ঈসা
মুহাম্মাদ
ঈসা
মূসা
ইব্রাহীম
নূহ

لا إله إلا الله

এ ছিলেন মুহাম্মাদ (সঃ)
এ'হলো ইসলাম
সকল বর্ণের সমাহার, বর্ণবাদ নয়
অন্যরা যা' বলে তা নয়

ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব

এ হ'লো ইসলাম
ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব

প্রকাশনায় ঃ
মুহাম্মাদ ইব্ন্ ইমামুদ্দীন
২৪৮/২, দ্বিতীয় কলোনী
মাজার রোড, মিরপুর
ঢাকা-১২১৮

প্রকাশকাল ঃ
রবিউসসানী, ১৪২৪ হিজরী
আষাঢ়, ১৪১০ সাল
জুন, ২০০৩ খৃস্টাব্দ

গ্রন্থস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। এর কোন আংশিক মূদ্রণ নিষিদ্ধ।
শুধু লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে ছাপা যাবে।

সৌজন্য মূল্য ঃ .... টাকা মাত্র।

সর্ব প্রকার যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বশান্তির বিশ্বায়ন কেন্দ্র
২৪৮/২, দ্বিতীয় কলোনী, মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৫৫২-৩৩১৭৭৯

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً)

''অতঃপর বলো, সত্যের আগমনে মিথ্যা পালিয়েছে। মিথ্যাকে অবশ্যই এভাবে পালাতে হয়।''(বানী ইসরাঈল-৮১)

আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য, মানুষ কর্তৃক নির্যাতিত মানুষকে ঈমান ও ইসলাম দিয়ে তাদের উন্নয়ন করে বৈষম্যবাদী শোষক ও শাষকদের উপর ইমামত্ ও কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা।

وَنُرِيْدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي ٱلأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ فِي ٱلأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوُنَ وَهَامَنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُوْنَ

"অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবীতে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছে, আমি তাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তা'হলো আমি তাদের ইমাম বানাবো, তাদের উত্তরাধিকারী করবো ও তাদের পৃথিবীর উপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবো। এবং (প্রত্যেক যুগে সমসাময়িক স্বৈরাচারী) ফেরআউন, (নম্‌রুদের প্রধানমন্ত্রী) হামান ও তাদের স্বৈরশাসনের সেনাবাহিনীদের সে পরিণাম স্বচক্ষে দেখাবো, যার তারা আশঙ্কা করে থাকে।" (সূরা ক্বাসাস-৫,৬)

বিশ্বের বিস্ময়,

বারাকাহ, যায়দ ও উসামাহ

اَلْحِبُّ, اَلْحَبِيْبُ وَإبْنُ الْحَبِيْب

নবী জীবনের বরকতের সমষ্টি

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

কে বারাকাহ,যায়দ ও উসামাহ?

আল্লাহ্ স্বয়ং "সালাম" শান্তি,

তাঁর আখেরী নবী বিশ্বে আল্লাহর "রহমত্"

এবং

বারাকাহ, যায়দ ও উসামাহ

নবী আদর্শের "বারাকাহ" বা

সকল বরকতের পর্বত শিখর!!!

"আমার মা'র পর তিনিই আমার মা

আমার আপনজনদের অবশিষ্টাংশ"

(রাসূল সঃ)

إنَّهَا أمِّي بَعْدَ أمِّي،إنَّهَا بَقِيَّةُ أهْلِيْ

বারাকাহ্

নবী সঃ নবুওতের পালিকা মাতা,

রাদিয়াল্লাহু আন্হা ওয়া আন্

আমসালিহা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

এবং

তাঁর অনুসারীদের প্রতিও সন্তুষ্ট।

উৎসর্গ

- বিশ্বসম্পদের ৮৫% মাত্র ১৫% শোষকরা ভোগ করে। এরা মুস্তাকবির। ৮৫% লোক মাত্র ১৫% সম্পদের অধিকারী। এরা মুস্তাদ্‌আফ্।
- ১৫ জন মুস্তাকবির খায় ৮৫টি রুটি । এরা মুস্তাকবির। ৮৫ জনে পায় মাত্র ১৫টি রুটি। এরা মুস্তাদ্‌আফ্।
- তাই মুস্তাকবিরদের ভোগের যোগান দিতে মুস্তাদ্‌আফ্ নর ও নারী বিশ্বময় ট্যাক্স স্লেইভ ও সেক্স স্লেইভ।
- আল্লাহ্ আল ক্বোরআনে মুস্তাদআফদের ক্ষমতায়নের ঘোষণা দিয়েছেন। এখন শুধু মুস্তাদ্‌আফ্‌দের ঈমান এনে বিশ্বায়নের সৈনিক হতে হবে।

- সে মুস্তাদআফদের ইমাম ও অনুসারীদের নামে উৎসর্গ এ মসির অসি।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়			
সতর্ক ও সাবধান বাণী, পূর্ব সতর্কীকরণ, সত্যের সাক্ষ্য	৭	মা হাফসা	২৭৮
মুখবন্ধ ঃ শাহাদাত	৯	বিপথগামী মুয়াবিয়ার প্রতি মুহাম্মাদ ইব্‌ন্ আবু বকরের পত্র	২৭৮
প্রথম কথা	১১	মুয়াবিয়ার উত্তর	২৭৯
বারাকাহ	১২	ইব্‌নু উমরের পত্র	২৮০
যায়দ ইব্‌ন্ হারিসাহ্	১৮	আম্মার ইব্‌ন্ ইয়াসির	২৮৩
ইমামতি কি শুধু ক্বোরেশীদের?	৩৭	আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্ মাসউদ	২৮৬
এ বেলাল কে?	৪০	সালমান ফার্সী	২৮৮
ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফের	৭৭	উসামাহ্ ইবন্ যায়দ	২৯৩
"রাদিআল্লাহুআনহু" কারা?	৭৮	সকল অভিশাপের মা-বিদ্‌আত	৩০১
ইমাম মাহদী ও দাজ্জাল	৮৩	আত্মঘাতি মিথ্যা সমূহ	৩০১
মুজাদ্দিদ ও তাজ্‌দীদ	৮৯	আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা	৩০৪
দ্বিতীয় অধ্যায়		ইহ্‌সানের সুফল ও বিদ্‌আতের কুফল	৩০৯
দিক দর্শন	১১৭	শামসুল হক ফরীদপুরী	৩৪৩
তাওহীদ ও ঈমান	১১৮	মানব জাতের উৎস, তার বিকাশ ও নাশ	৩৬৩
আদম ও ইবলীস	১১৮	মানব জাতের কুলাঙ্গার জারজদের পরিচয়	৩৬৪
রাসূল ও রিসালাত	১২৩	মক্কা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে মক্কা	৩৭১
সূরা মুহাম্মাদ	১২৬	শেষ কথা, মূল কথা ও আত্মস্বীকৃতি সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি	৩৭৬
সূরা হুজরাত	১৩২	বারাকাহ ফাউন্ডেশন(?)	৩৭৭
সূরা মুমতাহিনাহ্	১৫২	বিশেষ ঘোষণা	৩৮৩
সূরা তাহ্‌রীম	১৬৬	জরুরি জ্ঞাতব্য	৩৮৪
কে এ আবু বকর?	১৮৫	বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস	
মা খাদিজাহ	২৫৮	প্রমাণ সূত্র	
মা উম্মে হাবিবা	২৫৯		
মা উম্মে সালমা	২৬০		
মা আয়শার প্রতি মা উম্মে সালমার পত্র	২৬৭		
মা মারিয়া ক্বিবতীয়া	২৬৮		
মা আয়শা	২৭১		

সতর্ক ও সাবধান বাণী!!!
পূর্ব সতর্কীকরণ!!
সত্যের সাক্ষ্য!

সত্য পুরাতন হলে মিথ্যা হয় না। মিথ্যা পুরাতন হলে সত্য হয় না। সত্য চিরদিন সত্য থেকে যায়, মিথ্যা মিথ্যা। তাই ১৪১২ বছর পূর্বের সত্য দিয়ে তৎপরবর্তি ১৪১২ বছর ধরে চালু ও প্রচলিত হওয়া মিথ্যাকে আঘাত করা হচ্ছে।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

"আমি হক্কের ক্ষেপনাস্ত্র বাতিলের উপর নিক্ষেপ করি, তা' বাতিলের মগজে আঘাত হেনে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" (সূরা আম্বিয়া-১৮)

আল্লাহ বাবা আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আদম সন্তান সবাই সমান। মুত্তাক্বীরা গুণগত কারণে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী। বংশ বা বর্ণের ভিত্তিতে নয়।

ইবলিস জন্মগত ধাতব বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তোলে। তাই সে আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। আমরা সবাই তাকে অভিসম্পাত করি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত ও অভিসম্পাত চলবে।

আল্লাহ আদম সন্তানদের নির্দেশ করেছেন, "সাবধান! শয়তানের আনুগত্য করবেনা! সে তোমাদের আদিশত্রু! তার আনুগত্য করলে তার সাথে জাহান্নামে যাবে।"

সকল নবীরা আসেন। তাঁরা বলেন, "এক আল্লাহকে মানো। তাঁর সাথে কাকেও শরীক করবে না। বিদ্‌আত করবে না। তোমরা সব সমান। তাক্বওয়া ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মুত্তাক্বী ইমামের হাতে হাত দিয়ে তোমরা ইস্পাত ঢালাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কখনো বিভক্ত হবে না।" এর নামই "বায়আত"।

ইবলিস শয়তান ও তার মানুষ সন্তানরা বলে, "তোমরা রক্তে, বর্ণে, গোত্রে, ভাষায় ও রাষ্ট্রে বিভক্ত যতো ভাগ, ততো জাত ও জাতি।" এটাই শির্ক ও কুফর।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষ ব্রাহ্মন, অচ্ছুত, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, আরব ও অনারব, বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে মানুষ তাই অভিশপ্ত।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবী পাঠান। তিনি ভারতীয়, আরবীয়, মিশরীয়, পারস্য, গ্রীক, রোমান, আফ্রিকান, মোঙ্গলীয় ও চৈনিক ইত্যাকার বিভক্তির ৩৬০ প্রতীক প্রতিমাকে চুরমার করে বিশ্ব ঐক্যের ঘর কা'বাকে পবিত্র করে তাঁর বিদায় ও বিজয় হজ্জে ঘোষণা করেন, "আদম সন্তানেরা সব সমান। তাক্বওয়া ব্যতীত তাদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।"

তিনি যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সুহাইব, সালমান, সাওবান ও উসামাহদের দ্বারা বর্ণাঢ্য একজাতির পতাকা উত্তোলন করে তা, উসামাহর হাতে দিয়ে আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীদের বলে যান, "উসামাহর পতাকা তলে যারা থাকবে না, তাদের উপর লা'নত"। (আল্ মিলালু ওয়ান্ নাহল, পৃষ্ঠা-২১)

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর তাঁর দাফনের পূর্বেই উত্তোলিত হয় পুনঃ ক্বোরেশী মূর্তির একক পতাকা, "আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ"। ক্বোরেশী ব্যতীত অন্য গোত্রের কাকেও খলিফা হতে দেয়া হয়নি।

তারপর থেকে যায়দ, বিলাল, সালমান ও উসামাহরাই নয়, স্বয়ং বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীনও আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪১২ বছর ধরে ক্বোরেশী পতাকাতলে জিম্মী। কা'বা থেকে ৩৫৯টি মূর্তিকে বেদখল করে একা ক্বোরেশী মূর্তি তাকে দখল করে রেখেছে। ওদের দাপটে বিশ্বমুক্তির নবী "রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন" সঃ এর রিসালাতও আজ পর্যন্ত ক্বোরেশী-আরবী গোত্রবাদী যিন্দান খানায় বন্দি।

তাওহীদহীন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর ধোঁকার পতাকা বহন করে বিশ্বে যে ধর্মীয় দাজ্জালদের ১৪১২ বছরের দানব ও প্রেতপুরী দাঁড়িয়ে আছে, তা'জরাজীর্ণ হয়ে আজ পড়ে তো কাল পড়ে। এক'শ বিশ কোটি দিশাহারা মোহাচ্ছন্ন মুসলিম তাতে বন্দি। প্রতি কোঠায় পেঁচা, হুতুম, বদ্‌জ্বিন ও দৈত্য দানবের নিবাস। সংস্কারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এ প্রেতপুরী। সংস্কারে হাত দিলেই দানবেরা প্রেতপুরী ধ্বসিয়ে দিয়ে বন্দিদের যিন্দা কুবর দিবে।

এ বই মোহাচ্ছন্ন বন্দিদের জীর্ণ প্রেতপুরী ত্যাগ করে বের হয়ে আসার আযান দিয়ে শুরু। বের হয়ে আসার পর বিস্ফোরক দিয়ে ভিতসহ উড়িয়ে দেয়ার ডিনামাইট মাঝখানে। শেষে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও খাতামুন নাবিয়্যীন

মুহাম্মাদ সঃ দের আদর্শে বিশ্বকে মানব সাম্যের কা'বা রূপে গড়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর পতাকা উত্তোলনের বাস্তব ইশ্‌তিহার।
গড়া প্রাসাদে রংতুলী দিয়ে নামাঙ্কিত করে সিংহাসনে বসা যেমন সহজ কাজ, তেমনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাক্ষস খোক্কসপুরী নির্মূল করে কা'বা নির্মাণ দুরুহ কাজ। সেজন্য হযরত নূহ আঃকে কিস্তি বানিয়ে মানব দানবদের ডুবিয়ে মারতে হয়েছে, কুড়াল দিয়ে হযরত ইব্রাহীম আঃকে ধর্মীয় দানব মূর্তি খান খান করতে হয়েছে, হযরত মূসা আঃকে ফেরআউনী দানবদের নীলনদে ডুবিয়ে মারতে হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ সঃ কে তাঁর রক্তীয় ক্বোরেশী দানবদের উৎখাত করে কা'বাকে পবিত্র করতে হয়েছে।

১৪১২ বছরের পুরাতন মিথ্যার বন্দিখানা ভেঙ্গে, মিথ্যার ভিত পর্যন্ত উপড়ে ফেলে খাতামুন্ নাবিয়্যীন সঃ এর পহেলা হিজরী তারীখ থেকে ১০ম হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়ালের সোমবারে ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর নিয়োগ করা উসামাহ্ ইবন যায়দের ইমামতের আদর্শ পুনর্জীবিত করার ঘোষণা এ বই। ১৪১২ বছরের মিথ্যার জীর্ণ প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের উপর উড়বে রাসূল সঃ এর হাতে বাঁধা উসামাহর পতাকা। ইনশা আল্লাহ ।

ক্বোরেশী, উমাইয়া, আব্বাসী, মুঘল, পাঠান ও তুর্কী সুলতানাতের ১৪১২ বছরের মিথ্যার ভিত উপড়ানো কী চাট্টিখানি কথা?!

গোলাবারুদের বিস্ফোরকের স্থলে ভাষার বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে এ বইতে আগা গোড়ায়! তার কোনো বিকল্প ছিলো না, নাই বলে।
মিথ্যার প্রাসাদ নির্মূলের পর সত্যের কাবা নির্মানের জন্য আমাদের জন্য রয়েছে তিরিশ পারা মধুর ভাষা "আল্ ক্বোরআন।"

ক্বোরআনী ঈমান ও ইস্‌লামের অমৃত সুধাপানে পিয়াসীদের এ বইর তিক্তসত্য প্রথমে আকণ্ঠ পান করতে হবে। "আল্ হাক্কু মুররুন"। সত্য তিক্ত। সত্যের তিক্ত ঔষধ সেবন করে রোগমুক্ত হয়ে যারা ইহকাল ও পরকালের চরম সফলতা চায়, তাদের জন্য এ বই। এ বইর ভাষা।

যারা ১৪১২ বছরের পুরাতন জীর্ণ প্রেতপুরীতে বাস করে তার ধ্বংসস্তুপে আত্মহুতি দিয়ে হাশরের দিনে আল্লাহর মুখোমুখি হতে চায়, তাদের জন্য এ বই নয়, এ বইর ভাষাও নয়।

যারা এ সাবধানবাণী ও পূর্ব সতর্কীকরণ মেনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালে নবী-রাসূলদের সাথে হাশর চায়, একমাত্র তাদের জন্য এ বই ও তার ভাষা!
সত্য ন্যায়ের ইস্পাত কঠিন মানদন্ড ১৪১২ বছর ধরে অযত্ন ও অবহেলায় পরিত্যাক্ত পড়ে থাকার ফলে জং-মরিচা তাকে খেয়ে প্রায় বিকল করে ফেলেছে। Corrosive Rust বা ক্ষয়কারী জং-মরিচাকে পাল্টা Corrosive দিয়ে বিদুরণের জন্য আমাকে নিরুপায় হয়ে Corrosive ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। কে না চায় মিষ্টি ভাষা বলে মানুষের কাছে মিষ্ট হতে?! কিন্তু মিষ্টি যেখানে সংহারী এবং তিক্ত রক্ষাকারী, সেখানে তিক্ত প্রয়োগই সত্যের সাক্ষ্য, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। নবী রাসূলদের এ কাজ ছিলো। আমি তাঁদের উত্তরাধিকারী। তাঁদের রিসালাতের আযান পূনরুচ্চারণকারী।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

"আমি সত্যের ক্ষেপনাস্ত্র মিথ্যার প্রতি নিক্ষেপ করি। তাতে বাতিলের মগজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মিটে যায়।" (সূরা আম্বিয়া-১৮)

মুখবন্ধ ঃ শাহাদাত

এ বইখানা একজন বিশ্বাসীর ঈমানের সাক্ষ্য, শাহাদাত।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ

* আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই।

* "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"র সাথে অন্য কোনো কালেমা যোগ করা যাবে না।

* "আদম রাসূলুল্লাহ্", "নূহ রাসূলুল্লাহ্", "ইব্রাহীম রাসূলুল্লাহ্", "মূসা রাসূলুল্লাহ্", "ঈসা রাসূলুল্লাহ্", ও "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্", কালেমায়ে "রিসালাত"।

* কালেমায়ে রিসালাতকে কখনো কালেমায়ে তাওহীদের সাথে একত্র করা চলবে না।

* কালেমায়ে রিসালাতকে সর্বাবস্থায় পৃথকভাবে বলতে ও লিখতে হবে।

* ক্বোরআনে বর্ণিত গুণাবলীর ঈমানদারগণ ক্বেয়ামত পর্যন্ত "রাদিয়াল্লাহু আনহুম"।

* "রাদিয়াল্লাহু আনহুম"-কে, যারা কোনো বিশেষ শ্রেণী ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে, করছে বা করবে, তারা আল্লাহ্, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ-এর অমান্যকারী।

* ইসলাম গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহর একমাত্র দ্বীন, অন্য কোনো দ্বীন নেই।

* আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ সকল মানুষের জন্য চূড়ান্ত আল্লাহ্র রাসূল।

* তাঁকে যারা ক্বোরেশী, হাশেমী ও আরবী বলে "গন্ডিবদ্ধ" করেছে বা করে, তারা মুস্লিম নয়।

* তাঁকে যারা বর্ণ, গোত্র ও যুগের উর্ধ্বে আল্লাহ্র শেষ নবী মানে, শুধু তারাই মুস্লিম। যারা আল্লাহর রাসূলদের অনুসরণে আল্লাহকে মানে, তারা মুস্লিম।

* যারা নবীদের নিচে রাব্বাই, হাওয়ারী ও সাহাবাদেরও নবীর মতো মানে বা মানতে হবে বলে, তারা আল্লাহ্, ক্বোরআন ও নবীদের অমান্যকারী, অমুস্লিম।

* পৃথিবীতে একটিও ইসলামী রাষ্ট্র না থাকায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে, বিশ্বে কোনো "মুস্লিম উম্মাহ্" নেই। যারা আছে, তারা মিথ্যা দাবিদার। তাদের উপর আল্লাহর গযব।

* পৃথিবীতে ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু লোক মুস্লিম আছে। সংগঠিত মুস্লিম নেই। আখেরী নবী সঃ কর্তৃক আল্লাহর দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে।

* তাঁর মৃত্যুর পর পরীক্ষামূলকভাবে আবু বকর ও উমর তাদের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা অনুযায়ী ইসলামের অনুশীলনী আরম্ভ করে।

* আবু বকর ও উমরের আমলে আংশিকভাবে তা সফল হয়।

* ওসমানের আমলে নবী সঃ এর আদর্শের ইস্‌লাম হারিয়ে যায়।

* আলী এসে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে, তাকে স্ববংশে নির্মূল করে মূল ইস্‌লামকেই নির্বাসিত করা হয়।

* তারপর থেকে যে রাজতন্ত্র আরম্ভ হয়, তা ইস্‌লামের নামে রোমান সিজার ও পারস্য খসরুদের রাজ। ইসলাম নয়।

* উমর বিন্ আব্দুল আযীযের যুগ কুফর থেকে ইসলামে ফেরার একটি দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার যেমন কোনো শরীক নেই, তেমনি তাঁর রাসূলদের সমকক্ষ কোনো মানুষ নেই। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের মর্যাদা সব সময়, সম্পূর্ণ আলাদা।

নবী ও রাসূলদের সাথে তাদের সমসাময়িক শিষ্যদের আলাদা মর্যাদা দিলেই তারা পরবর্তী ঈমানদারদের উপর নিজেদের বিশেষ আধিপত্যবাদ দাবী করে দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলে। যেমন ইয়াহুদী রাব্বাই, খ্রীষ্টান হাওয়ারী ও ক্বোরেশী সাহাবীরা করেছে।
এই ভিত্তিহীন সর্বনাশা আধিপত্যের ফিৎনাকে কাটার জন্য এ বইতে শুধু আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলদের জন্যই "তিনি" "তাঁর" "তাঁদের" ও "করেন" ইত্যাদি বিশেষ সম্মানের প্রতিকী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য সকলের জন্য সাধারণ বাকধারা ব্যবহৃত হয়েছে, যা' ক্বোরআন ও রাসূলদের শিক্ষা।
বাবা হযরত আদম আঃ থেকে আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলাম আরম্ভ হয়ে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ এর রিসালাত দিয়ে তা' পূর্ণ হয়। এ বই সেই ইসলামের। যে কথিত ইসলাম ১৪১২ বছর পূর্বে "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" অর্থাৎ "নেতৃত্ব শুধু ক্বোরেশ গোত্র থেকে হতে হবে" এর মিথ্যা ভিত্তিতে আরম্ভ হয়ে উমাইয়া, আব্বাসী, মুঘল ও তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের পাপের আবর্জনা বহন করে আজ মৃত্যুর প্রহর গুনছে, তার সাথে এ বই ও তার লেখকের কোনো সর্ম্পক নেই। ইয়াহুদী-খৃষ্টান হওয়া যেরূপ "মিল্লাতে ইব্রাহীম" হতে খারিজ বুঝায়, সুন্নী ও শিয়া হওয়া সেরূপ আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ এর প্রদর্শিত ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার সনদ। গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকারীদের অবশ্যই শিয়া-সুন্নী বিভক্তি থেকে তওবা করে শুধু মুসলিম হতে হবে।
এ বই আল্লাহ্, ক্বোর'আন ও রাসূল সঃ দের দ্বীনকে তুলে ধরার সাক্ষ্য, শাহাদাত ও দাওয়াত। ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদী ইমামতের আদর্শে বিশ্ব শান্তির ইশ্‌তেহার।

- ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা

প্রথম কথা

আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির 'রব', পালন কর্তা।

তিনি কোনো গোত্র, বর্ণ ও জাতি ভেদাভেদের নন্।

তাঁর শেষ নবী সঃ "রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন" সকল সৃষ্টির কল্যাণের দৃষ্টান্ত, প্রতীক।

তাঁর উপর সালাম। তাঁর অনুসারীদের উপরও।

* শয়তান, ইব্লিস্, বর্ণবাদ ও বৈষম্যের দাবিদার, ধারক ও বাহক। তার উপর লানত ও ধিক্কার। তার অনুসারীদের উপরও।

* আরব বেদুঈনজাত বিবাদ, বৈষম্য ও বর্ণবাদের অপর নাম। বনি আদমের কলঙ্ক, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আল্লাহ্ তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্র, "শিফা", আল কোরআন্ দিয়ে তাঁর শেষ নবী পাঠান সেই আরব মরুতে।
* ২৩ বছর নবী সঃ তাঁর "শিফা শাস্ত্র" অনুশীলন করে তাঁর নবুওতের ঘরে কিছু "আদর্শ সুস্থ" মানুষ তৈরী করে যান। তারাই হলেন, বারাকাহ্, যায়দ, উসামাহ্, বেলাল, আম্মার, সুহাইব ও তৎসমরা।

* বর্ণ ও গোত্র বৈষম্যের পুজারী মক্কা ও কাবার "দখলদার" ধর্ম-ব্যবসায়ী অপবিত্র মুশরিক ক্বোরেশীরা নবীর রিসালাতকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করে থামেনি। তাঁকে প্রাণে নাশ করে চিরতরে তাঁর রিসালাতকে অঙ্কুরে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করে।

* আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করার জন্য আখেরী নবী সঃ কে মক্কাহ থেকে মাদীনাহ্ নিয়ে মাদীনাবাসীদের সাহায্যে তাঁর নবী ও দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

* অজ-গাঁ, মাদীনাহ্ ইসলামের লালন ভুমি হয়। মক্কাবাসী সমূলে পরাজিত হয়। তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের দেব-দেবীর মূর্তিগুলি চিরতরে বিদায় নেয়।

* মক্কার জালেমদের ক্রীতদাস-দাসীরা আখেরী নবীকে মুক্তিদূত হিসাবে গ্রহণ করে। "মানুষ হয়ে মানুষের প্রভু হওয়া" মক্কাবাসীরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়। নবী সঃ এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম চল্লিশ জনের মধ্যে তিরিশ জনের বেশী ছিলো দাস এবং দাসীরা। এরাই "মুস্তাদ্আফীন"।

* আব্দুল্লাহ্র ঔরসে ও আমিনার পেটে জন্মানো মুহাম্মাদকে নবী রূপে গড়ার জন্য এক ক্রীতদাসী বারাকাহ্কে দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর আখেরী নবীকে উত্তম আদর্শে লালন পালন করেন।

* মূল ইস্লামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বংশপূজারী ও বর্ণবাদী ঐতিহাসিকরা ক্বোরেশ ও আরব বর্ণবাদীদের প্রভাবে, বর্ণ ও গোত্রবাদ নির্মূলকারী ইসলামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে "মানুষ মুহাম্মাদের" মুশরিক পিতা-মাতা ও তার দুধ মা হালিমার কথা লিখেই ইতিহাসের ইতি টেনেছে।

* পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালেব মুহাম্মাদের ছ'বছর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব নিয়েছিলো।

* কিন্তু আমিনাকে বিয়ে করার পূর্বে আব্দুল্লাহ্‌র কেনা দাসী বারাকাহ্‌, যিনি সদ্য বিবাহিতা ও দু'মাসের গর্ভবতী বিধবা আমিনার শোকের সঙ্গী, গর্ভাবস্থায় তার পরিচর্যাকারী, প্রসবের সময় মুহাম্মাদের ধাত্রী, আমিনার মাদীনাহ্‌ যাত্রা ও ফেরার পথের একমাত্র সাথী, মরুভূমিতে অসুস্থতা ও মৃত্যুকালে একমাত্র সেবাকারিনী, আমিনার মৃত্যুর পর তাকে দাফনকারিনী এবং একা মুহাম্মাদকে নিয়ে এসে দাদার হাতে তুলে দিয়ে তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর মুহাম্মাদকে মাতৃস্নেহে তিলে তিলে গড়ে তোলেন, যাকে রাসূল হওয়ার পর মুহাম্মাদ সঃ বলতেন, "আমার মায়ের পর একমাত্র ইনিই আমার মা", তিনি বারাকাহ্‌।

আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালিবের ঘরে শিশু মুহাম্মাদকে বারাকাহ্‌ তার সকল সত্তা নিংড়িয়ে পালন করেছেন। তার মলমূত্র সাফ, গোসল ও কাপড় ধোয়া থেকে আরম্ভ করে পঁচিশ বছর বয়সে বিবি খাদিজার সাথে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে মাতৃত্বের কাজ করেছেন, তার ফলেই রাসূল সঃ বারাকাহ্‌কে আস্‌তে দেখলেই দাঁড়িয়ে তাকে সালাম করতেন এবং কপালে চুমো খেতেন। রাসূল জীবনের বরকত্‌, বিস্মৃত বারাকাহ্‌কে তার সঠিক ভূমিকা ও মূল্যায়নে তুলে ধরার জন্য এ বইখানা।

পিতার দাসী সন্তানের দাসী নয়। সন্তানদের মাতৃতূল্য মা। তারই স্বর্গীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন বারাকাহ্‌ ও তার রাসূল পুত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌, খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন।

সঠিকভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর শৈশব, যৌবন ও নবী জীবন জানতে হলে প্রত্যেককে বারাকাহ্‌, মুহাম্মাদ সঃ, যায়দ ও উসামাহ্‌কে জানতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বইখানা সে উদ্দেশ্যেই লেখা। ইসলাম ও নবীকে জানতে হলে এঁদের জানতেই হবে। তা' না হলে ইসলাম জানা হবে না।
ইয়া আল্লাহ্‌! তুমি আমাদের তোমার শেষ নবীর উৎস, জীবন ও আদর্শ উপলব্ধি, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক্ব দান করো। আমীন।।

বারাকাহ্‌

বারাকাহ্‌ কে?
বারাকাহ্‌ একটি হাব্‌শী বালিকা। বয়স পনের ষোল বছর। মুহাম্মাদের পিতা আব্দুল্লাহ্‌ তাকে মক্কার ক্রীতদাস-দাসীর বাজার থেকে ক্রয় করে।
মুহাম্মাদের মা আমিনা বিন্‌তে ওয়াহ্‌ব্‌কে বিয়ে করার পূর্বে আব্দুল্লাহ্‌ তাকে ক্রয় করে।

আব্দুল্লাহ্‌ ও আমিনার বিয়ের পর তাদের দেখা-শোনার সকল দায়িত্ব বর্তায় বারাকাহ্‌র উপর।

বারাকাহ্‌ বলেন ঃ
আমিনা ও আব্দুল্লাহ্‌র বিয়ের দু'সপ্তাহ পর আব্দুল্লাহ্‌র বাবা আব্দুল মুত্তালিব আমাদের বাড়ী এসে বললো, "আব্দুল্লাহ্‌ তৈরী হও। তোমাকে সিরিয়াগামী সওদাগরী কাফেলায় ব্যবসার জন্য যেতে হবে।"

এ কথা শোনামাত্র আমিনা আর্তনাদ করে বলে, "আশ্চর্য! আশ্চর্য!! কিভাবে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে এতো দূর দেশ সিরিয়া যাবে? এখনো যে আমি নববধূ! এখনো তো আমার হাতের মেহ্‌দীর রং যায় নি!"

আব্দুল্লাহ্‌র মনের অবস্থাও তাই। কিন্ত সে রাশভারী শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশের বিরোধিতা করতে পারে কি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দীর্ঘ পথের যাত্রায় পা বাড়াতে হলো। আব্দুল্লাহ্ রওয়ানা হয়ে বাড়ীর সীমানা পার হওয়ার পরই আমিনা বেহুশ হয়ে পড়ে যায় দোর গোড়ায়।

বারাকাহ্ বলেন ঃ
আমি যখন আমিনাকে পড়ে যেতে দেখলাম, দুঃখে আর্তনাদ করে বললাম, "কি হয়েছে তোমার! তুমি যে পড়ে গেলে?" আমিনা চোখ খুলে আমার দিকে তাকালো। তার গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা। জবাবে ক্ষীণ কণ্ঠে আমিনা আমাকে বললো, "আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো"।

এরপর আমিনা বিছানায় পড়লো। সে কারো সাথে কথা বলেনা। এমন কি যারা সাক্ষাৎ করতে আসে, তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। একমাত্র শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিব আসলে তার সাথে আদব রক্ষার্থে শুধু কুশল বিনিময় করে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বারাকাহ্ তার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। অশ্রুতে তার চোখ টলমল করে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পুনঃ বলেন ঃ

আব্দুল্লাহ্র চলে যাওয়ার প্রায় দু'মাস পর একদিন ফজরের পর আমাকে কাছে ডেকে আমিনা বলে, "আমি এক আজব স্বপ্ন দেখেছি আজ রাতে। দেখছি যে আমার জঠর থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সারা মক্কাহ উপত্যকাকে আলোকিত করে ফেলেছে।"

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি গর্ভ অনুভব করছো?" উত্তরে আমিনা বললো, "কি-জানি, মনে তো তাই হয়। কিন্তু গর্ভধারণ করলে মেয়েদের যে উপসর্গ দেখা দেয়, আমি যে তা অনুভব করছি না?"

জবাবে আমি বললাম, "মনে হয় তোমার এমন একটি সন্তান হবে, যার দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ হবে।"

এরপর আরো কিছুদিন কেটে যায়। আব্দুল্লাহর কোনো খবর নেই। তার ফলে আমার ও আমিনার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। আমিনার অবস্থা এতোই করুণ যে তার শরীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। আমি তাকে সর্বক্ষণ বিভিন্ন গল্প কাহিনী ও দুশ্চিন্তা বিদূরণের কথা-বার্তা বলে সান্তনা দিতে সচেষ্ট ছিলাম। আমি সর্বক্ষণ পাশে না থাকলে কি হতো বলা যায় না।

এভাবে দিন কাটছে আমাদের দু'জনের। একদিন সকালে আব্দুল মুত্তালিব উৎকণ্ঠার সাথে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং কোনো ভূমিকা না করেই বলল, "আমিনা তৈরী হও। আমাদের মক্কাহ নগরী ছেড়ে বাইরে যেতে হবে।"
আমিনা আশ্চর্য হয়ে বললো, "কি হয়েছে বাবা, আমরা কেনো নগরী ত্যাগ করে বাইরে যাবো?"

উত্তরে আব্দুল মুত্তালিব বললো যে, বাদশাহ্ আব্রাহা মক্কাহ আক্রমণ করতে আসছে। সে মক্কাহ্ দখল করে কা'বা ধ্বংস করবে, ক্বোরেশদের উৎখাত করবে এবং ছেলে মেয়েদের দাস-দাসীরূপে ধরে নিয়ে যাবে।

তদুত্তরে আমিনা বললো, "বাবা, আপনি দেখছেন আমি অসুস্থ ও শোকাহত, আমি এতো দুর্বল যে হেটে আমি পাহাড়ে চড়তে পারবো না।"

আব্দুল মুত্তালিব বলল, "কিন্তু আমার যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তোমার এবং তোমার পেটের সন্তানের জন্য!"

আমিনা বললো, "বাবা, আবরাহা মক্কাহ্ প্রবেশ করতেও সক্ষম হবে না, কা'বাও ভাঙ্গতে পারবে না। কারণ, কা'বার মালিক আছেন, তিনি তা রক্ষা করবেন।"

আব্দুল মুত্তালিব বললো, "কিন্তু আব্রাহা ও তার সেনাবাহিনী মক্কাহ থেকে মাত্র দু'মাইল দুরে, আক্রমণের শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে! আমরাও অন্যান্যদের মতো মক্কাহ ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেই- সেটাই উত্তম।"

কিন্তু আমিনা এ ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শুনে মোটেও বিচলিত হলো না। যেনো সংবাদটি কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। তা দেখে আব্দুল মুত্তালিব রেগে যায় এবং বলে, "কোনো কথার প্রয়োজন নেই। আমিনা কাপড় চোপড় ও জিনিস পত্র গুছিয়ে তৈরী হও। বারাকাহ্, তুমিও সব গুছিয়ে তৈরী হও। তৈরী হয়ে তোমরা দু'জন আসো। আমি তৈরী হয়ে তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো।"

এর মধ্যেই অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেলো। আক্রমণকারী আব্রাহার প্রকান্ড হাতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। আর উঠেনা, একপাও অগ্রসর হচ্ছে না।

হাতিকে তোলার জন্য সৈন্যরা তাকে লৌহদন্ড দিয়ে আঘাত করলো, হাতি দাঁড়ালো বটে কিন্তু একপাও আর সামনে আগাচ্ছে না। তখনই ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখী বিষাক্ত পাথর কুচি নিক্ষেপ করে আবরাহা ও তার সেনা বাহিনীকে নির্মূল করে দিলো। কা'বা রক্ষা পেলো এবং মক্কাহ্‌র মাহাত্ম আরো বাড়লো।

তারপর বারাকাহ্ তার কাহিনী বর্ণনা করছেন ঃ

আমি সর্বক্ষণ আমিনাকে চোখে চোখে রাখি। দিবানিশি তার চোখ ও চেহারার দিকে তাকাই। আমিনা যেনো তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো আব্দুল্লাহ্‌র বিরহে ও দুশ্চিন্তায়। আমি রাতেও তার পাশে শুতাম। আমি শুনতে পেতাম যে আমিনা ঘুমের মাঝেও যেনো আব্দুল্লাহ্‌র সাথে স্বপ্নে কথা বলছে। কখনো আমি তার আর্তনাদে জেগে যেতাম এবং তাকে বিভিন্ন ভাবে প্রবোধ দিয়ে, সান্তনা দিয়ে উৎসাহিত করতাম। এভাবেই আমাদের দিন কাটছিলো।

তার দু'মাস পর সওদাগরী ক্বাফেলা সিরিয়া থেকে ফেরৎ আসা আরম্ভ হলো। এক এক ক্বাফেলা পৌঁছুলেই তাদের আত্মীয় স্বজনেরা তাদের আগ বেড়ে গিয়ে স্বাগত জানিয়ে নগরীতে নিয়ে আসতো।

কোনো ক্বাফেলা এলেই আমি চুপি চুপি গিয়ে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট থেকে আব্দুল্লাহ্‌র সংবাদ নিতে যেতাম। কোনো সংবাদ না পেয়ে আমি পুনঃ চুপি চুপি বাড়ী চলে আসতাম। আমিনাকে কিছুই জানতে দিতাম না। পাছে কোনো সংবাদ নেই শুনতে পেয়ে আমিনা আরো ভেঙ্গে পড়ে!

এভাবে একে একে সকল ক্বাফেলা ফেরত আসে। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ফিরেনি। ব্যাপারটি আমাকেও বিচলিত করে তুললো। তাই একদিন সকালে খুব উদ্বেগ নিয়ে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট গেলাম।

গিয়েই দুঃসংবাদ পেলাম। মাদীনাহ থেকে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। সংবাদ শুনে বজ্রাহতের মতো হতভম্ভ হয়ে যাই।
দুঃসংবাদের আকস্মিকতা এমনই ছিলো যে আমার মনে পড়ে যে, সংবাদ শুনে আমি চিৎকার করে বসে পড়ি। তারপর প্রায় জ্ঞান হারা হয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী পৌঁছে প্রিয়কে চিরতরে হারানোর শোকে বিলাপ করতে থাকি। আমার অবস্থা দেখেই আমিনা সব বুঝে যায়। আমিনা কোনো প্রকার ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

এরপর আর আমিনা শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেনি। আমি ছাড়া বাড়ীতে আমিনার পাশে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী ছিলো না। আমার শোকের বোঝা নিয়ে আমি সর্বদা আমিনাকে ঘিরে থাকি। তার সেবা যত্ন, তাকে প্রবোধ দেয়া ও মনোবল দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা আমার একমাত্র জীবনের ব্রত হয়ে যায়। কারণ, আমিনার পেটে যে আমার প্রিয়ের চিহ্ন পূর্ণতা লাভ করছে! তার যত্ন চাই।

এভাবে দিনরাত প্রহর গোনার পর আমিনা মুহাম্মাদকে প্রসব করে। প্রসবের পর সর্ব প্রথম আমি মুহাম্মাদকে দু'হাতে তুলে আমিনার পাশে দেই। মুহাম্মাদ শেষ রাতে জন্মায়। ভোর হওয়ার পর খবর পাঠালে আব্দুল মুত্তালিব আসে ও অন্যান্যরাও আসে।

মুহাম্মাদকে পেয়ে আমরা আব্দুল্লাহ্‌কে ফিরে পাই। জমাট আঁধার শেষে যেনো বেঁচে থাকার আশার আলো জ্বলে ওঠে।

মুহাম্মাদের জন্মে আব্দুল মুত্তালিবসহ পরিবারের সবাই আনন্দিত হয় এবং মহা সমারোহে জন্মোৎসব করে। আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদকে কোলে করে কা'বায় গিয়ে তাওয়াফ করে ঘোষণা দেয়, "এ হলো মুহাম্মাদ, আমার ছেলে, এ হলো আব্দুল্লাহ্‌র বরকতময় স্মৃতি।"

আরবরা, বিশেষ করে মক্কাহ্‌বাসী, শিশুদের দুধ পান ও মরুভূমির স্বাস্থ্যকর মুক্ত বায়ুতে লালনের জন্য পয়সার বিনিময়ে ধাত্রীদের কাছে দত্তক দিতো।

বারাকাহ্ বলেন ঃ

মক্কা উপত্যকার বাইরে মরুবাসী ধাত্রীরা পালনের জন্য শিশুদের নিতে আসতো। মুহাম্মাদ দরিদ্র বিধবা মায়ের সন্তান বিধায় দুগ্ধদাত্রীরা কেউ তাকে নিলো না। যারা প্রচুর টাকা দিতে সক্ষম, তাদের সন্তানদেরই তারা আগ্রহ ভরে নিলো। হালিমা সাদীয়া নাম্নী এক দুগ্ধদাত্রী সবার শেষে আসলো। কারণ, তার বাহন গাধীটি এতোই রোগা ও দুর্বল ছিলো যে তার মক্কাহ পৌঁছুতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো।

অন্য কোনো শিশু না পেয়ে হালিমা মুহাম্মাদকে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের কুদরত! ফেরার পথে হালিমার রোগা গাধীটি তেজী আরবী ঘোড়ার গতিতে বাড়ী ফিরলো মুহাম্মাদকে নিয়ে। তারপর এতীম শিশু মুহাম্মাদের ভাগ্যে হালিমার দৈন্যদশা দূর হয়ে গেলো। তার ভেড়া বকরির পাল মোটাসোটা হতে আরম্ভ করলো। প্রচুর দুধ দিতে লাগলো এবং দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে হালিমার ঘর ভরে দিলো। চারি দিক থেকে হালিমার সংসারে বরকত উপ্‌চে আসতে লাগলো।

হালিমার সঙ্গী যে সমস্ত ধাত্রীরা দারিদ্রের জন্য তাকে অবজ্ঞা করেছিলো, হালিমার ভাগ্যের পরিবর্তন দেখতে পেয়ে তার প্রতি ঈর্ষা পরায়না হয়ে উঠলো। তারা কি জানতো যে এ সমস্ত আমার মুহাম্মাদের বরকতে হয়েছিলো!

এভাবে মুহাম্মাদ ছ'বছর বয়সে পৌঁছালো। আমিনা সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে তার স্বামী আব্দুল্লাহ্‌র কবর যিয়ারতের জন্য মাদীনাহ্ যাবে। এ সফর বেশ কষ্টসাধ্য ছিলো। শিশু মুহাম্মাদ ও শোকাহত আমিনাকে নিয়ে এ সফরে যাত্রা আমাকে চিন্তিত করলো। আমি এ ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিবকে আমার আশঙ্কা সম্পর্কে জানালাম।

এক সকালে আব্দুল মুত্তালিব এলো। সে আমিনাকে এ কষ্টকর সফর থেকে বিরত রাখতে চাইলো। কিন্তু আমিনা তার অটল সংকল্পের কথা জানালে আব্দুল মুত্তালিব অগত্যা রাজী হয়।

একদিন আমি, আমিনা ও মুহাম্মাদ উটের পিঠে এক পাল্কীতে চড়ে সিরিয়াগামী এক বিরাট কাফেলার সঙ্গী হয়ে মাদীনার পথে যাত্রা করলাম। কাফেলা যখন মক্কাহ্ থেকে রওয়ানা হয়ে দু'মাইল দূরে পৌঁছলো, মরু কাফেলার গায়করা তাদের গান ধরলো। এ গান শুনলে উটেরা তাদের গতি বৃদ্ধি করে তালে তালে গন্তব্যের দিকে ছুটে। ওদের যেনো নেশায় ধরে।

আমরা চলছি এ দীর্ঘ যাত্রায়, ধূধূ মরুভূমির বুক চিরে। আমি চেয়ে দেখি আমিনার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বেয়ে চলছে। আমি তাকে বললাম, "তুমি সাহসী হও, ধৈর্য্য ধারণ করো তোমার শিশু ছেলের সামনে। তা'না হলে সেও যে ভেঙে পড়বে!"

আমরা যে মুহাম্মাদের বাবার কৃবর যেয়ারতে যাচ্ছি, একথা শিশু মুহাম্মাদকে জানতে দেইনি। কচি শিশু না আবার শোকাহত হয়!
এভাবে আমরা দিনের পর দিন চলছি মরুভূমি দিয়ে। দীর্ঘ পথ। পুরোটা পথই আমিনা তার প্রাণ প্রিয় স্বামীর স্মৃতিতে বিভোর হয়ে চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে দিয়ে কাটালো। আমি তাকে বিভিন্নভাবে মরুভূমির কিস্সা কাহিনী বলে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করি।

অন্য দিকে মুহাম্মাদের দিকে আমিনার খেয়ালই নেই। সে তো আমার গলা ধরে, কোলে ঘুমাচ্ছে। যখনই উঁচু-নিচু পথে চলাকালে উটের ঝাঁকুনীতে মুহাম্মাদ জেগে উঠতো, তারপর পুনঃ শক্ত করে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। এভাবে দশ দিন পর আমরা মাদীনাহ্ পৌঁছে মুহাম্মাদের মাতৃকুল বনুন্ নাজ্জারদের আতিথেয়তায় উঠি। মাদীনাহ্ পৌঁছে এক দিনও বিশ্রাম না নিয়ে আমিনা ও আমি চল্লিশ দিন প্রত্যহ আব্দুল্লাহর কবরস্থলে যাই। সকাল থেকে সন্ধ্যা এভাবে কেঁদে কেঁদে আমিনা আরো দুর্বল হয়ে যায়।

আমরা মুহাম্মাদকে সঙ্গে নেইনি। তার বয়স মাত্র ছ'বছর। এ বয়সে তাকে পিতৃশোকে ফেলতে চাইনি। তাই তাকে মাদীনায় তার সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলতে দিয়ে আমরা দু'জন আব্দুল্লাহর কবরে চলে যেতাম। শোকে আমিনা ভীষণ দুর্বল হয়ে গেলো।

তারপর পুনঃ আমরা রওয়ানা হলাম মক্কার পথে। পথে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার জ্বর হলো। জ্বর দিন দিন বেড়ে এমন হলো যে, একদিন আমিনা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। আমরা তখন মক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝ পথে। "আব্ওয়া" নামক এক গাঁয়ের কাছে।

আমাদের জন্য কাফেলা একদিন দেরী করলো। কিন্তু আমিনার সুস্থ হয়ে উঠার কোনো লক্ষণ না দেখে কাফেলা আমাদের রেখে চলে আসলো।

দিন রাত আমি একা আমিনার সেবা করছি। আমার জানা মতে যতো চিকিৎসা ছিলো, তা'আমি মরুভূমির লতা গুল্ম দিয়ে করলাম।

এক কাল রাত্রিতে যেনো আমার মাথায় বাজ পড়লো। আমিনার জ্বর এমন বাড়লো যে আমি হাত দিয়ে দেখি গা পুড়ে যাচ্ছে। আমি তাৎক্ষণিক আশঙ্কা ও পরবর্তী পরিস্থিতির কথা ভেবে কাঠ হয়ে গেলাম। আমিনার অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগলো। এক পর্যায়ে আমিনা ডুবে যাচ্ছে বলে মনে হলো। প্রতি মুহূর্তে যেনো বিদায়ের দিকে এগুচ্ছে।

আমি অপলক দৃষ্টিতে আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সেবা করতে লাগলাম, আর আগত বিপদের শঙ্কায় বিমূঢ় হতে থাকলাম। এর মধ্যে মুহূর্তের জন্য আমিনা চোখ খুললো। আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে আরো কাছে ডাকলো। আমি তার মুখের দিকে ঝুঁকে তার কথা শুনতে চাইলাম।
আড়ষ্ট কণ্ঠে আমিনা আমাকে বললো ঃ
"বারাকাহ্, আমার বিদায়। মুহাম্মাদের ব্যাপারে তোমাকে বলে যাচ্ছি, মুহাম্মাদ তার বাবাকে হারিয়েছে যখন ও আমার পেটে। এখন আমি তোমার চোখের সামনে তাকে একা রেখে বিদায় নিচ্ছি। ওর তো পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কেউ রইলো না। তুমি আমাকেও পেলেছো। আমার পর তুমিই মুহাম্মাদের মা, মুহাম্মাদের সব। মুহাম্মাদকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাকে তুমি কখনো তোমার থেকে পৃথক করো না।"

আমি আমিনার অন্তিম কথাগুলো শুনছিলাম আর চোখের পানি দিয়ে অন্ধকার রাতে মরুভূমির বালুকে সিক্ত করছিলাম। তার কথা শুনে আমি আর আমাকে স্থির রাখতে পারলাম না। আব্দুল্লাহ্‌র ঘরে আমি আমিনার পূর্বে এসেছি। আব্দুল্লাহ্‌র দেখা-শোনা করেছি। বিয়ের পর আব্দুল্লাহ্‌ ও আমিনা উভয়ের সেবা যত্ন করেছি। আব্দুল্লাহ্‌ যেনো না বলেই হারিয়ে গিয়েছিলো। তারপর আমিনাকে নিয়ে আমার জীবন ছিলো। তারপর আব্দুল্লাহ্‌র চিহ্ন স্বরূপ আসলো মুহাম্মাদ। এখন আমিনাও চলে যাচ্ছে আমাকে একা মরুভূমিতে রেখে। আমি মুহাম্মাদকে নিয়ে কিভাবে ভবিষ্যতে আমিনা ও আব্দুল্লাহ্‌র আমানত রক্ষা করবো, এ সমস্ত কথা একত্রে জড়ো হয়ে মরুভূমির ভয়ঙ্কর একাকীত্ব আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছিলো।

আমার বুক ফেটে কান্না আসলো। নিজেকে আমি আর সামলাতে পারলাম না। অপ্রতিরোধ্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম আমি। আমার কাঁন্না দেখে মুহাম্মাদ তার মায়ের বুক জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। মুহাম্মাদ তার মায়ের কণ্ঠ দু'হাতে জড়িয়ে কাঁদছে। আমি অন্তিম পথের যাত্রী আমিনার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। এমন সময় আমিনা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

*** *** ***

এতো দিনের পুরাতন স্মৃতি বারাকাহ্‌ বলেছেন, তার লালন পালন ও যত্নে মুহাম্মাদ বড় হয়ে "খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন" "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পর। তখন মুহাম্মাদ বিশ্বের বিস্ময়, আর বারাকাহ্‌ তাঁর আজীবন পালক মাতা। বিশ্বের মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পাঠানো রহ্‌মতকে লালন পালনের জন্য আল্লাহ্‌র পাঠানো "বরকত" বারাকাহ্‌র স্মৃতিচারণ। দ্বিতীয় খলীফাহ্‌ ওমর বিন্‌ খাত্তাবের খেলাফতের আমলে বারাকাহ্‌ ইন্তেকাল করেন। প্রায় ষাট বছর পূর্বের ঘটনা বলতে গিয়ে বারাকাহ্‌ কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও বলেন ঃ

আমার দু'হাত দিয়ে মৃত মায়ের কণ্ঠ থেকে মুহাম্মাদকে পৃথক করে মুহাম্মাদের সে কচি হাত দু'খানা আমার গলায় জড়িয়ে আমি তাকে আমার বুকে নিলাম। মুহাম্মাদ ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে সজোরে কাঁদছিলো। কোনো অবস্থাতেই সে আমার কণ্ঠ ছাড়ছিলোনা। সে অবস্থায়ই আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে মরুভূমির বালি সরিয়ে কবর খুদে তাতে আমিনাকে শুইয়ে দিয়ে বালু দিয়ে ঢেকে আমার অবশিষ্ট চোখের পানি দিয়ে ভিজিয়ে ছিলাম।

রাতের বেলা। অন্ধকার মরুভূমি। হু হু করে মরুর বাতাস বালু উড়িয়ে যেনো আমার কান্নায় শরীক হয়েছিলো। এভাবে রাত পোহালো। মুহাম্মাদকে বুকে জড়িয়ে আমি পুনঃ উটে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলাম।

মক্কাহ পৌঁছে মুহাম্মাদকে নিয়ে আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে উঠলাম। আমি আর মুহাম্মাদ, এই আমার জীবন। আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে দু'বছর যেতে না যেতেই সেও বিদায় নিলো। আমিনার মৃত্যুকালে মুহাম্মাদ ছ'বছরের। দাদার মৃত্যুকালে তার বয়স আট বছর।

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আমাদের আশ্রয় জুটলো আবু তালিবের ঘরে। আবু তালিব অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলো। তার সংসার অভাবের সংসার। সংসারে সন্তান অনেক কিন্তু আয় কম। আমি মুহাম্মাদকে আমার অন্তর নিংড়িয়ে স্নেহ যত্ন করে পালছি। অপর দিকে দরিদ্র চাচার সংসারের বোঝা হালকা করার জন্য মুহাম্মাদকে দিয়ে মেষ-বকরি চরিয়ে বৃদ্ধ আবু তালিবের সংসারে কিছু আয়ের সংস্থান করেছিলাম। মুহাম্মাদও এতো বিচক্ষণ ছেলে ছিলো যে, সে তার স্নেহপরায়ন চাচার কষ্ট সম্যক বুঝেছিল। এরপর সে নিজে উদ্যোগী হয়ে মেষ বকরী পেলে তার আয় দিয়ে চাচার সংসারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো।

এভাবে আমি মুহাম্মাদকে লালন পালন করি। মুহাম্মাদ এমন আদর্শ ছেলে হিসাবে বড় হয় যে, তার পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদিজা তাকে বিবাহ করে।

এভাবে আমি পুনঃ খাদিজার ঘরে মুহাম্মাদকে নিয়ে প্রবেশ করি। জন্ম থেকে এ পর্যন্ত আমি মুহাম্মাদ থেকে পৃথক হইনি এবং মুহাম্মাদও আমার কাছ থেকে পৃথক হয়নি। খাদিজার সাথে বিবাহের পর আমাদের উভয়ের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসে।

মুহাম্মাদ আমাকে আম্মা (ইয়া আম্মাহ্‌) বলে ডাকতো। খাদিজার সাথে বিয়ের কিছুদিন পর এক সকালে মুহাম্মাদ এসে আমাকে বলে ঃ

"আম্মা, এখন তোমার ছেলে তোমার স্নেহযত্নে বড়ো হয়ে বিয়ে শাদী করে নিজের সংসার করেছে। মাগো, সারাটি জীবন দিয়ে তুমি আমার সুখ শান্তিই কেবল দেখেছো। কিন্তু তোমার যে কোনো সংসার হলো না মা! এখন যদি

কোনো আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এসে তোমাকে চায়, তুমি কি মা রাজী হবে?"
উত্তরে আমি বললাম, "সে কেমন কথা! আমি যে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। তুমিই কি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"
উত্তরে মুহাম্মাদ উঠে এসে আমার গলা জড়িয়ে আমার কপালে চুমো খেলো এবং হেসে তার স্ত্রী খাদিজার প্রতি তাকিয়ে বললো, إنها إمي، إنها بقية أهلي
"দেখো, এ হলো বারাকাহ্, আমার মা, আমার মায়ের পর ইনিই আমার মা, আমার মূলের অবশিষ্ট, বাক্বীইয়্যাতু আহ্‌লী।"
এ বলে মুহাম্মাদ যেনো তার স্ত্রী খাদিজাকে ইংগিত করলো, "তুমি মাকে বুঝাও। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভালো বোঝে।" একথা বলে মুহাম্মাদ বাইরে চলে গেলো। খাদিজা আমার আরো কাছে এসে আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো ঃ
"বারাকাহ্, তুমি তোমার যৌবন ও সারা জীবন মুহাম্মাদের জন্য উৎসর্গ করে তাকে লালন করে সোনার মানুষ রূপে গড়েছো বলে তার মতো স্বামী আমার নসীবে জুটেছে। তুমি মুহাম্মাদের যেমন মা, আমারও মা। এখন মুহাম্মাদ ও আমি তোমার কিছু ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তুমি আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আমাদের খুশীর জন্য রাজি হও। একদম বুড়ো হলে যে এভাবেই তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।"
উত্তরে আমি বললাম, "আমাকে কে বিয়ে করবে এ বয়সে?" খাদিজা বললো, "মদীনাহ্‌বাসী উবাইদ্ ইব্‌ন্ যায়দ আল্ খায্‌রাজী এসেছে প্রস্তাব নিয়ে। দোহাই তোমার, আমাদের বাসনা পূর্ণ হতে দাও।"
মুহাম্মাদ ও খাদিজার প্রস্তাব উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ছিলো না। আমি রাজি হলাম। আমার বিয়ে হলো। আমি মাদীনাহ্ চলে গেলাম। সেখানে আল্লাহ্ আমাকে একটি সন্তান দিলেন। আমি তার নাম রাখলাম "আইমান্"। তখন থেকেই লোকেরা আমাকে "উম্মে আইমান" নামে ডাকতে শুরু করে। কিন্তু আমার বিয়ে বেশী দিন স্থায়ী হলো না। আমার স্বামী মারা গেলো। আমি পুনঃ আমার ছেলে মুহাম্মাদ ও খাদিজার সংসারে মক্কায় চলে আসি।
এবার যখন আমি মক্কায় মুহাম্মাদ ও খাদিজার সংসারে আসি, তখন এ সংসারে মুহাম্মাদ ও খাদিজার সাথে আলী ইব্‌ন্ আবু তালেব ও যায়দ্ ইব্‌ন্ হারিসাহ্‌ও যোগ হয়। আলীকে মুহাম্মাদ তার চাচার দারিদ্র্য-পীড়িত সংসার থেকে চাচার স্নেহ-মমতার কিছুটা প্রতিদান স্বরূপ নিয়ে আসে। তাকে নিজ ঘরে পালন করে।
কিন্তু যায়দ্ ইব্‌ন্ হারিসাহ্ কে? কিভাবে যায়দ্ মুহাম্মাদের নিকট আসলো, এবং কিভাবে সে মুহাম্মাদের নবুওতের পূর্বে ও পরে তার সাথে সম্পৃক্ত হলো? এ আরেক অস্বাভাবিক ঘটনা।

যায়দ ইব্ন্ হারিসাহ্

এক সন্ধ্যায় খাদিজা একটি আরবী বালককে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদের কাছে এসে বলে ঃ
"এ ছেলেটিকে আমার ভাতিজা হাকীম ইব্ন্ হিযাম্ আমাকে উপহার দিয়েছে। আমি তাকে তোমার একান্ত সেবার জন্য তোমাকে দান করলাম।"
মুহাম্মাদ বালকটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ
"বালক, তোমার নাম কি?"
"যায়দ ইব্ন্ হারিসাহ্," বালকটি নাম বললো।
"কোন গোত্রের তুমি?"
"বনি কাল্ব্।"
"কি করে তুমি মক্কাহ্ পৌঁছুলে?"
উত্তরে যায়দ্ বললো ঃ-
"আমি আমার মায়ের সাথে আত্মীয় বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আরব দস্যুরা আমাদের কাফেলা আক্রমণ করে সকল মাল সামান লুটেপুটে নিয়ে নেয় এবং আমাকে আমার মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে মক্কার দাস বিক্রির বাজারে বিক্রি করে দেয়। আমাকে হাকীম ইব্ন্ হিযাম কিনে নেয়। এভাবে আপনার কাছে এসে পৌঁছুই।"
যায়দের বয়স তখন পনের ষোলো। তখন থেকেই যায়দ তার মালিক মুহাম্মাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও সেবক হিসেবে নতুন জীবন আরম্ভ করে। বিশেষ করে মুহাম্মাদ যখন থেকে মক্কাবাসীর শির্ক, কুফর ও ধর্মের মূল কেন্দ্রে চরম অধর্ম এবং গোটা আরব জাতিকে গোত্র পরম্পরায় খুনাখুনি, লুটতরাজ ও হিংসা বিদ্বেষে নিমজ্জিত দেখে হেরা গুহায় সত্যের সন্ধানে বিশেষ ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন থেকে যায়দ পর্বত গুহায় তার সার্বিক সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে এবং মুহাম্মাদও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে আরম্ভ করে।
অপর দিকে ছেলে হারানোর শোকে যায়েদের পিতামাতা ও স্বজনেরা পাগলপারা হয়ে সম্ভাব্য সকল স্থানে তাকে খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে তার বাবা ও চাচা এক অন্ধকার রাতে মক্কা এসে পৌছায়। তারা মক্কায় অপরিচিত। কাকেও চেনেনা। তাদেরও কেউ চেনেনা।
অপরিচিত শহরে কা'বার পাশে এক দেয়ালের নিচে বসে তারা ভাবছে কাকে জিজ্ঞাসা করে, কার কাছে থেকে খোঁজ নিবে। যায়দের বাবা ও চাচা, দু'ভাই বসে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করছে।
যায়দের বাবা বলছে ঃ "আমার মন বলছে যায়দ এ মক্কায়ই আছে।"
তার চাচা বলছে ঃ "পিতা পুত্রের মধ্যে যে রক্ত ও আত্মার সম্পর্ক, তাতে তোমার মন যা বলছে, তা সত্যও হতে পারে।"
এমন সময় এক মক্কাবাসী কোনো রাতের আড্ডায় রাত কাটিয়ে শেষ রাতে ঘরে ফেরার পথে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে যায়দের বাবা ও চাচার কথোপকথন শুনলো।
তারপর সে এগিয়ে এসে বললো ঃ
"আরব ভাইরা, মনে হচ্ছে তোমরা বাহির থেকে এসেছো, তোমরা প্রবাসী? তোমরা কি উদ্দেশ্যে এ অন্ধকার রাতে মক্কায় এসেছো?"
তারা জবাবে জানালো ঃ
"হ্যাঁ ভাই, আমরা শোকে দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে এখানে এসেছি। আমাদের এক ছেলেকে লুটেরারা ছিনিয়ে নিয়েছে। হয়তো বা তারা তাকে কোথাও দাস রূপে বিক্রীও করেছে। মক্কায় তো বহু দাসের হাট। তাই ছেলের খোঁজে এখানে এসেছি।!"
মক্কাবাসী জানতে চাইলো তাদের হারানো সন্তানের নাম ও পরিচয়। তারা জানালো যে ছেলেটির নাম যায়দ এবং তারা আরবের বনি কাল্ব্ গোত্রের লোক। সম্ভ্রান্ত তাদের বংশ।
তাদের সৌভাগ্য যে ঐ লোকটি যায়দের ব্যাপারটি জানতো। সে আরবদের প্রথানুযায়ী চিৎকার দিয়ে বললো ঃ
"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি তোমাদের ছেলে যায়দ্‌কে, সে এখন মক্কার সেরা সম্ভ্রান্ত বিশ্বাসী

ব্যক্তি মুহাম্মাদের কাছে আছে।"

শুনে যায়দের পিতা ও চাচা সমস্বরে চিৎকার করে বললো ঃ

"কে সে সম্ভ্রান্ত মুহাম্মাদ? কিভাবেই বা আমরা তাকে খুঁজে পাবো? তুমি দয়া করে আমাদের তার কাছে নিয়ে চলো?"

লোকটি যায়দের বাপ চাচাকে বললো ঃ

"অস্থির হওয়ার কিছু নেই। মুহাম্মাদকে পেতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না। সকাল হলেই দেখবে মুহাম্মাদ কা'বার ঐ জায়গাটিতে একা একা এবাদত করছে। সে দেব-দেবীদের সিজদাহ্ করেনা এবং যারা দেব-দেবীদের পূজা করে সে তাদের সাথে মেশেও না।"

যায়দের পিতা ও চাচা অধীর আগ্রহে রাত পোহাবার অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই সকাল হবে। কিন্তু এ সময়টুকুও যেনো তাদের কাটছিলো না। কারণ, তাদের হারানো প্রিয় সন্তানকে দেখতে ও পেতে তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলো। মনে হচ্ছিলো যেনো রাতের শেষ প্রহরটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে।

আশা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রাত পোহায়ে সকাল হতেই তারা মক্কাহবাসী সেই লোকটির বর্ণনানুযায়ী দেখতে পেলো যে, মুহাম্মাদ চিহ্নিত স্থানে এসে এবাদতে মগ্ন হয়েছে।

তারা মুহাম্মাদের নিকট এসে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললো ঃ "হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান! সম্মানিত ক্বোরেশ বনি হাশিমের সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাসী আল্ আমীন, আমাদের ছেলে যায়দ দাস নয়। সে আমাদের বনি কাল্ব গোত্রের আদরের সন্তান। তাকে দুর্বৃত্তরা ছিনতাই করে দাস রূপে বিক্রী করেছে। আমরা যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে আমাদের আদরের সন্তানকে পেতে চাই। তুমি যদি দয়া করো।"

মুহাম্মাদ শান্তভাবে সব ঘটনা শুনে বললো ঃ

"তোমাদের অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। যায়দ আমার কাছে সযত্নে আছে। তাকে আমি এক্ষুণি ডেকে আনছি। যায়দ তোমাদের মুক্ত সন্তান। তাকে আরব দুর্বৃত্তরা ছিনতাই করে এনেছে। তোমাদের হারানো সন্তানকে তোমরা ফেরৎ নেবে তাতে কোনো মূল্য দিতে হবে না। তবে একটি মাত্র শর্ত। তা হলো যায়দ যদি তোমাদের পেয়ে স্বেচ্ছায় চলে যায়, তা'হলে আমার কোনো আপত্তি হবে না। কিন্তু সে যদি যেতে না চায়, তা হলে তোমরা তাকে যবরদস্তি করে নিতে পারবে না।"

মুহাম্মাদের কথা শুনে যায়দের পিতা ও চাচা শুধু মুগ্ধই হলো না, তারা তার ব্যবহারে সম্মোহিত অনুভব করলো। ইতিমধ্যেই তারা মুহাম্মাদের মাঝে এক অসাধারণ মানবতার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলো। তারা বললো ঃ

"হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি, তুমি তার চেয়েও মহৎ ও মহান। তুমি যা বলেছো, তা ন্যায় বিচার ও ইনসাফের চেয়েও অধিক। তুমি যায়দকে উপস্থিত করো। সে যদি আমাদের পেয়েও তোমার কাছে রয়ে যেতে চায়, আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। আমরা তাকে সামান্য বাধ্যও করবো না।"

যায়দের স্বজনরা ভেবেছিলো, একি কখনো হয় যে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুক্ত স্বাধীন চৌদ্দ পনের বছরের যুবক পরাধীন দাসত্বের জীবন বেছে নিতে পারে? যায়দ্ তো তার চাচা ও বাপকে পেয়ে মুক্তি-পাগল হয়ে তাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

মুহাম্মাদ যায়দকে ডেকে পাঠালে যায়দ এসে তার বাবা চাচাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময় ও আনন্দে তাদের বুক জড়িয়ে ধরলো। উভয় পক্ষ তাদের হারানো আপনজনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের কুশল জানলো।

দৃশ্য দেখে ভবিষ্যতের বিশ্ব কল্যাণের মহামানব, আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নবী, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদও তার অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। মুহাম্মাদ মাতৃগর্ভে পিতৃহারা, শৈশবে মা হারা এবং যাকে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল বানাতে তাঁরই এক বিশেষ রহ্‌মত ও বরকত, "বারাকাহ্" নামের এক বঞ্চিত নারীর স্নেহ ও বিশেষ যত্নে মানুষ করেছেন সে মুহাম্মাদ, সে মা, বাবা ও স্বজন থেকে আরব বর্বরদের ছিনিয়ে আনা যায়দের কষ্ট ও দুর্দশা তার নিজের জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাথে মিলিয়েই যায়দকে তার স্নেহ ও যত্ন দিয়ে এমন আপন করে নিয়েছিলো, যে আপনের চেয়ে আপন আর কেউ হয় না।

মুহাম্মাদ যায়দকে বললো ঃ

"দেখো যায়দ, এরা তোমার বাবা ও চাচা। তুমি তাদের হারানো সন্তান। তারা তোমাকে খোঁজে পেয়েছে। তুমিও তাদের পেয়েছো। এখন তারা তোমাকে নিয়ে যেতে চায়। তুমি যদি যেতে চাও, তুমি মুক্ত। তোমার স্বজনদের কোনো

মুক্তিপণ বা মূল্য দিতে হবে না। কিন্তু আমি তাদের বলেছি যে তুমি যদি স্বেচ্ছায় যেতে না চাও, তা হলে তারা তোমাকে যবরদস্তি করে নিতে পারবে না। এখন তোমার স্বাধীন ইচ্ছা।"

মুহাম্মাদের কথা শেষ হতেই যায়দ তার বাপ চাচার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ

"আমি এ ব্যক্তিকে কখনো ছেড়ে যাবো না। মুহাম্মাদ আমাকে যে স্নেহ মমত্ব দিয়ে দেখেন, কোনো পিতা-মাতা ও স্বজন তা পারে না। আমি তার কাছে আসার পর কখনো এক মুহূর্তের জন্য অনুভব করিনি যে আমি পরাধীন। আমাকে ইনি যে মমতার বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন, তা ছিঁড়ে তাকে ত্যাগ করে যাওয়া আমার পক্ষে অকল্পনীয়। আমি তার স্নেহ বন্ধনে চির ক্রীতদাস।"

যায়দের কথা শুনে তার বাপ চাচা হতবাক্! তারা কেঁদে ফেললো। তাদের সন্তানের উক্তি শুনে তারা বিস্মিত হয়ে বললো ঃ

"এ কি! যায়দ এ কেমন করে ভাবা যায় যে, তুমি এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মুক্ত সন্তান হয়ে চিরদিন গোলামের দুর্নাম নিয়ে বাঁচবে? এ যে কল্পনাতীত দুঃস্বপ্ন। তুমি ভেবে দেখেছো কি! কি বলছো! এখন এ ভুল করলে তুমি ও তোমার ভবিষ্যত বংশধর দাসত্বের গ্লানি নিয়ে জন্মাবে ও বাঁচবে! এ যে কল্পনাও করা যায় না!"

কথাও তাই। আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্ব করার জন্য সকল সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। সে যে ফেরেশ্তার চেয়েও মহান! কিন্তু এ মানুষ যখন আল্লাহ্কে ছেড়ে প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুগত হয়, তখন সে এমন শয়তান হয় যে, ইবলিস শয়তানও তার থেকে পানাহ চায়। আরব মরুর মানুষেরা নবী রাসূলদের দ্বীন ধর্ম ত্যাগ করে এমন বর্বর হয়েছিলো যে, তারা শুধু নিজেরা পশুর চেয়েও নীচে নেমে থামেনি, সাধারণ দুর্বল মানুষকে পশুর চেয়ে নিচে নামিয়ে তাদের দাস-দাসী বানিয়ে বেচা কেনা করতো। সে অবস্থায় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোর মুক্তির মহা সুযোগ পেয়েও দাসত্বের কালিমা চিরতরে নিজের উপর আঁটবে, এ তো ভাবাও যায় না!

কিন্তু পৃথিবীর সেরা সৌভাগ্যবান কিশোর যায়দ যে ধরার পিঠে আরব দস্যুদের হাত থেকে ধরায় বসেই সাত আসমান ও সাত জমিনের মানবতার রাজা রাহ্মাতুল্লিল আলামীনের বোরাক্বে চড়ে মানবতার মে'রাজে চড়ার বিরল সৌভাগ্য পেতে যাচ্ছে! আল্লাহ্র দান এ সৌভাগ্য কে ঠেকায়! অপর দিকে কিছুদিন পরের বিশ্বনবী, খাতামুন্ নাবীয়্যীন ও রাহ্মাতুল্লিল আলামীন সম্মোহিতের ন্যায় তার প্রিয় সেবক যায়দ ও তার বাপ চাচার মধ্যকার কথোপকথন ও তার অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করছিলো। মুহাম্মাদ যখন দেখলো যায়দ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বংশ আভিজাত্য সব কিছু ত্যাগ করে মুহাম্মাদকেই বেছে নিয়েছে, মুহাম্মাদও তখন বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়ে যায়দের হাত ধরে দাঁড়িয়ে কা'বায় উপস্থিত ক্বোরেশের সকল গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলো ঃ

"হে মক্কাবাসীরা শোনো, হে ক্বোরেশের গণ্যমান্যরা সাক্ষী থেকো, যায়দ ইব্ন্ হারিসাহ্ এ মুহূর্ত থেকে মুক্ত। এখন থেকে যায়দ আমার ছেলে। আমি তার পিতা এবং সে আমার উত্তরাধিকারী হবে, আমিও তার উত্তরাধিকারী হবো।"

আরব জাহিলিয়্যাতের অন্ধকার যুগে আরব দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। অনুর্বর মরুতে মানুষ হয়েও আরবদের জীবিকা মানুষ বিকি-কিনি করে চলতো। তাই যুদ্ধ বিগ্রহ, আত্মকলহ ও মারামারী খুন-খারাবী করাই আরব জাতির ধর্ম ছিলো। আরব মরুভূমির চার পাশের উর্বর দেশসমূহ থেকে বিভিন্ন কাফেলা যখন খাদ্যদ্রব্য ও জীবন ধারণের উপকরণ নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে ও দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাতায়াত করতো, তখন সে সব কাফেলার সর্বস্ব লুটে নেওয়া, আরবদের নিত্যকার কাজ ছিলো। এ কাজে কোনো প্রকারের নৃশংসতায় তাদের বাধতো না। তাই আরবদেশে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই স্বতন্ত্র থেকে জীবন ধারণ করা অকল্পনীয় ছিলো। তাই সকল গোষ্ঠি ও স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের আরব ভূমিতে টিকে থাকতে হলে কোনো না কোনো গোত্র বা ব্যক্তির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে হতো। অন্যথা তাদের বাঁচা মুশকিল ছিলো। জাহেলী প্রথা প্রচলিত ছিলো। মুহাম্মাদ ও যায়দের মধ্যে সেরূপই মুখ-বলা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ঘোষণা হয়ে গেলো।

হাজার হাজার বছরের দারিদ্র্য-পীড়িত, আরবদের মধ্যে গত অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তেলের পয়সার যে প্রাচুর্য্য এসেছে, তার ফলে তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষা সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু তারপরও বর্তমানে আরব দেশে যারা চাকুরী বাকুরী করতে যায়, তাদের জন্য যে কাফিল ও আরবাব্ বা গোলাম মনিবের প্রথা অপরিহার্যরূপে চালু আছে, আজ পৃথিবীর কোনো সভ্য বা আধা সভ্য দেশেও এ মানবেতর প্রথা নেই।

মানব জাতির শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক আদর্শ "খুলুকুন্ আযীম" ও "উস্ওয়াতুন হাসানাহ্" এর আখেরী নবী সঃ ১৪১২ বছর পূর্বে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়েও আরবদের প্রথমে "মানুষ" তারপর "আরব" বানাতে পারেননি, প্রথমে "মুসলিম" পরে "আরব" বানানো তো দূরের কথা। এখনো আরবরা "ইসলামী উম্মাহ" উম্মাতুল্ ইসলাম না বলে প্রথমে উম্মাতুল আরাবীয়্যাহ বলে পরে অগত্যা ইস্‌লামের নাম উল্লেখ করে থাকে। তাই রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা, আরবজাতির মূল পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে আল্ কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, "এরা নিকৃষ্ট কাফের, মুনাফিক্ব ও আল্লাহ্‌র নাযিল্‌কৃত সীমা লঙ্ঘনকারী।" আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী বিচারক রূপে এ রায় দিচ্ছেন। الْأَعْرَابُ

أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ (সূরা তাওবাহ্- ৯৭)

এ জঘন্য চরিত্রের জন্যই রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পরপরই মক্কার সুবিধাবাদী ক্বোরেশরা, ক্বোরেশ অক্বোরেশের ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ইসলামী ঐক্যকে নস্যাত করে দেয়। যার ফলে আল্লাহ্‌র গযবে আরবরা ইয়াহুদী খ্রীষ্টান চক্রের হাতে নিজেদের সকল সম্পদ হস্তান্তর করেও আজ ওদের সেবাদাস গোলাম। যা থেকে ওদের মুক্তির কোনো পথ নেই।

মুহাম্মাদ সে মানুষ, যাঁকে আল্লাহ্ আরবদের পাপ মোচেনের জন্য তৈরী ও বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বারাকাহ্ ও যায়েদের মতো আপনজন দান করেছিলেন, যাদের সাথে আল্লাহ্ বিলাল, আম্মার ও সাল্‌মানদেরও জুটিয়েছিলেন।

মুহাম্মাদকে আল্লাহ্ চারটি ছেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু একটিও জীবিত রাখেননি। পাছে আবার নবীর ছেলে হয়েও ক্বোরেশী আরবী হয়ে নবুওতের কুলাঙ্গার না হয়!

মুহাম্মাদ ও যায়দের মিলন দেখে যায়দের বাবা ও চাচারা যেমন সন্তান হারানোর ব্যথা পেয়েছিলো, সাথে সাথে মুহাম্মাদের মতো মানুষের সাথে তাদের ছেলের এ একিভুতি তেমনি তৃপ্তিও দিয়েছিলো। তাই তারা সুখ এবং দুঃখ উভয়ের মিশ্রিত অশ্রু বিসর্জন দিয়েই সেদিন বিদায় নিয়েছিলো।

তারপর থেকে যায়দ ও মুহাম্মাদকে নিয়ে আল্লাহ্‌র সেরা বিস্ময়ের পটভূমি তৈরী আরম্ভ হয়। যায়দ, মুহাম্মাদ, খাদিজাহ্ ও বারাকাহ্ সাথে মিলে সোনায় সোহাগা হতে থাকে। মুহাম্মাদ বারাকার মতো মা, খাদিজার মতো স্ত্রী এবং যায়দের মতো ছেলে পেয়ে বিশ্ব-মানুষের মুক্তির সন্ধানে হেরা গুহায় নিশ্চিত মনে ধ্যানে মগ্ন হয়। খাদিজাহ্ ও উম্মে আয়মান্ বারাকাহ্ ও যায়দের মতো উৎসর্গকৃত মানুষ সংসারে পেয়ে তৃপ্ত জীবন যাপন করে স্বামী মুহাম্মাদকে আল্লাহর পথে নিমগ্ন হতে সহায়তা করে। ঘরে বারাকাহ্ খাদীজার জন্য আল্লাহ্‌র ফেরেশতা স্বরূপ, বাইরে যায়দ মুহাম্মাদের সার্বক্ষণিক ছায়া ও সঙ্গী। হেরা গুহায় মুহাম্মাদ যখন সপ্তাহভর কাটাতে লাগলো, তখন যায়দ সেখানে খাওয়া-দাওয়া ও পানীয় পৌঁছাতো। কখনো মুহাম্মাদের অজান্তে গুহার প্রবেশ পথে রাত জেগে মরুভূমির ক্ষতিকারক জীবজন্তু থেকে রক্ষার্থে পাহারা দিতো। বারাকাহ্ মায়ের সম্মানে এবং যায়দ সন্তানের অধিকার ও মর্যাদায় মুহাম্মাদ ও খাদিজার সংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

এভাবে প্রায় এক যুগ কেটে যাওয়ার পর আল্লাহ্ মুহাম্মাদকে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ও খাতামুন নাবিয়্যীন" রূপে তাঁর রিসালাত দান করেন। মুহাম্মাদ সঃ রিসালাতের নতুন অভিজ্ঞতায় হেরা গুহা হতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফেরার পথে যায়দ রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়। রিসালাতের বিবরণ শুনে রাসূল সঃ এর ঘরের তিনজন, বারাকাহ্, খাদিজাহ ও যায়দ এমনভাবে একত্রে রিসালাতের প্রতি ঈমান আনে যে, কে কার আগে ঈমান এনেছিলো, তা বলা মুশ্‌কিল। তবে ইতিহাস প্রায় এ বিষয়ে নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয় যে, আখেরী নবী সঃ এর অহী প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম যায়দই তাঁর উপর ঈমান আনে। তারপর অন্যান্যরা। কিন্তু বর্ণ ও গোত্র পূজারীরা তাদের জন্ম ও স্বভাব দোষে এমনভাবে ইতিহাস রচনা করেছে, যেনো, বিবি খাদিজাহ্‌ই রাসূল সঃ এর উপর ঈমান এনেছিলো সর্ব প্রথম। বারাকাহ্ ও যায়েদের ঈমান আনার কোনো উল্লেখই তারা করেনি। যেনো তারা ঈমান আনলেও তা লক্ষণীয় নয়, গুরুত্বহীন। কারণ, তারা তো দাস-দাসী মাত্র! কতো বড় জঘন্য অপরাধী এরা! আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনকেই বর্ণ ও বংশবাদী করার পাপে এরা অমার্জনীয় পাপী।

একটু পরেই বর্ণবাদীদের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ যখন দ্বীনের দাওয়াত আরম্ভ করেন, তখনই দেখা গেলো যে ধর্ম ব্যবসায়ী গোত্র ও স্বার্থ পূজারী মক্কাবাসীরা, বিশেষ করে ক্বোরাইশী আভিজাত্যের দাবীদাররা তাদের ক্বোরেশ গোত্রের মধ্যমনি বনি হাশিমের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ কেই পাগল, কবি, যাদুকর ও ভুতে পাওয়া মানুষ বলে প্রত্যাখ্যান করলো।

নবী মুহাম্মাদ সঃ কে গ্রহণকারী প্রথম ৪০ জনের মধ্যে ৩৫ জনই অক্রোরেশী ক্রীতদাস-দাসী ও অন্যান্যরা। মক্কী ও ক্রোরেশীরা নবী সঃ ও তাঁর উপর ঈমান আনা মুস্লিমদের উপর ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। নারীকুলের গৌরব ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়াকে আবু জেহেল নৃশংসভাবে হত্যা করে। উমাইয়া বেলালকে প্রায় পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়। বিজয়ের সম্ভাবনা দেখার পর ক্রোরেশী হওয়ার নামে যারা পার্থিব ক্ষমতার লোভে ইসলামে যোগ দেয় এবং রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর যারা "আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্রোরাইশ" অর্থাৎ "ইমাম শুধু ক্রোরেশ থেকে হবে" বলে ক্ষমতা দখল করে, তাদের অত্যাচারে মু'মিনদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হয়, রাসূল সঃ কে তিন বছর "দারুল আরক্বাম" নামক এক ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এবং তিন বছর ধরে সমাজচ্যুত হয়ে প্রায় বন্দীদশায় সঙ্গীদের নিয়ে গাছের লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। যার ফলে রাসূল সঃ ও তাঁর সঙ্গীদের ছাগল ভেড়ার মতো লাদী লাদী পায়খানা করতে হয়েছে বলে ইতিহাসে বর্ণনা মিলে।

রাসূল সঃ দারে আরক্বামে লুকিয়ে লুকিয়ে যখন মানুষকে দ্বীনী দাওয়াত দেন, প্রকাশ্যভাবে রাসূল সঃ-এর কাছে কারো যাতায়াত করতে দেখলেই ক্রোরেশী হিংস্র জন্তুরা তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা রাসূল সঃ-কে সকল সংবাদ সরবরাহ করতো, তারা ছিলো বারাকাহ্ ও যায়দ। অন্য কাকেও সে সময়ে এ বিপদের ঝুঁকি নিতে দেখা যায়নি।

রাসূল সঃ এর আপন চাচা আবু লাহাবের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারে স্বয়ং আল্লাহ্ রাহ্মানুর রাহীম ও রাউফুর রাহীম নারাজ হয়ে আবু লাহ্ব্ ও তার স্ত্রী আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামিলকে পৃথিবীতে জীবন্ত থাকাকালীনই পূর্ণ একটি সূরা নাযিল করে জাহান্নামবাসী ঘোষণা করেন, যে সূরাটি ক্বেয়ামত পর্যন্ত ঈমানদাররা তেলাওয়াত ও নামাজে পড়ে ওদের উপর লানত করে। রাসূলের আরেক চাচা আব্বাস মক্কার প্রধান সুদখোর। সুদখোররা মায়ের সাথে ব্যভিচার করার পাপে লিপ্ত বলে আল্লাহ্র শেষ নবী সঃ বলেছেন। এ পাপে আব্বাস লিপ্ত থেকে তার হারাম পয়সায় পরনারীর সাথে ব্যভিচারী রূপে কুখ্যাতী লাভ করেছে। রাসূল সঃ এর ২৩ বছরের নবুওতী জীবনে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, আল্লাহ্, রাসূল সঃ ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রত্যেকটি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় আবু সুফিয়ান এবং তার অর্থের যোগান দিয়ে প্রত্যেকটি যুদ্ধে আব্বাস সশরীরে অংশ গ্রহণ করে। বদর থেকে আহ্যাব পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে আব্বাস ইসলাম বিরোধী দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো।

ভাড়াটিয়া বর্ণবাদী গাল্পিকরা লিখেছে যে, আব্বাস গোপনে মুসলমান হয়ে ভাতিজা রাসূল সঃ এর পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করার জন্য মক্কা রয়ে যায়। কী চমৎকার মিথ্যা কথা?

এ কথায় যদি সামান্যতম সত্যতা থাকতো, তা হলে আব্বাস কী কখনো সম্মিলিত কাফেরদের যুদ্ধ আহ্যাবে, কুফরী শক্তির পতনের পর মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ ইসলাম বিরোধী সকল যুদ্ধের নেতা, তার ভাই হামযার বুক চিরে কলিজা ভক্ষণকারীনী হিন্দার স্বামী ও বনি হাশিমের কা'বার নেতৃত্বের চির শত্রু, উমাইয়া বংশের ফের্আউন, আবু সুফ্য়ানকে কখনো প্রাণে রক্ষার ষড়যন্ত্র করতো? না, ইসলাম, তার নবী সঃ ও মাদীনাহ্ তাইয়্যেবায় গড়ে উঠা মুসলিম উম্মার চির শত্রুকে চিরতরে নিমূর্ল করার পদক্ষেপ নিতো?

ক্রোরেশী গোত্রবাদী উমাইয়া ও হাশেমী জাহিলিয়্যাতের এই দুই দুষ্টক্ষত আব্বাস ও আবু সুফ্য়ান হতেই জন্ম নেয় দু'রাজতন্ত্র, উমাইয়া রাজতন্ত্র ও আব্বাসী রাজতন্ত্র। আহ্যাব্ বা পরিখার যুদ্ধের সময়ই আল্লাহ্র রাসূল বলে ছিলেন যে ইসলামের বিজয়ের পর "রোমান সিজার"ও "পারস্য খস্রুদের" রাজতন্ত্র আর থাক্বেনা। আল্লাহ্র রাসূল সঃ এর সৃষ্ট ঢেউয়ে পারস্য ও রোমান পরাশক্তি দুটিরই পরাজয় হয়েছিলো।

কিন্তু রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর ক্রোরেশী গোত্রবাদের জাহেলী পথে পারস্য-রোমান কুফরের পরাজিত শয়তানী আত্মা আরবী পোষাক পরে উমাইয়া ও আব্বাসী নামধরে পুনঃ মাথা তুলে নবী সঃ এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজের মূলোৎপাটন করে। তাই উমাইয়া রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া, মক্কা ও মাদীনাহ্ কেন্দ্রিক এতিম মুহাম্মাদ সঃ, বারাকাহ্, যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইব্ন মাস্উদ, সালমান ও উসামাহ্দের দ্বারা নির্যাতিত "মুস্তাদ্আফীন" দের প্রতিষ্ঠিত ইসলাম, ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী ইমামতকে উৎখাত করে সিরিয়ার দামেশকে সিংহাসনে বসেই ঘোষণা দেয়, "আনা ক্বায়সারুল্ আরব" আমি আরবী "সিজার"। সিজারের ছেলে সিজার হয়। তাই সে নিজে আরবী সিজার হয়ে তার ছেলে ইয়াযিদকে সিজার বানিয়ে যায়। যার হাতে মক্কা মাদীনাহ পদদলিত হয়। বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসাবে রাসূল সঃ এর আশ্রয় দাতা আন্সার, মাদীনাহবাসীদের দশ হাজার সাহাবীকে শহীদ করে, ৫০ জনের মতো রসূল সঃ

এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীকে হত্যা করে, মাদীনার হাজার হাজার কুমারী মুসলিম মেয়েরা উমাইয়া সিজারদের গণধর্ষণে গর্ভবতী হয় এবং এক সপ্তাহের জন্য মস্‌জিদে নববী তাদের ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়!

আল্লাহ্‌ ফেরআউনের ঘরেই ফেরআউনদের বিরুদ্ধে তাঁর সত্যের সাক্ষ্য ও সাক্ষী দাঁড় করান। হযরত ইউসুফের পক্ষে, ফেরআউনের স্ত্রীর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাক্ষী আল্লাহ্‌ সে ঘরেই দাঁড় করিয়েছিলেন। হযরত মূসার পক্ষে ও ফেরআউনের বিরুদ্ধেও তিনি সেই সাক্ষীর ব্যবস্থা করেছিলেন ফেরআউনের রাজদরবারেই। এটাই আল্লাহ্‌র সুন্নাত বা বিধান।

আল্লাহ্‌র শেষ নবী সঃ এর প্রতিষ্ঠিত "উস্‌ওয়ায়ে হাসানাকে" পাল্টিয়ে পুনঃ কুফরকে প্রতিষ্ঠাকারী উমাইয়াদের কুফরীর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ওদের ঘরেও আল্লাহ্‌ পরপর দু'জন সাক্ষী দাঁড় করান। আরবী সিজার মুয়াবিয়ার নাতী দ্বিতীয় মুয়াবিয়া তার বাপ-দাদার কুফরীর সাক্ষ্য দিয়ে সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে নিজ গৃহে বন্দী করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তারপর সিজার "মারওয়ান" ক্ষমতায় বসে। তারপর তার নাতী উমর ইব্‌ন্‌ আব্দুল আযীয্‌ তার বাপ-দাদাদের কুফরীর ঘোষণা করে তাকে পাল্টিয়ে পুনঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সঃ এর আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যায়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সঃ তাঁর মক্কার ক্বোরেশীদের আল্লাহ্‌র অহী অনুযায়ী "ইয়া আইয়্যুহাল্‌ কাফেরুন" বলে কাফের ঘোষণা দেন। তাঁরই অনুসরণে দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় উমর তাদের উমাইয়া গোত্রবাদীদের কুফরীর সাক্ষ্য দিয়ে যায়।

এ সাক্ষ্যকে যারা অমান্য করে ও করবে, তারা অবশ্যই হযরত ইউসুফের বিরুদ্ধে জুলেখার সাক্ষ্য বিশ্বাসকারী, হযরত মুসার বিরুদ্ধে ফের্‌আউনের বক্তব্য বিশ্বাসকারী এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সঃ এর রিসালাত, হিজরত, জিহাদ ও মক্কা বিজয়ের বিরুদ্ধে আবু জেহেল, আবু লাহ্‌ব, আবু সুফ্‌য়ান ও তার স্ত্রী হিন্দার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী।

উমাইয়া রাজাদের অনুরূপ আবু সুফয়ানের "দোস্ত" আব্বাসের প্রপৌত্র মনসূর বাগদাদের সিংহাসনে বসে ঘোষণা দেয় "আনা কিস্‌রাল্‌ আরব্‌" আমি আরব খসরু। সকল কুফরের গাঁজার কল্কির নেশা, স্বাদ, স্বর ও সুর এক।

নূহ্‌, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমুস্‌ সালামদের রিসালাত বিশ্বজনীন। তাঁদের "ইলাহ্‌" বা আল্লাহ্‌ যেমন সকল রক্ত, বর্ণ ও গোত্রের উর্ধ্বে, তাঁদের দ্বীনও সকল সীমাবদ্ধতা মুক্ত। মূর্খরা মুহাম্মাদ সঃ আরবে জন্মেছেন এবং ক্বোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে বলে তাঁকে "আরবী নবী" বলে অভিহিত করে। তা' যদি সত্যি হয়, তাহলে খোদ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনকেও নিঃসন্দেহে আরবী বলে প্রচার করা যায়। কারণ, পৃথিবীতে "আউয়ালা বাইতিন" অর্থাৎ প্রথম আল্লাহ্‌র ঘর মক্কায়, মাস্‌জিদুল আক্বসা আরবে, প্রায় সকল নবীরা আরব ভূখন্ডের এবং আল্লাহ্‌র সর্বশেষ পূর্ণ কিতাব আল্‌ ক্বোরআন- তাও আরবী ভাষায়। অতএব, আল্লাহ্‌ও নিঃসন্দেহে আরবী, বা ক্বোরেশী?!

সকল মূর্খতা ও দৈন্যতার উর্ধ্বে, আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলরা সবাই বিশ্বজনীন, আল্লাহ্‌র দ্বীনও বিশ্বজনীন। যেমন আল্লাহ্‌ বিশ্বজনীন, রাব্বুল আলামীন। বর্ণ ও গোত্রের রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ কুফর। তাই সকল নবীরা রাজা ও রাজতন্ত্র উৎখাত করতে প্রেরীত হয়েছেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম আঃ নমরুদ রাজা ও হযরত মূসা ফেরআউন রাজার বিরুদ্ধে এসেছিলেন। অতএব, খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সঃ কি তাঁর নবী জীবনের ২৩ বছরের ২১ বছর দ্বীনের শত্রুদের দু'নেতা, যারা মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা পায়, সেই আবু সুফ্‌য়ান ও আব্বাসের বংশধর বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের রাজতন্ত্রের ভিত্‌ রচনার জন্য এসেছিলেন!?

মূর্খ গাঁজা খোররা রাসূল সঃ এর নামে যে সমস্ত মিথ্যা রচনা করেছে, যে রাসূল সঃ বলেছেন, "আমার মৃত্যুর পর ৩০ বছর খেলাফত চলবে, তারপর রাজতন্ত্র", এ কথা যারা অতীতে প্রচার করেছে এবং এখনো করে, তারা কারা? এদের কী বলা যায়? এদের কী করা উচিৎ? এখন সময় এসেছে এদের নির্মূল করার। তা' না করলে আল্লাহ্‌ অন্য কোনো জাতিকে তাঁর আখেরী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে দিবেন এবং তাদের হাতে অচিরেই আমাদের নির্মূল করবেন।

*** *** ***

রাসূল মুহাম্মাদ সঃ মক্কায় "দারে আরক্বামে" গোপনে তাঁর দাওয়াত ও তাঁর শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। নির্যাতিত দাস-দাসী ও মক্কার বাইরের লোকেরা যতো বেশী রাসূল সঃ এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করছে, ততো বেশী মক্কার অভিজাতরা ক্ষিপ্ত হচ্ছে । তাদের অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে। অত্যাচারে রাসূল সঃ ও তাঁর বারাকাহ্‌, খাদিজাহ্‌, যায়দ, বেলাল, আম্মার ও ইব্‌ন্‌ মাসউদ পরিবার আরো দৃঢ় হচ্ছে। আল্লাহ্‌র বর্ণনায় এরাই "আহ্‌লে রাসূল" ও আহ্‌লে

বাইতির রাসূল। শিয়া সুন্নীদের গোত্রীয় আহ্‌লে বাইত নয়! (আল্ ইমরান-৬৮)। إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

রাসূল সঃ তাঁর নিজের বিবাহের পর তাঁর পালক মাতা বারাকাহ্‌কে বিয়ে দেন। তারপর তিনি তাঁর পালক ছেলে যায়দের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রাসূল বর্ণবাদ ও গোত্রবাদ বিরোধী। তাই তিনি তাঁর ফুফাতো বোন যাইনাব্ বিন্‌ত্ জাহ্‌শকে যায়দের জন্য বাছাই করেন।

রাসূল সঃ লালনে, পালনে এবং রিসালাতে ক্বোরেশী কুফ্‌রী জাত্যাভিজাত্য থেকে মুক্ত। তিনি যায়দকে তাঁর ফুফাতো বোনের সাথে বিয়ে দিয়ে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস নেন। কিন্তু যাইনাবের জাহিলিয়্যাতের রক্তে নবুওতের শিক্ষা প্রবেশ করেনি। রাসূল সঃ এর কথায় যাইনাব্ যায়দকে বিবাহ করেছে বটে, কিন্তু তাকে স্বামীর অধিকার দেয়নি কখনো। বলা হয় যে, সে তার স্বামী যায়দকে বিনা অনুমতিতে তার ঘরেও প্রবেশ করতে দিতোনা। যায়দের দোষ কোথায়? যাইনাবের দৃষ্টিতে তা' হলো যায়দ ক্বোরেশী নয়। তাছাড়া সে ক্রীতদাস ছিলো। রাসূল সঃ এর নিকট যায়দের গুণ কি? তাঁর নিকট যায়দের গুণ মাটির পৃথিবী ও তার গন্ডি পেরিয়ে মহাকাশ ও মহাশূন্য অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র আরশ্ পর্যন্ত ছুঁয়েছে! যায়দ আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ এর হেরা গুহার সঙ্গী। মুহাম্মাদের মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ হওয়ার প্রত্যেক মুহূর্তের সাথী ও সাক্ষী! আর যাইনাব? সে তো জাহিলিয়্যাতে ডোবা ক্বোরেশ বংশের একটি মেয়ে মাত্র! রাসূল সঃ তো যাইনাবের উপর বিরাট দয়া করেছিলেন!

কিন্তু জাহিলিয়্যাতের নারী যাইনাব, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল সঃ এর প্রিয় পাত্র যায়দকে অপছন্দ ও অবজ্ঞা করেছে। তাতে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠে। আল্ ক্বোরআনে নবী সঃ এর নামের পর তাঁর অনুসারী সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একমাত্র যায়েদের নামই আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহুর মুখে উচ্চারিত হয়ে আল্ ক্বোরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। যায়দ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়। ইস্‌লামের ইতিহাসে যায়েদের তুল্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র অন্য কেউ ছিলোনা।

অপরদিকে চরম হতভাগা হলো রাসূল সঃ এর ক্বোরেশী চাচা আবু লাহাব। সে হতভাগা, মক্কার অভিজাত ক্বোরেশী, ধনবান ভাতিজা মুহাম্মাদের দু'কন্যা দু'ছেলের সাথে বিবাহ দিয়েও নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর চাচা হতে পারলো না। বংশ, সম্পদ, সুন্দরী স্ত্রী ও স্বীয় সুঠাম দেহ সব নিয়ে জাহান্নামী! ধ্বংস আবু লাহ্‌বের! ধ্বংস তার স্ত্রীর! তাদের ধন-সম্পদ বেকার! সব ফেলে জাহান্নামের ইন্ধন নিজেরা কাঁধে বহন করে সে আগুনে তারা পুড়বে! সা-ইয়াস্‌লা-নারান্ যাতা-লাহাবিওঁ ওয়াম্-রাআতুহ্ হাম্মালাতাল্ হাতাব্! ফী-জ্বীদিহা হাব্‌লুম্ মিম্‌মাসাদ্? কত হতভাগা এরা! আর যায়দ কতো ভাগ্যবান!

ক্বোরেশী মেয়ে যাইনাব্ তার জাত্যভিজাত্যের ফলে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তালাক পেলো। রাসূল সঃ এর অনুসারী হয়ে সে জাহিলিয়্যাতের বর্ণবাদ ভাঙ্গতে অসমর্থ হয়। তার ভাই উবায়দুল্লাহ্ মুসলমান হয়েও তার বোনকে রাসূল সঃ কেনো যায়দের মতো ক্রীতদাসের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, সেজন্য হিজরত করে আবিসিনিয়া গিয়েও সেখানে মুহাম্মাদ সঃ এর দ্বীন ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায়। ক্বোরেশী অভিজাতদের ঈমান এতো দুর্বল? অ-ক্বোরেশী যায়দের ঈমান এতো সবল ও শক্তিশালী যে, সে মুহাম্মাদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন সব ত্যাগ করতে পেরেছে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য বংশ ও গোত্রে নয়। সৎকর্ম ও অপকর্মে।

জাহেলী যাইনাব তার মূল পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর তার ঈমানের কারণে আল্লাহ্ কর্তৃক আরবে প্রচলিত আরেকটি কুপ্রথা ভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত হয়। আরবরা পালক ছেলের স্ত্রীকে ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো নিজেদের জন্য হারাম মনে করতো, যা আল্লাহ্‌র আইনে অবৈধ। আল্লাহ্ কথিত মুহাম্মাদের পালক ছেলে যায়দের তালাক্ব প্রাপ্ত স্ত্রীকে রাসূল মুহাম্মাদ সঃ এর সাথে বিয়ে দিয়ে বর্বর জাহিলিয়্যাতের কু-প্রথাকে ভেঙ্গে দেন। যাইনাব রাসূল সঃ এর স্ত্রী হয়ে উম্মুল মোমেনীন বা বিশ্বাসীদের মা রূপে উন্নীত হয়। কিন্তু আজীবণ নিঃসন্তান রয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিঃশর্ত আনুগত্য পছন্দ করেন। রাসূল সঃ এর স্ত্রীদের মধ্যে বিবি খাদিজাহ নিঃশর্তে নিজের জানমাল সব তার নবী স্বামীকে সঁপে দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সঃ এর সকল সন্তান বিবি খাদিজার পেটেই দান করেন, একমাত্র ইব্রাহীম ব্যতিত। অন্যান্য স্ত্রীরা কমবেশী সবাই তাদের রাসূল স্বামীকে পার্থিব কারণে জ্বালাতন করে পারিবারিকভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাই দেখা যায় যে তারা কেউ রাসূলের সন্তানের মা হয়নি। তাদের আনুগত্য শর্ত ও স্বার্থহীন প্রমাণিত

করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিলো। অপর দিকে মিসরের রাজা রাসূল সঃ এর জন্য তার সম্প্রদায়ের এক সম্ভ্রান্ত নারীকে উপঢৌকনরূপে পাঠালে রাসূল সঃ তাকে গ্রহণ করেন এবং রাসূল সঃকেও সে মহিলা নিঃশর্তে ও নিঃস্বার্থে গ্রহণ করে। সেই মহিলাই উম্মুল মোমেনীন মারিয়া ক্বিব্তিয়াহ, যাকে রাসূল সঃ হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী মিসরী রমনী মা হাজেরার মতো গ্রহণ করেছিলেন এবং মারিয়াও রাসূল মুহাম্মাদ সঃ কে নবী ইব্রাহীম আঃ এর মতো গ্রহণ করেছিলো। তাই আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী সঃকে তার শেষ সন্তান মারিয়ার পেটে দান করেন। রাসূল সঃ সে স্মৃতিতে তার নাম রাখেন ইব্রাহীম। কিন্তু ইব্রাহীম দু'বছরের হয়ে মারা যায়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কোনো পুত্র সন্তান জীবিত রাখেননি। হয়তো বা তাতে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আবার বংশ পূজা আরম্ভ হয়ে যেতো!

আল্লাহ্র বিধান, ইসলামে পুত্র ছাড়া মেয়ে দিয়ে কোনো ব্যক্তির বংশক্রম করেন না। তাই আখেরী নবী সঃ এর কোনো বংশ পৃথিবীতে নেই। তা সত্বেও শয়তান ও তার মানুষ শিষ্যরা নবীর বংশ, নবীর পরিবার নামের মিথ্যা পরিভাষা দাঁড় করিয়ে মুস্লিম্ উম্মার মধ্যে ফিৎনার সৃষ্টি করেছে।

রাসূলের অনুসারীরাই শুধু ক্বেয়ামত পর্যন্ত রাসূল সঃ এর "আহ্ল্ ও আহ্লে বাইত"। তাদের কোনো রক্তের সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। তাই রাসূল সঃ বলেছেন, "সালমানু মিন্না আহ্লাল্ বাইত"। অর্থাৎ সালমান আমার, আমার আহলে বাইত। অথচ সালমান ফার্সী রাসূল সঃ এর দ্বিগুন বয়সের এক পারস্যবাসী ছিলো। তদরূপ, বারাকাহ্, যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইব্ন মাসউদ ও উসামাহ্রাই রাসূল সঃ এর আহ্ল ও আহলে বাইত ছিলো। সুন্নী, শিয়া ও আরব্য বর্ণবাদীরা যা দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তার সামান্যতম ভিত্তিও ইসলামে নেই। শিয়া, সুন্নী, সাইয়েদ, হাশেমী, ক্বোরেশী, সিদ্দিক্বী, ফারুক্বী, মোঘল ও পাঠান সব শয়তানের বানানো শ্রেণী বিভাগ, যার মূলোৎপাটনের জন্য শেষ নবী এসেছিলেন এবং বিদায় হজ্জে তিনি তার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে বিদায় নেন।

যাইনাব যায়দকে কার্যতঃ প্রত্যাখ্যান করলো, কিন্তু আল্লাহ্ যায়দকে আরো উপরে উঠাবেন, তাতে যাইনাবের কোনো অংশ থাকবেনা। কারণ, জাত্যভিমানের জন্য যাইনাব নিজেকে তার জন্য অযোগ্য প্রমাণ করেছে। রাসূলের ঘরে, রাসূলের জীবনে দু'টি প্রাণী, আল্লাহ্র পাঠানো মানুষরূপী ফেরেশ্তা, বারাকাহ্ ও যায়দ।

বারাকাহ্ পিতৃমাতৃহীন এতীম মুহাম্মাদকে তিলে তিলে পালন করে সোনার মানুষ করেছে। যায়দ পিতামাতা সব ত্যাগ করে নিজের সত্বা বিসর্জন দিয়ে মুহাম্মাদ সঃ এর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপ নিয়েছে। আল্লাহ্ সাত আসমানে বসে সব দেখছেন। তাই তিনি মুহাম্মাদকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ বানিয়ে, যায়দ ও বারাকাহ্কে, রাহ্মাতের রাসূলের জীবনে "বাড়তি বরকত" রূপে ক্বুবুল করেছেন। যায়দের বিয়ে টিকলোনা। মা বারাকাহ্ বিধবা হয়ে পূনঃ রাসূল সঃ এর সংসারে ফেরৎ এসেছেন।

একদিন রাসূল তাঁর দরবারে ঘোষণা করেন, "তোমরা কে আছো বেহেশ্ত্ বিবাহ করবে?"

যায়দ শুনেই বলে উঠে, "আনা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্", আমি হে আল্লাহ্র রাসূল। রাসূল সঃ দ্বিতীয় বার বলেন, "তোমরা কে আছো বেহেশ্ত বিবাহ করবে?" কিছু চিন্তা না করে যায়দ সবার আগে বলে উঠে, "আনা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্" আমি হে আল্লাহ্র রাসূল!

তৃতীয় বার রাসূল একই ঘোষণা দেন এবং তৃতীয় বারও রাসূল সঃ এর ছায়া, যায়দ একই উত্তর করে। রাসূল সঃ এর যবান মোবারক থেকে তিনবার একই প্রশ্ন ও যায়েদের একই উত্তর শুনে সবাই ঔৎসুক্যে রাসূল সঃ এর পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষায় থাকে। এ বেহেশ্ত্ কে বা কী?

রাসূল সঃ বলেন, "উম্মে আয়মান বারাকাহ্ ধরার বুকে বেহেশ্ত্।" সুব্হানাল্লাহ্! আল্লাহ্র আখেরী নবী, খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীনকে আজীবন যিনি লালন করেছেন, তিনি জান্নাত বা বেহেশ্ত্ হবেন না তো, ধরায় বেহেশ্তের প্রতীক আর কে হতে পারে?

তখন বারাকাহ্র বয়স ষাটের এর কাছাকাছি এবং যায়দ ত্রিশোর্ধ। রাসূল সঃ বারাকাহ্কে বলতেন "উম্মী" আমার আম্মা।

যায়দকে বলতেন "হিব্ব্" ভালবাসা।

আল্লাহ্ তাঁর নবীর ঘরে দু'অসাধারণ মানুষকে একত্র করলেন বিবাহের বাঁধনেও। এরপর আল্লাহ্ এ বেহেশ্তী যুগল থেকে এক অসাধারণ শিশুর জন্ম দেন। রাসূল সঃ খুশীতে আত্মহারা হন। শিশুর নাম রাখেন "উসামাহ্"। এ-ই সে

উসমাহ্, যাকে রাসূল সঃ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে মাত্র আঠারো বছর বয়সে আবু বকর, উমর, আলী, তালহা ও যুবাইরসহ সকল ক্বোরেশী অক্বোরেশী খান্দানী ও বয়োবৃদ্ধদের উপর সেনাপতি বানিয়ে যান।

বারাকাহ্ ও যায়েদের সন্তান উসামাহ্। পিতা আরবী, মা হাব্শী, রং পেয়েছিলো মায়ের। গুণ মা বাবা উভয়ের এবং প্রেম ভালবাসা রাসূল সঃ ও পিতা মাতার। রাসূল সঃ উসামাহ্কে কোলে নিয়ে আদর করতেন, আর বলতেন "হিব্ব্ ইব্নুল হিব্ব্" ভালবাসার ছেলে ভালবাসা। যাইনাবের ভাগ্যে উসামাহ্র মা হওয়া জুটেনি। কিরূপে হবে? সেতো ক্বোরেশীয়্যাহ্। তার পেটে জন্মালে যে ক্বোরেশী বর্ণবাদী রক্ত ও চরিত্র হবে! তা হলে তো বর্ণ, রক্ত ও গোত্রবাদ নির্মূলকারী দ্বীন ও তার সৈনিকদের সেনাপতি হওয়ার যোগ্য হবে না? কি আল্লাহর বিধান? কি আল্লাহ্র দ্বীন? তারপরও মানুষ বর্ণবাদী ও গোত্রবাদী হয়?!

আল্লাহ্র রাসূল সঃ আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে তাওহীদের দাওয়াত আরম্ভ করেন। মুশ্রিক বর্ণবাদী ক্বোরেশীরা নবীকে মানলোনা, বিশ্বাসও করলো না। তারা নবী সঃ ও তাঁর উপর ঈমান আনা লোকদের উপর অত্যাচারের নারকীয় কর্মকান্ডে দিন দিন হিংস্র থেকে হিংস্রতরো হতে লাগলো।

চাচা আবু তালিব ভাতিজাকে আশ্রয় দিলো, নবীকে নয়। চাচা আবু লাহ্বের অত্যাচারে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। চাচা আব্বাস মক্কার কাফেরদের নেতা আবু সুফ্য়ানের বন্ধু, ধনী, সুদী মহাজন ও হামযার কলিজা চিবিয়ে খানেওয়ালী হিন্দার প্রেমিক। একমাত্র হাম্যাহ্ রাসূল সঃ এর দু'বছরের ছোটো চাচা, ভাতিজার উপর ঈমান আনে। তাও এক ঘটনার প্রেক্ষিতে।

হাম্যা শিকারী। তীর ধনুক নিয়ে পাহাড়ে উপত্যকায় শিকার করে বেড়ায়। একদিন এসে শুন্তে পায় যে আবু জেহ্ল তার ভাতিজা মুহাম্মাদকে মারধর করেছে, অপমান করেছে ও অশ্রাব্য গালমন্দ দিয়েছে। তা'শুনেই সোজা কাবার চত্বরে গিয়ে আবু জেহ্ল্কে খুঁজে বের করে ধনুক দিয়ে আঘাত করে আবু জেহ্লকে রক্তাক্ত করে দেয় এবং বলে "আমিও ঈমান আনলাম মুহাম্মাদের উপর, এরপর পারলে তুই কিছু করিস্, দেখে নিবো।"

এ হলো নবী সঃ এর ক্বোরেশী ও হাশেমী চাচাদের ইতিহাস। আল্লাহ্ তাঁর হাবীব, রাসূল সঃ কে জন্মের পূর্বে ও শৈশবেই ক্বোরেশী মুশ্রিক পিতা মাতা থেকে মুক্ত করে তাঁর বরকত বারাকাহ্কে দিয়ে তাকে লালন করান, যাতে তাঁর নবী জাহেলী আভিজাত্যের ছোঁয়া না পান। ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকেই যেহেতু তাঁর বাবা মার ঠেংগানী খেয়ে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিলো, সে মিল্লাতে ইব্রাহীমের শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃকে তো বাবা আব্দুল্লাহ্ ও মা আমিনা বেঁচে থাকলে সর্ব প্রথম মা বাবার পিটুনী খেয়েই দেশ ছাড়তে হতো। এ সত্য কি কোনো বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে?

কিন্তু কি করা? মিলাদখোর মৌলবী মোল্লা ও বর্ণবাদী মুসলমান নামধারী মূর্খরাতো তাদের মিলাদে আব্দুল্লাহ্, আমিনা ও হালিমা ছাড়া বারাকাহ্র নামও নেয় না! কেনো? বারাকাহ্ দাসী! তাতে কি বির্য়ানী ও মিষ্টি নাস্তা কম জুটবে?

মিলাদে জন্মের সময় বিবি মারইয়াম ও বিবি আসিয়াকে ক্বর থেকে এনে উপস্থিত করা হয়! কিন্তু আমিনার গর্ভাবস্থা থেকে আমিনাকে লালন করে প্রসবের সময় যে ধাত্রীর কাজ করে মুহাম্মাদকে প্রথম কোলে নেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত চোখে চোখে রাখেন, সে বারাকাহ্র কোনো খবরও নেই, উল্লেখও নেই! এ কেমন মিলাদ! কিসের মিলাদ?

মুহাম্মাদ সঃ রিসালাত পেয়েও আব্দুল্লাহ্ ও আমিনার জন্য দোয়া করা বা ক্বর যিয়ারত করা পর্যন্ত তাঁর জন্য নিষেধ ছিলো, যেমন হযরত ইব্রাহিম আঃ এর জন্য তাঁর পিতামাতার জন্য দোয়া করায় আল্লাহ্র নিষেধ ছিলো। কিন্তু এক শ্রেণীর গোত্র পুজারী মুশ্রিকরা আব্দুল্লাহ ও আমিনাকে মুস্লিম ও আব্দুল মুত্তালিবকে হানীফ বলে আখ্যায়ীত করে। অথচ আব্দুল মুত্তালিব ৩৬০ দেবদেবীর মুর্তির মন্দিরের ঠাকুর ছিলো! আবু তালিবকে রাসূল সঃ তার মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তেও কলেমায়ে তাওহীদ পড়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হতভাগা পড়েনি। মুশ্রিকরূপেই মৃত্যু বরণ করেছে। রাসূল সঃ বলেছেন, "লোক লজ্জার জন্য চাচা আবু তালিব জাহান্নাম বেছে নিয়েছে (ইখতারান্ নারা, আলাল্ আ-র)।" আবু লাহ্বকে সস্ত্রিক জাহান্নামী করে আল্লাহ্ একটি সূরা নাযিল করেছেন। তারপরও বংশ ও গোত্রের পূজারী মিলাদের গায়করা ভাতিজা মুহাম্মাদের জন্মে আনন্দিত হয়ে দাসী মুক্ত করায় তার জন্যও বেহেশ্ত্ বরাদ্দ করে রবিউল আউয়াল মাসে গান গায়! অথচ নবী মুহাম্মাদ সঃ এর রিসালাত ও আল্লাহ্র দ্বীন প্রত্যাখ্যান করায় তার নিশ্চিত জাহান্নামী হওয়ার কথা উল্লেখও করে না! ওদের কথা যদি সত্য হয়, তা'হলে সুরা লাহাবে বলা আল্লাহ্র কথা কি মিথ্যা? নাউযুবিল্লাহ্!

আর যায়দ? ক্বোরেশী মেয়ে যাইনাব যখন তার মিথ্যা বংশ মর্যাদার জন্য যায়দ্কে বিবাহ করতে আপত্তি জানায়, তখন ক্বোরেশী আভিজাত্য প্রত্যাখ্যানকারী মুহাম্মাদ সঃ বলেছিলেন, "শোন যাইনাব্, যায়দ ক্বোরেশী না হলেও সে মহান চরিত্রের অধিকারী, প্রশস্ত আত্মার মালিক এবং প্রথম মুস্লিম, যাকে বেহেশ্তী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। ইস্লামে কোনো জাত্যাভিমান নেই। ইসলাম সব মানুষকে সমান করে।"

মক্কার ক্বোরেশী ও হাশেমী কাফের মুশ্রিকদের বিরোধিতা ও অত্যাচারে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্র আখেরী নবী সঃ তায়েফের লোকদের সামনে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার মনস্থ করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে মক্কার ক্বোরেশরা ধর্মব্যবসায়ী। ধর্ম তাদের দ্বীন ও আদর্শ নয়, আরব বিশ্বকে ধর্মের নামে লুটার জন্য মক্কার নেতৃত্ব তাদের মূলধন। তারা ইস্লাম ক্বুবুল করে কোনো মতেই তাদের মূলধন হারাবে না। তায়েফের লোকেরা তুলনামূলকভাবে কৃষিজীবি ও ব্যবসায়ী। তাই তারা হয়তো সত্যের ডাকে সাড়া দিবে। তাই নবী সঃ তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। আশ্চর্যের বিষয় যে মক্কার কোনো ক্বোরেশবাদী তায়েফ যাত্রায় রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়নি। এমন কী আবু বকরও নয়। রাসূলের একমাত্র সঙ্গী হলো নবী ও নবুওতে প্রথম সাক্ষী যায়দ। তায়েফের পাষন্ডরাও তাদের মক্কী কাফের মুশরিকদের মতো নিজেদের হতভাগাই প্রমাণ করলো। তারা রাসূল সঃ এর ডাক প্রত্যাখ্যান করে তাদের নরপশু ছেলে ও দাসদের লেলিয়ে দিলো রাসূল সঃ এর বিরুদ্ধে। মানুষ পশুরা বৃষ্টির মতো রাসূল সঃ এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। রাসূল সঃ জীবনে তায়েফের কষ্টের কথা কখনো ভুলেন নি। মক্কা বিজয় ও ইসলামের বিজয়ের পরও তিনি তাঁর তায়েফের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

নবুওতী আদর্শের মু'মিন হতে হলে বান্দাকে তার মা'বুদের পথে সর্বস্ব বিলিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়। তবেই মা'বুদ বান্দার পাশে এসে দাঁড়ান। রাসূল সঃ আল্লাহর পথে তাঁর ও তাঁর ধনাঢ্য স্ত্রী বিবি খাদীজার সকল সম্পদ নিঃশেষ করে এমন দুস্থ হন যে, তিনি তায়েফ হিজরত কালে যায়দকে নিয়ে পায়ে হেটে যান। যাতায়াতের জন্য তখন তাঁর ঘোড়া বা উট দূরে থাক, একটি গাধাও ছিলোনা। এ অবস্থায় তায়েফের ঘটনার পর আল্লাহ তাঁর মুস্তাদআফ্ রাসূলকে হিজরতের মাধ্যমে মহা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন, যখন একমাত্র যায়দ ধরার মাটিতে একমাত্র মরমী সঙ্গী।

রাসূলের উপর প্রস্তর বৃষ্টি হচ্ছে। যায়দ নিজ জীবনের তোয়াক্কা না করে নিজের পিঠ পেতে নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাত সহ্য করে নবী সঃকে রক্ষা করছে। রাসূল সঃ নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। যায়দ? যায়দের অবস্থা কি হয়েছিলো? তা কী মিলাদখোরেরা যথাযোগ্য উল্লেখ করে? করেনা। কারণ? যায়দ তো ক্রীতদাস! রাসূল সঃ কী তাকে ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করেছিলেন? কেনো রাসূল তাঁর পরমা সুন্দরী ফুফাতো বোন যাইনাবকে যায়দের সাথে বিয়ে দেন? ঈমানদারদের এর কঠিন মূল্যায়ণ করে নতুন করে ইস্লামের কালেমা পড়তে হবে। অন্যথা মুস্লিম নামধারী বর্তমান জাতি নির্মূল হয়ে যাবে এবং অন্য এক শ্রেণীর লোকদের যায়দ, বারাকাহ ও উসামাহ্ গংদের আদর্শে ঈমান ও আমল দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বের নেতৃত্ব হস্তান্তর করবেন। ইন্শা আল্লাহ্।

রাসূল সঃ এর মক্কীজীবনের শেষ দিনগুলোতে, বিশেষ করে বিবি খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পরের দিনগুলোতে মক্কার কাফেরদের ষড়যন্ত্রের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য রাসূল সঃ বারাকাহ্ ও যায়দকে তাঁর সর্বপ্রথম গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব দেন। যায়দ ও বারাকাহ্ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা রাসূল সঃ কে দারে আরক্বামে সরবরাহ করতো।

এক রাতে যখন কাফেররা দারে আরক্বামের চারপাশে অবরোধ দাঁড় করে কাছ দিয়ে কোনো লোককে যেতে দেখলেই তাকে ধরে বেদম প্রহার করতো, তখন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে বারাকাহ্ দুর্গম পাহাড়ী পথে তার ছেলে রাসূল সঃ এর নিকট পৌঁছে তা সরবরাহ করেন। রাসূল সঃ তা দেখে খুশী হয়ে বারাকাহ্র কপালে চুমো খেয়ে বলেন, "তোবা লাকি, ইয়া উম্মী, ওয়া ইন্না লাকি মাকানান ফিল জান্নাহ্।" অর্থাৎ "তোমার জুড়ি নেই আম্মা, তোমার জন্য অবশ্যই বেহেশ্তে বাড়ী তৈরী রয়েছে।" সুব্হানাল্লাহ্ এ হলেন বারাকাহ্, উম্মুর রাসূল সঃ।

অপরদিকে যায়দ। সে তো রাসূল সঃ এর সঙ্গে এক প্রাণ দু'দেহ! মাদীনা হিজরতের পূর্বের দিনগুলোতে যখন রাসূল সঃ কে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরী হতে থাকে, তখন যায়দ সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাসূল সঃ কে সরবরাহ করতো এবং রাসূল সঃ সে মতো হিজরতের পরিকল্পনা তৈরী করেন। তাঁরা দু'জন রাসূল সঃ এর গোয়েন্দা বিভাগ!

রাসূল সঃ কে হত্যা করার নীলনক্সা চুড়ান্ত হ'লে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় আখেরী নবী সঃ কে মক্কাবাসী ক্বোরেশী ও হাশেমী কাফের ও মুশ্রিকদের কপালে রোজ ক্বেয়ামত পর্যন্ত কালিমা লেপন করে মাদীনায় হিজ্রত করার আদেশ করেন এবং

নবুওতের সর্বশেষ মুকুট মাদীনাহ্‌বাসীদের মাথায় পরানোর জন্য তাঁর নবীকে মাদীনাহ্‌বাসীদের হাতে তুলে দেন। মাদীনাহ্‌বাসীরা "তালা আল্ বাদ্‌রু আলাইনা" গেয়ে নবুওতের পূর্ণিমা চাঁদকে জান, মাল ও মান সবকিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করে। অপরদিকে কা'বার দখলদার দাম্ভিক ক্বোরেশদের কপালে নবীকে বিতাড়নের কলঙ্ক চিরতরে অঙ্কিত হয়। তারপরও "ক্বোরেশ? ক্বোরেশ??" রাসূল সঃ মাদীনাহ্ পৌঁছার পূর্বেই যায়দকে তার আট বছরের সন্তান উসামাহ্‌সহ মাদীনাহ্ পাঠিয়ে দেন। রাসূল সঃ এর কাছে গচ্ছিত আমানত তাদের মালিকদের ফেরৎ দেয়ার জন্য তিনি আলী ইব্‌ন্ আবি তালেবকে মক্কায় রেখে যান। আলী রাসূল সঃ এর বিছানায় জীবনের পরওয়া না করে শুয়ে কাফেরদের নিরাশ করে। অপরদিকে রাসূলের পরিত্যাক্ত ঘরবাড়ী ও বিষয় সম্পত্তি গুছানোর জন্য তাঁর পালক মা বারাকাহ্‌কে মক্কায় রেখে যান। পিতার দাসী যে সন্তানের মা! দাসী নন!

বারাকাহ্ বলেন, "মক্কার কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে রাসূল সঃ যখন মাদীনাহ্ পৌঁছে যান, তখন মক্কার কাফেরদের গোস্যা আর কে দেখে! ওরা সব ক্ষিপ্ত হিংস্র পশু হয়ে যায়। আমি যথাসম্ভব সব গুছিয়ে মক্কার সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করে এক শেষরাত্রে আমার পাথেয় খাদ্য ও পানি সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেটে মাদীনার পথে রওয়ানা হলাম।"

পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, তখন মা বারাকাহ্‌র বয়স সত্তুরের কোঠায়। তিনি এর পূর্বে আমিনা ও মুহাম্মাদকে নিয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্বে উটে চড়ে মাদীনাহ্ এসে আমিনাকে দাফন করে শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে একা মক্কা পৌঁছান। বিয়ে হলে পর তিনি মাঝখানে স্বামীর সাথে একবার মাদীনা আসেন। সংক্ষিপ্ত সময় বাসের পর স্বামীর মৃত্যুর পর পুনঃ মক্কা চলে যান। এবার তিনি একা মাদীনাহ্ যাত্রা করেন পায়ে হেঁটে। তাঁর মুখেই শোনা যাক তার দুঃসাহসিক অভিযাত্রার অমর কাহিনী ঃ

"আমার এ পা'দুটির উপর ভর করে আমি একাকী যাত্রা শুরু করি। এ যাত্রায় আমার অবর্ণনীয় কষ্ট হয়েছে। মরুভূমির সকল কষ্ট সহায় শুধু মাত্র আমার ছেলে রাসূল সঃ এর সাথে মিলিত হওয়ার বাসনাই আমাকে শক্তিশালী করেছিলো। গরম ছিলো সংহারী। মরুভূমির ধুলিঝড় আমাকে প্রায় অন্ধ করে ফেলেছিলো। মরুভূমির রাস্তা চেনা অসম্ভব হচ্ছিলো। তাতেও আমি রোজা রেখে চলছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভীষণ পিপাসা লেগেছিলো। মুখ, গলা সব শুকিয়ে আসছিলো। অথচ আমার সঙ্গের পানি শেষ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে এক ফোটা পানিও নেই। চারিদিকে কোনো জন মানুষের চিহ্ন নেই।

এভাবে সন্ধ্যা হয়ে রাত নেমেছে। আমি চলছি আর চারিদিকে কোনো উদ্ধারকারী খুঁজছি। যদি একটু পানি পাই! কিন্তু পেলাম না কাকেও। তাই ক্লান্ত হয়ে এক টিলার পাদদেশে বসে পড়লাম। অবসাদে তন্দ্রা অনুভূত হচ্ছিল। এ অবস্থায় সর্বশেষ সাহায্যকারীর কাছে হাত তুললাম, "ইয়া রাব্ব, তোমার বাঁদীকে রক্ষা করে, আমার ছেলে তোমার নবীর কাছে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করে দাও।"

"দোয়া করতে করতে একটু তন্দ্রার মতো এসে গেলো। হঠাৎ করে পায়ের কাছে ভেজা অনুভব করলাম। চেয়ে দেখি যে একটি ছোট্ট প্রস্রবণ ফুঠে উঠেছে, তা থেকে পানি ফিন্‌কি দিয়ে বেরুচ্ছে। তা থেকে পান করলাম। পানির পাত্র ভরে নিলাম। তারপর হাত মুখ ধুয়ে আল্লাহ্ পাকের শুক্‌র্ করে ঐ টিলার উপর রাত কাটালাম।"

বারাকাহ্‌র জন্য আবার "যম্‌যম" জারী হয়েছিলো? হবে না কেনো? তারই মতো এক দুঃস্থ, বিবি হাজেরা ও তার ছেলে ইসমাঈলের জন্য আল্লাহ্ কা'বার চত্ত্বরে যম্‌যম্ কূপের ব্যবস্থা করে ছিলেন। মা হাজেরার সেই ইসমাঈলের পিতা ইব্রাহীম খলীলের "মিল্লাতে ইব্রাহীমের" সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ-এর আসল মা বারাকাহ্‌র জন্য পুনঃ যম্‌যম্ প্রবাহিত না হয়ে পারে? ঈমানদারদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, এখনো তাঁদের অনুসারী হলে বহু যম্‌যমের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু ক্বোরেশী হাশেমী, শিয়া ও সুন্নী হলে তা হবেনা। ইসলাম ছেড়ে আরবী, ক্বোরেশী, সাইয়্যেদ, সুন্নী ও শিয়া প্রভৃতিতে বিভক্ত হয়ে পুনঃ মুশ্‌রিক হয়ে যাওয়ার ফলে মুসলমান নামধারীদের আজ এ অবস্থা।

আখেরী নবীর জন্য পাঠানো আল্লাহ্‌র বরকত, বারাকাহ্ বলেন ঃ

"টিলার উপর বিশ্রাম করে পুনঃ চলতে লাগলাম। এভাবে চলতে চলতে শেষে মাদীনাহ পৌঁছুলাম। যখন মাদীনাহ পৌঁছুলাম, তখন আমার পা দু'টিতে পানি এসে গেছে। চোখ দু'টি ধুলা বালিতে প্রায় অন্ধ। এ অবস্থায় রাসূল সঃ আমাকে দেখেই উঠে এসে তাঁর মোবারক হাতে আমার পা দু'টি মুছে দিলেন, আমার চোখ জোড়া ও মুখ মুছে দিলেন। তারপর তাঁর বরকতময় হাত দু'টি আমার কাঁধে রেখে বললেন, "হে উম্মে আইমান, আমার আম্মা, বেহেশ্‌তে তোমার জন্য অবশ্যই একটি বাসস্থান বানিয়ে রাখা হয়েছে।" রাসূল সঃ এর স্পর্শে আমার পা ফোলা চলে যায় এবং চক্ষু সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যায়।"

যায়দ ও বারাকাহ্, বারাকাহ্ ও যায়দ, এ কেমন যুগল, কেমন দম্পতি? এ দু'জনকে রাসূল সঃ যখন বিয়ে দেন, তখন যায়দ চল্লিশের কোঠায় এবং বারাকাহ্ ষাটের কোঠায়। দু'জনের মাঝে বয়সের পার্থক্য প্রায় সে বিবি খাদিজাহ ও মুহাম্মাদ সঃ এর মতো! এ বিয়েতে রাসূল সঃ ও বিবি খাদিজা খুব ধুমধাম করেছিলেন। মা খাদিজা বারাকাহ্‌কে অলঙ্কার, উপঢৌকন, পোষাক, ও আতর দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল সঃ সাজিয়ে ছিলেন যায়দ্‌কে। এ কী সাধারণ বিয়ে? তা থেকে এ বয়সে উসামাহ্‌র জন্ম। উসামাহ্, মুহাজির, আন্‌সার, মাক্কী, মাদানী ও সকল আরবী অ-আরবী সম্মিলিত মুসলিম মুজাহেদীনের প্রধান সেনাপতি!

হিজরতের পর মাদীনায়ও রাসূল সঃ উসামাহ্‌কে নিয়ে খেলতেন। নিজ হাতে খাওয়াতেন ও তার সাথে হাসি ও তামাশা করতেন। মাদীনাবাসী মুসলিমগণ সবাই রাসূল সঃ এর নিকট বারাকাহ্ ও যায়দের মর্যাদা বুঝতো। তাই তারা যখনই রাসূল সঃ কে দেখতে পেতো যে তিনি উসামাহ্‌কে খাওয়াচ্ছেন স্বীয় হস্ত মুবারকে ও তার সাথে হাস্‌ছেন, তখন তারা পরস্পর বলতো "ইন্নাহুল্ হাবীব্ ইবনুল্ হাবীব", হবেনা! এ যে প্রিয়ের ছেলে প্রিয়!

মাদীনায় হিজরাতের পর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছিলো এবং ক্রমে ইস্‌লামের ভিত দৃঢ় হচ্ছিলো, তখন রাসূল সঃ চারিদিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সৈন্য বাহিনী পাঠান। রাসূল সঃ স্বয়ং যে সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে অংশ গ্রহণ করেন, তাকে ইসলামী ইতিহাসের পরিভাষায় "গোয্‌ওয়াহ্" বলা হয়, যার সংখ্যা মোট ২৭টি। আর যে সমস্ত যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি, অন্যদের পাঠিয়েছেন, সে সমস্ত যুদ্ধকে "সারায়া" বলা হয়। রাসূল সঃ যতো গুলো সারায়া প্রেরণ করেছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী সারায়ায় তিনি যায়দকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকটিতে যায়দ বিজয় নিয়ে এসেছে। তাই রাসূল সঃ যায়দকে "ক্বায়েদে মুয়াফ্‌ফাক্ব" বা আল্লাহ্ তাআলার তৌফীক প্রাপ্ত সমর নায়ক বলে অভিহিত করেন। হেরা গুহার ধ্যান থেকে মু'তার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তি পর্যন্ত যায়দই আল্লাহ্‌র আখেরী নবী সঃ এর সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলো। তাই নয় কি?

উম্মুল মোমেনীন আয়েশা বলে ঃ

"আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সঃ কে নগ্ন দেহে দেখিনি একবার ব্যতিত। একদা রাসূল সঃ যায়দকে এক যুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠান। যায়দ্ বিজয়ী হয়ে ফিরে রাসূল সঃ এর দুয়ারে আসে। রাসূল সঃ একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যায়দের আগমনী সংবাদ পেয়ে তাকে স্বাগত জানাতে রাসূল সঃ এমন ভাবে ছুটে যান যে তিনি কাপড় সামলানোর সময়ও নেননি।"

রাসূল সঃ এর সাথে যায়েদের সম্পর্কের পরিমাপ পাওয়া যায় মা আয়েশার আরেক গুরুত্বপূর্ণ অভিমতে। রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর মা আয়েশা বলে, "রাসূল সঃ এর বিদায় কালে যায়দ জীবিত থাকলে অবশ্যই তিনি যায়দকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করে যেতেন।"

মা আয়েশা আরো বলে ঃ

"একবার যায়দ এক যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে ফেরে। রাসূল সঃ যায়েদের কপালে চুমো খেয়ে তাকে স্বাগত জানান আর বলেন, আয়েশা, অবশ্যই যায়দ আল্লাহ্‌র অনন্য সৈনিক। যখনই আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছি, যায়দকেই তাতে সেনাপতি নিয়োগ করেছি।"

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ক্বোরেশদের সাথে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। সে সময় রাসূল সঃ বহু গুরুত্বপূর্ণ কুটনৈতিক মিশন দেশে বিদেশে পাঠান। তখনকার রোমান শাসিত সিরিয়ার সীমান্ত বুস্‌রার শাসকের কাছে রাসূল সঃ

তাঁর এক দূত পাঠান। তখনকার দিনেও এ শিষ্টাচার ছিলো যে কোনো দূতকে কখনো হত্যা করা হতো না। কিন্তু বুস্‌রার পাপীষ্ঠ শাসক রাসূল সঃ এর দূতকে হত্যা করে এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে অশোভন উক্তি করে।

রাসূল সঃ তাঁর অনুসারীদের ঈমান ও শাহাদাত প্রীতির অগ্নী পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের এক সেনা বাহিনী প্রস্তুত করেন। এটাই হুজুর সঃ এর প্রথম আন্তর্জাতিক সমরাভিযান। এতো দিন শুধু আরবদের মধ্যেই তাঁর সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিলো। এবার আরব উপদ্বীপের বাইরে তখনকার দিনের এক পরাশক্তি, রোমান সাম্রাজ্যের প্রজাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সূচনা হতে যাচ্ছে। তাই এ যুদ্ধ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মক্কার সুযোগ সন্ধানী ও পার্থিব নেতৃত্বের লোভীরা পরিখার যুদ্ধে সম্মিলিত আরবদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও তার নবীর জয় এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিতে মাদীনায় প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী শক্তির স্বীকৃতি ও তার উত্থান অপ্রতিরোধ্য দেখে পার্থিব স্বার্থে ইসলামে প্রবেশ আরম্ভ করে। তারা তাদের জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবলো যে মুহাম্মাদ সঃ তাদের মতো ক্বোরেশী ও মাক্কী। তাই তারা সুযোগ মতো মূলতঃ পার্থিব স্বার্থে রাসূল সঃ এর চার পাশে জমা হতে লাগলো।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল সঃ এর নিকট প্রস্তাব করারও ধৃষ্ঠতা প্রকাশ করেছিলো যে, "হে রাসূল আপনি বেলাল ও যায়দদের মতো কৃতদাসদের জন্য আলাদা সময় করে দিন, আমাদের জন্যও পৃথক সময় করে দিন, যাতে আমরা আপনার কাছে এসে দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য সমবেত হতে পারি। কৃতদাসদের সাথে আমাদের উঠা বসা পছন্দনীয় নয়।"

রাসূল সঃ ক্বোরেশী অভিজাতদের মান ও মন রক্ষার্থে একদা বেলাল, সুহাইব, আম্মার, সালেম ও ইব্‌ন্ মাসউদদের দরবার থেকে উঠিয়ে দিয়ে ওদের জন্য পৃথক সময়ের ব্যবস্থা করতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যে, হয়তো এরা এভাবে এসে দ্বীনের কথা শুনলে ঈমান আনবে এবং ইস্‌লামের শক্তি বৃদ্ধি হবে। তাতে ক্ষতি কি? বরং মঙ্গলের সম্ভবনাই রয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানী বর্ণবাদী মিথ্যা আভিজাত্যের দাবীদারদের ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে নবী সঃ কে সতর্ক করে দিয়ে অহী প্রেরণ করেন ঃ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

"যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌কে ডাকে, তাদের তাড়াবেনা। তাদের মূল্যায়ন তোমার খেয়াল খুশী নয় এবং তোমার মূল্যায়নের মানদন্ডও মোটেই ওদের কাছে নেই, (তোমার ও তোমার অনুসারীদের মানদন্ডের বিচার শুধুমাত্র আমার হাতে) তারপরও যদি তুমি তাদের উঠিয়ে দাও তোমার অভিজাতদের মান রক্ষার জন্য, তাহলে তুমিও ঐ যালিমদের মতো হবে।" (সূরা আন্‌আম-৫২)

এ নির্দেশ নাযিল হতেই রাসূল সঃ সঙ্গে সঙ্গে যায়দ ও বেলালদের ডেকে আনেন ও নাক উঁচু ভদ্রলোকদের বিদায় করে দেন। এরপর রাসূল সঃ বেলাল ও আম্মারদের দরবার থেকে উঠিয়ে দেয়া দূরের কথা, তারা দরবারে রিসালাতে উপস্থিত থাকলে তাদের উঠিয়ে রাসূল সঃ কখনো দরবার থেকে উঠতেন না। বরং বেলাল ও আম্মাররা নিজেরা দরবার থেকে উঠে গিয়ে রাসূল সঃকে উঠার সুযোগ করে দিতো।

আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ বুস্‌রার শাসককে দূত হত্যার জবাব দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার সৈন্যের বাহিনী পাঠান। এ আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করেন রাসূল সঃ পর পর তিন জনকে। প্রথম সেনাপতি রাসূল সঃ এর প্রিয়তম যায়দ, তারপর জাফর ইব্‌ন্ আবি তালিব্ ও তৃতীয় আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর তরফ থেকে ঈমান ও নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ আনুগত্যের পরীক্ষার পালা এবার। রাসূল সঃ কখনো একাধিক সেনাপতি নিয়োগ করে কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। রাসূল সঃ যখন মুতার যুদ্ধের জন্য পরপর তিনজন সেনাপতি নিয়োগের ঘোষণা করছিলেন, তখন নোমান ইব্‌ন্ ফুন্‌হাস্ নামী এক ইয়াহুদী মস্‌জিদে নববীর বাইরে দাঁড়িয়ে তা শুন্‌ছিলো।

একথা শুনে নোমান রাসূল সঃ কে লক্ষ্য করে বললো ঃ

"আবুল ক্বাসেম, তুমি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকো, তা হলে যাদের তুমি সেনাপতি রূপে নাম নিয়েছো, এরা কেউ জীবিত ফিরবে না। আমি ইয়াহুদী হিসাবে জানি যে বনী ইসরাঈলের নবীরা যখন কোনো যুদ্ধে এভাবে নাম উল্লেখ করে যাদের পাঠিয়েছেন, তারা শত শত হলেও কেউ জীবিত ফিরেনি।"

তারপর নোমান ইব্‌ন্ ফুন্‌হাস্ যায়দের প্রতি বললো, "আমি শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদ সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী হলে তুমি আর কখনো মুহাম্মাদের কাছে জীবিত ফেরৎ আস্‌বেনা।"

তার কথা শুনে যায়দ উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলো, أشهدأنه رسول الله،الصادق الأمين

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল, সত্যবাদী, সন্দেহাতীত।"

রাসূল সঃ যুদ্ধের পতাকা স্বহস্তে বেঁধে তাঁর প্রিয়তম সেনাপতি যায়দের হাতে তুলে দিলেন।

যায়দ দৌড়ে গিয়ে তার স্ত্রী বারাকাহ্‌কে বলে ঃ إن ذاهب في الجيش إلى بصرى

"ওগো শুনেছো, রাসূল সঃ আমাকে সেনাপতি করে বুসরার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন।"

শুনে বারাকাহ্ বলেন, تصبحك السلامة و يحالفك النصر من عند الله

"তাসহাবুকাস্ সালামাহ, আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তা ও বিজয় তোমার সাথী হোক।"

জবাবে যায়দ্ বললো, "কিন্তু আমি এ যাত্রায় এক বিশেষ ইংগিত পাচ্ছি"।

বারাকাহ্ বললেন "সে কি?"

যায়দ্ বললো, "রাসূল সঃ কখনো কোনো যুদ্ধে একাধিক সেনাপতি নিয়োগ করেননি। এবার যে তিনি একাধিক সেনাপতি নিয়োগ করেছেন, তা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার অহীর ভিত্তিতেই করেছেন।"

বারাকাহ্ ঃ ! أي أمر يا زيد، وأنت جند الله المظفر و حبيب الرسول الكريم

"কী হ'তে পারে তুমি ভাবছো, তোমার কী মনে হচ্ছে? তুমি-তো সর্বদাই আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে বিজয়ী, সফল সেনাপতি! ইন্নাকা আন্‌তাল আমীরুল মুযাফ্‌ফার। তুমি তো রাসূলে করীম সঃ এর প্রিয়তম!"

যায়দ ঃ أنا لا أبالى شيئافي رضا الله و رسوله، طموحى رضاهما ولا غير

"আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর সন্তুষ্টির পথে কোনো কিছুকেই পরওয়া করিনা। শুধু তাঁদের সন্তুষ্টিই আমার কাম্য।"

আহ্‌লে কিতাব ইয়াহুদী নোমান ইব্‌ন্ ফূন্‌হাসের কথা মনে করে যেনো যায়দ খুশী হয়ে বারাকার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলো। কিন্তু মুখে কিছুই বলেনি। বারাকাহ্ ও যায়দ যে আল্লাহ্‌র মেলানো বেহেশতী জোড়া! ক্বোরেশ বা আরবদের মধ্যে কি এমন কোনো দম্পত্তি ছিলো, যাদের আল্লাহ্‌র রাসূল এতো ভালোবেসেছেন?

অপর দিকে ঘটে যাচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইস্‌লামে যে যতো নিজের "নফস্" ও আমিত্ব কে শেষ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের পূর্ণ অনুসারী হয়, সে ততো খাঁটি, সত্য ও সম্মানী মুস্‌লিম হয়। বংশ, গোত্র ও বয়সের হিসেবে ইসলামে কখনো মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার স্পষ্ট ঘোষণা, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মাঝে সে সবচেয়ে সম্মানী, যে যতো মুত্তাকী, খোদাভীরু।" (সূরা হুজুরাত-১৩)

আল্লাহ্‌র দরবারে বান্দার তাক্‌ওয়ার বাইরে অন্য কিছুর দাবী, বংশ, জাত, বর্ণ ও ভাষার বড়াই-ই কুফর। যেমন ইব্‌লিস তার সৃষ্টি-ধাতুর গর্ব করে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ নবী ও অহী পাঠান মানুষের শয়তানের প্ররোচনায় সৃষ্টি জাতি ভেদাভেদ নির্মূল করে মানুষকে পুনঃ মানুষরূপে তাঁর অনুগত খলিফা বানাতে। ইব্‌লিসের জাত্যাভিমান বজায় রেখে ক্বোরেশী, হাশেমী, সাইয়েদ, সিদ্দীকি, ফারুকী ও ওস্‌মানী প্রভৃতি থাকলে আর মুসলিম হওয়া যায় না। ইসলাম সকল দেয়াল ভেঙ্গে শুধু মানব গোষ্ঠিকে "এক ভাতৃ" জাত ও জামাতে রূপান্তরিত করে। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মোমেনরা পরস্পর শুধু ভাই। (হুজুরাত- ১০)

নবী ও রাসূল সঃ দের রিসালাত ও অহীকে যেমন প্রশ্নাতীত ভাবে গ্রহণ করে মু'মিন হতে হয়, তদ্রুপ তাঁদের হুকুম ও ফয়সালা মেনে মুসলিম হতে ও থাকতে হয়। রাসূলদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অমান্য করলেই ঈমান চলে গিয়ে পুনঃ কুফর এসে যায়। পূর্বের কাফের পুনঃ কাফের হয়ে যায়, কিছুই আর বাকী থাকেনা। আল্লাহ্ স্পষ্ট ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের ক্বসম, তারা কখনো ঈমানদার হবে না, যারা নিজেদের মাঝে দ্বিমতের ব্যাপারে তোমার রায়কে চূড়ান্ত বলে মনে প্রাণে মেনে না নেবে এবং মন থেকে তোমার দেয়া রায়ের ব্যাপারে সকল প্রশ্ন মুছে

ফেলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করবে।” (সূরা নিসা-৬৫)
রাসূল সঃ যায়দের মতো ক্রীতদাসকে কেনো সেনাপতি করলেন, এ নিয়ে ক্বোরেশী ও অন্যান্য আরব গোত্রবাদীরা রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায়ই শুধু ফুস্ ফাস্ কানাঘুসা নয়, দস্তুর মতো সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েছিলো। যেমন “ইল্লত যায়না মইলে, স্বভাব যায় না ধুইলে”, তাই হলো গোত্র বর্ণ পূজারীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্‌র শেষ নবী সঃ যিনি মানব চরিত্রকে চূড়ান্ত উৎকর্ষ দানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ দিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি, যায়দের মত, তাঁর চোখের উপর তিলে তিলে গড়া, আল্লাহ্‌র আরশে প্রশংসায় উচ্চারিত নামের পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্বাচন করার বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব দিতে তাঁর মিম্বারে, তাঁর মস্‌জিদের দরবারে দাঁড়িয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ
“আমি শুনতে পেলাম, তোমরা আমার যায়দ্‌কে সেনাপতি নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছো। বনী ইস্‌রাঈলের লোকেরা যেমন তাদের নবীদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে অভিশপ্ত হয়েছে, তোমরাও সে পথের পথিক হতে যাচ্ছো। তোমরা কি জানো, যায়দ কে? আল্লাহ্‌র ক্বসম, যায়দ তোমাদের মাঝে অনন্য। খবরদার আবার যদি মুখ খোলো, তা হলে, তোমাদের পূর্বের অভিশপ্তদের পরিণামের অপেক্ষা করো। তোমাদের ঈমান ও সকল আমল বরবাদ হয়ে তোমরা পূর্বে যা ছিলে, তাই হয়ে যাবে।”
এভাবে রাসূল সঃ আরবী জাতীয়তা ও বংশবাদীদের রোগ চিকিৎসা করার জন্য ৩০ পারা আল্‌-ক্বোরআন, আরবী ভাষায় নিয়ে প্রেরীত হন। যাকে আল্লাহ্‌ স্বয়ং বলেনঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا “আমি আল্‌ ক্বোরআন দিয়ে সে জিনিস নাযিল করেছি, যা মু'মিনদের জন্য রোগ নিরাময়ক ও রাহমাত্‌। কিন্তু যালিমদের জন্য তা রোগ বৃদ্ধিকারক।” (সূরা বনী ইস্‌রাঈল-৮২)
আল্লাহ্‌র রাসূলের “হাবীব” যায়দকে তাঁর শিক্ষার চরম পরীক্ষা ও তার সফলতার মান প্রমাণের জন্য পাঠান রোমান সম্রাটের দেশীয় রাজা বুস্‌রার শাসকের বিরুদ্ধে। আশা করা হয়েছিলো যে যায়দের সেনাবাহিনীকে দশ থেকে বিশ হাজার শত্রুর মোক্বাবিলা করতে হবে। মু'মিনদের সৈন্যের আগমনের বার্তা পেয়ে রোমান সম্রাট তার নিজস্ব এক লক্ষ সেনা পাঠিয়ে দেয় তার আরবী রাজার সাহায্যে। কারণ, রোমানরা আহ্‌লে কিতাব খৃষ্টান ছিলো। তাই তারা জানতো যে, শেষ নবীর আগমন আসন্ন। মুহাম্মাদ সঃ যদি সত্যিই সে নবী হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর সেনা বাহিনীকে প্রতিরোধ করা তাদের দেশীয় রাজার সেনা দিয়ে সম্ভব হবে না। তাই রোমান সম্রাট তার পরাশক্তির এক লক্ষ সুসজ্জিত ও সমরাস্ত্রে অপ্রতিরোধ্য সেনা পাঠিয়ে দিলো। কোথায় পাঁচ হাজার, কোথায় এক লাখ। যায়দের বাহিনীতে খালিদ্‌ ইব্‌ন ওয়ালিদও সাধারণ সিপাহী রূপে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। ঈমানের পরীক্ষা শুরু হলো। খালিদসহ পার্থিব অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যা তত্ত্বের হিসেবীরা ভড়কে গিয়ে পরামর্শ দিলো যে, যেহেতু তাদেরকে বুস্‌রার শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এ যুদ্ধ বুস্‌রার শাসকের বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং রোমান সেনাদের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ। সেহেতু দূত পাঠিয়ে মাদীনায় রাসূল সঃ এর নিকট মতামত চাওয়া হোক যে কি করা উচিৎ? তারা এ যুদ্ধকে আত্মঘাতি ও আত্মহুতি মনে করে ক্বোরআনের উদ্ধৃতি দিতেও ভুলেনি,وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ “তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংস করো না।”
নবী সঃ এর নবুওতের হেরা ও ঘরে লালিত ও পালিত যায়দ্‌ বললোঃ “আমরা অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যার ভিত্তিতে যুদ্ধ জয়ের জন্য লড়িনা। আমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনার্থে যুদ্ধ করি। জয়-পরাজয় আল্লাহ্‌র হাতে। তোমরা কি জাননা যে, মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহ্‌র রাসূল? তোমরা কি বিশ্বাস করো না যে, রাসূল সঃ অহী মারফত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেকই শুধু আমাদের আদেশ করেন? যদি তোমাদের ঈমান তাই হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা জানো যে আল্লাহ্‌ তা'আলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব জানেন? আমাদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে তো চরম কাম্য হলো শাহাদাত্‌ প্রাপ্তি! যদি তাই হয়ে থাকে, তবে কিসের চিন্তা?”
যায়দের বক্তব্যে জাফর ইব্‌ন্‌ আবি তালিব ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্‌ রাওয়াহাও একমত হলো। হবে নাইবা কেনো? এ জাফরই যে আলী ইব্‌ন্‌ আবি তালিবের সেই বড়ো ভাই, যার মুখে সুরা মারইয়াম পড়া শুনে ইথিওপিয়ার তখনকার সম্রাট নাজ্জাশী মুসলিম হয়েছিলো!
দুঃখ-কষ্ট, পাপ-পঙ্কিলতা ও ইব্‌লিস্‌ শয়তান এবং তার মানুষ খলিফাদের রক্ত, বর্ণ ও হিংসা বিদ্বেষের আস্তাকুড় এ পৃথিবীতে, আল্লাহ্‌র খেলাফত ও তাঁর রাসূলদের ইমামত প্রতিষ্ঠার জেহাদে প্রাণ দিয়ে শাহাদাতের মাধ্যমে অকল্পনীয়

সাফল্যে পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ থেকে কি বড়ো কোনো কাম্য খাঁটি মু'মিনদের হতে পারে? কখনো না।

যুদ্ধের নামও মুতার যুদ্ধ। নামের মাঝেই যেনো পরীক্ষা হচ্ছে, যে মৃত্যুর দ্বার দিয়ে কে "দারুল আখেরাতে" প্রবেশ করবে শাহাদাতের সনদ নিয়ে, এ যেনো তারই প্রতিযোগিতা, তারই ইঙ্গিত!

স্বনামধন্য অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের "রিজাল" বলে আরবীতে উল্লেখ করা হয়। ক্বোরআনেও আল্লাহ্‌পাক একাধিক স্থানে তাঁর কৃতী বান্দাদের "রিজাল" বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা নূরে, নূরের দ্বারা পরিচালিত, নূরের ঘরের নূরানী চরিত্রের মানুষদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ- لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

"তারা এমন মহান চরিত্রের, যে তাদের পার্থিব জীবনের ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যস্ততা কখনো আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকির থেকে তাদের অন্যমনস্ক করতে পারেনা। বরং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই তারা সালাত্ ক্বায়েম ও যাকাত প্রদানের যিকিরে মগ্ন থাকে। সর্বদা তারা মন ও ধ্যানকে ওলটপালট করে পরকালের ভয়ে জীবন কাটায়! যাতে তারা পরকালে উত্তম পুরস্কার পায়। (সূরা নূর-৩৭-৩৮) সূরা আহ্‌যাবে আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের উল্লেখ করেন যে,

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"মোমেনদের মধ্যে এক শ্রেণী রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদানুযায়ী একেরপর এক শাহাদাত্ বরণ করেছে। অপররা তাদের সুযোগের অপেক্ষারত। তারা সমান্যতমও বদলায়না।" (সূরা আহযাব-২৩)

মুতা, বা মুউতার যুদ্ধে তাই হতে লাগলো। যায়দের নেতৃত্বের তিন হাজার, কি পাঁচ হাজার "রিজাল" মহান পুরুষেরা একলাখ রোমান সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করতে লাগলো। প্রথমে, প্রথম সেনাপতি যায়দ, তারপর দ্বিতীয় সেনাপতি জাফর ইব্‌ন্ আবি তালিব ও তারপর তৃতীয় সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ রাওয়াহা। একজন শহীদ হতেই দ্বিতীয়জন পতাকা নিয়ে শাহাদাতের জন্য এগিয়ে গেলো। তাদের সঙ্গে তাদের সৈনিকরাও। অপর প্রান্তে মাদীনায় রাসূল সঃ এর জন্য আল্লাহ্ ১৪১২ বছর পূর্বে দূরদর্শনের পর্দা খুলে দেন। তিনি মস্‌জিদে নববীতে বসে বলেছেন, "এইমাত্র যায়দ শহীদ হলো। তারপর জাফর নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে এগিয়ে গেলো। জাফরের উভয় হাত কেটে গেলো। সেও শহীদ হলো। আল্লাহ্ তাকে দুটি পাখা লাগিয়ে দিয়েছেন, তা দিয়ে সে বেহেশ্‌তে উড়ে বেড়াচ্ছে। এবার ইব্‌ন্ রাওয়াহা শহীদ হলো।"

একি টেলিভিশনের জীবন্ত ধারাবিবরণী নয়? চৌদ্দশ বছর পূর্বে আল্লাহ্ যা করেছেন তাঁর নিরক্ষর রাসূলকে দিয়ে, আজ মানুষের আবিষ্কৃত পর্দায় দেখে তা বিশ্বাস হচ্ছে না? ঈমানদারদের বিশ্বাস যন্ত্র ছাড়াই স্থাপিত হয়। বেঈমানদের বিশ্বাস যন্ত্রপাতি দিয়েও স্থাপন করা দুরূহ। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল ইমরানে আরো স্পষ্ট করে এরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ - فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"আর যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ দেয়, তাদের কখনো মৃত্যু বরণ করেছে বলে মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পানাহার করছে। তারা আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কৃত হয়ে আনন্দে আত্মহারা। তারা তাদের সঙ্গীদের জন্য সুসংবাদ বার্তা পাঠাচ্ছে, যারা এখনো এসে তাদের সাথে মিলিত হয়নি, "হে ভাইয়েরা, তোমাদের কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। আল্লাহ্ ঈমানদারদের প্রাপ্তি বিফল হতে দেন না।" (সূরা আল ইমরান-১৬৯-১৭১) নশ্বর পৃথিবীতে মানুষকে আখেরাতের অবিনশ্বর সাফল্যের পথ দেখাতে চূড়ান্ত নবী রূপে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর অনুসারীদের "জেহাদের ময়দানে শাহাদাতের" চূড়ান্ত প্রদর্শণী করে তার ধারাবিবরণীও শুনিয়ে গেলেন প্রায় হাজার মাইল দূরে থেকে। ক্ষণিকের মধ্যে মেরাজ আরশকুর্সী সফর করেও তার বিবরণী দিয়ে গেছেন, যার ধারে কাছেও আজ পর্যন্ত বস্তুবাদী, বর্ণবাদী, জন্তুবাদী, ইন্দ্রবাদী, উপনিবেশবাদী ও যৌনবাদী বৈজ্ঞানিকরা পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। সাত আস্‌মানের সর্বনিম্ন আকাশে শূন্যে সাঁতার কেটেই তারা হাবুডুবু খাচ্ছে।

যায়দের সৈন্যদের মধ্যে "রিজালরা" সপ্তাকাশের চূড়ায় একের পর এক "বোরাক্ব" বা সোনার খাটে বসে জান্নাতের মেহ্মান হচ্ছিলো। অপর দিকে যায়দের সৈন্যদের মধ্যে যারা জীবনকে শাহাদাতের চেয়ে প্রিয় এবং শাহাদাতকে মৃত্যু মনে করে আখেরাতকে "দু'নম্বর" বিশ্বাস করতো, তারা জেহাদের ময়দান থেকে পালানোর পথ খুঁজছিলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন! কতো বড়ো হতভাগা এরা! ইসলামের পর এ ধরণের চিন্তাই কুফর। এটাই ঈমানের সত্যের পর নিফাক্বের ফাঁটল এবং হক্বের পর বাতিল। فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ফামাযা বাদাল্ হাক্বি ইল্লাদ্দ্বলাল? সত্যের সন্ধান পাওয়ার পর এটাই পুনঃ পথ হারানো! (সূরা ইয়ূনুস্-৩২)

ইসলামে ঈমান যেমন অমূল্য ধন, কুফর তেমন নিকৃষ্ট পাপ। তাওহীদ যেমন উৎকৃষ্ট, শির্ক তেমনি ঘৃণ্য। জেহাদ যেমন সেরা পূণ্য, যুদ্ধের ময়দানে থেকে প্রাণ নিয়ে পালানো তেমনি মহাপাপ। যার কোনো ক্ষমা নেই, যে পর্যন্ত না পুনঃ জেহাদের ময়দানে যাবে। পুনঃ জেহাদে গিয়েই সে কালিমা ও কলঙ্ক ধুতে হয়। তাই, আল্লাহ্ তাঁর আখেরী নবী সঃ কে দিয়ে ঈমানদারদের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে দেখিয়ে দিলেন যায়দের বাহিনী দিয়ে। কারা "খাঁটি সোনা," কারা "সোনার পিত্লাকলস্।" শাহাদাতের সুযোগ পেয়ে যারা পালায়, তারা কি আর কখনো শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে? তাই খালিদ্রা পায়নি।

ক্বোরেশী বড়লোকের সন্তান "খালিদ বিন ওয়ালিদ" তার সমমনাদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসে। যায়দ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইব্ন্ রাওয়াহার সঙ্গীরা শাহাদাত বরণ করে সরাসরি জান্নাতবাসী হয়ে সুউচ্চ গৌরবের মর্যাদা লাভ করে। ক্বেয়ামতের পূর্বেই তাদের জান্নাতের ফয়সালা শেষ।

পার্থিব ভোগান্বেষী, দুন্ইয়া পূজারী ও যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া ঐতিহাসিকরা খালেদের পলায়নকে সমর কৌশল ও "সমরনায়কত্ব" বলে লিখেছে। কিন্তু এ অন্ধরা সামান্য চেয়েও দেখেনা যে ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে যারা মাদীনায় ফিরেছিলো, তাদের মাদীনাহ্ বাসীরা কিভাবে গ্রহণ করেছিলো!

যায়দের বাহিনীকে পাঠানোর সময় রাসূল সঃ কয়েক ক্রোশ পথ স্বয়ং পায়ে হেঁটে তাদের বিদায় দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগুড়ারা ফেরৎ আসার সময় কেউ তাদের আগবাড়িয়ে আনতে যায়নি। বরং মাদীনাহ্বাসীরা পলাতকদের নেতা খালিদকে ফুর্রার্ (পলাতক) বলে তিরস্কার করেছে এবং তার সঙ্গীদেরও ফুর্রার বলে তাদের মুখের উপর মাটি ও বালি নিক্ষেপ করেছে। সালাম দিলেও কেউ তাদের সালামের উত্তর দেয়নি। অনেক স্ত্রীরা তাদের পলাতক স্বামীদের শয্যায় গ্রহণ করেনি। তাই তারা লজ্জায় ঘর থেকে বের হতে পারেনি। তারা বাড়ির বাহিরে হলেই মু'মিনরা তাদের "ইয়া ফুর্রার্" বলে চিৎকার করতো।

অপর দিকে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের পরিবার পরিজনদের জন্য লোকেরা ঘরে ঘরে খাওয়া পাকিয়ে তাদের ঘরে পাঠিয়ে তাদের শহীদদের জন্য মোবারকবাদ দিয়েছিলো।

পলাতকদের সংখ্যা নেহাত কম ছিলো না। তাদের মধ্যে কিছু প্রথম সারির সাহাবীরাও ছিলো। আবু হোরায়রা তাদের একজন। তার বর্ণনা ঃ

"আমরা ঘর থেকে বের হলেই তিরস্কার শুনতাম। একদিন আমার এক চাচাতো ভাই এর সাথে কোনো বিষয়ে দ্বিমত হতেই সে আমাকে বললো, ও, তুমিতো মুউতার যুদ্ধের ফেরারী!"

সালামাহ ইব্ন্ হিশাম ইব্ন্ মুগিরা বর্ণনা করেছে, "আমি ঘর থেকে বের হতে পারতাম না। কেউ এসে আমার স্ত্রীকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতো যে, সে ঘর থেকে বের হতে পারেনা। বের হলেই লোকেরা ইয়া ফুররার বলে ধ্বনি তোলে।"

শাহাদাত থেকে পলাতকরা চরম অনুশোচনায় ভুগ্লে রাসূল সঃ তাদের মুক্তির পথ ঘোষণা করেন যে "ফুর্রারদের কুররার বানানোর জন্য পুনরায় তাদের যুদ্ধে পাঠানো হবে।"

ফুররারের অর্থ যেমন ফেরারী বা পলাতক, তদরূপ কুররারের অর্থ হলো প্রতি আক্রমণকারী সৈনিক। পলাতকদের নেতা খালিদ বিন্ ওয়ালিদের অবস্থা ছিলো সবচেয়ে শোচনীয়। কারণ, তার পিতার ইসলাম ও রাসূল সঃ এর শত্রুতাকে আল্লাহ পাক ক্বোরআনে একাধিক স্থানে উল্লেখ করে তাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তারপরও এ খালেদ উহুদের যুদ্ধে পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছিলো।

রাসূল সঃ খালিদ সহ তার পলায়নকারী সঙ্গিদের বললেন, أنتم سيف من سيوف الله أنتم الكرار في سبيل الله "তোমরাও আল্লাহ্র তরবারী হবে, তোমাদের পূনঃ যুদ্ধে পাঠানো হবে। আন্তুম্ সাইফুম্ মিন্ সুয়ূফিল্লাহ, আন্তুমুল্ কুররার ফী সাবিলিল্লাহ্।"

বিদায় নিলো রাসূল সঃ এর প্রিয়তম যায়দ, বেঁচে থাকলে রাসূল সঃ যাকে মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতেন বলে মা আয়েশা বলেছে। যায়দের মৃত্যুতে রাসূল সঃ এর পালক মাতা বারাকাহ্ আবার বিধবা হলেন। উসামাহ্ বিন্ যায়দও এতিম হলো। রাসূল সঃ যায়দের শাহাদাতে ও বীরত্বে যেমন খুশী হয়েছিলেন, তেমনি তিনি বারাকাহ্র একাকিত্বে শোকাহত হয়েছিলেন। তাই তিনি বেশী বেশী বারাকাহ্র কাছে যেতেন এবং তার সব রকম খোঁজ খবর নিতেন। অনেক সময় তিনি আবু বকর উমরসহ ক্বোরেশী ও অক্বোরেশী অভিজাতদের সঙ্গে নিয়ে বারাকার কাছে যেতেন, তাদের সামনে রাসূল সঃ তাঁর পালক মার কপালে চুমো খেয়ে বলতেন "হেইয়্যাহ্, ইয়া উম্মী, হাল্ আনতি বেখাইর?" মাগো, তুমি কেমন আছো, ভালো আছো? উত্তরে বারাকাহ্ বল্তেন, "আজাল্ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আনা বিখাইরিন্ মা দামাল্ ইস্লামু বি খাইর"। "হ্যাঁ আল্লাহ্র রাসূল, আমি ভালো আছি, যতক্ষণ ইস্লাম ভালো থাকে"। এভাবে রাসূল সঃ আবু বকর উমরদের অক্বোরেশী অ-অভিজাত বারাকাহ্দের মর্যাদা ও সম্মান দান শিখিয়ে গিয়েছেন। রাসূল সঃ মক্কা বিজয়ের যাত্রায় সঙ্গে করে উসামাহ্ ও বারাকাহ্কে নিয়ে যান। মক্কাহ বিজয়ের পর কাবা ঘরে প্রবেশ করেন বেলাল ও উসামাহ্কে নিয়ে। কোনো ক্বোরেশী অভিজাতকে নিয়ে প্রবেশ করেননি। হাব্শী বেলালকে কা'বার ছাদে উঠিয়ে তিনি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃ দের আযান দেয়ায়ে কা'বাকে ক্বোরেশদের শির্কের নাপাকী থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। "ইন্নামাল্ মুশরিকুনা নাজাস্" মুশরিকরা নাজাস্ বা, অপবিত্র বই কিছু নয়। মুশ্রিকরা নাজাস্ অপবিত্র ছিলো। তাই তারা মক্কাহ বিজয়ের পর বেলাল ও উসামাহ্কে নিয়ে রাসূল সঃ এর কা'বা প্রবেশের সমালোচনা করেছে। কারণ, মক্কাহ বিজয়ের মাধ্যমে ক্বোরেশদের আভিজাত্য পদদলিত হয়ে যায়দ, বেলাল, বারাকাহ্ ও উসামাহ্দের মতো "মুস্তাদ্আফীন"দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবীকে পাঠিয়েছেন। المكة تبك أعناق الجبابر আল মাককাতু তাবুক্কু আনাক্বাল জাবাবির, অর্থাৎ মক্কাহ অত্যাচারী দাম্ভিকদের ঘাড় ভাঙ্গে। তাই মক্কার নাম মাক্কাহ্।

রাসূল সঃ মক্কাহ বিজয়ের পর তায়েফ জয়ে যান। তায়েফের যুদ্ধকেই হুনাইনের যুদ্ধ বলে আল্লাহ্ ক্বোরআনে উল্লেখ করেছেন। তায়েফ যাত্রায় রাসূল সঃ এর সেনা সংখ্যা ছিলো প্রায় পনের হাজার। সংখ্যা দেখে আবু বকর বলে ছিলো, "এবার আমরা সংখ্যা স্বল্পের জন্য পরাজিত হবো না।" অর্থাৎ এবার আমরা জিতবই। অথচ আল্লাহ্র শিক্ষা, وما النصر إلا من عند الله "বিজয় শুধু আল্লাহ্র সাহায্যেই আসে।" ওয়া মান্ নাসরু ইল্লা মিন ইন্দিল্লাহ।

আল্লাহ আবু বকরদের একবার উহুদে দেখিয়েছেন, এবার শেষবারের মতো আল্লাহ্ হুনাইনের যুদ্ধে দেখালেন যে "তোমাদের সংখ্যায় বিজয় আসেনা।" হুনাইনের আক্রমণে রাসূল সঃ কে ফেলে প্রায় সবাই পালিয়ে যায়। অবস্থা এমন গুরুতর হয় যে, কাফেরদের নেতা আবু সুফ্য়ান তার বন্ধু আব্বাসকে ডেকে বলে "চলো চলো আব্বাস, তোমার ভাতিজার যাদু শেষ। এবার আর তার রক্ষা নেই। এবার সকল সঙ্গী নিয়ে তাকে লোহিত সাগরে ডুবে মরতে হবে। চলো আমরা মক্কাহ গিয়ে পুনঃ দখল করে তাতে কুফরীর পতাকা উড়াই।" এরা কি মুসলমান হয়েছিলো? এদের দু'জনের বংশ থেকেই পরে দুটি কুফুরী রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়ে ইসলামের সর্বনাশই বা হয় কেনো? যার ফলে আজ পর্যন্ত বিশ্বে কোথাও নবী সঃ এর আদর্শে কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি!

অল্প কিছু লোক রাসূলকে ঘিরে থাকে হুনাইনের যুদ্ধে। তাদের মধ্যে বারাকাহ্, তার ছেলে আইমান ও উসামাহ্ অন্যতম। আইমান শাহাদাত বরণ করে। রাসূল সঃ তার লাশ উম্মে আইমান-বারাকাহ্র সামনে উপস্থিত করলে তিনি তার প্রসিদ্ধ উক্তি করেন। "আল্হামদু লিল্লাহ্, আমার এক ছেলে আল্লাহ্ কবুল করেছেন। আমার তো আরো দু'ছেলে আছে।"

আবার আকাশ থেকে ফেরেশতা সৈন্য নামে, আল্লাহ্র রাসূলের সাহায্যার্থে। পুনঃ অবস্থা রাসূলের অনুকুলে আসলে আবার মু'মিনরা ফিরে এসে রাসূলের সংগে মিলিত হয়। দ্বীন ও রাসূলের জয় হয়। কাফের আবু সুফ্য়ানদের মুখে পুনঃ চুন কালি পড়ে। মক্কা বিজয়ের সময় যে তার বন্ধু আব্বাসকে বলেছিলো, صار الملك لإبن أخيك، ليست النبوة

"তোমার ভাতিজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে, নবুয়ত নয়।" এ হলো ক্বোরেশী নেতাদের ইস্লাম গ্রহণের নমুনা! এরা "রাদিয়াল্লাহু আনহুম" হলে "গাদিবাল্লাহু আলাইহিম" কারা?

রাসূল সঃ মক্কাহ জয় করে ক্বোরেশী মুশ্রিকদের করতল থেকে মাক্কাহ ও কা'বাকে মুক্ত ও পবিত্র করার পর মাদীনাহ্ ফিরে যান। তিনি তেইশ বছরে যাদের তৈরী করলেন, তাদের ঈমানের সার্বিক পরীক্ষার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশে তাবুকের যুদ্ধ যাত্রায় যান। সুবিধাবাদীরা গরমের অজুহাতে, ফসল কাটার অজুহাত দেখিয়ে পিছুটান দেয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ্র রাসূল "নারুজাহান্নামা আশাদ্দু হাররা", এর চেয়েও বেশী গরম্ জাহান্নামের আগুন, বলে ভয় দেখিয়ে তাদের তাবুকে যেতে বাধ্য করেন। কিন্তু বেলাল, আম্মার, ইব্ন্ মাস্উদ, সালেম, সাল্মান, সওবান ও উসামাহ্রা ঐ সমস্ত অজুহাত দাঁড় করিয়ে পিছু হটতে চেয়েছে বলে এমন কোনো নজীর ইতিহাসে কোথাও নেই।

রাসূল সঃ বিদায় হজ্জ করেছেন। বিদায় ভাষণে তিনি সকল বর্ণবাদ, গোত্রবাদ ও আরবী অ-আরবী জাহিলিয়্যাতকে ধোলাই করে ইসলামের সারমর্ম সংক্ষেপ করে ক্বেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লবের ইশ্তেহার ঘোষণা করে যান। তাতে কোথাও ক্বোরেশ ও ক্বোরেশীদের ইমামত বা নেতৃত্বের সামান্যতম উল্লেখও নেই। রাসূল সঃ সে যাত্রায়ই তাঁর বিদায়ের সংকেত পান। আল্লাহ্ ইসলামকে পূর্ণকরার অহী পাঠান।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আল্ ইয়াওমা আক্মালতু লাকুম্ দ্বীনাকুম, ওয়া আত্মাম্তু আলাইকুম্ নে'মাতী, ওয়া রাদিতুলাকুমুল্ ইসলামা দ্বীনা।" আজ তোমাদের জন্য দ্বীন, ইসলাম ও নেয়ামত্কে পরিপূর্ণ করে দিলাম।

এরপরও আবার ক্বোরেশী হাশেমীদের ক্বোরআন ও রাসূলের সারা জীবন ও সংগ্রামের আদর্শ বিরোধী, আরবী ক্বোরেশী দ্বীনের ইমামত ও একচ্ছত্র নেতৃত্বের কথা কারা কিভাবে এবং কখন চালু করলো, তা কি ভেবে দেখার সময় এখনো আসেনি?

রাসূল সঃ এর জীবনের শেষ ঘটনা দিয়ে দেখা যাক আমরা কোথায়?

রাসূল সঃ রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিভু, বুস্রার শাসকের বিরুদ্ধে নবী জীবনের সর্বকালের বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন্। খালিদ ইব্ন্ ওয়ালিদ ও তার পলায়নকারী বাহিনীকে পলায়নের পাপমুক্ত করার নিমিত্তে এবং নবীর সাহাবী বলে কথিত মুস্লিমদের চূড়ান্ত পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করান তাঁর নবী সঃ কে দিয়ে।

যে মুখপোড়ারা খালেদ বাহিনীর পলায়নকে খালিদের বীরত্ব ও কৃতিত্ব বলে দাঁড় করাতে "সাইফুম্ মি্ন সুয়ুফিল্লাহ্" কে একা "খালিদ্ সাইফুল্লাহ্" বানালো, তাদের জামা কাপড় খুলে দেখা যাক, কোথায় সত্য, কোথায় গলদ।

রাসূল সঃ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে তিরিশ হাজার সৈনিক একত্র করেন। কিন্তু সেনাপতি নিয়োগ করলেন সে আত্মঘাতী (?) যায়েদের পুত্র, রাসূল সঃ এর "হাবীব ইব্নুল্ হাবীব" উসামাহ্কে। তখন তার বয়স মাত্র ১৮ বছর। তার অধীনে সাধারণ সিপাহী আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সাআদ্ ইবন আবি ওয়াক্কাস, আবু উবাইদাহ্, প্রভৃতি সবাই।

আত্মহত্যার শামিল (?) যায়দের শাহাদাতের যুদ্ধ থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করায় যদি "সাইফুল্লাহর" একচ্ছত্র উপাধী পাওয়া যায়, তা হলে এ যুদ্ধে তাকে সেনাপতি না করে, সে যায়দের যুবক ছেলেকেই কেনো প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করলেন আল্লাহ্র রাসূল সঃ ??

এবারও গোত্র, বর্ণ, বয়স ও আভিজাত্যের পূজারী ক্বোরেশ, মাদানী, মুহাজির ও আনসারদের থলে থেকে ইঁদুর ও বিড়াল সব একত্রে বের হয়ে পড়লো। বলা বলি আরম্ভ হলো এ কি হচ্ছে! সেবার রাসূল আমাদের বাদ দিয়ে তার মুক্ত করা দাস (?) যায়দকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। তবুও যায়দের তো বয়স বেশী ছিলো! এবার তার যুবক ছেলে উসামাহ্কে আমাদের সকলের উপর প্রধান সেনাপতি? এ কেমন করে হয়?

ইতিমধ্যে হুজুর সঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাঁর অন্তিম শয্যা ত্যাগ করে দু'জনের কাঁধে ভর করে হুজ্রা থেকে বের হয়ে মস্জিদে এসে মিম্বারে আরোহণ করেন। এবার তাঁর ভাষা আরো স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদের প্রতিবাদ ও কানাঘুসা শুনতে পেয়েছি। তোমরা যায়দের ব্যাপারেও তাই করেছিলে। তখনো আমি তোমাদের সতর্ক করেছি, বুঝিয়েছি, তোমরা তারপর দেখতে পেয়েছো, যায়দ ও তার অনুসারীরা কি করেছে। তোমরা দেখতে পেয়েছো, কারা ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। তারপরও তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের নিয়োগকে

তোমাদের সমালোচনার বিষয় বানিয়েছো? আল্লাহ্‌র কুসম, যায়দ যেমন অসামান্য সেনাপতি ছিলো, তার ছেলে উসামাহ্‌ও অসাধারণ সেনাপতি। তোমাদের কাজ "সাম্‌আ'ও তা'আত" শোনা ও পালন করা। তোমরা একি আরম্ভ করেছো আমি জীবিত থাকতেই! আমি বিদায় নিলে তোমরা কি করবে! সাবধান, বনী ইস্‌রাঈলরাও এ কাজ করে ধ্বংস হয়েছে। যে কোনো মূল্যে উসামাহ্‌র অভিযান প্রেরণ করবেই করবে। তা'না হলে তোমাদের কল্যাণ নেই।"
এ বলে রাসূল সঃ পুনঃ হুজরায় প্রবেশ করেন। তারপর নিজ মুবারক হাতে একটি পতাকা বেঁধে উসামার হাতে সোপর্দ করে তাকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দেন। এরই মধ্যে হুজুর সঃ আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন নবীয়ে রাহ্‌মাতের পালক মা বারাকাহ্‌ এসে বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্‌, আপনি জানেন উসামাহ্‌ আপনাকে কেমন ভালোবাসে, আপনিও তাকে কেমন ভালোবাসেন, এ অবস্থায় আপনাকে রেখে উসামাহ্‌ কি মনোযোগী হয়ে আপনার দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে? আমার পরামর্শ হলো, উসামাহ্‌কে এক দু'দিনের জন্যে যাত্রা স্থগিত করতে বললে কেমন হয়?"
রাসূল সঃ বারাকাহ্‌র কথা শুনেই রাজী হয়ে যান। কেনইবা হবেন না! এ বারাকাহ্‌ যে রাসূল জীবনের শীতল বেহেশতী ছায়া! কখনো তো তিনি নিজের জন্য কিছু চান নি! যা চেয়েছেন, তা মুহাম্মাদের কল্যাণে, যায়দের কল্যাণে, উসামাহ্‌র কল্যাণে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয়ের জন্যই!
উসামাহ্‌র সেনা বাহিনীকে মাদীনার চার মাইল দূরে তাবু করতে আদেশ দেয়া হলো। তারপর রাসূল সঃ তাঁর সেনাপতি "হাবীব ইব্‌নুল্‌ হাবীব" উসামাহ্‌কে ডেকে পাঠালেন। রাসূল সঃ এর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হয়। উসামাহ্‌ আসার পর তিনি আর কোনো কথা বলতে পারেননি। শুধু উসামাহ্‌র দিকে তাকিয়ে তাঁর যবান মুবারক নেড়ে তার ও তার যুদ্ধ যাত্রার জন্য দোয়া করেই চিরদিনের জন্য চক্ষু বন্ধ করেন।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم صل على محمد وعلى من تبعه إلى يوم الدين

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা মান তাবিআ'আহু ইলা ইয়াওমিদ্দিন।
রাসূল মানুষ ছিলেন। "ওয়ামা মুহাম্মাদুন্‌, ইল্লা রাসূল।" রাসূল সঃ রিসালাত ব্যতীত সাধারণ মানুষদের মতোই ছিলেন। তাঁর পূর্বের নবী রাসূলরাও মৃত্যু বরণ করেছেন। সে কথাই ক্বোরআনে আল্লাহ বলেছেন।
ক্বোরআনে স্পষ্ট শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও নবীর মৃত্যুতে কেউ কেউ অইসলামিক আচরণ করেছে। যেমন উমর করেছে। আবু বকর বুঝানোর পর নাকি তার বুঝ ফেরৎ আসে। বিবি ফাতিমাহ্‌ পিতা হারিয়ে বিহবল হয়েছিলো, মা আয়েশা স্বামী হারিয়ে শোকাহত হয়েছিলো। শুধুমাত্র একজন রাসূল সঃ এর ওফাতে নবুওত্‌ ও ওহী হারিয়েছিলেন। তিনি হলেন বারাকাহ্‌। রাসূল সঃ এর তিরোধানে তিনি শুধু একটি তিন শব্দের কাব্য উচ্চারণ করে সমুদ্রকে ঝিনুকে ঢুকিয়ে মুক্তা বানিয়ে গিয়েছেন। তিনিই শুধু বলেছেন, "আহ্‌, লাক্বাদ ইনক্বাতা আল্‌ ওয়াহ্‌য়্যু" হায়, অহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলো। এর চেয়ে আখেরী নবী সঃ এর বিদায়ের উপর উত্তম, স্বার্থক ও সুন্দর উক্তি আজ পর্যন্ত কারো মুখে উচ্চারিত হয়নি। হবেও না। তিনি যে নবী সঃ এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর মা! তাই বল্‌তে পেরেছেন, آه لقد انقطع الوحي "হায় অহীর লাইন কেটে গেলো।"
রাসূল সঃ দুনিয়া থেকে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ করে বিদায় নিয়েছেন। তিনি ইব্‌লিস শয়তান ও তার মানুষ দোসরদের রক্ত ও বর্ণে শতধা বিভক্ত মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌দানিয়্যাত ও তাওহীদের ভিত্তিতে একত্রিত করার আদর্শ স্থাপন করে চলে গিয়েছেন। তিনি আলী, আবু বকর কাকেও খলিফা বানিয়ে যাননি। বা আন্‌সার, মোহাজের ও ক্বোরেশী, কারো খেলাফত বা ইমামত প্রতিষ্ঠা করে যাননি। কারণ, কাকেও কিছু বানানো নবীদের কাজ নয়। তাঁদের কাজ, "নিজে আচরি অন্যদের শিক্ষা দিয়ে" চলে যাওয়া। তাই তিনি করে গিয়েছেন।

ইমামতী কি শুধু ক্বোরেশীদের?

কিন্তু তাঁর বিদায়ের পর মুহূর্তেই তাঁর রেখে যাওয়া ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে "আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" বা "ইমামতি ক্বোরেশদের" বলে ইস্লামী ঐক্যকে জবাই করে দু'টুকরা করে ফেলা হয়। যে রাসূল সঃ আজীবন ক্বোরেশী কুফর, নেফাক্ব, শির্ক ও গোত্র পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে নির্মূল করে গেলেন, ঠিক তাঁরই নামে এ কসাইর ছুরী চালানো হলো! কে, বা কারা, কিভাবে এ সর্বনাশা কথা বলে মুস্লিম্ উম্মাহর গলায় ছুরী বসালো, তার বিচার আল্লাহ্ ক্বেয়ামতের দিন অবশ্যই করবেন। কিন্তু বিশ্বময় মানব জাতির মুক্তির জন্য পুনঃ ইস্লামী বিপ্লব সংঘটিত করতে হলে অবশ্যই রাসূল সঃ এর মূল আদর্শে ফেরৎ যেতে হবে। অন্যথা মুক্তি নেই।

ক্বোরেশীরা চিরতরে মাদীনার লোকদের উপর তাদের উপনিবেশ চাপিয়ে দিলো। চার খলীফাহ্ ক্বোরেশী, উমরের ৬ জন উপদেষ্টা, সবাই ক্বোরেশী এবং আশারায়ে মুবাশ্শারা সবাই ক্বোরেশী! একি ভাবা যায়? ক্বোর্আন ও রাসূল সঃ এর জিন্দেগী সবই মিথ্যা, "আর ক্বোরেশীবাদ" সত্য?

এ ক্বোরেশীবাদের জন্য আলী ও আবু বকর এবং উমরের মধ্যে খেলাফত নিয়ে চরম বিবাদ হয়। যদি ক্বোরেশীবাদই ইসলামী নেতৃত্বের ভিত হয়, তা'হলে আলীই সবচেয়ে বড় হক্বদার ছিলো। কারণ, আলী ক্বোরেশী, হাশেমী ও নবী সঃ এর জামাতা! এ কথা আদৌ সত্য হলে, নাউযুবিল্লাহ্, তা আলীর মুখ থেকেই বের হতো। আলী তো কখনো তা বলেনি!

রাসূল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। ক্বোরেশী অক্বোরেশী বিবাদে ইসলামী ঐক্য ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো। তার ফাঁকে অন্যান্য গোত্রবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং এমনকি কিছু আরবরা যাকাৎ দিতে অস্বীকার করে বসলো। কোনো কোনো গোত্র তাদের নুতন নবীও ঘোষণা করলো। এদেরকে ক্বোরেশের খলিফা ও তার লোকেরা মুর্তাদ, মুন্কিরে যাকাত ও নবুওয়াতের দাবীদাররূপে আখ্যায়িত করলো।

অপর দিকে রাসূল সঃ এর হাতে বাঁধা যুদ্ধের পতাকা নিয়ে তাঁর নিয়োগকৃত সেনাপতি অপেক্ষা করছে। রাসূল সঃ বিদায় নিতে না নিতেই পূর্বের বিরোধিতাকারীরা পুনঃ প্রশ্ন তুললো, "উসামাহকে বদ্লাও, তার যুদ্ধ বাতিল করো, না হয় তা স্থগিত করো"।

এরা কারা? এরা কোন জাত? এরা কিসের উম্মত?

এবার তাদের আভিজাত্যের দাবীর সাথে তারা আরেকটি জোরালো যুক্তি দাঁড় করালো যে, নবী সঃ এর মৃত্যুর পর চারদিকে বিদ্রোহের ফলে রাজধানী মাদীনাই অরক্ষিত এবং হুম্কির সম্মুখীন। অথচ সকল বিদ্রোহের মূলে তারা নিজেরা!

এ চরম ক্রান্তিলগ্নে নতুন ক্বোরেশী খলিফা আবু বকর এক অনন্য সাধারণ কাজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তা হলো রাসূল সঃ এর নির্দেশ ও কঠোর হুশিয়ারী অনুযায়ী উসামাহ্র বাহিনী প্রেরণ করা। উমরসহ অন্যান্যদের কথা উপেক্ষা করে আবু বকর উসামাহ্ বাহিনী পাঠায়।

যায়দের বাহিনীর কান্ড দেখেই রোমান বাহিনী বুঝতে পেরেছিলো যে পরের বাহিনী কি করতে পারে। উসামাহ্র তিরিশ হাজার সৈনিকের আগমন বার্তা পেয়েই রোমান সম্রাট তার বাহিনী তুলে নিয়ে যায়। ফলে বুস্রার রাজা একা পড়ে যায়। সে রাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ এলাকা বিনা যুদ্ধে উসামাহ্র করতল গত হয়। চল্লিশ হাজার উটসহ বিরাট পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে উসামাহ্ ফিরে আসে। আল্লাহ্র রাসূল সঃ এর একটি হুকুম যথাযথ পালনের ফলে এতো বড়ো বরকত নেমে আসে। ক্বোরেশদের নুতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরোধী অন্যান্য আরবরা ভেবেছিলো যে, যায়দের সেনা বাহিনী তাদের দৃষ্টিতে যেভাবে নির্মূল হয়েছে, রোমানদের হাতে উসামাহ্র বাহিনী তার চেয়েও শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নির্মূল হবে। যদি তাই হয়, তা হলে তারা আক্রমণ করে মাদীনায় প্রতিষ্ঠিত ক্বোরেশদের সহজেই পরাজিত করে নির্মূল করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের অন্তিম কালের একটি হুকুম ঠিকমতো পালন করার বরকতে ক্বোরেশদের গোত্রবাদী খেলাফত সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়। খলিফা আবু বকর তার ক্বোরেশী সঙ্গীদের কথামতো উসামাহ বাহিনীকে প্রেরণ বাতিল করলেই আল্লাহ্র গযবে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। পরে খেলাফতের নামে তিরিশ বছর পর্যন্ত ইসলাম ও নব্য ক্বোরেশবাদের যে জগাখিচুড়ী চালু হয়ে পরে তা নগ্ন রাজতন্ত্রের জন্ম দিয়ে, সারা বিশ্বে আরবী ইসলাম, রাজকীয় ও

সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম নামে যে মহা ফেৎনা চালু হয়, তা আদৌ হতো না। বর্তমানে ইসলামের নামে যে ধর্ম চালু আছে এবং মুসলমান নামে যে জাতি আছে, তার সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর মূল দ্বীনের কোনো মিল নেই। এ সব ক্বোরেশী, আরবী, উমাইয়া, আব্বাসী, তুর্কী, মুঘল ও পাঠানদের ধর্মের আলখেল্লায় দাজ্জালী সাম্রাজ্যবাদ বৈ কিছুই নয়। রাসূল সঃ যে বলেছেন, তাঁর আরব শিষ্যরা তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পদাঙ্কানুসারী হবে এবং তাদের মধ্যে থেকে নুতন তিরিশটি দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, এরা সব তারা?

শেষ নবী সঃ এর প্রতিষ্ঠিত বারাকাহ্, যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইবনে মাস্উদ, সালেম, সালমান ও উসামাহ্দের ক্বোরেশী উমাইয়ারা এক এক করে নেতৃত্ব থেকে নির্মূল করে ভিন্ন নামে উমাইয়া, উত্বা, শাইবা, আবু লাহ্ব, আবু জেহ্ল ও আবু সুফ্য়ানদেরই পুনর্বাসিত করে। শুধু পার্থক্য হলো যে উত্বা, শাইবা, উমাইয়া ও আবু জেহ্ল প্রভৃতি নামের স্থলে ক্বোরেশী নেতৃত্ব ইসলামী পোষাকে বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস, শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী নামকরণ করেছে। বিশ্বনবী সঃ বিশ্বগ্রাসী তাওহীদী ঢেউ তুলে দিয়ে যান, সে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আরবরা ইসলামের নামে তাদের জাহেলিয়্যাতকে বিস্তার করে আসল ইস্লামকে কলঙ্কিত করে। যার ফলে আজ পর্যন্ত বিশ্বময় কোটি কোটি মুসলিম জনতা অহেতুক খেসারত দিয়ে যাচ্ছে।

রাসূল সঃ এর মক্কাহ বিজয়ের পূর্বক্ষণ থেকে এ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। মক্কা বিজয়ের দু'দিন পূর্বে ছদ্মবেশী আব্বাস প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবুতে অনুপ্রবেশ করে। মক্কাহ বিজয়ের পূর্বরাতে আব্বাস তার বন্ধু আবু সুফ্য়ানকে সুকৌশলে অনুপ্রবেশ করায়। আবু সুফ্য়ান যখন রাসূল সঃ এর মাক্কাহ বিজয়কে আব্বাসের ভাতিজার "রাজত্ব প্রতিষ্ঠা" বলে মন্তব্য করলো, এরপর আব্বাসের মধ্যে ঈমানের এক তিল থাক্লেও সে আবু সুফ্য়ানকে বাঁচানোর চেষ্টা করতো না। আবু সুফ্য়ানকে তখনই শিরোচ্ছেদ করে ইস্লামের চিরশত্রুকে নির্মূল করার উমরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাসূল সঃ এর সম্মুখে আব্বাস যে সমস্ত কথা উমরকে বলেছে, বোখারীতে বর্ণিত সে বিবরণ পড়লে যে কোনো বিবেকবান বুঝবে যে, সুদখোর আব্বাস কী ষড়যন্ত্রইনা তখন করেছিলো? তায়েফের হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সঃ এর বিপর্যয় দেখে আবু সুফয়ান তার বন্ধু আব্বাসকে যে পরামর্শ দিয়েছিলো, তাও কি বিবেকবানদের বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়? কেনইবা রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের মাত্র তিরিশ বছরের মাথায় রাসূল সঃ এর সকল খাঁটি সঙ্গীরা নির্মূল ও উৎখাত হয়ে আবু সুফ্য়ান ও আব্বাস যুগলের পারিবারিক সাম্রাজ্যের পত্তন হয়? এ গুলো কি এমনিতেই বাতাসে হয়েছে? কারা এ গুলোকে হালাল বানানোর উদ্দেশ্যে রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা হাদিস বানালো, যে, "আমার মৃত্যুর পর তিরিশ বছর খেলাফত চলবে, তারপর রাজতন্ত্র"? আখেরী নবী সঃ এর আদর্শ মাত্র তিরিশ বছর চলার পর কি ক্বেয়ামত পর্যন্ত শয়তানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তাঁর আখেরী নবী পাঠিয়েছিলেন?

মক্কা বিজয়ের পর এ বাঁধকাটা ইঁদুরজোড়া আব্বাস ও আবু সুফ্য়ান মুসলিমদের শিবিরে প্রবেশ করে তাঁবুর রশিকাটা আরম্ভ করে। রাসূল সঃ তা টের পান। তিনি বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমায় এদের প্রাণ ভিক্ষা দেন সত্যি, কিন্তু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আব্বাসকে বিশ্বাস করে কোনো দায়িত্ব দেননি। আব্বাস বহুবার কৌশলে ঢুকতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভদ্রতা, শারাফত্ ও লাজের মূর্তপ্রতীক রাসূল সঃ প্রত্যেক বার নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আব্বাস সর্বদা "রাসূলের চাচা" সমন্ধের সুযোগ নিতে সচেষ্ট ছিলো। রাসূল সঃ এর নবুওতী জীবনের ২৩ বছরের একুশ বছরই আব্বাস্ আবু সুফ্য়ানের যুগল নেতৃত্বের কুফরীর দ্বারা বিষিত ছিলো। তাই রাসূল সঃ তাঁর চাচার পাহাড় পরিমাণ পাপের জন্য উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন "আল্লাহ্ আব্বাস ও তার সন্তানদের হেদায়েত করে ক্ষমার পথ দেখাও।"

অপরদিকে আবু সুফ্য়ানকে রাসূল সঃ ক্ষমা করে প্রাণে রক্ষা করলেও কখনো তাকে পাত্তা দেননি, কাছে ভিড়তেও দেননি। আগ বেড়ে আবু সুফ্য়ান কিছু বলতে চাইলে হুজুর সঃ বলতেন, مه مه إنك امرء فيك جاهلية "মাহ্, মাহ্, ইন্নাকাম্‌রুউন্ ফীকা জাহিলিয়্যাহ্" থামো থামো, তুমি তো জাহেলিয়্যাতের প্রতীক।

মক্কাহ বিজয়ের পর ভন্ডামী করে মুহাজির সেজে মাদীনায় আস্তে চাইলে রাসূল সঃ বলেন "লা হিজ্‌রাতা বা'দাল ফাত্হ্" ফত্হে মক্কার পর আর মক্কাবাসীর জন্য কোনো হিজ্‌রত্ নেই। কারণ, মুহাজিরের চামড়া লাগিয়ে যেনো আব্বাস আবু সুফ্য়ানরা আনসার ও মোহাজেরদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্ত এরা তাতেই সচেষ্ট ছিলো।

মাদীনায় হিজ্‌রতের পর রাসূল সঃ যে সমস্ত যুদ্ধে যাননি, তার মধ্যে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি যায়দকেই সেনাপতি করে পাঠাতেন। তখন কখনো যায়দের সেনাপতিত্বের কোনো বিরোধিতা হয়নি। কিন্তু মক্কা বিজয়েরর পর যখন আব্বাস ও তার পরিবার, আবু সুফ্‌ইয়ান ও তার পরিবার এবং হাকাম্‌ ও তার পরিবার মাদীনায় ইসলামের ঐক্যবদ্ধ সমাজে প্রবেশাধিকার পায়, তখনই এ ইঁদুরগুলো ঐক্যের বাঁধন কেটে কেটে পূনঃ জাহিলিয়্যাতের বর্ণ, গোত্র ও জাতি বিরোধের বীজ ছড়াতে আরম্ভ করে। তাই রাসূল কর্তৃক যায়দ ও উসামাহ্‌কে সেনাপতি নিয়োগের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির মতো ঘটনা ঘটে, যা মুসলিম সমাজে অকল্পনীয়। রাসূল সঃ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে তা' টের পান। বেলাল, আম্মার, ইব্‌ন মাসউদ, যায়দ, সালমান, সুহাইব, সালেম, সাওবান ও উসামাহ্‌, যাদের দ্বারা রাসূল সঃ এর নবুওতের ঘর রচিত হয়েছিলো, তারাও এ পরিবর্তনের লক্ষণ টের পায়। রাসূল সঃ সে সময়টায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সে সময়টায়ই তিনি বেশী বেশী তাঁর অনুসারীদের সতর্ক করেন এ বলে যে "আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছে যে, তোমরা আমার মৃত্যুর পর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মতো বিভক্ত হয়ে আবার জাহিলিয়্যাতে ফেরত যাবে।" (মুয়াত্তা, বোখারী, মুসলিম)

তাই রাসূল সঃ তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মারওয়ান, তার বাপ, মা ও ভাইদেরসহ পুরো পরিবারকে মাদীনাহ্‌ থেকে নির্বাসিত করেন। অপর কিছু লোককে ধরতে পারলে ক্বতলের নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা দিয়ে যান যে,"লা ইউসাকিন্নাবাদ"এরা কখনো আমাদের সমাজে ফেরৎ আস্‌তে পারবেনা। এরা সবাই ক্বোরেশের উমাইয়্যা গোত্রের ছিলো। এরা সবাই রাসূল সঃ এর পেছনে তাঁর চলাফেরা ও কথাবার্তা নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করতো।

রাসূল সঃ ইন্তেকাল করার সঙ্গে সঙ্গেই যখন রাসূলের বরকত্‌ মাতা বারাকাহ্‌ বলেন, "আহ্‌ অহী আসার সিল্‌সিলা কেটে গেলো" তখনো তাঁর লাশ দাফন হয়নি। দুষ্ট কুচক্রী আবু সুফ্‌ইয়ান কুমন্ত্রনা দিয়ে আব্বাসকে আলীর কাছে পাঠায়। আব্বাস এসে আলীকে বলে "আলী, হাত বাড়াও আমি তোমার হাতে বায়আত্‌ হই। তাহলে লোকেরা বলবে, রাসূলের চাচা আলীর হাতে যখন বায়আত হয়েছে, তখন আমরাও গিয়ে বায়আত হই। তাহলে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব বনী হাশিমের ঘরই রয়ে যাবে, অন্যরা দখল করতে পারবেনা। বনী হাশিমের ঘরেই সাম্রাজ্য রয়ে যাবে।"

আলী যে আর বনী হাশিমের নেই। সে যে রাসূলের তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণে মুস্‌লিম হয়ে গিয়েছে এ কথা বুঝার শক্তি সুদখোর মহাজন আব্বাস ও তার বন্ধু আবু সুফ্‌য়ানের কুফরী মগজে ঢুকেনি। আলী শোকাহত অবস্থায়ই ইব্‌লিসের চক্রান্ত বুঝতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গেই আলী ইব্‌লিসের খলিফাকে বললো "চাচা রাসূল সঃ তো কোনো পারিবারিক উত্তরাধিকারী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে যান নি। তাঁর পর মু'মিনদের ইমাম ও নেতা কে হবে তা মু'মিনরা সিদ্ধান্ত নেবে। এ সমস্ত ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার আপনাকে কে দিলো? এ প্রস্তাব তো আপনার মগজের ফসল নয়! এতো আপনার বন্ধু শয়তান আবু সুফ্‌য়ানের ওয়াস্‌ওয়াসাহ্‌ ও কুমন্ত্রনা! আপনি তো তার বাহক মাত্র! যান, আপনার কাজে আপনি যান। রাসূলের অনুসারীরা তাদের ব্যাপারে দেখবে।" (মাওয়াহিবুন্‌ নবুউয়াহ্‌)

জোঁকের মুখে চুন পড়ার মতো আব্বাস উঠে তার "মগজ" আবু সুফ্‌য়ানের কাছে গিয়ে আলীর কথা জানালে আবু সুফ্‌য়ান্‌ দু'হাতে তার মাথার চুল ছিড়ে বলেছিলো "সর্বনাশ! আলীর বোকামীর ফলে বনি তাইম্‌ ও আদীর বেটারা (আবু বকর ও উমর উক্ত গোত্রের) রাজত্ব নিয়ে নিবে।"

এ ধরণের ভাঙ্গনের মধ্যেই ক্বোরেশী মাদানী বা মুহাজির আনসারের মধ্যে তিক্ত বচসা ও বিবাদের পর মাদীনাহ্‌বাসীর অসাধারণ ত্যাগ ও ধৈর্য্য এবং ভদ্রতায় সে যাত্রা রক্তপাত এড়িয়ে আবু বকর খলিফা হয়। আলী এ বিবাদের দূরে থেকে অনেকটা নিজেকে রক্ষা করে। ক্বোরেশীদের দাবী যদি সত্যিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে আলীই খলিফা হতো প্রথমে। যেহেতু ক্বোরেশী মাদানীর দাবীটাই বাতিল ও অন্যায়ের উপর, তাই আলী এ নিয়ে নিজেকে বেশী দূর জড়ায়নি। অপরদিকে, রাসূলের সত্যিকারের রিসালাতের আহ্‌লে বাইতের সদস্য বেলাল, আম্মার, সালমান, ইব্‌ন্‌ মাসউদ ও উসামাহ্‌রা ক্বোরেশী অ-ক্বোরেশী বিভক্তির জাহিলিয়্যাত দেখে হতভম্ভ ও হতবাক! এ কি দেখছে তারা ইসলামের পর? এদের কান্ড দেখে তারা আরো বেশী রাসূল সঃ এর বিদায়ে শোকাভিভূত হয়। আর ভাবে, তাইতো রাসূল সঃ বার বার তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন যে, আরব গোত্রবাদীরা তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াহুদী নাসারাদের মতো বিভক্ত হয়ে জাহেলিয়্যাতে প্রত্যাবর্তন করবে!

এ অবস্থা দেখে সবার আগে বেলাল পৃথক হয়ে যায়। সে আর ক্বোরেশী ইমামদের নামাজ ও জামাতের আযান দেয়নি। কেন?

এ বেলাল কে?

ইয়ামেনের রাজা আব্রাহা মক্কা আক্রমণ করতে এলে তার সঙ্গে তার পরিবারও ছিলো। আল্লাহ্‌র গযবে রাজা আব্রাহা সসৈন্যে ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ্ চিহ্ন স্বরূপ তার পরিবারের এক মহিলাকে রক্ষা করেন। সে মহিলাই বেলালের মাতা। তাকে মক্কার বর্বর ক্বোরেশীরা দাসীরূপে গ্রহণ করে। এক সময় হিজায্ ও নাজ্‌দ্‌সহ পুরো জাযিরাতুল আরব ইয়ামেন রাজ্যের অধীন ছিলো। সে সূত্রে মক্কার ক্বোরেশরা বেলালদের পূর্ব পুরুষেরই প্রজা ছিলো।

বেলাল এখন মুস্‌লিম। খাতামুন্ নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর মুয়ায্‌যিন। মক্কায় একদা যে তাওহীদের আযান ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল যবীহুল্লাহ উচ্চারণ করে ছিলেন, এবং মক্কার মুশ্‌রিক ক্বোরাইশরা যে তাওহীদের আযান বন্ধ করে কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি বসিয়েছিলো, সে মূর্তি ধ্বংস করে মিল্লাতে ইব্রাহীমের শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ পুনঃ যে আযানকে বুলন্দ করেছেন, সে আযানের মুয়ায্‌য়িন বেলাল! মিল্লাতে ইব্রাহীম থেকে পুনঃ ক্বোরেশী গোত্রের ইমামত প্রতিষ্ঠাকারীদের জামাতের আযান বেলাল দিতে পারে না। তাই বেলাল সঠিক সময়ে নিজেকে আলাদা করে ফেলে।

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তখনো তাঁর লাশ মোবারক দাফন হয়নি। নামাজের সময় হয়েছে। বেলাল অভ্যাস মতো আযান আরম্ভ করেছে।

আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার

الله أكبر، الله أكبر.

আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার

الله أكبر، الله أكبر.

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

أشهد أن لا إله إلا الله.

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

أشهد أن لا إله إلا الله.

আশহাদু আন্না ------

أشهد أن.........

আর শব্দ বের হচ্ছেনা বেলালের কণ্ঠ থেকে। বেলাল ফিরে রাসূল সঃ এর ঘরের দুয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখছে যে ঐ দরজা দিয়ে তো আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এসে জামাতে ইমামতি করতে আসবেন না। তাই আর তার গলা দিয়ে আযানের "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" বেরই হচ্ছেনা। আযানের মধ্যেই বেলাল কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। আযান পূর্ণ করণার্থে বেলাল কেঁদে কেঁদে আযান শেষ করে। রাসূল সঃ এর আশেক্ব পতঙ্গরাও বেলালের সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সে-ই বেলালের শেষ আযান।

তারপর পুনঃ আযানের সময়। লোকেরা অপেক্ষা করছে। কিন্তু আযানের কোনো সাড়া শব্দ নেই। তালাশ করে দেখে, বেলাল এক কোনে পাথর হয়ে বসে। তাকে বিভোর দেখে জনৈক বলে ঃ آذان يا بلال

"আযান, ইয়া বেলাল! হে বেলাল আযান দাও।" لن أوذن بعد اليوم، فليوذن غيري "লান্ উযেন্ বা'দাল্ ইয়াউম্, ফাল্ ইউযেন্ গায়রী।"

অর্থাৎ "আমি আজ থেকে আর আযান দেবো না, অন্য কাউকে আযান দিতে বলো।"

রাসূল সঃ এর পর নতুন ইমাম আবু বকর আসে। জিজ্ঞাসা করে আবু বকর, "বেলাল কোথায়?"

তাকিয়ে দেখে বেলাল এক কোনে যেমন ছিলো, তেমনি বসে আছে।

আবু বকর গিয়ে বেলালকে বলে ঃ

"বেলাল আযান দাও।"

বেলাল, "না"।

"ওয়া লিমা-লা, ইয়া বেলাল?" কেনো না, হে বেলাল? و لما لا يا بلال؟

"তুমি যদি আমাকে তোমার কথা শোনার জন্য মুক্ত করে থাকো, তা'হলে আমি তোমার হুকুম পালনে বাধ্য। আর যদি তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে থাকো, তা'হলে যে জন্য মুক্ত করেছো, সে সওয়াবের আশায় আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।"

বেলালের স্পষ্ট জবাব।

বেলালের কথা শুনে আবু বকর বলেঃ

"আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাকে মুক্ত করেছি।"

উত্তরে বেলাল বলে ঃ

"আমি রাসূল সঃ এর ওফাতের পর আর কারো জন্য আযান দিবো না।"

বেলালের দৃপ্ত কণ্ঠের জবাব শুনে আবু বকর বেলালকে আর কিছু বলতে সাহস পায়নি। কারণ, তারা তো পরস্পরের মর্যাদা বুঝ্তো!

রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর মৃত্যুর পর বেলালের দৃষ্টিতে রাসূল সঃ এর একটি মাত্র প্রত্যক্ষ চিহ্ন বাকী ছিলো, তা হলো রাসূল সাঃ এর নিয়োগকৃত সেনাপতি উসামাহ্, উসামাহ্‌র পতাকা ও উসামাহ্‌র সেনাবাহিনী। উসামাহ্‌র বাহিনী যাত্রা শুরু করলে বেলাল যুদ্ধের পোষাক ও বর্ম পরে রওয়ানা দেয়। এভাবে বেলাল মাদীনাহ্ ত্যাগ করে।

রাসূল সঃ এর নিয়োগের বরকত ও আল্লাহ্‌র ফজলে উসামাহ্ একতরফা ভাবে পুরো এলাকা জয় করে অঢেল গনিমতের ধন সম্পদ নিয়ে ফিরে। তার মধ্যে উটই ছিলো চল্লিশ হাজার। উসামাহ্‌র অভিযান ব্যর্থ হলে আরব উপজাতিরা তারপরই চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্বোরেশী ইমামত নির্মূল করতো। কারণ ক্বোরেশদের মতো তারাও তো আরব! নবী সঃ এর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে মিলে জেহাদ করেছে। তারা খাটো কোথায়? তারা কেনো ক্বোরেশের অধীন হবে! আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর রাসূল সঃ এর আনুগত্য তো আছেই। এ ছিলো তাদের যুক্তি।

কিন্তু উসামাহ্‌র অভিযানের মুখে রোমান সম্রাটের ময়দান ছেড়ে পলায়ন এবং বুস্‌রার রাজা ও তার ব্যাপক এলাকার পতন মাদীনায় গড়ে উঠা ক্বোরেশী কর্তৃত্বকে আত্মবিশ্বাস দান করে এবং তাদের বিরোধীদের মনোবল ভেঙ্গে তাদের ভীত ও হীনবল করে দেয়। তাই তারা আর সুবিধা করতে পারেনি।

কিন্তু এখানেই সব শেষ। উসামাহ্ ফিরে আসার পর আর কখনো উসামাহ্, আম্মার, ইব্‌ন্ মাসউদ, সাওবান্ ও সালমানদের নেতৃত্বে দেয়া হয়নি। উসামাহ্‌র তখন মাত্র আঠারো ঊনিশ বছর বয়স। রাসূল সঃ এর "হাবীব ইব্‌ন্ আল হাবীবকে" তারা তো ইচ্ছা করলে, আল্লাহ না করুন, ইসলাম বিরোধী কিছু না করলে বহুদিন পর্যন্ত বরকত হিসেবে সেনাপতি করেও তো রাখতে পারতো! কিন্তু বনেদী অভিজাত ক্বোরেশীরা বারাকাহ্ বাঁদী ও যায়দ দাসের সন্তান উসামাহ্‌কে যেমন পূর্বে প্রধান সেনাপতিরূপে রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায়ই মেনে নিতে পারেনি, রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর কেম্‌নে তাকে সেনাপতি রাখে? এ তো যে কোনো সাধারণ জ্ঞানের মানুষের বোধগম্য?

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর বারাকাহ্, উসামাহ্, আম্মার, ইবন্ মাস্‌উদ ও সালমান ফারসীদের "তাবাররুক" হিসেবে মোটা ভাতা দেয়া হয়েছে, আবু বকর ও উমরের আমল পর্যন্ত। রাসূল সঃ এর ওফাতের পর আবু বকর ও উমর বারাকাহ্‌কে দেখতে যেতো এবং জিজ্ঞাসা করতো ঃ يا أُم الرسول الله، كيف حالك؟

"হে রাসূলুল্লাহ্‌র মাতা, আপনি কেমন আছেন?"

তখন বারাকাহ্ বৃদ্ধা। আজীবনের লালিত ধন রাসূল সঃ চলে গিয়েছেন। রাসূল সঃ এর প্রিয় যায়দ, তার স্বামী। যায়দ মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, ছেলে আয়মান হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে এবং রাসূলের প্রিয় সেনাপতি উসামাহ্ এখন অবসর প্রাপ্ত। কিছুদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করে তার পুত্র রাসূল সঃ ও স্বামী যায়দের সাথে দারুল আখিরাতে মিলিত হন।

উসামাহ্ বিজয়ী হয়ে ফেরত আসার পর মুউতার যুদ্ধে পলায়নকারীদের নেতা খালিদ্ ইব্‌ন্ ওয়ালিদ সেনাপতি হয়। ধনী, দাম্ভিক ও বহু শক্তিশালী সন্তানের পিতা ওয়ালিদকে ক্বোরেশী আভিজাত্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনে চরম নিন্দা করেছেন। কারণ, ইস্‌লাম ও নবী সঃ এর সাথে তার শত্রুতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। তার সন্তান খালেদের মধ্যে পিতার কিছু খাস্‌লত্ থাকাই স্বাভাবিক। ভোগ বিলাসী ঘরে জন্মিয়ে ইসলামের চরম শত্রুতা থেকে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আম্‌র্ ইব্‌নুল আস সহ একত্রে ইস্‌লামের বিজয়ের সম্ভাবনা মেপে মুসলমান হয়েছিলো। নুতন মুসলমান। তারবিয়াত ভালোরূপে হয়ে সারেনি। মক্কা বিজয়ের সময় অন্যায়ভাবে রাসূল সঃ এর নির্ধারিত কারণের

বাইরে কয়েকজনকে হত্যা করে। রাসূল সে হত্যাকান্ডে মর্মাহত হয়ে তিনবার আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে বলেন ঃ
اللهم إني أُبري نفسي مما صنع خالد
"ইয়া আল্লাহ্‌, আমি খালেদের কর্মের দায়িত্ব থেকে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করছি।"
إن في سيف خالد دما " খালেদের তরবারী রক্ত পিপাসু।"

রাসূল সঃ যায়দ ও উসামাহ্‌দের সেনাধ্যক্ষের দায়িত্বে যোগ্য মনে করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সমরাভিযানে পাঠান। তাঁর গোত্রবাদী শিষ্যরা তাদের নেতৃত্ব পছন্দ করেনি। রাসূল সঃ বিদায় নেয়ার পর হঠাৎ করে তাঁর নির্বাচিতদের গুণাবলী দূর হয়ে গেলো? না রাসূল সঃ থেকে তাঁর সাহাবীদের বুদ্ধি বেশী হয়ে গিয়েছিলো? নাউযুবিল্লাহি মিন্‌ যালেক। এতো কখনো হতে পারে না যে, "এও ঠিক", "সেও ঠিক"। তাও যদি হয়, তা হলেও তা প্রথম "ঠিকটা" পরবর্তী "ঠিকের" চেয়ে উত্তম। কারণ, সেটা যে স্বয়ং রাসূল সঃ এর "ঠিক"?

আবু বকর কর্তৃক প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হয়ে খালেদ বেশ কতগুলো অন্যায় হত্যাকান্ড ঘটায়, ক্বোরআনে স্পষ্ট বর্ণিত আল্লাহ্‌র মৌলিক নির্দেশ অমান্য করে। যেমন, সন্দেহের বশ্‌ হয়ে মুস্‌লিমদের হত্যা করা, এবং ইদ্দত পূর্তির পূর্বেই তাদের স্ত্রীদের নিজের মালিকানায় নিয়ে তাদের সাথে সহবাস করা ইত্যাদি। এসব হত্যার জন্য খলিফা আবু বকরকে নিহতদের রক্তপণ প্রদানে ক্ষতিপূরণও দিতে হয়েছে। "না জেনে ভুল করেছে" বলে আবু বকর খালেদকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু উমর, আবু ওবায়দা, সাআদ বিন্‌ আবী ওয়াক্কাস্‌ ও আলী প্রভৃতিরা আবু বকরের সাথে একমত হয়নি। তাই খলিফা হয়েই উমর যুদ্ধের ময়দানেই খালেদকে বরখাস্ত করে!

বিশ্বের সকল মানুষের জন্য রহ্‌মত, রাহ্‌মাতুল্‌লিল্‌ আলামীন, জাতি, গোত্র, বংশ ও বর্ণের ভেদাভেদ নির্মূলকারী নবী সঃ এর বিদায়ের পর ক্বোরেশদের "এক বংশীয়" খেলাফত আরম্ভ হলেও রাসূল সঃ এর দেয়া সংস্কারের ঢেউএ আবু বকর ও উমরের শাসন কাল মোটামুটি কোনো প্রকার চলেছিলো। আল্লাহ্‌ ও রাসূল সঃ এর প্রেমাস্পদ আম্মার, ইব্‌ন্‌ মাসউদ, উসামাহ্‌, আবু যার ও সালেমরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে নির্বাসিত হলেও "তাবার্‌রুকান্‌" তাদের বাহ্যিক সম্মান ছিলো। তাদেরকে মোটা ভাতাও দেয়া হতো অন্যান্যদের তুলনায়। আবু বকর ও উমরের আমলে রাসূল সঃ ক্বোরেশের যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, তাদের আর মাদীনায় আস্‌তে দেয়া হয়নি। তাই মাদীনাহ্‌ সে সমস্ত কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত ছিলো।

দ্বিতীয় খলিফা উমরের আমলে চার দিকে রাজ্যজয় আরম্ভ হলে, বিজিত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিজিত জাতিসমূহের চালাক ও ধূর্তদের মোকাবিলায় উমরের দৃষ্টিতে ধূর্তলোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলামে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস ও উৎপত্তি আল্লাহ্‌র ভয় বা তাক্বওয়া।

তাইতো রাসূল সঃ এর তাক্‌ওয়ার প্রশিক্ষণে যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইব্‌ন্‌ মাস্‌উদ ও উসামাহ্‌রা ইস্‌লামী জ্ঞানের দিকপাল হয়। রাসূলের জীবনে ঈমান ও তাক্বওয়ায় পশ্চাদপদ হওয়ায়, আবু সুফ্‌য়ান, আব্বাস, মুগিরা, মারওয়ান ও মুয়াবিয়ারা রাসূল সঃ এর বিচারে কোনো দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য ছিলো না। যোগ্য ছিলো যায়দ ও আম্মাররা।

পারস্য জয়ের পর উমর হয়তো তার সরল বিচারে রাসূল সঃ এর পরীক্ষিত ও প্রিয়পাত্র আম্মারকে বাগদাদে গভর্নর করে পাঠায় এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন্‌ মাস্‌উদকে বিশেষ ইস্‌লামী প্রশিক্ষকরূপে নিয়োগ করে।

ভালো করে বুঝ্‌তে হবে যে রাসূল সঃ এর আবির্ভাব কালে আরবরা, বিশেষ করে হিজায্‌ ও নাজদের বাসিন্দারা তখনকার বিশ্বে দরিদ্রতম ও পশ্চাদপদ ছিলো। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য দুটি উন্নততরো পরাশক্তি ছিলো। সে দু' পরাশক্তির চলাচল ও সাংস্কৃতিক এবং বানিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র বিন্দু ছিলো ইরাকের বাগদাদ।

আরবদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর সে জাতিকে দলে মথে তাদের তাগুতী ধ্যান ধারণা এবং জাহিলিয়্যাত থেকে ধুয়ে মুছে পূনর্জন্মের মতো পবিত্র করার মতো চরিত্র আরবরা রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর সংকীর্ণ আরব জাতীয়তায় প্রত্যাবর্তন করে হারিয়ে ফেলে ছিলো। তার ফলে ইসলামের নামে জয় করা নতুন জাতি গুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা ও রাখা মাদীনায় প্রতিষ্ঠিত নুতন আরবদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিলো। ফলে উমর তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুয়াবিয়া, মুগিরা ও আমর ইব্‌নুল আস্‌দের মতো জাতীয়তাবাদী কুটনীতিকদের সে সমস্ত জায়গায় গভর্ণররূপে নিয়োগ করা আরম্ভ করে। রাসূল সঃ এর তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণে গড়া আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির্‌রা রিসালাত ও নবুওতের মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত মু'মিন। ঈমান ও ইস্‌লাম দ্বারা পরিচালিত সমাজ পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌ তাদের তাঁর নবীকে দিয়ে মানুষ করেছেন। আরবী জুব্বা পরে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের আদলে আরবী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার

জন্য যেমন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে পাঠাননি, তেমনি আল্লাহ্র রাসূল সঃ'ও যায়দ, বেলাল, উসামাহ্ ও আম্মারদের আরবী সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য গড়ে যাননি।

আম্মার ইব্ন্ ইয়াসিরকে বাদ দিয়ে উমর যেমন ইরাকে মুগিরাকে পাঠায়, তদ্রূপ রোমান সাম্রাজ্যের আওতাভূক্ত সিরিয়ায় মুয়াবিয়া এবং ফেরআউনের দেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমর ইব্নুল আস্কে মিশরের গভর্নর নিয়োগ করে। উমর ভিন্ন অর্থে এদেরকে তিরস্কার করে فرعون هذه الأمة অর্থাৎ "এ উম্মতের ফিরআউন" বলে অন্তরে ফেরআউন, ক্বায়সার ও খস্রু হওয়ার বাসনাই জাগিয়েছিলো। পরে "নামকা ওয়াস্তের" ইস্লামী খেলাফত নির্মূল করে এরাই মূল ফেরআউনের "আনা রাব্বুকুমুল্ আ'লার" মতো "আনা ক্বায়সারুল আরব" ও "আনা কিস্রাল আরব" অবশ্যই বলেছিলো। "আমি আরবী সিজার, আমি আরবী খস্রু।"

তৃতীয় ক্বোরেশী ও উমাইয়্যা খলিফা ওস্মানের আমলে মাদীনায় প্রতিষ্ঠিত মক্কার ক্বোরেশী মুহাজিরদের রাজত্বের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূল সঃ যাদের মাদীনাহ্ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তৃতীয় খলিফা শুধু তাদের মাদীনায় এনে পুনর্বাসিতই করেনি, তা'দের এনে প্রধানমন্ত্রীর পদ ও বিভিন্ন জায়গায় সাআদ্ ইব্ন্ আবী ওয়াক্কাসের মতো রাসূল সঃ এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের বরখাস্ত করে গভর্ণর নিযুক্ত করে। তারা নিজ নিজ এলাকায় বসেই ঘোষণা করে ঃ سواد اللامصار بستان لقريش، سواد العراق بستان لقريش

"বিজিত রাজ্যের উর্বর ভূমি ক্বোরেশদের বাগান বাড়ী"। তারা কেউ কেউ রাতভর মদ ও বাঈজীদের আড্ডা করে ফজরের নামাজ নেশার ঘোরে তিন রাকাত পড়ালেও ইমামতি ছাড়েনি। কারণ, ইমামত্ যে ক্বোরেশের! মাত্লামী করলে ঈমান যায়, "ক্বেরেশী" তো আর যায় না!

রাসূলের মাদীনায় এদের দাপটে আম্মার, উসামাহ্, ইব্ন্ মাস্উদ, সালমান ও সালেমরা এমন কোনঠাসা যে, তাদের মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে শক্তি ছিলো, তাও তাদের আর রইলো না। মক্কায় নির্যাতিত হলে রাসূল সঃ তাদের আশ্রয় ও ভরসার স্থল ছিলেন। এখানে উপরে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের আর কেউ রইলো না। খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন নবী সঃ কে জান, মাল ও ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে যারা আশ্রয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলো, সে মাদিনাহ্বাসিদেরও নিরুপায় হয়ে মোহাজেরদের কান্ড দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিলো না।

মক্কাহ্ ও মাদীনার বাইরে ক্বোরেশী রাজপুত্রদের অত্যাচারের ইতিহাস পড়লে বর্গীর শাসনের কথা মনে আসে। তাদের ভোগবিলাসের যোগান দিতে মানুষের উপর এমন কর ও জিয্ইয়্যা আরোপ করা হয়, যা আদায় করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

মুশ্রিক ক্বোরেশী রক্তে জন্ম নেয়া মুহাম্মাদকে আল্লাহ্ শৈশবে পিতৃমাতৃ হারা করে তাঁর বিশেষভাবে পাঠানো পালিকা মাতা বারাকাহ্কে দিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছর লালন করে পবিত্র করেছেন ও পরে নবী বানিয়েছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর হাতে গড়া বিশেষ দল বেলাল, আম্মার ইব্ন্ ইয়াসির, ইব্ন মাসউদ ও সালমানদের এমন দুর্দিন আসলো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ আকড়ে ধরে তা প্রচার করার পাপে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদকে মস্জিদে নববীর চত্বরে পায়ের নীচে পিষ্ট করে বুক ও পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে হত্যা করা হয়। নবী সঃ এর সাক্ষ্য অনুযায়ী "ধরা পৃষ্ঠের সবচেয়ে বড় সত্যবাদী" আবু যারকে সত্য বলার অপরাধে অত্যাচার করে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং নবী সঃ কর্তৃক নির্বাসিতদের ফেরৎ এনে ক্ষমতায় বসানো হয়। ইসলামের প্রথম শহীদ পিতামাতার সন্তান আম্মার ইব্ন্ ইয়াসিরকে পিটিয়ে আধমরা করে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। যেমন একদা মক্কায় তাঁকে ও তাঁর পিতা-মাতাকে আবু জেহ্লরা করেছিলো। এরপর আর ইসলামের ও রাসূল সঃ এর রইলো কী? ইসলামের পর ইসলামের নামে চালানো ক্বোরেশদের কুফরী দেখে বারাকাহ্ ও যায়দের শেষ স্মৃতি চিহ্ন রাসূল সঃ এর "হাবীব ইব্নুল হাবীব" উসামাহ্ও হারিয়ে গেলো।

ক্বোরেশী ও বনি হাশিমের হয়েও নবী সঃ এর নবুওতী শিক্ষার 'সিংহদ্বার' হওয়া আলীর কোনো স্থানই রইলো না। রাসূল সঃ এর নাতি হাসান হোসেনও তখন আর কেউ নয়। ইরাক মিশর ও সিরিয়ায় অমুস্লিমদের মতো অক্বোরেশী অ-আরব নবদিক্ষিত মুসলমানদের উপরও জিয্ইয়্যা ধার্য্য করা হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তারা জিয্ইয়্যা দিতে অস্বীকার করলে রাতে আগুন দিয়ে তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হতো, আর তারা "ওয়া মুহাম্মাদা ওয়া মুহাম্মাদা" হায় মুহাম্মাদ, হায় মুহাম্মাদ, বলে ফরিয়াদ করতো। কিন্তু ক্বোরেশী উমাইয়্যা পাষন্ডদের তাতে দয়া না হয়ে আনন্দই হতো। কারণ, তারা যে মুহাম্মাদ সঃ এর উম্মত ধ্বংস করে আরবী উম্মতের স্রষ্টা! আরবী সাম্রাজ্যের রাজা ও

যুবরাজ!

আবু সুফ্‌য়ানের বংশধরদের রাজত্বের অন্ধকার যুগে উমর ইব্‌ন্ আবদুল আযীয এসে কুফরের অমানিশায় এক পূর্নিমার ঝলক দেখিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র সে "গোবরে পদ্মফুল" সাফ্ সাফ্ উমাইয়্যা রাজত্বকে কুফরী বলে ঘোষণা করে নবী সঃ এর আদর্শকে দু'বছর পাঁচ মাসের জন্য পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করে যায়। সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে ঃ بعث الله محمدهاديا ولم يبعث جابيا

"আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সঃকে পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন, করারোপ ও কর উসুলকারীরূপে পাঠাননি।" তার আমলে কেউ উমাইয়্যা রাজাদের "আমীরুল্ মোমেনীন" বললে সে তাকে বিশটি চাবুক মারার আদেশ দেয়। তার সময়ে মুস্‌লিম সমাজে এমন সুদিন আসে যে গোটা দেশ খুঁজেও যাকাত সাদ্‌কা গ্রহণ করার মতো কোনো দরিদ্র পাওয়া যেতো না। রাজ্যময় ঘোষণা করে দেয়া হয়, "যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হবে তাদের যাকাত ও খুমস্ ছাড়া অন্য কোনো কর দিতে হবে না"। ফলে লাখে লাখে লোক ইসলাম গ্রহণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত, ওশর ও খুম্‌স্ দিয়ে বাইতুলমাল ভাসিয়ে দেয়। এখনো তা' করলে বাংলাদেশের মতো ভিক্ষুক দেশও প্রাচুর্য্যের স্বর্গের রূপ নিবে।

ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফ্‌য়ানের বংশধরদের আল্লাহ্ আব্বাসের বংশধর দিয়ে এমন ভাবে নির্মূল করেন যে, আব্বাসীরা উমাইয়াদের ক্বর খুঁড়ে তাদের হাড়গোড় জ্বালিয়ে দেয়।

আবার আব্বাসীদের চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানকে দিয়ে আল্লাহ্ হালাক ও নিশ্চিহ্ন করে দেন। তাদের প্রেতাত্মা চেঙ্গিস্ খানের বংশধরদের ঘাড়ে ভর করে ইসলামের নামে ভারতবর্ষে মোঘল নাম ধারণ করে আটশ বছর লুটতরাজ করে নিঃশেষ হয়েছে। এখন আরব নামে যে প্রাণীগুলো নিজেদের মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্রের হাতে বিকিয়ে দিয়েছে, ওদের মুক্তির সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে। বিশ্বময় মুস্‌লিম নামধারী দেশগুলোতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনকারীদের সংগ্রামীদল রয়েছে, এরা কেউ ইব্রাহীম খলীলূল্লাহ্‌র ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃদের অনুসারী, ইস্‌লাম ও ঈমানের জাত বা জাতি নয়। এরা সবাই ইব্রাহীম খলীলের পরিবর্তে আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রের উম্মত। এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের নামে প্রতারক বিধায়, মিশরে, আলজেরিয়ায়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও তুরস্কে নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে।

ইসলাম ইব্রাহীম নবী ও মুহাম্মাদ নবী সঃদের পথ ও মত। ইরাক্বী ইব্রাহীম ও ক্বোরেশী মুহাম্মাদদের দ্বীন নয়। বংশ, বর্ণ, ভৌগোলিক সীমা রেখাকে মুছে এক আল্লাহ্‌র তাওহীদের উপর "সিবগাতুল্লাহ" আল্লাহ্‌র এক রঙ্গের উপর, এক মানব জাতি গড়ার জামাত ইসলাম। জামাত একমনা ইমাম, হানীফ্ ইব্রাহীমীদের পেছনে "সীসা ঢালাই" ঐক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্‌লামে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয় ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী বিভক্ত পেশাদার ও সাম্প্রদায়িক ইমামদের পেছনে সালাত হয় না। ইসলামে বিভিন্ন গোত্রের নামে তৈরী মসজিদ, যেমন ক্বোরেশী কা'বাহ্, উমাইয়া মসজিদ ও আব্বাসী মসজিদে সালাত হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ, গোত্র বিশেষ ও বর্ণ বিশেষের নামে প্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদ, আল্লাহ্‌র ঘর মস্‌জিদ নয়। এগুলো "মসজিদে দেরার" বা ক্ষতিকর বিভক্তি, ফেরক্বা, কুফর, শির্ক্ ও মুনাফিক্বদের, ইসলাম ও, মুস্‌লিমদের বিরুদ্ধে ভাঙ্গন সৃষ্টি, গুপ্তচর বৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের আড্ডা। যেমন রাসূল সঃ এর জীবনের শেষ বছরে মাদীনায় এক মসজিদ নামের আড্ডা তৈরী হয়েছিলো। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হুকুম করে তা মাটির সাথে গুড়য়ে দিয়েছিলেন।

ইসলামে মুস্‌লিম জাতির মাত্র একজন ইমাম হয়। বাকী সকল ইমামরা সে ইমামের নিয়োগকৃত তার "নায়েবীন" মাত্র। সে ইমামদের পেছনে, তাদের পূর্ণ নেতৃত্বে, যেখানে, যখন যে দেশে নামাজ ও সমাজ চলে, সে দেশ, সে সমাজ এবং সে যুগই একমাত্র ইসলামী দেশ, ইসলামী সমাজ এবং ইস্‌লামী যুগ। যে সমাজে, যে দেশে, এবং যে যুগে, সমাজের কথা মতো ইমাম নিয়োগ ও নামাজ পড়া হয়, সে সমাজই কাফেরী সমাজ, তাদের দ্বীনই শির্‌ক এবং তাদের নামাজই দেবদেবীর পূজা।

মক্কায়, মস্‌জিদ, ইমাম, নামাজ ও জামাত সবই ছিলো। উপরে বর্ণিত ইব্রাহীম খলীল আঃ এর ইমামত ছিলোনা। তাই আল্লাহ্ ক্বোরেশী মুহাম্মাদকে মক্কার সকল শির্ক ও কুফ্‌র্ থেকে মুক্ত করার জন্য বারাকাহ্‌কে দিয়ে পালন করে পাক করে রিসালাত দান করেন। রিসালাত দান করেই মক্কায় প্রচলিত নামাজ ও তার জামাত থেকে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের আলাদা করেন। মক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরতের মাধ্যমে শির্কমুক্ত একক ইমামের পেছনে সামাজিক নেতৃত্ব দানের কাঠামো দাঁড় করে তারপর জামাত ও নামাজের পুনঃ প্রচলন করা হয়। এ নামাজই ইসলামের নামাজ। আজ যে

দেশে দেশে অলিতে গলিতে হাযার হাযার নয়, লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মসজিদে রয়েছে, রয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ পেশাদার সাম্প্রদায়িক ও গোত্রীয় ইমাম নামক সমাজপতিদের চাকর ও ভৃত্যরা, এরা কেউ ইমাম নয়, এদের ঘরগুলো মসজিদ নয় এবং এতে জড়ো হয়ে যা করা হয়, তা নামাজ নয়। তা আল্লাহ্‌র ভাষায় "মুকাআঁও ওয়াতাস্ দিয়াহ" আড্ডা ও তামাশা।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً (সুরা আন্‌ফাল-৩৫)

১। "মস্‌জিদ্ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ঘর, তাতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কর্তৃত্ব চলবেনা। সেখানে অন্য কারো আনুগত্যে ইবাদত করা চলবেনা।" وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (সুরা জিন্‌ন্- ১৮)

২। ইমাম মাত্র একজন হবে। তার পরিচয়ে সকল ঈমানদেরকে ক্বেয়ামতের দিন ডেকে সত্যায়িত করা হবে। সে দিন প্রত্যেক জনগোষ্ঠীদের তাদের একক ইমামের পরিচয়ে ডাকা হবে। يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (সুরা বনী ইস্‌রাঈল- ৭১)

এ এক কেন্দ্রীয় মস্‌জিদ, কা'বাকে কেন্দ্র করে এক ও একক ইমামের হাতে বায়আত হয়ে নামাজ ক্বায়েমই ইসলাম। সে সালাত বা নামাজকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জামাতের ইমাম একক তিনি, তাঁর জামাতের আযান ও ইক্বামত দানকারী বেলাল অক্বোরেশী আরব, তাঁর জামাতের প্রথম কাতার যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান, ইব্‌ন্ মাসউদ, সালেম, সাওবান ও উসামাহ্‌রা। তারাও সবাই বর্ণবাদী আরবদের হাতে নির্যাতিত আরবী ভাষা-ভাষী আরব ছিলো। বর্তমান নির্যাতিত আরব জনসাধারণ তাদের বংশধর, মজলুম উত্তরাধিকারী।

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর এরা বর্ণ ও গোত্রবাদীদের দ্বারা নামাজ ও সমাজের নেতৃত্ব থেকে উৎখাত হয়েছে। তাদের রাজশক্তি ছিলো না। ঈমানী ও রুহানী শক্তি রাসূল সঃ এর মতো খাঁটি ছিলো। গোত্রবাদীরা রাজ শক্তি ছিন্‌তাই করে ঈমানী ও রুহানী শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বলা চলে যে এরা মুর্তাদ্ হয়ে যায়।

আজ আরব বিশ্বে সে গোত্রীয় বর্ণবাদের প্রেতাত্মাদের হাতে শাসন ক্ষমতা। কিন্তু তাদের ভাগ্য সম্পূর্ণ রূপে আব্রাহাম লিঙ্কনের অনুসারী দাজ্জালদের পদতলে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলেও এদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে খুব কম। বন্দুকের সাহায্যে এরা বর্তমানে টিকে থেকে এদের শেষ দিন গুনছে। ওদের স্বৈর শাসনে পিষ্ট জনগণের শতকরা ৮০% জনই যায়দ, বেলাল, আম্মার, উসামাহ্‌দের উত্তর পুরুষ, নির্যাতিত, "মুস্তাদ্‌আফীন"। এদের রুহানী সম্পদ চাপাপড়া। তবে অনুক্ষণ আগ্নেয়গিরির মতো ভিতরে ভিতরে পাক্‌ছে। উদ্‌গিরণের সময় সন্নিকট। মিল্লাতে ইব্রাহীমের মুহাম্মাদী ইমামতের অপেক্ষায় এদের বিস্ফোরণ। আলে সঊদ, আলে সাবাহ্, আলে সাদ্দাম ও আলে হুসনি মুবারকদের শাসনাধীন আরব সমাজ, আলে ইয়াহুদ ও নাসারদের পশ্চিমা মানবতাবাদী মূল্যবোধও বর্জিত। ওদের সমাজে মুসলমানরা তৃতীয় শ্রেণীর প্রাণী। সমমানের চাকুরীতে অ-আরব মুসলমান হলে তার বেতন এক হাজার ডলার, আরব হলে তিন হাজার ডলার, আর ইউরোপ আমেরিকান হলে তার বেতন দশ হাজার ডলার। কিন্তু এ ইউরোপ আমেরিকানদের কেউ ইস্‌লাম গ্রহণ করে মুসলমান হলেই তার বেতন কমে এক দু'হাজার ডলারে নেমে আসে। এ কি কোনো মানব সভ্যতার দেশ?

এ তো রাসূল সঃ এর আবির্ভাবের সময়ে বেলাল, আম্মার ও যায়দদের অবস্থান সাদৃশ্য! ওদের এ নিয়মের অধীনে মক্কাহ্ ও মদীনায় কী ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃদের হজ্জ, ঈদ ও জামাত হয়? তাঁদের হজ্জ ও জামাতের প্রথম ও শেষ শর্ত হলো, "সে মাটিতে মুস্‌লিমরা সব সমান অধিকারী হতে হবে। যারা সেখানকার বাসিন্দা, যারা বহিরাগত সবাই সমান"। ইব্রাহীম খলীল আঃ কে দিয়ে আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়েছেন, سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ "বাসিন্দা ও প্রবাসী সবাই সমান।" শেষ নবী সঃ কে দিয়ে আল্লাহ্ তার আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, বিশ্ববাসীরা পরস্পর চিরুনীর কাটার মতো সমান। সোজা। কোনো আঁকাবাঁকা নেই। ক্বোরেশী মুশরিক ও মুশ্‌রিকাহ্ আব্দুল্লাহ্ ও আমিনার ছেলে মুহাম্মাদ বারাকাহ্‌র প্রতিপালনে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব আল্ রুমী, সালমান আল্ ফারসী ও আবু যারদের সাথে যেমন এক হয়েছিলেন।

রোমান সুহাইব্ আল্ রুমী মক্কায় তার নিজ গুনে ব্যবসা করে বিত্তশালী হয়। বাপ দাদা খৃষ্টান ছিলো বিধায় আহ্‌লে

কিতাব্ ছিলো। তাওরাত ও বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আবির্ভাব হলে সুহাইব ইসলাম গ্রহণ করে। যেমন বেলাল ও আম্মাররা করেছিলো। মক্কার ক্বোরেশী ইমাম আবু জেহ্ল সুহাইবকে বন্দী করে বলেছিলো "তুমি রোমান ক্রীতদাস ছিলে। আমার দেশ মক্কায় এসে ধনী হয়েছো। আরবী ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছো। অতএব, আমাদের সম্পদ নিয়ে মুস্লিম হতে পারবেনা। সম্পদ রাখতে হলে ইস্লাম ত্যাগ করতে হবে।"

সুহাইব সকল সম্পদ ত্যাগ করে কপর্দকহীন হয়ে হিজরত করে মাদীনাহ্ গিয়ে রাসূল সঃ এর সাথে মিলিত হয়। তাই, ইস্লাম মক্কাবাসীদের বা আরবদের ধর্ম নয়। মুহাম্মাদ সঃ আরবী নবী নন। তাঁর ধর্ম আরবী নয়। তাঁর অনুসারীরা কেউ আরব বা আরবী ছিলোনা। সবাই বিশ্বজনীন মুস্লিম ছিলো। মুস্লিম হলে কেউ আর আরবী, আফ্রিকী, হিন্দি ও ইউরোপীয় থাকেনা।

নবী সঃ এর মৃত্যুর পর ক্রমে যে ক্বোরেশী ও আরবী ধর্মের প্রবর্তন হয়, তা সম্পূর্ণ ইসলাম বহির্ভূত এক নতুন ফিৎনা। বর্তমানের সাউদী, ইরাক্বী, কুয়েতী, আমীরাতী, মিশরী, সিরিয়ান ও লিবিয়ান গংরা মুস্লিম নয়। এরা আরবী মুশরিক ও কাফের। এদের আদর্শ আবু জেহ্ল, আবু তালিব, আবু সুফ্ইয়ান ও আব্বাসরা। ইব্রাহীম, মূসা ও মুহাম্মাদ সঃ রা নন। এদের দেশে মুসলিমরা বিদেশী, "আজ্নবী।" অর্থাৎ "ফরেনার"। অথচ মুস্লিমরা পরস্পর এক মায়ের পেটের ভাই। ভাই কি ভাইর বাড়ীতে বিদেশী হয়? কখনো হয় না।

বর্তমান আরবরা, বিশেষ করে শাসক শ্রেণী ও তাদের সমর্থকরা নিঃসন্দেহে আবু জেহেলের ধর্মাবলম্বী। সুহাইবদের মতো যারা আরবী ও ক্বোরেশী জাতীয়তাবাদ ত্যাগকারী মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীম সঃদের অনুসারী, আরব বিশ্বে একমাত্র তারা মুস্লিম।

নবী সঃ এর জন্ম উপলক্ষে প্রত্যেক বছর, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদের নামে অনুষ্ঠানাদী হয়, সীরাত সভা হয়। মোল্লারা মিলাদ পড়ে বিরিয়ানী মিষ্টি খায়।

ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা ও ধর্মবেসাতী মুসলমান নামধারীরা তাদের অজ্ঞতা ও মুর্খতার ফলে বিশ্বনবী সঃকে আরবী আব্দুল্লাহ্ ও আমিনার পুত্র হিসেবে হাশেমী, ক্বোরেশী ও আরবী নবীরূপে গান-গীত গেয়ে মিলাদ পড়ে। এখন তাদের বুঝতে হবে, এবং বুঝাতে হবে যে হাশেম ৩৬০ মূর্তির মন্দিরের ঠাকুর ছিলো। ক্বোরেশরা, সারা আরব বিশ্বের ধর্মীয় মোল্লা ছিলো এবং আরবদের ধর্ম কুফর, শির্ক ও মুনাফেক্বী ছিলো। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এসে বনী হাশেমের ঠাকুরগিরি, ক্বোরেশদের ধর্মব্যবসা এবং আরবদের কুফ্র ও শিরক নির্মূল করে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তির ধর্ম ইসলামকে পূর্ণ করে গিয়েছেন। তাঁর আদর্শ হাব্শী বেলাল, রোমান সুহাইব, ফার্সী সাল্মান, ইয়ামেনী আম্মার, আরবী আবু যার ও মাদানী আরবী আনসারদের একত্র ও অভিন্ন করে মক্কা বিজয় করে, কাবাহ্কে মূর্তিমুক্ত করে ও মক্কাবাসীকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর আসল মা বারাকাহ্, তাঁর আসল স্ত্রী খাদিজাহ্, তাঁর ঘরের মানুষ যায়দ ও উসামাহ্ এবং তার নিঃস্বার্থ অনুসারী বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান, আবু যার, আবু দারদা, ইব্ন্ মাসউদ, সালেম, সাওবান, প্রভৃতি, এবং ক্বোরেশীদের মধ্যে সৌভাগ্যবান আবু বকর ও উমরদের মতো গুটি কয়েকজন, যারা রাসূল সঃ এর আহ্বানে ইস্লামের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখার পূর্বেই তাঁর সঙ্গী হয়েছিলো। বাকীরা যারা বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে যোগ দিয়ে ছিলো, তারাই নবী সঃ এর বিদায়ের পর ইসলামের নামে গোত্রীয় সমাজ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। উমাইয়া, আব্বাসী, তুর্কী, মুঘল, পাঠান, সাইয়েদ ও বর্তমান পাকিস্তানী, বাংগালী, সাউদী ও আরবীরা ওদেরই ধর্মাবলম্বী উম্মত।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ কর্তৃক পুনঃপ্রবর্তিত মিল্লাতে ইব্রাহীমের সাথে এদের অতটুকুই সম্পর্ক, যতটুকু ইব্রাহীম আঃ এর নম্রুদের সাথে এবং মুহাম্মাদ সঃ এর আবু লাহ্ব্ ও আবু জেহ্লদের সাথে ছিলো। মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবীর অনুষ্ঠানাদি দ্বারা অনতিবিলম্বে রাসূল সঃ এর সত্যিকারের জীবন, তাঁর আদর্শ ও তার সত্যিকারের অনুসারী, নির্যাতিতদের জীবনী তুলে ধরতে হবে। তবেই মিলাদ ও সীরাত সার্থক হবে।

প্রায়শঃ পত্র পত্রিকায় দেখা যায় যে, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া প্রফেসররা ইস্লাম ও নবী সঃ সম্পর্কে বিরূপ উক্তি করে থাকে, এবং মৌলভী মোল্লারা তাদের কাফের ও মুর্তাদ বলে আখ্যায়ীত করে বিবৃতি দেয়। আসলে কি কেউ একটিবার ভেবে দেখেছে যে মূল ব্যাপার কি? কোনো ঈমানদার ব্যক্তিবিশেষ ইসলামের মূলনীতি বিরোধী

উক্তি করলে, বা কাজ করলেই কাফের বা মুর্তাদ হয়। কিন্তু যারা কোনো কালেই আদৌ ঈমানদার ছিলোনা, তারা ইস্‌লাম বিরোধী কথা বল্‌লে নুতন করে কিভাবে কাফের হয়? এ প্রফেসর ও বুদ্ধিজীবীদের পূর্ব পুরুষরা অধিকাংশ নমশুদ্র ছিলো। ব্রাহ্মণদের গরুচুরি করে খেয়ে ওরা "মোচলমান" হয়েছিলো। হারামখোর নিকাহ রেজিষ্ট্রাররা এদের মা বাপকে পয়সার বিনিময়ে ধর্মের নামে একত্রে থাকার কাগজ "কাবিন নামা" তৈরী করে দিয়েছে। এদের বাপদাদারা কোনো মোহ্‌রানাও আদায় করেনি। কাজীরা ঈমানদার হলে এদের বিবাহও পড়াতো না। কারণ, কোনো ঈমানদার ব্যক্তি বর ও কনে খাঁটি ঈমানদার না হলে তাদের বিয়েতে সাক্ষীও হতে পারে না। কোনো ঈমানদার বর যেমন বেঈমান কনের জন্য অবৈধ, তেমনি ঈমানদার কনে বেঈমান বরের জন্য হারাম। আল্ ক্বোরআনে স্পষ্ট করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

এরা ওদের জন্য বৈধ নয়, ওরাও এদের জন্য বৈধ নয়। (সূরা মুম্‌তাহিনা-১০) কাজী নামের পেশাদার লোকেরা বর্তমানে মূলতঃ পয়সার বিনিময়ে ধর্মের নামে নরনারীর ব্যভিচারের লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। তাদের এ লাইসেন্সের ফসলই ঐ সমস্ত মুসলমান নামধারী বুদ্ধিজীবী ও প্রফেসর। তাদের নুতন করে কাফের বা মুর্তাদ হওয়ার সুযোগ কোথায়!

তা ছাড়া এ সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সত্যিকারের ইসলাম ও তার নবী সঃ সম্পর্কে সঠিক জানার সুযোগ কোথায়? ইস্‌লামের ইতিহাস বল্‌তে আরব ও মুসলমান নামধারী মধ্যযুগীয় বর্বর স্বৈরাচারী রাজা বাদশাহ্‌দের কুকীর্তির বর্ণনা বুঝায়। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ইস্‌লামী ইতিহাস পড়ে ও পড়ায়, ওরা নাস্তিক হতে বাধ্য। তাইতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্‌লামের ইতিহাস বিভাগকে নাস্তিক তৈরীর কারখানা বলা হয়। খৃষ্টান বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রতিষ্ঠিত আবর্জনার "ডাষ্টবিন" এ বিশ্ববিদ্যালয়। ওদের কেরানী ও খানসামা তৈরীর জন্য ওরা এগুলো দাঁড় করিয়েছিলো। ওরা যেহেতু খৃষ্ট থেকে খৃষ্টান, তাই মুহাম্মাদ সঃ এর অনুসারীদের "মোহামেডান" রূপে চিহ্নিত করা তাদের প্রয়োজন ছিলো, তাই তারা করেছে।

পরে বিকৃত আরব, তুর্কী, মুঘল ও পাঠানদের শাসন শোষনকে "ইসলামী ইতিহাস" নাম দিয়ে ইস্‌লামকে অবমাননা করার চক্রান্ত চরিতার্থ করেছে। মুসলমান নামধারী এ দুর্বৃত্তদের ক্রিয়াকলাপ যদি ইস্‌লামের ইতিহাস হয়, তাহলে ইয়োরোপের খৃষ্টান রাজা মহারাজাদের কীর্তিকলাপ কেনো History of Christianity বা "খৃষ্টানদের ইতিহাস" নামে অভিহিত হবেনা?

নমশুদ্র থেকে মুসলমান হওয়া, বিনা মোহ্‌রানায় মিথ্যা পরিচয়ে কাজী নামের মোল্লার চক্রান্তে জন্ম নেয়া এবং ইংরেজ উপনিবেশবাদের কেরানী খানসামার ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রফেসর ও বুদ্ধিজীবীরা ইস্‌লাম ও তার নবীদের সম্পর্কে কটুক্তি করবেনা তো করবে কী? এরা এদের বাপদাদাদের যে ভাষায় স্মরণ করে তার কী কেউ খবর রাখে? অথচ এরাই "সায়েব্" হওয়ার জন্য ইউরোপ আমেরিকা গিয়ে যখন ডিস্‌ওয়াশার, চাইল্ড সীটার এবং নাইট ক্লাব ও বেশ্যালয়ে বয় বেয়ারার কাজ করে, তখন তাদের মুসলমানিত্ব জেগে উঠে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের মর্যাদা পেয়ে এ ধরনের মুসলমানেরা অধুনা যে ইউরোপ আমেরিকায় মুসলিম কম্যুনিটি হিসেবে গড়ে উঠছে, এরা আরবদের মতোই ইস্‌লামের জন্য "ব্যাডনেম" বা দুর্নাম।

কথিত উন্নত বিশ্বে মানব মূল্যের যে ধস্ নেমেছে, এবং তাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তা যেভাবে মহামারীর মতো বিশ্বে ছড়াচ্ছে, এ সন্ধিক্ষণে যদি ইউরোপ আমেরিকায় প্রবাসী মুসলিমরা আরবী ইস্‌লাম বাদ দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর আদর্শের ইসলাম উপস্থাপন করতে সক্ষম হতো, তা হ'লে বিশ্বে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হতো। ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী, আরবী, শিয়া ও সুন্নীতে বিভক্ত মুসলমানিত্বের যে ইসলাম ঐ সমস্ত দেশে প্রচারিত হচ্ছে, সে "লাবড়া" ইসলামেও পশ্চিমা দেউলিয়া দেশের লোকেরা প্রবেশ করে শান্তির সন্ধান করছে।

চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে রাসূল সঃ যে ঢেউ তুলে গিয়েছেন, সে ঢেউই তার শক্তি ও গতি হারানো সত্বেও মুস্‌লিম নামধারী অকৃতজ্ঞ জাতিকে আজো বয়ে বেড়াচ্ছে। এখন গোড়ায় এসে নুতন শক্তিতে বলিয়ান নুতন ঢেউ তুলতে হবে। পুরাতন ঢেউ আর্বজনার ভারে অচল। মুস্‌লিম বিশ্ব ও অমুস্‌লিম বিশ্বের নির্যাতিত ও দিশাহারা মানুষেরা আজ নির্বিশেষে মুক্তির পথ খুঁজছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর আদর্শে কোনো এক বিন্দু থেকে ডাক পড়লেই কোটি কোটি যায়দ, বেলাল, আম্মার,

সুহাইব, ইব্‌ন মাসউদ্‌ ও সালমানরা নূহের প্লাবনের ন্যায় মুক্তির প্রলয় সৃষ্টি করবে। বর্তমান যুগের আবু জেহ্‌ল্‌, আবু লাহাব্‌ ও আবু সুফ্‌য়ানরা ইসলামের গতি ও উত্থানের পথে বাধা হয়ে আছে বলে আজো সে তুফান শুরু হচ্ছে না। বংশ, গোত্র, বর্ণ ও জাতীয়তায় বিভক্ত জাতিই জাহেল। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা থেকে ডক্টর, প্রফেসর, মাওলানা ও মুহাদ্দেস্‌ হয়েও জাহেল। স্রষ্টা আল্লাহ্‌র শেখানো জ্ঞানই প্রকৃত শিক্ষা। ঈমানহীন সৃষ্টির অভিজ্ঞতা প্রসূত সকল শিক্ষা মুর্খতা ও অন্ধত্ব। জাহেল জাতি কখনো মুস্‌লিম হতে পারে না। রাসূল সঃ এর প্রিয় সাথী আবু যার কথায় কথায় একবার বেলালকে "কালো" বলায় তা শুনেই রাসূল সঃ বলেন, "ইন্নাকা আম্‌রুউন্‌ ফীকা জাহিলিয়্যাহ্‌" আবু যার তোমার মধ্যে এখনো "জাহিলিয়্যাত" বিদ্যমান। তারপর থেকে আবু যার বেলালকে "ইয়া সাইয়্যেদী" আমার সাইয়্যেদ্‌ বলে ডাকতো।

বর্ণ, গোত্র, ভাষা, আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তার অভিশাপ মুছে ফেলে সকল আদম সন্তান, মানব জাতিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ভিত্তিতে এক ও অভিন্ন করার জন্য প্রেরীত নবীকে যারা আরব, ক্বোরেশী, হাশেমী ও সাইয়েদ প্রভৃতিতে বিভক্ত করে মিলাদ ও সীরাত মাহ্‌ফিল করে ভোটের রাজনীতি করছে, তারা সবাই জাহিলিয়্যাতে নিমজ্জিত। চাই তারা ধর্মের দাবীদার হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক হোক।

বিশ্বে ইব্‌লিসের উম্মাতেরা যে ইউরোপীয়ান ঐক্য সংস্থা, জি-৭, সার্ক, আসিয়ান, ও.এ.ইউ. এবং ডি-৮ প্রভৃতি করে, রক্ত, মাংস, লোভ ও যৌন বিকৃতিতে ইতর পর্যায়ে ডোবা নরনারীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে, তা' কখনো সফলকাম হবে না। ইব্‌লিসী যৌন জ্বালায় নগ্ন নারীর মাংস নিয়ে লম্পট পুরুষদের কসাইর দোকান, হোটেল ব্যবসা, পর্যটনশিল্প, জুয়ার আড্ডা, পানশালা ও বেশ্যালয়েরই তাতে প্রসার লাভ হবে। মানবতার কোনো মুক্তিপথ তাতে উম্মোচিত হবে না। বিশ্বামানবের এক, একমাত্র পথ বারাকাহ্‌ কর্তৃক আল্লাহ্‌র পালিত মুহাম্মাদুর রাসূল, রাহ্‌মাতুল্‌লিল্‌ আলামীনের প্রদর্শিত বিপ্লব, যে পথ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আঃ দের বিপ্লব।

তাঁর বিপ্লবাদর্শে পুরুষদের আদর্শ যেমন যায়দ ও বেলালরা আদর্শ ও আত্মসমর্পনকারী, তদ্‌রূপ, নারীদের জন্য আদর্শ, কৃষ্ণাঙ্গী হাজেরা, বারাকাহ্‌ ও ক্বোরেশী খাদিজাহ্‌। তাদের ঈমান ও ইস্‌লামে কোনো পার্থিব চাওয়া পাওয়া ছিলো না। আবু বকর ও উমরদের মাঝে ক্বোরেশী অক্বোরেশী ও মুহাজির আনসারের শাব্দিক হলেও বিভক্তি ছিলো। মা আয়েশা ও বিবি ফাতেমার মাঝে নবী সঃ এর প্রথমা স্ত্রী বিবি খাজিদার স্মৃতি, প্রিয়তমা কন্যা ও মায়ের সতীন, আদরনীয়া স্ত্রী মা আয়েশার সাধারণ নারী সুলভ সীমাবদ্ধতার টানা পোড়ন ছিলো। মৌলিক দ্বীনী কোনো বিবাদ ছিলোনা। বারাকাহ্‌ ও বিবি খাদিজাহ তাদের এ সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ধর্মীয় আদর্শের সীমার বাইরে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কখনো নবী রাসূলদের স্ত্রী দেরও বহুক্ষেত্রে সাধারণ নারীদের পর্যায়ে নিয়ে আস্‌তে দেখা যায়। বলা হয়, মা সারার ঈর্ষায় সাইয়্যেদুনা ইব্রাহীম আঃ কেও মা হাজেরাকে মক্কায় স্থানান্তরিত করতে হয়েছিলো। নবী ইস্‌হাক্ব আঃ এর স্ত্রীর চক্রান্তে তাঁর যোগ্য ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়তে হয়েছে। নবী ইয়াকুব্‌ আঃ কেও তার স্ত্রীরা নারীদের বিবাদের গঞ্জনা থেকে রেহাই দেয়নি।

রাজনৈতিক ময়দানে রাজা বাদশা ও শাসকদের স্ত্রী কন্যাদের মাঝে, মা ও কন্যাদের মধ্যেও এরূপ ঘটে। পাকিস্তানে মা-মেয়ে নুসরাত্‌ ও বেনজীরের বিবাদ, ও বাংলাদেশে হাসিনা-খালেদার বিরোধ তার জীবন্ত প্রমাণ। এ দু'জনের মধ্যে কোনো ধর্মীয় আদর্শিক ও গুণগত পার্থক্য নেই। তারা দুই পার্থিব রাজনীতির নায়ক মুজিব ও জিয়ার কন্যা ও স্ত্রী । তাদের দু'জনের পারিবারিক উচ্চাভিলাষকে পুঁজি করে তাদের সামনে রেখে দেশের ধূর্ত ও চালাক স্বার্থান্বেষীরা জাতিকে বিভক্ত করে পালাক্রমে লুট্‌ছে মাত্র।

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর আরব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাঁর আদর্শকে দু'টুকরা করে সুন্নী ও শিয়া হয়ে যায়। তাদের এ বিভক্তিকে দু'মেরুতে নিয়ে যেতে তারা মা আয়েশা ও বিবি ফাতেমাকে, বা তাদের নামকে ব্যবহার করেছে। সুন্নীরা মা আয়েশাকে ভাগ করে নিয়ে মুহাদ্দিস, ফকীহ্‌ ও আরো বিশেষণ লাগিয়ে তার হাদীস্‌ দিয়ে ভরে ফেলেছে। অপর দিকে শিয়ারা বিবি ফাতেমাকে নিয়ে পুঁজি বানিয়েছে। সুন্নীদের মাঝে বিবি ফাতিমার কোনো হাদীস নেই বললেই চলে। শিয়াদের মধ্যে মা আয়েশার কোনো রেওয়ায়েত নেই। এ কতো দুঃখজনক নির্লজ্জ ব্যাপার!

অথচ, আরবরা ইস্‌লাম ত্যাগ করে বিভক্তির পথে না গেলে, তারা মুস্‌লিম নারী সমাজের জন্য বারাকাহ্‌ ও মা খাদিজাকে তুলে ধরতে পারতো! তাদের মধ্যে তা সুঁচাগ্র পরিমাণও বিরোধ পাওয়া যায় নি! যেমন বেলাল, যায়দ,

আম্মার ও উসামাহ্দের মাঝে ছিলো না।

অদুর ভবিষ্যতের বিশ্ব বিপ্লবে নারী আদর্শ স্থাপনের জন্য আমাদের আদর্শ বারাকাহ্, খাদিজাহ্, আসিয়াহ্ ও বিবি মারইয়ামরা। আয়েশা ও ফাতেমা থেকে আমরা তাদের সীমাবদ্ধতার শিক্ষা নেবো। দ্বন্ধ ও বিরোধের নয়। আল্লাহ্ তাদের সবার উপরে রাজী ও সন্তুষ্ট হোন।

আল্লাহ্ তা'আলা যেমন সম্পূর্ণ, তার দ্বীনও তেমন সম্পূর্ণ। তেমনি তাঁর আখেরী নবী সঃ কে প্রেরণ করে ইসলামকে ১০০% পূর্ণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে যতো ভুল ধারণা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তম্মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক হলো, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ আয়াতের ভ্রান্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে সত্যদ্বীন ও সঠিক পথ দিয়ে পাঠিয়েছেন, রাসূলকে সম্পূর্ণ দ্বীনের উপর উদ্ভাসিত করতে।" অন্যান্য ধর্ম সমূহের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য মোটেও নয়। কারণ, আল্লাহ্র কাছে "অন্যান্য দ্বীন" নেই। তাঁর কাছে দ্বীন মাত্র একটি। إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ তিনি এক। তাঁর ধর্মও এক, অভিন্ন। আদম আঃ থেকে মুহাম্মাদ সঃ পর্যন্ত সকল নবী সে এক ধর্মের নবী। তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ্র দ্বীন শুধুমাত্র ইসলাম। বর্ণের নামে অন্য যতো মতবাদ আছে, তা দ্বীন নয়, তাগুত।

আল্লাহ্র পূর্ণ দ্বীনের পূর্ণ নবী সঃ এর কোনো পূর্ণ অনুসারী ইমানদারের পেট ভরার জন্য অন্য কোনো আদর্শের প্রয়োজন অকল্পনীয়। তারপরও কারো পেট খালি থাকলে, তা শুধু মাত্র জাহান্নামের আগুন দিয়েই পূর্তি হতে হবে। কোনো সাহাবী বা তাবেঈ দিয়ে তা কখনো ভরবে না। مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ যে আল্লাহ্র রাসূল সঃ এর অনুসরণ করবে, সে পুরোপুরি আল্লাহ্র আনুগত্য করলো।" (সূরা নিসা-৮০)

রাসূল সঃ এর পর "সাহাবী"দের অনুসরণ না করলে যদি কাফের হয়, তা'হলে আবু বকর ও উমরদের রক্ষার কোনো পথ নেই। তারা দু'জন তাদের সাধ্যানুযায়ী রাসূল সঃ এর অনুসরণের চেষ্টা করে গিয়েছে। আবু বকর যা করেছে, উমর তা করেনি। আবু বকর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত করে তাদের পুরুষ্দের দাস ও নারীদের দাসী রূপে বন্টন করে দিয়েছিলো। উমর খেলাফতে আসীন হয়েই ওদের মুক্ত করে দিয়েছে। আবু বকর তার মৃত্যুর পূর্বে উমরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলো। উমর তার মৃত্যুর পূর্বে কাকেও তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়নি। এরূপ বহু মৌলিক ঘটনা ও দৃষ্টান্ত রয়েছে, তারা কোনো সাহাবীর অনুসরণ করেনি। এটাই আল্লাহ্র ক্বোরআন ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা। আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাহাবীদের আনুগত্যের কথা সংযোজন করলে উমরের আমলে ঘাড়ের উপর কারো মাথা থাকতো না। শিরোচ্ছেদ করা হতো।

আবু বকর ও উমরের পর যে খুনাখুনী ও হত্যাযজ্ঞের সূচনা হয়ে নবী সঃ এর রিসালাত পৃথিবী থেকে মূলোৎপাটিত হয়ে আজ পর্যন্ত নামধারী মুসলমান জাতের মাঝে যে মারামারি ও কাটা কাটি চলছে ও চলবে, তার একমাত্র কারণ, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাহাবী ও তাবেঈ নামের আরবী গোত্রীয়দের আনুগত্যের সংযোজন ও বিদ্আত।

যে দিন থেকে, যে মূহুর্ত থেকে সাহাবী ও তাবেঈর আনুগত্য বাদ দিয়ে ক্বোরআন ধারণ করে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য আরম্ভ করা হবে, পূর্ব থেকে সূর্যোদয়ের মতো পূনঃ ইসলামী উম্মার পূনর্জন্ম হয়ে যাবে এবং শিয়া-সুন্নী, আরবী-আজমী, ক্বেরেশী-হাশেমী, সাইয়্যেদ-শরীফ ও সিদ্দিক্বী-ফারুক্বীর সকল জঞ্জাল মিটে যাবে।

সকল নবীদের কালেমা, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো "ইলাহ্" নেই। এবং নবীদের আদর্শ ব্যাতিত কোনো শরীয়ত, মাযহাব ও ইবাদত্ বন্দেগী নেই। لاإيمان فوق التوحيد- و لا دين و لا شريعة مادون الرسالة এক কথায়,"তাওহীদের উর্ধে কোনো ঈমান নেই, "এবং রিসালাতের নিচে কোনো দ্বীন ও শরীয়ত নেই।" খাঁটি তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে ঈমানদার মাত্রই ঘোষণা করে যে, "সৃষ্টির কল্যাণের সকল বিধান ক্বোরআনে রয়েছে"। প্রমাণ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ "আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিই নি"। (আন্আম-৩৮)

তাই, কোরআনে যা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, সে বিষয়ে অন্য কোনো ব্যাখ্যা বা কারো কোনো মতামত চলবেনা।

যে ব্যাপারে ক্বোরআনে উল্লেখ আছে, ব্যাখ্যা নেই, সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাসূল (সঃ) এর বক্তব্য ও আমলকে মিলিয়ে

তা গ্রহণ করতে হবে।

যে সমস্ত বিষয়ে ক্বোরআনে কোনো উল্লেখ নেই, ইংগিতও নেই, সে ব্যাপারে যতো ব্যাখ্যাই প্রচলিত রয়েছে, যতো বিবরণই চলে এসেছে, সব বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

ক্বেয়ামতের দিনে স্বাক্ষ্য দেয়ার লক্ষ্যে স্বীয় আমলনামা তৈরীর জন্য বিশ্বমানবের সামনে মুসলিম উম্মাহ ও তাদের ইমামের ঘোষণা হবে ঃ-

একমাত্র আল্লাহ্ সম্পূর্ণ, তার রিসালাত পূর্ণ, এবং তাঁর শেষ নবী (সঃ) দ্বীনের পূর্ণ নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

কোনো মুহাজির, আনসার, কোরেশী, আরবী ও উমাইয়া আব্বাসীর "খত্ কামানীর" জন্য তিনি কিছুই বাকী রেখে যাননি। অতএব, খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিদায়ের পর আরবদের কর্তব্য ছিলোঃ

(১) আবু বকরের ইমাম হওয়া উচিৎ ছিলো, হিজরতের সময় রাসূল (সঃ) এর সাথী রূপে। মুহাজির ও ক্বোরেশী হিসেবে নয়। রাসূল (সঃ) তাকে নামাজের ইমামতী দিয়ে গিয়েছেন বলে যে প্রচার করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে, অন্য কোনো বিচেনায় নয়।

(২) যতো দিন কর্মক্ষম ও ইসলামের উপর ক্বায়েম থাকতো, উসামাহ্কেই প্রধান সেনাপতি রাখা কর্তব্য ছিলো। কোনো পরিস্থিতিতেই খালেদ, মুগিরা, আমর ও "তোলাক্বা"দের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না করা। ওরাই পরে খেলাফত নির্মূল করেছে।

(৩) রাসূল (সঃ) যেমন কাকেও তাঁর খলিফা বানিয়ে যাননি বলে বলা হয়, ঠিক তদ্রূপ আবু বকরেরও কাউকে খলিফা না বানিয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিলো। খেলাফত নয়, ইমামতই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। খলিফা নয়, ইমামই মুস্লিম উম্মাহর নেতা।

এখন করণীয় কি? মুক্তির পথ কি?

মুক্তির কোনো পথ নেই রাসূল (সঃ) এর আদর্শের মূলে ফেরৎ না গিয়ে। কি ভাবে ফেরৎ যেতে হবে?

(১) সকল বর্ণ, গোত্র, ভাষা, রাষ্ট্রীয় সীমা ও জাতীয়তা বর্জনের তাওবা করে ঈমানদারদের, মুহাম্মাদ (সঃ), যায়দ, বারাকাহ, খাদিজাহ, বেলাল, আম্মার, আবু বকর, ইব্ন্ মাসউদ, আলী, উমর ও সাল্মান ফারসীদের মতো "ইব্রাহীমী" আত্মসমর্পন করতে হবে।

(২) ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সঃ) দের মতো মুশ্রিক সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে পূর্ণ হিজরত করতে হবে।

(৩) "মিল্লাতে ইব্রাহীমের" শেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর অনুসারী ইমামের হাতে "বায়্'আত" করে জামাত বন্দী হতে হবে। আব্রাহাম লিঙ্কনী গনতন্ত্রীদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ভোটাভোটির রাজনীতি চিরতরে বর্জন করতে হবে।

(৪) তাওহিদী ইমামতের অধীন ব্যতীত কোনো জামাত, জুমা, ঈদ ও হজ্জের সমাবেশে যোগ দেয়া চলবে না। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে মুশরিকরা নাপাক, অপবিত্র। তাদের সাথে তাওহীদে বিশ্বাসীদের জামাত ও হজ্ব নিষিদ্ধ, যেমন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে মক্কায় নিষেধ করেছিলেন। এবং স্বতঃসিদ্ধ সূত্ররূপে বুঝে নিতে হবে যে,

"যে সমাজে, সমাজ ও নামাজ, ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত, সে সমাজ ও রাষ্ট্রই ইস্লামী রাষ্ট্র"। আর "যেখানে ইমাম ও নামাজ সমাজের কথায় চলে, সে সমাজই মুশরিক সমাজ।"

(৫) জানমালের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয়ার্থে সকল সম্পদ আল্লাহ্র আমানত রূপে মনে করে বায়আতের সময় এক পঞ্চমাংশ সম্পদ ইমামের হাতে তুলে দিতে হবে। তারপর থেকে প্রতি বছর পূর্তিতে মূলধনের শতকরা আড়াই ভাগ ও লাভের প্রবৃদ্ধির এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মাল ও ইমামের তহ্বিলে যাকাত্ ও খুমস্ প্রদান করবে। এ যাকাত ও খুম্স্ প্রদানই ইমাম ও ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফী ও বেতন। এগুলো প্রদান করার পর থেকে নামাজ জুমা, ঈদ ও হজ্ব বৈধ ও ক্বুবুল হয়। যেমন, ভর্তির ফী ও বেতন দিলেই বিদ্যালয়ের ক্লাসে বসা, পরীক্ষা দেয়া ও পাশ করে সনদ প্রাপ্তির পথ সুগম হয়।

এভাবে বায়আত ও ইমামতের মাধ্যমে জামাতবন্দি হওয়ার পর ঈমানদারদের নামাজ ও সমাজের পত্তন হয়। তা'না হলে, সকল আমল পন্ডশ্রম। যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা আল্ ক্বোরআনে বলেছেন أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

অর্থাৎ "মরিচিকার মতো দেখতে বহু ব্যাপক আমল ও ইবাদাত, কিন্তু পিপাসা নিবারণের জন্য তাতে এক ফোটা পানিও নেই।" (সূরা নূর-৩৯)

আরবী, ক্বোরেশী, শিয়া ও সুন্নীর বানোয়াট ধর্ম ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দ্বীন, ইসলাম গ্রহণ করে ইমামের জামাতে প্রবেশ করার পর বুঝতে হবে যে, আখেরী নবী (সঃ) কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্বোরআনে যেমন অন্যান্য নবী ও রাসূলদের জীবনী ও ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তদ্‌রূপ, এখনও মানুষকে আল্লাহ্‌র দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য শুধুমাত্র নবী ও রাসূলদের আদর্শ তুলে ধরতে হবে। রাব্বাই, হাওয়ারী ও সাহাবী, সব বাদ দিতে হবে।

খৃষ্টানরা যেমন ঈসার জন্ম ও জীবনীর উপর ভিত্তি করে খৃষ্টান, ইয়াহুদীরা যেমন মূসার ধর্ম ও কর্ম নিয়ে ইয়াহুদী, এবং মোহামেডানরা যেমন ক্বোরেশী, আরবী ও হাশেমী মুহাম্মাদকে নিয়েই মিলাদ ও সীরাত করে মুসলমান, আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসারী মুস্‌লিমদের কোনো অবস্থাতেই তা করলে চলবেনা।

তাদের আল-ক্বোরআন ও খাতামুন্ নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর অনুসরণে সকল নবীদের সমান বিশ্বাস করে, "সীরাতুন্নবীর" বদলে "সীরাতুল আম্বিয়া" উদ্‌যাপন করতে হবে। ক্বোরআন সীরাতুল আম্বিয়ার কিতাব, "সীরাতুন্ নবীর" কিতাব নয়। সকল নবীদের সীরাতের কিতাব।

যারা কোনো বিশেষ এক নবীর অনুসারী তাদের নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া বৈধ নয়। কারণ, তাতে "সিরাতাল্লাযীনা আন্ আমতা আলাইহিম" صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আছে। "সিরাতাল্লাযী আন্ আম্‌তা আলাইহি" صِرَاطَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ নেই। অর্থাৎ, সকল নবীদের "পথ" চাইতে বলা হয়েছে, এক নবীর পথ চাইতে বলা হয় নি। তাদের তাশাহ্‌হুদে "দুরুদে ইব্রাহীম" ও পড়া চলবেনা। কারণ, তাতে খাতামুন্ নাবিয়্যীন (সঃ) এর জন্য হযরত ইব্রাহীমের উপর কৃত বরকত ও সালাম চাওয়া হয়।

মিল্লাতে ইব্রাহীম ও রিসালাতে মুহাম্মাদীর অনুসারী মু'মিন ও মুস্‌লিমদের "সীরাতুল আম্বিয়া ও মীলাদুল্ আম্বিয়ার" অনুষ্ঠানাদী করতে হবে। যেমন ক্বোরআনে রয়েছে। তা না হলে তারা মুস্‌লিম হবেনা। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানদের মতো "মাগদুব ও দোয়াল্লীন" সম্প্রদায়, অর্থাৎ বিপথগামী ও অভিশপ্ত হবে। যেমন বর্তমান বিশ্বে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ওদের তল্পীবাহক মধ্য প্রাচ্যের আরবরা, ও বিভিন্ন দেশের মুসলমান নামধারী আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র ও ভোটাভোটির রাজনৈতিক মুশ্‌রিকরা আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত।

ইমাম মাহদীর আগমনের কথা যারা বিশ্বাস করে এবং তাকে যারা আখেরী নবী (সঃ) এর ইমামতের "বিশ্ব ইমাম" মনে করে, তাদের মানতেই হবে যে, ইমাম মাহদী "মিল্লাতে ইব্রাহিমী", অর্থাৎ ইব্রাহীমী আদর্শের ইমাম হবেন।

যারা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের গনতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা আব্রাহাম লিঙ্কনের ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোক। ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সঃ)দের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ন অন্য জাত।

যায়দ, বারাকাহ, খাদীজাহ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সাল্‌মান ও উসামাহ্‌রা আখেরী নবী (সঃ) কে হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আঃ)-দের মতো আল্লাহ্‌র রাসূল রূপে গ্রহণ করেছিলো। ক্বোরেশ, আরব, হাশেমী ও উমাইয়্যাদের নবী রূপে তাঁকে গ্রহণ করেনি। কারণ, ক্বোরেশ, আরব, হাশেমী ও উমাইয়ারাইতো তাদের দাস-দাসী বানিয়ে নির্যাতন করতো এবং লাত মানাত সহ ৩৬০ দেব-দেবীর পূজা করতো!

এখন থেকে, এ মূহুর্ত থেকে, আল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মতো যাদের মিল্লাতে ইব্রাহীমের ঈমান ও আমলের উপলব্ধি দেবে, তাদের মীলাদুল আম্বিয়া ও সীরাতূল আম্বিয়ার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিশ্ব ইস্‌লামী উম্মাহ্‌র বিপ্লবী ক্বাফেলা ও জামাত তৈরী করতে হবে।

গনতন্ত্র, মানব সার্বভৌমত্ত্ব ও তার নির্বাচনী কুফর ও শির্কে লিপ্ত সমাজ থেকে হিজরতকারী "নামাজ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবে" ইমামের অনুসারীদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তাগুতী রাষ্ট্রের চাকুরী ও তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বপ্রথম ত্যাগ করতে হবে। তা'না করলে তাদের জন্য ঈমানের দুয়ার খুলবে না।

হিজরতের পর রাসূল (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরা ব্যক্তি ইয়াহুদী, ব্যক্তি খৃষ্টান ও ব্যক্তি মুশরিকদের কাছে মজুরীর বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করেছেন বলে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু শির্ক ও কুফরীর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সাথে তারা কোনো সম্পর্ক রাখেননি। মক্কার সমাজে ওদের নামাজ, রোজা, ও হজ্বের অনুষ্ঠানাদিও তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করেছিলেন। তারপরই তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হওয়া শুরু হয়। এ নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

তদ্রূপ এখন যারা হিজরত করবে, তারা সরকারী চাকুরী করবে না। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ত্যাগ করবে। এটাই তাগুতের বিরুদ্ধে কুফরী করা। হিজরতকারীরা সাধারণতঃ কৃষিকাজ ও ব্যবসা করবে হালাল জীবিকার জন্যে। তা যতো ছোটই হোকনা কেনো। নিরুপায় হলে তারা বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় চাকুরী করতে পারে। সরকারী সংস্থায় নয়। কারণ, সরকার তাগুত। তাগুতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা চলবেনা।

যারা ঘুষ খায়, সুদ খায়, নামাজ পড়ে, দাড়ী রাখে, চিল্লায় বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনগণের ট্যাকস্ থেকে প্রদত্ত বেতনের দায়িত্ব ফেলে যোগদান করে, তাদের সাথে আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলদের অনুসারীদের কোনো জামাত বা সম্পর্ক থাকবে না। কারণ, তারা আমানতের খেয়ানতকারী, আর খেয়ানত কারীরা কখনো ঈমানদার হয় না। ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, বেতনভোগী সরকার ও আমলা শাসিত সমাজই উপনিবেশবাদ।

ঈমানদার স্বাধীন জাতির শাসক শ্রেণী প্রয়োজন বোধে শুধুমাত্র বাইতুল্-মাল, বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভাতা নিতে পারবে। ভাতা পরিবার ও পোষ্যদের সংখ্যানুপাতে হবে। পদমর্যাদার ভিত্তিতে নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মাথাপিছু মাসিক ভাতা হাজার টাকা হলে মুস্লিম উম্মাহর ইমামের পোষ্যদের সংখ্যা পাঁচজন হলে তার ভাতা হবে পাঁচ হাজার টাকা। তার গাড়ীর চালকের পোষ্যদের সংখ্যা দশ জন হলে তার ভাতা হবে দশহাজার টাকা।

পৃথিবীতে ঈমানদারদের পদমর্যাদা হবে যোগ্যতা ও দ্বায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে। কিন্তু তাদের জীবীকার ভাতা হবে মাথা প্রতি হিসেবে। পরকালে আল্লাহ্র দরবারে মর্যাদার ভিত্তিতে ভোগ বিলাস হবে। এ পৃথিবীতে নয়।

শেষ নবী (সঃ) তাই করেছেন। তাঁর পর আবু বকর সে নিয়মে চলে। উমর মর্যাদার ভিত্তিতে ভাতা প্রদান চালু করে। ফলে সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়। উমর তা বাতিল করে রাসূল (সঃ) এর আদর্শে ফিরে যাওয়ার পদক্ষেপ নেয়া আরম্ভ করলে সমাজের সুবিধাভোগীরা তাকে হত্যা করে। হত্যার দ্বায়িত্ব এক ইরানীর উপর চাপিয়ে দিয়ে উমরের ক্ষিপ্ত ছেলে উবাইদুল্লাহ্কে দিয়ে সপরিবারে সেই ইরানীকে নির্বংশ করে দেয়। ফলে উমরের হত্যা রহস্য আর উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

ওসমান এসে সুবিধাবাদীদের স্বর্গসুখ দেয়। ফলে আরবরা পরকালের "বাকী স্বর্গ" ভুলে ইহকালের "নগদ স্বর্গের" পেছনে আল্লাহ্ ও রাসূলের দ্বীন ভুলে পুনঃ জাহেলিয়্যাতে প্রত্যাবর্তন করে।

আলী এসে পুনঃ রাসূল (সঃ) এর আদর্শে ফেরৎ যাওয়ার চেষ্টা করলে আরবরা আলীকেই রাসূল (সঃ) এর নিকট পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে ক্বোরেশী, উমাইয়া, ও আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদের কুফর ও জাহেলিয়্যাতে চিরতরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আজও তার জেরই চলছে। পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ) এর আদর্শের কোনো দল বা জামাত নেই যে বা যারা যে যুগে রাসূলদের অনুসরণে আল্লাহ্কে মানে, তারাই মুস্লিম, মু'মিন ও মুস্লিম উম্মাহ। যারা মানে না, তারা নবী রাসূলদের স্ত্রী, পুত্র ও বংশধর হয়েও কাফের। যেমন, নূহ ও লুতের স্ত্রী কন্যা ও ছেলেসহ তাদের বংশধররা কাফের হয়ে ধ্বংস হয়েছে। তদ্রূপ আখেরী নবী (সঃ) এর ক্বোরেশী ও আরবী বংশধররা তাঁর আদর্শ পরিত্যাগ করে অধঃপতিত হয়ে আজ মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সাথে তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রহর গুনছে।

একমাত্র আল্লাহ্ অসীম। নবী রাসূল সহ সকল মানুষ সসীম। প্রত্যেককে সম্পূর্ণরূপে নিজ গুণে আল্লাহ্র দরবারে মক্বুল্ বা গৃহীত হতে হবে। যেমন নিজ কর্ম ও পাপে মানুষ বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়।

আখেরী নবী সঃ এর উসিলায় কেউ যদি পার হওয়ার যোগ্য হতো, তা'হলে বিবি ফাতেমা ও মা আয়েশা পিতা ও স্বামীর গুণে পার হয়ে যেতো। কিন্তু রাসুল সঃ উভয়কে বলেছেন যে, তাদের স্বীয় উপার্জন দিয়েই পরকালের খেয়া পার হতে হবে। পিতা ও স্বামী নবীর নামে পার হওয়া যাবে না।

নবীর খলিফা, পীরের বা বাবাদের খলিফা হয়ে "পুলসেরাত" পার হওয়ার বিধান আল্লাহ্র ক্বোরআনে নেই। শয়তান ও তার খলিফাদের ওয়াদায় মুক্তির বহু অঙ্গিকার আছে। মূলে শয়তানের নিজেরই যেরূপ মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই, তার খলিফা ও মুরীদদেরও নেই।

সব মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলিফা। যারা আল্লাহ্কে মানে, তারা বাধ্য খলিফা। যারা মানেনা, তারা বিদ্রোহী খলিফা। যেমন, কোনো রাজ্যে একামাত্র রাজা থাকলে সে রাজ্যের সকল অধিবাসী সেই একক রাজার প্রজা। যারা রাজার বাধ্য, তারা রাজার বাধ্য প্রজা। যারা রাজার অবাধ্য, তারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী প্রজা।

পৃথিবী একক আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাঁর রাজত্বে অন্য কারো অংশিদারিত্ব নেই। যারা তাঁকে মানে, তারা মুস্লিম বা বাধ্য

প্রজা। যারা তাঁকে মানেনা, তারা কাফের বা অবাধ্য প্রজা। মুখে যতই রাজার নাম নিক, নিঃশর্ত আনুগত্য নেই বলে তারা কাফের। যেমন মক্কাবাসী কা'বার পুরোহিত রাসূল সঃ এর ক্বোরেশী ও হাশেমী পূর্ব পুরুষরা মুখে মুখে আল্লাহ্ বিল্লাহ, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও তাওয়াফ করা সত্ত্বেও তাদের উদ্দেশ্যে "ক্বুল্ ইয়া আইয়্যুহাল্ কাফেরুন" অর্থাৎ "হে কাফের সম্প্রদায়" সম্বোধনই কপালে জুটেছে।

মানুষের একজনও খলিফা নেই। নবী রাসূলরাও মানুষ। তাঁরা নিজেরাও আল্লাহ্র খলিফা। খলিফা কি কাকেও খলিফা নিয়োগ করতে পারে? রাষ্ট্রদূত কি কাকেও রাষ্ট্রদূত বানাতে পারে? আল্লাহ্ই খলিফা বানাতে পারেন। যেমন রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানই একমাত্র রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতে পারে।

যে আল্লাহ্ একজন খলিফা বানাতে পারেন, তিনি তাঁর ইচ্ছায় অসংখ্য খলিফাও বানাতে পারেন। যেমন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান একজন দূতও নিয়োগ করতে পারে, একাধিকও পারে।

রাসূল সঃ স্বয়ং আল্লাহ্র খলিফা ও দূত ছিলেন। তাই তিনি কাকেও তাঁর দূত বা খলিফা রেখে যাননি। তিনি যখন একজনও খলিফা বানাননি, তখন চার খলিফা কোথা থেকে আসলো?

এভাবেই গোত্র ও বর্ণবাদী বনী ইস্রাঈলের অভিশপ্তরা নবীদের মৃত্যুর পর নিজেদের মধ্যে রাব্বাই, আহ্বার ও রুহ্বান বানিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের পথ ত্যাগ করে নিজেদের বিকৃত ক্রিয়া-কলাপকে ধর্মের নামে সমাজে চাপিয়ে দিতো। আখেরী নবী সঃ এর মৃত্যুর পূর্বেই যখন তার বিজয় হয়, তখন থেকেই তাঁর বিজয়কে ছিন্তাই করে ক্বোরেশীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। রাসূল সঃ তা' বুঝতে পারেন। তাঁর রিসালাতের বিজয়ের পর তাঁর সবচেয়ে বড়ো চিন্তা ও আশংঙ্কা হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে তাঁর ক্বোরেশী ও আরবী বর্ণবাদীদের হাতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মতো বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা।

সে লক্ষ্যেই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ আরম্ভ করেন। "আমার ভয় হয়, তোমরা আমার বিদায়ের পর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মতো বিগড়ে যাবে। খবরদার, তাই যদি হয়, তাহলে তোমাদের মতো হতভাগা আর কোনো জাতি হবেনা," ইত্যাদি সতর্কবাণী উচ্চারণ আরম্ভ করেন।

তিনি তাদের দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে যান, "তোমরা যদি ক্বোরআন ও আমার আদর্শ আঁকড়ে থাকো, তাহলে তোমাদের বিপথে গমনের কোনো ভয় থাকবেনা। আমি শুধু তোমাদের জন্য দু'টি জিনিসই রেখে যাচ্ছি, তা হলো, ক্বোরআন ও আমার আদর্শ।"

কখনো তিনি বলেছেন "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমাদের সঠিক পথে অবিচল থাকার জন্য। তা'হলো ক্বোরআন ও আমার গড়া পরিবার। তোমরা যদি ক্বোরআন ধারণ করে আমার পরিবারের আদর্শ আঁকড়ে থাকো, তাহলে কখনো পথহারা, বিপথগামী হবে না।"

আল্লাহ্র শেষ নবী শেষবারের মতো তাঁর গড়া পরিবারের আদর্শ বুঝানোর জন্য "বিদায় হজ্বে" তাঁর অমর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে যান। হজ্ব থেকে ফেরার পথে "গাদিরে খুমে" তাঁর অনুসারীদের একত্র করে বিশেষ ইংগীত দিয়ে যান। যায়দ ও উসামাহ্কে সেনাপতি বানিয়ে তাঁর গড়া পরিবার বলতে কি বুঝায়, তাও বুঝিয়ে যান। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধীতা ও সমালোচনা করায় তিনি মিথ্যা ও অসার গোত্রীয় আভিজাত্যের দুষ্ট ব্যাধিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে যান। তারপরও তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহুর্তে কিছু লিখে যেতে কাগজ কলম চান। সে মূহুর্তে কেউ কাগজ কলম আনতে যায়, আবার কেউ কাগজ কলম আনতে বাধা দেয়। রাসূল সঃ কি লিখবেন, বা লিখবেন না, সে ব্যাপারে বাধা দেয়ার অধিকার কার ছিলো??!! তবুও তো তারা করেছে। যারা করেছে তারা কারা? তারা কি আমাদের অনুসরণের যোগ্য?

এ ধরনের কাজ যে বা যারা করেছে, মোটেই ঠিক কাজ করেনি। পরবর্তি ইতিহাসের দুঃখজনক ঘটনাবলীর জন্য অবশ্যই তারা দায়ী। পরে তাদের এ ধৃষ্ঠতাকে হালাল (?) করার জন্য বিকৃত চরিত্রের লোকেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা ও হাদিস্ নামের অন্তরালে বহু মিথ্যার প্রচলন করে জাহান্নামে তাদের স্থায়ী ঘরবাড়ী তৈরী করেছে। সে কথা স্পষ্ট করার নিমিত্তেই আখেরী নবী সঃ বলেছে, من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

"আমার নামে যারা মিথ্যা রচনা করে, অবশ্যই জাহান্নামে তাদের আসন খুঁজে নিতে হবে।" (বোখারী, মুসলিম, আহমদ)

যে রাসূল খাতামুন নাবিয়্যীন, যাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না বলে আল্লাহ্ স্বয়ং ক্বোরআনে উল্লেখ করে তাঁর

নবীকে শিক্ষা দিয়ে বিশ্বময় কেয়ামত পর্যন্ত তার ঘোষণা দেয়ায়েছেন, সে নবী সঃ এর নামে, যারা তাঁর ভাষা তৈরী করে তাঁর মুখের কথা বলে প্রচার করেছে, যে রাসূল সঃ বলেছেন, "আমার ছেলে ইব্রাহীম জীবিত থাকলে সে অবশ্যই নবী হতো", বা "আমার পরে নবী হলে অমুক নবী হতো" তারা কোন শ্রেণীর মানব?

এ নরাধমদের মিথ্যাচার পড়লে তাদের ওস্তাদ শয়তান মনে প্রশ্ন জাগায়, নাউযু বিল্লাহ, রাসূল সঃ যে সর্বশেষ নবী, এ নিয়ে কী তাঁর অন্তরেই সন্দেহ ছিলো? তা'না হলে তাঁর যবান মুবারক থেকে এ ধরণের বাহুল্য কথা বেরিয়েছে এ কথা কিভাবে কল্পনা ও প্রচার করা যায়? এ মিথ্যাচারের ফলেই তখন আরবদের মধ্যে নবীর দাবীদার বের হয়েছিলো, এবং পরবর্তিতে কাদিয়ানী ও বাহায়ী দাজ্জালদের সূত্রপাত ঘটে।

আল্লাহ্ তা'আলার অমোঘ বিধানে কোনো মানুষ তার মৃত্যুর পর ধর্মীয় কাজে কাউকে স্থলাভিষিক্ত বা খলিফা বানাতে পারে না। তাই নবী রাসূলগণ কাউকে তাঁদের রিসালাত ও নবুওতের খলিফা বানাতে পারেন না। বহু অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইব্রাহীম আঃ কে মানব জাতির ইমাম নিয়োগ করেন, তখন আল্লাহ্র খলীল শুধু আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, "আমার পর আমার বংশধরদের ইমাম (নেতা) বানাবেন না?" সঙ্গে সঙ্গেই রাব্বুল আলামীন বললেন, "তোমার বংশধররা যালিম হলে ইমামত পাবেনা" (সূরা বাক্বারা-১২৪)। পৃথিবীতে যতো পাপ আছে, তম্মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পাপ আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে কাকেও শরীক করা। এ শরীক করাই শির্ক। এবং শির্ক সর্ববৃহৎ যুল্ম্। যা আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না বলে ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম আখেরী নবীকে বলেছেন, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তুমি যদি শির্ক করো, তা হলে তোমার সকল আমল পন্ড হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি চরম ব্যর্থদের মধ্যে পরিগণিত হবে।

রক্ত-বর্ণ ও গোত্র বৈষম্যহীন আল্লাহ্র দ্বীনে যে বা যারা বৈষম্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করে, তারা পৃথিবীতে নিকৃষ্ট যালেম, যেমন ইয়াহুদী ও ভারতীয় ব্রাহ্মন্যবাদীরা। স্বয়ং রাসূল শির্ক করলে যখন তাঁর রক্ষা ছিলোনা, তখন তাঁর মৃত্যুর পর যারা ক্বোরেশী, আরবী সুন্নী ও শিয়াবাদের বর্ণ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, তাদের অবস্থান কোথায়?

রাসূল সঃ তাঁর বিদায়ের পূর্বে "আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র ক্বোরআন ও আমার আদর্শ (সুন্নাত) এবং আমার পারিবারিক আদর্শ রেখে যাচ্ছি" এ আমার সুন্নাত ও আমার পরিবার শব্দ দু'টির মাঝে ইব্লিস শয়তান প্রবেশ করে সর্বনাশ ঘটিয়েছে।

রাসূলের ব্যক্তি আদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর পরিবার গঠন করেছেন। তাঁর ব্যক্তি আদর্শ আপাদমস্তক রিসালাত। তাঁর পারিবারিক জীবন, তাঁর সুন্নাত্ এবং তাঁর রিসালাত দ্বারা তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ ও আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি আদর্শ পরিবার গড়ে যান। যাতে তাঁর আদর্শে গোটা মানব সমাজ একটি মাত্র আদর্শ পরিবারে রূপান্তরিত হয়। এটাই রাসূলের সুন্নাত ও পরিবার। তাঁর সুন্নাত এবং "নবুওতী পরিবার" দুই নয়, এক ও অবিভক্ত।

কিন্তু ইব্লিস্ শয়তান ও তার মানব সন্তানেরা রাসূলের সুন্নাত ও পরিবারকে পৃথক করে দু'ভাগ করে সুন্নাতের দ্বারা "সুন্নী" এবং পরিবার দ্বারা "শিয়া" ফেৎনা ও বিবাদ দাঁড় করে ইসলামকে ইয়াহুদী খৃষ্টবাদের মতো বিভক্ত করে দেয়। ইয়াহুদীরা ইয়াহুদী বংশীয় বর্ণবাদী এবং খৃষ্টানরা বিবি মারইয়াম ও হযরত্ ঈসার মা ও ছেলের পারিবারিক খোদায়ীর পূজারী।

রাসূল সঃ এর পরিবার বলতে তাঁর এতীম সত্ত্বা, তাঁর পালক মাতা বারাকাহ্, পালক ছেলে যায়দ, আদর্শ স্ত্রী খাদিজা, তাঁর বন্ধু শিষ্য আবু বকর, লালিত চাচাতো ভাই, পরে জামাতা আলী, আরব বর্বরতার শিকার নির্যাতিত বেলাল, আম্মার, ইব্ন্ মাসউদ, সুহাইব, সালমান ফারসী, উসামাহ্ ও ক্বেয়ামত পর্যন্ত ক্বোরআন ও রাসূলের অনুসারীদের বুঝায়। রাসূল সঃ এর রক্তের সম্পর্কের "রক্তীয়" দের বুঝায় না। "আত্মার" সম্পর্কের আত্মীয়দের বুঝায়। যেমন ক্বোরআনের বর্ণনা মতে হযরত ইব্রাহীমের "আল্" বা পরিবার বলতে ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে। إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

"অবশ্যই ইব্রাহীমের আত্মীয় পরিজন তারাই, যারা ইব্রাহীমের অনুসারী ছিলো এবং নবী মুহাম্মাদ ও ক্বেয়ামত পর্যন্ত যারা ঈমান আনবে" (সূরা আল্ ইমরান-৬৮)

ক্বোরেশী, আরবী, হাশেমী, সিদ্দিক্বী ও সাইয়্যেদ প্রভৃতি দাবী করে যারা রাসূল সঃ এর অনুসারী নয়, তারা রাসূলের

কেউ নয়। আমেরিকার নিগ্রো, কানাডার রেড ইন্ডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, আফ্রিকান কাফ্রী, ভারতীয় অচ্ছুৎ, কেম্বোডিয়ার ক্ষেত মজুর, ইন্দোনেশিয়ার জাভী ও জাপানের কারখানার শ্রমিক, যখনই আল্লাহ্‌র কোরআন ও তাঁর শেষ নবীকে অনুসরণ করবে, তখনই তারা সবাই মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীমের পরিবার ও তাঁদের "আল"।

সূর্যের যেমন কোনো দেশ নেই, চন্দ্রের যেমন কোনো গোত্র নেই, আলোর যেমন কোনো গন্ডি নেই, বাতাসের যেমন কোনো রং নেই, তেমনি, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসী জাতির কোনো রং, গোত্র ও ভৌগোলিক সীমা নেই। রাজপুত্রের দেশ যেমন পিতা রাজার গোটা সম্রাজ্য, তদরূপ আল্লাহর বান্দাহ রাসূল সঃ এর অনুসারীদের দেশ সারা বিশ্ব। বাঁদি-দাসী ও রক্ষিতাদের সন্তানদের দেশ যেমন মাতৃক্রোড়, তদ্‌রূপ কাফের ও মুশ্‌রিক এবং অবিশ্বাসীদের দেশ শুধুমাত্র তাদের জন্মভূমি। কারণ, তাদের জন্মই পরাধীন অবৈধ সংকীর্ণ সত্তায়। তারা আশ্রিত ও রক্ষিত।

আল্লাহ্ তাঁর সাম্রাজ্য চালান তাঁর আজ্ঞাবাহী অসংখ্য ফেরেশতা দ্বারা। তাদের মধ্যে আল্লাহ্ জিব্‌রাঈল, আজ্‌রাঈল, মিকাঈল ও ইস্‌রাফীলকে চার প্রধান করেছেন। জিবরাঈল পৃথিবীতে নবী রাসূলদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী বহন করেন, আজরাঈল প্রাণ সংহার করেন, মিকাঈল মেঘ বৃষ্টি পরিচালনা করেন এবং ইসরাফীল সৃষ্টির প্রলয় বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োজিত। কোরআনে জিব্‌রাঈল ও মিকাঈল দু'জনের নামের উল্লেখ রয়েছে। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুস্‌লিম, তিন সম্প্রদায়ই এ চার বিশেষ ফেরেশতার অস্তিত্বে সমান ভাবে বিশ্বাসী। আল্লাহ তা আ'লার এ চার ফেরেশতার সাথে কল্পনা করে মুশরিকরা তাদের চার দেব-দেবীদের চার "সহচর" কল্পনার উদ্ভাবন করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কল্যাণকর কাজের জন্য চার জন "স্বর্গীয় দূত" এবং অকল্যাণের জন্য চারজন "নারকীয় দূত" কল্পনা করে থাকে।

মুশ্‌রিক আরবরা তাদের শির্কের সাথে প্রতিবেশী ইয়াহুদী ও খৃষ্টান মুশ্‌রিকদের কাছ থেকেও শির্কী ধ্যান ধারণা ধার করেছে। আল্লাহ্‌র আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূল সঃ ইস্‌লামকে পূর্ণরূপ দান করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পর তাতে ভাঙ্গন ও বিভক্তি সৃষ্টি করে তাকে আরবী কোরেশীরা ধর্ম ও গোত্রীয় হত্যাযজ্ঞে রূপান্তরিত করার কালে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর রাসূলকেও কল্পনা করে চার ফেরেশতার সাথে চার "খলিফা" কল্পনার জন্ম দেয়।

এই 'চার সহচর' বা চার খলিফার উল্লেখ বা ইশারা কোরআন ও রাসূল সঃ এর বাণীতে কোথাও নেই! এ গুলো রাসূল সঃ এর আদর্শ ত্যাগ করার পর শয়তানের প্ররোচনায় আরবরা কল্পনা করে মিথ্যা হাদিস্ তৈরী করে ইসলামের নামে চালু করে দেয়। আল্লাহর যেমন "চার ফেরেশ্‌তা" আছে, রাসূল সঃ এরও "চার সহচর" বা খলিফা আছে, এ শির্ক ও বিদ্‌আতের জন্ম দিয়েই আরবরা তৌহীদ ও ঐক্যের ইস্‌লামে সুন্নী পঞ্চরত্ন বা "পাঞ্জেতন" এবং "শিয়া পাঞ্জেতন" এর জন্ম দিয়ে ইস্‌লামের সর্বনাশ করে।

সুন্নীরা তাদের কল্পিত চার খলিফা দাঁড় করে তার মাঝে আল্লাহর রাসূল সঃ কে বসিয়ে এ জঘন্য পাপ চালু করে। অপরপক্ষ, বিবি ফাতেমাহ্, হাসান, হোসেইন ও আলী, এই চতুষ্টয়কে দাঁড় করে তার মাঝে নবী সঃ কে বসিয়ে শিয়া পাঞ্জেতন সৃষ্টি করে। এর ফলে, মক্কা, মাদীনাহ্ ও কারবালায় যে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হয়, আজ পর্যন্ত মুস্‌লিম্ উম্মাহ তাতে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হচ্ছে। শয়তানের চিতার এ আগুনকে না নিভালে কস্মিন কালেও মুস্‌লিম উম্মার বিশ্ব জাগরণ হবেনা এবং মুহাম্মাদ সঃ যে রহমত্ নিয়ে প্রেরিত হয়ে ছিলেন, তাও পৃথিবীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

রাসূল সঃ যেমন "চার খলিফা" বানিয়ে যাননি, তদ্‌রূপ আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলী তাদের মাঝে রাসূল সঃ কে বসিয়ে সুন্নী পঞ্চতন্ত্র দাঁড় করে যায়নি।

রাসূল সঃ যেমন তাঁর মেয়ে ফাতেমাহ্, জামাতা আলী ও দু'নাতি হাসান ও হোসেইনকে দিয়ে তাঁর পরিবারের "চার দেয়ালী" দাঁড় করিয়ে যাননি, তদ্‌রূপ ফাতেমাহ্, আলী, হাসান ও হোসেইন রাসূল সঃ কে তাদের মাঝে বসিয়ে শিয়া পাঞ্জেতন বানিয়ে যায়নি। এখনো কি ভাবার সময় আসেনি যে এগুলো কিভাবে ঘটলো, কে ঘটালো, এর ফলে আমরা কোথায় এবং এর পরিণতি কি?

নবী সঃ এর বিদায়ের পর থেকে চৌদ্দশ বছর ধরে তাঁর পবিত্র নাম ভাঙ্গিয়ে যে আরব ও অনারব আত্মপ্রতারক মুস্‌লিম জাতি, মধ্য প্রাচ্যে মুশ্‌রিক ও কাফের ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের জুতার নিচে পড়ে তার নিচ থেকে জিহ্বা বের করে ওদের জুতা চাটছে এবং ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের পবিত্র মক্কাহ, মাস্‌জিদুল আক্‌সা, জেরুজালেম ও মাদীনাহকে অপবিত্র ইয়াহুদী-নাসারাদের সেবাদাসদের হাতে সমর্পণ করে মুস্‌লিম উম্মার কা'বা, ওমরাহ্ ও হজ্জকে নিরর্থক ও লক্ষ্যহীন "তীর্থ যাত্রায়" পরিণত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কি আল্লাহর ঈমানদার বান্দাহ্ ও তার বাধ্য

খলিফাদের জেগে উঠে রুখে দাঁড়াবার সময় এখনো আসেনি???

ঘুমাইয়া ক্বাজা করেছো ফজর,
তখনো জাগোনি যখন যোহর
হেলায় খেলায় কেটেছে আসর,
মাগরিবের আজ শুনি আযান,
জামাতে শামিল হওরে এশাতে
এখনো জামাতে আছে স্থান।

হে মুস্লিম উম্মাহ্‌র অবশিষ্টরা!

তোমাদের ধমনীতে যদি তোমাদের পূর্ব পুরষদের হালাল রক্তের এক আধ ফোটা থেকে থাকে, তা'হলে, আর এক মুহূর্তও দেরী না করে মুর্দা গোসলের মতো তাওবা করে পুনঃ তাওহীদের কালেমা পড়ে জামাতে শরীক হতে ইমামের খোঁজে বের হও। আদম সৃষ্টির শত্রু ইবলিস শয়তানের খলিফারা তোমাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য মধ্য প্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও ভারত বর্ষে বধ্য ভূমি ও কসাইখানা প্রস্তুত করে পরীক্ষামূলক জবাই আরম্ভ করেছে।

এশার আযানে না জাগলে ফজরের পর থেকেই তোমাদের নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে যাবে। আর যদি এশার আযানে জেগে পাক সাফ্ হয়ে তাওবা করে তাহাজ্জুদে ঈমান নবায়ন করে তাওহীদের শপথ নাও, তাহলে নিধন যজ্ঞের পরিবর্তে সুব্‌হে সাদেক্ব হয়ে অমানিশা কেটে বিশ্ব জয়ের সূর্য উদিত হবে।

আল্লাহ্‌র সাথে কৃত শপথ ভঙ্গকারীদের তিনি ধর্মহীন জাতিদের দিয়ে নির্মূল করেন। যেমন ইয়াহুদী, আরব, তুর্কী, মোঘল ও পাঠানদের করেছেন। এবার এশার আযানেও না জাগলে তোমাদের সে নির্মূল অভিযান শুরু হবে, যার পরীক্ষামূলক কসাইখানা, ফিলিস্তিন, বলকান্ ও কাশ্মিরে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের নামধারী মুসলমানদের উপর আসবে সবচেয়ে কঠিন আযাব।

ইস্‌লাম আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের দ্বীন। আল্লাহ্ উপরে, বান্দারা নিচে সিজ্‌দায় মাথা নত। ইস্‌লামে একক ইমামের পেছনে জমায়েত হয়ে জামাতবন্দি হতে হয়। ইমাম সামনে, মোক্তাদীরা পেছনে। ইমামের পর্শ্বে মোক্তাদীরা নয়। তাই মোক্তাদীরা ইমামের পার্শ্বচর হয়না। ইমামের পেছনে চলে।

নবী রাসূল সঃ গণ মানব জাতির ইমাম। তাঁদের পার্শ্বচর হয়না। একজনও হয়না, চারজনও হয় না। মুশরিকরা যেমন আল্লাহ্‌র পার্শ্বচর বানায়, রাসূলদেরও পার্শ্বচর দাঁড় করিয়ে পরে তারা নিজেদের পার্শ্বচর, সহচর ও খলিফা বানিয়ে ধর্মকে কুক্ষিগত করে, আরব ও নামধারী মুসলমানরা তেমনি চার খলিফা, চার ইমাম, চার মায্‌হাব ও চার তরীক্বাহ্ বানিয়ে চার দেয়ালীর খান্‌কা মাজার ও মন্দির তৈরী করে এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের অগণিত ধর্ম, পীর ও দেব-দেবীর পূজারী মুশ্‌রিক বানিয়ে শোষণের প্রথা চালু করেছিলো, যা আজো চলছে।

আবু বকর ও উমররা কস্মিন কালেও "চার খলিফা" বা খোলাফায়ে রাশেদাহ্ নামের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে যায়নি। তাদের পৃথিবী থেকে বিদায়ের পর আরব ফেরক্বাবাজরা একদল তাদের চারজনের "খোলাফায়ে রাশেদাহ্" বানিয়েছে। আবার চারজনকে "চার কুচক্রী" বা দোহাতুল্ আরব দাঁড় করিয়েছে। আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীদের "চার খলিফায়ে রাশেদ" বা সত্যাশ্রয়ী খলিফা নামকরণ করে মুয়াবিয়া, মারওয়ান, মুগিরা ও আম্‌র ইব্‌নুল্ আস্‌দের "দোহাতুল আরব" বা চার ধুর্ত বা চার কুচক্রী দাঁড় করেছে।

মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও মধ্যপ্রাচ্যের ইস্‌লামী পুনর্জাগরণে গত শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ রাশিদ রেদা বলেছে ঃ

আমি বিশ্বে খাঁটি ইস্‌লামকে তুলে ধরার জন্য ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এক বিশেষ সমাবেশ আয়োজন করি জার্মানীতে। তাতে ইউরোপের প্রায় সকল সত্যাশ্রয়ী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌গণ যোগ দেয়। সে সমাবেশে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্যকথা শুনতে পাই।

পৃথিবীতে সংঘাতে লিপ্ত তিন জাতি, মুস্‌লিম, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্মের উৎস ইস্‌লামকে ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের আদর্শ জোরালো ভাষায় আমি তুলে ধরি। আমার বক্তব্য উপস্থাপনের পর এক জার্মান দার্শনিক চিন্তাবিদ দাঁড়িয়ে বলে ওঠে "তুমি যে ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদের প্রবর্তিত ধর্মের কথা বলছো, তুমি নিজেও

তো সে ধর্মে নেই। মুহাম্মাদ (সঃ) যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে তার জয়যাত্রা আরম্ভ করে যান, তাকে যদি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস গংরা আলীর বিরুদ্ধে ক্বোরআন উত্তোলন করে সে দিন না ঠেকাতো, তাহলে আজ ইউরোপ কেন, সারা বিশ্বে ইস্‌লাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম থাক্‌তোনা। তোমারও আজ এ সমাবেশ করার প্রয়োজন হতোনা। সিফ্‌ফীনে আলীর বিজয়কে ঠেকিয়ে তারপর মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস, মুগিরা ও মারওয়ানরা যে ধর্মের প্রচলন করে, তা ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলে তার খোলসের মধ্যে হিংস্র আরবী বর্বতারই প্রচলন করা হয়। সেই আরবী হিংস্র থাবা ও তার চোয়ালের ধারালো দাঁত দিয়েই উমাইয়ারা উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও ইন্ডিয়া তস্‌নস্‌ করে ইউরোপকে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়। তখনই খৃষ্টান ক্রুসেডররা জিব্রাল্টা প্রনালীর মুখে দু'পার্শ্বের পাহাড়ের পাথর দিয়ে আরবী হিংস্রতার দাঁত ও থাবার নখ গুলো উপ্‌ড়ে ও বোথা করে তাদের ঘরে ফেরত পাঠায়।

মুয়াবিয়া, আম্‌র ইবনুল আস, মারওয়ান ও মুগিরা বিন শো'বাদের "চতুষ্টয়"ই বর্তমান অপ্রতিদ্বন্দ্বি ইউরোপ ও আমেরিকা, তথা, পাশ্চাত্য শক্তির উত্থানের আসল প্রতিষ্ঠাতা। পশ্চিমা সভ্যতা সে চতুষ্টয়ের কাছে চির কৃতজ্ঞ, চিরঋণী।"

এ হলো রাসূল (সঃ) এর এক অভিন্ন ও অবিভাজ্য আদর্শকে বিভক্ত করার ফল। প্রথমে তাঁর আদর্শকে আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীদের নামে চার রঙ্গের খেলাফত দাঁড় করে রিসালাতকে চার টুকরা করা হয়। আবু বকর উমররা কস্মিন কালেও যা করেনি।

রাসূল সঃ এর প্রিয়দের মধ্য থেকে চারজনকে দিয়ে ইসলামকে চার ভাগ, সিদ্দিকী, ফারুক্বী, ওসমানী ও আলাভী রূপে বিভক্ত করে, তাকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে কাজ সিদ্ধি করে। "কুচক্রী চারেরা"এই চার জনের সকল চিহ্ন মুছে ফেলে মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের চারজনের কু ফিত্‌নাহ চাপিয়ে দেয়।

এরা ক্ষমতায় বসে প্রথমে হাসান ও হোসেইনকে শেষ করে। তারপর আবু বকরের সন্তানদের নির্মূল করে। আব্দুর রাহমান বিন্‌ আবু বকর প্রাণ ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে, মৃত্যুবরণ করে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন্‌ আবু বকরকে জীবন্ত হাত পা বেঁধে একটি মৃত গাধার পেটের নাড়িভুড়ি ফেলে সে গাধার পেটে ঢুকিয়ে সেলাই করে আগুন দিয়ে গাধার পেটে সিদ্ধ করে পুড়িয়ে মেরেছে। তার অপরাধ্‌ ছিলো, সে মুয়াবিয়া ও মারওয়ানদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আলীকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলো। উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথের কাঁটা দূর করার জন্য আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন্‌ উমরের মতো দরবেশ মানুষকেও বিষাক্ত বর্শা দিয়ে নামাজে সিজদারত অবস্থায় আহত করে পঁচিয়ে পঁচিয়ে হত্যা করেছে। এ বর্বরতা কী আজকালও কল্পনা করা যায়?

এ ক্বোরেশদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কী আল্লাহ্‌ তাঁর আখেরী নবী সঃ কে পাঠিয়ে ছিলেন?! এ জন্যই কি আল্লাহ্‌ তাঁর শেষ ও পূর্ণ নবী সঃ কে এতীম করে অক্বোরেশী দাসী বারাকাহ্‌কে দিয়ে পালন করিয়ে, যায়দ, আম্মার, বেলাল, ইব্‌ন্‌ মাস্‌উদ, সুহাইব ও সালমানদের মতো নির্যাতিতদের দ্বারা তাঁর রাসূল সঃ এর রিসালাতের ভিত্‌ রচনা করেছেন? এবং মক্কার হিংস্র ক্বোরেশদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচিয়ে হিজরাতের মাধ্যমে মাদীনার দরিদ্র ও দুর্বলদের সাহায্যে মক্কা বিজয়ের দ্বারা ক্বোরেশদের পরাজিত ও উৎখাত করে আল্লাহর বিশ্ব জয়ী দ্বীনের আদর্শ স্থাপন করেন? বর্ণ ও গোত্রবাদী কাফের ক্বোরেশদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কখনো আল্লাহ্‌ তা করেন নি।

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সঃ কর্তৃক ইসলামের আদর্শ পূর্ণ হওয়ার পর এ চরম পতন কেনো আরম্ভ হলো???!!!

সুস্থ মানসিকতা ও ঈমানদার মানুষের জন্য তার কারণ বুঝা ২+২ = ৪ এর মতো সহজ ও সরল।

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"যারা রাসূলের অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর অনুসারী হবে," "তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" আল্লাহ বলেননি "যারা রাসূল ও সাহাবীদের অনুসারী হবে, তারা আল্লাহ্‌র অনুসারী হবে"।

রাসূল সঃ বলেছেন ঃ احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

"উত্তম হাদিস আল্লাহ্‌র কিতাব (ক্বোর'আন), উত্তম পন্থা, মুহাম্মাদের পন্থা, নিকৃষ্ট কাজ হলো নতুন কথার অবতারণা করা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ্‌আত, প্রত্যেক বিদ্‌আত্‌ই বিপথ গমন এবং প্রত্যেক বিপথগামী জাহান্নামী।" (মুস্‌লিম, বর্ণনাকারী জাবির ইব্‌ন্‌ আব্‌দিল্লাহ্‌ ও ইব্‌ন্‌ মাসউদ)

অতএব, এ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয় যে, রাসূলের অনুসরণই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য। রাসূলের জীবন "উত্তম হাদীস" ক্বোরআনের চতুর্সীমায় আবদ্ধ। তার বাইরে কোনো কিছু বলা ও করা বিদআত। বিদ্‌আতই বিপথ গমন এবং বিপথ গামীরা জাহান্নামী। তারা যেই হোক।

রাসূল সাঃ "উত্তম হাদীস" ক্বোরআনের বাইরে কিছুই করেননি, বলেননি। তিনি অন্যদেরও করতে বা বল্‌তে নিষেধ করে দিয়েছেন। যারা তা করবে, তারা ঈমান ও দ্বীন হারিয়ে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ "আমার নাযিল্ করা হাদীস্, ক্বোর্আনের বাইরে হাদীসের অংশ বিশেষও রাসূল তাঁর তরফ্ থেকে যোগ দিয়ে বললে আমি তৎক্ষনাৎ রাসূলকে ডান হাতে ধরে তার ঘাড় মটকিয়ে তার ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমরা কেউ তা ঠেকাতে পারতেনা। এটা মোত্তাকীদের জন্য চরম হুশিয়ারী।" (সূরা আল্ হাক্বাহ্-৪৪-৪৮)।

তারপরও কি কোনো সুস্থ মস্তিস্কের লোক কল্পনা করতে পারে যে, রাসূল সঃ ক্বোরআনের বাইরে আক্ষরিক কিছু করতে বলেছেন ??!!

এখানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই জীবনের তরে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং মানতে হবে যে, ক্বোর্আনের অক্ষরের বাইরে জিব্রাঈল ও রাসূল সঃ আল্লাহর দ্বীন সংক্রান্ত যতো কথা বলেছেন, তা কখনো "হাদীস্" নয়। "ক্বাওল্" বা কথা। ক্বোর্আনে কোথাও আল্লাহ্ ক্বোরআন ব্যতিত জিব্রাঈল ও রাসূল সঃ এর কথাকে "হাদীস" বলেননি। রাসূল সঃও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর বাণী সমূহকে শুধুমাত্র "ক্বাওল্" "আক্বাউয়ীল" ও "মাক্বালা" বলেছেন। কোথাও, কখনো একটি বারও তাকে "হাদীস" বলেননি।

রাসূল সঃ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পর আল্লাহ্‌র "হাদীস" ক্বোর্আনের বাইরে তাঁর বাণী ক্বাওল, আক্বাউয়ীল ও মাক্বালা সমূহকে কে বা কারা, কখন, কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে "হাদীস" নামকরণ করে এর প্রবর্তন করলো???

যারা তা করেছে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ-কে অমান্য করে নতুন বস্তুর উদ্ভাবন করেছে। বিদ্‌আত্ করে বিপথগামী হয়েছে, মানুষকে বিপথগামী করেছে এবং নির্ঘাত জাহান্নামের পথ সুগম করেছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর সীমা লংঘন করে কোনো ক্বোরেশী, আরবী, "জম্হুর" এবং গোটা বিশ্ববাসী একত্র হয়েও চুল পরিমাণ নতুন কিছু করা, বলা বা উদ্ভাবন করার অধিকার রাখেনা, নেই এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত হবে না। যারা করেছে, করছে এবং করবে, তারা বিনা যুক্তি, বিনা তর্ক ও বিনা হিসেবে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও জাহান্নামী। তারা অভিশপ্ত। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘনকারী।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ ক্বোরআনে কোথাও ক্বোরেশের ইমামতির কথা বলেননি। কোথা থেকে "আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" আসলো?? আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ কোনো একজনকেও খলিফা বানাননি, চার খলিফা কোথা থেকে আসলো??? এ বিদ্‌আতের স্রষ্টা কারা? আল্লাহ্ তাঁর আখেরী নবী সঃ কে বলতে নির্দেশ করেছেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ "বলো তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, তোমরা রাসূলের আনুগত্য করো এবং যারা (তোমাদের, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগতদের, মধ্য থেকে) নির্দেশদাতা হবে।"

"খলিফা" বা "আমীরুল্ মোমেনীন" আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর পরিভাষায় ক্বোরআনে, অর্থাৎ হাদীস্ বা আহ্‌সানুল হাদীসের কোথাও নেই। শুধুমাত্র ইমামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন নবীরা ইব্রাহীম আঃ এর অনুসারী ইমাম ছিলেন, আখেরী নবী সঃ ইমামুল মুত্তাক্বীন ছিলেন এবং ক্বেয়ামতের দিনও প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের পরিচয়ে চিহ্নিত করা হবে। এমনকি পৃথিবীতে সর্বশেষ সংস্কারক যিনি আসবেন, তিনিও "ইমাম মাহ্‌দী"। খলিফা বা আমীরুল মু'মিনীন মাহ্‌দী নন। রাসূল সঃ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তে আবু বকরকে নামাজের ইমাম বানিয়ে ইমামতের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন বলে বলা হয়। খেলাফত বা আমারত্ দিয়ে যাননি।

আল্লাহ্ ও রাসূল সঃ এর হাদীসের বাইরে ক্বোরেশী খেলাফতের জন্ম দেয়ার ফলে জিব্রাঈল, আজরাঈল, ইস্রাফীল ও মিকাঈল আঃ, এই চার ফেরেশ্তার দৃষ্টান্তে ইয়াহুদী নাসারাদের মতো চার ভালো খলিফা ও চার কুচক্রীর রীতি চালু হয়। তা থেকেই হিটলারের চার সহচর ও মাওসেতুং এর "গ্যাং অব্ ফোর" চার কুচক্রীর প্রথা চালু হয়ে তা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমানেরও চার খলিফা নামকরণ করে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর রাসূল সঃ এর আদর্শকে

ঠাট্টা মশ্‌করার বস্তু বানানো হয়। অথচ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নামে প্রহসন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ক্বোরআনে কতো কঠিন শাস্তির বিধান করেছেন!

আল্লাহ্‌র ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর সীমা লঙ্ঘন করে বিদ্‌আতের দ্বারা খেলাফত চালু করার ফলে তা' ছেঁড়া জামার আবু বকর ও উমরের খেলাফত থেকে আমীর ও আমারাত সৃষ্টি হয়ে সিরিয়ায় রেশমী পোষাকের "আমীর মুয়াবিয়ার" গোড়া পত্তন হয়। তা থেকে সোনার সিংহাসন ও সোনার প্রাসাদে বসবাসকারী বাদশাহ্‌, শাহিনশাহ্‌ ও জালালাতুল্‌ মালিক পর্যন্ত এসে গড়ায়। আর ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের ইমামত দু' রাকাত্‌ বা চার রাকাতের মিস্‌কিন মোল্লার ভাগ্যে এসে পতিত হয়। যাকে নামাজের বাইরে কেউ দু' পয়সা দিয়ে জিজ্ঞাসাও করে না। বেচারাদের কাছে মোক্তাদী ও মুসল্লীরা পারতঃপক্ষে কখনো বোন বা মেয়ে বিয়ে দেয়ার কথাও ভাবে না।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন! এ দশা হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তাঁর দ্বীনের উদ্ভাবন করে নবী রাসূলদের একের পর এক পাঠিয়ে সর্বশেষ নবী সঃ কে দিয়ে পূর্ণ করেছেন? হে ঘুমে বিভোর নির্যাতিত নিপীড়িত ও প্রতারিত আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌রা, এখনো কি তোদের জাগার সময় আসে নি?!! তোরা না "মুস্তাদ্‌আফীন"? তোদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই না আখেরী নবী সঃ কে আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছিলেন?

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী ইমামত ত্যাগ করে মুসলমান নামধারী জাতি আজ বিশ্বে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সেবাদাস। আল্লাহর বিধানের রাষ্ট্রীয় নেতা "ইমাম" আজ বিশ্ব শাসনের "দারুল্‌ হুক্‌ম্‌" বা রাষ্ট্রীয় ভবন থেকে বিতাড়িত হয়ে অলিতে গলিতে অবৈধ ও দখল করা জায়গায় সমাজের সুদখোর, ঘুষখোর ও অবৈধ ধনবানদের পাপের আবর্জনার চাঁদা দিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মস্‌জিদ্‌ নামের কুঠুরী গুলোতে বেতন ভুক্ত দু'চার রাকাত নামাজের ইমাম। সাধারণ দরিদ্র মুসল্লীরা যার দু' বেলা খাবার দিতেও অপারগ। তাই চার পাশের অবৈধ টাকা ওয়ালাদের বাসা থেকে চক্রাকারে আসা হারাম হালাল খাদ্যে ইমামের পেট আজ ময়লার ডাস্টবিন। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য তাঁর পার্লামেন্টের মেম্বার "খলিফাগণ" আজ পার্লামেন্ট থেকে বিতাড়িত হয়ে কাপড় সিলাইয়ের 'দর্জি'(?)। কাপড় চুরী করা ও ওয়াদা খেলাফ করে দিন তারিখ মতো জামা কাপড় না দেয়া যাদের কাজ। ন্যায় অন্যায় বিচার করার ক্বাজী? সে এখন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিতাড়িত হয়ে পয়সার বিনিময়ে ধর্মের নামে নির্বিচারে নারী পুরুষের নিকট ব্যভিচারের লাইসেন্স, "কাবিন নামা" বিক্রি করে সমাজকে হারামজাদা ও হারামজাদী উৎপাদনের অবাধ সুযোগ দিয়ে ভরে ফেলছে!

ইসলামে বিবাহ বন্ধন হলো 'আল্লাহ্‌র দ্বীন' জীবনধর্ম পালনে নারী পুরুষের সামাজিক 'সাক্ষী' রেখে কালেমা পড়ে পরস্পরকে গ্রহণ করার অঙ্গিকার। তাই স্বামী স্ত্রী সহধর্মী সহধর্মিণী। ইস্‌লামে শুধুমাত্র ঈমানী কর্তব্য পালনের অঙ্গিকারে অঙ্গিকারাবদ্ধ নর-নারীর মধ্যেই বিবাহ হতে পারে। ধর্মীয় অঙ্গিকারহীন নর বা নারীর জোড়া বাঁধা ইসলামে নেই।

ইসলামের বিবাহ মোটেই পশুদের মত যৌন মিলন ও বাচ্চা উৎপাদন নয়। বিবাহ, আল্লাহ্‌র দাস দাসীদের দ্বারা আরও আল্লাহর দাস দাসী উৎপাদন ও তাদের মানুষ রূপে তৈরী করার মিলিত শপথ। বর্তমান সমাজের ক্বাজীরা কি সে দায়িত্বের ধারে কাছেও আছে? পয়সা পেলে হারাম বিবাহ, ও এক জনের স্ত্রী অন্যের জন্য হালাল করেনা, এমন ক্বাজী ক'জন আছে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ সঃ দের প্রদর্শিত, পালিত ও প্রতিষ্ঠিত ইমামত, খেলাফত ও ন্যায় বিচার ত্যাগ করার ফলে মুস্‌লিম নামধারী জাত তোমরা আজ কোথায়? কোথায় তোমাদের সেই ইমাম, সেই খলিফা ও সেই ক্বাজী?

ইসলাম ত্যাগ করে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পোষাকে, চলনে বলনে, তাদের মত হয়ে, বৌ ঝিদের উলঙ্গ করে খোলা বাজারে নিলাম করে তোমরা কি ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সমান হতে পেরেছো? ওদের দান ভিক্ষা ছাড়া কি তোমাদের রাষ্ট্র, সরকার ও তার বাজেট চলে? তোমাদের মেয়েদের তোমরা ওদের হোটেল, রেস্তোরাঁ, পর্যটন কেন্দ্র ও অফিসের বিনোদনের বারবনিতা বানিয়েছো। শুক্রবার, তোমাদের জুমআর দিন নয়, ছুটির দিন। ভিসিআর ও ভিডিও দেখে মানসিক ও দৈহিক ব্যভিচারের দিন। এ দিন তোমাদের সিনেমা বেশ্যা শিল্পের শুভ (?) উদ্বোধন হয়। তোমাদের মিলাদুন্নবী খৃষ্টানদের বড়ো দিনের মতো এক মাস বা এক দিনের মেলা ও তামাশা। নবী সঃ এর জীবন আদর্শকে অপমান করার মহড়া! তা' কি অস্বীকার করতে পারো?

তোমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি আজ (সরকার প্রধান ও বিরোধী দল প্রধান) ঘরভাঙ্গা, বাপ মা ও স্বামী খাওয়া

"রিক্তা" দের নিয়ে। প্রতিশোধ তাদের ভাষা। তোমরা তাদের পেছনে জল্সা ঘরের যোগান দাতা। রাজনৈতিক বাটপাররা ওদের সাজিয়ে যেমন স্বদেশে জলসা ঘর সাজায়, তদ্রূপ দেশে বিদেশে দান খয়রাতের জন্য পাঠিয়ে পর পুরুষের সাথে করমর্দন ও মনমর্দন করিয়ে ছবি তুলে তোমাদের আল্লাহ্ ও নবীর আমানত নিলাম করছে। ওদের দেখাদেখি সাধারণ নারীরা আজ পর পুরুষের সাথে ধানক্ষেতে, পাটক্ষেতে তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছে।
তোমাদের রাষ্ট্র প্রধানদের দেখলে কী মনে হয়? ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃদের অনুসারী মনে হয়? না ক্লাইভ ও হিট্লারের প্রেতাত্মা মনে হয়? আবার তাদের দিয়েই তোমাদের মিলাদ ও সীরাতের মেলা-খেলার উদ্বোধন হয়!
অপর দিকে তোমাদের ধর্মবেসাতি রাজনীতিকরা মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীম আঃ দের নাম ও জামা-জোব্বা নিয়ে ইব্রাহীমী ইমামত বাদ দিয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের রাজনীতির কলেমা ও কালাম আওড়ায়। মক্কাহ, মাদীনাহ এবং মাসজিদুল আক্সা এদের ক্বেব্লা ও শিক্ষার কেন্দ্র নয়। তাদের ক্বেবলা ও কা'বাহ্ ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডা। তোমাদের ছেলেদের দ্বারা তাদের দলীয় রাজনীতি করিয়ে সন্ত্রাসী বানিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিঃস্কৃত করে। সন্ত্রাসে তোমাদের ছেলেরা মরে। নেতাদের ছেলেরা কখনো মরেনা। তাদের ছেলেরা লন্ডন, আমেরিকা ও আলীগড়ে পড়ালেখা করে বিদেশে পাঁচ দশলাখ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী করে সাদ্দাদ্ ও ক্বারুনদের সুন্নত পালন করছে! আর তোমাদের সন্তানরা বেকারত্বের নৈরাশ্যে ঈমানও হারাতে বসেছে।
হয্রত ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ যদি ইরাক ও মক্কা থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিন ও মাদীনাহ গিয়ে তাঁদের ও তাঁদের নেতৃস্থানীয় নেতাদের ছেলেদের বিধর্মীদের দেশ ও সমাজে পাঠিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্নেস্ এক্সিকিউটিভ বানাতেন, তা হলে কি মিল্লাতে ইব্রাহীম ও উম্মতে মুহাম্মাদী হতো??!! তাদের নেতৃত্বে আল্লাহ্র দ্বীনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতো কখনো?
তোমাদের দেশ ও সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মব্যবসায়ী রাজনীতির নায়ক ও নায়িকারা ছাত্র রাজনীতির দ্বারা তোমাদের ছেলেদের "বলির পাঠা" বানিয়ে তাদের উভয় শ্রেণীই ইউরোপ আমেরিকায় কারুনের ধন ভান্ডার ও সাদ্দাদের বালাখানা বানিয়ে যাচ্ছে। তাদের নাতি পোতারা ওদেশে জন্মে ওদেশের নাগরিক হচ্ছে। "জয় বাংলা ও জয় বাঙ্গালীর" নেত্রীকে তার দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্ম লগ্নে উপস্থিত থাকতে আমেরিকা পাড়ী দিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীত্ব ফেলে। মাদীনায় নিরাপত্তার অভাবে রাসূল সঃ যদি তাঁর কলিজার টুকরা ফাতেমা ও জামাতা আলীকে নিরাপদ রোম বা ইটালী পাঠিয়ে হাসান হোসেনের জন্মোপলক্ষে রিসালাত ও ইমামত ফেলে দেখতে যেতেন, তা হলে কেমন হতো? ঈমানদার জাতির নেতাদের অবশ্যই তাদের জাতির অনুকরণীয় আদর্শ হতে হয়। তোমরা কি ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের অনুসারী?
তোমাদের দেশের ধর্মনিপেক্ষরা যা করছে, ধর্মবেসাতীরাও তা-ই করছে। এ কাজ কোনো ঐশী ধর্মে বিশ্বাসী ঈমানদার জাত বা জাতি করেনা, করতে পারেনা। ধর্মের নামে প্রতারকরাই এ কাজ করে স্বজাতিকে লুটে চুষে খায়। মক্কায় আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মুহাম্মাদ (সঃ)-দের দ্বারা আল্লাহ্ বিশ্বের মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও অবিভক্ত জাতির কেন্দ্র কা'বাহ্ তৈরী করে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তার ইমামত ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সেই কা'বার মূল আদর্শ ত্যাগ করে পার্থিব স্বার্থে হাশেম ও তার যমজ ভাই উমাইয়ার সাথে বিবাদ হয়। সেই বিবাদে উমাইয়া পরাজিত হয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়ে রোমান খৃষ্ঠানদের সাথে আতাঁত করে মক্কায় হাশেমকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। তখন থেকেই উমাইয়াদের শক্তির উৎস হয় রোমান খৃষ্ঠান রাজত্বের প্রাদেশিক রাজধানী দামেস্ক।
অপর দিকে মক্কায় আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী (সঃ) কে শির্ক থেকে কা'বাকে মুক্ত ও পবিত্র করার জন্য প্রেরণ করেন। ধর্মবেসাতী অধার্মিক ক্বোরেশ ও বনী হাশেমকে আল্লাহ্ নবী (সঃ) কে না মানার জন্যে স্পষ্ট "কাফের" আখ্যা দিয়ে "ইয়া আইয়ুহাল্ কাফেরূন" অর্থাৎ "হে কাফের সম্প্রদায়" বলে তাঁর রাসূল (সঃ) কে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক সংগ্রামের নির্দেশ দান করেন। وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও কর্তব্য পালনার্থে রাসূল (সঃ) কে মক্কা ত্যাগ করে মাদীনাহ হিজরত করে শক্তি সঞ্চয় করে ক্বোরেশদের উৎখাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। রাসূল (ঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা কেউ তখনকার পরাশক্তি রোমান ও পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের কোনো দেশে ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে সে সমস্ত দেশে আখের গুছানোর ব্যবস্থা করেনি। ঈমানদারদের কখনো পার্থিব কারণে ঈমানী পরিবেশহীন কাফের সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস করার অনুমতি নেই।

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সঃ) কে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন ঃ

"যারা আল্লাহ্ ও পরকালের পথে ঘরবাড়ী ও বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করে হিজরত করবে, তাদের হিজরত আল্লাহ্র পথে হিজরত। তাদের পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে নির্ধারিত। যারা পার্থিব কারণে দেশ ত্যাগ করে, বা কোনো নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে, তাদের দেশ ত্যাগ তাদের উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্র নিকট তা হিজরত নয়, নিছক দেশ ত্যাগ।" (বুখারী-মুসলিম)

নবী (সঃ) এর নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে রাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লোভে মক্কার ক্বোরেশরা ইসলামে অনুপ্রবেশ করে। এ মুনাফেক্বীতে বনি হাশেম ও বনি উমাইয়া সমান ভাবে জড়িত ছিলো। এ ঘৃণ্য কাজে বনি হাশেমের আব্বাস ও বনি উমাইয়ার আবু সুফ্য়ান ছিলো যুগল নেতা। রাসূল (সঃ) এর মুত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আব্বাস আলীকে দিয়ে বনি হাশেমের গোত্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আলীর ঈমানের ধমক ও তিরস্কারে আব্বাস সে যাত্রায় ব্যর্থ হয়। উমাইয়া খলিফা ওসমানের আমলে আবু সুফ্য়ান ইসলামী খেলাফতের ঘাড়ে তার বিষদাঁত বসিয়ে দেয়। এবার মক্কার "সেবাইত" হাশেমের নাতি আব্বাস পেছনে পড়ে যায় এবং বনি হাশেমের শত্রু উমাইয়ার নাতি আবু সুফ্য়ান সফল হয়।

মুয়াবিয়ার দ্বারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে বনি হাশেমের আব্বাসের বংশধররা উমাইয়াদের পতন ঘটানোর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে লেগে যায়। উমাইয়ারা ক্ষমতায় বসে একে একে নবী (সঃ), আবু বকর ও উমরের বংশকে নির্দয় ভাবে নিধন আরম্ভ করে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো যে, নবী (সঃ) ও তাঁর সত্যিকারের অনুসারীদের কেউ বেঁচে থাকলে ওদের বংশীয় রাজতন্ত্র টিকবেনা। তাই উমাইয়া বংশ ব্যতীত অন্যদের তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতো না।

দামেস্কে উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে বনি হাশেমের আব্বাসীরা বাগদাদে ক্ষমতায় বসেই প্রথমে উমাইয়া রাজা মুয়াবিয়া ও ইয়াযিদ্দের কবর খুঁড়ে ওদের হাড়গোড় তুলে জ্বালিয়ে, পুরানো হাশেম ও উমাইয়াদের আরবীয় হিংস্র বর্বরতাকে পুনরুজ্জীবিত করে। অপর দিকে এরা কেউই নবী (সঃ) এর বংশ ও অনুসারীদের নির্মূল করার ব্যাপারে সামান্যতম দুর্বলতা দেখায়নি। উমাইয়ারা রাসূল (সঃ) এর সঙ্গী অনুসারী আবু বকর ও উমরের বংশধরদের নির্মূল করে জুমআর খুৎবায় আলীকে ইতরীয় ভাষায় গালমন্দ ও তার উপর অভিসম্পাতের প্রচলন করে। ষাট বছর পর উমর বিন্ আব্দুল্ আযীয এসে খুৎবা থেকে তা বাদ দেয়।

আব্বাসীরা আবার রাজত্বে বসে ইমাম হোসেনের বংশের অবশিষ্টদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করে। উমাইয়া ও আব্বাসীরা ভালো করেই জানতো যে, নবী (সঃ) এর আদর্শ ও চরিত্রের রক্ত ধারা বেঁচে থাকলে ওদের রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ কখনো নিরাপদ হবে না।

উমাইয়া ও আব্বাসী "শাজারায়ে খবীসাহ্" বা বিষবৃক্ষের মূল আবু সুফ্য়ান ও আব্বাস যেমন রাসূল (সঃ) এর নবী জীবনে মক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বের রাত পর্যন্ত, তেইশ বছরের একুশ বছর ইস্লাম, রিসালাত ও রাসূল (সঃ) এর শত্রু ছিলো, ওদের বংশধররা স্পেন ও বাগদাদে ইউরোপিয়ান ও মোঙ্গলিয়ানদের হাতে নির্মূল ও নির্বংশ হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ও রিসালাতের শত্রু ছিলো।

ইস্লামে রাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদোপম মসজিদ্ নির্মাণ অকল্পনীয়, হারাম। রাসূল (সঃ) বহুবার বলেছেন "লানত ও অভিসম্পাত ওদের উপর, যারা মস্জিদকে কারুকার্য খচিত করবে। পূর্বেকার জাতি সমূহ তাদের ইবাদতের ঘর সমূহে সাজগোজ করে মানুষকে বিপথগামী করেছে। তোমরা কখনও তা করবেনা। যারা করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র লানত।" (বুখারী)

মানুষ যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের অনুসারী হয়, তখন তারা তাদের চরিত্রমাধুর্য দিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট করে ঈমানদার বানিয়ে পার্থিব জগতে সরল সহজ ও সাধাসিধে জীবনে দীক্ষিত করে। তারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে কে কতো সরল ও সহজ জীবন যাপন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তার প্রতিযোগিতা করে। তাদের মসজিদ ও বাসস্থান অতি সাধারণ হয়। তাদের পোশাকও তদরূপ হয়। ফলে বাইরের অপরিচিত লোকেরা তাদের দেখতে আসলে তাদের রাজা প্রজা, বা শাসক শাসিতদের দেখে "কে শাসক ও কে শাসিত" চিনতে পারে না। রাসূল (সঃ) এর নাম শুনে যখন মুশরিক ও কাফেররা দূর থেকে তাঁকে দেখতে আসতো, তখন কেউ দেখিয়ে না দিলে তারা তাঁকে চিনতে পারতো না। রাসূল (সঃ) এর অনুসারী উমর যখন জেরুজালেম বিজয়ের পর নগরীর চাবি গ্রহণ

করতে যায়, তখন সেখানকার খৃষ্টানরা উমর ও তাঁর চাকরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে উমরের চাকরকে উমর মনে করেছিলো। তাতে অনেকেই চমৎকৃত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা মদীনায় সেই সাদা সিধে জীবনেরই পত্তন করেন।

কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা মানুষকে তাদের দাস বানানোর জন্য পোশাকে জাঁকজমক আনে ও প্রাসাদ, মন্দির ও মসজিদকে কারুকার্যময় করে মানুষকে দিয়ে প্রাসাদ, প্রাসাদবাসী, মন্দির, মসজিদে পুরোহিত ও মোল্লাদের পূজা করায়।

উমাইয়া খলিফা ওসমানের আমলে মদীনার মসজিদের খেজুর গাছের খাম্বা ও খেজুর ডালির উপর কাদামাটির ঢালাই করা ছাদ পাল্টিয়ে তার স্থলে কারুকার্য খচিত পাথরের স্তম্ভ সুড়কির ছাদ এবং রং বেরঙ্গের এর দেয়াল ও মেঝের প্রচলন হয়। আসলে তখন থেকেই নবুওত ও রিসালাতের স্থলে আরব্য সাম্রাজ্যের পত্তন আরম্ভ হয়, এবং বিজিত দেশসমূহ থেকে সম্পদের ঢেউ মদিনায় আসতে আরম্ভ করে। পরে যখন নাম সর্বস্ব খেলাফতও বিদায় নিয়ে উলঙ্গ রাজতন্ত্র রেশমী পোষাকের ইসলামী(?) আলখেল্লা ও সিংহাসনের সাম্রাজ্য আরম্ভ হয়, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কার্যতঃ বিদায় দিয়ে লুণ্ঠিত ধনে প্রাসাদের পর প্রাসাদ, ও তদোপম উমাইয়া ও আব্বাসীদের মনিমুক্তা খচিত মস্‌জিদ্ নামের "দারুলফিতনা" বা ফিৎনার কেন্দ্র সমূহ গড়ে উঠে। এ গুলোর বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে মানুষকে তাক্ লাগিয়ে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর পরিবর্তে শাসকদের বন্দেগীর প্রবর্তন করা হয়। তাদের গুণ কীর্তন করে জুম'আ, ঈদ ও হজ্জে খুৎবার প্রচলন শুরু হয়। যা আজো চলছে। এ সমস্ত আরব দাজ্জালদের আল্‌হাম্‌রা ও বাগদাদের অনুকরণে তুর্কী, তাতার ও মুঘলদের প্রাসাদ ও প্রাসাদোপম মস্‌জিদ, ও ভারতবর্ষে তাজমহল, শীষমহল, ও তদরূপ মস্‌জিদ নামের বাবরী মস্‌জিদ ও শাহী মস্‌জিদ প্রভৃতি তৈরী করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর কা'বাহ্ ও মস্‌জিদে নববীর আদর্শের উপর কালিমা লেপন ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান যুগে আরব রাজা বাদশাহ ও শেখদের সূদ ও জুয়ার পয়সার ভিক্ষায় যে সমস্ত কারুকার্য খচিত মস্‌জিদ হয়েছে ও হচ্ছে, তাতে হেদায়েত না হয়ে মানুষ আরও গোমরাহ্ হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে। কারণ, এগুলো মস্‌জিদের নামে মাদীনার মসজিদে দেরারের বংশধর, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সঃ) এর হাতে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাসাদ ও প্রাসাদোপম মস্‌জিদ ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ (সঃ) দের নয়। এগুলো নমরূদ ও আবু জেহ্‌লদের মন্দির এবং মসজিদ। আল্লাহ্ কর্তৃক সুরা ওয়াদ্দোহায় বর্ণিত পন্থায় এতীম ও অনাথ মুহাম্মাদকে বারাকাহ্‌কে দিয়ে আজীবন লালন পালন করে আখেরী নবী ও রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামীন বানিয়ে সমাজের নির্যাতিত যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, ইব্‌ন মাস্‌উদ, আবু যার ও সালমানদের দ্বারা যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম আদর্শ পত্তন করেছিলেন, তাকে পুনর্বার পুনর্জীবিত না করলে পতিত মুসলিম ও মানব জাতির উত্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। অতি শীঘ্র তাওবা করে, নুতনভাবে কালেমা পড়ে কোনো দল বা জামাত ঐ মূল আদর্শের উপর না দাঁড়ালে নাম সর্বস্ব মুস্‌লিম জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণরা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতাসীন উমাইয়া ও আব্বাসী দাজ্জালীর প্রেতাত্মা বাদশা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীনীদের দ্বারা মুসলিম নিধন যজ্ঞের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে তার শেষ পর্ব আরম্ভ হবে। তার সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন।

বর্তমানে জাতি ও ভাষাভিত্তিক যে সমস্ত রাষ্ট্রসমূহ রয়েছে, এরা আবু জেহে্ল ও আবু লাহ্‌বদের ধর্মাবলম্বী।

আবু জেহ্‌ল ও আবু লাহবরা যেমন "জয় আরব ও জয় ক্বোরেশের" ধারক বাহক ছিলো, তদরূপ তাদের বর্তমান উম্মতরা "পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জয় বাংলা ও আল্ ইয্‌যাতু লিল আরব্" প্রভৃতি জাহেলী কলেমার জাত ও জাতি। আল্লাহ্, তাঁর খলীল ইব্রাহীম ও তাঁর আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এবং ইসলামের সাথে এদের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। এরা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে গণতন্ত্রের প্রবক্তা আব্রাহাম লিঙ্কনের ধর্মাবলম্বী। এরা মুস্‌লিম নয়। অপর দিকে ধর্মবেসাতী রাজনীতিবিদ ও শিয়া সুন্নীসহ ইত্যাকার ফেরক্বা ও মাযহাবের ব্যবসায়ী মোল্লারা, আবু সুফ্‌য়ান ও আব্বাসের বংশধরদের দ্বারা ছিন্তাইকৃত ইসলামের আল্‌খেল্লায় চালু করা উমাইয়া আব্বাসী রাজতন্ত্রের জঞ্জাল। বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র প্রকৃত দ্বীন ও তাঁর প্রেরীত আখেরী নবী (সঃ) এর আদর্শকে উৎপাটিত করে তার স্থলে ধর্মের নামে আরবী হিংস্রতাকে চালু করার জন্য যে ভাড়াটিয়া ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ভন্ড পীরগিরির জন্ম দেওয়া হয়, এরা তাদেরই তল্পিবাহক। আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামে আল্লাহ্ একমাত্র প্রভু, আল্লাহ্‌র নাজিলকৃত কিতাব একমাত্র বিধান ও শরীয়ত এবং রাসূল (সঃ) গণই একমাত্র আদর্শ, তার বাইরে কোনো মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও পীর,

ফকীর নেই।

এ সর্বনাশ প্রথম আরম্ভ হয়, যখন আলী, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আসের প্রতারণায় মুয়াবিয়া চক্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তখন আব্বাসের ছেলে আব্দুল্লাহ বস্‌রায় আলীর নিযুক্ত গভর্ণর ছিলো। তখন বস্‌রা, ইরান-ইউরোপ, ইরান-আরব ও আফ্রিকার মধ্যে সকল ব্যবসায়ী যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। ফলে আলীর খেলাফতের আমলে বস্‌রাই ছিলো রাজস্ব আমদানীর সর্ববৃহৎ উৎস। আলী বিশ্বাস করে তার আপন চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ্‌কে বস্‌রার গভর্ণর নিযুক্ত করে।

রাসূল (সঃ) এর বিদায়ের পর খেলাফতকে মক্কার ক্বোরেশী চক্র যে কুফরী গোত্রীয় রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের দিকে নিয়ে যায়, তাকে পুনঃ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের পথে ফেরৎ আনার সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে আলী রোমান খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। মুয়াবিয়ার পরদাদা উমাইয়া, সিরিয়ার দামেস্কে পালিয়ে গিয়েই মক্কাহ ও কা'বার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো। তাই উমাইয়ার প্রপৌত্র মুয়াবিয়া বনি হাশেম থেকে জন্মপ্রাপ্ত আখেরী নবীর (সঃ) এর দ্বীনকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র সেই সিরিয়ায় বসেই পাকানো আরম্ভ করে।

যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আলী তাঁর প্রাদেশিক গভর্ণরদের নিকট থেকে বাইতুল মাল, বা রাষ্ট্রীয় ভান্ডারের হিসাবসহ অর্থ পাঠাতে নির্দেশ দেয়। আব্দুল্লাহ তার পিতার অবৈধ পয়সায় লালিত ভোগবাদী ছিলো। বসরায় রাষ্ট্রীয় রাজস্বের অর্থ আত্মসাত করে সে তার বিলাসী জীবনে খরচ করে। অপর দিকে রাষ্ট্র প্রধান আলী কুফার বরফ জমানো শীতে মলমলের মতো পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে "আমীরুল মোমেনীন, বায়তুল মালের গুদামে কম্বল ও শীত বস্ত্র থাকতে আপনি প্রচন্ড শীতে কেন কাঁপছেন?"

উত্তরে আলী বলে "রাসূল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় এ ধরণের শীতবস্ত্রই আমাকে, ফাতেমা ও হাসান হোসেনকে দিতেন। এর চেয়ে উত্তম শীতবস্ত্র আমি কি করে গায়ে পরি?"

আলী যে শৈশব থেকেই নবীর নবুওতের ঘরে পালিত! যেমন রাসূল (সঃ) আল্লাহ্‌র বরকত দাসী মাতা বারাকাহ্‌র হাতে পালিত ছিলেন!

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস তো তার পিতার হারাম পয়সার প্রাচুর্য্যে পালিত। তাই বস্‌রায় বাইতুল মালের হিসাব দেয়া দূরের কথা, এক রাতের অন্ধকারে বাইতুল মালের সকল অর্থ নিয়ে পালিয়ে মক্কার নিরাপদ কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়। তায়েফে প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরী করে এবং তখনকার দিনে এক এক হাজার দিনার দিয়ে সুন্দরী সুন্দরী দাসী ক্রয় করে তার বালাখানা সাজায়। করবে না? তার পিতাও তো তা-ই করেছে! তার প্রপৌত্র আব্বাসী রাজারা বাগদাদে তাদের হারেমে হুরপরী ও মদের আসর নিয়েই মেতে থাকতো! চেঙ্গিস্‌ খান ও হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করে, তখন ইব্‌নে আব্বাসের নাতীদের হারেমে চেচ্‌নিয়া ও দাগেস্তানের শত শত নর্তকী, বাঈজী ও বেশ্যার স্বপ্নপুরী ছিলো। এমনিই কী আল্লাহ্‌র গযব আযাব হয়ে এসেছিলো বাগদাদের আব্বাসী রাজাদের উপর??!!

আলী যখন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাসের কীর্তি জানতে পারে, তখন এতোই মর্মাহত হয়েছিলো যে, সে তখন শোকের কাব্য রচনা করে এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র দরবারে মৃত্যু কামনা করে।

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের নিকট দূতের পর দূত পাঠিয়ে বাইতুল মালের লূণ্ঠিত অর্থ ফেরৎ চাইলে আব্বাসের পুত্র আলীকে জানায় যে, আলী বাড়াবাড়ী করে অর্থ ফেরত চাইলে সে অর্থ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দামেস্কে মুয়াবিয়াকে দিবে, আলীকে নয়।

এটাই তো স্বাভাবিক। তার বাবা আব্বাস মুয়াবিয়ার বাবা আবু সুফ্‌য়ানের সাথে মিলে রাসূল (সঃ) এর রিসালাতের ২৩ বছরের দীর্ঘ ২১ বছর রাসূল (সঃ) ও তাঁর দাওয়াতকে নির্বাপিত করার জন্য মক্কাহ ও আরব কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো। এবং পরে ইসলামকে নির্মূল করে পরবর্তিতে তাদের সন্তানরা পুনঃ ইসলামের নামে আরবী সিজার ও আরবী খস্‌রুদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে রাজ্যজয়ী ভোগ বিলাসের আগ্রাসী ধর্মে রূপান্তরিত করেছিলো। আজ পর্যন্ত ইসলাম সেই দুর্নাম নিয়েই পৃথিবীতে বেঁচে আছে।

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের সেই কান্ডের পর আলী আর বেশী দিন বেঁচে থাকেনি। হয়তো যে দোয়া আলী করেছিলো, তা আল্লাহর দরবারে ক্বুবুল হয়েছিলো। কিছু দিনের মধ্যেই এক আরবী ঘাতকের বিষাক্ত ছুরির আঘাতে আলী বিদায় নিয়ে তার প্রিয় রাসূল (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হয়। আল্লাহ্‌র বিধানে অকৃতজ্ঞ জাতির জন্য তিনি রহ্‌মতের শাসক রাখেন না। তাই অকৃতজ্ঞ ক্বোরেশ ও আরবদের মধ্যে প্রেরিত নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন ও

তাঁর সঙ্গীদের আল্লাহ্ মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই এক এক করে পৃথিবী থেকে তুলে নেন। এবং রাসূল (সঃ) এর সতর্কবাণী অনুযায়ী হিংস্র আরবদের উপর "মুলকুন আদুদ" অর্থাৎ "দাঁতে কামড়ানো পশুদের রাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ্‌র আখেরী নবী (সঃ) এর পূর্ণ রহমতের দ্বীনের ইমামত ও খেলাফত থেকে "দাঁতে কামড়ানো হিংস্র পশুরাজতন্ত্রে" হঠাৎ করে তো যাওয়া যায় না! তার পূর্বে মিথ্যা গল্প ও কিস্যা বানিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার চর্চা করে ইঞ্জিলকে বিকৃত করে নবীদের চরিত্র হনন করে ছিলো। সে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চাচাতো মামাতো ভাই আরবরা ওদের চেয়েও আগে বেড়ে রাসূল (সঃ) এর নামে দস্তুর মতো মিথ্যার বিশাল কারখানা তৈরী করে ফেলে।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের পূর্ণসূর্যখচিত উদ্ভাসিত মধ্য দিনের আলো থেকে হঠাৎ করেই আমাবশ্যা রাতের ঘন আঁধারে ফিরে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? কোথায় খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (সঃ) এর প্রদর্শিত আলোকে উদ্ভাসিত জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা, আর কোথায় তাঁর রিসালাত ও দ্বীনের আজীবন শত্রু, কুফর ও জাহিলিয়্যাতের যুগল নেতা আবু সুফ্‌য়ান ও আব্বাসের বংশধরদের আঁধারে নিমজ্জিত কুফরীর সাম্রাজ্য??!!

এখানেই সাম্রাজ্যবাদের সেবায় মিথ্যা ইসলামী ধর্মের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে যায়। আবু সুফয়ানকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য বড়ো বড়ো গল্প বানাতে হয়। যে আবু সুফ্‌য়ান ইস্‌লামী পরিভাষায় (رأس الكفر والأحزاب) অর্থাৎ "কুফ্‌র ও সম্মিলিত কুফ্‌রী নেতৃত্বের মাথা" ছিলো, তাকে ইস্‌লামী বানানো মোটেই সহজ কাজ ছিলো না।

মক্কাহ বিজয়ের পর আল্লাহ্‌র রাসূলের দেয়া সাধারণ ক্ষমায় প্রাণ ভিক্ষা পাওয়ার পর মাদীনায় আবু সুফ্‌য়ান কখনো আগ্‌বেড়ে রাসূল (সঃ) এর দরবারে কিছু বলতে গেলে হুজুর (সঃ) বলতেন, "মাহ্ মাহ্, ইন্নাকামরুউন ফীকা জাহিলিয়্যাহ্।" চুপ করো, চুপ করো, তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাহ্ ভরা। আব্বাস চাচা হওয়ার সুবাদে রাসূল (সঃ) এর নিকট গিয়ে একাধিক বার কোনো এলাকার দায়িত্ব পেতে চেয়েছিলো। প্রত্যেক বারই রাসূল (সঃ) তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর নবুওত জীবনের ২৩ বছরের ২১ বছরই এই চাচা ইস্‌লামের চির শত্রু আবু সুফ্‌য়ানের দক্ষিণ হস্ত ছিলো। তা কী আল্লাহ্‌র রাসূল ভুলতে পারেন? তাঁর এই চাচার পাপ তাঁকে আবু লাহ্‌ব ও আবু তালেবের দ্বীন প্রত্যাখ্যানকেই স্মরণ করিয়ে দিতো। আবু লাহ্‌ব সস্ত্রীক ও সপরিবার একটি পূর্ণ নাযিল কৃত সূরায় অভিশপ্ত হওয়ার পরও রাসূল (সঃ) এর অন্তর নিংড়ানো আবেদনে সাড়া না দিয়ে আবু তালিব কুফরীর অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তাতে রাসূল (সঃ) দুঃখ করে বলেন, "ইখ্‌তারান্নারা আ'লাল্ আ'র" অর্থাৎ "লোক লজ্জায় জাহান্নামের আগুন বেছে নিলো।" আব্বাসের অবস্থা দেখে তাই তার পাপের বোঝা হালকা করার জন্যই হয়তো রাসূল সঃ আব্বাস ও তার ছেলের পাপ মোচনের দোয়া করেন।

রাসূল বলেছেন, "উহুদের পাহাড়ও তার স্থান থেকে নড়তে পারে, কিন্তু মানুষের মজ্জাগত স্বভাব দূর হয় না।" মক্কাহ্ বিজয়ের পর বাহরাইনের লোকেরা বিনা যুদ্ধে ইসলামে প্রবেশ করে মাদীনায় প্রচুর অর্থকড়ি ও দ্রব্যাদি পাঠায়। তা মদীনায় পৌঁছার পর হুজুর (সঃ) মসজিদে নববীতে সাজাতে হুকুম করেন। তা দেখে হুজুর (সঃ) শুকরানা নামাজ আদায় করে স্বহস্তে বন্টন করতে বসেন। আব্বাস এসে তার বিরাট চাদর বিছিয়ে দান চায়। রাসূল (সঃ) তাকে যা দেয়া উচিৎ, তা দান করেন। কিন্তু আব্বাস তাতে তুষ্ট না হয়ে আক্বীল ও নিজের জন্য আরো চায়। তাতে হুজুর (সঃ) বিরক্ত হয়ে তার চাদর ভরে দান করেন। আব্বাস চাদর গুটিয়ে বিরাট বোঝা বাঁধে। তার পর রাসূল (সঃ) কে অনুরোধ জানায় কাউকে দিয়ে তার বোঝাটা তার ঘরে পৌঁছে দিতে। রাসূল বলেন, "না তোমার বোঝা তোমাকেই নিতে হবে।" আব্বাস বলে, কেউ তার বোঝাটা একটু তার ঘাড়ে তুলে দিক। রাসূল (সঃ) বললেন, "তাও হবে না, তোমার বোঝা তোমাকেই তুলে নিতে হবে।" তারপর আব্বাস নিজে বোঝাটা তুলতে চেষ্টা করে। এতো ভারী ছিলো তার বোঝা যে, সে তা আর তুলতে পারলো না। অগত্যা কিছু কমিয়ে কিছুটা হালকা করে নিজে ঘাড়ে তুলে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার পথে যতক্ষণ আব্বাসকে দেখা যাচ্ছিল, হুজুর (সঃ) তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং তার লোভের কথা বলছিলেন। (বোখারী, কিতাবুস সালাত্)

আবু সুফয়ানও তার বন্ধু আব্বাসেরই মতো দুনিয়াদার ও প্রচন্ড লোভী ছিলো। উমরের শাসন আমলে তার ছেলে মুয়াবিয়া দামেস্ক থেকে বাইতুল মালের অর্থ ও মালামাল পাঠালে মাদীনায় পৌছার পথে আবু সুফ্‌য়ান পথে আটকিয়ে বাহকের কাছ থেকে কিছু মালামাল জোর করে আত্মসাৎ করে। বাইতুল মালের বাহকের মুখ থেকে ঘটনা শুনেই উমর সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফয়ানকে ধরিয়ে এনে বাইতুল্ মালের সম্পদ ছিনতাইয়ের জন্য চাবুক মারা আরম্ভ করে এবং বলে "আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের শত্রু, তোমার এতো বড় স্পর্ধা যে তুমি বাইতুল মালের উপর হাত দিয়েছো?"

আবু সুফ্য়ান বললো, "আমিরুল মোমেনিন, আমি এখনি গিয়ে তা ফেরৎ এনে দিচ্ছি।" উমর বললো, "তুমি যেতে পারবেনা। তুমি যদি পালিয়ে যাও? কাউকে পাঠাও যা যা নিয়েছো তা ফেরৎ আন্তে।"

আবু সুফ্য়ান বললো, "আমীরুল মোমেনিন, হিন্দা আমাকে মেরে ফেললেও অন্য কারো কাছে মাল ফেরৎ দেবে না, যে পর্যন্ত সে আমার বিপদের কথা না জানবে এবং আমার কোনো চিহ্ন না পাবে।"

তখন আবু সুফ্য়ান চিহ্ন স্বরূপ তার হাতের আংটি খুলে খলিফার পেয়াদার হাতে দেয়ার পর সে গিয়ে আবু সুফ্য়ানের ঘর থেকে বাইতুল মালের সম্পদ ফেরৎ আনলে উমর তাকে মুক্তি দেয়।

আবু বকর খলিফা হয়ে হজ্জে মাক্কাহ্ গিয়েছে। তখন খলিফা হজ্জে গেলে মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তার সমাধান করতো। আবু বকরের বাবা তখনও বেঁচে ছিলো কিন্তু দৃষ্টি শক্তিহীন অন্ধ ছিলো। এক ব্যক্তি মক্কায় আবু সুফয়ানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে খলিফা আবু বকরের নিকট নালিশ করলে খলিফা আবু সুফ্য়ানকে ডেকে শাসাতে আরম্ভ করে। আবু বকর মৃদু ভাষী লোক ছিলো। উচু আওয়াজে সাধারণতঃ কথা বলতো না। আবু বকরের অস্বাভাবিক উচুঁ গলার শাসানী শুনে তার অন্ধ পিতা জিজ্ঞাসা করে, "আমার ছেলে কাকে ধমকাচ্ছে?"

তাকে যখন বলা হলো যে খলিফা আবু সুফয়ানকে ধমকাচ্ছে। তখন আবু বকরের অন্ধ পিতা দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে বললো, "এ কেমন কথা, তুমি আমাদের রাজাকে ধমকাচ্ছো?" কারণ, আবু বকরের বাবা ইবনে ক্বোহাফা মক্কাহ বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলো। আবু সুফয়ান ছিলো মক্কাহ ও সারা আরবের কুফরীর নেতা। তাই আবু বকরের নওমুসলিম অন্ধ পিতার অন্তরে তখনো জাহেলিয়াতের নেতৃত্বের প্রভাব বিদ্যমান ছিলো।

উত্তরে আবু বকর তার পিতাকে বলেছিলো ঃ

"বাবা আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের বিজয়ের দ্বারা কিছু ঘরকে সম্মানিত করেছেন এবং কিছু ঘরকে লাঞ্চিত করেছেন। আল্লাহ্ তার দ্বীনের বরকতে ইবনে আবি ক্বোহাফাহ আবু বকরের ইসলামী ঘরকে সম্মানিত করেছেন এবং কুফ্রীর জন্য আবু সুফ্য়ানের ঘরকে নীচে নামিয়েছেন।

আবু বকরের মৃত্যুর পর খলিফা হয়ে উমরও হজ্জে আসলো। এবার হজ্জে এসে হাজীদের চলাচলে অসুবিধা হয় বলে হুকুম জারী করে যে, হজ্জের মৌসুমে কোনো মক্কাহ্বাসী যেনো রাস্তায় দোকানপাট এবং বাড়ীর সামনে চকি সামিয়ানা লাগিয়ে চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটায়।

পরিদর্শণে বের হয়ে খলিফা উমর দেখতে পায় যে, আবু সুফয়ান তার বাড়ীর সামনে সামিয়ানা ও চকি সাজিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। দেখা মাত্রই উমর তার দোররা দিয়ে আবু সুফ্য়ানকে 'খলিফার হুকুম অমান্য' করার শাস্তি দিচ্ছিলো। এমন সময় আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দা ঘর থেকে বের হয়ে ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো ঃ

"হায় কপাল! হে খাত্তাবের বেটা (উমর) তুমি আমার স্বামী আবু সুফয়ানকে জনসমক্ষে বেত্রাঘাত করলে! আমাদের এমন একদিন ছিলো যে তুমি খাত্তাবের বেটা অসম্মানের সাথে আবু সুফ্য়ানের দিকে তাকালে তোমার চক্ষু উপড়ে দেয়া হতো।"

হিন্দার উক্তি শুনে খলিফা উমর আল্লাহ্র শুকুর করে বলেছিলো ঃ "হ্যাঁ হিন্দা, তুমি ঠিকই বলেছো। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের উসিলায় খাত্তাবের বেটার ঘরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং কুফরীর জন্য আবু সুফ্য়ানের ঘরকে অধঃপতিত করেছেন।" مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ সঃ ও তাঁর সঙ্গীরা কাফেরদের উপর ভীষণ কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত দয়ালু।" (সূরা ফাত্হ্, আয়াত ২৯)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শনের জন্য বিশ্বাসী মানব গোষ্ঠির বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক পরিবার গঠনের জন্য সমান অধিকারের ভিত্তিতে মাক্কাহ্কে ঈমানদারদের মুক্তাঙ্গন বানিয়ে ইব্রাহীম খলীল (আঃ) ও মুহাম্মাদ রাহ্মাতুল্লিল আলামিন (সঃ) কে দিয়ে তা ক্বোরআনে বিশ্বময় মানুষের জন্য ক্বেয়ামত পর্যন্ত ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন। সেই মক্কাহ্ আল্লাহ্র শেষ নবী (সঃ) এর দ্বারা শেষবারের মতো মু'মিনদের জন্য বিজয়, পবিত্র ও মুক্ত করেন। বিজয়ের সময় মক্কার কাফেরদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ক্ষমার দ্বারা প্রাণভিক্ষা প্রাপ্ত কাফের ও মুশরিকদের ভবিষ্যৎ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রাসূল (সঃ) যেমন স্বয়ং সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাঁর অনুসারীদেরও তিনি বার বার ওদের সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে যান।

আবু সুফ্য়ান গংরা ঈমান এনে মুসলিম হয়ে থাকলে আবু বকর ও উমর কি তা জানতো না? তারা ইস্‌লাম গ্রহণ করে মুসলিম হলে খলিফা আবু বকর ও উমর উপরে উল্লেখিত উক্তি সমূহ আবু সুফ্য়ান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে কখনো করতো কী? তা কী কখনো কল্পনাও করা যায়? অথচ এ আবু সুফ্য়ানের ছেলে ও নাতির দ্বারা প্রথমে ইসলামী বিপ্লবের ফসল মাদীনাহ্ থেকে রোমানদের ছত্রছায়ায় দামেস্কে ছিনতাই হয় এবং পরে ইয়াযিদের হাতে তা হত্যা ও সমাহিত হয়ে তার কবরের উপর পরিবার ও গোত্রের সুন্নী (?) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর পুনঃ আবু সুফ্য়ানের বন্ধু আব্বাসের বংশধররা সে সাম্রাজ্য সিরিয়া থেকে ছিনতাই করে বাগদাদে এনে ইরানীদের সাথে মিলে প্রথমে উমাইয়া বিরোধী "হাশেমী আব্বাসী" রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। পরে আব্বাসী ও শিয়া দ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষ রোপন করে যায়। বর্তমান বিশ্বে সুন্নী-শিয়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত নাম সর্বস্ব মুসলিমবিশ্ব যে জীবন মৃত্যুর শেষ প্রহর গুনছে, তা সেই বিষবৃক্ষেরই বিষফল। ইরান ও আফগানিস্তানে বর্তমানে তারই শেষ তামাশা চলছে। ইরানী শিয়ারা সুন্নী ঠেকানোর জন্য কাফের ইন্ডিয়ার সাথে একত্র ও একজোট হয়েছে। তালেবানরা সুন্নী ফেরক্বা ত্যাগ করে তওবা করে রাসূল (সঃ) এর আদর্শের মুসলিম হলে আবার বদর ও হুনাইনের মতো আল্লাহ্‌র ফেরেশতা সৈনিক নেমে শুধু আফগানিস্তান নয়, সারা বিশ্বের ইসলামী ইমামত পাকা ফলের মতো ওদের কোলে পড়তো। সুন্নী ফেরক্বার জন্য তালেবানরা এখনো মার খাচ্ছে এবং খাবেও। "আনসার" ও "মোহাজের" এর ফাটল সৃষ্টি করে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর দ্বারা যে সর্বনাশ করে ক্বোরেশরা ইসলামী উম্মার স্থলে জাহিলিয়্যাতের প্রচলন করে, আলী নিহত হওয়ার পর আবু সুফয়ানের ছেলে মুয়াবিয়া ও আব্বাসের ছেলে আব্দুল্লাহ তাদের পিতাদের মতো পুনঃ "দু'দেহে এক প্রাণ" হয়ে যায়। রাসূল (সঃ) এর আদর্শ থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চালিত করা চাট্টিখানী কথা ছিলো না। এ কথা স্মরণ করা মাত্রই কি আমাদের গা শিউরে ওঠে না? ঈমান থাকলে অবশ্যই ওঠে।

বস্‌রা থেকে লুটে আনা অর্থ দিয়ে আব্বাসপুত্র মক্কাহ ও তায়েফে দাস দাসী কিনে দুনইয়ার বেহেশ্‌ত্ তৈরী করে। অপর দিকে তার পিতার বন্ধুপুত্র মুয়াবিয়া দামেস্কের বাইতুল মালকে তার পৈত্রিক সম্পদ বানিয়ে রোমান সীজার সেজে তার ছেলে ইয়াযিদকে "আমীরুল মোমেনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন" রূপে রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। পিতা পুত্র একই পানপাত্র ও নারী নিয়ে কাড়াকাড়ি করতো বলে 'সুন্নীদের' কিতাবে তার ভুরি ভুরি বর্ণনা পাওয়া যায়। অথচ রাসূল (সঃ) এর জীবদ্দশায় সাধারণ ক্ষমায় প্রাণ ভিক্ষা পাওয়া মুয়াবিয়ার এ অবস্থা ছিলো যে, সে নিজের দু'বেলা খাবার যোগাতে অপারগ ছিলো। এক মহিলা রাসূল সঃ এর দরবারে মুয়াবিয়ার সাথে বিয়ের পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে বলেনঃ "মুয়াবিয়া তো নিজের অন্নই যোগাতে অপারগ, তোমাকে সে কি করে পুষবে?" ইসলাম বিরোধী শক্তির দু'নেতার ছেলেরা প্রথমে তাদের পিতাদের নামে পরস্পর মিথ্যা হাদীস তৈরী আরম্ভ করে। প্রথমে ইবনে আব্বাস ক্ষমতায় বসা রাজা মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের নামে এক দীর্ঘ হাদীস দাঁড় করে। তাতে দেখানো হয় যে, রোমান রাজার দরবারে গিয়ে আবু সুফ্য়ান মহানবী সঃ এর উত্থান, তাঁর চরিত্র তাঁর সঙ্গীদের গুণাবলী ইত্যাদী সম্পর্কে এমন সাজানো বর্ণনা দেয় যে, তাতে মনে হয় আখেরী নবী সঃ এর সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো সমঝদার নেই।

এ হাদীসের আসল বর্ণনা কারী স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ আব্বাস। সে যখনকার ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে, তখন ইব্‌ন্ আব্বাসের জন্মও হয়নি। রাসূল (সঃ) এর রিসালাত প্রাপ্তির প্রথম যুগের ঘটনা। রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালের সময় ইব্‌ন্ আব্বাসের বয়স ছিলো মাত্র আট থেকে দশ বছর। আর সে বর্ণনা করেছে তার জন্মের পূর্বের ঘটনা! মিথ্যুকরা মানুষকে বোকা মনে করে মিথ্যা রচনা করে। আবু সুফ্য়ান যদি আখেরী নবী (সঃ) সম্পর্কে এতোই সমঝদার ছিলো, তা হলে সে কী করে মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত আজীবন ইস্‌লাম ও রাসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দিলো? মক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বের রাত্রে যখন তার বন্ধু আব্বাস তাকে বলে যে কাল রাসূলুল্লাহ মাক্কাহ্ দখল করবেন, তখন কিভাবে আবু সুফ্য়ান বলে যে "তা হলে তো তোমার ভাতিজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো"! কিভাবে বলে ? আব্বাস যখন আবু সুফ্য়ানকে সাধারণ ক্ষমার জন্য রাসূল (সঃ) এর দরবারে নিয়ে উপস্থিত করে, তখন হুজুর (সঃ) আবু সুফ্য়ানকে বলেন "তোমার কি এখনো বিশ্বাস হচ্ছেনা যে আল্লাহ্ এক?" তদুত্তরে কুফরের নেতা বলে "মনে তো হয় তাই। কাল সকালে আমার পরাজয় ও তোমার বিজয় হতে যাচ্ছে। যদি আল্লাহ্ একাধিক হতো তা হলে একজন তো আমার পক্ষে থাকতো"। আদম সৃষ্টির সময় ইবলিস্ যেমন সত্যের পক্ষে সোজা উত্তর দেয়নি, আল্লাহ্‌র হাবীব শেষ নবী সঃ এর প্রশ্নের জবাবও ইব্‌লিসের ক্বোরেশী শিষ্য সোজা ভাষায় দেয়নি।

তারপরও রাসূল সঃ বলেন "আমি যে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ ব্যাপারে কি তোমার সাক্ষ্য দেয়ার সময় আসেনি?" উত্তরে সম্মিলিত কুফর ও সম্মিলিত কুফরী প্রতিরোধের নেতা আবু সুফিয়ান বলে "তোমার নবী হওয়ার ব্যাপারে এখনো আমার মনে সন্দেহ রয়েছে?"

এই হলো আবু সুফ্‌য়ান। তারপরও মাক্কায় রক্তপাত এড়ানোর জন্য রাসূল (সঃ) তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে প্রাণ ভিক্ষা দান করেন। তাদেরকে বিশেষ পরিভাষা "তোলাক্বা" বলে অবিহিত করেন। যার অর্থ হলো "দয়া করে ছেড়ে দেয়া"। এ পুরো বর্ণনাই বোখারীর। মক্কাহ বিজয়ের পর রাসূল সঃ তায়েফ অভিযানে যান। তাতে প্রথম পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল সঃ এর বিপর্যয় দেখেই আবু সুফ্‌য়ান তার বন্ধু আব্বাস্‌কে ডেকে বলে উঠে, "চলো চলো আব্বাস্‌, আমরা সবার আগে মাক্কাহ্‌ গিয়ে পুনঃ কুফরীর পতাকা উড়িয়ে দেই। তোমার ভাতিজার সকল যাদু-মন্ত্র শেষ, এবার তারা লোহিত সাগরে নিক্ষিপ্ত হবে।" এ কথা কী কোনো মুস্‌লিম বলতে পারে? তখনো আবু সুফ্‌য়ান ঈমান আনেনি।

খলিফা আবু বকরের আমলে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হচ্ছে। আবু সুফ্‌য়ান তার বাপ দাদাদের মিত্র রোমানদের বিজয় কামনা করে সে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করতে যায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে তখনকার পরাশক্তির হাতে অবশ্যই তার ও তার বাপ দাদার শত্রু ইসলাম ও মুস্‌লিমদের পরাজয় হবেই এবং সে তার পরদাদা উমাইয়ার মতো রোমানদের সাহায্যে মক্কার একচ্ছত্র নেতৃত্ব লাভ করবে ।

প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। একদিকে তখনকার দু' সুপার পাওয়ারের এক পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত সেনাবাহিনী, অপর দিকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনের পতাকাবাহী দরিদ্র ও দুর্বল মুসলিম বাহিনী। রোমান তাগুতী শক্তি তাদের পার্থিব সমর সম্ভারে ও রণ কৌশলে মত্ত হয়ে নিশ্চিত ভেবেছিলো যে, প্রথম আক্রমনেই তারা ঈমানের সৈনিকদের নির্মূল করে উড়িয়ে দেবে। সেভাবেই আক্রমন তারা করেছিলো। আবু সুফ্‌য়ান পাহাড়ে চড়ে তার ও তার বাপ দাদার খোদা, লাত, মানাত, উয্‌যা ও হোবলকে ডাকছিলো মুসলিমদের পরাজয় এবং রোমানদের জয়ের জন্য। যেমন সে বদর, উহুদ, আহ্‌যাব্‌ ও হুনাইনের যুদ্ধের সময় ডেকেছিলো। আবু সুফ্‌য়ানের এই কান্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে আব্বাস। তারা তখনো মাত্র তেরো চৌদ্দ বছরের বালক। অল্প বয়সের জন্য তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। নারীদের সাথে তাদেরও যুদ্ধের ময়দানে নেয়া হতো মুসলিম সেনাবাহিনীর খাওয়া দাওয়া, আহতদের সেবা এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য।

ছোটদের ও নারীদের এবং বৃদ্ধদের যুদ্ধের সময় নিরাপদ স্থানে রাখা হতো। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে যুবাইর বলে ঃ "যুদ্ধ আরম্ভ হতেই রোমানরা এমন প্রচন্ড আক্রমন করে যে মুসলিম বাহিনী পশ্চাদাপসারণ করতে বাধ্য হয়। রণক্ষেত্রের চিৎকারে বিচলিত হয়ে আমি পাহাড়ে উঠে যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য ছুটে যাই। মুসলিমদের পরাজয়াবস্থা দেখে আমি বিচলিত হই। ছুটা ছুটির মাঝে আমি এক জায়গায় গিয়ে দেখতে পাই যে আবু সুফ্‌য়ান চিৎকার দিয়ে রোমানদের উৎসাহিত করছে, আর বলছে "ইয়া বনুল্‌ আস্‌ফার আবিদুহুম্‌" হে সোনালী চামড়ার সৈন্যরা, মুহাম্মাদের সৈন্যদের নির্মূল করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও, এ সুযোগ হারালে তোমরা আর দাঁড়াতে পারবে না।"

ইব্‌ন্‌ যুবাইর বলে যে আবু সুফ্‌য়ান মুসলমানদের নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভবনা দেখে এমন উন্মাদ হয়ে যায় যে, আমি যে তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কান্ড দেখছি সে দিকে তার কোনো খেয়ালই নেই। সে এক মনে তার দেব দেবীদের ডাকছে এবং রোমানদের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করছে। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে অন্য কাউকে আবু সুফ্‌য়ানের অবস্থা দেখানোর জন্য ডাকতে যাই।

ইতিমধ্যেই আল্লাহ্‌র রহমতে আল্লাহ্‌র সৈনিকরা পাল্টা আক্রমন করে রোমানদের পিছু হটাতে আরম্ভ করে এবং শেষে পরাজিত করে। আমি পুনঃ দৌড়ে আবু সুফ্‌য়ানের অবস্থা দেখতে যাই। গিয়ে দেখি, মুসলমানদের বিজয় ও রোমানদের পরাজয়ে আবু সুফ্‌য়ান গলাকাটা দুম্বার মতো চিত হয়ে মাটিতে পড়ে প্রলাপের মতো বকছে "হায় হায়, সর্বনাশ হয়ে গেলো। এ সুযোগ আর কখনো আস্‌বেনা। হায়, বনুল আস্‌ফার এ কি হলো? তোমাদেরও পতন হলো! ইত্যাদি।"

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন্‌ যুবাইর আবু বকরের বড়ো মেয়ে আসমার ছেলে, রাসূল সঃ এর হাওয়ারী যুবাইর ইবনুল আওয়াম তার বাবা। মাদীনাহ্‌ হিজরতের পর মুহাজিরদের ঘরে জন্মানো প্রথম সন্তান এই আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন্‌ যুবাইর। তার জন্মে রাসূল

সঃ, আন্সার ও মুহাজির সবাই আনন্দ করেছিলেন। রাসূল সঃ স্বয়ং খেজুর চিবিয়ে তাঁর মুখ থেকে খেজুরের মধু নবজাতকের মুখে দিয়ে তার তাহ্নিক্ করেছিলেন।

ইসলামের রহ্মতকে উৎখাত করে মুয়াবিয়া কর্তৃক তার ছেলে ইয়াযিদকে আরবী জাহিলিয়্যাতের রাজা বানানোর পর ইতিহাসের সবচাইতে মর্মান্তিক ইমাম হোসেনের কারবালার ঘটনা ঘটে। এরপর একমাত্র আব্দুল্লাহ্ ইব্ন্ যুবাইরই পুনঃ মক্কায় রাসূল সঃ প্রবর্তিত ইস্লামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আবু সুফ্য়ানের নাতি ও মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াযিদ তার বর্বর বাহিনী দিয়ে মাদীনায় বদরী সাহাবাদের হত্যা, দশ হাজার মাদীনাহ্বাসীকে নিধন, মাদীনায় গণধর্ষণ ও মাস্জিদে নববীকে অপবিত্র করার পর মাক্কাহ্ অবরোধ করে কাবাহ্ ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে ছাইয়ে রূপান্তরিত করে। তারপর আব্দুল্লাহ্ ইব্ন্ যুবাইরকে হত্যা করে তার লাশ কাবাহ্ ঘরের চত্বরে কয়েক দিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর ইব্ন্ যুবাইর আবু সুফ্য়ানের কীর্তি কান্ড বিজয়ী মুস্লিম সেনাপতি আবু উবাইদাহ্ ও রাসূল সঃ এর সাহাবাদের নিকট বর্ণনা করলে সবাই বলে "রা'সুল্ আহ্যাবি ওয়াল কুফ্র" সম্মিলিত কাফেরদের নেতা ও তাদের মাথা! তারা মাদীনাহ্ ফিরে আবু সুফ্য়ানের ঘটনা উমর ও অন্যান্যদের জানালে তারাও আবু সুফ্য়ান সম্পর্কে একই মন্তব্য করে।

আবু সুফ্য়ানের আরেক ঘটনা। উমাইয়া বংশের প্রতি দুর্বল ওসমান খলিফা হওয়ার পর ওসমানের ভরা দরবারে বনু উমাইয়ার লোকদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করে "তোমরা এই প্রথম বনু হাশেম থেকে ক্ষমতা পেলে। তোমাদের সকল শক্তি দিয়ে একে আঁকড়ে ধরবে। এ সুযোগ হারালে তোমরা কখনো তা আর পাবেনা।"

এরপর কিছুদিন পর আবু সুফ্য়ান মাদীনার নিকটবর্তি উহুদের প্রান্তরে পা'চারী করতে যায়। তার পেছনে দু'কিশোরও সেখানে উপস্থিত হয়। এ কিশোর দুটি আব্দল্লাহ্ ইব্ন্ যুবাইর ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন্ আব্বাস। বয়সে তারা সমান। তারা দেখতে পায় যে, আবু সুফ্য়ান বদরের যুদ্ধের বীর হাম্যার ক্ববরে লাথি মারছে আর স্বগত বলছে, "বদরের যুদ্ধে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য তুমি আমাদের লোকদের হত্যা করেছিলে, আজ সে ক্ষমতা উমাইয়া বংশের ঘরের বাঁদী"। অর্থাৎ ওস্মানের মাধ্যমে এ ক্ষমতা তাদের হাতে এসেছে।

এ ঘটনাও দু' আব্দুল্লাহ্ মাদীনায় দৌড়ে এসে আলী, তাল্হা, যুবাইর ও আব্দুর রহ্মান্ ইব্ন্ আউফ্দেরকে জানায়। তারা আবার অন্যান্য প্রধান সাহাবাদের একত্র করে ঐ দু'কিশোরকে দিয়ে তাদের মুখে আবু সুফ্য়ানের ঘটনা জানায়। এই আবু সুফ্য়ানের ছেলে ও নাতি কর্তৃক ইস্লামের "বিশ্ব রহমত" পরিবর্তিত হয়ে আরবী লানত ও অভিশাপ হয়ে বিশ্বকে গ্রাস করে। এ হিংস্র নেকড়েকে ইসলামী পোষাক ও পাগড়ী পরাতে বহু মিথ্যা হাদীস বানাতে হয়। কারবালায় হোসাইন ও তার পরিবারকে হত্যা করার পর হোসাইনের কাটা মাথাকে হাতের ছড়ি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইয়াযিদ বলেছিলো "বদরের বদলা নিলাম"। বদরের বদলা কি কোন ঈমানদার মানুষ নিতে পারে?

পার্থিব পাশবভোগ, ঈমানহীন কুফরীআত্মা ও জাহিলিয়্যাতের অবৈধ রক্তের বাঁধন কাটা বড়ই কঠিন কাজ। কারণ, স্বয়ং ইব্লিস শয়তান এদের জন্মের সময় এদের পিতামাতার সাথে সহবাসে অংশ গ্রহণ করে وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (সূরা বনী ইসরাঈল-৬৪)

সাধারণ ঈমানদার স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ না বললে যেখানে শয়তান জন্মে শরিক হয়,সেখানে সম্মিলিত কুফরের মাথা ও নেতা এবং তার সুদখোর বন্ধুর সন্তানদের রক্তে ও মাংসে ইবলিশের শেয়ার কতটুকু?

আজ দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর পরও যাদের দংশনের বিষে আখেরী নবী সঃ এর বয়ে আনা রহ্মত ইসলাম কলুষিত, মুসলিম জাতি স্বদেশে বিদেশে কুখ্যাত এবং বিশ্বের নির্যাতিত আদম-হাওয়ার সন্তানেরা মুক্তির খোঁজে পাগল হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকে মুক্তির "একমাত্র পথ" হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ, তখন, আল্লাহ্, ইসলাম ও তাঁর আখেরী নবী সঃ এর উপর বিশ্বাসী ঈমানদারদের সর্ব প্রথম ফরজ বা দায়িত্ব হলো ইসলামের উপর ক্বোরেশ ও আরবদের প্রলেপিত কালিমা ধুয়ে মুছে ইসলামকে একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দ্বীন রূপে বিশ্ব-সমাজের সামনে নূতন করে উপস্থাপন করা। এ দায়িত্ব নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতির চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, দ্বীন তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে, তার দ্বারা মানুষের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণ হয়। যেমন বর্তমান প্রাণহীন নামাজ, রোজা মানুষকে দিন দিন অধঃপতনের অতলে নিয়ে যাচ্ছে। এই বই একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্র দ্বীন ও তাঁর রাসূল সঃ এর আদর্শের

উপর আরব বর্বর, দুর্বৃত্ত কপট মুসলিম শাসক ও তাদের লালিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রলেপিত কালিমা দুর করার জিহাদ। প্রচলিত কোনো কিতাব ও পুস্তক রচনার প্রচেষ্টা নয়। তাই বিরোধীদের বিরোধিতা ও নিন্দুকদের নিন্দা এ রচনার উদ্দেশ্য ও প্রচারকে সামান্যও বাধা দিতে পারবে না। এর উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তাঁর নবীদের অনুসরণ এবং বিশ্বের সকল অশুভ শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা।

আল্লাহ্ তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ সঃ কে দিয়ে তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করে তাতে পূর্ণতার সীলমোহর মেরেছেন। তাই শেষ নবী (সঃ) খাতামুন্ নাবিয়্যীন। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর ও উমরের প্রচেষ্টায় দ্বীনের যে অনুশীলনী আরম্ভ হয়, তা উমাইয়াদের দ্বারা অপহৃত হয়ে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন পথে চালিত হয়। এ কারণেই আজ আমরা বিশ্বে ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও ব্রাক্ষন্যবাদের বলির পাঠা। এ বলি শুরু হয় কাফের আবু সুফ্য়ান ও তার দোসর আব্বাসের বংশধরদের হাতে মাক্কা, মাদীনা ও কারবালায়। এবং বর্তমানে তা হচ্ছে, ফিলিস্তিন, বস্নিয়া, আলজেরিয়া, মিসর ও কাশ্মীরে। আগামীকাল তা শুরু হবে সারা বিশ্বে একযোগে। তা ক্বেয়ামতের পূর্বে পার্থিব ক্বেয়ামত হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ হযরত ইব্রাহীমকে দিয়ে কা'বাহ তৈরী করে তাকে বিশ্বমানবের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের কেন্দ্ররূপে ঘোষণা দেওয়ান। মুহাম্মাদ সঃ এর দ্বারা পূনর্বার মক্কাহ বিজয় ও বিদায় হজ্জের দ্বারা তা সত্যায়িত করেন। সে থেকে মক্কাহ মুস্লিম উম্মাহর মুক্তাঙ্গন। মুস্লিম উম্মাহর ইমাম "ইমামুল মুমেনীন" এর নেতৃত্বে "হজ্জ" হবে। তার নেতৃত্বে বিশ্বের ঈমানদার লোকেরা এক অবিভাজ্য জাতি হবে এবং গোটা বিশ্বে তার নিয়োজিত নায়েবদের পেছনে সালাতের জামাত, জুম'আ ও ঈদ হবে। এটাই ইসলাম। এ ইসলামই আল্লাহ্র দ্বীন। যত দেশ, তত জাত ও তত রাষ্ট্র এবং অলিতে গলিতে মস্জিদ, এটাই শির্ক এটাই কুফর। এ জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তাগুতের। এ তাগুতের ইমাম ইব্লিস এবং U.N. তার মক্কাহ। মক্কাহ্, কা'বাহ্ মাসজিদুল আক্সা এবং মাদীনায় রাসূল সঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের অনুসারী মুস্লিম জাতির প্রত্যেকের পারিবারিক ঘর, ঈমান ও দ্বীন চর্চার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পারিবারিক মসজিদ। মহল্লা বা এলাকার মস্জিদ, এলাকার সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র ও ওয়াক্তিয়া নামাজের মস্জিদ। ইমাম সে এলাকার আমীর।

ধর্মহীন ও ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজে প্রত্যেকটি পারিবারিক ঘর এক জোড়া নরনারীর দাম্পত্য ব্যভিচারের ঘর। টেলিভিশন, ভিডিও ও ভিসিআরে প্রচারিত অশ্লীলতা এদের পারিবারিক জীবনের বিনোদন ও পাপাত্মার খোরাক এবং চালিকা শক্তি। ঐচ্ছিক লোক দেখানো নামাজ, রোজা, জুমা, ঈদ, হজ্জ এদের জাতীয় প্রতারণা ও মিথ্যাচার। এই নামাজী মুসল্লীদেরই আল্লাহ্ বলেছেন, (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ)এ মুসল্লীদের জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে শুধুই অভিশাপ আর অভিশাপ। এ নামাজীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন।

এক আল্লাহ্র এক কেন্দ্রিক কা'বা ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থাকে নস্যাত্ করে শয়তান সর্বশেষ যে বিশ্বব্যবস্থা চালু করেছে, তার কেন্দ্র U.N. বা জাতিসংঘ। সৃষ্টির উৎস থেকে যেমন স্রষ্টা আছেন, তাঁর ধর্মও তখন থেকেই বিদ্যমান। নমরুদের যুগে যেমন ধর্ম ছিলো, তেমন ফের্আউনের আমলেও ধর্ম ছিলো। নবী মূসা আঃ যেমন নামে মূসা ছিলেন, তেমনি স্বৈরাচারী ফের্আউনের নামও মূসাই ছিলো। মূসা আঃ এর রিসালাত সম্পর্কে ফের্আউন তার দেশবাসীকে বলেছিলো, "মূসাকে নির্মূল করা না হলে সে দেশের ধর্মকে বদলে ফেলবে এবং ধরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।" এতএব, ফের্আউনেরও ধর্ম ছিলো, যেমন বর্তমান জাতীয়তাবাদী বর্ণবাদীদেরও দেশে দেশে তাদের মর্জি মাফিক "ধর্ম" রয়েছে। إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (গাফির-২৬)

দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধান যখন ধর্মের অনুসারী আল্লাহ্র দাস হয়, তখন সে দেশ ও জাতি ধর্মীয় ও ধার্মিক হয়। আর যে মুহুর্তে দ্বীন বা ধর্ম দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের অধীন হয়, তখনই সে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র কাফের হয়। যেমন ইব্রাহীম আঃ বিরোধী নমরুদ রাজা ও তার রাজ্য ছিলো এবং মূসা আঃ বিরোধী রাজা ফের্আউন ও তার রাজ্য ছিলো। একই ভাবে মুহাম্মাদ সঃ বিরোধী ক্বোরেশ নেতা আবু লাহাব, আবু জেহ্ল্, আবু সুফ্য়ান, আব্বাস, তাদেরও জাতি ছিলো ধর্ম ছিলো। এ ধরণের বিভক্ত জাতি সত্তাই কুফর।

আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃকে দিয়ে তাঁর ঘর কাবাহ্ ও কা'বার দেশ সম্পূর্ণ আরব ব-দ্বীপকে মুক্ত ও পবিত্র করে সে দেশ ও তার বাসিন্দাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের অধীনস্থ আদর্শ জাতির আদর্শ স্থাপনের দায়িত্ব বুঝিয়ে তাঁর নবীকে ফেরৎ নিয়ে যান।

নবী সঃ এর বিদায়ের পর আবু বকর ও উমর তাদের শক্তি ও সীমিত বুঝ অনুযায়ী রিসালাতের আদর্শকে লালনের প্রচেষ্টা চালু করে। তারা যেহেতু নবী ছিলো না, ছিলো নবী সঃ এর অনুসারী, তাই, তাদের দায়িত্বও সীমিত ছিলো। কিন্তু পরে তাদের নামে প্রচারিত "আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" বা ক্বোরেশ গোত্র থেকেই ইমাম হতে হবে, এ ভ্রান্ত প্রচারণার চোরাগলিতে ক্বোরেশী গোত্রবাদের কুফর প্রবেশ করে ইস্লামের ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদী ইমামত, ইস্লামের চিরশত্রু আবু সুফ্য়ান ও আব্বাস চক্রের কবলে পতিত হয়ে যায়। এদের হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ ইসলামী ইমামত আবু জেহ্ল ও আবু লাহ্ব চক্রের অধীনে চলে যায়।

মক্কাহ্ ও মাদীনাহ্ যেহেতু তখনো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর অনুসারীদের দখলে ছিলো, তাই আবু সুফ্য়ানের পুত্র মুয়াবিয়া ও তার পুত্র ইয়াযিদ মক্কাহ্ ও মাদীনার কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে উৎখাত করার জন্য প্রথমে তাদের পূর্ব পুরুষের শক্তির উৎস দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তর করে এবং পরে মক্কাহ্ ও মাদীনার বাসিন্দাদের হত্যা করে তার "পবিত্রতা' নষ্ট করে।

ইসলামের শুধু নামটা রেখে ইস্লাম থেকে মুস্লিম উম্মাহ্কে পুনঃ কুফর ও শির্কের পথে পরিচালিত করার কঠিন কাজকে সম্ভব ও সহজ করার জন্য নবী সঃ এর নাম ও তাঁর গোত্র বনি হাশিমের শিখন্ডি দাঁড় করানো অপরিহার্য্য ছিলো। তা না হলে উমাইয়াহ্দের জঘন্য পরিকল্পনা সম্পাদন অসম্ভব ছিলো।

ভোগ বিলাস ও প্রাচুর্যে লালিত ইব্ন্ আব্বাস আলীর পক্ষ ত্যাগ করে বস্রার বাইতুল মালের লুণ্ঠিত ধনে মক্কায় তার নিরাপদ অবস্থান পাকা পোক্ত করার সময়ই মুস্লিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। আলী ঘাতকের হাতে নিহত হয়ে বিদায় নেয়। ইব্ন্ আব্বাসের কপাল খোলে! রোমান খৃষ্টানদের আশ্রয়ে আরবী "সিজার" মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। সে ইব্ন্ আব্বাস্কে লুফে নেয়। মুস্লিম বিশ্বের প্রখ্যাত তাফ্সীরের ইমাম আল্লামা যমখ্শারীর মতে মুয়াবিয়া ও ইব্ন্ আব্বাস এক রক্তের ভাই। বর্তমানে আমাদের দেশের বস্তি ও গুলশান বনানী, ইউরোপ আমেরিকা এবং আরবদেশে আরবরা যেমন ব্যভিচারে নিমজ্জিত, রাসূল সঃ এর আবির্ভাব কালে আবু সুফ্য়ান ও আব্বাসরা তখন মক্কায় তেমনি এ খেলাতেই মত্ত ছিলো। আবু সুফ্য়ানের জারজ সন্তান যিয়াদের পুত্র ইব্ন্ যিয়াদই ইয়াযিদের নির্দেশে কারবালার ইতিহাস রচনা করে। হালালের চেয়ে হারামের সন্তানদের কুকর্ম ঘটানোর উৎসাহ সর্বদাই বেশী থাকে। কারণ, তা'না করলে যে তাদের বাপ দাদার কু-কর্ম জনগণ ভুলে যায়!

ইসলামী খেলাফত ও ইমামত উৎখাত করে উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লগ্নে ইসলামী ফতোয়ার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় দারুণ ভাবে। দামেস্কে বসা রাজা সেই ফতোয়া পাওয়ার আশায় তার ধনভান্ডার খুলে দেয় ইব্ন্ আব্বাসের জন্য। যেমন আব্বাস খুলে দিয়েছিলো তার ধনভান্ডার আবু সুফ্য়ানের জন্য ইস্লাম ও আখেরী নবী সঃ এর বিরুদ্ধে বদর থেকে আহযাবের যুদ্ধ পর্যন্ত।

বস্রার বাইতুল মালের অর্থ শেষ হওয়ার পূর্বেই দামেস্ক থেকে অর্থ আসা আরম্ভ করে। তা দিয়ে ইব্ন্ আব্বাস তাফ্সীর ও হাদীসের মজলিস আরম্ভ করে। যা রাসূল সঃ, আবু বকর ও উমরের আমলে শক্তভাবে নিষিদ্ধ ছিলো। কারণ, তাতে কোরআনের মূল শিক্ষা থেকে দুরে সরে নিষ্প্রয়োজনীয় বাহাস্ তর্কের সূত্রপাত হতো। যেমন ইয়াহুদী খৃষ্টানরা তাওরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে তাফ্সীর ও বাহাস্ আরম্ভ করে মূল তাওরাত ও ইঞ্জিলকেই তাহ্রীফ করে নষ্ট করে দিয়েছিলো। ক্বোরআনের তাফ্সীরে ইব্ন্ আব্বাস্ ইয়াহুদী নাসারাদের ক্বাসাসুল্ আম্বিয়ার সকল গাঁজাখোরী কিস্যা কাহিনী ক্বোরআনের নামে চালু করার ধারা প্রবর্তন করে। ফলে ক্বোরআনের বরকতময় শিক্ষা থেকে মক্কাহবাসী ও মক্কায় যারা হজ্জ-ওমরার জন্য আসতো, তারা বিভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন ফেরক্কার জন্ম দিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ক্বোরআনের তাফ্সীরের নামে ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষার বাইরে যে সকল গল্প ও কল্পকাহিনী প্রচলিত রয়েছে, সব কিছুর মূলে সেই ইব্ন্ আব্বাস ও তার শাগরেদ্রা।

অপর দিকে রাসূল সঃ এর প্রচলিত সত্য বাণী সমূহের সাথে আক্ষরিক মিল রেখে বানোয়াট ও মাউদূ হাদীস লাখে লাখে তৈরী হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এ সবের মধ্যে সর্ব প্রথম মক্কাবাসীদের সকল পাপ ঢাকা দিয়ে তাদের প্রশংসা সূচক হাদীস দাঁড় করানো হয়। অথচ ক্বোরআনের চারভাগের এক ভাগই মক্কার কাফের ও মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে নাযিল

হয়েছে। তাতে কোথাও মক্কাবাসীদের কোনো গুণকীর্তন নেই। বরং "কুল্ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" "তাব্বাত্ ইয়াদা" "ইন্না আ'তাইনা" "আরা আইতাল্লাযী" ও "লি'লাফে ক্বোরেশ" এসব সূরাগুলো শুধু মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে যা ঈমানদারগণ গত চৌদ্দ'শ বছর ধরে প্রতি নামাজে পড়ে। ইনশাআল্লাহ্, ক্বেয়ামত পর্যন্ত এ চর্চা জারী থাকবে।

খেলাফত ও ইমামত নির্মূল করে কুফরী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারীরা তাদের ফ্যাক্টরীতে ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা হাদীসের নামে অসংখ্য কিস্সা কাহিনী তৈরী করেছে এবং তা বিশ্বময় আজো প্রচার করে বেড়াচ্ছে। একটি হাদীস এরকম- "মক্কা বাসীদের অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না"। বললে ঈমান, আমল ও দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ! তা' হলে তো সর্বপ্রথম ক্বোরআন নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন! কারণ, আখেরী নবী সঃ এর অবির্ভাব ও ক্বোরআন নাযিল হওয়ার প্রথম কারণই হলো ৩৬০টি মূর্তির মন্দিরে রূপান্তরিত আল্লাহ্র ঘর কা'বাকে মক্কাবাসীর কুফ্রী ও শির্ক থেকে মুক্ত করা এবং ব্যভিচার, অপহরণ, খুনাখুনী, সুদ খাওয়াসহ ইত্যাকার পাপাচার থেকে তাদের উদ্ধার করা।

এমন কোনো নির্বোধ মানুষ কী পৃথিবীতে একজনও আছে, যে বলবে যে মক্কার লোকেরা যদি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, শির্ক না করতো এবং হযরত ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর ক্বায়েম থাকতো, তা হলেও তখন মক্কায় বিশ্ব নবী সঃ এর আবির্ভাব ও মক্কায় ক্বোরআন নাযিল হতো??? বা যদি মক্কায় লোকেরা চরম পরাজয় বরণ ছাড়া সংশোধনের যোগ্য হতো, তা হলে কী খাতামুন্ নাবিয়্যীন সঃ কে দীর্ঘ তের বছর মক্কাবাসীর চরম অত্যাচার এবং সবশেষে প্রাণ নাশের হুম্কির মুখে মক্কাহ ত্যাগ করে প্রাণ নিয়ে মাদীনায় হিজরত করতে হতো??? মিথ্যার কোনো মা বাপ হয় না। তাই মিথ্যুকদের কোনো বিবেক ও লজ্জা শরম থাকেনা। তারা মিথ্যা ভাবে, মিথ্যা বানায় ও তা প্রচার করে। মিথ্যুকদের ধর্ম মিথ্যা। তাই তাদের সমূলে বাদ দিয়ে আমাদের ঈমান, দ্বীন, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ কে নতুন করে বুঝতে হবে, মানতে হবে নতুনভাবে এবং তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে।

এ দিকে আরেক ল্যাঠা বাঁধিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'আলা। তিনি ক্বোরআন ছাড়া অন্যান্য আস্মানী কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নবীদের পরে সে সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাসী আলেম ওলামাদের উপর। কিন্তু তারা রাজা বাদ্শাদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনে কিছু দানদক্ষিণা পেলেই তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে দিতো। তাতে তারা সরকারের পক্ষ থেকে "মুফ্তিয়ে আযম ও মুফাসসিরে আলম" উপাধী পেতো। শেষ নবীকে পাঠিয়ে আল্লাহ্পাক নবীর সিলসিলা দিলেন বন্ধ করে। তাই নবী সঃ বিদায় নেয়ার পর কোনো মানুষের নবী হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তা' সত্বেও আমাদের হুজুরদের কিতাবী কিস্যা মতে আরবের পাক যমিনের পাক আরবরা(?) রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পরই প্রায় ডজন খানেক নতুন নবুওতের দাবী করে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখেছে। তা'তে তারা সুবিধা করতে পারেনি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন তিরিশ পারা ক্বোরআন নাযিল করেছেন। তা' নাযিল করে পূর্ণ ভাবে রাসূল সঃ কে পড়িয়ে, বুঝিয়ে এবং তার পর জিবরাঈল আঃকে দিয়ে জমাকৃত তিরিশ পারার ক্বোরআন রাসূল সঃ এর হাতে হস্তান্তর করে ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন ঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি যেমন ক্বোরআন নাযিল করেছি, তেমনি তার হেফাজতের দায়িত্বও আমার জিম্মায় রাখলাম।" তাই আরব ভাইরা ইয়াহুদী নাসারাদের মতো ক্বোরআনে তাদের জাত বংশের কীর্তণের কিছুই ঢুকাতে পারেনি। তা'ছাড়াও আরেকটি ল্যাঠা বাধিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে। তা হলো তিনি কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেও তা' আরবদের আরবী ভাষায় নাযিল করেননি, করেছেন بلسان عربي مبين

অর্থাৎ "স্পষ্ট আরবী ভাষায়"। শুধু আরবী ভাষায় নয়। শুধু প্রচলিত আরবদের ভাষায় ক্বোরআন অবতীর্ণ হলে আরবরা ক্বোরআনের সাথে দু'চার পারা তাদের আরবী একাডেমীর পন্ডিতদের দ্বারা রচনা করে ক্বোরআনের নামে তা চালু করার চেষ্টা অবশ্যই করতো । তাই আল্লাহ পাক বলেছেন, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ

"ক্বোরআন যদি আমার রচিত না হয়ে তোমাদের মতো কোনো মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তা' হলে দু'দশ খানা সূরা রচনা করে ক্বোরআনের সাথে মিলাও দেখি!"

বহু চেষ্টা করেও সফল না হয়ে তারা এ পথ ত্যাগ করে অন্য পথ বেছে নিয়েছে। দাঙ্গা, খুনাখুনী, বংশ গোত্র নিয়ে মিথ্যা বড়াই ও দস্যু বৃত্তিতে অভ্যস্ত মরুবাসী আরবরা আল্লাহ্‌র আখেরী নবী সঃ এর হাতে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীনের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এ ক্বোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক রক্ষিত বলে আরবরা, বিশেষ করে মক্কার ক্বোরেশরা, ক্বোরআনে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি, যেমন ইয়াহুদীরা পেরেছিলো। তাই তারা অন্য পথ তৈরী করে, শানে নুযুলের নামে বহু বাজে ও মিথ্যা কথার প্রচলন করে। কিন্তু তাতে মূলে কোনো কিছু ঢুকাতে না পেরে রাসূল সঃ এর নামে বাণী ও এরশাদ তৈরী করে তা দিয়ে আরবী ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ভিত রচনার পথ বেছে নেয়।

ইস্‌লাম আল্লাহ্‌র দ্বীন। আল্লাহ্ বিশ্বের সকল সৃষ্টির। আল্লাহ্ কোনো জাত ও গোত্রের নন। তিনি তাঁর আখেরী নবী সঃ কে এতীম অনাথ বানিয়ে বারাকাহকে দিয়ে লালন করে তাঁর জাতিগত বর্ণবৈষম্য বিধৌত করে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহ্ প্রভৃতি নির্যাতিত ও উপেক্ষিতদের দ্বারা বিশ্ব বর্ণ ও গোত্রবাদকে নির্মূল করার আদর্শ স্থাপন করেন। এরাই "মুস্তাদআফীন"।

উন্মাদ, নির্বোধ, বিবেকহীন এবং জাহিল ব্যতীত প্রত্যেকটি মানুষ বুঝ্‌তে পারে যে স্রষ্টা আল্লাহ্, রাজা। মানুষ তাঁর দাস, প্রজা। রাজার রাজত্ব হয়। প্রজার হয় দাসত্ব। আল্লাহ্ মাবুদ, মানুষ বান্দাহ্। আল্লাহ্‌র রাজত্ব, বান্দার বন্দেগী। তাই নবী সঃ "আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু", অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস, ও দাসদের প্রতি তাঁর দূত। রাসূল স্বয়ং যখন দাস, তখন তাঁর সাহাবী ও অনুসারীরা কিরূপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজা হওয়ার কথা কল্পনা করতে পারে?

কোনো বুদ্ধিমান তারপরও যদি বলতে চায় যে, নবী দাউদ আঃ ও তাঁর ছেলে সুলাইমান আঃ তো নবী ও রাজাই ছিলেন? তাই ক্বোরেশরা বাদশা হলে আপত্তি কোথায় ?

উত্তর সোজা। দাউদ এক সাধারণ রাখাল ছিলো। অত্যাচারী রাজা জালুতকে উৎখাত করার যুদ্ধে তালুতের সঙ্গী হয়ে জালুতকে হত্যা করে। তালুতের মেয়ে বিবাহ করে রাখাল দাউদ রাজ্য ও নবূওত পেয়ে নবী হন। নবী হয়ে তিনি ও তাঁর ছেলে সুলাইমান রাজা হয়েও কীভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করতে হয়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তারপরও যদি আখেরী নবী সঃ এর পর পুনঃ ইসলামী সাম্রাজ্য ও রাজত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার বৈধতার প্রশ্ন উঠে তা হলে তো তাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, তা আলী ও তার বংশধর থেকে হতে হবে। কারণ, আলী মু'মিন ও রাসূল সঃ এর জামাতা ছিলো। যেমন দাউদ আল্লাহ্‌র নির্বাচিত মুজাহিদ্ তালুতের জামাতা ছিলেন। তালুতের হাতে পরাজিত জালুতের বংশ থেকে তো ইস্‌লামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়নি!

আখেরী নবী সঃ কর্তৃক ইস্‌লামের "পূর্ণ" আদর্শ প্রতিষ্ঠার পরও যদি সাম্রাজ্য বা পারিবারিক ইসলামী রাজত্ব কল্পনা করা যায় তাহলে তা' অবশ্যই আলী, আবু বকর বা উমরের বংশধরদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত ছিলো। তা' তো কস্মিনকালেও আখেরী নবী সঃ এর নবী জীবনের ২৩ বছরের সংগ্রামে পরাজিত জালুত আবু সুফ্‌য়ান ও তার দোসর আব্বাসের বংশ থেকে হবার কথা নয়! মুহাজির ও আনসারদের "সাবেক্বীন" ও তাদের যোগ্য সন্তানদের মধ্যে এমন কী অধঃপতন নেমে এসেছিলো এবং "রা'সুল কুফ্‌র ওয়াল্ আহযাব" আবু সুফ্‌য়ান ও তার দোসর আব্বাসের সন্তানদের মধ্যে রাতারাতি এমন কি অসাধারণ গুণাবলী গজিয়ে উঠেছিলো যে, তারা সবার উপর টেক্কা মেরে ইস্‌লামের খেলাফতের জামা জোব্বায় ঢুকে পারিবারিক ও গোত্রীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে সম্রাট হয়ে গিয়েছিলো??!!

ক্বোরআন ও শানে নুযুল দিয়ে কার্য্য সিদ্ধি সম্ভব নয় দেখে আখেরী নবী সঃ-এর যুগের জালুতের বংশধরেরা তাদের পরাজিত ও হারানো কুফ্‌র্ শির্ক ও জাহিলিয়্যাত এবং তার বর্বরতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে সর্ব প্রথম হাশেমী আব্বাসের পুত্র, ইব্‌ন্ আব্বাসের দ্বারা রোমান রাজার দরবারে রাসূল সঃ সম্পর্কে আবু সুফ্‌য়ানের কল্পিত কাহিনী তৈরী করা হয় আবু সুফ্‌য়ানের পক্ষে গ্রহণ যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য। কারণ, আবু সুফ্‌য়ান উমাইয়া বংশের। তার পক্ষে বনি হাশেমের ফতোয়া চাই!

অপর দিকে রাসূল সঃ এর চাচা বলে কথিত আব্বাসকে বনি হাশিমের ভবিষ্যৎ বিকল্প রাজবংশের আদি পুরুষ বানানোর জন্য উমাইয়া মোহাদ্দেস্ যুহ্‌রী ও তার শিষ্যদের দ্বারা "কিস্যা" তৈরী করা হয় যে, রাসূল সঃ মাদীনায় হিজরাতের পূর্বে মাদীনাহ্‌বাসীদের রাসূল সঃ এর হাতে বায়আতের মাধ্যমে যে চুক্তি হয়, তাতে আব্বাসকে রাসূল সঃ এর পক্ষ থেকে এড্‌ভোকেট (?) দাঁড় করানো হয়েছিলো।

ইসলামে "আত্মীয়তা" আছে "রক্তীয়তা" নেই। অর্থাৎ ঈমান ও আত্মার বন্ধনে মু'মিনদের মাঝে "আত্মীয়তা" হয়ে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। ঈমানহীন আত্মীয়তা, এমন কি পিতা-পুত্র এবং চাচা-ভাতিজার কোনো সম্পর্কই থাকে না, যখন ঈমান ও কুফ্‌রের সংঘাত হয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম আঃ ও তার পিতা-মাতার মধ্যে ছিলো না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ ইব্রাহীম আঃ এর আদর্শের চূড়ান্ত নবী। তিনি দীর্ঘ তেরো বছর মক্কায় তাওহীদ প্রচার করেন। এর মধ্যে আব্বাস ঈমান আনে নি। মক্কাবাসীদের পক্ষে থেকে নিরাশ হয়ে রাসূল সঃ তায়েফে দাওয়াত দিতে যান। সেখানে এড্‌ভোকেট চাচা আব্বাস তো যায়নি!? তায়েফবাসীদের নির্যাতনে রক্তাক্ত হয়ে কোনো প্রকার প্রাণে বেঁচে ভাতিজা নবী অন্যের আশ্রয়ে মক্কাহ্ ফিরেন। উকীল চাচা আশ্রয় দেয়া দূরের কথা, মৃত ভাইয়ের একমাত্র চিহ্ন 'ভাতিজাকে' দেখতেও যায়নি।

সেই চাচা আব্বাসকে মাদীনাহবাসীদের সাথে বায়আত্ বা চুক্তির মতো চরম গোপনীয় বৈঠকে মিথ্যা সৃষ্টিকারীরা শুধু উপস্থিতই করেনি, তাকে মক্কাহ্‌বাসীর বিরুদ্ধে মাদীনাহবাসীদের চূড়ান্ত যুদ্ধের চুক্তি ব্যাখ্যাকারী কৌশলী ও সাক্ষী বানানো হয়। ইস্‌লামের এ চরম সন্ধিক্ষণে রাসূল সঃ কী নিজে ভবিষ্যতে মাদীনায় হিজরত এবং তার ফলে সম্ভাব্য উদ্ভুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট ছিলেন না? কি করে ভাবা যায় যে, সে পরিস্থিতিতে আব্বাসের মতো একজন কাফের ও মুশ্‌রিক ব্যক্তিকে রাসূল সঃ বিশ্বাস করেছিলেন? তা'হলে কি গোপনীয়তা রক্ষা পেতো?

যদি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে ভাবা হয় যে, আসলেই আব্বাস গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং রাসূল সঃ এর নির্দেশেই আব্বাস ছদ্মবেশী মুশ্‌রিক সেজে মক্কাবাসীদের মাঝে থেকে ইস্‌লাম ও রাসূল সঃ এর খেদ্‌মতেই নিয়োজিত ছিলো, তা'হলে তার কিছুদিন পরই রাসূল সঃ ও তাঁর সঙ্গীদের যখন মাদীনায় হিজরত করে গিয়ে প্রথমে বদরের যুদ্ধ এবং তারপর উহুদ, আহ্‌যাব এবং হুদাইবিয়ার ঘটনা সমূহে আব্বাসের কার্যাবলী কী প্রমাণ করে?

বদরের যুদ্ধে আব্বাস, মক্কার জালুত আবু জেহ্‌ল, উত্‌বাহ্, শাইবা, রাবীআহ্ ও অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গী হয়ে তার সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়ে ইসলামকে অঙ্কুরেই নির্মূল করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে রাসূল সঃ ও মু'মিনরা বিজয়ী হয়। আব্বাসও অন্যান্যদের সাথে যুদ্ধ বন্দি হয়ে পরে মুক্তি পায়। এবারও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, আব্বাস সাজানো খেলের অভিনেতা ছিলো।

কিন্তু উহুদের যুদ্ধে যখন মু'মিনদের চরম বিপর্জয় ঘটে, মু'মিনরা প্রায় নির্মূল হয়ে যায়, খোদ রাসূল সঃ মারাত্মকভাবে আহত হন, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয় এবং আব্বাসের আপন ভাই 'হামযাহ্' শহীদ হলে মক্কার প্রধান জালুতের স্ত্রী হিন্দা হামযার বুক চিরে তার কলিজা চিবিয়ে খায়, সেই পরিস্থিতিতেও কি আব্বাস অভিনয় করছিলো? আউযুবিল্লাহ্! তাও যদি তার অভিনয়ই হয় থাকে, তা'হলে আল্লাহ্ না করুন, উহুদের যুদ্ধে যদি রাসূল সঃ শহীদ হতেন, তা'হলে আব্বাসের অভিনয় কোথা গিয়ে শেষ হতো? খোদ আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ এর মারাত্মক ভাবে আহত হওয়া এবং হামযার শাহাদাত ও তার কলিজা খাওয়ার ঘটনার পরও যার অভিনয় ঈমানের চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণিত হয়, সে ব্যক্তি কোন জাতের মু'মিন ছিলো? তারপরও সে আহযাব বা পরিখার যুদ্ধে আবু সুফ্‌য়ানের সঙ্গী হয়ে যৌথ নেতৃত্ব দিয়ে সমগ্র আরব উপজাতি ও ইয়াহুদী খৃষ্টানদের একত্র করে মাদীনাহ্ অবরোধ করার চরম দুষ্কর্মেও তার সকল ধন সম্পদ নিয়ে শরীক হয়। আল্লাহ্ পাক আল্ ক্বোরআনে সম্মিলিত আরব কাফের ও ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মাদীনাহ অবরোধের কঠিন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেনঃ **"চার দিক থেকে এমন ভাবে হাজার হাজার শত্রু যখন মাদীনাহ অবরোধ করে, তখন তাদের ভয়ে মু'মিনদের কলিজা কণ্ঠনালীর কাছে পৌঁছে যায়। রাসূল ও মু'মিনরা আর্তনাদ করে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে, মা'বুদ কখন আপনার সাহায্য আসবে? আমরা শেষ হলে? এ ধরণের ভাবনায় যখন মু'মিনদের চরম পরীক্ষা হলো, তখন আমি আমার বিশেষ সাহায্য পাঠিয়ে সম্মিলিত কুফরী শক্তিকে বিতাড়িত করে মু'মিনদের বিজয়ের পথ সুগম করি।" (আহ্‌যাব)**

এভাবে আল্লাহ্ পাক মক্কার জালুত, নমরুদ ও ফিরআউনদের "মক্কাহ বিজয়ের" মাধ্যমে পরাজিত ও উৎখাত করার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ ফাত্‌হুম্ মুবীন বা চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য তাঁর রাসূল সঃ ও তাঁদের সৈন্যদের মক্কার দোরগোড়ায় নিয়ে উপস্থিত করেন। আগামী কাল সকালে মক্কাহ বিজয় হয়ে কাফের ও মুশ্‌রিকদের চিরতরে পরাজয় হবে, মক্কাহ মুক্ত হবে। কা'বাহ পবিত্র হবে। বেহেশ্‌ত্ থেকে পতনের পর আদম ও তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌র তৈরী তাঁর ঘর, বিশ্বমানুষের জন্য ক্বেয়ামত পর্যন্ত মুক্তাঙ্গন হবে। তারপরও আব্বাসের অভিনয়কাল শেষ হবে না??!!

এরপর তো অভিনয়ের কোনো প্রয়োজন থাকেনা। পূর্বের সবকাজ যদি সত্যিই আব্বাসের পাতানো খেল বা অভিনয় হতো, তা হলে মক্কা বিজয়ের ঘটনায় তার সকল অভিনয়ের যবনিকা পাত করে মূল ভূমিকা প্রমাণের চরম মূহুর্ত উপস্থিত হয়েছিলো! তা যদি আদৌ সত্য হতো, তা হলে আব্বাস ইস্‌লাম, রাসূল ও মু'মিনদের চির শত্রু "রা'সুল আহযাব ওয়াল্ কুফ্র" ও মক্কার জালুত আবু সুফ্‌য়ানকে রাসূল সঃ এর 'দাউদ' হয়ে সবংশে নির্মূল করে সত্যিকারের দাউদ আঃ এর সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করতো! তা'না করে, চতুর সুদখোর, ভোগ বিলাসী ও জাহিলিয়্যাতের সকল পাপে আবু সুফ্‌য়ানের ডান হাত আব্বাস ঠিক মক্কাহ্ বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূল সঃ এর চাচা হওয়ার সুবাদে তাঁর সাথে গিয়ে ভিড়ে। আল্লাহ্‌র ঘর "বালাদুল আমীনে" রাসূল সঃ রক্তক্ষয় এড়াতে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। শুধুমাত্র হাতে গোনা কিছু নরাধমদের শিরোচ্ছেদের জন্য আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় শেষ নবী সঃ কে সীমিত কয়েক ঘন্টা সময় দিয়ে তা, পুনঃ ক্বেয়ামত পর্যন্ত পূর্ববৎ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

এ সুযোগে আব্বাস রাসূল সঃ কে সাহায্য না করে, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ইস্‌লামের শত্রুদের মাথা আবু সুফইয়ানকে রক্ষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুচতুর কাফের আব্বাস গভীর ষড়যন্ত্র করে মক্কাহ জয়ের পূর্বরাত্রে আবু সুফয়ানকে রাসুলের সন্মুখে এনে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়। তখনও রাসূল সঃ আবু সুফ্‌য়ানের শেষ পরীক্ষা নিতে তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

রাসূল (সঃ) ঃ এখনো কি তোমার মনে হয় না যে এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই?

আবু সুফ্‌য়ান ঃ "মনেতো তাই হয় যে আল্লাহ্ একজন ব্যতিত নেই। কাল তোমার বিজয় হচ্ছে এবং আমার পরাজয় হচ্ছে। সে এক আল্লাহ্ তোমার পক্ষে। দ্বিতীয় কোনো আল্লাহ্ থাকলে সে তো আমার পক্ষ নিতো!"

রাসূল (সঃ) ঃ "আমি যে আল্লাহ্‌র রাসূল, তুমি কি তা বিশ্বাস করো?"

আবু সুফ্‌য়ান ঃ "এ ব্যাপারে আমার মনে এখনো সন্দেহ রয়েছে।" (বোখারী)

সে সময় উমর রাসূল সঃ এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলো যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রুকে ক্বতল করার হুকুম দিন"। কিন্তু আব্বাস রাসূল সঃ এর সামনে চাচার দাবী নিয়ে উমরের সাথে কটুবাক্য বিনিময় করে আবু সুফ্‌য়ানকে প্রাণে রক্ষা করে। মক্কাহ্ বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্যই হয়তো হুজুর সঃ "তোলাক্বা" নাম দিয়ে ওদের প্রাণে বাঁচিয়ে দেন। আব্বাস অস্বাভাবিক ভাবে সেদিন রক্ষা না করলে মক্কার জালুত আবু সুফ্‌য়ান চিরতরে নির্মূল হয়ে যেতো। এভাবে ওস্‌মান আল্লাহ্ কর্তৃক ক্বোরআনে "ফাসিক্ব" বলে অভিহিত তার সতালো ভাই ওয়ালিদ বিন্ উক্ববা বিন্ আবু মুঈত্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবি সারাহকে রাসূল সঃ এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করে। এরা সবাই আবু সুফ্‌য়ানের 'উমাইয়া' বংশের।

আব্বাসের চক্রান্তে আবু সুফ্‌ইয়ান বেঁচে যাওয়ার ফলে সহজেই মক্কার অন্যান্য কেউটে সাপগুলো প্রাণে বেঁচে যায়। এরাই রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর ইস্‌লাম ও খেলাফতের বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মুস্‌লিম উম্মাহকে সেই চক্রে নিক্ষেপ করে, যা থেকে আজো মুক্তি সম্ভব হয়নি। "আব্বাস্ আবু-সুফ্‌য়ান" ও "আবু সুফ্‌য়ান-আব্বাস" রেল লাইনের এমন দুটি লাইন, যা তাওহীদ, রিসালাত ও ইমামতের একমাত্র পথকে বিচ্যুত করে প্রথমে উমাইয়া ও তারপর আব্বাসী জালুতী, সিজার ও খস্‌রুতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। যার পূর্ণ বিকাশ রক্ত পিপাসু তাতারী ড্রাকুলা তৈমুর লং ও তার বংশের 'মোঘল সাম্রাজ্য' অভিশাপ হয়ে মানবজাতির উপর চেপে বসেছিলো। রাসূল সঃ যে অর্থে রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামীন, সে অর্থেই আবু সুফ্‌য়ান ও আব্বাসের বংশের ইস্‌লামের নামের দাজ্জালী সাম্রাজ্য "লা'নাতুল্লিল্ আলামীন"। মানব জাতির জন্য অভিশাপ।

আল্লাহ্‌র রহমতের খেলাফত ও ইমামত উৎখাত হয়ে যখন রাসূল সঃ এর সতর্ক করা কুকুরে কাম্‌ড়ানো রাজতন্ত্র "মুল্‌কুন্ আদূদ্" প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন রাসূল সঃ এর নাতি হুসেইন তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, এরপর আর কোনো ঈমানদারের পক্ষে জালুতদের রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না করে বাঁচা সম্ভব নয়। যারা ওদের সাথে সমঝোতা করে বাঁচবে, তাদের কেউ আর রাসূল সঃ এর প্রদর্শিত দ্বীনের উপর থাকবেনা। তাই হুসেইন চরম সিদ্ধান্ত নেয়। ইসলামের পর পুনঃ তারই নামে ফিরে আসা জাহিলিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করে হুসেইন সপরিবারেই প্রাণ দিয়ে তার নানা রাসূল সঃ এর তৃপ্ত আত্মার সাথে মিলিত হয়।

হুসেইনের প্রায় সমবয়সী আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ উমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ যুবাইর ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ আব্বাস। এদের মধ্যে ইব্‌ন্ আব্বাস্ তো তার রক্তীয় ভাইয়ের সরকারী মুফাস্‌সিরের পদ অলঙ্কৃত করে মোটা অঙ্কের হাদিয়া পেতে আরম্ভ করে।

যা তার চাচাতো ভাই আলীর সাথে থাকলে কখনো সম্ভব হতোনা। অপর দিকে ইব্ন্ উমর ও ইব্ন্ যুবাইর আগত বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়। তারা তখন হুসেইনের সাথে একমত হয়ে একত্রে ইস্‌লামের জুব্বায় ঢাকা নব্য কুফরের বিরুদ্ধে ময়দানে না নেমে ছদ্মবেশী কুফরীর সাথে জোড়া তালি দিয়ে সহ অবস্থান করে বাঁচার বিফল চেষ্টা করে। উমাইয়ারা কারবালায় হুসেইনকে খতম করে তারপর এক এক করে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন্ যুবাইর ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন্ উমরকেও হত্যা করেছে। হুসেইনের সাথে মিলে এক সাথে তিন জন প্রতিরোধ করলে যেমন তা' শক্তিশালী হতো, তিনজন একত্রে শাহাদাত বরণ করলেও তার মূল্য ইতিহাসে ভিন্নতরো হতো। হুসেইন কখন প্রতিরোধ করতে হয়, তা জেনেছিলো এবং কখন মরতে হয় তাও বুঝেছিলো। ওরাও মরেছে, তবে ওরা কারবালার ত্যাগের সু-উচ্চ মিনার স্পর্শ করতে পারেনি। ওরা কখন দাঁড়াতে হয়, তা জানেনি, কখন মরতে হয়, তাও বুঝেনি।

ক্বোরআন আল্লাহ্ নিজের ভাষায়, নাযিল করেছেন। তাই আরবরা কেউ তা নকল করতে সক্ষম হয়নি। ক্বোরআনের জ্ঞান ছাড়া সকল জ্ঞান অন্ধ। জাহেলিয়্যাত, অন্ধ ও মূক। সুম্মুন, বুক্‌মুন, উম্‌য়্যুন্। ক্বোরআনী শিক্ষার বাইরের সকল জাতিসত্ত্বা, তারা আরব হোক কি অনারব্, সবাই মূর্খ ও আজমী। আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন, মুহাম্মাদকে যারা ক্বোরআন শিখিয়ে দিচ্ছে বলছে, لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ তাদের ভাষা আরবী নয় । ওদের ভাষা আজমী। একমাত্র ক্বোরআনের ভাষাই সুস্পষ্ট আরবী। (নাহ্‌ল্-১০৩)

ইব্ন্ আব্বাসের ফাঁদে পড়া কিছু কিছু তথাকথিত মুফাস্‌সিররা বলে যে, রাসূল সঃকে নাকি কোনো দু'জন ইরানী মুচি রাতে চুপে চুপে ক্বোরআর রচনা করে শিখাতো, এবং দিনে রাসূল সঃ নাকি তা পড়ে শোনাতেন। একি কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের পক্ষে ভাবা সম্ভব যে কোনো অনারব ইরানী ঐ অলৌকিক ভাষায় ক্বোরআনের আয়াত রচনা করছে এবং রাসূল সঃ তা শিখে আরবদের পড়ে শোনাচ্ছেন, যার একটি সাদৃশ্য আয়াতও তদানিন্তন আরব পন্ডিতরা একত্র হয়েও রচনা করতে পারেনি! অবশ্য যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওরা আরবই ছিলো। কিন্তু তাদের ভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অস্পষ্ট ভাষা বলে আল্লাহ্ অভিহিত করেছেন। ক্বোরআন দিয়ে আরবী ক্বোরেশী বর্ণবাদের নেতৃত্ব প্রমাণ করতে অপারগ হয়ে মিথ্যুকরা প্রচার আরম্ভ করে যে, ক্বোরআন ক্বোরেশদের বাকধারা ও বাচন ভঙ্গিতে নাযিল করা হয়েছে। আবারও একই উত্তর। তা হলে ক্বোরেশরা নিশ্চয়ই দু' চারটি সূরা বানাতে সমর্থ হতো। তা যখন হয়নি, তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভাষা ও বাকধারায়ই আল্লাহ্ কোরআন নাযিল করেছেন। যখন তিনি বলছেন, لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

আমি আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ক্বোরআন আমি আমার ইল্‌ম ও ভাষা দিয়ে নাযিল করেছি। সে ব্যাপারে যদিও আমি আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তবুও ফেরেশতারাও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। (সূরা নিসা-১৬৬) কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্বোরেশীরা ক্বোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কথা বলা থেকে বিরত হয়নি। তারা মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন ইব্ন্ আব্বাস ও তার শাগরেদদের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ ক্বোরআন সংগ্রহ ও জমা করে একত্র করে যাননি। বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন বস্তুতে লিপিবদ্ধ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যান এবং কিছু কিছু শুধুমাত্র হাফেজদের কণ্ঠে মুখস্ত রেখে যান। পরে উমাইয়া খলিফা ওসমানের আমলে ক্বোরআন সত্যিকারের অর্থে একত্রিত করা হয়। ফলে তারা ওসমানকে ক্বোরআন একত্রকারীরূপে ঘোষণার মাধ্যমে তাদের খোৎবায় দস্তুর মতো "ওয়া আ'লা জামিইল্ ক্বোরআন ওসমান ইব্ন্ আফফান" পড়ার প্রচলন করে, যা অদ্যাবধি আমাদের দেশে প্রচলিত জুমার খোৎবায় নিয়মিত পড়া হয়। ক্বোরআন একত্রিত করার ব্যাপারে এমন মারাত্মক কথাও প্রচার করা হয় যে, ওস্‌মানের আমলে ক্বোরআন একত্র করে লেখার সময় নাকি দেখা যায় যে কিছু কিছু আয়াত ও তার বাচন ও বাকধারা মিলানো যাচ্ছেনা। তখন খলিফার তরফ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যেনো সে আয়াত সমূহ ক্বোরেশদের বাকধারায় সংযোজন করা হয়। একথা তো আদৌ সত্য নয়! কারণ আল্লাহ্ তাঁর খাতামুন্ নাবিয়্যীন সঃ কে সম্পূর্ণ ক্বোরআন কয়েকবার স্বয়ং জিব্রাঈল আঃ কে দিয়ে পড়িয়ে তা তাঁকে হস্তান্তর করেছেন। যে ক্বোরআন হুবহু লৌহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত ক্বোরআনের অনুলিপি। "বাল্‌হুয়া ক্বোরআনুম্ মাজীদুম্ ফী লাউহিম্ মাহফুজ্" বলে তাকে সত্যায়ন করা হয়। কোনো খলিফা বা ক্বোরেশী একাডেমীর সংযোজন, সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌পাক কিছুই বাকী রাখেননি। بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيد فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

এই মারাত্মক ও অমূলক, মিথ্যা কথা ছড়িয়ে ক্বোরেশরা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আরবীকরণের ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে গিয়ে তাওরাত ও বাইবেল জালকারী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সুযোগ করে দিয়েছে এটা বলতে যে, ক্বোরআনও আক্ষরিকভাবে আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব নয়, যেমন তাওরাত ও ইঞ্জিল আহ্‌বার ও হাওয়ারীদের মূসা ও ঈসা আঃ দের মুখ থেকে শোনা কথার সংকলন, তদ্রূপ আল্‌ ক্বোরআনও। এই জঘন্য কাজকে সাধারণ মু'মিনদের নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা করে রাসূল সঃ এর নামে আবু সুফ্‌য়ানের দোসর আব্বাসের জন্য বিশেষ দোয়া প্রচার করা হয়েছে যে, "আল্লাহ্‌, তুমি আব্বাস ও আব্বাসের আওলাদদের জন্য তোমার ইল্‌মের দরজা জানালা সব খুলে দাও" ইত্যাদি। এমন একটি দোয়ার জন্য কী আলী, আবু বকর ও উমর এবং তাদের সন্তানেরা কেউ যোগ্য ছিলো না? আব্বাসের ছেলেরাই হবে কেনো?

রাসূল সঃ বলেছেন যে, যে কেউ আমার নামে মিথ্যা রচনা করবে, সে যেনো জাহান্নামে তার অবস্থান জেনে নেয়। (বোখারী, মুস্‌লিম) শুধু রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা রটালে যদি এ পরিণাম হয়, তাহলে, খোদ্‌ আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর ব্যাপারে যারা মিথ্যা রটিয়ে বিশ্বমানবের জন্য পূর্ণকরা ইস্‌লামকে রক্তপিপাসু উপনিবেশ সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত করেছে, তাদের স্থান কোথায় হবে?

এদের জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা "খিয্‌য়্যুন্‌ ফিদ্‌দুনইয়া ওয়ালাহুম ফিল্‌ আখিরাতি আযাবুন্‌ আযীম্‌" অর্থাৎ "পার্থিব জীবনে চরম লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি অবধারিত" বলে ক্বোরআনে বহুবার ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা রচনা করে তা রটানোর মহা পাপেই আল্লাহ্‌ স্পেন ও বাগদাদ এবং দামেস্কে তিনবার উমাইয়া ও আব্বাসী শাসকদের উপর আসমানী আযাবের চেয়েও ভয়াবহ রূপে ইউরোপিয়ান ক্রুসেডর ও চেঙ্গিজী তাতারদের হত্যাযজ্ঞ চাপিয়ে নির্মূল করেছেন। আল্লাহ্‌, রাব্বুল আলামীন। তিনি রাহ্‌মান ও রাহীম। তাঁর রহমত গযবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তা সত্ত্বেও যাদের উপর তাঁর গযব নাযিল হয়, তারা কতো জঘন্য পাপী ও হতভাগা!

মক্কার সাধারণ কাফেররা এবং বিশেষ করে কা'বাহ্‌কে মূর্তির মন্দির বানানেওয়ালা ক্বোরেশরা রাসূল ও রিসালাত সব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র নুরকে নিভানোর সকল চেষ্টা করেছে। অপরদিকে মাদীনার লোকেরা রিসালাত ক্ববুল করেছে, জীবন ও অস্তিত্বের ঝুঁকি নিয়ে রাসূল সঃ কে গ্রহণ করেছে এবং ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত রাসূলের অনুসারী উদ্বাস্তুদের নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পদ অর্ধেক ভাগ করে দিয়ে ভাই বানিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। এরা উভয় কি সমান হতে পারে? রাসূল সঃ তাই বার বার মক্কার লোকদেরকে মাদীনাবাসীর 'অবদানের' কথা স্মরণ করিয়ে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু মক্কার ক্বোরেশরা রাসূল সঃ এর সে কথা রাখেনি। যদি রাখতো, তা হলে চার খলিফার চার জনই কি করে ক্বোরেশ থেকে হয়? উমর আহত হওয়ার পর পরবর্তি খলিফা নির্বাচনের জন্য যে ছ'জনের উপদেষ্টা পরিষদ হয়, তারা সবাই কি করে ক্বোরেশ থেকে হয়? এবং "আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ" বলে যে দশ জনের তালিকা প্রচার করা হয়, তারাও সবাই শুধুমাত্র ক্বোরেশী কি করে হয়? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তো কোনো মতেই ধামা চাপা দেয়ার নয়! এ সবই রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা প্রচার।

মক্কার জালুতরা যখন গোটা আরব ব-দ্বীপের সকল মুশ্‌রিক, কাফের ও ইয়াহুদীদের একত্র করে দশ হাজারের অধিক সৈন্য নিয়ে আবু সুফ্‌য়ান ও আব্বাসের যৌথ নেতৃত্বে রাসূল ও তাঁর তিন চার হাজার অনুসারীকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করার জন্য মাদীনাহ অবরোধ করে, তখন সেই পার্থিব ক্বেয়ামতের ঘটনায় শেষ রক্ষার জন্য রাসূল সঃ তাঁর বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। মোহাজেরদের নেতৃত্ব দান করেন যায়দ ইব্‌ন হারিসাহ্‌কে যার অধীনে আবু বকর ও উমর থেকে আরম্ভ করে সকল ক্বোরেশীরা সাধারণ সৈনিক ছিলো। এ গুলো কি রাসূল সঃ এমনিতেই করেছেন? আরশ থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ ছিলো না? নিশ্চয়ই ছিলো। রাসূল সঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম্‌ ছাড়া এতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেননি।

ইস্‌লামকে জাতীয়করণ ও তারপর গোত্রীয়করণের পর মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ইমাম ও মাযহাব বানানোর নামে তাওহীদ ও ঐক্যের দ্বীনকে এমনভাবে টুকরা টুকরা করা হয় যে, ইস্‌লাম ঐক্যের ধর্ম না হয়ে বরং অনৈক্যের ধর্মই প্রমাণিত হয়। রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরী করে বলা হয় যে, রাসূল সঃ বলেছেন তাঁর উম্মাত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই নাজাত পেয়ে বেহেশ্‌তে যাবে। আর বাকী ৭২ ভাগই যাবে জাহান্নামে।

অথচ ক্বোরআনে আল্লাহ্‌ বলেছেন, ঈমানদাররা কখনো ঈমানের বন্ধন ভেঙ্গে বিভক্ত হবে না। যারা হবে, তারা আর

ঈমানদার থাকবেনা। রাসূল সঃ তার সমর্থনে বলেছেন, আমার অনুসারীরা কখনো বিভ্রান্তির পথে একত্রিত হবেনা।
لا تجتمع أمتي على الضلالة
যারাই বিভ্রান্তির পথে পা বাড়াবে তারা আর রাসূলের অনুসারী থাকবেনা। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীগণ সব সময় সর্ব পরিস্থিতিতে সত্যের উপরে অনড়, অটল ও ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যে বা, যারাই সে ঐক্য ভেঙ্গে আলাদা হবে, সে বা তারা আর ঈমানদার ও রাসূল সঃ এর অনুসারী থাকবে না। পৃথক হওয়ার মূহুর্ত থেকেই ইস্‌লাম ও ইস্‌লামী উম্মাহ থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তা হলে এক থেকে ৭৩ পর্যন্ত যারা বিভক্ত, তারা কি করে রাসূল সঃ এর উম্মত থাকে? কখনো থাকেনা। বিভক্তিবাদই শির্ক। শির্কের পথে যারা পা দেয়, তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়।

"আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" বলে ইসলামী উম্মাহকে মুহাজির, আন্‌সার, আরব, অনারব, চার খলিফা, চার ইমাম, চার মায্‌হাব ও চার তরীক্বা বানানোর ফলে দেখা যায় যে, তাতারী খবীস্, রক্ত পিপাসু তৈমুর লঙ্গ, সিরিয়ার হিম্‌স্ ও হালাব্ দখল করে আট লক্ষাধিক আরবদের শিরোচ্ছেদ করে তাদের কাটা মাথা দিয়ে পিরামিড তৈরী করে তার উপর চড়ে তখনকার মায্‌হাব ও হাদীসের মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস্‌দের হুকুম দেয় যে "তোমরা ফতোয়া দাও যে, উভয় পক্ষে যারা নিহত হয়েছে এবং যারা তাদের হত্যা করেছে, তারা সবাই বেহেশ্‌তে যাবে।" তাতারী নরপিশাচ তৈমূরের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই বিরাট বিরাট ফতোয়া লিখে এনে তার সামনে পাঠ করে। এ জঘন্য হত্যা যজ্ঞের উপর ফতোয়ার ইসলামি গিলাফ চড়িয়ে তা তার হাতে হস্তান্তর করে।

অথচ আল্লাহ্ পাক ক্বোরআনে বলেছেন যে, একটিমাত্র ঈমানদার মানুষকে যে বা যারা ইচ্ছা করে হত্যা করবে, তার পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে রাসূল সঃ বলেছেন, যারা মু'মিনদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ ঘটাবে, তারা নিহত ও হত্যাকারী উভয়ই জাহান্নামী।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ ঘটিয়ে মক্কার ক্বোরাশীরা যে জাহান্নামী তান্ডব সৃষ্টি করে, চেঙ্গিস্, তৈমূর ও তাতার দস্যুদের হাতে সেই আযাব দিয়েই আল্লাহ্ উমাইয়া ও আব্বাসীদের নির্মূল করেন। এবং ওদের পয়সায় চালু করা মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও মুফতীরা আজো ফতোয়া দিয়ে ইসলামী ঐক্য থেকে বিশ্বের মানুষকে দুরে ঠেলে রাখছে।

ঐক্যের একমাত্র পথ ক্বোরআন এবং ক্বোরআনের সাথে হুবহু মিল রাসূল সঃ এর আমল। এর মধ্যেই রাসূল ও তাঁর রিসালাত সীমাবদ্ধ। ক্বোরআন ইব্রাহীমী ইমামতের বিধান ও সমাজ ব্যবস্থা। মুহাম্মাদ সঃ মিল্লাতে ইব্রাহীমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরীত হয়েছিলেন। যা তিনি করে গিয়েছেন। মিল্লাতে ইব্রাহীম কী ক্বোরেশদের ইমামত? ক্বোরেশদের গোত্রীয় নেতৃত্ব তো নমরুদের মিল্লাত!

ইস্‌লামের চূড়ান্ত ইমাম মুহাম্মাদ সঃ মক্কার কাফেরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দশ বছর মাদীনায় নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে বিদায় নেন বলা যায়। তিনি মক্কাহ জয় করেন। আবু সুফ্‌য়ান ও তার স্ত্রী হিন্দাকে তিনি ক্ষমা করে প্রাণ ভিক্ষা দেন। অথচ আবু সুফ্‌য়ান সম্মিলিত কুফরের নেতা এবং তার স্ত্রী উহুদের যুদ্ধে হামযার বুক চিরে তার কলিজা ভক্ষণকারিনী ও অন্যান্য শহীদদের নাক ও কান কেটে তা দিয়ে হার তৈরী করে গলায় পরা পাষন্ডী। রাসূল সঃ ও তাঁর সঙ্গীরা তো মক্কাহ্ জয়ে মক্কায় হত্যাযজ্ঞ করেননি, মক্কায় এবাহা ঘোষণা দিয়ে গণধর্ষণ দূরে থাক, একটি ধর্ষণও ঘটতে দেননি!

অথচ আবু সুফ্‌য়ান ও হিন্দার নাতি ইয়াযিদ মাদীনাহ্ আক্রমণ করে বদরের যুদ্ধের ৩১৩ জন সাহাবীর জীবিতদের মধ্যে বেছে বেছে চল্লিশ জনের উর্দ্ধে হত্যা করে, দশ হাজার মাদীনাহ বাসীদের কৃতল করে, তিন দিন এবাহা ঘোষণা করে মাদীনার আনসার ও মুহাজিরদের কুমারী মেয়েদের উপর তার রোমান খৃষ্টানদের সাহায্য পুষ্ট সিরিয়ান সৈন্যদের দ্বারা ব্যভিচার ও গণধর্ষণ চালায়, যার ফলে ন্যূনপক্ষে এক হাজার কুমারী অন্ত:সত্তা হয় এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত মাদীনায় 'মস্‌জিদে নববীকে' তাদের ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে রাখে। এভাবে আবু সুফ্‌য়ান ও হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় রাজা ইয়াযিদ রাসূল সঃ, মাদীনাহবাসী ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

ইসলামের নবী সঃ যেখানে মক্কার কাফেরদেরও ক্ষমা করে দিলেন, সেই কাফেরদের নেতা আবু সফ্‌য়ানের ছেলে ও নাতি মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চরম পৈশাচিকতা চালালো। এ দু মেরুর দুটি ভিন্ন রূপের উভয়টাই কি ইসলাম??!! মুফতী ও মুহাদ্দেস সাহেবরা এ ব্যাপারে কি ফতোয়া দিবেন? রাসূলও ঠিক, কাফেরও ঠিক?!

ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফের

সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্য ঈমান। সেই সত্যের সাক্ষদাতারা মু'মিন। অন্যায় ও পাপ কুফর। সেই অন্যায় ও পাপের ধারক ও বাহকরা কাফের। ঈমানদারদের কাজ, সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করে তাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যায় ও পাপকে উৎখাত করে সত্যের জয়গান গাওয়া এবং পাপ ও অন্যায়ের নিন্দা করা । এক কথায়, "সত্যের জিন্দাবাদ এবং মিথ্যার নিন্দাবাদ"ই ইস্‌লাম ও ঈমান। সত্যের জিন্দাবাদ "হাম্‌দ" এবং মিথ্যার নিন্দাবাদ "জেহাদ"। সূরা ফাতেহা আল্লাহ্‌ ও তাঁর দ্বীনের জিন্দাবাদ, ইবলিস্‌ শয়তান ও তার পাপের নিন্দাবাদ। সকল নবী আলাইহিমুস্‌ সালামরা আল্লাহ্‌ কর্তৃক "আন্‌আম্‌তা আলাইহিম্‌" অর্থাৎ পুরস্কৃত অমর। ইয়াহুদী-খৃস্টানরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবীদের পথ ত্যাগ করে শয়তানের পথ গ্রহণ করায়, তারা মাগদূব ও দ্বোয়াল্লীন অর্থাৎ, অভিশপ্ত ও বিপথগামী। হক্কের অনুসারী ও বাতিলের অনুসারীদের জিন্দাবাদ ও নিন্দাবাদই ঈমানদার মুসলিম উম্মাহর ধর্ম ও জীবন। তাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরু হয় এ জিন্দাবাদ ও নিন্দাবাদ সুরা ফাতেহা দিয়ে।

সত্য ও ন্যায় যেমন সবসময় ও সর্বকালে সত্য, মিথ্যা ও পাপ তেমন সব সময় ও সর্বকালে মিথ্যা ও পাপ। সত্যানুসারী ও ন্যায় পরায়নদের প্রাপ্য চিরকাল জিন্দাবাদ এবং অসত্য ও পাপাচারীদের জন্য চির নিন্দাবাদ।

শয়তান বৃদ্ধ হলে যেমন ফেরেশতা হয়না, তেমন শয়তানের অনুসারীরা বৃদ্ধ হলে ঈমানদার ও নেককার হয়ে যায় না। নমরুদ বৃদ্ধ হয়ে যখন ইব্রাহীম হয়নি, ফেরআউন যেমন বৃদ্ধ হয়ে মূসা হয়নি, তদ্রূপ মক্কার আবু সুফ্য়ান ও মুয়াবিয়ারা **১৪১২** বছর অতীত হয়েছে বলে তারা "বুজুর্গ সাহাবা" হয়ে যায়নি। তারা মু'মিন ও সাহাবী হ'লে কখনো মদীনাবাসীদের উপর প্রতিশোধ নিতে হত্যা, ব্যভিচার ও মসজিদে নব্বীকে ঘোড়ার আস্তাবল বানাতো না।

কিন্তু তারা তাই করেছে বলে আল্লাহ তাদের উপর চেঙ্গিস্‌ খান, তৈমূর লং ও ইউরোপিয়ান ক্রুসেডরদের বাগদাদ, দামেস্ক ও স্পেনে পাঠিয়েছেন। রহমতের নবী মুহাম্মাদ সঃ এর কোনো অনুসারী দ্বিতীয়বার তাদের হেদায়েতের জন্য এ যাবৎ আর পাঠাননি। কারণ, উমাইয়া ও আব্বাসীরা হেদায়েত পেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার পোষাক খোলসে ঢুকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর শেষ নবীর দ্বীনকে দুর্নাম দান করেছে। তাই চেঙ্গিস ও তৈমূররা ওদের উপর চড়াও হয়ে বাগদাদে ও দামেস্কে এবাহা করে ওদের লক্ষ লক্ষ মেয়েদের লাঞ্ছিত করেছে, স্পেনে আরবী ক্বোরেশদের নির্বংশ করেছে। আমরা মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীম আঃদের অনুসারী ঈমানদার। ওদের পাপ ও গজব আমাদের ঘাড়ে কেনো নেবো? আমরা সূরায়ে ফাতেহার মর্মে ওদের নিন্দাবাদ ও আখেরী রাসূল সঃ ও তাঁর সঠিক অনুসারীদের জিন্দাবাদ করাকে আমাদের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য বানাবো। আমি নিজেকে এ পথে উৎসর্গ করে এ কথা লিখছি।

ক্বোরেশী ইমাম মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ ও মারওয়ানের পেছনেই যদি নামাজ পড়বো, তা হলে ক্বোরেশী কাফেরদের উৎখাত করে মিল্লাতে ইব্রাহীমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী নবী সঃ ও তাঁর জামাতের প্রথম ক্বাতার, যায়দ, বেলাল, আম্মার সুহাইব, সালমান ও উসামাহ্‌দের সাথে আমাদের কিসের সম্পর্ক? মক্কার ক্বোরেশী কাফেরদের ইমামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করায় মুহাদ্দিস আবু হুরাইরাকে রাসূল সঃ এর বিতাড়িত কুচক্রী মারওয়ানের মুয়ায্‌যিনগিরী করে মরতে হয়েছে। বেলাল তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তার কর্তব্য স্থির করে রাসূল সঃ এর খাঁটি অনুসারীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে।

ইস্‌লামের নেতৃত্ব ও ইমামতের প্রথম শর্ত যদি "ক্বোরেশী" হওয়া হয়, তাহলে রাসূল সঃ এতো কষ্ট কেনো করলেন? তিনি জন্মগতভাবে ক্বোরেশী ছিলেন। ইসলামের অর্থ "ক্বোরেশদের ইমামত ও সাম্রাজ্য" ঘোষণা করলেই বিনা বাক্যে তাঁকে ক্বোরেশ ও মক্কাবাসীরা আজীবন ইমাম, সিজার ও খস্‌রু বানিয়ে বংশ পরম্পরায় পূজা করতো।

"রাদিআল্লাহু আনহু" কারা?

কাল, যুগ, পাত্র ও ক্ষেত্রের সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে আল্লাহ্। তাঁর সত্য ও তাঁর সুন্নাত বা বিধানও তাই। সৃষ্টির সেরা মানুষ তার অস্তিত্বের সকল মুহূর্তে তার স্রষ্টা প্রতিপালককে স্মরণ করে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যে অবস্থান করে, তাতেই সে খুশী ও আনন্দিত। এ দাসত্ব ও আনুগত্যের জীবন যাত্রায় জয়-পরাজয়, নিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ এবং জীবন ও মৃত্যুর কোনো ভয় থাকেনা। আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র ও গোষ্ঠি-জ্ঞাতির বিচার বিবেচনা থাকে না। শুধু ভয় থাকে "আল্লাহ্ মালিক ও প্রভু যেনো নারাজ না হন"। সর্ব মুহূর্তে, সর্ব পরিস্থিতিতে তাঁর সন্তুষ্টি চাই। মানুষ, নর কি নারী, যখন উক্ত অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করে, তখন তারা মু'মিন ও মু'মিনা হয়। তা না হলে তারা "মানুষ পশু"।
যারা আল্লাহ্তে বিলীন হয়ে তুষ্ট হয়, আল্লাহ্ তাদের উপর তুষ্ট হন। ক্বোরআনের ভাষায় এদেরকে "রাদিআল্লাহু আনহু" বলা হয়েছে। ক্বোরআনের চার জায়গায় আল্লাহ্ এদের উল্লেখ করেছেন।
(এক) কেয়ামতের দিন যখন হযরত ঈসা আঃ বলবেন যে, তিনি কখনো তাঁকে ও তাঁর মাকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করতে খৃস্টানদের বলেননি এবং এ খৃস্টানদের এ পাপের জন্য আল্লাহ্ চাইলে তাদের শাস্তিও দিতে পারেন, যেহেতু তারা তাঁরই দাস। আর তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমাও করতে পারেন, কারণ তিনি পরাক্রমশালী বিচারক। তখন আল্লাহ বলবেন, "আজ একমাত্র সত্যনিষ্ঠদের সত্যনিষ্ঠাই উপকারে আসবে (কারো সুপারিশ নয়) তাদের জন্য চিরস্থায়ী বেহেশ্ত্। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূআন্হ্। আল্লাহ্ তাদের উপর তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র উপর তুষ্ট। এটা বিরাট সাফল্য"। (সূরা মাইদাহ্- ১১৯) رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

(দুই) আখেরী নবী সঃ এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুহাজির আনসারদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত এবং পরে যারা উত্তম রূপে তাদের অনুসারী হয়েছে, তারাই "রাদিআল্লাহু আনহুম ওয়ারাদূ আনহু" আল্লাহ্ তাদের উপর তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র উপর তুষ্ট। আল্লাহ্ তাদের জন্য চিরস্থায়ী বেহেশ্ত্ সাজিয়ে রেখেছেন। এটা বিরাট সাফল্য। (সূরা তওবা- ১০০) رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো জাতি পাবেনা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখবে। হোকনা তারা তাদের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতবেশী! আল্লাহ্ স্বীয় হস্তে তাদের অন্তরে "আল ঈমান" লিখে তাঁর স্বীয় রূহ্ দিয়ে তাদের সমৃদ্ধ করেন। এদের আল্লাহ্ চিরস্থায়ী বেহেশ্তে স্থাপিত করবেন। আল্লাহ্ এদের উপর তুষ্ট এবং এরাও আল্লাহ্র উপর তুষ্ট, "রাদিআল্লাহু আনহুম্ ওয়া রাদূআনহ্"। এরাই আল্লাহ্র দল। এরাই সফলকাম। (সূরা মুজাদালাহ্ - ২২)
رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

(চার) আল্লাহ্র কিতাব পেয়েও যারা কুফ্রী ও শির্ক করে, তারা জাহান্নামী ও নিকৃষ্ট জীব। যারা ঈমান এনে সে অনুযায়ী সৎকাজ করে, তারা জীব-শ্রেষ্ঠ। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের পুরস্কার স্বর্গোদ্যান, যাতে রং বেরঙ্গের ঝর্ণা প্রবাহমান। তাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে বাস করবে। "রাদিআল্লাহু আনহুম, ওয়ারাদূ আন্হু"। আল্লাহ্ তাদের উপর তুষ্ট, তারাও আল্লাহ্র উপর তুষ্ট। যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তাদের এ পরিণাম। (সূরা আল বাইয়্যেনাহ - ৬,৭,৮) আল ক্বোরাআনে এ চার জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা "রাদিআল্লাহু আনহু" দের বর্ণনা ও তাদের গুণাবলী বেঁধে দিয়েছেন। এর বাইরে অবস্থানকারীরা কেউ "রাদিআল্লাহু আনহু"র যোগ্য ছিলো না, নেই এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত হবেনা। এ হলো আল্লাহ্র সুন্নাত বা বিধান। যার কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। "রাদিআল্লাহু আনহু"দের সূরা মুজাদালায় বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পূর্বে আল্লাহ্ পাক যাদের উপর "অসন্তুষ্ট" অর্থাৎ যাদের উপর তাঁর গযব অবধারিত, তাদের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। গাল্পিক ও পেশাদার তথাকথিত মুফাস্সিররা আল্লাহ্র গযব ও অসন্তুষ্টির কোনো আয়াত পেলেই তা অতীতের ইয়াহুদী ও খৃষ্ঠানদের উপর আরোপ করার জন্য দু'দশ খানা হাদীস ও গল্প বানিয়ে তা' ওদের উপরই সেঁটে রাখে। যেনো যতো পাপ আছে সব অতীতের ইয়াহুদী খৃস্টানদের ঘাড়ে। আখেরী নবী সঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রহমত, পূর্ণ ইস্লামকে বিকৃত করে যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র গযবকে টেনে আনবে, তাদের জন্য যে অতীতের সকল পাপীদের পাপের যোগফল বর্তাবে, তার কোনো উল্লেখ নেই ওদের লেখনীতে। কারণ, সে জঘন্য পাপে যে তারা নিজেরা শরিকদার?! আল্লাহ্ সূরা মুজাদালায় "কারা রাদিআল্লাহ্

আনহুম" এবং "কারা গাদিবাল্লাহু আনহুম" তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার এ ব্যাখ্যার পর কোনো ঈমানদার ব্যক্তি ও জাতির অন্য কোনো ব্যাখ্যার কল্পনাও জাহান্নামী হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকেনা। আল্লাহ্, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। তাই তাঁর সর্বশেষ নবী সঃ কে দিয়ে অতীতের ইয়াহুদী ও আরব মুনাফিক্বদের দৃষ্টান্ত দিয়ে তারপর ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁর তুষ্ট ও অভিশপ্ত বান্দাদের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ - لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ - اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ - إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ -كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ - لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

হে রাসূল, তুমি কি দেখছোনা ওদের, যারা আল্লাহ্র গযবে পতিতদের পথ অনুসরণ করছে? অথচ ওরা তোমাদেরও লোক নয়, ওদেরও লোক নয়? এবং ওরা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ নিচ্ছে! আল্লাহ্ এদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এরা যা করে আসছে, তা অতীব জঘন্য। এরা এদের শপথ অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টির জন্য ঢাল স্বরূপ দাঁড় করাচ্ছে। এর জন্য ওদের অপমানজনক শাস্তি হবে। ওদের ধনবল ও জনবল কিছুই আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কাজে আসবেনা। ওরা সবাই মিলে চির জাহান্নামী হবে। ক্বেয়ামতের দিনে যখন এ শ্রেণীর সকল মানব গোষ্ঠিকে আল্লাহ্ একত্র করবেন, তখন এরা সবাই আল্লাহ্র সামনে শপথ অনুষ্ঠান করবে, যেমন পার্থিব জীবনে তারা তোমাদের জন্য শপথ অনুষ্ঠান করে। তারা ভাববে যে (বাঁচার জন্য) তারা কিছু একটা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। হায়, এ ধারণায় ওরা নিশ্চিত মিথ্যায় পতিত!

শয়তান ওদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধেছে। ফলে শয়তান ওদের আল্লাহ্র শিক্ষা ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা শয়তানের দলের সাংসদ। ওরা নিশ্চিত নিপাত যাবে। যারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের বিরোধী দলের সদস্য হয়, ওরা নিশ্চিত লাঞ্ছিতদের দলে। আল্লাহ্ বিধিলিপি করে রেখেছেন "আমি ও আমার রাসূলরাই একমাত্র বিজয়ী হবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতায় পরাক্রমশালী"।

তুমি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় পাবেনা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের সাথে কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখবে, হোকনা তারা তাদের বাপদাদা ছেলে পেলে, ভাই বেরাদার বা গোষ্ঠি প্রতিবেশী! এ শ্রেণীর লোকদের অন্তরে আল্লাহ্ স্বয়ং "ঈমান" অঙ্কিত করেছেন এবং তাঁর রূহানী শক্তি দিয়ে তাদের সমৃদ্ধ করেছেন। এদের আল্লাহ্ নয়নাভিরাম বেহেশ্তে অধিষ্ঠিত করবেন। যার তারা চির বাসিন্দা হবে। এদের উপরই আল্লাহ্ তুষ্ট এবং এরাও আল্লাহ্র উপর তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্র দলের সাংসদ। সবাই শুনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ্র দলই সফল হবে। (সূরা মুজাদালাহ্, ১৪-২২)

এ হলো বাবা আদম থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানদের "রাদিআল্লাহু আন্হুম্" এবং "গাদিবাল্লাহু আলাইহিম" হওয়ার মানদন্ড। আখেরী নবী সঃ এবং তাঁর পূর্বে যারা এ মানদন্ডে নিজেদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের অনুসারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে, তারা সবাই নির্বিশেষে "রাদিআল্লাহু আনহুম" যেমন আল্লাহ্ সূরা আল বাইয়্যেনাতে বলেছেন। আখেরী নবী সঃ এর জীবদ্দশায় যারা তাঁকে পেয়ে যায়েদ, বারাকাহ্, খাদিজাহ্, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইব্ন্ মাসউদ, আবু বকর, আবু যার ও উমরদের মতো সে মানদন্ডে উপস্থাপিত করে গিয়েছে, তারা যেরূপ "রাদি

আল্লাহু আন্‌হুম” তদ্‌রূপ ক্বেয়ামত পর্যন্ত যারা সে মানের হয়েছে ও হবে, সবাই “রাদি আল্লাহু আনহুম্” যেমন উপরে সূরা মুজাদালায় আল্লাহ্ বলেছেন। বরং তার সমর্থনে রাসূল সঃ থেকে বর্ণিত পাওয়া যায় যে তিনি বলেছেন তাঁর বিদায়ের পর যারা তদ্‌রূপ হবে, তাদের জন্য সত্তুর গুণ বেশী মর্যাদা রয়েছে। কারণ, তারা কোনো রাসূলকে না দেখে, অহী নাযিল হতে না দেখে এবং শুধু শুনে ও ক্বোরআন পড়ে রাসূলদের অনুসারী হয়েছে, হচ্ছে ও হবে।

আর যে সমস্ত ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া ও আরবরা রাসূল সঃ কে দেখে তাঁর মুখে ক্বোরআন শুনে ও তাঁর আমল দেখেও উপরোল্লেখিত মানদন্ডে রাসূল সঃ কে গ্রহণ করেনি ও মানেনি, বরং তার মৃত্যুর পরই গোত্রবাদ, বর্ণবাদ ও আরব জাহিলিয়্যাতের বিভক্তিবাদের ধ্যান ধারণা প্রকাশ ও প্রচার করে ইস্‌লামী ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, তারা, “রাদি আল্লাহু আন্‌হুম” নয়। বরং যারা ক্বোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে রাসূল সঃ এর আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়ে স্বজনপ্রীতি করে ইসলামের রহমতকে উৎখাত করে পুনঃ মক্কাহ ও মদীনায় গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রাসূল সঃ এর গড়া প্রথম সারির সঙ্গীদের হত্যা, নির্বাসন ও নির্মূল করে ইসলামের নামে আরব জাহিলিয়্যাতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা “রাদিআল্লাহু আন্‌হুম্” এর পরিববর্তে, সেই সমস্ত নরাধম, যাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও মানব জাতির লানত ও অভিসম্পাত। আল্লাহ্ পাক ক্বোরআনে এ শ্রেণীর লোকদের উপর বিশেষ করে পাঁচবার লা'নত ও গযবের উল্লেখ করেছেন।

(এক) এদের পরিণাম, আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সকল মানবজাতির লা'নত (আলে ইমরান, ৮৬-৮৭)

(দুই) এরা এ পৃথিবীতে লানতের পিছু ধাবন করবে এবং ক্বেয়ামতের দিনও। (হুদ্, ৫৯-৬০)

(তিন) পৃথিবীতেও লা'নত এদের তাড়াবে এবং ক্বেয়ামতের দিনও। (হুদ-৯৯)

(চার) এরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, এদের উপর লা'নত এবং নিকৃষ্ট এদের বাসস্থান। (রা'দ-২৫)

(পাঁচ) আমি পৃথিবীতে এদের পেছনে লা'নত লাগিয়ে দিয়েছি। পরকালেও এরা দুর্দশাগ্রস্থ হবে। (ক্বাসাস্-৪২)

এদের অমার্জনীয় পাপ হলো যে, এরা আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর সাথে রাসূলদের মাধ্যমে কৃত শপথ ও অঙ্গিকার ভঙ্গ করে তাকে পেছনে ছুঁড়ে পার্থিব তুচ্ছ ও ক্ষনস্থায়ী লোভ ও লাভের পেছনে ধাওয়া করে। ক্বোরেশদের চেয়েও অনেক বেশী খান্দানী কুলিন ও অভিজাত বনি ইসরাঈলদের উপর আল্লাহ্‌র এ লা'নত। তারা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র বংশধর বলে আল্লাহ্‌র অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। আত্মকলহবাজ, রক্তপিপাসু ও গোত্রপূজারী মক্কার ক্বোরেশরা তাদের তুলনায় অতি তুচ্ছ সম্প্রদায় ছিলো।

সেই নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট আখেরী নবী সঃ কে পাঠিয়েছিলেন। তাদের হঠকারিতা, পাষন্ড মনোবৃত্তি ও হিংস্রতায় রাসূল সঃ মর্মাহত হয়ে সূরা হুদ ও ইউনুসে বর্ণিত বনি ইস্‌রাঈলের পাষন্ড চরিত্রের কথা ভাবতেন। রাসূল সঃ বহুবার তাঁর মক্কাবাসী ও ক্বোরেশী জাতকে সতর্ক করে বলেছেন “তোমরা আমার পর সুরা হুদ ও ইউনুসে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতি সমূহের মতো আমার আদর্শ ও শিক্ষা ত্যাগ করে অভিশপ্ত হবে। সূরা হুদ ও ইউনুস্ পড়ে তার সাথে তোমাদের মিল দেখে চিন্তায় আমি বুড়িয়ে গিয়েছি।” شيبني هود وإخوانه “শাইয়াবানী হুদ্ ওয়া ইখ্‌ওয়ানুহু।”

মাদীনায় হিজরত, মক্কাহ বিজয় ও ইস্‌লামের জয়ের পরও যখন রাসূল সঃ যায়দ ও উসামাহকে নেতৃত্ব দিয়ে দেখলেন যে অনৈক্যের আরব বেদুঈন জাত রাসূল জীবিত থাকতেই সুযোগ পেলে তাদের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ স্বভাব বেরিয়ে পড়ে, তাই রাসূল সঃ তাঁর বিদায়ের পূর্বে বিদায় হজ্জ ছাড়াও মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত বিশেষ ভাবে নবদীক্ষিত আরবদের নানান ভাবে সতর্ক করে যান। বিশেষ করে মাদীনাহবাসীদের উপর যে মক্কার ক্বোরেশদের আক্রোশ ছিলো, তিনি তা স্পষ্ট বুঝতে পেরে মদীনাবাসী তাঁর প্রিয় আনসারদের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় ও অসদাচারণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বহুবার সাবধান করে যান।

বিদায়ের পূর্বে পরাজিত ক্বোরেশদের, বিশেষ করে বনু উমাইয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করে হুজুর সঃ খুব বিচলিত হন বলা চলে। তিনি বনু উমাইয়ার কিছু লোককে মাদীনাহ থেকে বহিস্কার করে ঘোষণা করেছেন “এরা কখনো মাদীনায় বাস করতে পারবে না।” এদের মধ্যে ওস্‌মান ইব্‌ন্ আফ্‌ফানের চাচা হাকাম, তার ছেলে মারওয়ান ও হিশাম অন্যতম। একবার রাসূল সঃ ওসমানকে লক্ষ্য করে বলেন, “তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে যার একার উপর অর্ধ মানব জাতির আযাব হবে।”

নবী করীম সঃ এর নিকটতম এক ব্যক্তির পাপ এতো গুরুতর হবে যে বিশ্বাবাসীর সকল পাপের অর্ধেক তার একার উপর আপতিত হবে!!??

এ কেমনতরো ব্যাপার? তাও সে লোকটি আবার ক্বোরেশের লোক! সে ব্যক্তিটি আবু বকর, উমর, ওস্‌মান ও আলীদের মতো রাসূল সঃ এর ঘনিষ্ঠ লোকদের মাঝ থেকে হবে!!!

হযরত ঈসা রূহুল্লার বারোজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা হাওয়ারী ছিলো। তারা তাঁর নিকটতম ছিলো। তাদের মধ্য থেকে একজন জুডাস্ মাত্র তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাদের নবী ঈসা রূহুল্লাহ আঃ কে ঘাতকদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলো। আল্লাহ তাঁর নবীকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাহাবী জুডাস্‌কে হয্‌রত ঈসা আঃ এর অবিকল অবয়ব করে তাকে ঘাতকদের হাতে তুলে দেন। এটাকেই আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন "ওরাও চক্রান্ত করেছিলো এবং আল্লাহ্‌ও চক্রান্ত করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ চক্রান্ত কারীদের শ্রেষ্ঠ"।

ঈসা রূহুল্লাহর সাহাবীদের মধ্যে জুডাস্ আল্লাহ্‌র নবীর ঘনিষ্ঠ হয়েও নবীর আদর্শ বিক্রয় করে এমন মহাপাপ করলো যে, সে তার পাপের ভয়াবহতা বুঝ্‌তে পেরে বলে যায় যে, "ক্বেয়ামত পর্যন্ত সে হযরত ঈসার অনুসারীদের সকল পাপ তার ঘাড়ে নিয়ে ক্রুশ বিদ্ধ হতে যাচ্ছে।" খৃষ্টানরা জুডাস্ হাওয়ারীর পরিবর্তিত রূপ দেখে এবং তার কথা শুনে তাকেই আসল ঈসা আঃ বিশ্বাস করে বলে বেড়াচ্ছে যে, তাদের যীশু তাদের সকল পাপ নিজের ঘাড়ে নিয়ে তাদের পাপ মুক্ত করে গিয়েছেন। আসলে যে এ যীশু আল্লাহ্‌র ক্লোনিং করা নকল যীশু, তা তারা বুঝতে পারেনি। আসল সাইয়্যেদুনা ঈসা রূহুল্লাহকে আল্লাহ্ উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি পুনঃ আসবেন, এসে মিথ্যার দাজ্জালকে নির্মূল করে আসল সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

জুডাস্ কিন্তু কাফের বা সম্পূর্ণ বেঈমান ছিলোনা। জুডাস্ ও তার অপর এগারজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের উপস্থিতিতেই হযরত ঈসা বলেছিলেন "তোমাদের মধ্যে কে আমাকে কিছু মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রী করবে?" তখন হযরত ঈসা আঃ এর ইঙ্গিত কিন্তু জুডাসের দিকেই ছিলো। যেমন আখেরী নবী সঃ তাঁর নিকটতম সাহাবীদের যখন বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে সে ব্যক্তি, যার উপর বিশ্ববাসীর পাপের অর্ধেক বর্তাবে?" যাদের ঈমান নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ না হয়, তারা কিন্তু পার্থিব লোভ সম্বরণ ক্‌রতে পারে না। যেমন জুডাস্ পারেনি। তদরূপ ইসলামের পূর্ণ জয়ের পর যখন ক্বোরেশীরা দেখলো যে ইসলাম তো প্রতিষ্ঠিত হয়েই গিয়েছে। এখন এটাকে দখল করে আমরাই এর একচ্ছত্র ইমাম হয়ে যাই! তাই তারা তাদের জাহিলী দৃষ্টিতে দেখা নবীকে তাদের গোত্রীয় সম্পদ মনে করে "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" প্রচার করে ইসলামের ইমামতকে তাদের গোত্রীয় খেলাফতে রূপান্তরিত করে। তাদের মধ্যে থেকে একজন আরো এগিয়ে বললো, যদি বেহেশ্‌তের চাবী তার হাতে থাকতো, তা'হলে সে তার উমাইয়া বংশের লোকদের সবাইকে তাতে ঢুকিয়ে তারপর বেহেশ্‌তে স্থান খালি থাকলে অন্যান্যদের বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে দিতো।

যে বেহেশ্‌ত বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই ঈমানদার। বেঈমান হলে তো আর বেহেশ্‌তের কথা বলতে পারে না! তবে তার ঈমান শর্তপূর্ণ ও স্বার্থপূর্ণ। আল্লাহ্ ও রাসূলদের উপর যাদের নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ ঈমান, একমাত্র তারাই স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে খাঁটি ঈমানদার হয়। একমাত্র তারাই "রাদিআল্লাহু আনহুম"। এ শ্রেণীর ঈমানদারগণ ক্বেয়ামত পর্যন্ত "রাদিআল্লাহু আন্‌হুম"। এদের কোনো যুগ ও কাল নেই।

ইসরাঈলী গোত্রবাদী জুডাস্‌রা মনে করতো যে, তারা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয় পাত্র। যেমন কোরেশরা মনে করেছে যে, তারা যেহেতু কাবাহ্ ঘরের প্রতিবেশী, তাই তাদের কোনো পাপ নেই। ক্বোরেশ ও আরবরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে এ ধারণা ধার করেছে। যেখানে আল্লাহ ক্বোরআনে বলেছেন কোনো মানুষই তাঁর দরবারে নিজের আমল ব্যতীত পার পাবেনা। আখেরী নবী সঃ তার কলিজার টুকরা ফাতিমাহকে বলেছেন যে তিনি তাকেও পার করতে পারবেন না, বরং ফাতিমাহকেও তার নিজের কর্ম ফলে পার হতে হবে। সেখানে যীশুর খৃস্টানদের পার করে নেয়া এবং আখেরী নবী সঃ এর ক্বোরেশী বা আরবদের পার করে নেয়ার কথা জঘন্য মিথ্যুকরা ব্যতীত কেউ প্রচার করতে পারে?!

কাঁচা ঈমানদাররা ধর্মবেসাতি ও ধর্ম ব্যবসায়ী হয়। কোনো পাপ করলেই তাদের ধর্ম যায় না। যেমন ইয়াহুদীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে রাসূলদের হত্যা করার পরও তাদের ঈমান যায়নি, যেমন জুডাসের ঈমান যায়নি, হযরত ঈসা আঃ কে বিক্রি করার পরও। তদরূপ আখেরী নবী সঃ এর রিসালাতকে "কুকুরের মতো কামড়ানো রাজতন্ত্রে" রূপান্তরিত করে মাদীনায় হাজার হাজার খাঁটি ঈমানদার মদীনাবাসীকে হত্যা, হাজার হাজার মেয়েদের ধর্ষণ ও মস্‌জিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেও তাদের ঈমান অটুট রেখে ক্বোরেশী উমাইয়ারা শুধু সাহাবী ও

ঈমানদারই রয়ে যায়নি, মক্কাহ্, মদীনাহ্, বাগদাদ, দামেস্কে তাদের ইমামতীও বহাল রেখেছে। মদ খেয়ে ফজরের নামাজ তিন রাকাত পড়ালেও তাদের ইমামতি যায় নি।

আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে আরবরা জিদ্দাহ, মক্কাহ ও মদীনাহ্‌র পথে হাজীদের সর্বস্ব লুট করতো। পর্তুগীজ, বৃটিশ, ডাচ্ ও অন্যান্য খৃস্টান জলদস্যুরা মক্কাগামী হাজীদের জাহাজ আক্রমণ করে সর্বস্ব লুট করে তাদের হত্যা করতো। খৃস্টানরা এসব করতো এই মনে করে যে, যীশু তাদের সকল পাপ মোচন করে দেবে। আরবরা কাফেলা লুট করে বহু ক্ষেত্রে হজ্জ যাত্রীদের হত্যাও করতো। তাদের দৃষ্টিতে কিন্তু তারা বেঈমান ছিলোনা। তারা বানোয়াট হাদীস মোতাবেকই এসব কাজ করতো। আক্রান্ত হজ্জ যাত্রীরা যখন বলতো যে তারা হজ্জ করতে এসেছে, এখনো হজ্জ সমাধা করেনি, তাদের হজ্জ্ব পালন করার জন্য ছেড়ে দেয়া হোক, তখন আরবরা বলতো, হাদীসে আছে যে রাসূল বলেছেন, যারা হজ্জ্ব করতে এসে মারা যায়, তারা শহীদ হয় এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত যতো হজ্জ হয়, তারা সকল হজ্জের সওয়াব পায়। তাই আরবরা তাদের সর্বস্ব লুট করে হত্যা করে ক্বেয়ামত পর্যন্ত হজ্জে জারিয়াহর ব্যবস্থা করেছে। অপর দিকে যারা হজ্জ্ব সমাধা করে দেশে স্বজনদের কাছে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইতো যে, তারা পবিত্র হজ্জ পালন করে স্বজনদের কাছে ফিরছে। তখন আরব দস্যুরা বলতো, "হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হজ্জ করলে মানুষের সকল গুনাহ মাফ হয়ে সদ্য প্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জ করে দেশে ফিরে গুনাহ করলে সে গুনাহ আর মাফ হয় না।" তাই আরবরা হাজ্জীদের সর্বস্ব লুটে তাদের হত্যা করে নিষ্পাপ বেহেশতে পাঠানোরই ব্যবস্থা করছে। এ হত্যাকান্ডে কোনো গুনাহ্ নেই!

বর্তমানে মক্কাহ ও মাদীনায় হজ্জ ও ওমরা পালনকারীদের কাছ থেকে মক্কাহ্ ও মাদীনার মোয়াল্লেম ও অন্যরা যে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা উপার্জন করে, তার সিংহ ভাগই যে আরবরা দেশ বিদেশে বেশ্যালয়, পানশালা, জুয়ার আড্ডা ও অন্যান্য পাপকার্যে ব্যয় করে, তা কি কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে?

রাসূল সঃ মক্কার কাফেরদের পরাজিত করে মক্কাহ ও কা'বাহকে পবিত্র করে হারাম ব্যভিচারকে নির্মূল করে হালাল বিবাহকে সহজ করে যান। "জটিল বিবাহ ব্যভিচারের পথ সুগম করে"। নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে তা নিজে পালন করে পাপকে পৃথিবী থেকে বিদায় দেন। বিদায় হজ্জে তিনি বার বার বুঝিয়ে হাত তুলিয়ে শপথ নিয়ে যান, "তোমরা আর অন্ধকার যুগের জাহিলিয়্যাতে কখনো ফেরৎ যাবেনা।"

কিন্তু ইসলামের ইমামত ও খেলাফতকে উৎখাত করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই মক্কার জালুতের বংশধরেরা বিজিত দেশের মেয়েদের বন্দী করে এনে মক্কাহ্ ও মাদীনার ঘরে ঘরে সয়লাব করে দেয়। পেশাদার নর্তকী ও বেশ্যাদের এনে এদের বেহায়াপনার শিক্ষা দিয়ে নবী সঃ এর রেখে যাওয়া সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এদের ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কারণ, ইসলামী পারিবারিক দুর্গকে ধ্বংস করতে না পারলে সে সমাজে জাহিলিয়্যাতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যায়না। ইসলামের এক মোজেযাহ্ উমর ইবন্ আব্দুল আজীজ ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে উমাইয়াহ্ খবীসদের নাপাকী দূর করে ঐ সমস্ত মেয়েদের উদ্ধার করে যাদের পিতা মাতাদের ঠিকানা পেয়েছে, তাদের ফেরৎ দিয়েছে। যাদের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেনি, তাদের বাইতুল মাল থেকে অর্থ দিয়ে পুনর্বাসিত করে ইসলামী জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়।

ইসলামকে জাহিলিয়্যাতে রূপান্তরকারী জুডাসদের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে মিথ্যা বুজুর্গী প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছে যে, ওদের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে কিছু বললে ঈমানই চলে যাবে। অথচ ঐ জুডাস্‌রাই আল্লাহ্, ক্বোরআন এবং রাসূল সঃ এর বিরুদ্ধাচারণ করে ইসলাম ও ঈমান থেকে খারিজ হয়ে "হিযবুশ শাইতান" অর্থাৎ শয়তানের দলের সদস্য ও সাংসদ হয়ে ক্বেয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েছে।

আখেরী নবী সঃ এর নবী জীবনের ভিত্তি প্রস্তর, তাঁর জামাতের প্রথম সারি এবং ইসলামী উম্মাহর কষ্টি পাথর ইব্‌ন মাসউদ, আম্মার, বেলাল, সুহাইব, আবু যার, সালমান ও আলীরা ঐ জুডাসের ইসলাম ও নবী সঃ এর আদর্শ ত্যাগী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রকাশ করে গিয়েছে। তাদের সাথে তালহা ও যুবাইরও নির্দ্বিধায় একমত হয়ে বলেছে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদ সঃ এর জুডাস্ যে অবরুদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে তা সে তার কৃত পাপের কিঞ্চিৎ শাস্তিই পেয়েছে। বাকী পাপের শাস্তি পৃথিবীবাসীর অর্ধেক পরকালে ভোগ করবে, যেমন আসল জুডাস্ খৃষ্টান বিশ্বের সকল পাপ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করেছে।

আসলে কি কোনো মানুষ অন্যের পাপের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অন্যান্যদের পাপ লাঘব করতে পারে? পারে না। আসলে

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ ঃ ব্যাপারটি হলো
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (العنكبوت১২-১৩)

কাফেররা মু'মিনদের বলে, আমাদের পথে চলো, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো। মূলে ওরা ওদের সামান্য বোঝাও বহন করতে সক্ষম হবে না। ওরা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী। হ্যাঁ, ওরা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ করবে এবং তার সাথে অন্যদের বিভ্রান্ত করার শাস্তিও ভোগ করবে এবং ক্বেয়ামতের দিন অবশ্যই ওরা মিথ্যাচারের জন্য বাড়তি জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আন্‌কাবুত-১২,১৩)

হযরত ঈসা আঃ এর বারোজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে জুডাস্ অন্যতম ছিলো। সে বনি ইসরাঈলের সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষাবলম্বন করে হযরত ঈসা আঃ কে তার কপালে চুমো খেয়ে ঘাতকদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। ঠিক তদ্‌রূপ আখেরী নবী সঃ এর দশজন ঘনিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলো উম্মতে মুহাম্মাদীর জুডাস। সেও মুল জুডাসের মতো তার গোত্র বনি উমাইয়ার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর দ্বীন ও তার আখেরী নবী সঃ এর পূর্ণ আদর্শকে বিকিয়ে দিয়েছিলো।

যারা আল্লাহর দ্বীন ও তার রাসূলদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জান মাল, স্ত্রী পরিজন, ভাই বেরাদার, আত্মীয় গোষ্ঠি ও পাড়া প্রতিবেশী সব বিলিয়ে দেয়, তারাই বাবা আদম আঃ থেকে রোজক্বেয়ামত পর্যন্ত রাদিআল্লাহু আন্‌হুম ওয়া রাদূ আনহু অর্থাৎ তারা আল্লাহর উপর তুষ্ট এবং আল্লাহ্‌ও তাদের উপর তুষ্ট। আর যারা স্বজনপ্রীতি করে আল্লাহর দ্বীন ও তার নবীদের আদর্শকে নিলাম করে, তারা ইব্‌লিসের নিমক হারামীর দিন থেকে আরম্ভ করে ক্বেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে বিচারের মুহূর্ত পর্যন্ত জুডাস্। এদের কোনো যুগ ও কাল নেই। ভালোরা রাদিআল্লাহু আনহুম, আর মন্দরা মাগদূবি আলাইহিম। তাদের উপর অনুক্ষণ আল্লাহর গযব। তারা হযরত নূহের স্ত্রী ও ছেলে হোক, হযরত লুতের স্ত্রী মেয়েরা হোক, হযরত ইব্রাহীমের পিতা মাতা হোক, হযরত ঈসার সাহাবী জুডাস হোক বা আখেরী নবী, রাহমাতুল্লিল্ আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর চাচা বা সাহাবী হোক। কোনো পার্থক্য নেই। এটাই ঈমানদারদের ঈমান ও বিশ্বাস।

ইমাম মাহদী ও দাজ্জাল

বিশ্বজনীন ইস্‌লামী নেতৃত্ব ও ইমামতকে ক্বোরেশের দাজ্জালরা নিজেদের গোত্রের পক্ষে ছিন্‌তাই করার পর তারা আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ এর নামে অসংখ্য মিথ্যা হাদীস বানিয়ে ইমাম মাহ্‌দীকেও পকেটস্থ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সকল মিথ্যার যেমন মা বাপ থাকেনা, ওদের এ মিথ্যারও মা বাপ নেই। অথচ প্রত্যেক মিথ্যাই তার অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট উপাদান তার মধ্যে নিয়েই জন্মায়। তাই আল্লাহ্ পাক ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا "সত্য আসন্ন, মিথ্যা অস্তগামী, মিথ্যাকে অবশ্যই বিলুপ্ত হতে হবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল - ৮১) রাসূল সঃ তাঁর সম্প্রদায় আরবদের তিরিশ পারা ক্বোরআন্, তাঁর আদর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে বার বার বলেছেন, "তোমরা আমার মৃত্যুর পর ইয়াহুদী খৃস্টানদের অনুসরণে ওদের পদচিহ্নে পতিত হবে। ওরা যদি কোনো কারণে ভল্লুকের গর্তে প্রবেশ করে, তা হলে তোমরাও ওদের অনুসরণে ভল্লুকের গর্তে প্রবেশ করবে। (বোখারী,মুস্‌লিম)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবী বলে কথিতদের মধ্যে শতকরা আশি জন মোর্তাদ হয়ে ভন্ডনবীদের অনুসারী হয়েছিলো। আবু বকর যুদ্ধ করে তাদের হাযার হাযার কে হত্যা করে বাকীদের পুনঃ ক্বোরেশী ইস্‌লামে ফেরৎ আসতে বাধ্য করে। তাদের বহু নর-নারীকে বন্দি করে দাস-দাসী রূপে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। আবু বকর ও উমরের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর আরবরা হযরত মূসার "সামেরী" ও হয্‌রত ঈসার "জুডাস্" দাঁড় করিয়ে "রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামীনের" আদর্শকে রাজ্য বিস্তার, হত্যাযজ্ঞ ও বিশ্বময় লুটমারের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়েছে।

রাসূল সঃ বলেছেন, "তোমরা কুকুরে কাম্‌ড়ানো" হিংস্রতা করে পৃথিবীকে পাপাচারে ডুবিয়ে ফেলবে। "মুল্‌কুন্ আদুদ" ও "ইয়াম্‌লাউল্ আরদা যুলমান ওয়া ঝুরা"। তোমাদের মধ্যে ন্যূন তিরিশটি দাজ্জাল বের হবে। তারপর একজন হেদায়েতের ইমাম এসে হযরত ঈসার সাথে মিলে পৃথিবীকে পুনঃ সত্য ও ন্যায়-নীতি দিয়ে ভরে দিবে। يملأ الارض قسطا و عدلا ইয়াম্‌লাউল আরদা ক্বিস্‌তান্ ওয়া আদলা। (মুসলিম)

আরবী সামেরী ও জুডাসের অনুসারী তিরিশজন দাজ্জাল ওদের মধ্য থেকে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী রাজাদের মধ্যে থেকেই ঠিক ঠিক বের হলো। এ দাজ্জালরা তাদের দাজ্জালীকে ঢাকার জন্য শুধু মিথ্যা হাদীস দাঁড় করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা রাসূল সঃ এর বলা ইমাম মাহ্দীকেও তাদের গোত্রে ঢুকানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে যায়। হযরত ঈসা আঃ কে ওদের ক্বোরেশী গোত্রে জন্মানো সম্ভব নয় বলে ঐ নরপশুরা তাঁকেও মিথ্যা হাদীস বানিয়ে আসমান থেকে দামেস্কের উমাইয়া দাজ্জালদের মস্‌জিদের মিনারে অবতরণের ব্যবস্থা করেছে।
এ মিথ্যুকরা প্রচার করে যে তাদের ক্বোরেশী গোত্রীয় নবী বলেছে, ইমাম মাহদী শুধু আরবই হবেন না, তিনি ক্বোরেশ বংশ থেকে হবেন। তাঁর নাম হবে রাসূল সঃ এর নামের মতো মুহাম্মাদ, এবং তাঁর পিতা মাতার নামও হবে আব্দুল্লাহ ও আমিনাহ্। মিথ্যুকদের যেমন স্মরণশক্তি থাকেনা, তেমনি ওদেরও ছিলোনা! তারা নিজেদের মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য নিজেরাই মিথ্যা জুড়ে যায়। তারা আবার বলে যে, ইমাম মাহ্দী বিবি ফাতিমার বংশ থেকে হবেন।
এখন এ মিথ্যা গুলোকে অপনোদন করা যাক।
আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে নামাজ ভিত্তিক শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদম ও তাঁর সন্তানদের খলিফা করে পাঠিয়েছেন। এ আদম সন্তানদের খেলাফত পরিচালনার আদর্শ স্বরূপ আল্লাহ্ মাঝে মাঝে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়ে নেতৃত্ব বা ইমামতের সংস্কার ও নবায়ন করেন। নবী ও রাসূলরা সবাই ইমাম "আইম্মাতুল্ হুদা"। وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ (আম্বিয়া -৭৩)।
আল্লাহ্র এই নবী ও রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে সঠিক পথের প্রশিক্ষণ দেয়াই আল্লাহ্র সুন্নাত। سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, তোমাকে রাসূল করে পাঠানো আমার সুন্নাত। যেমন তোমার পূর্বে রাসূলদের পাঠানো হয়েছে। এ আমার অপরিবর্তনীয় বিধান। এ বিধানের কোনো পরিবর্তন নেই। তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো "সালাত ক্বায়েম করা"। অর্থাৎ ইমামের নেতৃত্বে নামাজ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যেমন ইব্রাহীম খলীলকে দিয়ে কা'বাহ নির্মাণ করে তাকে মস্‌জিদ বানিয়ে মস্‌জিদ ভিত্তিক সমাজের পত্তন করা হয়েছে। রাজা, বাদশাহ্, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আমলা ও সেক্রেটারীয়েট ভিত্তিক বিধান ইস্‌লামে নেই। এ গুলো, খোদাদ্রোহী ইব্‌লিসের খলিফা নমরূদ, ফেরআউন ও আবু জেহল, আবু লাহ্‌ব্ এবং আবু সুফ্‌য়ানদের কুফরী সমাজ ব্যবস্থা।
রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, সব শয়তানের বিধান। রিসালাত ভিত্তিক ইমামত এবং ইমামত ভিত্তিক সমাজ আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বান্দাদের একমাত্র (ফরজ) কর্তব্য হলো, ইমামের নেতৃত্বে নামাজ ভিত্তিক সমাজ কায়েম করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, পাঁচটি ক্লাস। তার পাঠ্যপুস্তক ক্বোরআন এবং ইমাম হলো শিক্ষক। শিক্ষক ও শিষ্যদের কাজ হলো নামাজের নিয়মিত ক্লাস চালু রাখা। এই পাঁচ ক্লাসের আজীবন শিক্ষা পদ্ধতিই "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়"। এর কোনো বিকল্প নেই। এটাই ইস্‌লামী বিশ্ব বিধান, বা বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্‌লাম। এর বাইরে সকল গোত্রীয়, ভাষা ভিত্তিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তা, রাষ্ট্র ও সরকার, শিক্ষাপদ্ধতি ও সংস্কৃতি, বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভ্রান্তি। এ বিভ্রান্তিকে আরবী ভাষায় "দজ্‌ল্" এবং এর নায়ক ও নেতাদের "দাজ্জাল" বলা হয়।
<u>স্রষ্টা ও পালন কর্তা ভিত্তিক মানব জাতির নিশ্ছিদ্র একক ঐক্যই "তাওহীদ"</u>। এ ঐক্যে ফাঁটল, শির্ক এবং এ শির্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াই কুফ্‌র। এ কাজ যারা করে তারা কাফের এবং যুগে যুগে যারা এর নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, তারা দাজ্জাল এবং সর্বশেষ বিশ্বজুড়ে যে ব্যক্তি এর নেতৃত্ব দেবে, সে হবে "মসীহুদ্ দাজ্জাল" মানে বিশ্ব দাজ্জাল।
আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী এবং নবীদের ইমামতের আদর্শে যারা বিশ্বে সমাজ পরিচালনা করে, তারা ইমাম। তাদের অনুসারীরা মুস্‌লিম। মানব ইতিহাসের সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তির মোক্বাবেলা করে সারা বিশ্বে এক আল্লাহ্ ও এক মানবজাতির নেতৃত্ব যে দেবে, তিনিই ইমাম মাহ্দী, বা আল্লাহ কর্তৃক হেদায়েত প্রাপ্ত বিশ্ব শান্তির নেতা। তিনি বিশ্বমুক্তির নেতা রূপে বিশ্ব বিভ্রান্তির দাজ্জালের বিরুদ্ধে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দাজ্জালকে নির্মূল করবেন।
আখেরী নবী মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্ সঃ কর্তৃক আল্লাহ্ তাঁর আদর্শকে পূর্ণ করেছেন। কিন্তু সে আদর্শকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছেন মুসলিম উম্মাহ্ বা জাতির উপর। মানব জাতির মধ্যে ঐক্য নষ্টকারী নিকৃষ্ট জাত ও জাতি আরব বেদুঈনরা। ওরা শহুরে কী মরুবাসী, এক জাত এক ধাত্। "আল্ আ'রাবু আশাদ্দু কুফ্‌রাও ওয়া নিফাক্বা" স্বয়ং আল্লাহ্র ঘোষণা।

নিকৃষ্ট রুগ্ন জাতির রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট নিরাময় আবিষ্কারের জন্য আল্লাহ্ তাঁর উৎকৃষ্ট নবী পাঠান আরব মরুতে। প্রথমে তিনি তাঁর নবীর চিকিৎসা করেন তাঁকে আরবী-রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য। আল্লাহ্র এই প্রক্রিয়াই তাঁর রাসূলের আসল "সিনা-চাক" বা "আলাম নাশরাহ্" হয়। তাঁকে শিশু কালেই শির্ক ও কুফুরের রোগাক্রান্ত ও রোগগ্রস্থ আরবী ক্বোরেশী পিতা মাতা থেকে আলাদা করে আল্লাহ্ তাঁর লালন করেন বরকতময় পালিকামাতা বারাকাহ্কে দিয়ে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এর পর স্ত্রী খাদিজার মতো জাহিলিয়্যাত্ মুক্ত পরিচারিকা দিয়ে তার দেখাশুনা করান। চল্লিশ বছর বয়সে ইমামত প্রাপ্তির পর যায়দ, আলী, আবু বকর, আম্মার, বেলাল, ইব্ন্ মাসউদ, আবু যার, সুহাইব প্রভৃতিদের নিয়ে তিনি তাঁর আদর্শের প্রথম কাতারের মোক্তাদী তৈরী করেন। এটাই হলো "তোমাকে এতীম থেকে আশ্রয় দেইনি? তোমাকে পথ হারা থেকে পথের দিশা দেইনি?"

মক্কার ক্বোরেশরা, বিশেষ করে রাসূল সঃ এর স্বগোত্র বনি হাশিমের এক জনও তাঁর উপর ঈমান আনেনি। একমাত্র বয়সে ছোট, ছোটবেলার খেলার সাথী ও দুধভাই চাচা হামযা আবু জেহ্লের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে ভাতিজাকে রক্ষা করতে ঈমান আনে। ভাতিজার প্রতি মমত্ববোধ তাকে ঈমানের স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যায়। অন্য চাচা আবু লাহ্ব্, আবু তালেব ও আব্বাসের কথা তো সবারই জানা। তারপরও ভাড়াটিয়ারা নবী সঃ কে ক্বোরেশী, হাশেমী ও তাঁর পিতা মাতাকে 'মুসলিম' এবং ৩৬০টি দেব-দেবীর মন্দিরের ঠাকুর, দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে 'হানিফ' বানিয়ে তাদের ভাড়ার হক আদায় করেছে, করছে। এ শ্রেণীর ভাড়াটিয়া চিরদিন ছিলো, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো কিছু থাকবে।

কিন্তু আসল কথা, নবী সঃ ক্বোরেশে ও আরবে জন্মেও ক্বোরেশী বা আরবী ছিলেন না। জাপানের দিক থেকে সূর্য্য ওঠে বলে যেমন সূর্য্য জাপানী নয়, তদ্রূপ আরবে জন্মানো নবী সঃও আরাবী ছিলেন না। তিনি বিশ্ব পালনকর্তার রাসূল, রাহ্মাতুল্লিল্ আ'লামীন রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর এ ছাড়া অন্য কোনো পরিচিতি নেই।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "তোমাকে শুধুমাত্র বিশ্বশান্তির দূত বৈ পাঠাইনি।" (সূরা আম্বিয়া - ১০৭)

রাসূল সঃ তাঁর ক্বোরেশ ও আরব সম্প্রদায়ের মজ্জাগত স্বভাব যায়দ ও উসামাহ্কে আমীর (সেনাপতি) নিয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ইতিহাসও আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী সঃ কে ভালো করে পড়িয়েছেন। তাই রাসূল তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করার লক্ষ্যে বলে যান যে, তারা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মতো নবীর আদর্শ ত্যাগ করবে। তাদের মধ্যে অনুন্য তিরিশটি মানুষরূপী 'দাজ্জাল' প্রকাশ পাবে এবং সর্বশেষে বিশ্বদাজ্জালের আবির্ভাব হবে। সকল দাজ্জালরা ধর্মের নামেই আত্মপ্রকাশ করবে। উমাইয়া ও আব্বাসী রাজারা তাই ছিলো।

রাসূল সঃ এ সম্পর্কে একাধিক রূপক ভবিষ্যদ্বাণীও করে যান। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো আলী কর্তৃক বর্ণিত একটি বাণী। রাসূল সঃ খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, **ইস্লাম মক্কাহ্ ও মাদীনাহ থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হবে। আরবদেশ বহির্ভূত খোরাসান ও মা ওয়ারাআন্ নাহ্র এলাকার দিক থেকে "হারিসুল হার্রাস" অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নিজহাতে উৎপন্ন করে হালাল ভোগী এক লোক সংস্কারের ডাক দেবে। তার সাথে "মান্সূর" অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত এক লোক যোগ দেবে, তাদের সাথে খোরাসান ও তার পশ্চাদভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ আল্লাহ্র সৈনিক যোগ দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে মক্কাহ ও মাদীনাহ পৌঁছে তাকে মুক্ত করবে, যেমন রাসূল সঃ করেছেন। তারপর মাক্কাহ ও মাদীনাহ হয়ে বহু লোক ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে ইস্রাঈল, বাইতুল মাকদিস্ গমন করে দাজ্জালের মুখোমুখি হবে। তখন হযরত ঈসা আঃ আকাশ থেকে অবতরণ করে ইমাম মাহ্দীর সাথে মিলে দাজ্জালকে নির্মূল করবেন, ইত্যাদি।**

দাজ্জালদের আগমন সম্পর্কে রাসূল সঃ বার বার এতো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উমর নাকি তার খেলাফতের আমলেই কয়েক বার দাজ্জাল হত্যার অভিযানে বের হবার ঘোষণা দিয়ে ছিলো। কিন্তু উমরের জীবদ্দশায় দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেনি। উমরের মৃত্যুর কিছুদিন পর দাজ্জালদের নেপথ্য নায়কদের খেল আরম্ভ হয়ে যায়। তাদের খেলে ওসমান ও আলী নিহত হয়ে বিদায় নিলেই প্রথমে দামেস্কে দাজ্জালের রাজতন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়।

উমাইয়া দাজ্জালদের মাদীনাহ ও মক্কায় ঘটানো নৃশংসতায় রাসূল সঃ এর ওফাতের পর তাঁর অনুসারী ইয়াতীম সাধারণ মুসলিমরা রাসূল সঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উমাইয়া দাজ্জালদের পতন কামনা করে উল্লেখিত রাসূল সঃ এর বাণী প্রচার আরম্ভ করে। দামেস্কের বনু উমাইয়ার দাজ্জালরা তখন তাদের ভাড়াটিয়াদের লাগিয়ে দেয় পাল্টা হাদীস দাঁড় করার জন্য। তারা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করে ফেলে যে, আলী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে যেহেতু ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব অ-আরব খোরাসানের দিক থেকে হবে, তা ঠিক নয়। ইমাম মাহদীকে অবশ্যই ক্বোরেশী হতে হবে, যেমন

আখেরী নবী সঃ ক্বোরেশী ছিলেন। উমাইয়ারা এই মিথ্যা হাদীসের বহুল প্রচার করেই থামেনি। তারা আরো যোগ করলো যে, হযরত ঈসা স্বয়ং আকাশ থেকে উমাইয়াদের মস্‌জিদের মিনারে অবতরণ করে পূনঃ বিশ্বে ক্বোরেশী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

উমাইয়াদের এই প্রচারের মুখে উমাইয়া রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ইব্‌ন আব্বাসের বংশধররা চুপকরে রইলো না। তারা তাদের লোকদের দ্বারা প্রচার আরম্ভ করলো যে ইমাম মাহদী ক্বোরেশী বংশ থেকে হবেন, তা ঠিকই, কিন্তু তাতে আরেকটি যোগ আছে। তা হলো, ইমাম মাহ্‌দী কোরেশদের মধ্যে বনি হাশিম থেকে হবেন। উমাইয়ারা ক্বোরেশী হলেও যেহেতু হাশেমী নয়, তাই মাহদী আব্বাসের বংশধর থেকে আবির্ভূত হয়ে আব্বাসী-হাশেমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

এ কাজে তারা আবু মুস্‌লিম খোরাসানী নামের এক যোগ্য লোককে পেয়েও গেলো। উমাইয়াদের অত্যাচারে তাদেরকে দাজ্জালের আসনে আসীন করে আবু মুস্‌লিম খোরাসানী তুমুল আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে। তাতে উমাইয়াদের পতন হয় এবং বাগদাদে আবু সুফ্‌য়ানের দোস্ত আব্বাসের সন্তানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ ও মারওয়ান সহ সকল উমাইয়া রাজাদের ক্ববর খুঁড়ে তাদের হাড়-গোড় তুলে জ্বালিয়ে দেয়।

সাধারণ মুস্‌লিম্‌রা মুহাদ্দিস্‌দের বানানো হাদীসের তেলেস্‌মাতিতে উমাইয়া দাজ্জালদের হাত থেকে আব্বাসী দাজ্জালদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আব্বাসী দাজ্জালরা প্রথম প্রথম আব্বাসী ও হাশেমী প্রতারণাকে আরো পোক্ত করার জন্য বিবি ফাতিমাহ্‌ ও আলীর বংশ "আহ্‌লে বাইত" এর সদস্যদের দান-দক্ষিনা দিয়ে তাদের সাথে ভিড়ায়। কারবালার ঘটনার পর থেকে উমাইয়াদের হিংস্র থাবা থেকে বহু কষ্টে আলীর বংশধরদের পালিয়ে পালিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিলো।

আব্বাসীদের ক্ষমতা দখলে তারা কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু আব্বাসী দাজ্জালরা "আহ্‌লে বাইতের" লোকদের গতিবিধির উপর অত্যন্ত কড়া প্রহরা বসায়। তারা ভালো করে জানে যে, যে মিথ্যা কথা দাঁড় করিয়ে তারা উমাইয়াদের হাত থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, তা পরিণামে আব্বাসের বংশধরদের মাঝে গিয়ে টিকবে না। কারণ, আরবী পরিভাষায় "বনি হাশিম" বলতে রাসূল সঃ এর ঘর বুঝায়। রাসূল সঃ বনি হাশিমের রাসূল। রাসূল সঃ এর যেহেতু কোনো ছেলে সন্তান বেঁচে ছিলোনা, শুধুমাত্র তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ্‌ ও জামাতা আলীর সন্তানরাই রয়েছে, তারাই ইমামত ও মাহ্‌দী হবার জন্য সবচেয়ে বেশী হক্বদার। আব্বাস তো আবু সুফ্‌য়ানের দোসর, ইসলাম ও রাসূলের চির শত্রু! তাই আব্বাসীরাও উমাইয়াদের মতোই দাজ্জাল।

এই জটিল টানা পোড়নে পড়ে ভীত আব্বাসীরা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নৃশংস ভাবে রাসূলের বংশধর ইমামদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। শেষ রক্ষার জন্য আব্বাসীরা তাদের নিজেদের নামের সাথে "হাদী ও মাহ্‌দী" ও যোগ শুরু করে।

অপর দিকে আলী ও হাসান হোসাইনের বংশধর ভিতরে ভিতরে 'আহ্‌লে বাইতে রাসূল' অর্থাৎ রাসূল সঃ এর নির্যাতিত পরিবারের প্রতি সাধারণ মুস্‌লিম জনগোষ্ঠির সমবেদনাকে মূলধন করে নিজেকেই খেলাফত্‌, ইমামত এবং নেতৃত্বের একমাত্র হক্বদার বলে প্রচার আরম্ভ করে।

আরবদের হাতে পরাজিত ইরানীরা এই আদর্শকে লুফে নিয়ে এ'কে আরবদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবার মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। রাসূল সঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্‌র দ্বীনের তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ থেকে বিচ্যুত হয়ে আরবরা রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় উম্মাদ হয়ে যায়। তাই বিজিত দেশ সমূহে মানুষদের ইসলামী শিক্ষা দিতে চরম ভাবে ব্যর্থ হয় তারা। এক কালের দেউলিয়া ও দরিদ্র আরবরা ইসলামের নামে দেশের পর দেশ জয় করে লুণ্ঠিত ধনে প্রাসাদের পর প্রাসাদ গড়ে যে ভোগ বিলাস ও প্রাচুর্যের ঝলমলে চমক সৃষ্টি করে, তা দেখে বিশ্বের মানুষ হতবাক হয়ে যায়। তাদের ঘৃণা ও বদদোয়ার সাথে আল্লাহ্‌র গযবও আরবদের উপর পতিত হয়। আল্লাহ্‌ এদের নিধন ও শাস্তির জন্য কখনো চেঙ্গিজদের পাঠান, কখনো তৈমূর লং কে পাঠান, আবার কখনো ওদের সমূলে নির্বংশ করার জন্য স্পেনে ক্রুসেডরদের চাপিয়ে দেন। আজ তাদের মাথার উপর ঝুলন্ত অসির মতো ইস্‌রাঈলকে যেমন চাপিয়ে দিয়েছেন। এতো শতাব্দীর লাঞ্ছনার পরও ঐ বর্বর জাতের সামান্যতম বোধোদয় হচ্ছে না। বরং দিন দিন আরো নির্লজ্জ হয়ে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের দিকেই ভিড়ছে। বিশ্ব-মুস্‌লিমকে আল্লাহ্‌র দেয়া সকল সম্পদ আজ ওরা হাতে পেয়ে

ভোগের নেশায় বিভোর হয়ে আছে।

আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে মিথ্যাচারের দাজ্জালী পাপে উমাইয়ারা নিশ্চিহ্ন। আব্বাসীরা নিশ্চিহ্ন। আজ ইসলাম ও মুসলমানী শুধু ক্বোরআনে লেখা আছে। হাদীস নামের রাসূল-বাণী সংকলনে সত্য ও মিথ্যার ভেজাল। তাকে যাচাই করার একমাত্র কষ্টি পাথর আল্‌ ক্বোরআন। এই ক্বোরআনই থাকবে। এ ক্বোরআন সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন,

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

"এ সেই ক্বোরআন, যা সত্যি সত্যি সঠিক পথ দেখায় এবং ঈমানদারদের সাফল্যের সুসংবাদ দেয়।"

উমাইয়া ও আব্বাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর পতিত মুস্‌লিম জাতিকে শিয়া ও সুন্নীর দুই বিভক্তি, ক্যানসারের মতো প্রতিমুহূর্ত নিঃশেষ করছে। সুন্নীরা ক্বোরেশী ইমামত, উমাইয়া ও আব্বাসী রাজতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে মুসলিম নামধারী তুর্কী, মোঘল ও পাঠান পর্যন্ত সর্ব প্রকারের বর্বর শাসনকে মুসলিম তথা ইসলামী নাম দিয়ে গর্বের সাথে গ্রহণ করে। কারণ, রাসূল সঃ এর পর থেকে এ সকল হিংস্র শাসনের নায়ক তারা। তাদের পূর্ব পুরুষরা ইমাম মাহ্‌দীর সত্য হাদীসের সাথে মিথ্যা যোগ বিয়োগ দিয়ে তা নিজেদের পক্ষে বিপক্ষে অতীতে যত্রতত্র ব্যবহার করেছে। তাই তারা ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হুজুর সঃ এর ভবিষ্যৎ বাণীকে সরাসরি অস্বীকার করতেও পারছেনা। কিন্তু শিয়ারা ইমামত ও ইমাম মাহ্‌দীর পরিভাষাকে প্রায় জাতীয়করণ করে ফেলায় বিভিন্ন দেশে সুন্নী চক্ররা ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত পুরো ব্যাপারটাকেই এখন বানোয়াট ও কাল্পনিক বলার প্রয়াস পাচ্ছে। সৌদী আরবে হিজরী ১৪০০ সাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ওখানকার ও আশে পাশের আরবদেশে সুন্নীরা মুসলিম বিশ্বে চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ দেখতে পেয়ে তাদের পত্র পত্রিকায় মুক্তির দুত ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রচুর লেখা-লেখি করতো।

কিন্তু ১৪০১ সালের ১লা মুহার্‌রামে কিছু ঈমানদার সৌদী যুবকদের দ্বারা কা'বাহ অবরোধের ঘটনা ঘটলে সৌদী সরকারের তাবেদার শেখ ও মোল্লারা রাতারাতি ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত সকল হাদীস ও ধ্যান ধারণাকেই অমূলক ও মিথ্যা প্রমাণের জন্য ফতোয়া দেয়া ও লেখালেখি আরম্ভ করে দেয়। তারা ইমাম মাহ্‌দীর পাশাপাশি "মুজাদ্দেদ" নামে আরেক শ্রেণীর সংস্কারকের কথা প্রচার করে।

শিয়া সুন্নীর বিভক্তি এতো মারাত্মক যে, এ ব্যাধিতে আক্রান্তরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় যে কোনো বিধর্মীর পক্ষাবলম্বন করতে পারে। আরব সুন্নীরা ইরানের শিয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ডেকে আনলো নিজ ঘরে এবং বর্তমানে ইরানী শিয়ারা আফগানী সুন্নী তালেবানদের বিরুদ্ধে ৩৩ কোটি দেব-দেবীর পূজারী ভারতের সাথে একাকার হতেও দ্বিধা করেনি! ক্বোরআন এদের প্রত্যেককে তাদের মিত্র শক্তির সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করেছে। এরা কেউ মুস্‌লিম নয়। (সূরা মাঈদা - ৫১) وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ শিয়ারা তাদের ইমাম মাহ্‌দীকে ১২০০ বছর পূর্বে জন্ম দিয়ে কোনো এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রেখে তার পুনর্বার আবির্ভূত হওয়ার প্রহর গুনছে। বিবি ফাতেমার বংশধর এই ইমাম, সুন্নী হিংস্রদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রহস্যজনক ভাবে ১২০০ বছর ধরে আত্মগোপন করে আছে বলে শিয়াদের বিশ্বাস।

এ হলো সুন্নী ও শিয়াদের ইমাম মাহ্‌দীর ধ্যান ধারণার সার সংক্ষেপ। এবার আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলদের আদর্শে সম্ভাব্য ইমাম মাহ্‌দীর ব্যাপারে আসা যাক।

আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান হলো যে, কোনো মানব সমাজ কখনো সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ বিপথগামী হলেই তিনি নবী পাঠিয়ে সে সমাজের সামনে নতুন করে সত্যের পূর্ণ আদর্শ তুলে ধরার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নবী আসার সিল্‌সিলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শেষ যামানায় একজন বিশ্ব সংস্কারক ইমামের আগমনের কথা নবী সঃ বলে গিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন যে, হযরত ঈসা আঃ উক্ত ইমামের সাথে মিলে পৃথিবীতে হযরত ইব্রাহীম আঃ এর ইমামতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে ধরাকে ভূ-স্বর্গে রূপায়ীত করবেন।

সেই বিশ্বশান্তি ও সত্যের ইমাম সকল বর্ণ ও গোত্রীয় পঙ্কিলতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে হবেন। তাঁর আদর্শ ও গুণাবলী আখেরী নবী সঃ এর মতো হবে। আখেরী নবী যেমন তাঁর স্বীয় গোত্রের ও পরিবারের শির্ক ও পাপাচারের বিরুদ্ধে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর খলীল ইব্রাহীম আঃ এর পক্ষে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছেন, ইমাম মাহ্‌দীও সকল বর্ণ ও গোত্রবাদের বিরুদ্ধে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" এর তাওহীদ ও ঐকের ডাক দিবেন। সুন্নী, শিয়া, মায্‌হাব, আরব ও অনারব, সকল

বিভক্তি নির্মূল করে তিনি ঈসা রুহুল্লাহর সঙ্গী হয়ে ইয়াহুদী-খৃষ্টান আঁতাতের শূকরকে হত্যা করবেন, খৃষ্টানদের ক্রুশ ভাংবেন এবং ওদের সম্মিলিত সামরিক শক্তিকে এমন ভাবে পরাজিত করবেন, যেমন লবন পানিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মিথ্যুক উমাইয়া, আব্বাসী ও শিয়া, কারো কথা মতো ইমাম মাহ্দী ক্বোরেশ বংশে জন্মাবেন না এবং তাঁর পিতা-মাতার নামও আব্দুল্লাহ্ ও আমিনাহ্ হবে না। হওয়ার কোনো কারণ ও যুক্তি নেই। বা বিবি ফাতিমার বংশধর হওয়ারও কোনো যুক্তি বা প্রয়োজন নেই। ক্বোর'আন ও রাসূল সঃ এর আদর্শ ও শিক্ষা এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কারণ সমূহ ঃ

(এক) ইমাম মাহ্দীকে যদি অবশ্যই নামের দিক দিয়ে মুহাম্মাদ, বংশে ক্বোরেশী এবং তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মায়ের নামে আমিনাহ হতে হয়, তাহলে তাঁকে কোনো মুশ্‌রিক ও কাফের বংশে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং অবশ্যই তাঁর পিতা মাতাকেও মুশ্‌রিক এবং কাফের হতে হবে, যেমন হুজুর সঃ এর মা বাবা মুশরিক ও কাফের ছিলো। আর রাসূল সঃ এর মৃত্যুর ১৪১২ বছর পর ক্বোরেশ ও হাশেমী বংশে অন্ততঃ একটি দম্পতি মুশরিক ও কাফের হতে হবে যা থেকে ইমাম মাহ্দী জন্ম গ্রহণ করবেন। ক্বোরআন্ অনুযায়ী মক্কাবাসী ১০০ ভাগ কাফের ছিলো। ক্বোরেশরা ছিলো সে কাফেরদের পুরোহিত বংশ, এবং বনি হাশিমের আব্দুল মুত্তালিব ছিলো ৩৬০টি দেব-দেবী দ্বারা রূপান্তরিত মন্দির, কা'বার প্রধান পুরোহিত। প্রমাণ, সূরা কাফেরুন। তাতে নির্বিশেষে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূল সঃ এর মুখ দিয়ে মক্কাহ্‌বাসীদের ঘোষণা করিয়েছেন قل يايها الكافرون "বলো হে কাফেররা" সূরা মাউনে বলেছেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ "হে রাসূল, ওদের দেখছো না যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মিথ্যা বলে?"

এ দুটি সূরায় আল্লাহ্ কাবাহ ঘরে মক্কাহবাসীদের নামাজকে ধ্বংসের কারণ ও "মূর্তিপূজা" বলে আখ্যায়ীত করেছেন, এবং রাসূল সঃ কে দিয়ে বলিয়েছেন, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ "তোমরা যে ইবাদত করছো তা আমি কখনো করবোনা।" فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ তোমাদের নামাজ তোমাদের ধ্বংসের কারণ। فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ সূরা ক্বোরেশে আল্লাহ্ ক্বোরেশদের চরমপত্র দিয়েছেন যে তারা যদি দেবদেবীর পূজা বাদ দিয়ে একমাত্র কা'বা ঘরের রবের ইবাদত না করে, তা হলে তাদের শীত গ্রীষ্মের নিরাপদ বানিজ্য বন্ধ করে দেয়া হবে। যা রাসূল সঃ কার্যতঃই মাদীনায় হিজরতের পর সিরিয়া যাত্রার পথ অবরোধ করে আরম্ভ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি না হলে তা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। সূরা আনফালের ৩৪ ও ৩৫ আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন যে মক্কার কাফের ও বনি হাশিমের পুরোহিতরা কা'বার সেবাইত হতে পারেনা। একমাত্র "মোত্তাক্বীরা"ই কা'বার খাদেম হবে। কারণ ক্বোরেশ ও বনি হাশিমের কা'বায় নামাজ 'আড্ডা ও ভন্ডামী' বই কিছু নয়। وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

মক্কাহবাসী ক্বোরেশ ও বনি হাশিমের ব্যাপারে উমাইয়াহ্ ও আব্বাসীদের ক্রয় করা পরবর্তি মুহাদ্দিস্ ও মুফাস্‌সিরদের বর্ণিত "হানিফ" হওয়ার কোনো প্রমাণ ক্বোরাআন ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আমলে কোথাও নেই। মক্কাহর দেবদেবীদের পুরোহিতদের হয্‌রত ইব্রাহীমের অনুসারী "হানিফ" বানানোর কিস্যা কাহিনী মাদীনার আনস্‌র ও অন্যান্য মুসলিমদের খাটো করে দেখানোর ক্বোরেশী অপচেষ্টা মাত্র। কারণ, আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃ কে দিয়ে মক্কাহবাসীকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে কা'বাহ্‌কে ইব্রাহীমী হানিফিয়্যাতে ফেরৎ এনেছিলেন। পরবর্তিতে এ ক্বোরেশেরাই অন্যায়ভাবে ইসলামী ইমামত ও নেতৃত্বকে ছিনতাই করে মুস্‌লিম উম্মাহ্‌কে ডুবিয়েছে, যা থেকে আজো তারা ভাসতে পারেনি। ক্বোরআন ও সহীহ্ হাদীস্ অনুযায়ী অক্বোরেশী ও অনারব ইমাম মাহ্দী ও হযরত ঈসা এসেই মুস্‌লিম উম্মাহ্‌র চূড়ান্ত বিজয়ের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি কোনো ক্বোরেশী, হাশেমী বা ফাতেমী বংশোদ্ভুত হবেন না।

"ইমাম মাহ্দীর ফাতিমার বংশোদ্ভুত হতে হবে" এ কথাও ভূয়া ও মিথ্যা। কারণ, বলা হয়েছে যে তাঁকে রাসূল সঃ এর বংশ থেকে ফাতিমার আওলাদদের মধ্য থেকে হতে হবে। এ গুলো সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী মিথ্যা। কারণ, ইস্‌লামে মেয়ে থেকে কখনো পিতার বংশ হয়না। তাই ইমাম মাহ্দী এক সঙ্গে নবীর বংশ ও ফাতিমার বংশোদ্ভুত হতে পারেন না। এ গুলো স্বার্থান্বেষী, গোত্র পূজারী ও বর্ণবাদী ক্বোরেশী, হাশেমী ও শিয়াদের মিথ্যাচার। আল্লাহর দ্বীনে মুস্‌লিম ও মুস্‌লিম উম্মাহর ইমাম হওয়ার জন্য মাত্র দুটি শর্ত। বাবা আদম ও মা হাওয়ার বংশোদ্ভুত হওয়া এবং মোমেন ও মুত্তাক্বী হওয়া। বাকী সব নিষ্প্রয়োজনীয়, মিথ্যা। পৃথিবীতে খেলাফত বনি আদমের। ক্বোরআন "হুদাল্লিল্ মুত্তাক্বীন"। আখেরী নবী সঃ মুত্তাক্বী ও "ইমামুল মুত্তাক্বীন" ছিলেন এবং শুধুমাত্র ক্বোরআন দিয়ে নামাজ ও সমাজের ইমামতী করাই দ্বীন, ঈমান ও ইস্‌লাম। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, ক্বোরেশী, হাশেমী, সুন্নী বা শিয়া, সব শয়তানের বর্ণ ও গোত্রবাদ।

মুজাদ্দিদ ও তাজ্‌দীদ

ইস্‌লাম চিরন্তন শাশ্বত প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তের ধর্ম ও কর্মের নাম। এক মূহুর্তেও মানুষ তার ঈমানী দায়িত্ব থেকে পৃথক ও আলাদা হয়না। ঈমানদার মানুষ মাত্রেরই কাজ হলো, কোনো কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও শরীক না করা, প্রত্যেক কাজে নবী সঃ এর অনুসরণ করা এবং "বায়আতের" মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুসারী ইমামের অধীনে জামাত-বন্দি হয়ে জীবন যাপন করা। ইমাম আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাইরে পা দিলেই আর সে ইমাম আনুগত্যের যোগ্য থাকেনা। এ তিনটি কাজই হলো ইসলাম। তাওহীদ. এত্তেবায়ে রাসূল ও ইমামের আনুগত্য। এ সব কিছু প্রমাণের কিতাব হলো আল্‌-ক্বোরআন । ক্বোরআনে যা সুস্পষ্ট আছে, সে বিষয়ে কারো ব্যাখ্যা চল্‌বে না । যে বিষয়ে উল্লেখ আছে 'ব্যাখ্যা নেই' সেখানে রাসূল সঃ এর সহীহ্‌ বাণী পালনীয়। **এবং যে বিষয়ে ক্বোরআনে কোনো উল্লেখ ও ইংগীত নেই, সে বিষয়ে সকল মুফাস্‌সিরীন, মুহাদ্দেসীন্‌ ও ফুক্বাহার মায্‌হাব্‌ ও মতামত পরিত্যাজ্য।** সমসাময়িক কোনো নুতন সমস্যা দেখা দিলে "ইমামে ওয়াক্তের" ইজ্‌তিহাদ সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে। এই হলো أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

আখেরী নবী সঃ কর্তৃক আল্লাহ্‌র পূর্ণকরা দ্বীন ও সমাজ এবং রাষ্ট্রীয়-কল্যাণ কাঠামোকে সম্পূর্ণ রূপে উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করার পর আরব অকৃতজ্ঞরা ইসলামে বহু মিথ্যার সংযোজন করে। হযরত্‌ মূসা ও ঈসার মৃত্যুর পর ইয়াহুদী খৃষ্টানরা যেমন করেছিলো।

বিশেষ করে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী রাজারা তাদের কুৎসিত চেহারাকে ঢাকা ও তাদের কুকর্মের ফলে জনমনে সৃষ্ট বিদ্রোহকে ঠেকানোর জন্য রাসূল সঃ এর নামে অসংখ্য মিথ্যা হাদীস বানিয়ে তাদের বেতনভুক্ত মোল্লাদের জুমার খোৎবা ও ওয়াজের মাধ্যমে তার বহুল প্রচার করে। কারণ, তারা ভালো করেই জানতো যে তাদের নিজেদের নামে এ সমস্ত কথা প্রচার করলে জনগণ তা মানবে না, বিশ্বাসও করবে না। তাই ঐ নাপাকরা পাক নবী সঃ এর নামে কৌশলে সে সমস্ত মিথ্যা প্রচার করেছে। এ সমস্ত মিথ্যার মধ্যে ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মিথ্যার পর মুজাদ্দেদের ব্যাপারটি অন্যতম মারাত্মক।

রাসূলের আদর্শের খেলাফতকে উৎখাত করে হিংস্র গোত্রীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উমাইয়া ও আব্বাসী বাদশা ও রাজারা এক আধজন বাদে, সবাই খৃষ্টান রোমান সিজার ও অগ্নি পূজক পারস্য খসরুদের ন্যায় প্রাসাদে মদ ও নর্তকীদের নিয়েই রাত কাটাতো এবং রাজ্য রক্ষার দায়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ই ফজরের নামাজের ইমামতী করতো। অনেকে পিতাপুত্র একই নারীকে নিয়ে টানা টানিও করতো। ইস্‌লামী খেলাফত উৎখাত হওয়ার পর আর নামাজ ক্বায়েম ও আল্লাহ্‌র ইবাদত হয়নি। নামাজও রাসূল সঃ এর পূর্বের আবু জেহ্‌ল্‌, আবু লাহ্‌ব, আব্বাস ও আবু সুফ্‌ইয়ানদের মক্কার নামাজে ফেরৎ চলে গিয়েছিলো। যে নামাজ ও তার ইমামদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেন "ফা ওয়াইলুল্লিল্‌ মুসাল্লীন্‌" লানত ও গযব ঐ মুসল্লীদের উপর। মদ, মাতলামী ও ব্যভিচার করা সত্ত্বেও দামেস্কে ও বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া ও আব্বাসীদের নামাজের ইমামতী যায় নি। যেমন যায়নি আবু জেহ্‌ল্‌ ও আবু সুফ্‌ইয়ানদের।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ ও তাঁর অনুসারীদের জন্য মদ নিষিদ্ধ, "উম্মুল খাবাইস" অর্থাৎ সকল পাপের মা। কিন্তু মক্কার ক্বোরেশদের জন্য মদ ও সুরা ছিলো মাতৃ দুগ্ধের ন্যায়। এ পানীয় পান করেই যে ব্যভিচারে ওদের সেকালে জন্ম হতো, হাল যামানায়ও আরবরা তেলের পয়সা দিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, থাইল্যান্ড ও বোম্বাইতে সেই কাজই করে যাচ্ছে! বর্তমানে হলিউড ও বলিউডে সৌদী ও আমীরাতের রাজপুত্রদের কারবার জমজমাট। তাতেও মক্কাহ্‌ ও মাদীনায় সেই আরবদের হজ্জের ইমামত যাচ্ছে না! কারণ তারা যে ৩৬০টি দেবদেবীর কা'বার ইমামতের উত্তরাধিকারী! মক্কাহ বিজয়ের পর রাসূল সঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ও ইমামত আজ আর নেই, তাই সেই হজ্জও আর নেই। কারণ, রাসূল তো আর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যান নি!

আরবরা ইস্‌লাম ও তার শেষ নবী সঃ এর নামে তাঁকে ক্বোরেশী ও আরবী বানিয়ে তাদের পাপাচার চালিয়ে যাবে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছুই বলা যাবে না এবং তা উৎখাত করার আন্দোলনও করা যাবে না। করলে কারবালায় যা ঘটেছে, তাই ঘটবে। উমাইয়া ও আব্বাসীরা তাদের পেশাদার হাদীস তৈরীকারীদের দ্বারা রাসূল সঃ এর নামে হাদীস

তৈরী করে ছড়ায় صلوا خلف كل بر و فاجر "তোমরা প্রত্যেক ভালো ও পাপাচারীর পেছনে নামাজ আদায় করো"। আরব অনারব রাজা বাদশাহ্‌রা যতো পাপীই হোক, তাদের বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না। প্রয়োজনে তোমরা একশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওদের পেছনেই নামাজ পড়তে থাকবে এবং ভাববে যে প্রত্যেক একশ বছর পর তোমাদের জন্য একজন করে "মুজাদ্দিদ" আসবে। সে মুজ্জাদ্দিদ এসে তোমাদের দ্বীনকে সংস্কার করে দিয়ে যাবে। এর জন্যও নিয়ম মতো হাদীস বানানো হয়েছে।

অথচ আল্লাহ্ ক্বোর'আনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, তোমরা রাসূলের আনুগত্য করবে এবং তোমাদের মতো আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগতদের মধ্য থেকে যে তোমাদের নির্দেশক হবে, তোমরা তার আনুগত্য করবে"।

আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের সাথে মিলিয়ে রাসূল সঃ বলেছেন, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"স্রষ্টার নির্দেশের বিরোধী, সৃষ্টির কোনো নির্দেশের আনুগত্য নেই।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য নেই।

ক্বোরেশ, উমাইয়া, আব্বাসী ও হাশেমীদের মিথ্যাচার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি যে ওদের "মিথ্যুক ও মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করছি, তাতে সম্ভবতঃ আমাদের কোনো কোনো অর্ধ শিক্ষিত আলেম ও বস্তুবাদী শিক্ষার পন্ডিত প্রশ্ন তুলতে পারে যে ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আরবদের ব্যাপারে এ পরিভাষা কি বেমানান নয়? তাদের সন্দেহ ও প্রশ্ন নিরসনের জন্য এখানে আমি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, মানব জীবনে যতো মিথ্যাচার আছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্, রাসূল ও ধর্মের নামে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সংযোজক করা নিকৃষ্টতম। স্বয়ং আল্লাহ্ এদের কোরআনে শতাধিক বার মিথ্যুক ও অসত্য সংযোজক বলে ধিকৃত করেছেন। ধর্মের নামে মিথ্যাচারকে "ইফতিরা" ও "কিয্‌ব" বলে ক্বোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমি আল্লাহ্‌র পরিভাষা ব্যবহার করে ওদের "মিথ্যাচারী" লিখেছি। ওরা আসলেই জঘন্য মিথ্যুক ও সত্যের অপলাপকারী। ওদের যারা মিথ্যুক বলবেনা ও লিখবে না, তারা আল্লাহ, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ কে মিথ্যুক বলে।

যখন উমাইয়া, আব্বাসী ও ওদের শ্রেণীর শাসকরা পাপ করে, তখন ওদের ভাড়াটিয়া ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা মস্‌জিদে ও মিম্বারে প্রচার আরম্ভ করে দেয় যে, রাজা বাদশাহ্‌রা মাতাল ব্যভিচারী হলেও তাদের বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না। রোমান খৃস্টানদের মিথ্যাচার "The King is the shadow of God" কে আরবীতে অনুবাদ করে তাকে রাসূল সঃ এর বাণী "আস্ সুলতানু যিল্লুল্লাহ" বলে তারা জুমা, ঈদ ও হজ্জের খুৎবায় চালু করে দেয়। হাজার বছর পূর্বের চালু করা সেই পাপ আজো বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে খুৎবায় পড়া হয়। অপরদিকে "প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় একজন মুজাদ্দিদ্ আসবে" বলে তা রাসূলের নামে প্রচার করে মুসলিম উম্মাহকে শত বছরের নেশার বড়ি গিলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। "ধরার পৃষ্ঠে আল্লাহ্‌র ছায়া" বলে কথিত এই নর পিশাচদের বিরুদ্ধে কোনো কথিত মুজাদ্দিদ কোনো আওয়াজ তুললেই তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীদের লেলিয়ে দেয়া হয়। এ প্রথা কোনো নতুন চক্র নয়। আরবদের বাপদাদা ইয়াহুদী খৃস্টান রাজারা এ কাজই করতো। ব্যভিচারী রাজার বিরুদ্ধে বলায় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া এবং কুফর ও শির্কের বিরুদ্ধে বলায় হযরত ঈসাকে হত্যা ও শূলে চড়ানোর ফতোয়া এরাই দিয়েছিলো। উমাইয়া ও আব্বাসীরা তা শুধু আরবীতে অনুবাদ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছে।

মু'মিনদের অপেক্ষার দিন কেটে যায় কিন্তু কোনো শতাব্দীর মাথায়ই আর সেই মুজাদ্দিদ আসছে না এবং এভাবে প্রায় হাজার বছর কেটে গেলো। তখন ভারত বর্ষে চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর এক মুর্খ রাজা, আকবর দশ শত বছরের মাথায় "হাযার বছরের মুজাদ্দিদ" হিসাবে দ্বীনে ইলাহী নামে এক দাজ্জালী আরম্ভ করে। যেহেতু শত বছরের মাথায় মুজাদ্দিদের কথাই মিথ্যা, তাই হাযার বছরের মুজাদ্দিদ দশ গুণ বড় মিথ্যুক ও দাজ্জাল। এই দাজ্জালের পক্ষে নবরত্নের মতো বহু মোল্লারত্নও ভীড়ে।

অপর দিকে খ্রীষ্টান পাদ্রীত্ব, পারস্য অগ্নি পূজারীদের আধ্যাত্ববাদ ও ভারতীয় বৈরাগ্য, এ তিনটার একটি জগাখিচুড়ী, "রূহানিয়াত" বা সুফীবাদ নাম নিয়ে নেশাগ্রস্ত মুস্‌লিম সমাজে চালু হয়। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, মূসা কলিমুল্লাহ, ঈসা রূহুল্লাহ্ ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র মেরাজ ও তিরিশ পারা অহীর ক্বোআনের শিক্ষায় যাদের ক্বাল্‌ব্ ও রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়না, তাদের প্রেতাত্মা তো অবশ্যই শয়তানের কোনো নোস্‌খা ব্যতিত প্রস্ফুটিত হওয়ার

কথা নয়! তাই দামেস্ক, বাগদাদ ও দিল্লীতে ইব্লিস শয়তান, তার খলিফাদের, ইস্লামের নামে দাজ্জাল রূপে ক্ষমতায় আসীন করে ইসলাম বহির্ভূত এক সুফীবাদ চালু করে মুসলিম জাতির অবশিষ্ট পৌরুষকেও কেটে নির্বীজ্য ও নির্জীব করে দেয়।

রাষ্ট্রীয় ইমামত ও নেতৃত্ব থেকে উৎখাত হওয়ার পর তা আর কখনো ফেরৎ পাওয়া অসম্ভব মনে করে কিছু সাদা-সিধা লোকেরা দুনিয়ার আশা ত্যাগ করে শুধু পরকাল প্রাপ্তির জন্য ধ্যান ও মোরাক্বাবা আরম্ভ করে দেয়। পুনঃ রিসালাত্ ভিত্তিক বিশ্ব বিজয়ের ইমামত প্রাপ্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ জনতার এক অংশ আজও এই সুফীদের আশ্রম ও খানকায় ভীড় জমায়। এই পীরদেরই কাউকে তার ভক্তরা "মুজাদ্দিদে যামান" নাম দিয়ে প্রচার করে আত্মতৃপ্তির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু তাতে মুস্লিম উম্মাহ্ দিন দিন আরো রসাতলে যাচ্ছে। যাবেনা?! এ পথ যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের পথ বর্জিত বিদ্আত! আখেরী নবী সঃ বলেছেন كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار "বিদ্আতীরা বিপথগামী এবং বিপথগামীরা সবাই জাহান্নামী!"

ভারতে হাযার বছরের পুঞ্জিভূত বিদআত "দ্বীনে ইলাহী" নামে আত্মপ্রকাশ করে। তাও আবার চেঙ্গিজ, তৈমূর ও তাতারী রক্ত পিপাসুদের বংশধর, আকবরকে মুজাদ্দিদ বানিয়ে!

এই সন্ধিক্ষণে ভারত বর্ষের সিরহিন্দবাসী একজন আলেম আকবরের দাজ্জালীর বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করে। আকবরের দরবারী মোল্লারা তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলে আকবর তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে। আহমদ সিরহিন্দি গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি আকবরের বিরোধীদের নিকট আকবরের দ্বীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে তার মতামত ব্যক্ত করলে তারা তার মুরীদ হতে আরম্ভ করে। বন্দিরা জেল থেকে বের হয়ে বাইরে তার মতামত প্রচার চালায়। তাতে আকবর ও মোঘল সাম্রাজ্য বিরোধী বেশ লোক জড়ো হয়। এর মধ্যে আল্লাহ্র মারে আকব্রের মৃত্যু হলে তার হাযার বছরের মুজাদ্দেদী তরীকা "দ্বীনে ইলাহী" সংকটে পতিত হয়। আকবরের হিন্দু স্ত্রীর গর্ভে ইস্লামী বিবাহ বহির্ভুত জন্মানো ছেলে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে। আকবরের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্য বিরোধীরা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নেমে যায়। বিদেশ থেকে এসে ধর্মের নামে যুদ্ধবাজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দাজ্জালী মোঘল সিংহাসন হুম্কির মুখোমুখি হয়।

আলেমে দ্বীন আহমদ সিরহিন্দি আকবরের হাযার বছরের মিথ্যা মুজাদ্দেদীর বিরুদ্ধে তার মতামত ও শিক্ষা প্রচার করেছিলো ঠিকই। কিন্তু সে কখনো নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবী করেনি। কারণ, মুজাদ্দিদ বলে যে মূলে ইসলামে কিছু নেই! তার মতো একজন আলেম এ মিথ্যা কিরূপে নিজের উপর প্রয়োগ করে? যে নিজেই আকবরের মুজাদ্দেদীর বিরোধী মুজাদ্দিদ?

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসেই সংকটে পড়ে। রাজাদের তো রাজত্ব ছাড়া কোনো ধর্ম থাকেনা? যেমন নমরুদ ও ফেরআউনের রাজত্ব ও সিংহাসন রক্ষা ছাড়া কোনো ধর্ম ছিলোনা। যেমন কোরেশী উমাইয়া ও আব্বাসীদেরও সাম্রাজ্য ও সিংহাসন ছাড়া কোনো দ্বীন ও ঈমান ছিলোনা। দ্বীন ছিলো আল্লাহ্র খলীল ইব্রাহীম, আল্লাহ্র কলিম মূসা এবং তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ এর। জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেই সিংহাসন রক্ষার খাতিরে বাপের হাযার বছরের মুজাদ্দেদী "দ্বীনে ইলাহী" বিসর্জন দিয়ে গঙ্গাস্নান করে আহমদ সিরহিন্দির মুরীদ হয়ে তাকে গোয়ালিয়র দুর্গের বন্দিশালা থেকে মুক্তি দেয়।

আল্লাহ্র বান্দাহ ও তাঁর রাসূল সঃ এর অনুসারী (?) আহ্মাদ সিরহিন্দী আকবরের দ্বীন ইলাহীর বিরোধীতা করলো। অথচ আকবর স্বৈরাচারী সম্রাট হওয়ার ফলেই এই জঘন্য অপকর্ম করতে সমর্থ হয়েছিলো। যেমন মুয়াবিয়া ও ইয়াযিদ রাজা হওয়ার ফলেই ইস্লামের সর্বনাশ করতে পেরেছিলো। তাই তার উচিত ছিলো আকবর, তথা মোঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করা। তা না করে শুধুমাত্র আকবরের দ্বীনে ইলাহীর সীমিত বিরোধীতাকেই সে তার কর্তব্য মনে করেছিলো। অথচ আকবরের ধৃষ্টতা "আল্লাহু আকবরের" খোদায়ী দাবী করার নামান্তর ছিলো। যেমন ফেরআউন বলেছিলো "আনা রাব্বুকুমুল্ আ'লা" আমিই তোমাদের মহান প্রতিপালক, তদ্রূপ "আল্লাহু আকবর" আল্লাহ্ সবার বড় এবং "আকবরই সবার বড় এবং আকবরই আল্লাহ", এ দাজ্জালীই তার দ্বীনে ইলাহীর মূল উদ্দেশ্য ছিলো। আল্লাহ্ পাকের জালালী নামের অন্যতম "আকবর"। আল্লাহ্র বান্দা কোনো ব্যক্তির নাম "আকবর" হতে পারেনা। শয়তানের নামের মধ্যেই যেমন শয়তানী লুকায়িত থাকে, তদ্রূপ "সম্রাট আকবরের" নামের মধ্যেই খোদায়ী সার্বভৌমত্ব দাবীর শয়তানী বীজ লুকায়িত ছিলো।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের সিংহাসন রক্ষায় আহমদ সিরহিন্দী তার সকল সমর্থন জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হলো না, রাজকীয় ধূর্তামীর শিকার হয়ে আহমদ সিরহিন্দী জাহাঙ্গীরের রাজ্য-ভ্রমণে তার সফর সঙ্গী হয়েছিলো। দু'তিন বার তার সঙ্গী হয়ে আহমদ সিরহিন্দী লাহোর ও পাঞ্জাব যাতায়াত করে। এ সবের চাইতেও যা সব চেয়ে দুঃখজনক ও দুর্বোধ্য, তা হলো, যে আহমদ সিরহিন্দী মুর্তাদ আকবরের রাসূল সঃ এর পর "দ্বিতীয় সহস্রের" মুজাদ্দেদীর বিরোধীতা করেছিলো, সে ব্যক্তিই দ্বিতীয় সহস্র বা "আলফেসানীর" মুজাদ্দিদের পাগড়ীটি নিজ মাথায় পরে নিলো। এ ভাবতেও কেমন লাগে! তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আহমদ সিরহিন্দীকেও "মুজাদ্দিদে আলফেসানী" বলে স্মরণ করা হয়। পতনোন্মুখ, স্বৈরাচারী দস্যুবৃত্তির রাজতন্ত্র ও রাজ সিংহাসনকে সমর্থন দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখার মুজাদ্দিদ্গিরি করার ভবিষ্যৎ বাণী কী আখেরী নবী সঃ করে গিয়েছেন??!! নবী রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের কাজ হলো পারিবারিক সাম্রাজ্য নির্মূল করে আল্লাহ্‌র তাওহীদের ইমামত ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা! যেমন হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, তালুত ও মুহাম্মাদ সঃ গণ করেছেন । এই কামড়েখাওয়া রাজতন্ত্র রক্ষা করার মুজাদ্দিদী তো মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ এবং আব্বাসী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষার মাহদ্বী ও মুজাদ্দেদ গিরি! এর সাথে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের মিল্লাত ও উম্মাহ্‌র কোনো সম্পর্ক নেই।

দুঃখের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আহমদ সিরহিন্দী মোঘল সাম্রাজ্যকে দ্বিতীয় জীবন দান করে যাওয়ার একশ বছরের মাথায় দ্বিতীয় বার মোঘল সহ ভারতের সকল বদ্‌মাশ সুলতান ও নওয়াবরা চরিত্র দোষে এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তাদের অবস্থা "আজ বাঁচে তো কাল মরে"। মারাঠা ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্য এবং এলাকা ভিত্তিক চোর ডাকাতদের দমন করার ক্ষমতাও মোঘলদের ছিলোনা। মোঘল দস্যুরা ভারতে ইসলামের জুব্বা পরে যে উমাইয়া আব্বাসী লুটপাটের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তার পূর্বে ভারতীয় ব্রাক্ষ্মণ্য বর্ণবাদের অত্যাচারে ভারতের নির্যাতিত মানুষদের শতকরা দশভাগ জনসংখ্যা আখেরী নবী সঃ এর প্রতিষ্ঠিত বারাকাহ্, খাদিজাহ্, যায়দ, বেলাল, সালমান ও উসামাহ্ প্রমুখদের সাম্যবাদী ইসলামের খবর শুনেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। তারা উমাইয়া আব্বাসীদের "কুকুরে কামড়ানো" রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসা বেলাল, যায়দ, আম্মার, সালমান ও মাদীনার আনসারদের চরিত্রের আরব ব্যবসায়ী ও ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে এসেই ইস্‌লাম ক্বুবুল করেছিলো। মোঘল খুনীরা ইসলামের নামে আরবী ও চেঙ্গিজী রাজত্ব না করলে ভারতে হাতে গোনা কিছু হতভাগা বর্ণবাদী ব্রাক্ষ্মণ ছাড়া কোনো অমুসলিম আজ থাকতো না। কিন্তু মোঘলরা ইসলামী জুব্বা পাগড়ী পরে লুটতরাজ করে শীশমহল ও তাজমহল ইত্যাদি নির্মাণ আরম্ভ করলে ভারতে আর মুসলমানের সংখ্যা বাড়ে নি। কারণ তখন ইস্‌লাম ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের চেয়েও অত্যাচারী নিপীড়কদের রাজধর্মে রূপান্তরিত হয়। মযলুম জনতা কখনো যালেমদের ধর্ম গ্রহণ করে না। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান।

মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানীর আশীর্বাদে রক্ষা পাওয়া মোঘল সাম্রাজ্য যখন দ্বিতীয়বার অর্জিতপাপে মৃত্যুর দুয়ারে পতিত হয়, তখন ভারত বর্ষে ইসলামের জয়ের এক সোনালী সুযোগ আসে। কোনো এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের আদর্শের পতাকা নিয়ে ভারতের এক কোন থেকে আযান দিলেই মরা গাছের পাতার মতো মোঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়ে ভারত বর্ষের মাটিতে ইসলামের "শাজারায়ে তাইয়্যেবাহ্" এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছেয়ে যেতো। কিন্তু নসীব মন্দ, তা আর হলোনা।

কারণ, আলেম ও মুহাদ্দিসরা রিসালাতের মুজাদ্দিদ না হয়ে উমাইয়া ও আব্বাসী রাজতন্ত্রের মুজাদ্দিদ ও মাহ্‌দী হয়ে যায়। তখন আহমদ সিরহিন্দির মতো, বা তার চেয়েও পড়া লেখায় উজ্জল এক ব্যক্তির জন্য সে সোনালী সুযোগ আসে। সে লোক দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ। আল্লাহ্ ঈমানদারদের একমাত্র বাদশাহ। ঈমানদারগণ শুধু আল্লাহ্‌র গোলাম। শাহ বা বাদশাহ্ হলেই মুসলমানের মূলধন উঠে যায়। যেমন ক্বোরেশদের থেকে উঠে গিয়েছিলো। ভারতে মোঘলদের সূর্য্যি ডুবু ডুবু। তাকে ডুবতে দিয়ে বা ডুবিয়ে ইসলামের সুব্‌হে সাদেক্ব ঘটানো ছিলো তার জন্মে সব চেয়ে সৌভাগ্যের কাজ। তার জন্য সে সুযোগও এসেছিলো।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ আলেম হলেও যেহেতু শাহী আলেম, ফক্বির মুহাম্মাদ সঃ এর ধ্যান-ধারণা তার ছিলোনা। তাই সে মুঘল বাদশাদের রক্ষার জন্য তার ভক্ত নাদির শাহের সেনাপতি আহমদ শাহকে ডেকে আনে। মুহাদ্দিস্ শাহ্‌ও রাজতন্ত্রের শাহ্‌দেরকে ডেকে এনে পানিপথের যুদ্ধে মোঘলদের শত্রুদের পরাজিত করে পুনঃ রাজতন্ত্রকে রক্ষা করে। আহমদ শাহ্ আব্‌দালী ভারতবর্ষে এসে মোঘলদের সম্পদ ও ভোগ বিলাস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মারাঠাদের পরাস্ত

করার পর শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার ভক্ত আহমদ শাহ্‌কে আরো কিছু দিন ভারতে রয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তার পরামর্শ ভেবে দেখার জন্য আহমদ শাহ্ কিছুদিন সময় চায়।

এতো শক্তি ও সম্পদ থাকা সত্বেও মুঘলদের পরাজয়ের কারণ তাকে ভাবিয়ে তোলে। সে ব্যাপারটি কিছু আঁচ করতে পেরে মনে মনে এক ফন্দি আঁটে। একদিন সে ফরমান জারী করে মুঘলদের জানিয়ে দেয় যে সে অমুক দিন বিজয় উৎসব করবে। রাতভর নাচ-গান হবে। সবাই যেনো তাদের সুন্দরী নারীদের তার তাবুতে পাঠিয়ে দেয়। আহমদ শাহর বিশ্বাস ছিলো যে মুঘলদের মধ্যে যদি ঈমান থাকে, তা হলে তারা তার নিদের্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এবং প্রতিবাদ জানাবে। তা হলে সে বুঝবে যে, ওদের মধ্যে ঈমান আছে এবং ওদের মাঝে সে কিছুদিন থেকে ওদেরকে শক্তিশালী করে যাবে।

কিন্তু যা ঘটেছে, তা তার আক্কেল গুড়ুম করে দিয়েছে। মুঘলরা তাদের হারেমের সুন্দরীদের অর্ধ উলঙ্গ করে সাজিয়ে কে কার আগে পারে প্রতিযোগিতা করে আহমদ শাহর তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়েছে। অবস্থা দেখে সে তার পীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করে বলে "হযরত আমাকে অনুমতি দিন আমি আজই আমার সৈন্যদের নিয়ে রওয়ানা হই। এই মোঘলদের সাথে থাকলে আমার সৈন্যদেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

ইসলাম আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত । আল্লাহ্‌র গুণ ও আল্লাহ্‌র প্রকৃতি। আল্লাহ্ "সুব্‌হান" অর্থাৎ সকল দোষ থেকে পাক। তাঁর দ্বীনের 'ইমাম' রাষ্ট্র প্রধান, রাষ্ট্র প্রধানই ইমাম। ইসলাম, নামাজ দিয়ে সমাজ শাসনের ধর্ম, তাই ইসলামের নেতা, ইমামের চরিত্র নিষ্কলুষ হতে হয়। মোক্তাদীদের দোষত্রুটি থাকলে তা সালাত বা নামাজের দ্বারা ধুয়ে দুর হয়। কিন্তু ইমামের ত্রুটি থাকলে মোক্তাদীরা জমজম দিয়ে উযু গোসল করে নামাজে দাঁড়ালেও তাদের নামাজ হয় না।

ইসলামের আল্লাহ্ বলেছেন "শির্ক করোনা" এবং "ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাবেনা"। কারণ, শির্ক মানুষের রূহের মৃত্যু ঘটায় এবং ব্যভিচার মানুষের মানবতা মুছে ফেলে। মানব বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই মুশ্‌রিককে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না, এবং বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীদের প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ্ রাহ্‌মান ও রাহীম। তিনি পশু জবাই করার জন্য ছুরি ভালো করে ধারালো করে নিতে বলেছেন, যাতে জবাইতে কষ্ট কম হয়। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব ব্যভিচারী নর-নারীকে ভোঁতা পাথর মেরে থেঁৎলিয়ে হত্যা করতে বলেছেন। কতো জঘন্য পাপ হলে তিনি তার এই শাস্তি বিধান করতে পারেন?

ইসলামের আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন পুরুষদের যে কোনো মূল্যে তাদের মা, বোন, স্ত্রী, ও কন্যাদের মান ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করতে। রাসূল সঃ বলেছেন, যারা নিজেদের নারীদের সতীত্ব বিকিয়ে খায়, তারা দাইয়ুস্ এবং দাইয়ুসদের জন্য বেহেশত্ হারাম। আল্-ক্কোরআনে আল্লাহ্ মানুষের লুচ্চামী ও লাম্পট্যকে "খিদ্‌ন্ বা আখ্‌দান" বলেছেন এবং সাধারণ আরবী পরিভাষায় একে মুখাদানাহ্ বলা হয়। এ পাপে যে জাত ও সম্প্রদায়কে ধরে, তাদের আল্লাহ্ ধ্বংস করে দেন। এই লাম্পট্য ও লুচ্চামী থেকে যে সমাজ ও জাতি পবিত্র হয়, আল্লাহ্ তাদের তাঁর খেলাফত ও ইমামত দান করেন।

মক্কার ক্কোরেশরা এ লাম্পট্যে লিপ্ত হয়ে বাবা ইব্রাহীম খলীলের কা'বাহ্‌কে ৩৬০টি দেবদেবীর মন্দিরে রূপান্তরিত করলে, আল্লাহ্ তাদের শির্ক ও লুচ্চামী নির্মূল করার জন্য আখেরী নবী সঃ কে পাঠিয়ে মক্কাহ্‌কে পাক করেন এবং ক্কোরেশদের উৎখাত করেন। পরে এ পাপে ক্কোরেশরা পুনঃ লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তাদের দামেস্কে, বাগদাদ্ ও স্পেনে নির্মূল করে দেন।

ভারত বর্ষের দুই প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, মুজাদ্দিদ্ মুহাদ্দিস্ আহমদ সিরহিন্দী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দীসে দেহলবী কি জানতো না মুর্তাদ আকবরসহ মুঘল রাজাদের লুচ্চামী ও লাম্পট্য? না জানা কি সম্ভব? তাদের পূর্বেই তো এই পাপে বাগদাদ ও স্পেনে ক্কেয়ামত্ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিলো?! এতো সবের পরও রাজতন্ত্র রক্ষায় তাদের সাহায্য করা কেনো? তারা যদি রাজতন্ত্র উৎখাতে নিরুপায় ছিলো, তা হলে তারা তাদের খানকাহ্ নিয়েই থাকলে হতো!

শাহ্ সাহেব কেনো তার মুরীদ আহমদ শাহ্ আবদালীকে নির্দেশ করলো না যে তুমি আমাকে সাহায্য করো, আমি এই লম্পট, লুচ্চা ও দাইয়ুসদের উৎখাত করে ভারতের মতো বিশাল জনসমুদ্রে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর দ্বীনের ইমামত ক্বায়েম করবো? এ কথা বলে, বা পথে নেমে ইমাম হোসাইনের মতো শাহাদাত বরণ করলেও তো একটি বিরাট কাজ হতো! দু' দু'বার সাহায্য করেও কি মুঘল সাম্রাজ্যকে ভারতে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে? আজ কি মুঘলদের বংশের কোনো চিহ্ন আছে ভারতেবর্ষে? না, আরব দেশেই মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ ও আব্বাসীদের কোনো দাবীদার আছে?

নাই। যদি থেকে থাকে এখনো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর নাম ও পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার বহু লোক আছে এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত থাকবেও।

আল্লাহ্র দ্বীন ও তার ইমামত ছাড়া পৃথিবীর বুকে যত রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র রয়েছে, সব তাগুত্। তাওহীদ ও ইমামতের বাইরে যত তন্ত্র আছে, তার খেদমত, যারা, যে যুগে এবং যে নামেই করে থাকুক এবং করুক আল্লাহ্র দরবারে তাদের রেহাই নেই। তাদের নামের সাথে সাহাবী, তাবেঈ, ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও মুজাদ্দিদ্ যাই থাকুক, কিছুই ক্ববুল হবেনা। وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ যে ইসলামের বাইরে যে কোনো জীবন ব্যবস্থা চাইবে, তা গ্রহণ করা হবে না। সে পরকালে বিফলদের তালিকাভুক্ত। (সূরা আলে ইম্রান- ৮৫)

মোদ্দা কথা, পৃথিবীতে এক আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করা "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্", আল্লাহর পথে সংগ্রাম। মানব জীবনে একাজ সর্বোৎকৃষ্ট । এর বাইরে গোত্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তারের সকল প্রচেষ্টা "ফাসাদ ফি সাবীলিল্লাহ" আল্লাহর পথে অরাজকতা সৃষ্টি। এ পথে একটি মানুষ হত্যা , পূরা মানব জাতিকে হত্যার মতো মহাপাপ। এদের স্থান জাহান্নামে।

রাসূল সঃ বিদায় নেয়ার পর আলী পর্যন্ত প্রচেষ্টা সমূহকে কোনো প্রকার জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ বলা চলে। তারপর থেকে প্রত্যেকটি হত্যা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে, শয়তানের পক্ষে সংগ্রাম । ব্যক্তি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তা বিস্তারের সকল যুদ্ধ হত্যাযজ্ঞ। আবু বকর থেকে আলী পর্যন্ত তাদের সীমিত যোগ্যতার প্রচেষ্টাকে কোনো প্রকার রাসূল সঃ এর অনুসরণের বলা চলে । তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ছিলো। কারণ তারা রাসূল ছিলো না। তাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তি রাজত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য ছিলো না। তাদেরও ছেলে ছিলো। তারা তাদের রাজা বানিয়ে যায়নি।

তাদের পর মুয়াবিয়া ও ইয়াযিদদের কাজ রাসূল সঃ এর রিসালাতকে পাল্টিয়ে ইসলামের শত্রু চক্রের দু' দিকপাল আবু সুফ্য়ান ও আব্বাসের ক্বোরেশী "ক্কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" মক্কার কাফেরদের ইসলামের ছদ্ম নামে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে গোটা বিশ্বে নাম সর্বস্ব নারকীয় যতো মুসলিম সম্প্রদায় ও তথা কথিত মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, তা সবই ক্বোরেশী জাহিলিয়্যাতের বংশোদ্ভুত উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদের নাতিপোতা, প্রজন্ম। এ পুস্তকের এ অধ্যায়ে আল্লাহ্ কিরূপে তাঁর সর্বশেষ নবী ইয়াতীম, দিশাহীন ও দরিদ্র মুহাম্মাদ সঃ কে দিয়ে বিশ্ব মানবের ঐক্যের রজ্জু পাকিয়ে ছিলেন, তার বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাঁর খাতামুন নাবিয়্যীনকে দিয়ে ধরাপৃষ্ঠে রিসালাত পূর্ণ করে আল ক্বোরআনে ঈমানদার মাত্রকে আদেশ করেন, واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا "আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্ড়ে ধরো , কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না"।

রশি বা রজ্জু কখনো সুতা বা তন্তুর একটি আঁশ দিয়ে পাকানো হয় না। অনেকগুলো আঁশ বা তন্তুকে একত্রে পাকিয়ে তাকে মজবুত রশিতে রূপান্তরিত করা হয়। অন্যথা তা মজবুত হয় না।

আল্লাহ্, অনৈক্যের আরব মরুতে মুহাম্মাদ সঃ কে দিয়ে আরব্য বর্বরতার শিকার আরবী যায়দ, আবিসিনিয়ার বেলাল, রোমান সোহাইব, ইয়ামেনী আম্মার ও পারস্যের সালমান প্রমুখদের দিয়ে তার মনোনীত দ্বীন ইসলামের রজ্জু বা রশির চূড়ান্ত রূপ দিয়ে বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তির বাধন তৈরী করেছেন। তারপরই আল্লাহ তাঁর আখেরী নবীকে পৃথিবী থেকে তুলে নেন। নবী করীম সঃ তার মিশন বা দায়িত্ব পালনে যেরূপ ১০০ ভাগ সফল হন, তদ্রুপ তাঁর অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য জাতি একশত ভাগ ব্যর্থ হয়। স্বয়ং রাসূল সঃ তাঁর নবী জীবনের শেষ তিন বছরে মক্কা বিজয়, তায়েফ অভিযান ও তাবুকের অভিযানে আবু বকর ও ওসমান সহ ক্বোরেশী সঙ্গীদের হাবভাব দেখে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান যে, তাঁর আরব মরুর সঙ্গীরা সাধারণভাবে এবং ক্বোরেশী সঙ্গীরা বিশেষভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করলেও তাকে বিকৃত করে ফেলবে।

এ আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে রাসূল সঃ তাঁর বিদায় হজ্জের চরম সতর্কবাণী প্রচার করে যান। নবী সঃ এর আদেশ অমান্য করে তাঁর সাহাবা নামের সঙ্গীরা উহুদের যুদ্ধের যে পরিণাম ডেকে আনে, তখনই তিনি বলে ফেলেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যারা তাঁর আদর্শ ও আদেশ পালনে জীবন উৎসর্গ করবে, একমাত্র তাদের সফলতার ব্যাপারে তিনি রাসূল রূপে সাক্ষ্য দিবেন। উহুদের শাহাদত বরণকারীদের দাফন করার সময় তিনি এ মন্তব্য করছিলেন। আবু বকর তা শুনে রাসূল সঃ কে প্রশ্ন করেছিলো, "হে রাসূল আমরা কি ওদের মতো ঈমান আনিনি, ওদের মতো জিহাদ করিনি,

আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ওদের অনুরূপ সাক্ষ্য দিবেন না?"
সে দিনই রাসূল সঃ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আবু বকরকে স্পষ্ট বলেছিলেন, و لكني ما ادري ما تحدثون بعدي
"আমি তোমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষ্য দিবো, আমি তো জানিনা তোমরা আমার পরে কি কান্ড ঘটাও?"
তদুত্তরে আবু বকর আরজ করেছিলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আপনার মৃত্যুর পর বদলিয়ে যাব?" উত্তরে রাসূল সঃ বলেছিলেন, "ইয়াহুদী, খৃষ্টানরা যেরূপ তাদের নবীর বিদায়ের পর বিগ্‌ড়ে ছিলো, তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে বিগ্‌ড়াবে। তা শুনে নাকি আবু বকর অনেকক্ষণ ক্রন্দন করেছিলো।" (মুয়াত্তা মালেক, উহুদের শহীদদের দাফন অধ্যায়)

সূরা মুহাম্মাদ, সূরা হুজুরাত, সূরা তাহ্‌রীম, সূরা মুমতাহানা ও সূরা তওবায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সঃ কে দিয়ে তথাকথিত "তারকা সাহাবীদের" চারিত্রিক চিত্র অঙ্কন করে আল ক্বোরআনে তা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আল ক্বোরআন এরূপ সাক্ষ্য দেয় বলেই তাকে আড়াল করার জন্য পরবর্তীতে অসংখ্য মিথ্যা হাদীস তৈরী করা হয়। তা' না হলে যে কোনো মতেই পরবর্তী ক্বোরেশী, উমাইয়া, আব্বাসী ও হাশেমীদের পাপের হিমালয়কে ঢাকা যায় না!

গোত্র ও বর্ণ পূজারী ধাতের নব দীক্ষিত ক্বোরেশী ও অক্বোরেশীদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে রাসূল সঃ ইসলামী উম্মার মুস্তাদআফ্ ইমামত প্রতিষ্ঠিত করে যান। মউতার যুদ্ধে আলীর বড় ভাই জা'ফর ইবন আবি তালেবকে এবং আনসারদের দিকপাল আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে মুস্তাদআফ্ যায়দ ইবনে হারিসার অধীনে সহকারী রূপে নিয়োগ করে রাসূল সঃ আলী, আবু বকর ও উমর এবং মদীনার আনসারদের বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর পর নেতৃত্ব ক্বোরেশদের নয়, আনসারদেরও নয়, নেতৃত্ব ও ইমামত সূরা ক্বাসাসের ৫ ও ৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত "মুস্তাদ্‌আফ্"দের।

মউতার যুদ্ধে যায়দের নেতৃত্বে জা'ফর ও ইবন রাওয়াহারা শাহাদাত বরণের মাধ্যমে যেমন সফল হয়, খালেদ ও তার অনুসারীরা তেমন ব্যর্থ হয়ে ধিকৃত হয়। এখানে এ কথাটি প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে সকল দ্বিধাদ্বন্ধের ঊর্ধ্বে বুঝতে ও মানতে হবে যে, যায়দ ও তার পদাঙ্ক অনুসারীরা মউতার অভিযানে যে শাহাদাতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তাই হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। ঈমান আনার পর প্রাণ বাঁচিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা নিকৃষ্টতম কাজ। যে বা যারা যে যুগ বা যে কালে যায়দ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহাদের দৃষ্টান্তকে আত্মহুতি ও খালেদদের পলায়নকে রণকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা মনে করবে, তারা নির্বিশেষে আল্লাহ্, রাসূল ও ক্বোরআন অমান্যকারী অমুসলিম।

আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট রাসূল সঃ ক্বেয়ামত পর্যন্ত সকল সন্দেহের অবকাশকে নিরসনের জন্য তাঁর বিদায়ের পূর্বে মক্কা বিজয়ে, বারাকাহ্ ও যায়দের যোগ্য সন্তান উসামাহ্‌কে তাঁর সওয়ারীতে সঙ্গী করে কা'বায় প্রবেশ, হুনাইনের যুদ্ধেও উসামাহকে সঙ্গে সঙ্গে রেখে এবং বিদায় হজ্জে সকল গোত্রীয় ও জাতীয় উপজাতীয় বৈষম্যকে অবৈধ ঘোষণা করে বলে যান, "তাক্বওয়ার মানদন্ডে উত্তীর্ণ কোনো কৃষ্ণকায় দাসও যদি তোমাদের ইমাম হয়, তা'হলে তোমরা তার আনুগত্য করবে। জাহিলিয়্যাতের দোষে দুষ্ট কোনো ব্যক্তি ও গোত্রপতির নেতৃত্বের অবকাশ চিরতরে রহিত হলো।"
إن أكرمكم عند الله أتقاكم তোমাদের মাঝে যোগ্যতম ব্যক্তি হলো মুত্তাক্বীতম ব্যক্তি।" (সুরা হুজুরাত-১৩)

মজ্জাগত কুফরী ও নবদীক্ষার ক্বোরেশী অক্বোরেশী বর্ণবাদী ও তাদের পরবর্তী অন্ধ অনুসারীদের মগজ ধোলাইর জন্য আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে দিয়ে আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীসহ সকল ক্বোরেশী নেতৃত্বের গোপন আশা পোষণকারীদের উসামাহ্‌র অধীনে সাধারণ সৈনিক বানিয়ে বলে যান "সাবধান! যে বা যারা উসামাহ্‌র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবেনা, তাদের উপর লা'নত। এ ঘোষণার পরও রাসূল সঃ এর পার্থিব জীবনের সর্বশেষ মূহুর্তে উসামাহ্‌কে ডেকে এনে তাঁর মুবারক দু'হাত তুলে দুআ করে সে হাতজোড়া উসামাহ্‌র বুকে স্পর্শ করে বিদায় নেয়া কী বুঝায়??

তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও আল্ কোরআন ভিত্তিক তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী মানব গোষ্ঠীর নিকট খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর দুহাতের চেয়েও বরকতময় কোনো হাত কি আছে? যদি না থেকে থাকে, তা'হলে বিশ্ববাসীদের মানতে হবে যে উসামাহ্‌ই রাসূল সঃ কর্তৃক বিদায়ী হজ্জে ঘোষিত ইমাম, সেনাপতি ও আমীর। যাকে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর বিনা বাক্যে মানা উচিত ছিলো। সূরা ক্বাসাসের আয়াতে "মুস্তাদ্‌আফ"দের ইমামত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। শুধু একটি যুদ্ধাভিযানের সেনাপতি নিয়োগের কথা বলা হয়নি। যেমনটি নির্বোধ মূর্খরা মনে করে। ওদের কি আল্লাহ্‌র ক্বোরআনেও ঈমান নেই? ওরা কি ক্বোরআনও পড়েনা। না ওদের অন্তরে আল্লাহ্

তালা মেরে দিয়েছেন? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا **"ওরা কি ক্বোরআন বুঝার** চেষ্টা করে না। নাকি ওদের অন্তরে তালা মারা?" (সূরা মুহাম্মাদ - ২৪)

ঈমানদার হলে স্বতঃসিদ্ধরূপে মানতে হবে যে আল্লাহ্ সত্য ও তাঁর রাসূল সঃ সত্য। আল্লাহ্‌র রাসূলের মানদন্ডকে স্পর্শ ও খাটো করে, এমন কোনো নবী-স্ত্রী বা সাহাবীর বর্ণনা সঠিক বা সত্য হতেই পারেনা। শোনা মাত্র তাকে ছুঁড়ে মারতে হবে। তা না হলে তাওহীদ ও রিসালাতকে মানা হবে না। এ মানদন্ডে এ পুস্তক লেখা হয়েছে। যারা এ মানদন্ডের ঈমানদার, তাদের প্রতি এ পুস্তকের আবেদন। যারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মতো নবী রাসূলদেরও অবমূল্যায়ন করে, তাদের উদ্দেশ্যে এ বইতে কোনো আবেদন নেই।

বিশ্বাস দূরের কথা, ভাবতেই কেমন লাগে যে বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করে সমান অধিকার দানের জন্য যে শেষ নবীর আগমন, আল ক্বোরআনের পুরোটাই যার সাক্ষী, সে দ্বীনের ইমাম ও নেতা হবে শুধু একটি পরিবারের লোকেরা, যে পরিবারটি তাওহীদের পবিত্রতম ঘর কা'বাকে সারা বিশ্বের মূর্তি দিয়ে অপবিত্র করেই ক্ষান্ত হয়নি, "বালাদুল আমীন" নিরাপত্তার নগরীকে দাস বেচাকেনার বাজারে পরিণত করে ছিলো! ঘুমন্ত জনবসতি ও কাফেলায় হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্ব লুট করে মুক্ত নর-নারী,আশরাফুল মাখলুকাতকে বন্দী করে এনে ভেড়া ছাগলের মতো বাজারে বিক্রি করা! তাও মক্কার হাটে, যে মক্কাকে আল্লাহ্ তাঁর খলীল ইব্রাহীমের দ্বারা চিরদিনের জন্য ঘোষণা করিয়েছেন, سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد"এ নগরীতে বাসিন্দা ও বহিরাগতের সমান অধিকার"।

আখেরী নবী সঃ মক্কা জয় ও বিদায় হজ্জ উভয় সমাবেশে ঘোষণা করেন যে, ক্বোরেশ নেতৃত্বের আরব মরুর সম্মিলিত কুফরী শক্তি "আহ্যাব"কে আল্লাহ্ পরাজিত করেছেন। ক্বোরেশদের প্রতিপত্তি চিরতরে নির্মূল করা হলো। এখন থেকে শুধুমাত্র তাকওয়া নেতৃত্বের মানদন্ড।

বদরের যুদ্ধে নিহত ক্বোরেশের নেতাদের লাশগুলোকে লক্ষ্য করে রাসূল সঃ সে কথাই বলেছিলেন। হিজ্‌রতের সময় পথিমধ্যে নাযিলকৃত সূরায় মুহাম্মাদে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে সে অঙ্গিকারই করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে রাসূল সঃ এর আদেশ অমান্যের ফলে বিজয়ের পর বিপর্যয় নেমে এসে হামযার মতো সত্তুর জন সঙ্গীকে রাসূল সঃ হারান। শহীদ সাহাবাদের জানাযার জামাত অনুষ্ঠানকালে রাসূল সঃ শহীদদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। জীবিত আবু বকর সে সাক্ষ্য প্রাপ্তদের অনুরূপ রাসূল সঃ এর সাক্ষ্য চাইলে রাসূল সঃ স্পষ্ট ইংগিত করেন যে তাঁর বিদায়ের পর তাদের পদস্খলনের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের সময় ও তারপর কি আবু বকরের সে আশঙ্কা ও সতর্কবাণী মোটেও স্মরণ হয়নি? এমন গুরত্বপূর্ণ ঘটনা মানুষ কি করে বিস্মৃত হয়! এও কি সম্ভব! রাসূল সঃ এর লাশ মোবারক মাটির উপর রেখেই "আল্ আইম্মাতু মিন্ কোরেশ" বলে তাঁর গড়া উম্মতকে এমনভাবে টুকরা টুকরা করলো যে আবু বকররা আর এক ইমামতে এক ইমামের পিছনে রাসূল সঃ এর জানাযাও অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি! ফলে রাসূল সঃ কে তাঁর শেখানো জামাতে জানাযা ছাড়াই দাফন করে তারা কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত হয়। এ কলঙ্ককে চাপা দেয়ার জন্য মিথ্যা হাদীসও তৈরী করা হয়। মূলতঃ ক্বোরেশী গোত্রীয় জাহিলিয়্যাতকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহাপাপ করা হয় এবং সে পাপকে মাটি চাপা দিয়ে দীর্ঘ দেড় হাজার বছর যে মিথ্যার ইতিহাস রচনা করে তাকে "ইসলামের ইতিহাস" নামকরণ করা হয়, তার শাস্তিই উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্য, কারবালার ঘটনা, মদীনায় হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ, বাগদাদে হালাকু-চেঙ্গিস খাঁর ধ্বংসযজ্ঞ, স্পেনের করুণ কাহিনী, ভারত বর্ষে মুঘল দস্যুদের তাজমহল শীশমহলের আলেখ্য ও বর্তমানে ইরান আফগানিস্তানের শিয়া সুন্নীর ফিৎনা, প্যালেষ্টাইন, কাশ্মীর, বসনিয়া ও ফিলিপাইনে মুসলিম নিধন।

সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আখেরী নবী সঃ এর সঙ্গীদের, বিশেষ করে তাঁর গোত্রীয় মুহাজির নামধারীদের আপাদমস্তক ধোলাই করে চরম সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, "তোমরা যদি রাসূল সঃ এর অনুসরণে সকল প্রকারের জাহিলিয়্যাত ত্যাগ করে জানমাল কোরবানী করে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে বিলীন না হও, তাহলে তোমাদের নির্মূল করে অন্য এক জনগোষ্ঠীকে বিশ্বতাওহীদের নেতৃত্ব দানের জন্য নির্বাচিত করা হবে। তারা তোমাদের মতো হবে না।" (সূরা মুহাম্মাদ-৩৮)

বিশ্বে সে প্রক্রিয়া আজ শেষ পর্যায়ে। আখেরী নবী সঃ এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে ত্যাগ করে ক্বোরেশী, আরবী, উমাইয়া, আব্বাসী ও শিয়া, সুন্নী দাজ্জালীকে ইসলামের নামে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার পাপে আরবরা আজ আরবী উম্মত বা

উম্মাতুল আরবীয়্যাহ। এ নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞদের আল্লাহ্ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সেবা দাসে রূপান্তরিত করেছেন। ওদের পাপকে গ্রহণ ও লালন করার পাপে অনারব মুসলিমরাও একই পরিণামের দিকে এগুচ্ছে।

গোটা মুসলিম জাতির শতকরা দশ ভাগেরও কম আরবরা। অনারব শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিমদের রাসূল সঃ এর বিদায় হজ্বের ভাষণের মর্মবাণী অনুযায়ী যায়দ, বেলাল, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ্দের দৃষ্টান্তে আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর সত্যিকার অনুসারী এক ইমামের হাতে সূরা তওবার **১১১** ও **১১২** আয়াত অনুযায়ী বায়আত হয়ে পুনঃ ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে। তবেই এরা সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্র দল হবে, যাদের দিয়ে আল্লাহ ধরার পৃষ্ঠে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র রিসালাত অনুযায়ী ইসলামকে পূর্ণ বাস্তবায়িত করবেন।

বর্তমানে বিশ্বময় আমেরিকার নেতৃত্বে ইয়াহুদী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ কাফেরদের ঐক্যজোট, নামধারী মুসলমানদের নির্মূল করার যে নীলনক্সা বাস্তবায়ন করছে, তা নিঃসন্দেহে পৃথিবী থেকে ক্বোরেশী বর্ণবাদ ও উমাইয়া আব্বাসীদের বিকৃত ইসলামকে উৎপাটিত করার আল্লাহ্র বিধানের বাস্তবায়ন বৈ কিছুই নয়। এরূপেই আল্লাহ্ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলেন। বাগদাদ ও স্পেনে যদি আল্লাহ্ উমাইয়া আব্বাসীদের নির্মূল না করতেন এবং ভারতবর্ষে মুঘলদের নির্বংশ না করতেন, তা হলে আজ খাঁটি ইসলামের পুনর্জাগরণের কথা বলার কোনো ব্যক্তি বিশেষও দুনিয়াতে বাকী থাকতো কিনা সন্দেহ।

আর একটি দিনও কালক্ষেপ না করে পৃথিবীতে নব্বই ভাগ অনারব মুসলমানদের রাসূল সঃ কর্তৃক দেখানো সকল বর্ণের সমাহারে গঠিত হয়ে ঐক্যের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। সে ঐক্য তাওহীদ ও রিসালাতের। ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মোহামেডান, এ তিন সম্প্রদায়ই ধরার পৃষ্ঠে দাজ্জালের ত্রিশূল। খাঁটি তাওহীদের ডাক দিলেই এরা জাতিসংঘে বসে আমেরিকার নেতৃত্বে পূর্ণ দাজ্জালের মূর্তি ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করবে। এদের পৃষ্ঠ পোষক হবে স্বয়ং ইবলিস। যে আদম সৃষ্টির লগ্নে আগুনের সৃষ্টি বলে সর্বপ্রথম বর্ণবাদের জন্ম দেয়। ইয়াহুদীদের বর্ণবাদ ও ক্বোরেশদের বর্ণবাদ সে ইবলিসের বর্ণবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর দ্বারা আল্লাহ সূরা হুজুরাতের **১৩** নং আয়াত অবলম্বনে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ্দের সমন্বয়ে যে জামাত ও ইমামত প্রতিষ্ঠা করেন, তাই ইমাম মাহ্দীর জামাত।

ঈমান ও তাওহীদের অনুসারী কোনো মানুষ কোনো অবস্থাতেই গোত্র ও বর্ণবাদী হতে পারেনা। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, সে আল্লাহর সৃষ্টি। তার আত্মা আল্লাহর ফুঁকা রূহ। আল্লাহ যেমন কোনো গোত্রের নন, সেরূপ আল্লাহর দেয়া রূহের অধিকারী কোনো মানুষ গোত্রবাদী হতে পারেনা। হয়না। তাই নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের উম্মত মুসলিম জাতি। তারা ভৌগলিক রক্ত ও বর্ণের কোনো সীমায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা।

তাই ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর মৃত্যুর পর আবু বকর কর্তৃক উচ্চারিত আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ থেকে উদ্ভূত সুন্নীদের সুন্নীপাঞ্জেতনের খেলাফত ও শিয়া পাঞ্জেতনের শিয়া ইমামতের দুষ্টচক্রমুক্ত ইব্রাহীম আঃ এর "মাক্বামে ইব্রাহীম" ও মুহাম্মাদ সঃ এর "মাক্বামে মাহমুদ" ভিত্তিক নির্ভেজাল তাওহীদ ও রিসালাতের দল বা জামাতের আন্দোলন আরম্ভ হলেই ইয়াহুদী খৃষ্টান ও সুন্নী-শিয়ারা তাদের গোত্রবাদের জাতিসংঘ গঠন করে তার বিরুদ্ধে দাজ্জাল হয়ে তাকে মৌলবাদী আন্দোলনে আখ্যায়িত করে বিশ্বময় তার বিরুদ্ধে হিন্দু ব্রাহ্মন ও রাশিয়ান নাস্তিক সবাইকে একত্রিত করে "মাল্হামাতুল কোবরা" বা আর্মাগেড্ডানের মহাধ্বংস যজ্ঞের পরিস্থিতি চূড়ান্ত করবে। অপর দিকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর অনুসারী ইমামও তার অনুসারীদের নিয়ে দাজ্জালী এ্যান্টি ক্রাইষ্টের মুখোমুখি হবেন। ঠিক তখনই বলা হয় যে, ঈসা রূহুল্লাহ্র পুনরাবির্ভাব ঘটবে। তিনি ইয়াহুদী খৃস্টানদের বর্ণবাদ খন্ডন করবেন এই বলে যে, আমি ইয়াহুদী নই, খৃস্টানও নই। আমি পিতৃমাধ্যমহীন সরাসরি আল্লাহ্র রূহ দ্বারা সৃষ্টি, যেমন বাবা আদম সৃষ্টি। আমি ইব্রাহীম আঃ এর অনুসারী, যিনি ইয়াহুদী বা খৃস্টান কিছুই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আত্মসমর্পনকারী, মুসলিম। আমিও সে মুসলিম।"

এ পরিস্থিতিতেই ইয়াহুদী খৃস্টান ও আরব বর্বর ভূমির নব্য ফিরআউন ও নমরূদ বর্তমান শেখ বাদ্শাহ্রা একত্রিত হয়ে দেখা যাবে যে মাহ্দী ঈসার বিরুদ্ধে ইয়াহুদী খৃষ্টান লবীর দাজ্জাল আমেরিকার একক নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে যাবে। এ ধারণার অকাট্য প্রমাণও আমাদের সামনে রয়েছে। ইরাকের নব্য নমরুদ, সাদ্দামও নাকি আরব ও ক্বোরেশ বংশদ্ভুত। তাকে শতশত বিলিয়ন ডলার দিয়ে আরব রাজা-বাদশারা ইরানী শিয়াদের বিরুদ্ধে লড়িয়েছে। কিন্তু সে সাদ্দামই ওদের গোষ্ঠিগত স্বার্থের দ্বন্দে যখন কুয়েতের একটি অতিক্ষুদ্র ভুমি দখল করে, তখন কথিত হারামাইনের

খাদেম ও তার আরব দোসররা ইয়াহুদী খৃষ্টান দাজ্জালীর মিত্রশক্তিকে ডেকে এনে কার্যতঃ তৈলসহ সকল সম্পদ এবং পবিত্র মক্কাহ ও মদীনাহ অপবিত্র ও অভিশপ্ত মুশরিকদের হাতে তুলে দেয়। এরা কি কোনো সংজ্ঞায় ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃদের অনুসারী মুসলিম?

ঠিক এ ভাবেই আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফ্ অনুসারীদের ধরাপৃষ্ঠ থেকেও নিশ্চিহ্ন করার জন্য মক্কার ক্বোরেশীরা তাদের বেদুঈন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান মিত্রদের নিয়ে বদর, উহুদ ও সম্মিলিত মিত্রশক্তি আহযাব এর যুদ্ধ সংঘঠিত করেছিলো। এ সকল যুদ্ধে নাটের গুরু ছিলো আবু সুফ্য়ান ও আব্বাস, যাদের ইব্লিসী ঔরস থেকে পরবর্তীতে জন্ম নেয় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" রিসালাতের উৎপাটনকারী উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদ, লা'নাতুল্লিল আলামীন বা সৃষ্টি জগতের অভিশাপ।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের অনুসারী তাওহীদের ধারক-বাহকদের কাজ হলো সকল কিছুর বিনিময়ে তাওহীদ ও রিসালাতকে অক্ষত ও অকৃত্রিম রাখা। একমাত্র সে তাওহীদ ও রিসালাতের উদয় ও অস্তাচলের গগণকে সকল প্রকারের গ্রহণ ও গ্রাসের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে সারা বিশ্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ কর্তৃক পূর্ণ করা রিসালাত, আল্লাহর নির্দেশে সূরা ক্বাসাসের শুরুতে বর্ণিত মুস্তাদ্আফ্দের ইমামত ভিত্তিক বিপ্লবের সূর্যোদয় ঘটানোর জন্য এ পুস্তকের রচনা। পাঠক মাত্রকেই এ স্থির লক্ষ্য ও বিশ্বাস রেখে এ বই পড়তে হবে। অন্যথা বই পড়া নিরর্থক হবে।

কথিত আঠারো হাজার মাখ্লুক বা গোটা সৃষ্টির কল্যাণ ও মুক্তির মূল মন্ত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বা আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এ সত্যই তাওহীদ। এ তাওহীদে সকল মানুষ সমান। রক্ত, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও দেশ ভেদে মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য নেই। মানুষে মানুষে বৈষম্যে বিশ্বাস দূরের কথা, কল্পনাও করা চলবে না। বিশ্বাস করা মাত্রই সে মানব ঔরসে জন্ম নেয়া মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সে ইবলিসের সন্তান, মানুষ ইবলিস। কারণ, মানব সৃষ্টির লগ্নে ইব্লিস বলেছিলো, "আমি শ্রেষ্ঠ, আমি আগুনের সৃষ্টি।"

এ মহা সত্য নিয়েই সকল রাসূলদের আগমন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ তাঁদের সর্বশেষ। তাঁরপর আর রিসালাত আসবে না। চূড়ান্ত রিসালাত বহন করে তিনি যায়দ, বেলাল, ইবন মাসউদ, আম্মার, খাব্বাব, সুহাইব, আবু যার, সাওবান, সালমান ও উসামাহ্দের দ্বারা তাঁর তেইশ বছরের রিসালাতের জীবনপূর্ণ করে বিদায়ের পূর্বে গোত্র বর্ণহীন ইমামতের আদর্শরূপ চূড়ান্ত করেন। রাসূল সঃ এর বিদায় হজ্জের বাস্তবায়ন ছিলো উসামাহ্র ইমামত ও তার প্রধান সেনাপতিত্ব।

রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর মূহুর্তে "আমরা তোমরা" বলে ইসলামী উম্মাহকে প্রথমে মুহাজির ও আনসারে বিভক্ত করা হয়েছে। তারপর "আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" বলে গোত্রে ও জাতি উপজাতিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ বাক্যটি এমন আত্মঘাতী বাক্য, যা কার্যতঃ কালেমায়ে তাওহীদ, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন রাসূলের রিসালাত ও ক্বোরআনকে পরিত্যক্ত করা বুঝায়। তারপর থেকেই গোত্রীয় শাসনের ভিত রচনার জন্য আবার বিভিন্ন গোত্রে নতুন নতুন নবীর দাবিদার বের হয়।

আনসার ও অক্বোরেশী আরবদের বঞ্চিত করে একত্র ক্বোরেশীদের খেলাফত নামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমে খেলাফত নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। তাতে কথিত খোলাফায়ে রাশেদূনের তিন খলিফাই আত্মকলহে নিহত হয়। চার জনকে "খোলাফায়ে রাশেদূন" বা সঠিক পথের চার খলিফা নামকরণ করা হয়। নিজেদের মধ্যে আন্তঃকলহে মৃত্যুবরণকারীরা কিরূপে "সঠিক পথের" হয়? নবী রাসূল সঃরা তো এক সময়ে একাধিক ছিলেন। তারা তো কখনো নিজেদের মাঝে আন্তঃকলহে নিহত হওয়া দূরের কথা, কেউ কারো বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। একজন অপরজনের সম্পূরক হয়ে তারা আমাদের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। তাই তারা নিষ্পাপ। মানব জাতির অনুকরণীয়, আদর্শ।

অপর দিকে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর মৃত্যুর পর আল্লাহর ক্বোরআনে বর্ণিত "তোমাদের মাঝে তাক্বওয়ায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম" পাল্টিয়ে, রাসূল সঃ প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকে অমান্য করে যারা ইসলামী ঐক্যকে খান্ খান্ করে ফেলে, তারা কিরূপে নিষ্পাপ আদর্শ হয়? কথিত আশারায়ে মুবাশ্বারার মধ্যেও ৫ জন আন্তঃকলহে মারা যায়। "চার খলিফা" বলে যে চার দেয়ালীর খেলাফতের খাঁচা তৈরী করা হয়, সে চার খলিফার চতুর্থ জন আলী আদৌ কখনো খলিফা হয়নি। তাকে কখনো আশারায়ে মুবাশশারার তাল্হা, যুবাইর ও সা'আদ্ ইবনে আবী ওয়াক্কাসরা এবং মা আয়েশা খলিফা রূপে গ্রহণ করেনি। খলিফা হলে তাকে সবাই মেনে নিয়ে তার হাতে বায়আত হয়ে আনুগত্য ঘোষণা করতে

হয়। যারা তা না করে, তারা বিদ্রোহী ও কাফের হয়ে যায়।

মুয়াবিয়া আলীর বিরোধিতা করে, বিদ্রোহী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। আলী নিহত হলে মুয়াবিয়া পূর্ণ খেলাফত দখল করে তার খেলাফত আরোহণকে "আ'মুল জামাআত" বা ঐক্যের বছর বলে উদযাপন করে এবং মহাসমারোহে ঘোষণা করে "আনা আউয়ালু মুলূকিল্ আরব, আনা ক্বায়সারুল আরব" আমি প্রথম আরব সম্রাট, আমি আরবী সিজার। তারপর থেকে দীর্ঘ ষাট বছর ধরে চতুর্থ (?) খলিফা আলীকে প্রত্যেক জুমার খোত্‌বা, ঈদের খোত্‌বা এবং বাৎসরিক হজ্জের খোত্‌বায় আরাফাতে নিয়মিত গালি দিয়ে লানত করা হতো। মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ কারবালায় নিহত হুসেইনের মস্তক বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে উল্লাস করে ঘোষণা দেয় "বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়া হলো, আমার পূর্ব পুরুষরা এ দৃশ্য দেখলে মনে প্রশান্তি পেতো।"

যে খলিফায়ে রাশেদকে জুমা, ঈদে ও হজ্জে গালি দেয়া হয়েছে ষাট বছর ধরে, সে কি খলিফা হয়েছিলো? মুসলিমরা কি তাদের খলিফাকে গালি দিয়ে খোত্‌বা দিতে পারে? বা খোতবায় রাশেদ খলিফাকে গালি দেয়া শুনে নামাজ ও হজ্জ পালন করতে পারে?

সকল কথার মূল কথা রাসূল সঃ মুস্তাদ্‌আফ অর্থাৎ বিশ্বের নির্যাতিত নিগৃহিতদের মুক্তির আদর্শ ইমামত প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। তিনি তা হযরত ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আঃদের আদর্শে, সুরা ক্বাসাসে বর্ণিত আল্লাহর হুকুমে উসামাহকে ইমাম নিয়োগ করে, বার বার তাগিদ দিয়ে সতর্ক করে বলেছেন, "যারা উসামাহ্‌র নেতৃত্বে, উসামাহ্‌র অভিযানে অংশগ্রহণ করবে না, তাদের উপর লা'নত।" (আল মিলাল্ ওয়ান নিহ্‌াল)

ক্বোরেশ বংশের খলিফা ও ক্বোরেশ বংশীয় আশারায়ে মুবাশ্বারা সবাই উসামাহ্‌র অধীনে সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে রাসূল সঃ কর্তৃক আদিষ্ট ছিলো। এও কি সম্ভব যে রাসূল সঃ আন্‌সার, মুস্তাদ্‌আফ ও অন্যান্য সকল ঈমানদারদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বেছে বেছে ক্বোরেশ গোত্রের দশজনকে অগ্রীম জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন? বা দিতে পারেন?

শিয়ারা নির্লজ্জভাবে হাদীস তৈরী করে বলছে যে, আলীকে রাসূল সঃ উসামাহ্‌র অধীন করেননি। আবু বকর, উমর ও ক্বোরেশের অপরাপর নেতৃত্বের অভিলাসীদের আলীর নেতৃত্ব অমান্য করার হাবভাব টের পেয়ে নাকি রাসূল সঃ ফন্দি করে তাদের মদীনাহ থেকে দূরে উসামাহ্‌র অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। ফাঁকে রাসূল সঃ আলীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন বিশ্বনবী সঃ কে ওরা কি আদৌ চিনে নি? ওরা কি সবাই তাঁকে ওদের মতো করেই ভেবেছিলো? রাসূল সঃ এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী আল ক্বোরআনে আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত এবং রাসূল সঃ এর পরীক্ষিত যায়দের অধীনে আলীর যোগ্যতম বড় ভাই জাফর ইব্‌ন আবি তালেবের নিয়োগ কি শিয়াদের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট নয় যে, জা'ফর যেমন যায়দের অধীনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট ছিলো, আলীও, আবু বকর ও উমরদের মতো যায়দের সুযোগ্য পুত্র, রাসূলের মনোনীত ইমাম ও আমীর উসামাহ্‌র আনুগত্যে আদিষ্ট ছিলো? এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো যে ক্বোরেশী মুশরিক রক্তে জন্মানো, যারা রাসূল সঃ এর উপর ঈমান এনেছিলো, তারা কেউ যুগ যুগান্তরের লালিত বদ রক্তের সীমাবদ্ধতা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারে নি। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মাতৃগর্ভ থেকে ইয়াতিম করে স্তরে স্তরে তাঁকে মুশরিক পিতা মাতার রক্ত ও লালন পালন থেকে পাক করেন। পাক করার জন্য তাঁর খাস বরকত বারাকাহ্‌কে নিয়োগ করেন। বারাকাহ্, যায়দ ও উসামাহ্ সমন্বয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দিয়ে ধরার পৃষ্ঠে প্রথমে একটি আদর্শ "মুস্তাদআফ" পরিবার গঠন করেন। এরাই মূলতঃ মুস্তাদআফ্‌দের আদর্শের মানদন্ড। তাদের সাথে একাকার হয়ে যায় বেলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব ও সালমান গংরা। অপরদিকে ঈমান আনা ক্বোরেশীরা "মুস্তাকবির" খাসলত ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়। মক্কা বিজয়ের অনেক পর ইয়ামেন থেকে আগত নব দীক্ষিত আরবদের কাকে আমীর নিয়োগ করা হবে, তা আল্লাহর রাসূল সঃ এর ব্যাপার। আল্লাহর কড়া নির্দেশ, "আল্লাহ ও রাসূলের আগে বাড়বেনা, রাসূলের সামনে উচ্চ বাক্য করবে না, করলে অজান্তে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে।" (সূরা হুজুরাত-১,২)

আবু বকর ও উমর তাদের নিজ নিজ ব্যক্তির নিয়োগ নিয়ে তর্কাতর্কী করে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে ফেলে। তাই সূরা হুজুরাত নাযিল হয় আবু বকর ও উমরদের আদব শিখাতে। বলা হয় যে তারপর নাকি আবু বকর ও উমর সংযত হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় রাসূল সঃ তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে উসামাহকে আমীর নিয়োগ করলে তাদের স্বরূপ পুনঃ প্রকাশ পায়। তার পূর্বে যায়দের আমারত নিয়েও এরূপ বদ্‌তমিযীর প্রকাশ ঘটেছিলো। কই কোথাও ইতিহাসে তো আমরা ঘুনাক্ষরেও দেখিনা যে আবু বকর বা উমর কেউ রাসূল সঃ কর্তৃক যায়দকে বা উসামাহ্‌কে আমীর নিয়োগের

বিরোধিতাকারীদের ধৃষ্টতার প্রতিবাদে রাসূল সঃ এর পার্শ্বে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়াতে? ক্বোরআন ও হাদীসে বরং তার উল্টোটাই দেখতে পাই। যেরূপ সূরা মুহাম্মাদের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন।

ওদিকে রাসূল সঃ-এর ঘরে ক্বোরেশের এ দু'নেতা আবু বকর ও উমরের কন্যা মা আয়শা ও হাফসা একের পর এক অঘটন ঘটায়। রাসূল সঃ এর নবুওতী জীবনের শেষ সময় মা মারিয়া ক্বিবতীয়া রাসূল সঃ এর ঘরে আসে। তাঁকে নিয়েও মা যায়নাবের ঘরে মধু পানের মতো স্বাভাবিক ব্যাপার নিয়ে মা আয়শা ও হাফসা এমন ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে, প্রায় এক মাসের জন্য রাসূল সঃকে তাঁর স্ত্রীদের ত্যাগ করে পৃথক ভাবে মসজিদে নববীতে বাস করতে হয়। এ বদ্তমিযীতেও আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। আল্লাহ তাঁর এ দু'অকৃতজ্ঞ দাসীকে তাদের অবস্থান জানাতে সপ্তম আকাশ থেকে জিব্রাঈল আঃকে অহী দিয়ে পাঠান। তাদের অসংগত আচরণের জন্য আল্লাহ এক পূর্ণ দৈর্ঘ্য সূরা নাযিল করেন। সূরা তাহরীম নাযিলের কারণ মা আয়শা ও হাফসা। আল্লাহ তাদের দু'জনকে হযরত নূহ ও লূত আঃ-এর দু'অভিশপ্ত স্ত্রীর সাথে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলনা করে রাসূল সঃকে তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে আদেশ করেন। কোনো প্রকার তওবা তিল্লা করে সে যাত্রা এ দু'আম্মা তালাক থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, এ দু'নারীবাদী আম্মাজান তাদের মূল খাসলত ত্যাগ করে নি। রাসূল সঃ-এর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে উভয় নিজ নিজ পিতাকে রাসূল সঃ এর স্থলে বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

মা আয়শা ও হাফ্সা আবু বকর ও উমরকে দিয়ে মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করিয়ে জনমনে তাদের নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস পায়। সর্বপ্রথম রাসূল সঃ মসজিদে জামাতে যেতে অপারগ হলে উমরকে দিয়ে জামাত দাঁড় করার চেষ্টা করা হয়। উমর ইমামতি আরম্ভ করলে তার চড়া গলার আওয়াজ শুনে রাসূল সঃ জিজ্ঞাসা করেন, "কে নামায পড়াচ্ছে?" তাঁকে উমরের কথা জানানো হলে রাসূল সঃ সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে উমরকে সরিয়ে দেন। তারপরও দু'আম্মাজান তাদের পরিকল্পনায় ক্ষান্ত হয়নি। দ্বিতীয় বার আবু বকরকে এনে নামাযের জামাত দাঁড় করার চেষ্টা নেয়। রাসূল সঃ আবু বকরকে নামাযে ইমামতী করতে দেখে চরম অসুস্থ অবস্থায় দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে নববীতে গিয়ে আবু বকরকে সরিয়ে নিজে বসে বসে নামাজ সমাপ্ত করেন। এরপর রাসূল সঃ পুনঃ তাঁর শয্যায় এসে মা আয়শা ও হাফসাকে বলেন "তোমরা দেখছি ইউসুফ আঃ এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী জুলেখাদের দৃষ্টান্ত!" বোখারী মুসলিমে বর্ণিত ঘটনাবলী পড়লে দেখা যায় যে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পূর্ব মূহুর্তে মা উম্মে সালমা ও মা মারিয়া ক্বিব্তীয়াসহ অন্যান্যরা যখন রাসূল সঃএর বিদায় কালে শোকে বিহবল, তখন মা আয়শা ও হাফসা যেনো কোনো প্রভাবশালী শাসকের মৃত্যুকালে তার উত্তরাধিকার আয়ত্বের চেষ্টায় ব্যস্ত!

মূল ব্যাপার হলো যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁর শেষ রাসূল মৃত্যুর পূর্বে মুস্তাদ্আফদের ইমামত প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি সকল বয়স্ক সুস্থ ঈমানদারদের উসামাহ্র অধীনে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়ে মদীনা থেকেই ছ'মাইল দূরে সেনা শিবিরে পাঠিয়ে দেন। কারণ, বয়স্ক পুরুষের মদীনায় থাকার অনুমতি ছিলোনা। শিবিরে বেলাল আযান দিচ্ছে এবং তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে উসামাহ সেখানে ইমামরূপে জামাত করে নামাজ আদায় করছে। তাদের মধ্যে আবু বকর, উমর, আলী, ওসমান ও অন্যান্য সকল মুহাজির আনসার ও তাদের বয়স্ক মোড়লরাও রয়েছে। তাদের কারোই মদীনায় থাকার কথা নয়। মদীনায় কোনো জামাতে নামায কায়েমের অবকাশও ছিলো না। মা আয়শা ও হাফসা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায়ই ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটায়।

আল্লাহর অমোঘ বিধান, তিনি রাহ্মান ও রাহীম। বান্দাদের সাধারণতঃ এক পাপে তিনি পাকড়াও করেন না। একবার, দুবার এবং তৃতীয়বার অন্যায় করলেই তিনি যমধরা ধরেন। রাসূল সঃ ভোগবাদী শয়তানতন্ত্র উৎখাত করে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কৃচ্ছতার জীবন যাপনে আদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ক্বোরেশের দু'উচ্চাভিলাসী নেতার দু'কন্যা রাসূলের স্ত্রী হয়েও রাসূলের জীবনে নিজেদের খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়। তাই তারা চার দিকে জয় দেখে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য রাসূল সঃকে চাপ প্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করে। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সাহায্যে জিব্রাইল আঃকে পাঠিয়ে অহী নাযিল করেন ঃ "হে রাসূল! তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, তারা যদি পার্থিব ভোগ বিলাস চায়, তা হলে তারা ধন সম্পদ নিয়ে তালাক নিয়ে চলে যাক। তাতে কোনো আপত্তি নেই। আর যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও পরকালের কল্যাণ প্রত্যাশা করে, তা হলে তাদের পার্থিব জীবনে রাসূলের সাথে কৃচ্ছতার জীবনই যাপন করতে হবে। পরকালে আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব-২৮,২৯)

ভোগ ভাতার আন্দোলনেও মা আয়শা ও হাফসাই রাসূলের ঘরে রাসূল সঃ এর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করে। পরে

মধুপান ও মারিয়া কিব্তীয়ার ঘটনায়ও এ দু'জন সীমা লংঘন করে। তাই ন্যূন পক্ষে তিনটি অন্যায়ের পর আল্লাহ্ মা আয়শা ও হাফসাকে তাদের স্বরূপে চিহ্নিত করে নূহ ও লূত (আঃ) দের স্ত্রীদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেন। তাতেও কি তারা নিজেদের সংযত করেছিলো? রাসূল সঃ এর বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে মিসরের ভ্রষ্টা জুলেখার সইদের সাথে তাদের তুলনা কি বুঝায়? তারা রাসূল সঃ এর স্ত্রী বিধায় মু'মিনদের মাতৃতুল্য। কিন্তু তারা যে আল্লাহ্‌র দাসী এ সত্য কি তাদের বুঝে আসেনি?

অপরদিকে রাসূল সঃ এর সামনে আগ্‌বেড়ে ইয়ামেন থেকে আগত নব দীক্ষিতদের আমীর নিয়োগের ব্যাপারে কা'কা' ইব্‌ন্ মা'বাদ ও আকরা' ইবন্ হাবিস এর নাম প্রস্তাব করার শিক্ষা আবু বকর ও উমর কোথা থেকে পেলো? ক্বোরআন ও সহীহ হাদীসের শিক্ষায় আমরা দেখতে পাই যে প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর অনুসারীদের যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা উত্তর জানা থাকলেও বলতো "আল্লাহ্ ওয়া রাসূলুহু আ'লামু" অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ-ই উত্তম জানেন। সে ক্ষেত্রে "কা'কা'কে আমীর করুন, আকরা'কে আমীর করুন" এভাবে নির্দেশ করা এবং তা নিয়ে রাসূল সঃ এর দরবারে আবু বকর ও উমরের বাক বিতন্ডা করা কোনো বিচারেই অনুমোদন যোগ্য ছিলোনা। তাই তাদের অহি মারফত আল্লাহ্ সতর্ক ও সাবধান করেছেন। যাতে তারা এ অশোভন আচরণের পুনরাবৃত্তি না ঘটায়। ঘটালে তাদের সারা জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে রাসূল সঃ এর মৃত্যু শয্যায় নামাজের ইমামত এবং রাসূল সঃ কিছু লিখে দেয়ার জন্য কাগজ কলম চাইলে তারা শুধু তা দিতে বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাসূল সঃ মৃত্যু যন্ত্রনায় প্রলাপ বকছেন বলেও ধৃষ্ট মন্তব্য করতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ্ বলেন যে, "রাসূল সঃ আজে বাজে কথা উচ্চারণ করেন না, যা অহী দ্বারা আদেশ করা হয়, তিনি শুধু তাই বলেন।" (নাজ্‌ম্-৩,৪)

এ কথা এখানেই শেষ নয়। রাসূল সঃ পুনঃ চাইলে উমর তার চড়া গলায় এমন দৃশ্যের সৃষ্টি করে যে রাসূল সঃ উমরদের তাঁর দরবার থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ করেন। সূরা হুজুরাতে অহীর আদেশও পরবর্তী আমিরুল মোমেনীনদের চরিত্রে লাগাম লাগাতে যথেষ্ট হয়নি?! ক্বোরেশী মুস্তাকবিরীর দুষিত রক্ত এতো খারাপ বলেই না আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে দিয়ে ক্বোরেশী আবু বকর, উমর, আলী, ওসমান, তালহা, যুবাইর, সাআদ্ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবু ওবায়দা ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফদের মুস্তাদ্‌আফ্ নবীর পরীক্ষিত প্রিয়তম পিতামাতা যায়দ ও বারাকাহ্‌র পুত্র উসামাহ্‌র ইমামত ও আমারাতের অধীনে নাকে খত দেয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন! এরপরও কি বিবেকবানদের বুঝার কিছু বাকী থাকে?

অপরদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল সঃ-এর উপর ঈমান আনা প্রথম চল্লিশ জনের ৩৫ জন মুস্তাদ্‌আফ্। যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইবন মাসউদ ও খাব্বাবরা ঈমান আনার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে বে-আদবী দূরের কথা, তারা যেনো তাদের সকল অস্তিত্ব দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর আদেশ পালনের অপেক্ষায় থাকতো! রাসূল সঃ-এর জীবদ্দশা এবং মৃত্যুর পর এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তারা আবু বকর, উমর বা মুহাজির ও আনসারদের ক্ষমতা ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে সামান্যতমও জড়িয়েছিলো। একেই না বলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য?!

রাসূল সঃ তাঁর নবুওতী জীবনের একমাত্র হজ্জ, বিদায় হজ্জে প্রায় দেড় লক্ষ ঈমানদারদের সঙ্গে নিয়ে হজ্জ সমাধা করেন। তাতে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মূলনীতির ঘোষণা দেন। আবু বকর ও উমরদের দশজন ক্বোরেশী ব্যক্তি ছাড়াতো অন্যান্যরা পরবর্তী আত্মঘাতি বিতর্কে তাদের মতো জড়ায়নি! মুস্তাদ্‌আফদের মতো আমাদের নির্বিবাদে আল্লাহ্, রাসূল সঃ ও আল ক্বোরআনকে মানতে বাধা কোথায়? তারা কি বিনা বাক্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে অন্যায় করেছে যে আমাদের তাদের বাদ দিয়ে যারা পরবর্তীতে আত্মঘাতি বিবাদ সৃষ্টি করে ঐক্যের দ্বীনকে বিভক্ত করে আরবী অ-আরবী, ক্বোরেশী অ-ক্বোরেশী এবং পরিণামে সুন্নী ও শিয়ার জন্ম দিয়েছে, তাদের নামে অসংখ্য মিথ্যা হাদীস তৈরী ও বর্ণনা করে তাদের সাফাই গাইতে হবে? আল্লাহ্ তো আমাদের তাঁর অনুগত দৃষ্টান্ত ঈমান আনতে নির্দেশ করে বিবাদ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীদের পথ ত্যাগ করতে বলেছেন?!

আমরা জানি যে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত আখেরী নবী সঃ এর আদর্শ ঘরে এগারো জন স্ত্রী ছিলো। তন্মধ্যে নয়জন আল্লাহ্, রাসূল ও ক্বোরআনের নির্দেশ মতো জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তো ক্বোরআনে কোনো অহী নাযিল হয়নি? রাসূল সঃও তাদের বিরুদ্ধে কোনো উক্তি কখনো করেননি। তাদের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর

রাসূল সঃ সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন কি তাদের অযোগ্যতা ও অপরাধ? তা না হলে যাদের আচরণ ও ক্রিয়া কলাপে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ অসন্তুষ্ট, যাদের নিন্দায় বহুবার অহী নাযিল হয়েছে, তাদের নিয়ে টানাটানি করে আল্লাহ্র দ্বীনকে বেঈমানদের ঠাট্টা তামাশার বিষয়, কে, কারা, কখন এবং কেনো করলো?

মা খাদিজাতুল কুবরা, মা উম্মে সালমার মতো ধীরস্থির বুদ্ধিদীপ্ত মহিলা মা হাজেরার প্রতিচ্ছবি, মা মারিয়া ক্বিবতিয়াহ্ ও হযরত মূসার ভাতিজী, হযরত হারুন আঃ এর কন্যা এবং আখেরী নবী সঃ এর পতিব্রতা স্ত্রী মা সাফিয়া, এদের কোনো মূল্যায়ন নেই কেনো সুন্নী শিয়াতে বিভক্ত তথাকথিত বিপথগামী মুসলমানদের ইতিহাসে?

নারী জাতির মধ্যে আল্লাহ্ কাকেও নবী বা রাসূল বানাননি। কারণ, নবুওত ও রিসালাত ঘরের বাইরের কাজ। নারী জাতি সুখ শান্তির নীড় রচনাকারিনী, ভূ-পৃষ্ঠে জান্নাত রূপীনী "সাকীনাহ"। আখেরী নবী সঃ এর ঘরে আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আদর্শ নারীদের সমাগম ঘটিয়েছেন। যাতে তারা সাধারণ নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়। এ ঘরে যারা এ আদর্শ প্রতিফলনে সফল হয়েছে, তারা সর্ব যুগে সফল নারীদের আদর্শ। আর যারা ব্যর্থ হয়েছে, তারা কখনো আদর্শ নয়। তাদের দুর্ভাগ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সকল ঈমানদার নারীর তা থেকে আল্লাহ্র দরবারে পানাহ্ চাওয়া কর্তব্য।

রাসূল সঃ-এর ঘরে আল্লাহ্ তাঁর কুদরতে এক অপূর্ব মহিলার আগমন ঘটান। খায়বার বিজয়ের পর মা সফিয়াহ্ বা সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন্ আখতাব রাসূল সঃ এর ঘরে আসে। তার বংশ পরিচয় হলো, তিনি হযরত হারুন আঃ এর অধস্তন কন্যা। তাই সে সূত্রে তিনি হযরত মুসা আঃ এর ভ্রাতুস্পুত্রী।

ক্বোরেশী রক্তধারার মা আয়শা ও হাফসা এ নবাগতাকে সামনে পেলেই "ইয়াহুদীয়াহ্" বা ইয়াহুদী বলে ভ্রুকুটি করে ভেংচাতো। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে রাসূল সঃ এর নিকট অভিযোগ করতে হয়। রাসূল সঃ মা আয়শা ও হাফসাকে সফিয়াকে উত্যক্ত করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাসূল সঃ মা সাফিয়াকে বলে দেন, "তোমাকে উত্যক্ত করলে তুমি আয়শা ও হাফসাকে বলো, "তোমরা শুধু ক্বোরেশের দু'জন সাধারণ ব্যক্তির কন্যা, আর বুঝতে চেষ্টা করো যে আমি এক নবীর কন্যা, এক নবীর ভাতিজী ও আখেরী নবীর স্ত্রী। কার মর্যাদা বেশী?"

এ ছিলো মা আয়শা ও হাফসার স্বভাবের নমুনা। অথচ ক্বোরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে ঈমানদার নারী পুরুষরা, কখনো তোমরা পরস্পর নারী পুরুষকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করোনা। কারণ, তোমাদের প্রতিপক্ষ তোমাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে খারাপ উপাধি ও নামে ডাকবেনা। ঈমান আনার পর এ অভ্যাস নিকৃষ্ট স্বভাব। যারা এ বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করবে না, তারা যালিম"। (সূরা হুজুরাত-১১)

রাসূল সঃ এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সূরায়ে হুজুরাত ও তাহ্রীম নাযিল হয়। হুজুরাত নাযিল হয় আবু বকর ও উমরের রাসূল সঃ এর দরবারে তাঁর সামনে গলা চড়িয়ে বিবাদের পরিণতিতে, এবং তাহরীম নাযিল হয় তাদের দু'কন্যার রাসূল সঃ এর ঘরে চরম অবাধ্যতা ও সীমাহীন চক্রান্তের ফলে। অন্য কারো ব্যাপারে এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ, পূর্ণ দৈর্ঘ্য সূরা নাযিলের নযীর ক্বোরআনে দেখা যায়না।

এখন স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ্র রাসূল সঃ এর কথিত এতো ঘনিষ্ঠ দু'সঙ্গী ও তাদের দু'কন্যাদ্বয় কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সংযত বা সংশোধিত হয়েছিলো? পক্ষপাত দুষ্টরা বহু বর্ণনা দেয় যে, এরা অহী নাযিলের পর তওবা করে শোধরে গিয়েছিলো। আবার বোখারীতেই দেখা যায় যে, এ দু'ব্যক্তি ও তাদের কন্যারা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও রাসূল সঃকে কষ্ট দিয়েছে। রাসূল সঃ কাগজ কলম চাইলে তা না দিয়ে তাকে মৃত্যুর পূর্বের "প্রলাপ" বলে উচ্চস্বরে বিবাদ করা হয়। দু'পিতাকে দিয়ে নামাজের জামাত দাঁড় করানোর মাধ্যমে স্ব স্ব পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করায় রাসূল সঃ মা আয়শা ও হাফসাকে বলেন "তোমরা ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারিনী জুলেখাদের মতো।"

রাসূলের রিসালাতকে সকল প্রকার কালিমামুক্ত করা প্রত্যেক ঈমানদারের সর্ব প্রথম কাজ। ইবলিস শয়তান ও তার মানব দোসররা ঈমানদারদের বিপথগামী করার জন্য সর্ব প্রথম আল্লাহর রাসূলদের চরিত্রে কালিমা লেপন করে মানব মনে দ্বিধা সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

ইয়াহুদীরা নবী রাসূলদের চরিত্র হনন ও তাদের নামে মিথ্যা সৃষ্টি ও তা প্রচারে মানবজাতির নিকৃষ্ট প্রজাতি। আখেরী নবী সঃ সকল নবীদের নামে প্রলেপিত সকল কুৎসাকে খন্ডন করে তার অনুসারীদের বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যান, তারা যেনো তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াহুদীদের মতো তাঁর নামে মিথ্যা সংযোজন ও তা প্রচারণা না করে। করলে তারা জাহান্নামী হবে। إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিবে, তাদের উপর ইহকাল ও পরকালে লানত। পরকালে আল্লাহ্ তাদের জন্য অপমানকর কঠোর শাস্তির বিধান করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব-৫৭)

আল্লাহ্ ও রাসূলকে মানুষ কীভাবে কষ্ট বা পীড়া দেয়? কীভাবেই বা মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূলকে সুখ বা শান্তি দেয়? আল্লাহ্কে যারা, যেখানে ও যে যুগে শান্তি দেয়, তারা যেখানে যে যুগে এবং যে-ই হোক, তারা রাদিআলাহু আনহুম। যারা যে যুগে, যেখানে এবং যেভাবেই আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দেয়, তারাই "মালউন" বা লা'নাতুল্লাহি আলাইহিম। ঠিক আল্লাহর রাসূল সঃ কে কষ্ট দেয়া ও সন্তুষ্ট করা তদরূপ। যারা আল্লাহ্কে অংশীদারহীন "লা শারিক" বিশ্বাস করে, ক্বোরআনের ভিত্তিতে সকল নবী রাসূলদের সমান ভাবে বিশ্বাস করে, বিশ্বের মানুষকে এক অভিন্ন জাতি মনে করে ও সকল বৈষম্যের উর্ধ্বে আল্লাহর দাসত্বে মানবজাতিকে একত্রিত করার সংগ্রাম করে, তারাই আল্লাহ্ ও রাসূলকে রাজী ও সন্তুষ্ট করে। তারা কখনো মানুষকে, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভৌগলিক সীমায় বিভক্ত করবেনা।

আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সঃকে প্রেরণ করে শেষ বারের জন্য চূড়ান্ত রূপে পৃথিবীর নির্যাতিত মানবদের মুক্তির আদর্শে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সালমান, সাওবান ও সালেমদের আবু বকর, উমর, আলী, আবু উবাইদা, তালহা, যুবাইর গংদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে যায়দ ও উসামাহ্দের আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ইমাম ও আমীর রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার কারণ, আবু বকর, উমর ও আলীরা বিশ্বের মানব সভ্যতার কা'বা মক্কাকে অপবিত্র করা আল্লাহ্র সীমা লংঘনকারী ক্বোরেশদের সন্তান। তাদের রক্তে বৈষম্যের বিষ প্রবাহমান ছিলো। তাই তারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও "মুস্তাকবির" ছিলো। তাদের পূর্বপুরুষ ও গোত্র বৈষম্যের পূজারীদের হাতে নিগৃহিত নির্যাতিত যায়দ, বেলাল, সুহাইব ও উসামাহ্রা ছিলো আল্লাহ্র নাম দেয়া ক্বোরআনের পরিভাষার "মুস্তাদ্আফ"।

রাসূল সঃ এর আশঙ্কা কী আশ্চর্য রূপে সত্য হলো! তার মৃত্যুর পরই উচ্চারিত হলো কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"র উল্টা কালেমা "আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ"। তাও আবার আবু বকরের মুখে! সে দ্বন্দ্বে রাসূল সঃ তিন দিন পর্যন্ত দাফন কাফনহীন অবস্থায় রইলেন! রাসূলের আজীবন শিখানো জানাযা ছাড়াই তাঁকে দাফন করা হয়! তারপর থেকে আল্লাহ্র গযবে বাগদাদ ও স্পেনে চেঙ্গিস হালাকু খাঁ ও ইউরোপীয় বর্বরদের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ আরবী ক্বোরেশী জাহিলিয়্যাতই সাম্রাজ্য বিস্তার করে আল্লাহ্র দ্বীন ইসলামকে কলঙ্কিত করে রাখে। তাদের পাপের অবৈধ সন্তান শিয়া-সুন্নী বিদ্বেষ আজো পাকিস্তান, আফ্গানিস্তান ও ইরানকে এক হতে দিচ্ছেনা! অথচ এরা সবাই মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলে। এ কালেমা বলেও এরা শিয়া সুন্নীর বিভক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইয়াহুদীবাদের ঘাঁটি আমেরিকা, বিশ্বে একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক পৌত্তলিক মুশরিক ভারত ও নাস্তিক রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে পরস্পরকে নির্মূল করার আত্মঘাতি যুদ্ধে লিপ্ত! এসব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া ও কষ্টদানকারী বাস্তব পাপকে লালনকারী সিপাহে সাহাবী ও সিপাহে মুহাম্মাদী নামধারীরা কি মুসলিম? উসামা বিন লাদিনরা মুয়াবিয়া, মারওয়ান, ও ইয়াযীদের নামে ও আদর্শে শিবির স্থাপন করে তাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে যে যোদ্ধা তৈরী করে, তারা কি সন্ত্রাসী নয়? তাদের কি রাসূল সঃ-এর হাতে গড়া যায়দ ও উসামাহ্দের সাথে কোনো তুলনা হয়? উভয়কে এক পথের যাত্রী যারা মনে করে, তারা কি সঠিক? উসামাহ্ যায়দ ও উসামা বিন্ লাদিন কখনো এক নয়।

শিয়ারা রাসূল সঃ-এর ইন্তেকালের পর আলীকে রাসূল সঃ-এর উত্তরাধিকারী প্রথম ইমাম মনে করে বারো ইমামের কল্পিত ধর্মের জন্ম দিয়েছে। যেমন সুন্নীরা বানোয়াট ক্বোরেশী খেলাফতে রাশেদার খাঁচা তৈরী করেছে। শিয়ারা আলীকে ইমাম না মানার জন্য আবু বকর ও উমরদের মুর্তাদ মনে করে। অপর দিকে আবু বকর ও উমরের অনুসারী পরবর্তী সুন্নী খলিফারা ষাট বছর পর্যন্ত আলীকে খলিফা মানা দুরের কথা, তাকে জুমা, ঈদ, ও হজ্জের খুৎবায় গালি ও লানত করেছে। যাকে জুমা, ঈদ ও হজ্জে সুন্নীরা ষাট বছর যাবৎ গালি দিয়েছে, সে আলীকে কি তারা মুসলিম মনে করতো? এ গালির প্রচলনকারী যদি মুসলিম হয়, তাহলে আলী কাফের ছিলো। আর যদি আলী চতুর্থ খলিফায়ে রাশেদ হয়ে থাকে তা'হলে কি মুয়াবিয়াহ কাফের ছিলোনা ? না উভয়ই মুসলিম বা উভয়ই কাফের ছিলো? এ গোলক ধাঁধাঁর সমাধান না বুঝে কি কোনো ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে?

বিশ্বকে একত্রিত করার তাওহীদের দাবিদাররা বর্তমানে শির্কে নিমজ্জিত। মুসলিম নামধারিরা মূলতঃ অমুসলিম! এ অবস্থায় তারা বিশ্বে ইসলামী জাগরণের কথা বলে। এ কি আল্লাহ্ ও রাসূলকে ক্রোধান্বিতকারী প্রহসন নয়!

বর্তমান আরবদের কি কোনো সংজ্ঞায় মুসলিম বলা যায়, না তারা তার দাবী করার যোগ্যতা রাখে? জর্ডানের হোসেইনরা নবী সঃ এর হাশেমী ক্বোরেশী এবং মরোক্কোর হাসানরা ফাতেমী হাশেমীর দাবিদার হয়ে আরব দেশে ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের পোষ্যপুত্র। তারা উভয়ই "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর বিষবৃক্ষের ফল। মক্কা মদীনাহ আরেক চক্রের হাতে বন্দি। ইব্রাহীম আঃ কর্তৃক নাম প্রদত্ত মুসলিম জাতি আজ তিন ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পরস্পরকে নির্মূল করার চক্রান্ত ও সংঘাতে লিপ্ত। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডান, এরা কারা? আল্লাহ্র নির্দেশ হলো, হে আদম সন্তানরা, তোমরা নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদের মতো মুসলিম হও। সকল সত্ত্বা দিয়ে আত্মসমর্পণ করলেই শুধু মানুষ মুসলিম হয়। যেমন ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ হয়েছিলেন। তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের সালাম ও দুরুদ। তাঁদের মতো হলেই অন্যান্য সকল মানুষের উপর আল্লাহর সালাম ও দুরুদ। هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ তিনি তোমাদের উপর তার ফেরেশতাদের নিয়ে সালাম ও দুরুদ বর্ষণ করেন, যাতে তোমরা কুফরীর অমানিশা থেকে ঈমানের আলোতে প্রবেশ করো। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এরূপ ঈমান নিয়ে তোমরা যে দিন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে দিন আল্লাহ্ তোমাদের "সালাম" বলে অভিবাদন জ্ঞাপন করবেন। (সূরা আহ্যাব-৪৩,৪৪)

ঈমানদারমাত্রের কাজ হলো ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের মতো মুসলিম হওয়া। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুহাম্মাদী হওয়া নয়। কারণ, তাঁরা কেউই কখনো ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মুহাম্মাদী বা মোহামেডান ছিলেন না। ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মোহামেডান হওয়াই কাফের মুর্তাদ হওয়া। কারণ, এসবই ইসলাম ও ঈমান ত্যাগ করে সম্প্রদায় জন্ম দেয়া। আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ কর্তৃক আল্লাহ্র দ্বীনকে পূর্ণ করে সীলমোহর করার পর "আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" বলা পূর্ণ দ্বীন ও ইসলামকে ত্যাগ করে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট হওয়া ও নিকৃষ্টতম বর্ণবাদী সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়া। এ মহাপাপের ফলেই আল্লাহ্র গযব ও লা'নতে ক্বোরেশ নামের বংশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বটে। কিন্তু সেই বিষবৃক্ষের ফল আজো বাঙ্গালীদের বাংলাদেশ, পাকিস্তানীদের পাকিস্তান, আফগানীদের আফগানিস্তান, ইরানীদের ইরান, মালয়ীদের মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশীয়দের ইন্দোনেশিয়া, মিসরীয়দের মিসর, সুদানীদের সুদান, আলজেরীয়দের আলজেরিয়া, লিবিয়ানদের লিবিয়া, সিরীয়দের সিরিয়া, ইরাকীদের ইরাক, তুর্কীদের তুরস্ক, এবং সৌদি আরবীয়দের সৌদি আরবে নিজ নিজ পতাকা উড়িয়ে আখেরী নবী সঃ এর এক ও অবিভাজ্য উম্মত গড়ার রিসালাতকে উৎখাত করার স্বাক্ষর বহন করে যাচ্ছে। তারপরও নাকি তারা মুসলিম উম্মাহ!?

আল্লাহর আদেশে তাঁর চূড়ান্ত নবী কর্তৃক মুস্তাদআফ্দের ইমামাত ও কর্তৃত্বকে চূড়ান্ত রূপদান করার পর রাসূল সঃ এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর কর্তৃক উচ্চারিত "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" জাহেলী বাক্যের উপর পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত তথা কথিত ক্বোরেশী গোত্রের "খেলাফতে রাশেদার" চার নায়ক আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীরা কি রাসূল সঃ কর্তৃক আচরিত, প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ ত্যাগ করে মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিলো? না শিয়াদের মতানুযায়ী আবু বকর, উমর ও ওসমান গং মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিলো, না আলী একা মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিলো? যে জন্য সুন্নীরা অর্ধ শতাব্দীর চেয়েও বেশী দিন ধরে জুমা, ঈদ, ও হজ্জের খুৎবায় আলীকে গালি ও লানত করেছিলো?

এ সত্যকে চেপে রেখে কি মুসলিম ঐক্য সাধিত হতে পারে? না চেপে রাখা সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে শিয়া সুন্নীর বিষকে মুসলিম উম্মাহর দেহ থেকে দূর করে কাঙ্খিত বিশ্ব ঐক্যের ভিত্ রচনা করা কর্তব্য?

দ্বিতীয় মতকে একমাত্র ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে এ পুস্তক রচনা করা হচ্ছে। সুন্নী ও শিয়াদের সমর্থন ও আশির্বাদ চেয়ে বা কল্পনা করে এ বই লেখা হচ্ছে না। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল-ক্বোরআন ভিত্তিক সকল নবীদের রিসালাত ও শরিয়তের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে ইব্লিসের বর্ণ ও গোত্র বৈষম্যের মুস্তাকবিরী থেকে মুক্ত করার নিশ্চিত ও নির্ভিক শপথ নিয়ে এ ইশ্তেহার ঘোষিত হচ্ছে। সুন্নী শিয়াসহ সকল ফের্কাবাজরা তাদের কল্যাণ ও মুক্তির তাগিদে "তাওবাতুন নাসূহা" করে এ ক্বাফেলায় একাকার হলে কোনো আপত্তি থাকবে না। কারণ, এ প্রক্রিয়াই তাওহীদ ও রিসালাতের পথ, "সিরাতুল মুস্তাকীম"। আমাদের কাঙ্খিত ইমাম মাহ্দী ও ঈসা রূহুল্লাহর আত্মপ্রকাশ এ মূলনীতির উপরই হবে। ইনশাআল্লাহ। কারণ, রিসালাত চূড়ান্ত রূপ নিয়ে সীলমোহর

কৃত হয়েছে বলে তাঁরা নবী রাসূলরূপে আবির্ভূত হবেন না। সকল নবী রাসূলদের রিসালাতের সমষ্টি ফল নিয়ে বিশ্ব ইমামের অভ্যূদয় হবে। কোনো সাহাবী, তাবেঈ, ক্বোরেশী, আরবী, বা আজমী তুরানীর বর্ণবাদের নাম নিশানাও তাতে থাকবে না। এ সব থাকবে দাজ্জালের শিবির ও জামাতে।

প্রত্যেক ঈমানদার, যারা তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও ক্বোরআনে বিশ্বাস করে, তাদের প্রত্যেককে দিবা লোকের মতো স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাঁর শতকরা ৯০% ভাগ নির্যাতিত বান্দাদের, ১০% নির্যাতকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। নির্যাতিতরা মুস্তাদআফ্ এবং নির্যাতকরা মুস্তাকবির। নবী রাসূলরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে বিদায়ের সময় বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে স্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যান। এ বিশ্বাসঘাতকরা অধিকাংশই নবী রাসূলদের "বংশীয় রক্তীয়" হয়। এরা ঘাপটি মেরে ক্ষমতা দখলের জন্য নবীদের সঙ্গী হয়। অনেক ক্ষেত্রে নবীদের ঘরের নিমক হারাম স্ত্রীরা কুচক্রী ঘাতকদের হয়ে নবীদের ঘরে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের মূল চাবিকাঠি হয়। যেমন হযরত নূহ, লূত ও শামউন আঃ দের স্ত্রীরা করে কলঙ্কিত হয়ে চির অভিশপ্ত হয়েছে। আখেরী নবী সঃ এর ঘরে আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য সূরা, তাহরীম নাযিল করে মা আয়েশা ও হাফসাকে নূহ ও লূত আঃদের সাথে তুলনা করেছেন।

অপরদিকে এ শ্রেণীর নির্বোধ স্ত্রীদের সহযোগিতায় নবী রাসূলদের রক্তের সম্পর্কের ছেলে, জামাতা, শ্বশুর, শ্যালক ও ভাই ভাতিজারা নবীদের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের জাল বুনে থাকে। এটাকেই সাধারণতঃ ধর্মীয় নেতাদের ঘরে "আহলে বাইত" এবং রাজা বাদশাদের ঘরে "প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চক্র" বলে অভিহিত করা হয়। নবী রাসূলদের ঘরের এ চক্র নবীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুস্তাদআফ্দের বিতাড়িত করে। নবুওতের উত্তরাধিকারকে পার্থিব গদি দখলের সোপান বানিয়ে ফেলে। নবী রাসূলদের ঘরে এ সমস্ত পরিজনরা ইবলিস শয়তানের এজেন্ট রূপে অবস্থান করে। তাই প্রত্যেক নবী রাসূল ও তাদের অনুসারীদের বেশী বেশী আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম পড়তে বলা হয়েছে।

হযরত নূহের স্ত্রী, পুত্র ও রক্তীয় স্বজনরা এরূপ করেছিলো। হযরত মুসা আঃ কূহে তুরে দীর্ঘ দিনের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যে গেলে তাকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মনে করে তাঁর তথাকথিত সাহাবীরা হযরত হারুন আঃকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলো। হযরত সুলায়মান আঃ-এর মৃত্যুর পর তার এক স্ত্রী তার ছেলেকে নিয়ে একই কাজ করেছিলো। হযরত ঈসা আঃ তার রিসালাত অনুযায়ী আল্লাহর আদেশ মোতাবেক যখন ক্বোরেশদের মতো গোত্র পুজারী ইস্রাঈলীদের বর্ণবাদী শির্ক ত্যাগ করে হযরত ইব্রাহীম আঃ-এর মিল্লাতে একাকার হতে আহ্বান করেন, তখন সাধারণ জনগণ, "মুস্তাদআফ"রা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু ক্বোরেশদের মতো কায়েমী স্বার্থবাদী ইয়াহুদীরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত ঈসা আঃ কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। যেমন মক্কার ক্বোরেশরা আখেরী নবী সঃ কে একই কারণে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। হযরত ঈসা আঃ তা আঁচ করতে পেরে আল্লাহ্র নির্দেশে হিজরত করে এক দূরবর্তি এলাকায় জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেন। যেমন আখেরী নবী সঃ ক্বোরেশদের হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে পালিয়ে মদীনার অজগাঁয় খেজুর বাগানের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। আখেরী নবী সঃ যেরূপ খেজুর গাছের ডালা ও গুড়ি দিয়ে মদীনায় মসজিদে নববীর পত্তন করেন, সেরূপই হযরত ঈসাও নাযারাথে গাছের ডালপালা ও খড়কুটা দিয়ে তাঁর আশ্রয় ও ইবাদতের ঘর মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। হযরত ঈসা আঃ এর সাথে যারা হিজরত করে, তাদের মাঝে স্বার্থপর কিছু ইয়াহুদীও ঈমান এনে সঙ্গি হয়। তারা নিজেদের মধ্যে আবার বারোজনের একটি চক্র গড়ে তোলে। যেমনটি আখেরী নবী সঃ এর ক্বোরেশী মোহাজেরদের মধ্যে দশজনের একটি জোট তৈরী করে পরবর্তিতে তাদের "আশারায়ে মুবাশ্শারাহ" নাম করণ করে তার স্বপক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরী ও প্রচার করে। একি কোনো সুস্থ ব্যক্তি, যে ক্বোরআনে বিশ্বাস করে, সে কি ভাবতেও পারে যে রাসূল সঃ বেছে বেছে শুধুমাত্র ক্বোরেশ গোত্রের দশজনকে আগাম বেহেশ্তবাসী হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে যাবেন?! যাদের মধ্যে একজনও আনসার নেই? মুস্তাদআফ্রাও কেউ নেই, যাদের মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সঃ প্রেরিত হয়েছেন?

ঠিক একাজটিই বর্ণবাদী ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আঃ এর সময়ও করেছিলো। হযরত ঈসা আঃ তাঁর বারজনের চক্রের সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন। তাঁকে যখন ইয়াহুদী রাজা হিরোডাস হত্যা করার পরিকল্পনা করে, তখন তার রাষ্ট্রীয় ঘাতকরা পয়সার বিনিময়ে ঈসা আঃ এর বারোজনের চক্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। হযরত ঈসা আঃ তা

যথা সময়ে জানতে পারেন। এবং যে রাতে তারা ঘাতকদের হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিলো, তার পূর্বের দিনও সন্ধ্যায় হযরত ঈসা আঃ তাদের বলেন, "আজ রাতই তোমরা আমাকে হত্যাকারীদের হাতে হত্যার জন্য ধরিয়ে দিবে।"
বাইবেলে এর বিশদ বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল্-ক্বোরআনে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। ক্বোরআনে আল্লাহ পাক বলেন, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
"যখন ঈসা তাঁর গোত্রের কুফরী টের পেলো, বলেছিলো, তোমরা কে আছো আমাকে আল্লাহর পথে সাহায্য করবে? তখন তার নিবেদিত প্রাণ অনুসারীরা বলেছিলো, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা মুসলিম। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি যা' নাযিল করেছেন, আমরা তাতে ঈমান আনলাম এবং রাসূলের আনুগত্য করলাম। আপনি আমাদের সত্যের সাক্ষ্য দানকারীদের তালিকাভুক্ত করে দিন। (সূরা আল-ইমরান-৫২,৫৩)
তারপরও হযরত ঈসার "ইস্না আশারা মুবাশ্শারা" বা বারো সাহাবী ঈসা রূহুল্লাহ আঃ কে পার্থিব স্বার্থে বিক্রি করে দিতে উদ্যত হলে আল্লাহ্ তাঁর রূহকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর হেফাজতে রাখেন। যেমনটি তিনি তাঁর আখেরী নবী সঃ কে মদীনায় রক্ষা করেন। وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন"। (সূরা মাঈদা-৬৭) ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আল্লাহ্র নবীদের মাঝে পরস্পরের জীবনে কতোইনা মিল ও সাদৃশ্য! বিশেষ করে ঈসা রূহুল্লাহ্ ও আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর মধ্যে! তাই না, তাঁরা উভয়ই উভয় সম্পর্কে বলেছেন "আমার পর মুহাম্মাদ আসবেন, আমার পর ঈসা আসবেন।"
কিন্তু কতইনা পরিতাপ ও ক্ষোভের বিষয় যে, হিরোডাসের ঘাতকরা ঈসা রূহুল্লাহ্কে ধরে নিতে আসলে তাঁর কথিত নিকটতম ব্যক্তি সাহাবীই তাঁর কপালে চুমো খেয়ে তাকে চিহ্নিত করে দেয় এবং ঘাতকরা ঘরে প্রবেশ করলেই সবাই নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ তাকে রক্ষা বা প্রতিরোধ করতে বুখে দাঁড়ায়নি। অথচ এরাই তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা আঃ ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা গেলে তাঁর ক্রুশ বিদ্ধ প্রতীক বুকে ঝুলিয়ে তাঁর তাওহীদী রিসালাত ত্যাগ করে। ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আঃ দের ইসলাম ত্যাগ করে ইয়াহুদীবাদের ন্যায় আরেক ত্রিত্ববাদী শির্কের ধারকবাহক হয়। বরং এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। ঐ ঘাতকদের দোসররা হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্র উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল বিকৃত করে তার কথিত চার সাহাবা চার কিতাব তৈরী করে, যার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই প্রধান, যেমনটি ক্বোরআনের বাইরে বহু মিথ্যা গল্প কাহিনী দিয়ে উমাইয়া আব্বাসী গোত্রবাদী সাম্রাজ্য বিস্তারকারী তাদের দান-দক্ষিনায় বহু পেশাদার মুহাদ্দিসদের দ্বারা মিথ্যা হাদীস তৈরী করে মানব জাতিকে মূল ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান করেছে।
হযরত ঈসার বারজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গির দৃষ্টান্তে দশজন ক্বোরেশী ব্যক্তিকে বেছে বেছে যে আশারায়ে মুবাশ্শারার বেড়াজাল সৃষ্টি করে পুনঃ তার মধ্য থেকে চারজনকে দিয়ে যে খেলাফতে রাশেদা নামের খাঁচা তৈরী করা হয়েছে, তাতেই বন্দি হয়ে আজ বিশ্ব বিজয়ের শাহীন পাখী তার উড্ডয়ন শক্তি হারিয়ে "খাঁচা বন্দি পেঁচার" দশায়। আল্লাহ্র বিশেষ কৃপা ও রহমতে ক্বোরআন স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক অবিকৃত রক্ষিত থাকায় আজ আমরা আল্লাহ্র একমাত্র দ্বীন ও সকল নবীদের রিসালাত ইসলামকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও বর্ণবাদী ক্বোরেশী খাঁচা ভেঙ্গে মুক্ত করে বিশ্বের নির্যাতিত মুস্তাদ্আফ্দের মুক্তির পথ দেখাতে প্রয়াস পাচ্ছি। আখেরী নবী মোহাম্মাদ সঃ এর সত্যি বাণীসমূহ বেছে বের করার কোনো পথই আমাদের থাকতোনা, যদি না অবিকৃত ক্বোরআন রক্ষিত থাকতো। রাসূল সঃ এর সহীহ্ বাণীসমুহ মিথ্যা হাদীসের দুষ্ট চক্র থেকে বাঁচার মোক্ষম অস্ত্র। ক্বোরআনের সাথে রাসূল সঃ এর বাণী পাশাপাশি মিলাতেই মিথ্যা হাদীস (?) গুলো হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক "শুধু ক্বোরআনই যথেষ্ট" বলে রাসূল সঃ এর বাস্তব জীবনকেই যেনো বাদ দিতে চায়। রাসূল সঃ এর সত্য বাণীসমূহ ক্বোরআন নাযিল ও তার বাস্তবায়নের ইতিহাস বৈ কিছু নয়। সত্য ইতিহাস ব্যতীত কোনো যুগ ও সমাজের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান শুধু কল্পনা মাত্র। বাস্তব নয়। যারা তাওহীদী ঈমান ও রিসালাতের বাস্তবতায় ক্বোরআনে নিজেদের ডুবিয়ে দেয়নি, তারাই শুধু রাসূল সঃ এর বাস্তব জীবন "উস্ওয়াতুন্

হাসানাহ" কে অস্বীকার করতে পারে। আর পারে বেঈমান কাফেররা। قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

"হে রাসূল, বলে দাও, আমি কোনো অভিনব রাসূল নই এবং আমি জানিনা আমার এবং তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে"। (সূরা আল আহ্‌ক্বাফ-৯)

রাসূল সঃকে যেখানে আল্লাহ্‌র নির্দেশে বলতে হয়েছে যে, তিনি কোনো অভিনব রাসূল নন, এবং তিনি নিজে তাঁর সাথে পরকালে কি ব্যবহার করা হবে তা' জানেন না। তার সাথে তিনি তাঁর উপর ঈমান আনা সঙ্গী বা কথিত সাহাবার সাথে পরকালে কি আচরণ করা হবে, তাও তিনি জানেন না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে নবী রাসূল ব্যতিত অন্য যে কোনো ব্যক্তির অনুসরণই বিপদজনক। হোক না সে হযরত মূসা আঃ এর সাহাবী, তাবেঈ রাব্বাই, হযরত ঈসা আঃ এর হাওয়ারী বা আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ এর সাহাবী আবু বকর বা উমর! তাদের উপর তো অহী নাযিল হয়নি? এবং আল্লাহ্‌ তাদের কাছে জিব্রাঈল আঃ কে পাঠিয়ে পাহারা দেননি। যেমনটি নবী রাসূলদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান ছিলো। বরং তাওরাত, ইঞ্জিল ও ক্বোরআনে দেখা যায় যে, হযরত মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ রা জীবিত থাকতেই তাঁদের অনুসারীদের মাঝে স্বার্থপররা তাঁদের অবাধ্য হয়েছে এবং তাদের চক্ষুর আড়াল হতেই তাঁদের রিসালাতকে বিকৃত ও বিক্রি করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত মূসা আঃ ৪০ দিনের জন্য তূর পাহাড়ে একনিষ্ঠ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে গেলে তাঁর গোত্রীয় সাহাবীরা কি মূর্তি তৈরী করে নি? এবং "হযরত মূসা আর ফিরত আসবেন না, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে" প্রচার করে জনগণকে বলেনি যে, তাদের দাঁড় করানো ইসরাঈলী মূর্তিই হযরত মূসার ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ?

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ

তারা একটি গোবাছুরের মতো দেখতে দেহ তৈরী করলো, যার মধ্য থেকে একটি শব্দ বের হতো। অত:পর তারা বললো এটা তোমাদের ইলাহ্‌, মূসারও ইলাহ। (সূরা তোয়াহা-৮৮)

হযরত ঈসা আঃ চক্ষুর আড়াল হতেই তাঁর বারো সাহাবী তার নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হয়নি– যে হযরত ঈসা নিজে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে তাদের পাপ মোচন করে গিয়েছেন? তাদের সকল অপরাধ মাফ। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রূহুল্লাহ সম্পর্কে দীর্ঘ দু'হাজার বছর যাবৎ মিথ্যা প্রচার করেও সে বারোজন খৃষ্টান বিশ্বে পূজনীয়।

আখেরী নবী সঃ হযরত ঈসার ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী আগমন করে ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আঃদের দ্বীনকে ইয়াহুদী খৃষ্টবাদের রাহু মুক্ত করে বিশ্ব মানবের মুক্তি সনদ ঘোষণা করে যান। বিদায় হজ্জের ভাষণই বিশ্বের মুস্তাদ্‌আফ্‌দের মুক্তির ইশ্‌তিহার।

সূরায়ে ক্বাসাসের ৫-৬ নং আয়াত ও বিদায় হজ্জে আরাফাতের প্রান্তরে ঘোষিত সাদা কালো ও আরব অনারব ঐক্যের চূড়ান্তে আল্লাহ্‌র আখেরী নবী সঃ কর্তৃক তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে কালো বর্ণের উসামাহ্‌কে সকল আনসার ও মুহাজিরদের উপর ইমাম ও সেনাপতি নিয়োগ কি ঈমানের দাবীদারদের চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিলো না? لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ

الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াত)

"অবশ্যই আমি পরীক্ষা করে দেখতে থাকবো যে, তোমাদের মাঝে কারা কারা মুজাহিদ এবং ধৈর্য্যশীল। আমি তোমাদের অন্তরের আসল খবর বের করেই ছাড়বো" কি আবু বকর ও উমররা শুনেনি, পড়েনি? জিব্রাঈল আঃ এ আয়াত রাসূল সঃ এর উপর নাযিল করার পরও ক্বোরেশী গোত্র পূজারীরা তাতে ঈমান আনে নি। ইসলামের মূল শিক্ষায় ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। এর পর ৩২ নং আয়াতে আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ্‌ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ

"সত্য ও হেদায়েত এরূপ স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে রাসূলকে পীড়া দিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। পরন্তু ওদের সকল আমলই বরবাদ হয়ে যাবে।"

এরূপে আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ কর্তৃক আল্লাহ্‌র দ্বীন পূর্ণতা পাওয়াকে আল্লাহ্‌ ক্বোরআনে আরো বিশদ ভাবে স্পষ্ট করে বলেন ঃ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই আল্লাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য-সঠিক দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে পূর্ণ (?) দ্বীনের উপর পূর্ণ রূপে বিকশিত ও উদ্ভাসিত করতে, করুক না তাকে মুশরিকরা অপছন্দ! (সূরা তওবা-৩৩, সাফ্‌ফ-৯)

এ পূর্ণ দ্বীনের পূর্ণ তা'লীম পূর্ণ নবী সঃ এর সাহচর্যে উমর ও আবু বকররা কতটুকু পেয়েছিলো বা কতটুকু গ্রহণ করেছিলো? রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর উমর হযরত মূসার অবাধ্য ইয়াহুদীদের মতো কিরূপে ভাবে যে, রাসূল সঃ হযরত মূসার মতো ৪০ দিনের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব আনার জন্য চলে গিয়েছেন, কিতাব নিয়ে তিনি পুনঃ আসবেন! তাহলে কি উমরের মতে রাসূল সঃ পূর্ণ ক্বোরআন দিয়ে যান নি! আবার মৃত্যুর পর হযরত মূসার মতো আখেরী নবী সঃও কিতাব আনতে যাবেন, অথচ রাসূল সঃ এর লাশ মোবারক বিদ্যমান! এ সমস্ত কথা-বার্তা ও ধ্যান-ধারণা তো সম্পূর্ণ ক্বোরআনী শিক্ষার পরিপন্থী! পরবর্তীতে রাসূল সঃ এরপর দ্বিতীয় খলিফা হওয়া উমরের জন্য তো কোনো প্রকারেই একথা স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য নয়!? সূরা হুজুরাত বিশেষ ভাবে আবু বকর ও উমরের আল্লাহ্ ও রাসূলের সীমা লংঘন সম্পর্কে নাযিল হওয়ার পরও কি তারা সংশোধিত বা সংযত হয়নি? ক্বোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করলে ইসলাম ও ঈমানের বাকী থাকে কী? আল ক্বোরআনেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে কেয়ামতের দিন রাসূল সঃ বলবেন, ক্বোরআন পরিত্যাগকারীরা তাঁর কেউ নয়। وَقَالَ الرَّسُوْلُ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْ هَذَا الْقُرآنَ مَهْجُوْراً

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর ক্বোরেশীরা একচ্ছত্র ক্ষমতা দখল করে মুসলিম উম্মাহকে ক্বোরেশী অক্বোরেশী, উমাইয়া, হাশেমী ও তারপর সুন্নী, শিয়া বানিয়ে যে আত্মঘাতী সর্বনাশা অভিশাপ সৃষ্টি করে গিয়েছে, তা থেকে মুক্ত না হলে কখনো মুসলিম উম্মার পূনর্জন্ম ও পুনরুত্থান হবে না। তাই বিষপানকারী রোগীর মতো পাকস্থলী ধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে এ তিক্ত সত্য লিখতে বাধ্য হয়েছি। তার চিকিৎসা শুধু আল্-ক্বোরআন দিয়েই হবে। কারণ, আল্লাহ্ই বলে দিয়েছেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ خَساَراً

"মু'মিনদের কল্যাণে একমাত্র ক্বোরআনেই তাদের নিরাময় অবতীর্ণ করেছি। কিন্তু এ ক্বোরআনই যালিমদের নিপাত করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

আরবরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে তাদের সাহিত্য ও পত্র পত্রিকায় বানর, শূকর ও কুকুরের বংশধর বলে উল্লেখ করে নিন্দা করে। কারণ, বনি ইসরাঈলীরা আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাত ও আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মূসার রিসালাতের অবাধ্য হওয়ায় এক সময় আল্লাহ্ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের এক অংশকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করেছিলেন। সূরা বাক্বারার-৬৫, সূরা মায়িদা-৬০ ও আ'রাফের-১৬৬ আয়াতে পরপর বলেন "অতপর আমি বললাম, তোরা ঘৃন্য বানর হয়ে যা, আল্লাহর লা'নত ও গযব দিয়ে তাদের বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ওরা নিষেধ অমান্য করলো, তখন বললাম তোরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যা।"

নবীকুলের আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম আঃ এর সুবাদে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের উপর বহু অনুকম্পা করেন। মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের শিক্ষা ও আদর্শ দানের জন্য আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকে বহু নবী রাসূল পাঠান। একসময় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ বিক্রি ও বিকৃত করে ধন সম্পদ আহরণের পাপে আল্লাহ্ এক শ্রেণীর ইয়াহুদী আলেমদের কুকুর বলে আখ্যায়িত করে বলেন فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، إِنْ تَحْمِلْ عَلَيهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

"তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের মতো, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্বদা লোভে জিহবা বের করে বেড়ায়। এ হলো আমার আয়াতসমূহ অবিশ্বাসকারী জাতির দৃষ্টান্ত। তুমি ঠিক ঠিক তাদের ঘটনা গুলোর বর্ণনা দাও, যাতে তারা চিন্তা করে। আমার আয়াতসমূহ অবিশ্বাসীদের দৃষ্টান্ত কতইনা নিকৃষ্ট"। (সূরা আ'রাফ-১৭৬-১৭৭)

ইয়াহুদী খৃষ্টানরা আল্লাহ্‌র অসম্পূর্ণ দ্বীন ও কিতাব অমান্য করে আল্লাহ্‌র গযবে শূকর, কুকুর ও বানর হয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। আর আরব ও ক্বোরেশীয়রা পূর্ণ ক্বোরআন ও তার বাহক খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর প্রতিষ্ঠিত "উস্ওয়াতুন হাসানাহ্ ও খুলুকুন্ আযীম" ত্যাগ ও বিকৃত করার পর আমরা দীর্ঘ ১৪১২ বছর ধরে তাদের অনুসরণ করার পাপে আমরা বিশ্বের তথা কথিত মুসলমানরা কতো নিকৃষ্ট অভিশপ্ত যে, আমরা আজ সর্বত্র তাদের দাসানুদাস! মক্কা, মদীনাহ্ ও বাইতুল মাক্বদিস্ সব আজ সে বানর, শূকর ও কুকুরদের প্রজন্ম ও তাদের উচ্ছিষ্ট ভূগী আরবদের পদতলে?!

কুকুরকে কুকুর, বানরকে বানর এবং শূকরকে শূকর বলা যেমন গালি নয়, তেমনি কুকুরের পেটে কুকুর, বানরের পেটে বানর, শূকরের পেটে শূকর জন্মানো দোষনীয় নয়। বরং এগুলোকে এদের মাতা পিতা লালন পালন করে এবং এদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে এদের মূল্য ও সমাদর আছে। কিন্তু মানুষকে কুকুর, বানর ও শূকর বলা যেমন অমার্জনীয় অপরাধ,

এবং মানুষের পেটে কখনো কুকুর, বানর ও শূকর সাদৃশ্য কোনো শিশু জন্মানো, দুর্ঘটনা, কলঙ্ক এবং অভিসম্পাত। এ সন্তানকে কখনো পিতা-মাতা পালন করে না এবং এদের কোনো স্থানও মানব সমাজে নেই।

বিশ্বে পাঁচশত কোটি মানব সন্তানের বাস। এরা বাবা আদম ও মা হাওয়ার ঔরস ও গর্ভজাত। এদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা তিনজন মহান নবীর অনুসারী বলে দাবী করে। ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আঃ, খৃস্টানরা হযরত ঈসা আঃ ও মুসলমানরা বা মোহামেডানরা আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ এর উত্তরাধিকারের দাবীদার। মূলে সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর মহান নবীদের দ্বীন ও আদর্শ ত্যাগী সে কুকুর, বানর ও শূকরের মনুষ্যরূপী প্রজন্ম। আচরণ ও কর্মে ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কুকুর, শূকর ও বানর যা করে না, বিশ্বময় মানুষ আজ তা করে এবং তা' বেতার, দূরদর্শন ও পত্র পত্রিকায় কালচার, শিক্ষা ও শিল্পরূপে প্রচার করে।

পশুরা মিথ্যা কথা বলে না, অন্যের অধিকার হরণ করে না, জন্ম ও সৃষ্টিগত সীমা লংঘন করে না, ব্যভিচার করে না বা সমকামিতা করে না। আর মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের ধর্মের দাবীদার ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানরা এগুলো সব করে। তাই আল্লাহ্ ওদের পশুর চেয়েও অধম বলেছেন। (সূরা আরাফ-১৭৯)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

এ তিন নিকৃষ্ট পোষাকী ইতর পশুদের হাত থেকে বিশ্বমানব জাতিকে নবী রাসূলদের আদর্শে চূড়ান্ত পথ প্রদর্শণের জন্য এ বই লেখা। প্রত্যেক নবী রাসূলদের বিদায় প্রাক্কালে স্বার্থপর আহ্বার, হাওয়ারী ও সাহাবারা তাদের বিজয় ও সফলতার ফলকে বিপথে চালিত করার জন্য চার পাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। নবী সঃ দের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই এরা এ কাজ করেছে। মূলতঃ এরা ইব্লিস্ শয়তানের কাজ করে মুত্তাক্বী, নিঃস্বার্থ ও খাঁটি অনুসারিদের দূরে সরিয়ে দেয়। তার পর পুণঃ নতুন নবী এসে পূর্বতন নবীর দ্বীনকে পুনঃ তাওহীদ ও রিসালাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আখেরী নবী সঃ এর পর কোনো নবী আসবেন না। তাই তাঁর মৃত্যুর পর যারা তাঁর বিপ্লবকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে, তারা ইয়াহুদী খৃষ্টান-বানর, শূকর, ও কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট। তার ফলেই প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ আরব অনারব মুসলমানদের নির্বিশেষে জুডু-খৃস্টান চক্রের যাঁতা কলে পিষছেন। "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে উম্মতকে ভেঙ্গে সে দিন আত্মঘাতি সর্বনাশ না করলে আজ বিশ্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের হতো। সে ওয়াদাই আল্লাহ্ আল্ ক্বোরআনে তাঁর আখেরী নবী সঃ এর মাধ্যমে আমাদের সাথে করেছেন। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য করলে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থানকে দৃঢ় করবেন"। (সূরা মুহাম্মাদ-৭) আল্লাহ্র সাহায্যে দৃঢ় হলে কি আজ নাম সর্বস্ব মুসলমান জাতির বর্তমান অবস্থা কল্পনা করা যায়? এ জাতি মুসলিম হলে তো আল্লাহ্, ক্বোরআন ও নবী রাসূলগণ মিথ্যুক প্রমাণিত হয়? নাউযুবিল্লাহ্।

আল্লাহ্, আল্লাহ্র দ্বীন, ক্বোরআন ও নবী রাসূলদের সত্যকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ক্বোরেশী নব্য সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও উপনিবেশবাদের গোলক ধাঁধাঁ থেকে মুক্ত না করলে বিশ্বে ইবলিস্ শয়তানের চূড়ান্ত দাজ্জালীর গ্রাস থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করা সম্ভব হবেনা। বিশ্বমুক্তির এ পথ নির্দেশই ইমাম মাহ্দী ও ঈসা রূহুল্লাহ্র কাঙ্খিত সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস।

আল্লাহ্ বিশ্বনবী খাতামুন্ নাবিয়্যীন ও রাহ্মাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ সঃকে মানব জাতির দূরারোগ্য চারিত্রিক রোগের চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ দিয়ে চিকিৎসক করে সর্বনিকৃষ্ট রোগী জাতির মাঝে প্রেরণ করেছেন। রোগটির নাম শির্ক ও বিদআত, রোগী জাতির নাম আরব জাতি, রোগের জীবাণু ও তার বাহক মক্কার ক্বোরেশরা। চিকিৎসা শাস্ত্র আল্ ক্বোরআন এবং চিকিৎসক শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ।

মানব জাতির নিকৃষ্টতম রোগ শির্ক। প্রমাণ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (সূরা লোকমান-১৩) শির্ক রোগের চিকিৎসা হয় না বলা যায়। إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ আল্লাহ্ কখনো শির্ককে ক্ষমা করবেন না, অন্য রোগ চাইলে ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা-৪৮, ১১৬) নিকৃষ্ট রোগী আরবরা। الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقً

আরবরা কুফর ও মুনাফিকী রোগে নিকৃষ্ট আক্রান্ত (তওবা-৯৮)। ক্বোরেশরা পবিত্রতম ঘর কা'বা দখল করে তাকে ৩৬০ প্রতিমা দিয়ে অপবিত্র করে তার চত্বরে শির্ক করে, হজ্জে আগত মানুষদের মুশরিক বানিয়ে কা'বা ঘরের সম্মান ও সুবাদের আশ্রয়ে নিরাপদে অনুর্বর, অনুৎপাদক উপত্যকায় শীত গ্রীষ্মে বাণিজ্যিক কাফেলার গমনাগমনে ক্ষুধার খাদ্য উপার্জন করতো। তাদের কর্তব্য ছিলো শির্ক না করে কা'বা ঘরের একমাত্র মালিক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা। (সূরা ক্বোরেশ) لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْف সূরা ক্বোরেশ ও সূরা কাফেরুন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্বোরেশদের জন্য চরমপত্র ছিলো, যা তারা মানে নি বলে পরাজিত হয়ে উৎখাত হয়। ঈমানী চিকিৎসা শাস্ত্র আল-ক্বোরআন। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء আমি ক্বোরআন নাযিল করে রোগের নিরাময় ব্যবস্থা দিচ্ছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২) ক্বোরআনী চিকিৎসা শাস্ত্রের চিকিৎসক স্বয়ং রাসূল সঃ। আবু বকর উমররা রোগী। ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর চিকিৎসায় আবু বকর ও উমরসহ রাসূল সঃ কে যারা পেয়ে ঈমান এনেছে, তারা রোগানুযায়ী নিরাময় লাভ করেছে বা তাদের রোগ উপশম হয়েছে। সহজ-আরোগ্য রোগমুক্ত হয়েছে, কঠোর রোগাক্রান্ত রোগীর কিছুটা লাঘব হয়েছে এবং দুরারোগ্য সুস্থ্য হয়নি।

রোগীরা রোগীই। পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত হোক, কিছুটা আরোগ্য প্রাপ্ত হোক বা আংশিক আরোগ্য প্রাপ্ত হোক। রোগীর শরণাপন্ন হয়ে রোগীদের চিকিৎসায় কোনো রোগীর চিকিৎসা হয়না। শুধুমাত্র রোগীর অবস্থা দেখে তার রোগের কারণ ও ধরণ দেখে তা থেকে সতর্ক হয়ে রোগের চিকিৎসায় সাহায্য নেয়া যায়। কিন্তু চিকিৎসা নিতে হবে অবশ্যই ডাক্তার থেকে। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ, তার প্রদত্ত ঔষধ সেবন, তার বলা পথ্য গ্রহণ এবং তার উপদেশ মোতাবেক গ্রহণ ও বর্জনের সাহায্যে রোগীদের আরোগ্য লাভে সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে। হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তাদের শিক্ষক ডাক্তাররা রোগীদের ওয়ার্ডে রুটিন মাফিক রাউন্ড দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। কোনো রোগীর দ্বারা কখনো রোগীর চিকিৎসা করায় না। বরং শিক্ষার্থী ছাত্রদের দ্বারাও হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করা হয়না।

মানসিক ও চারিত্রিক মানব রোগীদের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ্‌ তাঁর নবী রাসূল ডাক্তারদের প্রেরণ করেছেন। সে প্রেরিত চিকিৎসকদের মাঝে বিশ্ব চিকিৎসক খাতামুন্‌ নাবিয়্যিীন, রাহ্‌মাতুল্‌লিল আলামীন মুহাম্মাদ সঃ। কা'বাঘর ও তার বিশ্ব ঐক্যের তাওহীদের কেন্দ্রকে বিভক্তিবাদের মহামারী রোগ শির্ক্‌ ও প্রতিমা পূজা দ্বারা কলুষিত ও অপবিত্রকারী মক্কাবাসী ক্বোরেশী গোত্র। বিশেষ করে ক্বোরেশ বংশের বনী হাশেম ছিলো দুরারোগ্য ব্যাধির রোগী। সে গোত্র থেকে আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাতে ভূমিষ্ট হওয়া এক শিশুকে তার অপবিত্র মুশ্‌রিক পিতামাতা থেকে পবিত্র করণার্থে ইয়াতিম করে আল্লাহ্‌ মুস্তাদ্‌আফ্‌ বারাকাহ্‌ নামের বরকতময় দাসীকে দিয়ে লালন পালন করে মুস্তাদআফ্‌ রূপে বড়ো করেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃ কে দিয়ে বলিয়েছেন ঃ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه و يمجسانه

"প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর শিশুর পিতা মাতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, ও অগ্নী উপাসক বানায়।" (মুসলিম) ক্বোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

"মুশরিক মাত্রই অপবিত্র। তারা এ বছরের পর মক্কায় বাস দুরে থাক, কা'বাহ্‌ ঘরের কাছেই এ বছর থেকে ঘেষতে পারবে না।" এ ঘোষণা আল্লাহ যাকে দিয়ে করাবেন, তাঁকে কি আল্লাহ্‌ অপবিত্র পিতা মাতা দিয়ে পালন করতে পারেন? কস্মিন কালেও না। তাই শিশু মুহাম্মাদকে অপবিত্র মুশ্‌রিক পিতামাতা আব্দুল্লাহ ও আমিনার সংস্পর্শ থেকে পবিত্র করণার্থে জন্মের পূর্বে ও শৈশবে মুক্ত করেন। এবং ইয়াতীম করে বারাকাহ্‌কে দিয়ে সার্বিক লালন পালন করান। আল্লাহ্‌র এ হিকমতের কথাই আল্লাহ্‌ সূরা ওয়াদ্দোহায় বলেন ঃ

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

"তোমাকে কি তোমার প্রতিপালক ইয়াতীম দশায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেনি? পথের দিশাহীন অবস্থায় কি তোমাকে পথের সন্ধান দেয়নি। দারিদ্র্য থেকে অভাবমুক্ত করেনি।"

কোনো কোনো নির্বোধ হয়তো বলতে পারে যে এখানে "তোমাকে আশ্রয় দেয়ার" অর্থ আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালিবের আশ্রয় বুঝায়। কিন্তু সে নির্বোধরাও একটু ভেবে দেখলেই তাদের সম্বিৎ ফিরে পাবে যে, আব্দুল মুত্তালিব ও

আবু তালেবের মতো কা'বাহ ঘর অপবিত্রকারী ৩৬০ মূর্তির ঠাকুর কি করে ভবিষ্যতের কা'বাহ ঘর ও বিশ্ব পবিত্রকারী বিশ্বনবী সঃ এর পালক অভিভাবক হতে পারে? বরং আল্লাহ্ বারাকাহ্র পালিত ছেলে মুহাম্মাদকে দিয়ে রিসালাত পূর্ণ করে তার বিশ্বময় বাস্তবায়নের জন্য তার জঠরের ছেলে উসামাহ্কে দিয়ে জাত গোষ্ঠি নির্বিশেষে বর্ণবাদ নিধনের বর্ণাঢ্য নেতৃত্বের আদর্শ স্থাপন করেন!

বর্ণবাদ নির্মূলের হাসপাতালের চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন আল ক্বোরআন, তার আদর্শ চিকিৎসকও খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সঃ। ক্বোরেশী আবু বকর, আলী, উমর ও উসমান গংরা তাঁর জটিল রোগী। যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সাওবান, সালমান ও খাব্বাব গংরা ছিলো জটিল রোগীদের সংক্রমনের শিকার, এবং মাদীনার সরলমনা সত্যান্বেষী কাফেররা ছিলো মক্কার মুশরিক ও মদীনার ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের গোলক ধাঁধাঁয় নিপতিত।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

"বলে দাও প্রত্যেক ব্যক্তি তার গঠন ও মনন অনুপাতে আমল করে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক, যারা সঠিক পথে চলে, তাদের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম খবর রাখেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

মক্কার মুস্তাকবিরদের মধ্যে থেকে আবু বকর ও তাদের আশারায়ে মুবাশ্শারাদের মতো যারা রাসূল সঃ এর উপর ঈমান আনে, তারা দৃশ্যমান দেব দেবীর মূর্তি পূজা থেকে পবিত্র হয় বটে। কিন্তু অদৃশ্য মনের মুদ্রায় অঙ্কিত গোত্রবাদী রোগ থেকে পূর্ণমুক্ত হতে পারে নি। তাই তারা মক্কাহ বিজয়, কা'বাহ থেকে মূর্তি বিদূরণ ও বিদায় হজ্জের ভাষণের পরও 'আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ' এর মতো মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। ক্বোরেশী চার খলিফা ও ক্বোরেশী দশের চক্রের বেহেশত দখল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের বানোয়াট হাদীসে দেখা যায় যে রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে, "আমার পর পরপর বারজন খলিফা হবে, তারা সবাই ক্বোরেশ বংশোদ্ভুত হবে"।

لا يزال أمر أمتى قائما حتى يمضي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش- الخلفاء من بعدى اثنا عشر كلهن من قريش- لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، ويكون عليكم اثنا عشر خليفة-

আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর শেষ নবী সঃ বিশ্বের মানব জাতির জন্য (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) রহমত স্বরূপ প্রেরীত হয়ে পরে তাঁর মৃত্যুর পর মক্কাহ ও কা'বাহ অপবিত্রকারী ক্বোরেশদের গোত্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে যাবেন, এমন কথা কি কোনো সুস্থ্য মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ ভাবতে পারে? আল্লাহ্ ও ক্বোরআনে বিশ্বাসী কোনো মনুষ্য সন্তান তা কল্পনাও করতে পারেনা।

কথিত নির্লজ্জ মিথ্যা হাদিসগুলো আবার বোখারী ও মুস্লিমরা তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছে। এবং এ দু'টি গ্রন্থকে কথিত ছয়টি সহীহ (?) গ্রন্থের প্রথম দু'টি শুদ্ধতম গ্রন্থ বলে চালানো হয়েছে। বোখারী জাবির ইবনে সামুরা এবং মুসলিম সুফ্য়ান ইব্ন্ উয়াইনাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছে যে রাসূল সঃ নাকি বলেছেন "আমার পর বারোজন খলিফা হবে, তারা সবাই ক্বোরেশ বংশের হবে।" এখন একটু গননা করে দেখা যাক যে এ বারোজন কারা কারা!

(১) আবু বকর (২) উমর (৩) ওসমান (৪) আলী (৫) মুয়াবিয়া (৬) ইয়াযীদ (৭) মুয়াবিয়া ইব্ন্ ইয়াযীদ (দ্বিতীয় মুয়াবিয়া) (৮) মারওয়ান ইব্ন আল হাকাম্ (৯) আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (১০) ওয়ালিদ ইব্ন আব্দুল মালিক (১১) সুলায়মান ইব্নে আব্দুল মালিক (১২) উমর ইবন্ আব্দুল আযীয।

এদের মধ্যে আলী ইব্ন্ আবি তালিব মূলতঃ খলীফা হয়নি। কারণ, ইসলামের নিয়ম হলো কেউ খলিফা হলে সকল মুস্লিমদের তাকে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বায়আত্ হতে হবে। যারা তাকে মানবেনা ও তার হাতে বায়আত হবেনা, তারা বিদ্রোহী রূপে মুর্তাদ ও কাফের হয়ে যাবে।

আলী খলিফা হওয়ার পর মা আয়েশা তাকে মানে নি। তার হাতে বায়আত হওয়া দূরের কথা, মা আয়শা ক্বোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র আদেশ পদদলিত করে আবু বকরের অপর দু'জামাতা তার দুই ভগ্নিপতি তালহা ও যুবায়রকে নিয়ে উষ্ট্রের যুদ্ধে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তালহা ও যুবায়র তথাকথিত আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্যতম দু'জন। তারা দু'জন প্রথমে আলীর হাতে বায়আত হয়ে পরে তা ভঙ্গ করে তাদের শালী মা আয়শাকে নিয়ে তার নেতৃত্বে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়। তন্মধ্যে তালহা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তার শালী মা আয়শাকে বিবাহ করার কথা রাসূলের জীবদ্দশায় ব্যক্ত করলে ক্বোরআনের আয়াত নাযিল হয় যে, নবী করীম সঃ এ স্ত্রীরা ঈমানদারদের মাতৃতুল্য। তাই কখনো নবী সঃ এর মৃত্যুর পর কোনো মুসলিম তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করতে পারবেনা।

মনে এরূপ ধারণা পোষন করাও আল্লাহ্র নিকট মহাপাপপূর্ণ ধৃষ্টতা। (সূরা আহযাব - ৫৩) তালহার এ ঘোষণার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাফসিরে ইব্ন্ কাসির, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে রুহুল মা'আনী ও কুরতুবী প্রভৃতিতে। এটাই হলো ক্বোরআনে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, যার উর্ধ্বে তালহাদের মতো লোকেরাও উঠতে পারে নি। অথচ রাসূল সঃ এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে "তোমরা হামু থেকে বাঁচো" কারণ হামু জাহান্নামের অগ্নীতুল্য। হামু হলো দেবর-ভাবী ও শালী-ভগ্নীপতিদের সম্পর্ক। কারণ বর্তমানেও এ সম্পর্ক সমূহে অধিক অঘটন ঘটে থাকে। মরুভূমির বালুর চরিত্রের আরবদের মাঝে এ সম্পর্কে পাপ আরো জঘন্য ছিলো। তাই আল্লাহ্ ঈমানদার সমাজকে তাঁর নবীর দ্বারা সতর্ক করে দিয়েছেন। নবী রাসূলদের ঘরে এ বিধি-নিষেধকে আরো কড়াকড়ি করেছেন। তা সত্ত্বেও মা আয়েশা তার দু'ভগ্নিপতিকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলো! এই ঘটনা কতই না হৃদয় বিদারক! তার ফলে বিশ হাজার সাহাবী উভয় পক্ষে প্রাণ হারায়!

তালহা, যুবায়র ও আব্দুর রহ্মান ইব্ন আউফ এবং সা'আদ ইব্ন্ আবি ওয়াক্কাসও পরে আলীর হাতে বায়আত হয়নি এবং আলীর খেলাফত মেনে নেয়নি। অপরদিকে আবু সুফ্য়ানের ছেলে মুয়াবিয়া তো আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত খেলাফত উৎখাত করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলো! এদের মধ্যে কোন্ পক্ষ মু'মিন ও কোন্ পক্ষ বিদ্রোহী ছিলো? উভয় হক্বের উপর ছিলো, এ কথা তো ইব্লিস ও তার শাগরেদদের কথা! ইসলামী পুনরুত্থানের সৈনিকদের এর সুস্পষ্ট উত্তর বুঝেই তৈরি হতে হবে। অন্যথা ভাগ্যের পরিবর্তন তো হবার নয়!

আলীর খেলাফত মূলতঃ প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। আলীর খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার মাঝপথেই আলী ঘাতকের হাতে নিহত হলে ক্বোরেশদের তথা কথিত খেলাফত মুয়াবিয়ার গোত্র উমাইয়াদের রাজতন্ত্রের পত্তনে নির্মূল হয়ে যায়। তারপরই রাসূল সঃ এর কথিত কুকুরে কামড়ানো হিংস্র পাশবতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহন করেই ঘোষণা করে, "আমি প্রথম আরব সম্রাট।" সম্রাট ঘোষণার পর কি সে আর ইসলামী খলিফা থাকে?।

সম্রাট মুয়াবিয়া ক্ষমতায় বসেই সাম্রাজ্যের প্রতিটি মসজিদে আলীকে লা'নত করে জুমা, ঈদ ও হজ্জের খোৎবা চালু করে। আলীকে গালমন্দ দিয়ে চালু করা খুৎবা ৪১ হিজরী সন থেকে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে চলে। অর্থাৎ ৯৯ হিজরী পর্যন্ত চালু থাকে। উমর ইবন্ আব্দুল আযীয এসে এ প্রথার পরিবর্তন করে।

৬০ বছর ধরে যাকে খোৎবায় লা'নত ও অভিসম্পাত করা হয়, সে কি খলিফায়ে রাশেদ ছিলো? যারা রাশেদ খলিফাকে গালাগালি দিয়ে ও গালি শুনে নামাজ আদায় করেছিলো, তারা কি আল্লাহ্ ও তাঁর আখেরী নবী সঃ এর অনুসারী মু'মিন ছিলো?! পাঠকবৃন্দ, তোমাদের নিকট এ প্রশ্নের উত্তর চাই। রাসূল সঃ এর নামে রচিত হাদীসের চতুর্থ খলিফা, বা ক্বোরেশী ইমামতের চতুর্থ ব্যক্তির অবস্থান ছিলো এই। উমর ইবন আব্দুল আযীযের অকাল মৃত্যুর পর পুনঃ এ প্রথা চালু হয়। ইমাম আহমাদ্ ইবন্ হাম্বল এসে আলীকে ৪র্থ খলিফা রূপে তালিকা ভুক্ত করে।

তাই মূলতঃ দেখা যায় যে, সুন্নীদের দৃষ্টিতে ক্বোরেশী খেলাফতের তালিকায় ৪র্থ খলিফা মুয়াবিয়া এবং ৫ম খলিফা তার পুত্র ইয়াযিদ এবং ৬ষ্ঠ খলিফা ইয়াযিদের পুত্র মুয়াবিয়া (দ্বিতীয় মুয়াবিয়া), ৭তম খলিফা মারওয়ান, ৮ম খলিফা মারওয়ানের ছেলে আব্দুল মালিক, ৯বম খলিফা আব্দুল মালিকের ছেলে ওয়ালিদ, ১০ম খলিফা সুলাইমান ইবন্ আব্দুল মালিক, ১১তম খলিফা উমর ইবন্ আব্দুল আযীয এবং দ্বাদশ খলিফা দ্বিতীয় ইয়াযিদ।

আল্লাহ্ আল্ ক্বোরআন দিয়ে তাঁর আখেরী নবী সঃ কে পাঠিয়েছিলেন এ ক্বোরেশী বারো খলিফার খেলাফত নামী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য? মুসলিম নয়, ঈমানদার নয়, কোনো সুস্থ্য বিবেকের মানুষও কী এ কথা ভাবতেও পারে?

এবার যাওয়া যাক আরেক প্রসঙ্গে। মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফয়ান তো "রা'সুল কুফর ওয়াল আহযাব", অর্থাৎ ইসলাম ও তার শেষ নবীর রিসালাতী জীবন সংগ্রামের বিরুদ্ধে আরব বিশ্বের সম্মিলিত তৎকালীন কাফের, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের প্রধান নেতা। তার মা হিন্দা। তার সত্যিকারের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে পূর্বে ইংগিত করা হয়েছে। এবার আসা যাক তার পুত্র ইয়াযীদ প্রসঙ্গে।

সুন্নীদের ৪র্থ বা ৫ম খলিফা সম্পর্কে বহুল প্রচারিত মিথ্যা রটানো আছে যে রাসূল সঃ নাকি একদা মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন যে, "তোমার ঔরসে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যে আমার বংশ নির্মূল করবে।" এ কথা শুনে নাকি মুয়াবিয়া প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে জীবনে কখনো সে বিবাহ করবে না। কিন্তু আল্লাহ্ নাকি মুয়াবিয়াকে এমন এক যৌনব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করেছিলেন যে তার জীবন রক্ষার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতে

হয়। তাই সে প্রাণ রক্ষার্থে এক বিগত যৌবনা বন্ধ্যা বুড়ীকে বিয়ে করে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে (?) অলৌকিকভাবে মুয়াবিয়ার ঔরসে বুড়ীর গর্ভে ইয়াযীদের জন্ম হয়।

হারামজাদা ও অবৈধ মানুষদের স্বীকৃত পিতা না থাকলেও অবৈধ জন্মদাতা থাকে। মা'তো থাকেই। কিন্তু মিথ্যা রচনাকারীদের মিথ্যার পিতামাতা কিছুই থাকেনা। তাই তারা বস্ত্র ও পরিধানহীন নির্লজ্জ হয়।

ইসলামী ইতিহাস, আরবী সাহিত্য, আরবী বিশ্বকোষ এমন কি নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধানগুলোর পাতা উল্টালেই দেখা যায় যে, ইয়াযীদের জন্মদাত্রী মা'র নাম মাইসূন। তার বাবার নাম বাহ্‌দালুল্ কাল্‌বী। বর্তমান রিয়াদের আশে পাশে তার বাস ছিলো। একদা এ লোকটি মুয়াবিয়াকে একটি দামী উট উপহার দানের মাধ্যমে তার কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুয়াবিয়ার রাজ দরবারে উপস্থিত হয়। মুয়াবিয়া উপহার গ্রহণ করে। কিন্তু সে জানতে পারে যে, বাহদালের একটি সুন্দরী কিশোরী মেয়ে রয়েছে তার তাঁবুতে। মুয়াবিয়া সে কিশোরীকে চেয়ে বসে তার পিতার কাছে। ঘটে যায় বিপত্তি। কিশোরীটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুয়াবিয়া তাকে তার প্রাসাদে নিয়ে উঠায়। তার পিতা চলে আসলে কিশোরী মাইসূন বিলাপ করে কান্না কাটি আরম্ভ করে দেয়। এক রাতে মুয়াবিয়া শুনতে পায় যে মাইসূন অপমান ও নিন্দাজনক স্বরচিত কবিতা আবৃতি করে বিলাপ করেছে। তা' শুনে মুয়াবিয়া মাইসূনকে তার পিতার নিকট পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তত দিনে অঘটন ঘটে যায়। মুয়াবিয়ার ধর্ষণে মাইসূন গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তার ফলই হলো ক্বোরেশী ইমামতের পঞ্চম খলিফা নামের রাজা আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ ইবন্ মুয়াবিয়া। মাইসূন ইয়াযীদকে প্রসব করার পর তার জন্মদাতা মুয়াবিয়ার নিকট বাহকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। সে রত্নটিই ইয়াযীদ।

আরবী সাহিত্য ও তথা কথিত আরবী খেলাফতের ইতিহাস ছাড়াও এ ঘটনাটি সাহিত্যরূপে আজো সৌদী আরবে পাঠ্য পুস্তকে পড়ানো হয়। আমার ছেলে মেয়েদের পড়ানো আরবী সাহিত্য বইতেও তা' বিদ্যমান। তারপরও বিশ্বে, বিশেষ করে পাক ভারতে সুন্নী সম্প্রদায়ের মাঝে মুয়াবিয়ার বৃদ্ধা বন্ধ্যার পেটে সন্তান লাভের কিস্যা প্রচলিত!

তার পরের খলিফাই হলো মারওয়ান ইব্‌ন্ হাকাম। এ মারওয়ানও তার ঘাতক পিতা মক্কাহ্ বিজয়ের কালে সাধারণ ক্ষমায় প্রাণ ভিক্ষা পেয়ে "তোলাক্বা" নামে বেঁচে যায়। যেমন আবু সুফ্‌য়ান, তাঁর স্ত্রী হিন্দা ও তার পুত্র মুয়াবিয়া প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলো।

মক্কা বিজয়ের পর আব্বাস, আবু সুফ্‌য়ান ও মুয়াবিয়াদের সাথে মারওয়ান এবং তার পিতা হাকামও মদীনায় গিয়ে উঠে। মদীনায় গিয়েই এরা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্‌মূলকে ইঁদুরের মত কাটতে আরম্ভ করে। রাসূল সঃ এর পেছনে এরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে বেড়াতো। রাসূল সঃ এদের ক্রিয়া কলাপ জানতে পেরে এদের "ওয়াযাগাহ্" বা টিকটিকি ও গিরগিটি বলে আখ্যায়িত করে একদা খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "তোমরা কে আছো এ গিরগিটিগুলোকে হত্যা করে আমাকে স্বস্তি দিবে?"

এ খবীস্ পিতা-পুত্র হাকাম ও মারওয়ান ছিলো ওস্‌মানের চাচা ও চাচাতো ভাই। তাই ওস্‌মান চালাকি করে ওদের রক্ষা করে রাসূল সঃ কে অনুরোধ করে মাদীনা থেকে নির্বাসিত করে বাইরে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু উমাইয়া খলিফা ওসমান ক্ষমতায় বসে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রু গিরগিটিদের মদীনায় ফেরৎ আনেনি, বরং তাদের মহা সম্মানে এনে পুনর্বাসিত করে। ওসমান মারওয়ানের নিকট তার মেয়ে বিবাহ দেয়। হাকাম মারা গেলে ওসমান হাকামের কবরের উপর সর্বপ্রথম মাদীনায় স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে।

ইয়াযীদ ক্ষমতায় আরোহণ করে মদীনায় বদরী সাহাবীদের হত্যা করে। দশ হাজার মদীনাবাসীকে নির্মূল করে। মদীনার এক হাজার কুমারী মেয়েদের ধর্ষণে গর্ভবতী করায়। পাঁচ দিনের জন্য মদীনায় "এবাহা" বা ধ্বংস যজ্ঞ চালানোর ঘোষণা দেয় এবং মসজিদে নববীকে তার সৈন্যদের ঘোড়ার আস্তাবলে রূপান্তরিত করে। তারপর মক্কা আক্রমণ করে কা'বাহ ঘরকে পুড়িয়ে দেয়। সর্বশেষে কারবালায় ইমাম হোসাইনকে হত্যা করে তার পরিবারের নারীদের উলঙ্গ করে দামেশ্‌কের রাস্তা প্রদক্ষিণ করায় এবং ঘোষণা করে "এতোদিন পর বদরের প্রতিশোধ নিলাম। আমার পূর্ব পুরুষেরা বেঁচে থাকলে আজ তাদের অন্তর শীতল হতো।"

এ মদ্যপ ও ব্যাভিচারী ইয়াযীদ বাঁদর নিয়ে খেলতো, বাঁদর নিয়ে ঘুমাতো এবং বাঁদরের মাথায় হিরার মুকুট পরাতো এবং ঘোড়ায় চড়ে বাঁদরের সাথে দৌড়ের পাল্লা দিতো। এমনই এক দৌড়ে ঘোড়া থেকে বেকায়দায় পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে এ ক্বোরেশী পঞ্চম খলিফার মৃত্যু ঘটে। এ পাষন্ডের পাপের হিমালয় দেখে তার ছেলে দ্বিতীয় মুয়াবিয়া পাপীষ্ঠ পিতার সিংহাসনে বসতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন ক্বোরেশী বার খলিফার ৬ষ্ঠ রত্ন মারওয়ান আমিরুল মোমেনীন, খলিফাতুল

মুস্‌লিমীন হয়। এ ভাবে এ সিল্‌সিলা চলে।

বিশ্ব মুস্তাদআফদের ইমামতের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত আল্লাহর আখেরী নবী সঃ তাঁর মুস্তাকবির রক্তীয় স্বগোত্রীয়দের দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখানের পর তাদের হাতে অবর্ণনীয় উৎপীড়নে নিরাশ হয়ে তাঁর চিরসঙ্গী সুহৃদ যায়দকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফে গিয়ে নির্যাতনে রক্তাক্ত ও জর্জরীত হয়ে যায়দকে নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক মুনাজাতে বলেন ঃ

اللهم إنى أشكوا إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهوانى على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك غضب على ابالى، غير ان عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه امر الدنيا والآخرة:ان يحل على غضبك، او ينزل بى سخطك. لك العتبى حتى ترضى. ولا حول و لا قوة إلا بك

প্রভুগো, আমি আপনার দরবারে আমার অক্ষমতা নিবেদন করেছি। আমার অযোগ্যতা পেশ করছি । মানুষের উপর আমার প্রভাবহীনতা স্বীকার করছি। আপনি মুস্তাদআফ্‌দের প্রভু। তাই আপনি আমার প্রভু, আমি মুস্তাদআফ্‌। আপনি কার হাতে আমাকে ন্যস্ত করেছেন? আপনি কি আমাকে দুর অজানাদের মাঝে ঠেলে দিচ্ছেন ? না শত্রুর হাতে আমাকে তুলে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার প্রতি বিরাগ না হন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা যাচনা করছি। আপনার সন্তুষ্টির আলোকে, আপনার নূরের দিশায় আমি পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরণ এবং পরকালের সাফল্য চাই। আমার প্রতি কখনো যেনো আপনার ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ না হয়। আপনার দুয়ারে আমার ধর্ণা, যে পর্যন্ত না আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আপনার করুনা ছাড়া আমার আর কোনো শক্তি ও সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমীন৷৷ (বোখারী, মুসলিম, আহমদ)

মুস্তাদআফ্‌ যায়দকে নিয়ে মুস্তাদআফ্‌ রাসূল তাঁর এই অস্তিত্ব নিংড়ানো মুনাজাত করলেন। এরপর ঐ জঙ্গলে খেজুর বাগানে রাসুল সঃ তাঁর আল্লাহ্‌র প্রদত্ত মরমী সাথী যায়দসহ দু'তিন সপ্তাহ এ অবস্থায় কাটালেন। দু'জন মিলে বিশ্ব প্রভূর দরবারে মিনতি জানালেন ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ও করণীয় চেয়ে। এরপর আল্লাহ্‌ এ স্থানে জিব্রাইল আঃ কে পাঠালেন, রাসূল চাইলে সে জনপদকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌ একদল জ্বিন পাঠালেন রাসূল সঃ এর সান্নিধ্যে। মক্কার মুস্তাকবির ক্বোরেশ ও অন্যান্য মানুষ যখন রাসূল সঃ কে নিরাশ ও প্রত্যাখ্যান করলো, তখন থেকে আকাশের ফেরেস্তা ও ধরার জ্বিন সম্প্রদায় রাসূলের সহায়ক ও সাহায্যকারী রূপে জড়ো হতে লাগলো। কই, ক্বোরেশী মুস্তাকবির আবু বকর, ওমর, আলী ও তাদের পরবর্তী আশারায়ে মোবাশ্বারারা তো কেউই এই চরম সংকট ও ক্রান্তি লগ্নে রাসূল সঃ এর সঙ্গী সাথী হয়নি! তাই আল্লাহ্‌র দ্বীনের মুস্তাদআফ রাসূল ও তার মুস্তাদআফ্‌দের সফলতা ও বিজয়ের পর ক্বোরেশী বারো ইমাম ও আশারায়ে মোবাশ্বারারা ও বারো খলিফা কোথা থেকে, কি রূপে গজালো? তাও আবার মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ, মারওয়ানও ইমাম? এর চেয়ে মিথ্যাচারের দৃষ্টান্ত কি কোথাও মিলে? খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর মৃত্যুর পর খোদ ইবলিস্‌ এসে তার স্থান দখল করলে কি এর চেয়ে বেমানান এবং আশ্চর্যের বিষয় হতো ?

পৃথিবীতে যখন সত্যের সৈনিকরা ইবলিসী মুস্তাকবিরির রক্ত, বর্ণ ও গোত্রের বাঁধন ছিন্ন করে, তখনই সাত আসমানের উর্ধ্বের আরশে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। রাসূল সঃ ও তাঁর পরীক্ষিত সঙ্গী যায়দের দোয়া ক্ববুল হলো। রাসূল সঃ এর সাত আ্সমানের মেরাজ হলো।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর উপর মক্কা ও তায়েফবাসীর অত্যচারে জিব্রাঈল আঃ কে পাঠিয়েছিলেন এ বলে যে, আমার রাসূল চাইলে তুমি মক্কার পূর্বের এবং তায়েফের পশ্চিমের পর্বতমালাকে একত্র করে মধ্যকার তায়েফ ও মক্কাহ বাসীকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। কিন্তু বিশ্ব রহমতের নবী তা চাইলেন না। তিনি চাইলেন যে এ জনবসতির বর্তমান বাসিন্দারা যদি ঈমান না আনে, হতে পারে যে এদের পরবর্তী কোনো প্রজন্ম যদি ঈমান আনে! তাই এদের এ যাত্রা ক্ষমা করা যাক।

আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় নবীর ক্ষমায় সে যাত্রা মক্কাহ ও তায়েফবাসীকে প্রাণে বাঁচালেন ঠিকই। কিন্তু মক্কা ও তায়েফবাসি সম্পর্কে তার নবীকে জানালেন যে, "আমি মক্কাহ ও তায়েফবাসিকে অবরোধ করলাম" । মেরাজের সূরার ৬০ নং

আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তোমার প্রতিপালক তোমার শত্রু জনসমষ্ঠিকে ঘিরে ফেলেছে । এবং মেরাজে তোমাকে যা দেখিয়েছি , তা জনগণের জন্য পরীক্ষা বৈ কিছুই নয় এবং ক্বোরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও । এ সব তোমার লোকদের সৎ পথে আসতে ভীতি প্রদর্শণের জন্য । কিন্তু এরা এমন বদ্ যে তারা আরো মহা বিদ্রোহে অগ্রসর হয়েছে।" (বনী ইসরাঈল- ৬০)

মক্কাহ ও তায়েফ বাসীর হঠকারীতায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের উপর এতোই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি মে'রাজে মক্কার ক্বোরেশদের একটি অভিশপ্ত বৃক্ষ রূপে চিহ্নিত করে তার নবীকে দেখান। রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর ক্বোরেশ কর্তৃক খেলাফতের নামে গোত্রীয় সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অপরাধকে লঘু করার জন্য রাসূল কে মেরাজে দেখানো অভিশপ্ত বৃক্ষকে দোজখের যাক্কুম বৃক্ষ বলে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী সম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া মুহাদ্দিস ও মুফাসসিররা বহু মিথ্যা হাদীস ও কিসসা দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে উমাইয়া ও আরববাসীদের আন্তঃকলহে আসল বিড়াল থলে থেকে বের হয়ে পড়ে ।

বনী হাশেমের আব্বাসী ও শিয়ারা রাসূল সঃ কে মে'রাজে দেখানো অভিশপ্ত বৃক্ষকে উমাইয়াদের বুঝিয়ে রাসূল সঃ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। যমখশরী তার তাফ্সীরে কাশ্শাফে ঃ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

তোমার প্রতিপালক জনসমষ্টিকে ঘিরে ফেলেছে অর্থাৎ মক্কার ক্বোরেশদের উল্লেখ করেছে। তাফসীরে আল বোরহানে সা'লাবী সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছে যে, অভিশপ্ত বৃক্ষ বলতে রাসূল সঃ বনী উমাইয়া কে বুঝিয়েছেন। দুররে মনসুর গ্রন্থে ইব্ন্ মারদবীয়াহ মা আয়শা থেকে বর্ণনা করেছে, আয়শা বলেছে, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছি যে ক্বোরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ বলতে মারওয়ান ও তার গোত্র অর্থাৎ বনী উমাইয়া বুঝায় । উক্ত গ্রন্থেই আবার রাযযাক ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আহমদ, বোখারী, হাকেম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, আবী হাতেম ও তিবরানী প্রভৃতি বর্ণনা করেছে যে, মে'রাজে রাসূল সঃ কে দেখানো অভিশপ্ত বৃক্ষ বলতে পূর্ববর্তী নাযিল করা কিতাব সমূহ অমান্যকারী ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মক্কার কাফের ও মুশরিকদের সমান ভাবে বুঝায়। কারণ, ইয়াহুদী খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত মূসা ও ঈসা এবং তাওরাত এবং বাইবেল প্রত্যখানকারী। তদরূপ মক্কার ক্বোরেশীরা হযরত ইব্রাহীম কর্তৃক নির্মিত কা'বাকে দেব-দেবীর পুজার মন্দীরে রূপান্তরিত করে, আল্লাহর শেষ নবীকে প্রত্যাখান করে তাঁকে নির্যাতন করে দেশান্তরীত করেছে।

দোজখ বা জাহান্নাম ভয়ংকর অগ্নীকুন্ড, যাকে বিশেষ পাথরের জালানী দিয়ে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জলিত করে রাখা হয়েছে। তাই জাহান্নামে কোনো বৃক্ষের কল্পনা করা যায় না। ফলে অভিশপ্ত বৃক্ষ বলতে পার্থিব বৃক্ষ ও বৃক্ষতুল্যই বুঝায়। তাই ক্বোরআনে বর্ণিত "শাজারায়ে তাইয়েবাহ" বা উত্তম বৃক্ষ বলতে যেমন পৃথিবীর ঈমানদার মুমিন ও তাদের প্রজন্ম ও অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে, তেমনি "শাজারায়ে খবীসাহ" বা খবিস বৃক্ষ বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের শিক্ষা-দীক্ষাকে অমান্যকারী মানব শ্রেণী ও তাদের অনুগামীদের বুঝানো হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ রাসূল সঃ কে দেখানো অভিশপ্ত বৃক্ষরূপে মক্কাবাসীকে সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ ভাবে ক্বোরেশদেরই বুঝানো হয়েছে। রাসূল সাঃ এর রিসালাত প্রাপ্তি থেকে হিজরত পর্যন্ত মক্কাবাসী, বিশেষ করে ক্বোরেশীরা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেছে, হিজরতের পর যেভাবে বদর, উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধে যা করেছে এবং তার মৃত্যুর পর থেকে ক্বোরেশী উমাইয়া ও আব্বাসীরা আল্লাহর গযবে ধরা পৃষ্ঠ থেকে দামেশক্, বাগদাদ ও স্পেনে নির্মূল হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত যা করেছে, তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ তার রাসূলকে মে'রাজে "শাজারায়ে মালউনাহ" রূপে ক্বোরেশী ও মক্কাবাসিদেরই দেখিয়েছেন। তাই রাসূল সঃ কোনো ক্বোরাইশীকে যুদ্ধের সেনাপতি ও ইমাম নিয়োগ না করে যায়দ ও উসামাহ্দের মতো মক্কাবাসীদের বর্বরতার শিকার মুস্তাদআফ্দেরই বার বার সেনাপতি ও ইমাম নিয়োগ করে যান। কারণ, এ পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সূরা ক্বাসাসের আয়াতে মুস্তাদআফ্দেরই ইমাম ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার আল্লাহ্র অভিপ্রায়ই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে। যা তাঁর আখেরী নবী সঃ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন । খুব গুরুত্বের সাথে স্মরণ করতে ও মনে রাখতে হবে যে, রাসূল সঃ মে'রাজে গমন ও তাতে অভিশপ্ত রূপী বৃক্ষ দেখে ও তার মর্ম বুঝেই মক্কা বাসীদের ত্যাগ করে মদীনায় পরদের মাঝে হিজরত করেন।

"আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এবং "আমার পর বারো জন ইমাম হবে পরস্পর, তারা সবাই হবে ক্বোরেশ গোত্র থেকে" রাসূল সঃ এর নামে বানানো এ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ক্বোরেশী সম্রাজ্যবাদের উমাইয়া সুন্নীরা যেমন মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানকে দিয়ে বারোজন পূর্ণ করেছে, তেমনি বনী হাশেম ও রাসূলের আহলে বাইআতের ধ্বজাধারী শিয়ারা রাসূল সঃ এর জামাতা আলীকে দিয়ে শুরু করে পাল্টা বারজন ইমামের শিয়া শাজারায়ে মালউনার শাখা দাঁড় করিয়ে মিথ্যার ষোলকলা পূর্ণ করেছে। অথচ শিয়াদের প্রথম ইমাম আলী ইব্ন আবি তালেব, আবু বকর ও উমরদের মতো 'আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ' নিয়ে মাতামাতি করেননি। সাক্বীফা বনি সা'আদায় মুস্লিম উম্মাহকে খন্ডিত করে আবু বকর ও উমর ক্বোরেশী খেলাফতের পত্তন করলে আলী শুধু বলেছিলো "তোমরা যে কথা বলে মদীনাবাসী আনসারদের বঞ্চিত করলে, তা'যদি সত্য হয়, তা'হলে আমিই তার বড়ো হক্বদার। কারণ, আমি একাধারে ক্বোরেশী, হাশেমী, আবু তালেবের পুত্র এবং রাসূল সঃ এর প্রিয়তমা কন্যার স্বামী হিসাবে রাসূল সঃ এর জামাতা।"

এ মিথ্যা কথায় মৌন সমর্থন দান না করে আলী যদি সে দিন বলতো "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষায় তাক্বওয়া ব্যতিত অন্য কোনো গোত্র ও রক্তের প্রাধান্য নেই। রাসূল আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর ক্বোরআনের স্পষ্ট আয়াত অনুযায়ী ইবলিস, ইয়াহুদী ও ক্বোরেশী গোত্রবাদী শাজারায়ে মালউনা ভেঙ্গে অক্বোরেইশী মুত্তাক্বী, বয়ষ্ক পুরুষদের মধ্যে রাসূলের প্রতি সর্ব প্রথম ঈমান আনা যায়দকে যেরূপ ক্বোরেশী বনী হাশেমী কৌলিন্যের দিকপাল আমার বড়ো ভাই জাফর ইব্ন আবি তালেব ও আনসারদের দিক পাল আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহার উপর সেনাপতি ও সালাতের ইমাম নিয়োগ করে মউতার যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, সেরূপ রাসূল তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে চুড়ান্তভাবে যায়দের ছেলে রাসূলের প্রেমাস্পদের পুত্র প্রেমাস্পদ উসামাহ্কে আমাদের সবার উপর সেনাপতি ও ইমাম নিয়োগ করে গিয়েছেন। যায়দের অধীনে সহকারী সেনাপতি ছিলো জাফর ও ইব্ন্ রাওয়াহা। এবার উসামাহ্র অধীনে আবু বকর, উমরসহ সকল মুহাজির ও আনসাররা। তাই আমি উসামাহ্র সেনাপতিত্ব ও ইমামতের আনুগত্য ঘোষণা করলাম। যারা বলেছে "তোমাদের মধ্য থেকে উযীর, আমাদের মধ্য থেকে আমীর এবং 'আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ' তারা উম্মতকে বিভক্ত করেছে, আমি তাদের সাথে নেই।"

এ ঘোষণা দিয়ে আলী যদি উসামাহ্র ইমামতিতে রাসূল সঃএর সুন্নাহ অনুযায়ী রাসূলের জানাযা অনুষ্ঠিত করে তাঁকে দাফন করতো, তা হলে রাসূল সঃ এর লাশ মুবারক তিন দিন পর্যন্ত বিনা দাফনে পড়ে থাকতোনা এবং বিনা জানাযায় তিনি দাফন হতেন না।

এরপর যারা আপত্তি তুলতো, তাদের নির্দ্বিধায় উসামাহ্র নেতৃত্বে মাথা উড়িয়ে দিলে "আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" 'আমার পর বার জন ইমাম হবে' তারা সবাই হবে ক্বোরেশ বংশ থেকে, এ ধরণের মিথ্যা সৃষ্টি ও তার প্রচারের সুযোগ হতো না। মুয়াবিয়াহ, ইয়াযীদ ও মারওয়ানরা খলিফা হয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে কালিমার সমুদ্রে ডুবাতে পারতো না।

এ ভুলের জন্য আলীকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। উমাইয়া, আব্বাসী নরপশুদের হাতে আলীর বংশধররা নির্মম হত্যার শিকার হয়েছে এবং সুন্নীদের মতো শিয়া সম্প্রদায়ের জন্ম হয়ে সর্বনাশ হয়েছে। অগভীর প্রকৃতির কোনো নামধারী মুসলমান এই লেখা পড়ে হয়তো ভাববে যে, বিশ্বে এখন মুসলসানদের চরম দুর্দিন যাচ্ছে, এখন মুসলিম জাতির উৎসের ভুল ভ্রান্তি তুলে ধরে লাভ কী, বা প্রয়োজনই বা কী?

উত্তর অতীব সহজ এবং সরল। বিশ্বের মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত ধর্ম ও দ্বীনকে যারা বিকৃত করে নিজেরাও ধ্বংস হলো এবং গোটা মানব জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিলো, তাদের ভ্রান্তিসমূহ তুলে না ধরলে আমরা মুক্তির পথ পাবো কি ভাবে? আমরা কি তাদের ভুলের বোঝা বয়ে বয়েই রোজ কেয়ামতে অভিশপ্ত রূপে আল্লাহর দরবারে দন্ডায়মান হবো? না আমরা ভুল সংশোধন করে মানব জাতিকে কল্যাণের পথ প্রদর্শণ করে সফলতা নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবো, যার ফলে সকল নবী রাসূল আমাদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রতি তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন? তা না হলেতো ইবলিস ও তার শয়তান সঙ্গীরা তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উল্লাস প্রকাশ করে বলবে, "এ আদম ও আদম সন্তানদেরই আমরা সৃষ্টি করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলাম রাব্বুল আলামীন!"

রাসূল সঃ ইন্তেকাল করার সংবাদ পেয়েই যখন মক্কার ক্বোরেশ ও তাদের অনুসারী মক্কাবাসী এমন আনন্দ ও উল্লাসে ফেটে পড়েছিলো যে তাদের ভয়ে রাসূল সঃ এর নিয়োজিত মক্কার গভর্নর ও রাসূলের নায়েব উত্তাব ইবন উসাইদকে প্রাণ রক্ষার্থে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো এবং মক্কায় সপ্তাহ ধরে আযান ও সালাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো!

তখন তা কী প্রমাণ করেছিলো? মক্কাবাসী কি মুস্লিম হয়েছিল, না তোলাক্বা রূপে আত্মসমর্পণ করেছিলো?
পরে ক্বোরেশী আবু বকর খলিফা হওয়ার সংবাদ মক্কায় পৌঁছলে সুহাইল ইবন আমর, ক্বোরেশী নেতৃত্বে বিশ্ব বিজয়ের উজ্জল ভবিষ্যত ও তার সম্ভাব্য ফলাফল বর্ণনা করলে পার্থিব স্বার্থ ও কারণে তারা পুনঃ উত্তাব ইবন উসাইদকে ফেরত এনে লোক দেখানো সালাতের পুনঃ প্রবর্তন করে। সে অবধি আজ পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম, তথা বিশ্ব মানবের পবিত্র মুক্তাঙ্গন মক্কাহ ও মদীনায় আরবরা যা ঘটিয়ে আসছে ও ঘটাচ্ছে, সে সবকে আমরা লুকাচ্ছি বলেই আজ আমাদের এ দশা। ইউরোপ, আমেরিকার ইয়াহুদী খৃস্টানরা তাদের মা-বাপ। আর আমরা? মিসকীন "আজনবী" ভিন দেশী। অথচ আল ক্বোরআনে মক্কাহ ও মাদীনায় সকল মুসলিমের সমান অধিকার ঘোষিত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ (সূরা হজ্জ-২৫)

এখানে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা নির্বোধ ও কলহ প্রিয় লোকদের সাবধান করণার্থে লিখছি। তা'হলো যে, আবু বকর, উমর, আলী ও অন্যান্য তথাকথিত আশারায়ে মুবাশ্শারাদের এক শ্রেণীর সুন্নীরা পূজার পর্যায়ে শ্রদ্ধা করে। আরেক শ্রেণীর শিয়ারা এদের কাফের ও মুর্তাদ বলে, এদের মুসলিম বলেই স্বীকার করেনা। মা আয়শার ব্যক্তি চরিত্রকে এরা ক্ষমার অযোগ্য ভাষায় নিন্দাবাদ করে। এ শুধু অন্যায়ই নয়, অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষা তাদের যে মর্যাদা ও অবস্থান দিয়েছে, তাকে কঠোরভাবে মেনে তাদের ক্রিয়া-কলাপের পর্যালোচনা করে আমাদের সঠিক পথ বের করতে হবে। তাদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করা চলবেনা। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, পর্যালোচনা ও সমালোচনা কখনো এক নয়। পর্যালোচনা সত্যের দিগন্ত খুলে দেয়। আর সমালোচনা ব্যক্তির দৃষ্টিপাতের সাধারণ শক্তিকেও অন্ধ করে দেয়। এ সংকীর্ণতা থেকে আমি সর্বদা আল্লাহর দরবারে পানাহ্ চাই।

আবু বকর, উমর ও আলী এবং তাদের শ্রেণীর লোকেরা তাদের মুদ্রামান ও সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী অবশ্যই ঈমান এনে মুস্লিম হয়েছিলেন। কারণ, আল্লাহ্ যেমন আল ক্বোর্আনে সাধারণ আরব, ক্বোরেশ ও মক্কাবাসী এবং বেদুঈনদের স্বভাব চরিত্র বলে দিয়েছেন, তাঁর শেষ নবীও এদের সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। উহুদের যুদ্ধের পর রাসুল সঃ আবু বকরকে বলেছেন যে তারা তাঁর বিদায়ের পর বিচ্যুত হবে। (মুয়াত্ত্বা মালেক) মা আয়েশা সম্পর্কে তার স্বামী রাসূল সঃ এর বহু সতর্ক ও সাবধান বাণী রয়েছে। মা আয়েশা ও তার ভেদী উমর তনয়া মা হাফ্সা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়নি। তাই তাহরীম নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য সুরা নাযিল করে আল্লাহ তাদের দু'জনকে নূহ্ ও লূত আঃদের অভিশপ্ত স্ত্রীদের সারিতে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ তাদের লাগাম দিয়েছেন। তারা আমাদের প্রাণ-প্রিয় নবীর স্ত্রীরূপে আমাদের শ্রদ্ধেয়া মা বটে, কিন্তু তারা নবী বা ইসলামের জননী নয়। সাবধান!

ঠিক তদ্রূপ আবু বকর ও উমরের বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ফলে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু সূরা হুজুরাত নাযিল করে তাদের ধোলাই করেছেন। কারণ, আল্লাহ্ ক্বোরেশদের সম্পর্কে তাঁর রাসূলের মুখে বার বার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। "অবশ্যই ক্বোরেশরা ইসলামে কাঁচা, কুফরে পাকা, কুফরে মজ্জাগত, ঈমানে নবাগত।" মা আয়েশাকে লক্ষ করে বলেছেন "তোমার জাতি যদি জাহেলিয়াত, কুফর ও শির্কে নিমজ্জিত না হতো।" বোখারী, মুস্লিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইব্ন্ মাজাহ, দারেমী ও মুসনদে আহমদে সম্মিলিত ভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। এগুলো চাপা দেয়ার ফলেই আজ নাম সর্বস্ব মুসলমানদের এ হাল।

এ যাবৎ এ বইতে চাপা দেয়া সত্যের কিছু কিছু ঘটনা উদঘাটন করে তার শুধু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায় ও পৃষ্ঠা সমূহে এ গুলোকে কষ্টি পাথরে প্রমাণ করে কর্মপন্থা ও কর্মসূচী দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

পরবর্তী অধ্যায়ে, আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, ক্বোরআন, তাঁর নবী রাসূলরা, তাদের রক্তীয়জন ও আত্মীয়জন এবং তাদের ঘরের স্ত্রী পরিজনের ও সন্তানদের আচরণ প্রমাণ সূত্র উল্লেখসহ উপস্থাপন করবো। বাংলা ছাড়া আরবী ও ইংরেজী এবং সম্ভব হলে উর্দুতেও এ পুস্তক তৈরী ও বন্টন করার আশা রাখি। তৌফিক আল্লাহ্র হাতে। সাত আসমান ও তার মধ্যস্থিত সকল কিছুর যিনি একমাত্র মালিক, তাঁর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ এবং বিশ্বের বিপন্ন মানবতাকে মুক্তির পথ প্রদর্শণ এ 'শাহাদাতে হক্ক' বা সত্যের স্বাক্ষ্য। ভূ-পৃষ্ঠে কোনো প্রাণী কী বলবে বা গোটা বিশ্ব কী বলবে তার কোনো পিছু টান এ বইতে স্থান পাবেনা। কারণ, তাই শির্ক। আর শির্ক অমার্জণীয় অপরাধ। বিশ্ব আজ শির্কের জঞ্জালে ডোবা। ভাসা না ভাসা তাদের ইচ্ছা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দিক দর্শন

তাওহীদ ও ঈমান
আদম ও ইবলিস্
মুস্তাকবির ও মুস্তাদ্আফ্
রাসূল ও তাঁর অনুসারী
"তাওহীদের ঊর্ধ্বে কোনো ঈমান নেই
রিসালাতের নিচে কোনো দ্বীন নেই"
ঈমানদার নর-নারী
পতিত ও পতিতা নর-নারী
বর্তমান বিশ্বে সংগঠিত মুসলিম নেই
যারা আছে, তারা ইয়াহুদী, খৃষ্টান
অথবা মোহামেডান।

মুসলিম অধ্যুসিত দেশ সমূহে জনগণের শত্রু হলো ঃ

(১) উপনিবেশবাদী কুশিক্ষিত রাজনৈতিক বাটপারদের সরকার

(২) বেতনভুক অস্ত্রধারী সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী

(৩) বেতনভুক ঘুষখোর আমলা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী

(৪) ধর্মব্যবসায়ী হারামখোর পীর, মাদ্রাসা শিক্ষক ও ইমাম।

বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীরা। খাঁটি ঈমানদাররা সকল বর্ণবাদ, গোত্র ও ভাষা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে সেরা আদম সন্তান। বর্ণবাদ, গোত্রবাদ, ভাষাবাদ ও রাষ্ট্রীয় সীমাবাদীরা নিকৃষ্ট দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ প্রজাতি। বিশ্বমানবজাত ও প্রজাতির মধ্যে ধর্মীয় বিচারে আরবরা সর্বযুগে নিকৃষ্ট প্রজাতি ছিলো। আরবরাই বর্তমানে বিশ্বসৃষ্টির ঐক্য, তাওহীদের পথে প্রধান বাধা ও অন্তরায়।
বিশ্বমানবের ঐক্য ও বিশ্ব শান্তির সর্বকালীন পূর্ণ আদর্শ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ। হযরত নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আঃ-দের তিনি যোগফল। মা বারাকাহ্, মা খাদীজাহ্, যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইব্‌ন মাস্‌উদ, সুহাইব, খাব্বাব্, সাওবান, সালমান ও উসামাহ্রা তাঁর আদর্শ পরিবার। তারা ও তাদের অনুসারীরা অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে "রাদি আল্লাহু আনহু"। কোনো গোত্র, বর্ণ ও সময়ের লোকেরা নয়।

আমি কে?
ছোটো মুখে বড়ো কথা?! না, খাঁটি মুখে খাঁটি কথা।
খাঁটি কখনো ছোটো হয় না। সব সময় বড়ো। যেমন আল্লাহ্ বড়ো।
আমার উৎস, পরিচয়, কামাই রোজগার
মা, ভাই, বোন, রক্তীয় ও আত্মীয়রা
বৈবাহিক জীবন ও সন্তান, রাজনৈতিক ও সমাজ জীবন।
আমি বাবা আদমের আদি নিবাস ভারতবর্ষ থেকে "এক আল্লাহ্, এক বিশ্ব ও এক অভিন্ন মানবতার" ডাক দিচ্ছি।
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আমার পতাকা। এ বই তার ইশ্‌তিহার। আল্লাহ! তুমি ক্ববুল করো। আমীন॥

তাওহীদ ও ঈমান

প্রশ্নাতীত সীমাহীন বিশ্বাস হতে হবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো প্রকার শরীক নেই। একমাত্র তিনিই সকল সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উৎস। তিনিই সবের উৎসক, পালক, দাতা ও নাশক। তিনি চাইলেই ভালো-মন্দ সব হয়। তাই প্রত্যেক মানুষকে সে কী হবে, তার কার্যকর পন্থা অবলম্বন করে তাঁর কাছে তা চাইতে হবে। ঈমানদার হবে কি বেঈমান হবে, মুসলিম হবে কি কাফের হবে, সাধু হবে কি অপরাধী হবে, তার প্রত্যেকটির জন্য আমলের মাধ্যমে তাঁর কাছে চাইতে হবে। এরই অর্থ হলো, আল্লাহ্ যাকে চান, তাকে সৎ পথ দেখান, যাকে চান বিপথে ঠেলে দেন। যে কল্যাণের পথে চলতে চায়, তাকে কল্যাণের পথের পাথেয় দেন, যে অকল্যাণের পথিক হতে চায়, তাকে অকল্যাণের পথের পাথেয় সরবরাহ করেন। এমনটি কস্মিন কালেও হবার নয় যে কোনো মানুষ ভালো হতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে ভালো হতে দিবেন না এবং মন্দ হতে চাইলে তাকে মন্দ হতে বাধা দিবেন। প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফলে ভূষিত হবে, এ হলো "মাঁয়্যাশাউ"র অর্থ। আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বে এ নির্ভেজাল অনড় অবিচল বিশ্বাসই তাওহীদ। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর এই তাওহীদের সাক্ষ্য এরূপ দিচ্ছেন ঃ

شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملئكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم-

আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাসকল এবং ন্যায় নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক জ্ঞানী মাত্রই সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (সূরা আল ইমরান- ১৮)

এ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলার বিশ্বাস হলো ঈমান। এ বিশ্বাসে বিশ্বাসীরা হলো মু'মিন। এ বিশ্বাস বাস্তবায়নে উৎসর্গকারীরা মুস্‌লিম। আল্লাহ্‌র এ বিধানটির একমাত্র নাম হলো "আল্ ইসলাম" বা ইসলাম। আদি মানব বাবা আদম আঃ থেকে শুরু করে খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সঃ এ ইসলামের নবী রাসূল ছিলেন। তাঁরা সবাই মুস্‌লিম ছিলেন। নবী রাসূলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সকল মানব ও জ্বীনরা "মুস্তাক্‌বির" ও "তাগুত"। এ তাগুত ও মুস্তাকবিরদের অনুসারীরা নির্বিশেষে "অনুসারী তাগুত" ও মুস্তাকবির।

আল্লাহ্ এক, তাঁর দ্বীন, ইস্‌লাম এক, নবী রাসূলরাও এক। কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এক এবং ইসলামী উম্মাহ বা উম্মত্ও এক। নবী রাসূলরা উম্মতের প্রথম সারি। তাদের পেছনে, সে এক ও অভিন্ন উম্মাহর সারি। "ছাফ্‌ফান কাআন্নাহুম বুনইয়ানুম মারসুস", ইস্পাত ঢালাই প্রাচীর। যারা মূসার দ্বীন, ঈসার দ্বীন ও মুহাম্মাদের দ্বীন এবং তদ্রূপ মূসার উম্মত, ঈসার উম্মত ও মুহাম্মাদী উম্মতের পরিভাষায় বিশ্বাসী, তারা সবাই মুশরিক ও কাফির। কারণ আল্ কোরআনে আল্লাহ ইসলামী উম্মাহকে, ইসলামকে এবং মুস্‌লিম জাতির ইমামকে সর্বক্ষেত্রে এক বচনে বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে মুশরিক ও কাফেরদের ধর্মকে, তাদের জাতি সমূহকে এবং তাদের নেতাদের বহু বচনে উল্লেখ ও চিহ্নিত করেছেন। তাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আদম ও ইবলিস

আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু তাঁর খলীফা স্বরূপ আদম ও বনী আদমকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তাঁর এ ইচ্ছা ফেরেশতাদের সামনে তুলে ধরলেন। ফেরেশতারা তাদের আশঙ্কা ব্যক্ত করলো, "তারা না আবার ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এবং ধরায় রক্তপাতের ধারা চালু করে? আমরা যে আপনার প্রশংসা ও স্তুতি গাই, তা কি যথেষ্ট নয়?"

আল্লাহ্ "ফা-আলুল লিমা ইউরীদ" যা স্থির করেন তা করেনই। তিনি তাঁর অনুগত ফেরেশতাদের সতর্ক করে বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না"। তাই তোমাদের আপত্তি অযাচিত ও অনভিপ্রেত।

আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন। অনুগত ও আজ্ঞাবহ ফেরেশতারা আদম সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কাজকে মেনে নেয়ার প্রতীক রূপে আদমের শুভ কামনা করে আল্লাহ্‌কে সিজদা করলো। ফেরেশতাদের এই সিজদাকে মূর্খ ও নির্বোধরা আদমকে সিজদা করা বলে চালিয়ে দিয়ে তা দেব-দেবী, রাজা-বাদশা ও পীর-পুরোহিতদের সামনে সিজ্‌দার ইবলিসী প্রথার পক্ষে দলীল রূপে দাঁড় করাচ্ছে। আলাহ কোরআনের ভাষায় একটি মাত্র অক্ষর "লাম" দিয়ে তার সকল সম্ভাবনা নির্মূল করে দিয়েছেন وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

অর্থাৎ, স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম "আদমের জন্য" সিজদা করো। লাম দিয়ে আদমের জন্য আল্লাহ্কে সিজদা করা বুঝিয়ে দিলেন। "আদমকে সিজদা করো" তা তিনি বলেন নি। তা' হলে আয়াতটি দাঁড়াতো قلنا للملئكة اسجدو آدم তো لآدم এর লামটি হতো না। তদরূপ মিশরে গিয়ে কূপে ফেলা ও দাসরূপে বিক্রি করা ইউসুফ আঃ কে রাজশক্তিতে আসীন দেখতে পেয়ে ইউসুফ আঃ এর পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা যে সিজ্দা করেছিলো, তা-ও আল্লাহর শুকরানা সিজদাই করেছিলো। ইউসুফ আঃ-কে নয়। সেখানেও فقعوا له ساجدين বলা হয়েছে। "লাহু" দিয়ে সেখানেও "তার জন্য" বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। "তাকে" সিজদা করা হয়েছে উল্লেখ নেই।

আল্লাহ্ তাঁর আদম সৃষ্টিকে মেনে নেয়ার সিজদায় সকল ফেরেশতারা শরীক হলেও ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ অনুকম্পা প্রাপ্ত এক জ্বিন তাতে শরীক হলো না। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায় যে, সে আদম থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই সে আদম সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহ্র আজ্ঞাকে মেনে নিলোনা। বরং সে যুক্তি দাঁড় করাতে ব্যর্থ প্রয়াস পেলো এ বলে যে, أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ,

আমি তার চেয়ে উত্তম, কারণ আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। ইব্লিসের ধৃষ্টতা পূর্ণ উক্তিতে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বললেন, قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

"তুই মর্যাদা থেকে পতিত হ, আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদায় আসীন থেকে তোর অহঙ্কার করার কোনো অধিকার নেই। তুই এখান থেকে নীচদের শ্রেণীতে বের হয়ে যা"। (সূরা আরাফ ১২-১৩)

আল্লাহ্র সৃষ্টি হয়ে তাঁর বিধান লংঘন করে বড়লোকী (?) দাবী করার বিন্দু মাত্র অধিকার কোনো সৃষ্টির নেই। আল্লাহ্ একমাত্র কবীর ও আকবার। তাকাব্বুরী ও অহঙ্কার একমাত্র আল্লাহ্র ভূষণ ও অলঙ্কার। যে কোনো সৃষ্টি, সে জ্বিন হোক কি ইনসান, সৃষ্টির উপাদান, বংশ, গোত্র, বর্ণ, রক্ত বা ভৌগলিক অবস্থান, যে কোনো একটির উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা মাত্রই সে "মুস্তাক্বির" হয়ে যায়। এ মুস্তাকবিরদের আল্লাহ্ আল ক্বোরআনে ৪৮ বার নিন্দা ও ধিক্কার দিয়েছেন। মুস্তাকবির হওয়ার দাবীদার হওয়ার একমাত্র মূল উৎসই হলো ইব্লিসের উপরোল্লিখিত ঘটনা। তাই যারা মুস্তাকবিরির দাবীদার হবে তা তারা সচেতন ভাবে করুক বা অজ্ঞতা বশতঃই করুক, তারা ইবলিসের অনুসারী ও শিষ্য। যারা সচেতনভাবে করে, তারা নিশ্চিত রূপে ইব্লিসের সঙ্গী হয়ে জাহান্নামী। যারা অজ্ঞতা বশত করবে বা করছে, তারা জীবদ্দশায় তওবা করে কাফ্ফারা আদায় করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে হয়তো মুক্তি ও রক্ষার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু মুস্তাকবিরির প্রথা বা সুন্নাত যারা চালু করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে, তারা কেয়ামত পর্যন্ত এ পাপের বোনাস্ পাবে।

ইব্লিস সচেতন মনে মুস্তাকবির হয়েছে। ফলে পতিত হয়ে সে ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহ্র দরবারে ঘোষণা করেছে, "আপনার হাতে গোনা কয়েকজন নিবেদিত দাস ছাড়া বাকী সবাইকে আমি বিপদগামী করে ছাড়বোই"। অর্থাৎ তাদের সে তার মতো মুস্তাকবির বানাবে। (সূরা হিজ্র-৩৯ এবং সূরা সাদ্-৮২) এর ফলে মুস্তাকবির ইবলিসের আর ক্ষমার সম্ভাবনা রইলোনা। ক্বেয়ামত পর্যন্ত সে অভিশপ্ত। তার অনুসারী মুস্তাকবিররা তাদের ইমাম ইবলিসের সাথী রূপে জাহান্নাম পূর্ণ করবে। তা-ই আল্লাহর পূর্ব-ঘোষণা। لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (সাদ্-৮৫)

ইবলিসের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে বাবা আদম সস্ত্রিক ভুল করে আল্লাহ্র প্রদত্ত মর্যাদা থেকে পতিত ও পতিতা হন। পতিত হয়েই তারা দুজন বিনা বাক্যব্যয়ে ভুল স্বীকার করে তওবা করে পতিত ও পতিতাবস্থা থেকে উন্নীত ও উন্নীতা হন। তবে এ উন্নীত হতে তাঁদের বহু মাসুল দিতে হয়।

বাবা আদম ও মা হাওয়ার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা অনুসরণ করে যারা পৃথিবীতে জীবন যাপন করে যাবে, তারা আদর্শ ও অনুকরণীয় মুস্তাদআফের সফল জীবন যাপন করে যাবে। আল্লাহ্ যেরূপ মুস্তাকবিরদের দ্বারা দোজখ পূর্তি করবেন, সেরূপ তিনি মুস্তাদআফ্দের জান্নাতের অধিকারী করবেন। তিনি মুস্তাদআফ্দের প্রতিপালক ও অভিভাবক।

পৃথিবীতে যারা বৈষম্যের দাবীদার হয়েছে, তারাই মানব জাতিকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করেছে। একত্র করা যেমন তাওহীদ, বিভক্ত করা ঠিক তেমন শির্ক। এক ও একত্রকারীরা তাওহীদবাদী। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তকারীরা মুশ্রিক, শির্কবাদী, এদের ক্ষমা নেই।

ইবলিসের পর পৃথিবীতে রাজা নমরূদ ও ফেরআউনরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে “ইস্‌তিকবার” মুস্তাকবিরির প্রচলন করে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য সাম্রাজ্যাবাদীরা তা করে আসছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইয়াহুদীরা এর সূচনা করে। অথচ এরা হযরত মূসা আঃ এর বংশ ও আদর্শের দাবীদার। এরা ধর্মীয় মুস্তাকবিরীর প্রচলন করে নবী-রাসূল ও তাঁদের উপর নির্যাতন চালায়। নবী রাসূল ও তাঁদের মুস্তাদআফ অনুসারীরা সমান ভাবে এদের নিপীড়নের শিকার হয়। তাই আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী সঃ কে পাঠিয়ে মুস্তাদআফদের ইমামত ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ঘোষণা আল কোরআনে দেন। রাসূল সঃ মক্কার মুস্তাকবিরদের ত্যাগ করে তায়েফের উপত্যকায় তাঁর মুস্তাদআফ্ সঙ্গী যায়দকে নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক “মুস্তাদআফ্ জীবনের চূড়ান্ত আর্জি আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। আল্লাহ তা’য়ালা ক্বুবুল করে নবী রাসূলদের শিখর সম্মেলন” ঘটান। তার পরই খাতামুন্ নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সঃ মক্কাহ ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। ক্বোরেশী মুস্তাকবিরদের হাত থেকে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব ও খাব্বাবদের নিয়ে তিনি জড়ো করেন মাদীনার মুস্তাদআফদের দুয়ারে।

শুরু হয় খাতামুন নাবিয়্যীন রাসূলের “রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন” এর যাত্রা। এর পূর্বে সালাতের কোনো জামাত হয়নি মক্কায়। মদীনায় মুস্তাদআফদের নামাজ ও সমাজ জীবনের সূচনা করেন। “যার পিছনে নামাজ, তারই পেছনে সমাজ” হলো ইসলাম, ইসলামী জীবন, ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রীয় কাঠামো। নমরূদ, ফেরআউন, সিজার, খস্‌রু, বাদশা, প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীনীদের পেছনে সমাজ ও রাষ্ট্র, এবং রাব্বাঈ, পোপ ও মোল্লাদের পেছনে নামাজ ও ধর্মকর্মই হলো শির্ক, কুফর ও নাস্তিকতা। ধর্মীয় বর্ণবাদী ইয়াহুদী ও তাদের দোসর খৃষ্টানরা ধর্মীয় মুস্তাকবিরবাদের ধুয়া তোলে। তারা বলে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ আমরা তো হলাম আল্লাহর বেটা ও আল্লাহ্‌র বন্ধু সম্প্রদায়! তাই তারা আল্লাহ্‌র দরবারে “মুস্তাকবির” রূপে চির অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীদ্বয় দাউদ ও ঈসা আঃ দের মুখে এদের বিরুদ্ধে লানতের ঘোষণা দেন সূরা মাঈদার ৭৮ আয়াতে। لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ

তার ফলে বনী ইস্রাঈল আল্লাহ্‌র দ্বীনের ইমামত থেকে চিরতরে বরখাস্ত হয়। বনী ইসমাঈলকে সে দায়িত্ব দেন মক্কায়। তবে কি তিনি মক্কার ক্বোরেশদের হাতে তা ন্যস্ত করেন? কখনই নয়। ওরাতো আল্লাহ্‌র খলীল ইব্রাহীম ও ইসমাঈল জবীহ্ কর্তৃক নির্মিত কা‘বাহকে ৩৬০ মূর্তির মন্দিরে রূপান্তরিত করেছে!

আল্লাহ্‌র বিধান অমোঘ, অলংঘনীয়। তিনি আল্ কোরআনে মুশরিকদের “নাজাস্” অপবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃ দের নিকট থেকে কা‘বাহকে শির্কের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। মক্কার ক্বোরেশরা সে কা’বাহকে শির্ক ও দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে অপবিত্র করেছে। তাই আল্লাহ্ ক্বোরেশদের মধ্য থেকে এক মুশ্‌রিক দম্পতির মাধ্যমে জন্ম দেন এক শিশুর। জন্মের প্রক্রিয়ায়ই তাকে পাক করার বিশেষ ব্যবস্থা নেন আল্লাহ্ স্বয়ং। أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ “তোমাকে ইয়াতীম দশায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিনি? পথের দিশাহীন থেকে পথ প্রদর্শন করিনি? দরিদ্র পেয়ে সাচ্ছন্দ্য দান করিনি?” মাতৃগর্ভে থাকতেই অপবিত্র মুশ্‌রিক পিতা আব্দুল্লাহকে পর্দা থেকে মুছে ফেলেন। মুশ্‌রিক মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ রাখার জন্য বারাকাহ্ নামের প্রতীক বরকতের বন্দোবস্ত পূর্ব থেকেই করে রাখেন। বারাকাহ চরম মুস্তাদআফ্। তা’ না হলে কিরূপে ভবিষ্যতের বিশ্ব মুস্তাদআফদের শেষ নবীর লালন পালন হবে?

জন্ম হলো শিশুর! বারাকাহ্ ধাত্রী। শিশু ৬ বছরে পড়তে না পড়তেই মুশরিক মা’র বিদায়। কারণ ৬ বছর থেকেই না স্কুলিং শুরু! মুশরিক মা থেকে যাতে শির্কের মজ্জাগত অপবিত্রতা স্পর্শ না করে, তার জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া অপরিহার্য ছিলো। তা ছাড়া আমিনা বেঁচে থাকলে সে সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী তার আধা ডজন খানিক স্বামী বদলের বিবাহও অসম্ভব ছিলো না। বরং তাই মক্কাবাসীর নিয়ম ছিলো! কুলীন হিন্দারাতো আরেক ধরণের ধান্দার ইতিহাস সৃষ্টিকারী ছিলো। ক্বোরেশী বনেদিবাদের জন্মই তাই। মায়ের এতো স্বামীর ঘরে স্থান বদল শুরু হলে শিশু মুহাম্মাদের ভালো হতো? মোটেই না। বরং সর্বনাশের সম্ভাবনা ছিলো নিরানব্বই ভাগ।

বাঁদী দাসীরাও তাদের মুস্তাক্‌বির মনিব স্ত্রীদের মতো যৌন মাংসের ফেরী করেই বেড়াতো বলে জানা যায়। তাই বিশ্বকে পবিত্র করার শিশুকে সার্বক্ষনিক লালন পালনের জন্য এমন এক বরকতময় আল্লাহর দাসীর ব্যবস্থা করেন,

যার জীবনে কলঙ্কের একটি ফোটাও পাওয়া যায় না। শিশুটি ২৫ বছরের যুবক হয়ে নিজে বিবাহ করে তার পালক মাকে জোর করে, আদর করে, স্ত্রীকে দিয়ে বুঝিয়ে বিবাহ দিলে দু'স্বামীর ঘরে দুটি অসাধারণ সন্তান জন্ম নেয় তাঁর পেটে। আইমান ও উসামাহ! এরা কারা? মক্কাহ বিজয়ের সময় রাসূল সঃ তাঁর মা বারাকাহ, তাঁর দু'সন্তান আইমান ও উসামাকে নিয়ে আসেন। মক্কাহ বিজয়ের পর কা'বাহ ঘরে প্রবেশ করেন রাসূল সঃ উসামাহকে সংগে নিয়ে। বেলালকে উঠান কা'বার উপর। ধ্বনিত হয় الله أكبر، الله أكبر আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু মহান, আল্লাহ্ মহান!

মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ বিজয়ের অভিযান। সে অভিযানেও বারাকাহ্, আইমান ও উসামাহ্ সঙ্গী। আবু বকর ও উমরসহ পনের হাজার সৈন্যের বহর। যুদ্ধ শুরু হতেই শত্রুর অতর্কিত আক্রমনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সবাই রাসূল সঃকে ফেলে উধাও। সূরা তওবাতে এ পলায়নকে এমন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে সূরার অপর নাম হয়েছে "ফাদেহাহ্" অর্থাৎ "গোমর ফাঁক"। সত্যিই তাই। রেওয়ায়াত সমূহে দেখা যায় যে রাসূল ব্যতীত তিন জন বাদে সবাই চম্পট। কোনো রেওয়া'য়াতে পাওয়া যায় পাঁচ জন, সাত জন ও নয় জন। কোথাও দশ বারো জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সব চেয়ে বিস্মিত হওয়ার ব্যাপার যেটি, তা হলো যে, প্রথম তিন জনের নাম বারাকাহ্, আইমান ও উসামাহ। তার মধ্যে আরো তাক লাগানো ঘটনা হলো যে হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম শহীদ আইমান। রাসূল সঃ শহীদ আইমানের মৃত দেহ নিজে কোলে করে বহন করে এনে বলেন, "আম্মা, তোমার আইমান শহীদ হয়েছে"। উত্তর আসে "আলহামদু লিল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্ আমার এক সন্তানকে ক্বুবুল করেছেন। আমার তো আরো দুটি সন্তান রয়েছে।"

এ বারাকাহ্কে দিয়ে রাসূল সঃ এর পালন কি সাধারণ ঘটনা! বারাকাহ্র স্বামী যায়দ। একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার নাম আল্লাহ্ ক্বোরআনে নিয়েছেন। এ সে যায়দ যে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর রিসালাতের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে। মক্কার মুস্তাকবির ও তাদের ভাড়া করা মুহাদ্দিস ও বর্ণনাকারীরা যায়দের ঈমান আনাকে খাটো করে দেখানোর জন্য উল্লেখ করেছে যে, "ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়দ সর্ব প্রথম ঈমান এনেছে"। কিন্তু আল্লাহ্ ওদের মুখে চুন-কালি দিয়েছেন ক্বোরআনে "আন্‌আ'মাল্লাহু" অর্থাৎ যাকে পুরস্কৃত করেছেন বলে।

এ যায়দই সে সিদ্দীক যে সর্বপ্রথম ঈমান এনে সিদ্দীক হয়েছে। পালকমাতা বারাকাহ্র স্বামী হয়েছে। উসামাহর জন্মদাতা হয়েছে। পরাশক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহাদাতের অগ্রীম আভাস পেয়েও প্রধান সেনাপতি রূপে যুদ্ধে গিয়ে শাহাদাত বরণ করে সিদ্দীক রূপে মৃত্যুবরণ করেছে।

রাসূল সঃ-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সাজানো, তাঁর হাতে বাঁধা পতাকা বহনকারী, তাঁর তৈরী করা সর্ববৃহৎ সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও ইমাম, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও অন্যান্য মুস্তাকবির ক্বোরেশী, অক্বোরেশীরা যার অধীনে সাধারণ সিপাহী ছিলো, সে উসামাহ্র মা বারাকাহ্। যায়দ তার পিতা। এ বারাকাহ কি সাধারণ দাসী? এমন দাসীর সৌভাগ্যের উপর আসমান যমীন ক্বোরবান!

কেউ হয়ত এখানে প্রশ্ন তুলতে পারে, আবু বকর ও উমর গংরা কি করে মুস্তাকবির হলো? উত্তর হলো যে এরা ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা বংশীয় গোত্রবাদী জাহিলিয়্যাত পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারে নি। তাই তারা রাসূল সঃ কর্তৃক যায়দ ও উসামাহ্কে তাদের সবার উপর সেনাপতি নিয়োগকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারেনি। রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আবু বকর, উমর ও উসমান কেউই মৃত্যু এড়াতে নিজেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। অথচ এটাই ক্বোরআন কর্তৃক আদিষ্ট, রাসূল সঃ কর্তৃক পালিত এবং রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বার বার আদেশকৃত কাজ ও একমাত্র কর্তব্য ছিলো। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনে নিজেদের গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দেয়, তারাই নির্বিশেষে হতভাগা মুস্তাকবির। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। নির্দ্বিধায় সন্তুষ্ট চিত্তে ও বিনা বাক্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ, বিশ্বাস ও পালনের দ্বারা সিদ্দীক ও ফারুক হতে হয়। তাঁদের আদেশ নিষেধে প্রশ্ন তুলে তা কখনো অর্জন করা যায় না। এ নিয়ম ক্বিয়ামত পর্যন্ত চালু। কালের সীমায় আবদ্ধ নয়।

আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত করার মানসে তাঁর রাসূল সঃ-কে ক্বোরেশী শির্কের নাপাকী থেকে বিধৌত করার জন্য যে বারাকাহকে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি বিশ্বের ইবলিসী বর্ণবাদের জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত গোটা বিশ্বাবাসীর দৃষ্টিতে দাসী হলেও, তাঁর পালিত ছেলে মুহাম্মাদ সঃ, তার জঠনের সন্তান আইমান ও উসামাহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের উপর বিশ্বাসী সকল আদম সন্তানদের চোখের মনি ও বিশ্বের সেরা গর্বের ধন।

এ মানদন্ডের বাইরে নমরূদ, ফেরআউন, ইয়াহুদী, ক্বোরেশী, আরবী, আজমী, ইরানী, তুরানী, তুর্কী, হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ইব্লিসের ঘোষিত "ইস্তিক্বার" ও এর অনুসারীরা সর্বকালের, সর্বস্থানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে পতিত মানব ও পতিতা মানবী। এরাই ক্বোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র দেয়া পরিভাষার "এদের অন্তর সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং এরা মুস্তাকবিরুন"। (সূরা নাহ্ল-২২) قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ এদের পুরুষ শ্রেণী পতিত এবং এদের নারী শ্রেণী পতিতা। আমাদের প্রচলিত পতিতালয় বাসিনীদের আমরা পতিতা বলে থাকি। মূলতঃ তারা পতিতা নয়। এরা সমাজ দখলকারী সমাজপতি ও তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারীতার শিকার মাত্র। এ প্রতিষ্ঠিত পতিত ও পতিতাদের উৎখাতের বিশ্ব আন্দোলনই হবে মুস্তাদআফ্দের আন্দোলন। তারই আদর্শ আল্লাহ্ স্থাপন করেছেন তাঁর নবীর দ্বারা বারাকাহ, যায়দ, বেলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহদের বর্ণাঢ্য জামাত দাঁড় করে।

অপর দিকে উহুদের যুদ্ধে রাসূল সঃ-এর নির্দেশ অমান্যকারী, হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সঃ-কে ফেলে পলায়নকারী, রাসূল সঃ কর্তৃক যায়দ ও উসামাহকে সেনাপতি নিয়োগের বিরুদ্ধাচারণকারী, রাসূলের অন্তিম শয্যায় বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁর নিয়োগকৃত উসামার নেতৃত্বে যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, রাসূল সঃ-এর চোখ বুজার সঙ্গে সঙ্গেই যারা ক্বোরেশী অক্বোরেশী বলে ইসলামী উম্মাহ্কে খন্ডিত করেছে, তিন দিন পর্যন্ত রাসূল সঃ-এর মৃতদেহকে দাফন না করে ক্ষমতা দখলের বিবাদ করেছে, রাসূল সঃ-এর শিক্ষা ও আদেশানুযায়ী জানাযা আদায় না করেই তাঁকে দাফনকারী এবং আল্লাহ্র গযবে নিঃশেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অক্বোরেশী ব্যক্তিকে মুস্লিম উম্মাহর খলিফা ও ইমাম হতে আপত্তি উত্থাপনকারী বর্ণবাদী ক্বোরেশী আরবদের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণকে আল-ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর আদর্শে চুলচেরা মূল্যায়ন করেই বিশ্বে তাওহীদের পুনরুত্থান ঘটাতে হবে। দেড় হাজার বছর অতীত হলেও চাপা দেওয়া সত্যকে চেপে রেখে তাওহীদী বিপ্লবের নামে মিথ্যা ও বাতিলের পতাকা পুনরোত্তলন করা চলবেনা।

ঠিক তদ্রূপ নবী রাসূল সঃ-দের স্ত্রী কন্যাদের মধ্যে যারা মা হাওয়ার তওবার পরের জীবনাদর্শের অনুসারী ছিলেন, তাদের, যারা ইব্লিসের প্ররোচনায় বিপথগামী হয়েছে, তাদের থেকে পৃথক করতে হবে। তবেই মু'মিনদের ঘর ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী হবে।

নবী-রাসূলগণ যখনই তাঁদের সংগ্রামে সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হন, তখনই আজীবন তাঁদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের মধ্য থেকে কিছু বর্ণচোর স্বার্থান্বেষী প্রাণী নিজেদের বেষ্টনী তৈরী করে অপেক্ষামান থাকে। নবীরা ইন্তেকাল করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পূর্ব কল্পিত নামাবলী পরে অতি নবী-প্রীতি দেখিয়ে সরল ঈমানদারদের প্রতারিত করে। হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আঃ-দের অনুপস্থিতির পর আমরা যা দেখতে পাই, তা হলো, আখেরী নবী সঃ-এর বিশ্বজয়ের প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে ভিন্নখাত ও ভিন্ন পথে পরিচালিত করার চক্রান্ত তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি তা টের পেয়েই তাঁর জীবনের শেষ দিন গুলোতে ভীষণভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন। "আমার বিদায়ের পর তোমরা সন্দেহাতীতভাবে আদ, সামূদ, আইকা, তুব্বা ও ইয়াহুদী নাসারাদের অনুসারী হবেই হবে" বলে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, মুয়াত্তা, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি বর্ণিত রাসূল সঃ-এর ব্যক্ত আশংকাই ঈমানদার মাত্রের জন্য প্রমাণ স্বরূপ যথেষ্ট। কারণ, আল-ক্বোরআন তার সত্যায়ন করে।

এখানে অতীব গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে আখেরী নবী সঃ তাঁর আশঙ্কা তাঁর সমসাময়িক কথিত সাহাবীদের ব্যাপারেই করেছেন। পরবর্তীদের ব্যাপারে মোটেও নয়। কারণ, প্রত্যেক নবী ও সংস্কারকের দায়িত্ব তাঁর সমসাময়িকদের সতর্ক করা। এটাই মূখ্য কাজ। পরবর্তীদের ব্যাপার সম্পূর্ণ গৌণ। এ কথা পাঠকদের বুঝতে ও স্মরণ রাখতে হবে। অন্যথা ভুলে পথে পা পড়ে বিপথগামী হয়ে যাবে।

আখেরী নবী, রাসূল সঃ-এর জীবন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি মানবজাতির সর্বশেষ রাসূল ও পথ প্রদর্শক। তাঁর আদর্শকে যারা, যে যুগেই নিখুঁত ভাবে ধারণ করবে, তারা কালজয়ী শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান। হোক তারা নর বা নারী। তাঁকে যারা চক্র স্বার্থে বরণ ও ধারণ করবে, তারা সর্ব নিকৃষ্ট মানব মানবী। হোকনা তারা তাঁর স্ত্রী, কন্যা, শ্বশুর, জামাতা, বা তথা কথিত সাহাবা, তাবেঈ!

নবীদের সন্তানদের মাঝে ইসমাঈল, ইস্হাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ এবং যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া আঃ রা সর্বকালের আদর্শ সন্তান। মা হাজেরা, সারা, মূসা আঃ এর মাতা, তাঁর বোন, হযরত ঈসা আঃ-এর মাতা মারইয়াম ও আখেরী

নবী সঃ এর আদর্শ স্ত্রী খাদীজাহ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্ত্রী, মাতা ও ভগ্নী। ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্‌ত্‌ মুযাহিম কাফির সমাজের অন্ধকারে নিমজ্জিত নারীদের মুক্তির দিশা।
অপর দিকে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ আঃ-এর স্ত্রী ও পুত্র, লূত আঃ-এর স্ত্রী এবং আখেরী নবী সঃ-এর ঘরে নূহ ও লূত আঃ-দের স্ত্রীদের সাদৃশ্য বলে আল-ক্বারআনে বর্ণিত চিহ্নিতরা এবং তাদের অনুসারী মুস্‌লিম ও মু'মিনদের ঘরের নারীরা সর্ব নিকৃষ্ট দুর্ভাগা। কারণ তারা পূর্ণ দ্বীনের প্রত্যাখানকারী। তাই সাধু সাবধান। মানবতা আজ বিপর্যয়ের শেষ সিড়িতে অবস্থান করছে। তাই তাকে ফেরৎ মুক্তির পথ দেখাতে হলে আমাদের সম্পূর্ণ "এবাউট টার্ন" করতে হবে। অন্যথা এক পা এগুলেই জাহান্নাম। (সূরা ইব্রাহীম-২৮,২৯,৩০)

রাসূল ও রিসালাত

মুস্তাকবির ইবলিস ও তার সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের চক্রান্ত থেকে মুস্তাদআফ্‌ আদম সন্তানদের "সিরাতুল মুস্তাক্বীম" প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। এ নবী রাসূলদের যারা ইবলিসের গোত্রবাদী অহমিকা সম্পূর্ণরুপে তাগ করে বাবা আদমের মতো "রাব্বানা জ্বালামনা" বলে বিধৌত হয়ে ঈমান এনে সকল রক্তের বাঁধনের রক্তীয়তা ত্যাগ করে শুধু আত্মার বাঁধনের আত্মীয়তায় ভাই ভাই হয়, তখনই তারা মুস্‌লিম হয়। তাই আল্লাহ্‌ ক্বোরআনে "একমাত্র মু'মিনরা ভাই" বলেছেন। মায়ের পেটের ভাইদের ভাই বলেন নি (সূরা হুজুরাত-১০)। ঈমান আনার পর শুধু মাত্র ঈমানী ভাইদের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে হবে। ঈমানের তুলায় কুফরের দিকে ঝুঁকা মাত্রই পিতা ও মাতা এবং ভাই বোনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। যারা তা করবে না, তারা "যালিম"। (সূরা তওবা-২৩)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
সকল নবী রাসূল রিসালাতের দাওয়াত দেয়া মাত্র তাতে ক্বায়েমী গোত্রস্বার্থবাদে সর্ব প্রথম আঘাত লাগে। তাই নবীদের গোত্রীয়রা নবীদের প্রাণের শত্রু হয়ে যায়। বিশেষ করে মা বাপ ও রক্তীয় ভাইরা রাসূলদের রিসালাত বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেছে বলে আল্‌ ক্বোরআনে উল্লেখ রয়েছে।
তাওহীদ ও ঈমানের আসন্ন আন্দোলনে যারা তাগুত ত্যাগ করে শরীক হবে, তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, পৃথিবীর সকল কাফিররা নবীদের সন্তান। সকল বেশ্যা নারীরা মা হাওয়ার সন্তান। অধিকাংশ নবী রাসূল কাফিরদের ঔরসজাত সন্তান । হাতে গোনা কয়েকজন নবী রাসূল মাত্র নবীদের ঔরসজাত নবী রাসূল। তাই প্রায় সকল নবী রাসূলকেই তাঁদের নষ্ট পিতামাতা ও ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, অর্থাৎ রক্তীয়তা কর্তন করে তাওহীদের ডাক দিতে হয়েছে। তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে পতিত হলেই মানুষ ইব্‌লিসের মতো অভিশপ্ত হয়ে যায়। এ মানুষ নারী-পুরুষ জোড়া বেঁধে পতিত ও পতিতার সংসার করে পতিত ও পতিতার বংশ বৃদ্ধি করে। সূরা হুদ ও ইউনুস পাঠে দেখা যায় যে হযরত সালিহ, হুদ্‌, লূত ও শুয়াইব আঃ-দের তাঁদের ভাইরা কী-ইনা নিপীড়ন করেছিলো। খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁর ক্বোরেশী রক্তীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশী বেশী সূরা ইউনুস ও হুদ পড়তেন এবং বলতেন, এদুটি সূরা আমাকে বুড়িয়ে দিয়েছে। তাই রক্তীয়তার সম্পর্ক কেটেই ঈমান ও ইস্‌লামের আত্মীয়তার জন্ম হয়। সর্ব প্রথম সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এ হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ।
নবী রাসূলদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাঁর পাঁচ দাসের নাম বিশেষ ভাবে আল্‌ ক্বোরআনে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, ও মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম। নূহ আঃ তাঁর স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করেছেন, ইব্রাহীম আঃ তাঁর পিতা মাতা ত্যাগ করেছেন, মূসা আঃ তাঁর পালন কর্তা ফিরআউন ও তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন ও ঈসা আঃ বনী ইসরাঈলের রক্তের মিথ্যা দাবীকে অসার প্রমান করনার্থে "রূহুল্লাহ" রূপে আবির্ভূত হন। আর আখেরী নবী? সারা বিশ্বের সকল শির্ক, কুফর ও গোত্রীয় বর্ণবাদ উৎখাতের নিমিত্তে তিনি "রাহমাতুল্লিল আলামীন" নামে ও রূপে প্রেরীত হন। তাঁর জন্ম ভূ-পৃষ্ঠের সর্ব প্রথম তাওহীদের কেন্দ্র মক্কার কাবাহ বা বাইতুল্লাহের নগরীতে। আর এ কা'বাহ ঘর ও মক্কাকে অপবিত্র ও মানবতাকে অবমাননাকারী দাস বেচা-কেনা করার বাজারে রূপান্তরকারী হলো ক্বোরেশ ও তাদের বর্বর নেতৃত্ব।

আল্লাহ্‌র কালিমা, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হলো "কালিমাতুন তাইয়্যেবাহ্‌" অর্থাৎ এমন পবিত্র বাক্য যা তার বিশ্বাসীকে পবিত্র করে। এ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ্‌কে আল্লাহ্‌ তায়ালা ক্বোরআনে সুরা ইব্রাহীমের ২৪ নং আয়াতে "শাজারাতুন তাইয়্যেবাতুন" অর্থাৎ পবিত্র বৃক্ষ বলে নামকরণ করেছেন। যে বা যারা এ কালিমাহ পড়ে তার ধারক ও বাহক হয়, তারা সে বৃক্ষের ন্যায় পবিত্র। তাদের পরিবার পরিজন সে বৃক্ষের শাখা তুল্য। পৃথিবীতে তাদের কর্ম উক্ত বৃক্ষের ফলের সদৃশ। (সূরা ইব্রাহীম-২৫)

অপর দিকে শির্ক হলো অপবিত্রতা। শির্কের ধারক-বাহকরা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অপবিত্র। মুশরিকরা অপবিত্র বৈ কিছু নয় (সূরা তওবা-২৮)। ধরা পৃষ্ঠে মুশ্‌রিকদের অস্তিত্ব অপবিত্র বৃক্ষের ন্যায়। তাদের স্ত্রী পরিজন ঐ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। তাদের ক্রিয়া কলাপ ঐ বৃক্ষের বিষ ফল স্বরূপ।

আল্লাহ্‌ তাঁর আখেরী নবীকে শৈশবে অনাথ করে বারাকাহর মতো এক বিশেষ পালিকা দিয়ে লালন পালন করান। রিসালাত প্রদানের পূর্বে খাদীজার মতো স্ত্রী জুটান এবং যায়দের মতো মরমী সঙ্গী ও সহচর দান করেন। রিসালাত প্রাপ্ত হলেন মুহাম্মাদ সঃ। মক্কাবাসী মুস্তাকবির। তা'না হলে কী মানব সাম্যের কা'বার নগরীকে দাসের হাট বানায়? তাওহীদের ঘরকে ৩৬০ দেব-দেবীর মঠ-মন্দিরে রূপান্তরীত করে? এদের পূর্বে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহের বংশের দাবিদার ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাঁর আবাদ করা ভূখন্ডকে শির্ক ও গোত্রবাদ দিয়ে অপবিত্র করে। তারা আদম ও ইব্রাহীম আঃ-দের "মুস্তাদ্‌আফ্‌" বৈশিষ্ট পরিত্যাগ করে ইবলিসের মুস্তাকবিরীর ধারক বাহক হয়। শাজারায়ে তাইয়্যেবার লোকেরা শাজারায়ে খাবীসাহ্‌ অর্থাৎ অপবিত্র বৃক্ষের রূপ ধারণ করে।

মুহাম্মাদ খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন সঃ চূড়ান্ত তাওহীদের ঘোষণা দেন। "আমি আদম সন্তান, আল্লাহ্‌র দাস ও আল্লাহ্‌র রাসূল"। মক্কার মুস্তাক্‌বির ক্বোরেশ ও তাদের প্রজারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। কা'বাহ দখল করে তাদের শীত গ্রীষ্মের নিরাপদ ব্যবসা, কাফেলা লুট ও হজ্বের নামে মানুষের ধন সম্পদ ভোগের একচেটিয়া স্বার্থের বিরুদ্ধে অশনি সংকেত, মৃত্যু ধ্বনী?

মুস্তাদআফ্‌ যায়দ সর্ব প্রথম বললো, "আশহাদু আন্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। ঘরে মা খাদীজা ও বারাকাহ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়ে মক্কার মুস্তাকবিরদের মাঝে মস্তাদআফ উম্মার ভিত্তি প্রস্তর রাখলেন।

যাত্রা শুরু হলো। মক্কার যালেমদের নিপীড়নে নিষ্পেষিত দাস-দাসী মুস্তাদআফরা সাত আসমানের মুক্তির দিশা পেলো। ইয়াসির, সুমাইয়া, আম্মার, বিলাল, খাব্বাব, সুহাইব, ইব্‌ন উম্মে আবদ ও অন্যান্য মুস্তাদআফ্‌রা সুর তুললো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্‌ নেই। ক্বোরেশদের মাঝে ও বনী হাশেম ও বনী উমাইয়ার আধিপত্যবাদের শিকার কোনঠাসা বনী তামীম ও বনী আদির আবু বকর, তালহা ও উমর ইবন আল খাত্তাবের মতো কিছু মুস্তাকবিররাও তাওহীদের আন্দোলনে শরীক হলো। তবে তা ক্বোরেশী ধ্যান ধারণা বহাল রেখেই। কারণ এরাই রাসূল সঃ-এর মৃত্যুর পর "আল আইম্মাতু মিন্‌ কুরাইশে" বলে বর্ণাঢ্য উম্মার সকল বর্ণ মুছে ক্বোরেশী বর্ণ পুনর্বহাল করলো। এখানে একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে এবং স্মরণ রাখতে হবে যে, "আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ" বলা হয়েছে। "আল্‌ আইম্মাতু মিনাল মুহাজিরীন" ও সুকৌশলে বলা হয়নি। অর্থাৎ মুহাজিরদের মধ্য থেকে নেতা বা ইমাম হতে হবে, সে সম্ভাবনাকেও কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ মুহাজিরদের মাঝে যে প্রথম সারিতে যায়দ, বিলাল, আম্মার ও সুহাইবদের পাল্লা ভারী!

খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ-এর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ধ্বনীতে লাত, মানত, উযযা ও অপরাপর ৩৬০টি মূর্তির পূজারী ও তাদের ঠাকুর ক্বোরেশের বিরোধ ও প্রতিরোধ চরমে উঠলো। মুস্তাদআফ্‌দের প্রভু আল্লাহ্‌ও মুস্তাকবির ক্বোরেশদের চরমপত্র দিলেন। "শোন ক্বোরেশরা, শীত-গ্রীষ্মে তোমাদের নিরাপদ ব্যবসা বাণিজ্যের কায়েমী স্বার্থ বহাল রাখতে চাইলে তোমাদের দেব-দেবীদের বিসর্জন দিয়ে এ কা'বার একমাত্র কর্তার কর্তৃত্ব মানতে হবে। কারণ তিনিই তোমাদের কা'বার সুবাদে নিরাপত্তা দিয়ে তোমাদের ক্ষুধার অন্ন যোগান দেন। তা'না হলে তোমাদের উৎখাত আসন্ন

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (সূরা-কুরাইশ)।

নাপাক মুশরিক ক্বোরশরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। রাসূল সঃ তাঁর স্বজন বলে ভাবা মক্কাবাসী সম্পর্কে নিরাশ হলেন। যায়দকে নিয়ে তায়েফ হিজরত করলেন। "ভুলবার নয়" এমন অভিজ্ঞতা হলো খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর। "লাহুয়ে লাহাঁ" হলেন রাসূল সঃ ও যায়দ। প্রাণে বেঁচে আশ্রয় নিলেন এক বাগানে। তিন সপ্তাহ কাটালেন সেখানে। মুস্তাদআফ্দের চূড়ান্ত নেতা তাঁর আজীবন মরমী সঙ্গী মুস্তাদআফ্ যায়দকে নিয়ে হাত তুললেন "রাব্বুল মস্তাদআফীন" আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর দরবারে। দোয়া ক্বুবুল হলো। মি'রাজ হলো তাঁর। তাঁকে স্বচক্ষে দেখালেন সাত আসমানের কম্পিউটারের পর্দায়। তোমার স্বগোত্র স্বজাতি বনী ইসরাঈলের ন্যায়, "শাজারায়ে মালউনাহ" অভিশপ্ত বৃক্ষ। মাকাল ফল ছাড়া এতে তাইয়েব ফল হবে না। আমি ওদের চার দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছি। আমি ওদেরকে ক্বুরআনে "অভিশপ্ত" নামকরণ করলাম।

কিন্তু হায়! কোনো জাতি বা গোত্র একবার খবিস বা মালউন হলে, তারা আর কখনো তওবা অনুশোচনার দিকে মুখ ফিরায়না। বরং আরো চ্যালেঞ্জ করে বসে। যেমনটি মুস্তাকবির ইব্লিস করেছিলো। রাসূল সঃ-কে মে'রাজে মক্কাবাসীকে "শাজারায়ে মালউনাহ" রূপে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিলো ওদের ভীতি দেখিয়ে পথে আনা। কিন্তু অভিশপ্তরা আরো বেশী একগুয়েমী করলো। إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ... وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (সূরা বনী ইস্রাঈল-৬০) তাই আল্লাহ্ মক্কার ক্বোরেশদের ইয়াহুদীদের মতো কাবা ভিত্তিক মুস্‌লিম উম্মার তাওহীদী ইমামতের সম্ভাবনা থেকে খারিজ করে তাঁর নবীকে ইয়াসরিব হিজরত করার অনুমতি দান করেন।

আখেরী নবী সঃ-এর মদীনা হিজরত, হযরত ইব্রাহীম আঃ-এর নমরুদ আধিপত্যের ইরাক ত্যাগ, হযরত মূসার ফিরআউনী প্রাধান্যের মিশর ত্যাগ, এবং হযরত ঈসার নাজারাথ ত্যাগের পুনরাবৃত্তি ছিলো। হযরত ইব্রাহীমের হিজরতের পর নমরুদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে। মূসা আঃ-এর পিছু ধাওয়া করতে এসে ফিরাআউন সসৈন্যে নিমজ্জিত হয়। হযরত ঈসাকে তাঁর সাহাবী কর্তৃক তুচ্ছ মূল্যে শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার ঘটনার পর আল্লাহ্ তাঁর স্বজাতিকে প্রায় নির্মূল করেন। এটাই হলো আল্লাহ্র সুন্নাহ, যার কোনো ব্যতিক্রম হয়না।

বিশ্বের নির্যাতিতদের মুক্তির শেষ সনদ মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে রক্তীয়দের ছেড়ে আত্মীয়দের পথে পা বাড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে হিজরত করে মক্কার কিছু ছিন্নমূল মুস্তাদআফ্ও আল্লাহ্র ওয়াদার উপর ভরসা করে অজানার পথে পা বাড়াচ্ছে। আল্লাহ্র নিকট এদের অবস্থান কোথায়, এদের করণীয় কি হবে? এরা কর্তব্য পালনে বিমুখ বা ব্যর্থ হলে এদের পরিনাম কি হবে এবং এরা বিফল হলে কাদের দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেন, তার বিশদ নীল নক্শা ও তার বিবরণ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়। হিজরতের পথে এ সূরা নাযিল হয়ে মদীনা পৌঁছার পর এর শেষ আয়াতসমূহ পূর্ণ হয়।

আল্ কুরআনে একটি মাত্র সূরাই নাযিল হয় মুহাম্মাদ সঃ-এর নামে। তা হলো সূরা মুহাম্মাদ। এর অপর নাম সূরা ক্বিতাল। কি আশ্চর্যের বিষয় যে, ক্বোরআনের অন্যান্য সূরায় বিভিন্ন নবীদের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সূরা মুহাম্মাদে তাঁর সাথে হিজরতকারী মক্কার সঙ্গীদের ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রসঙ্গ নেই। শুরু হয়েছে মক্কার ক্বোরেশীদের সকল আমলের বরবাদীর ঘোষণা দিয়ে। শেষ হয়েছে তাঁর সঙ্গীরা কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাদের পরিনাম সম্পর্কে ভবিষ্যত বানী দিয়ে।

তাই সূরা মুহাম্মাদ এরূপে পাঠ করতে হবে যে পাঠক স্বয়ং যেনো হিজরত করছে এবং নাযিল হওয়া আয়াতগুলো যেনো তাকে উদ্দেশ্য করে বলা। মনে রাখতে হবে যে হিজরতের পর থেকেই রিসালাতে মুহাম্মাদীর সাল গণনা আরম্ভ হয়। যেনো তাঁর মূল যাত্রা হিজরত থেকেই শুরু!

হিজরতের পর বদর ও উহুদের জয় পরাজয়, আহযাবের অবরোধের প্রানান্তকর ঘটনা, হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা ও তায়েফ অধিকারের মাধ্যমে আল্লাহ্র শেষ নবী সঃ-এর দাওয়াতী কাজ সম্পন্ন হয় বলা চলে। রাসূল সঃ-এর জীবনাদর্শ দিয়ে যারা যারা মু'মিন মুস্‌লিম হবে, তাদের জন্য মানদন্ড দাঁড় করে যান। তিনি তার সঙ্গীদের, যাদের পরবর্তীতে সাহাবা নাম করা হয়েছে, তাদের আদর্শ মুস্‌লিম বানিয়ে যাননি। নবী রাসুলরা কাকেও ঈমানদার বানাতে পারেন না! নবীদের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা মু'মিন হতে মনস্থ করে, তারা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে তা' চাইলে আল্লাহ্ তাদের ঈমানদার হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। নবী-রাসূলরা মানুষকে কিছু বানাতে সক্ষম হলে তো পৃথিবীতে একজনও বেঈমান থাকতো না! সব মু'মিন মুস্‌লিম হয়ে যেতো। তই সকল নবীরা বলেছেন وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

''আমাদের দায়িত্ব স্পষ্ট ডাক পৌঁছানো ছাড়া আর কিছু নয়" (সূরা ইয়াসীন-১৭)। স্বয়ং আল্লাহ ক্বোরআনে অনূন্য পনের বার বলেছেন যে নবীদের কাজ হলো শুধু সত্যের ডাক পৌছে দেয়া। কাকেও সত্যবাদী বানানো তাঁদের কাজ ও দায়িত্ব নয়। সূরা রা'আদের ৪০-নং আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর আখেরী রাসূল মুহাম্মাদ সঃ কে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

"তোমার একমাত্র আরদ্ধ কাজ হলো ডাক পৌছে দেয়া, আর আমার কাজ হলো হিসাব নেয়া"।

তাই আমাদের জানতে হবে এবং বুঝতে হবে যে রাসুল সঃ যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, আবু বকর, উমর, আলী, উস্মান, সালমান ও উসামাহ প্রভৃতিকে কিছু বানিয়ে যাননি। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গুন, মেধা ও নিষ্ঠায় যা'হতে সচেষ্ট হয়েছে, তাই হয়েছে। রাসুল সঃ শুধু মানদন্ডানুযায়ী তাদের স্বীকৃতি দান করেছেন। তার বাইরে কিছু নয়।

রাসূল সঃ হিজরত থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে তাঁর সঙ্গী ও অনুসারীদের কী হওয়া উচিৎ, কতটুকু হয়েছে ও কতটুকু হয়নি তার একটি ক্বরআনী বর্ণনা রয়েছে আল ক্বোরআনের পাঁচটি সূরায়। সূরা গুলো হলো যথাক্রমে ঃ-

(১) মুহাম্মাদ (২) হুজুরাত (৩) মুম্তাহানাহ (৪) তাহ্রীম (৫) তওবা।

(১) মুহাম্মাদ; হিজরতকারীদের করণীয়, না করলে তাদের পরিনাম কি হবে।

(২) হুজুরাত; আবু বকর, উমর, ও তাদের শ্রেণী, স্ত্রী কন্যা সহ কোথায় অবস্থান করছিলো।

(৩) মুম্তাহানাহ; মক্কা বিজয় পর্যন্ত তারা, নরনারী নির্বিশেষে কতোটুকু তৈরী হয়েছে, হওয়া চাই।

(৪) তাহ্রীম; রাসূল সঃ-এর স্ত্রীরা কে কোথায়, তাদের কার অবস্থান কী? উত্তম কারা?

(৫) তওবাহ; বিদায় হজ্বের সময় ও তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে কারা কোথায়।

এবার আমি তাওহীদে বিশ্বাসী আল্লাহ্র ঈমানদার বান্দাদের নিয়ে চৌদ্দ শ' বাইশ বছর পেছনে চলে যাবো। ঈমানহীন মানুষ পশুর সমান। কারণ, ঈমান না থাকার ফলে সে তার অতীত রুহানী অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি সে মৃত্যুর পরের পরকালেও তার আস্থা স্থাপন করতে অক্ষম। কিন্তু ঈমানদার মাত্রই সন্দেহাতীত বিশ্বাস করে যে বর্তমান দৈহিক পার্থিব জীবনের পূর্বেও সে ছিলো এবং মৃত্যুর পরও সে অতীত বর্তমানের ধারাবাহিকতা নিয়ে পরকালের জীবনে প্রবেশ করবে। এ বিশ্বাসীরা মুমিন। এ বিশ্বাসহীনরাই কাফের, নাস্তিক।

ঈমানদাররা বর্তমানের মতো অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সক্ষম বিধায় তাদের নিকট অতীত ও ভবিষ্যত মাত্র দুটি পর্দার এদিক ওদিক। তার বেশী কিছু নয়। ক্বোরআন তাই "গায়ব" অর্থাৎ অদৃশ্যে বিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শন করে। আমি ক্বোরআনে বিশ্বাসীদের নিয়ে ১৪২২ বছর পিছনে চলে গেলাম। রাসুল সঃ মক্কার অপবিত্র মুশ্রিকদের ত্যাগ করে ইয়াসরিব, বা মদীনার দিকে হিজরত করছেন। এ হিজরতের প্রক্রিয়ার ধারা বিবরণী দিয়ে আল্লাহ্ সুরা মুহাম্মাদ নাযিল করছেন ঃ

সূরা মুহাম্মাদ

(১) যে মক্কাবাসীরা কুফরী করে আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আল্লাহ্ তাদের সকল আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।

(২) যারা ঈমান এনে সে অনুপাতে সৎক্রিয়া করেছে এবং মুহাম্মাদ সঃ এর প্রতি যা'নাযিল হয়েছে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সত্য রূপে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ্ তাদের অতীত ভুল শুধরে দিয়ে তাদের বর্তমান গুছিয়ে দিয়েছেন।

(৩) তা এজন্য যে, কাফিররা অন্যায়ের অনুসারী ছিলো এবং মুমিনরা ছিলো সত্যের অনুসারী। এরূপেই আল্লাহ্ মানুষকে বুঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

(৪) অতএব, তোমরা মক্কার কাফিরদের বাধার মুখোমুখি হলে গর্দানে আঘাত হানবে। তাদের সম্পূর্ণ পরাজিত করা পর্যন্ত এ আঘাত চালিয়ে যাবে। এরা ধরাশায়ী হলে এদের কষে বাঁধবে। তারপর অবস্থা বুঝে, হয় মুক্তিপন নিয়ে ছাড়বে, বা কৃপা করবে। তবে স্মরণ রাখবে যে, এরপর ওদের যেনো আর অস্ত্র ধারণ করার যোগ্যতা না থাকে। এ হবে তোমাদের করণীয়। আল্লাহ্ চাইলে ওদের তিনি নিঃশেষ করে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের

মু'মিনদের তোমাদের কাফেররদের দ্বারা ঈমানের পরীক্ষা নিতে চান। এ সম্মুখ সংঘাতে যারা প্রাণ দিবে, কখনো তাদের প্রচেষ্টা বিফল হবেনা।

(৫-৬) বরং শাহাদাত লাভের পর আল্লাহ্ তাদের পরিনাম গুছিয়ে অভ্যর্থনা সহকারে তাদের পরিচয় ফলক খচিত জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(৭) হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি এরূপ আল্লাহ্কে সাহায্য করতে থাকো, তা'হলে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করে তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।

(৮) আর মক্কার কাফিরদের দুর্দিন চলতে থাকবে, তাদের প্রচেষ্টাও বিফল হতে থাকবে।

(৯) কারণ মক্কার কাফিররা আল্লাহ্র নাযিলকৃত সত্যকে অপছন্দ করেছে। ফলে তাদের শ্রম পন্ড হয়েছে।

(১০) মক্কার কাফিররা কি শীত গ্রীষ্মের ইয়ামেন-সিরিয়া অতিক্রম পথে সমৃদ্ধ মাদায়েনবাসী, আ'দ ও সামুদ এবং সু-উচ্চ প্রাসাদবাসী এরাম ও সাবাদের পূর্বেকার পরিনাম দেখেনি? তাদের সকল প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তাদের উপরই দুমড়ে দিয়েছেন! মক্কার কাফিরদের নিয়তির লিখন তাই।

(১১) দু'পক্ষের দু'পরিনামের কারণ হলো, মু'মিনদের অভিভাবক আল্লাহ্। আর মক্কার কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।

(১২) তোমরা ঈমানদাররা যে ঈমান অনুপাত জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সেরূপ নদী নালা প্রবাহিত জান্নাতে সমাদ্রিত করবেন। আর মক্কার কাফিররা? তারা যে ভোগে লিপ্ত রয়েছে, তাদের ভোগ বিলাস তো চতুষ্পদ পশুর নির্লিপ্ত ভোগের মতো! তাদের পরিনাম জাহান্নামের আগুনে।

(১৩) হে রাসূল সঃ তোমাকে যে মক্কাবাসীরা দেশান্তরীত করেছে, তাদের চেয়ে বহু শক্তিধর নগরবাসীদের আমি ধ্বংস করেছি। ধ্বংস কালে তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি।

(১৪) তোমাদের উভয়ের নিয়তির পার্থক্য হলো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ওরা? ওরাতো ওদের দুষ্কর্ম গুলোকে শোভন করে স্বেচ্ছাচারের অনুসারী!

(১৫) তোমরা মুত্তাকিরা যে জান্নাতের অঙ্গিকারাবদ্ধ, তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে এমন পানির প্রস্রবন প্রবাহমান থাকবে, যার পানি কখনো দুষিত হবেনা। এমন দুধের নহর থাকবে, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হবে না। এমন সুরার নহর থাকবে যা পানকারীদের শুধু সস্বাদ দান করবে। আর থাকবে পরিশোধিত মধুর নহর। তোমরা এতো প্রকার পানীয় পান করেই শুধু দিন কাটাবে? না। সেখানে তোমাদের জন্য সকল প্রকারের ফলফলাদিরও আয়োজন থাকবে। সবের উর্ধ্বে তোমাদের জন্য কি থাকবে জানো? তা হলো তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর ক্ষমা। মক্কার মস্তাকবিররা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামের নাড়ি ভুড়ি গলানো ফুটন্ত পানি পান করবে, তাদের পরিনাম কি তোমাদের তুল্য?

(১৬) হে রাসূল, ওদের কিছু লোক এসে কান পেতে তোমার বক্তব্য শুনে যাবে। ফেরত গিয়ে ওদের গুরুজনদের নিকট সবিস্তার তোমার বক্তব্য বর্ণনা করবে। ওদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন। ওরা কখনো সত্য গ্রহণ করবেনা। কারণ ওরা কল্পনার অনুসারী।

(১৭) আর যারা তোমাদের নিকট সঠিক পথ পেতে আসে, আমি আল্লাহ্ তাদের পথের দিশা বাড়িয়ে তাক্বওয়ায় তাদের অলঙ্কৃত করি।

(১৮) কাফেররা কি শেষ ঘন্টা বাজার অপেক্ষা করছে? তা তো হঠাৎ করে ওদের কপালে বেজে উঠবে? তার লক্ষন সমূহ তো সবই একে একে প্রকাশ পেয়েছে! শেষ ঘন্টা বেজে উঠলে অতীত উপদেশ স্মরণ করে কি কোনো ফায়দা হবে?

(১৯) হে রাসূল, হিজরতের পর এখন থেকে তোমার স্থির কর্তব্য জেনে নাও। তোমাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। সর্বদা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনারত থাকবে। আল্লাহ তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্রের সম্যক খবরাখবর রাখেন।

(২০) তোমার হিজরতের সাথী মু'মিনরা কিন্তু তড়িঘড়ি করে বলবে, "কেনো আমাদের পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে সূরা নাযিল হচ্ছেনা?" কিন্তু দেখবে যে স্পষ্ট যুদ্ধের আদেশ সম্বলিত সূরা নাযিল হতেই তোমার রুগ্ন আত্মার সাহাবীদের দিকে তাকাতেই দেখবে যে ওরা তোমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেনো মৃত্যুর হাতছানি তারা দেখতে পাচ্ছে। তোমার এ শ্রেণীর সাহাবীদের মৃত্যুই শ্রেয়।

(২১) আনুগত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার বাক্য সর্বদা বোধগম্য। কর্তব্য স্থির হওয়ার পর যদি তোমার সঙ্গীরা তাদের অঙ্গিকার সত্য প্রমাণ করে, তাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত।

(২২) এ ভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কি তোমরা আত্মার বাঁধন কর্তন করে রক্তের স্বজনপ্রীতি করে পৃথিবীতে পূনঃ নৈরাজ্য সৃষ্টি করবেনা?

(২৩) এ কাজ যারা করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। আল্লাহ্‌ এদের দৃষ্টিহীন ও বধির করে দিবেন।

(২৪) এরা কি ক্বোরআন অভিনিবেশ সহকারে পড়ে না? না ওদের অন্তরে বোধশক্তি প্রবেশের সকল দুয়ারে তালা ঝুলানো রয়েছে?

(২৫) অবশ্যই এভাবে সত্য প্রকাশ হওয়ার পর যারা পিছু হটে, শয়তান তাদের নেপথ্য চালক, সর্বদা তাদের কুমন্ত্রণা দেয়।

(২৬) এ শ্রেণীর মুহাজিরদের এ দশার কারণ হলো যে এরা নাযিল হওয়া তাওহীদের অহীকে অপছন্দকারী মক্কাবাসীকে বলে এসেছে "আমরা রাসূলের সাথে মক্কা ত্যাগ করলেও কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাদের অনুসারী রয়েই যাবো"। আল্লাহ্‌ তো এদের গোপন আঁতাতের খোঁজ রাখেন! (এখানে ভাবতে হবে যে এরা কারা ছিলো?)

(২৭) এদের অপমৃত্যু হবে। এদের মৃত্যু কালে ফেরেশতারা যখন এদের গালে চড় এবং পাছায় লাথী মারবে, তখন কেমন দৃশ্য হবে?

(২৮) এদের এ পরিনামের কারণ হলো, এরা এমন মানসিকতার অনুসারী ছিলো, যা' আল্লাহ্‌কে ক্রোধান্বিত করে। অপরদিকে এরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ্‌ এদের সকল আমল বাতিল করে দিয়েছেন।

(২৯) এ রুগ্ন আত্মার প্রানীগুলো কি ভেবেছে যে, আল্লাহ্‌ এদের অন্তরের বিদ্বেষ রোগকে প্রকাশ না করে ছাড়বেন?

(৩০) আমি চাইলে, হে রাসূল, অঙ্গুলী উঁচিয়ে তোমাকে তাদের চিহ্ন দেখিয়ে দিতাম। তুমি তাদের চিনে ফেলতে। কিন্তু তা' করলাম না। তুমি একটু লক্ষ্য করলেই তাদের কথার টোনে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ্‌ এদের সকল কার্যকলাপের খবর রাখেন।

(৩১) অবশ্যই আমি তোমাদের যাচাই করতেই থাকবো। এর মাধ্যমে আমি তোমার ধৈর্য্যশীল সংগ্রামীদের বেছে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকবো।

(৩২) অবশ্যই হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পরও মক্কার যে কাফেররা আল্লাহ্‌র পথে বাঁধা সৃষ্টি করে রাসূল সঃ-কে পীড়া দিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। বরং তাদের সকল শ্রম পন্ড হবে।

(৩৩) হে বিশ্বাসীরা সাবধান! তোমরা শুধু আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত্য করবে। তার ব্যতিরেক করে তোমাদের আমল বরবাদ করোনা।

(৩৪) এর পরও যারা মক্কার কাফেরদের ন্যায় আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে মৃত্যু বরণ করবে, তাদের মৃত্যু কাফের রূপেই হবে। আল্লাহ্‌ কস্মিন কালেও তাদের ক্ষমা করবেন না।

(৩৫) অতএব তোমরা নবীর সাথে হিজরকারীরা কোনো পরিস্থিতিতেই হতদ্যোম হয়ে মক্কার মুস্তাকবিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করবেনা। পরিনামে তোমরা বিজয়ী হবেই। কারণ আল্লাহ্‌ তোমাদের পক্ষে। তিনি কখ্খনো তোমাদের শ্রম নিষ্ফল হতে দেবেন না।

(৩৬) পার্থিব জীবন তো ক'দিনের! খেলায় খেলায়ই কেটে যায়। কিন্তু এ খেলার জীবনও যদি তোমরা ঈমান ও ত্বাকওয়া ভিত্তিক কাটিয়ে আসো, আল্লাহ্‌ তোমাদের পুরস্কার দিবেনই। তোমাদের ধন সম্পদের তিনি হিসাবে নিবেন না। কারণ, তোমরা তা'সবই তাঁর পথে ব্যয় করেছো।

(৩৭) তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি ভিন্নতরো জীবন যাপন করো, তা'হলে অবশ্যই হিসাব চাইবেন। তখন সূক্ষ্ম হিসাবে তোমাদের কারচুপি ধরা পড়ে যাবে।

(৩৮) এতোক্ষন যে বক্তব্য পেশ করা হলো, তা' তোমাদেরই বলা হয়েছে। তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে তোমাদের সবস্ব আল্লাহ্‌র পথে নিঃশেষ করতে। এতো সবের পরও তোমাদের কেউ সাড়া দিতে কার্পন্য করবে। যে-ই এ কাজটি করবে, সে নিশ্চিৎ নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই এ কাজটি করবে। কারণ আল্লাহ্‌তো সকল অভাব মুক্ত! আর তোমরা?

তোমরা তো সব ফকির! এর পরও যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তা'হলে আল্লাহ্ তোমাদের বদলিয়ে অন্য জাতিকে বেছে নিবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না।

এ সূরাটি সকল তফসীরকারকদের বর্ণনায় রাসূল সঃ-এর হিজরতকালীন মক্কাবাসী ও তার সাথে হিজরতে অংশগ্রহণকারীদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার একটি পূর্ণ প্রতিবেদন। এতে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুনাফিকদের কোনো প্রসঙ্গ নেই। এ সূরায় শুধু মাত্র প্রসঙ্গ রয়েছে মক্কার কা'বাকে দেবদেবীর মন্দিরে রূপান্তরকারী ক্বোরেশ ও তাদের অনুসারী মুশরিকদের এবং রাসূল সঃ এর সাথে হিজরতকারী মুহাজিরদের। এমনকি মদীনাবাসী আনসাররাও এ সূরার আওতার বাইরে। অতএব, পাঠকদের মধ্যে ঈমানের সাথে যারা এ সূরাটি অর্থ সহকারে আদ্যোপান্ত বুঝে পড়তে সক্ষম হবে, তারাই রাসূল সঃ-এর সাথে খাঁটি ইসলামে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। আর যারা তাড়াহুড়া ও অস্থির চিত্তের কারণে এ সূরাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অক্ষম হবে, ওরা বিভ্রান্ত হবে, ওরা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হবেই হবে। নিচে এ সূরাটির কিছু দিক নির্দেশনা তুলে ধরছি। এ সূরাটির নাম যেমন সূরা মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ সঃ এর রিসালাতের কষ্টিপাথরও এ সুরাটি। যাদের এ কষ্টিপাথর খাঁটি বলবে, তারাই আল্লাহ্র দ্বীনের অলঙ্কার। আর যাদের ভেজাল বলে ইঙ্গিত করবে, তারা অবশ্যই কুলাঙ্গার এবং ইসলামী উম্মার পথের জঞ্জাল। এদের অপসারণ করেই তবে আমরা বিশ্ব জয়ের নতুন কাফেলা গড়বো। ইনশ্আল্লাহ।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মক্কাবাসীদের ধর্ম কর্ম সব বরবাদ। কারণ তারা মুহাম্মাদ সঃ-এর রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে দেশ ত্যাগ বাধ্য করেছে। এরপর মক্কাবাসীদের সাথে আর কোনো প্রকারের সমঝোতা হবে না। তাদের মুখোমুখি হতেই ঘাড়ে আঘাত করতে হবে। (আয়াত-৪)

তারপর বদরের যুদ্ধ হয়। তাতে আল্লাহ্র সাহায্যে ক্বোরেশদের মাথাতোলাগুলো প্রায় সবই কুপোকাত হয়। আবু সুফ্য়ান যুদ্ধে ছিলো না বলে বেঁচে যায়। আবু সুফয়ানের দোস্ত আব্বাসসহ বহু যুদ্ধবন্দি হয়। তাদের আল্লাহ্র নির্দেশ (আয়াত-৪) অনুযায়ী কষে বাঁধা হয়। এ অবস্থায় ঈমানদার মাত্রের কাজ ছিলো, রাসূল সঃ যা'করেন, তাকে বিনা বাক্যে মেনে নেয়া। কারণ রাসূল যা করবেন তা আল্লাহ্র নির্দেশেই করবেন। এবং তাতেই মঙ্গল। রাসূল সঃ যদি তাঁর সঙ্গীদের এ পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তা' হলে তারা সবাই বলবে "আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আ'লাম," আল্লাহ্ ও তার রাসূলই সর্বোত্তম জানেন। রাসূল পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য তাঁর শিষ্যদের প্রশ্ন করবেনই। এ প্রশ্নবোধক পরামর্শ দ্বারাই আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দাদের তৈরী করবেন। "আমরুহুম্ শুরা বাইনাহুম" এর অর্থ তাই। সবাই মিলে রাসূল সঃ কে পরামর্শ দেয়া আরম্ভ করবে, তা কখ্খনো হয়না। এটাকেই "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে আগবাড়ানী" বলে সুরা হুজুরাতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কাজ করলে কোনো নেতার পক্ষেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ থাকেনা। জটিল হয়ে যায়।

হাদীস অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে দুই ক্বোরেশী ব্যক্তি দু'পক্ষ হয়ে রাসূল সঃ-কে প্রভাবান্বিত করার জন্য আগে বেড়ে জটিলতা সৃষ্টি করে। আবু বকর বলে তাদের পণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক। উমর বলে ওদের শিরোচ্ছেদ করা হোক। এ ব্যাপারটি আল্লাহ্র রাসূলের উপর ক্বোরআনের নির্দেশানুযায়ী ন্যস্ত করে দিলে তো বিতর্কের সৃষ্টি হতো না!

তাদের সৃষ্ট পরিস্থিতির জটিলতায় যুদ্ধ বন্দিদের ছেড়ে দেয়া হয়। অহী নাযিল হয় যে, এদের জীবিত ছেড়ে দেয়া ভুল হয়েছে। কারণ ওদের ছেড়ে দেওয়ায় এরা ফেরৎ গিয়ে আবু সুফয়ানের সাথে মিলে উহুদের বিয়োগন্তক ফলাফলের প্রেক্ষাপট তৈরী করে। আব্বাসসহ যুদ্ধ বন্দিদের খতম করে দিলে প্রভূত সম্ভাবনা ছিলো যে, এ সূরায় আল্লাহ্ কর্তৃক ইংগিত "হাত্তা তাদা'আল্ হারবু আওযারাহা" অনুযায়ী ক্বোরেশদের পক্ষে পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতির সম্ভাবনা চিরতরে শেষ হয়ে যেতো। আবু সুফ্য়ান ও আব্বাস যুগল মিলে উহুদের জন্য রিগ্রুপিং করার সুযোগ পেতো না। বরং পরবর্তীতে এই দু'দুষ্টক্ষতের বংশধর থেকে উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যের মহামারী রোগের বিস্তার হয়ে ইস্লামী বিপ্লবের বিশ্বায়ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো না। মনে রাখতে হবে যে, সুদের মহাজন আব্বাস ক্বোরেশদের ইসলাম বিরোধী যুদ্ধে অর্থের যোগানদাতা ছিলো। বদরের যুদ্ধে বন্দি হওয়া আব্বাসের শিরোচ্ছেদ হলে তাঁর প্রণয়ী হিন্দা ও তার স্বামী আবু সুফ্য়ানের কোমর ভেঙ্গে যেতো। বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্দিদের নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য রাসূল সঃ এর শিবিরে আবু বকর ও উমরই দায়ী। এই দু'ক্বোরেশী হবু নেতাই মক্কা বিজয়ের পর ইয়ামেন থেকে আগত দু'ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করে রাসূল সঃ এর দরবারে উচ্চস্বরে বেআদবী করার ফলে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে এবং দু জনের

ব্যাপারেই পূর্ণ দৈর্ঘ্য সূরা হুজুরাত নাযিল হয়। (ইবনে কাসীর, কুরতুবী, তাবারী, শওকানী ও রূহুল মা'আনী প্রভৃতি)।
রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর তাঁর লাশ মুবারক তিন দিন পযন্ত দাফনহীন ফেলে রেখে এই দু'ব্যক্তিই "মিন্নাল উমারা, ওয়া মিনকুমুল্ উযারা" আমরা ক্বোরেশীরা হবো "আমীর", আর তোমরা মদীনাবাসীরা হবে "ওয়াযীর" বা মন্ত্রী, বলে রাসূল সঃ এর গড়া উম্মতকে ক্বোরেশী ও আন্সারীতে বিভক্ত করে দু'টুকরা কের দেয়। এবং তারপর "আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ" বলে চিরতরে বিশ্বজয়ী ইসলামকে ক্বোরেশী চক্রের সাম্রাজ্যেবাদের প্রাসাদে দামেশক, বাগদাদ ও স্পেনে নর্তকীর মতো নাচিয়ে ওদের বংশধররা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। আজো আমরা চৌদ্দশ বারো বছর পরও তারই খেসারত দিচ্ছি। এ বই সে অভিশাপ থেকে মুক্তির সনদ ও ইশ্তেহার।
এ সূরা অনুযায়ী ঈমান ও ব্যক্তি চরিত্র বিধৌত না হতেই যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত হয়, তা হলে তোমরা "মুমিনরাই শুধু পরস্পর ভাই" (হুজুরাত-১০) এর ঈমানী ও রূহানী সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলে ২২ নং আয়াতে যে সতর্কবানী উচ্চারিত হয়, তাই রাসূল সঃ এর লাশ দাফনের পূর্বেই আবু বকর ও উমররা "একমাত্র ক্বোরেশ থেকে নেতা হতে হবে" ঘোষণা করে সত্য প্রমাণ করে দেয়। তার পরের আয়াত অর্থাৎ ২৩ নং আয়াতে এর পরিণামও আল্লাহ আগাম ঘোষণা করেছেন। "যারা এ কাজ করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত, এদের বধির ও অন্ধ করে দেওয়া হলো।"
রাসূল সঃ কে পেয়ে, তাঁর হাতে বাইআত্ হয়ে এবং তাঁর সাথে হিজরত করার পরও এ পরিণাম হওয়ার কারণ কি? তাঁর উত্তরও আল্লাহ্ এর পরবর্তি ২৪ নং আয়াতে দিয়ে দিয়েছেন "এরা ক্বোরআন বুঝে পড়ে তার ভিতরে প্রবেশ করে না। কারণ তাদের অন্তরের প্রবেশদ্বারের প্রত্যেকটিতে তালা ঝুলানো রয়েছে।"
আল্লাহ্ যখন থেকেই মক্কায় হিজরতের পর আমার অন্তরকে ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর সাহীহ্ বানী বুঝার জন্য খুলে দেন, তখন থেকেই আমি ভাবি যে, আমরা দেখতে পাই যে রাসূল সঃ তাঁর বহু বানীতে "তোমরা যায়দ, কা'আব ও ইব্ন্ মাস্উদ প্রভৃতি থেকে আল ক্বোরআনের শিক্ষা নিবে" বলেছেন। "আবু বকর ও উমর থেকে ক্বোরআন শিখো", নেই কেনো? যারা আল্ ক্বোরআনে অগ্রণী ও অগ্রগামী নয়, তারা কিরূপে রাসূল সঃ এর পর খলিফা হয়? ক্বোরআনই তো ইসলাম, ক্বোরআনই তো রাসূল সাঃ এবং ক্বোরআনে কোথাও তো ক্বোরেশ বা কোনো গোত্র বা বর্ণ থেকে নেতা হবার ইংগিতও নেই! বরং সূরা হুজুরাতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে "একমাত্র মুত্তাক্বীরাই যোগ্য"। (সূরা হুজুরাত-১৩) ক্বোরেশ কোত্থেকে আসলো? এ তো অভিশপ্ত বর্ণবাদী ইয়াহুদীদের দাবীর প্রতিধ্বনী? ইয়াহুদীদের দাবী "আমরা আল্লাহ্‌র বেটা আল্লাহ্‌র একমাত্র প্রিয়ভাজন?"
আল্লাহ্ তাঁর ক্বোরআনুল কারীমে বহু জায়গায় পুনরাবৃত্তি করেছেন, 'ওরা কি তাদের পূর্ববর্তীদের দেখে তাদের পরিনাম ও পরিনতি থেকে কিছু শিখে না"? অতীতের ভালো মন্দ প্রত্যেক ঘটনা থেকে উত্তম শিক্ষণীয় রয়েছে। কিতাব পুস্তকে লিখিত উপদেশাবলী রচিত ও কল্পিত ধারণা। আর ঘটনাবলীর শিক্ষা, ঘটিত সত্য। তাতেই মৌলিক শিক্ষণীয় নিহিত। আল ক্বোরআনে সুরা আহযাবের ৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয়, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের ইহকাল পরকালে লা'নত করেছেন। এবং এদের জন্য অপমানজনক শাস্তি পস্তুত রেখেছেন।" আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নূহ, ইব্রাহীম, লূত, মূসা ও ঈসা আঃদের তাঁদের রক্তীয় স্বজনরা কী-ই-না পীড়া দিয়েছে। ফলে তাদের উপর কঠোর শাস্তি নেমে এসে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুরের লোকদের চেয়ে নিকটের লোকরাই এ পীড়াটি বেশী দিয়ে থাকে।
আখেরী নবী সঃ ও তাঁর অনুসারীদের আল্লাহ্ তাই সতর্ক করে পূর্ববর্তীদের পাপের পূনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার তাগিদ দিয়েছেন। সূরা মুহাম্মদ তার পূর্ণ প্রমাণ ও দলীল। তাতে পরদের জন্য সতর্কবাণী নেই। সব আপনদের ঘিরেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সূরা আহযাবের ৫৭ ও সূরা মুহাম্মাদের ২৩ ও ৩২ নং আয়াতে এতো স্পষ্ট সতর্কবানীর পরও ক্বোরেশীরা রাসূল সঃ কে ঘরে-বাইরে কি রূপে এ রূপ পীড়া দিলো যে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ সূরা নাযিল হলো? বিশেষ করে আবু বকর ও উমরের আচরণের বিরুদ্ধে সূরা হুজুরাত ও তাদের দু'কন্যা মা আইশা ও হাফসাহ সম্পর্কে স্পষ্ট সূরা তাহরীম অবতীর্ণ হওয়ার পরও পরবর্তী ঘটনাবলী কিভাবে ঘটে? বাইরে দু'পিতা, ঘরে দু'কন্যা? তাও রাসূল সঃ এর রিসালাত জীবনের শেষ বর্ষগুলোতে! প্রথম দিকে হলে বলা যেতো যে এরা অজ্ঞ মরুবাসী। তাই না জেনে এগুলো ঘটিয়েছে। কিন্তু এ ঘটনাগুলো রাসূল সঃ এর বিদায়ের দু'বছর পূর্বের, মৃত্যুকালীন ও মৃত্যুর পরের!?
আরো ভেবে আশ্চর্য হই এ দেখে যে, ওদেরই বানানো আশারায়ে মুবাশ্শারাদের মৃত্যুর ঘটনা সমূহ লক্ষ্য করে। আবু

বকর স্বল্প সময় বেঁচে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। তারপর উমর, ওসমান, আলী, তালহা ও যুবাইর, এরা সবাই অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। তালহা ও যুবাইর তাদের স্ত্রীর ছোট বোন, শালী মা আইশাকে পুনঃ বিয়ে করার ঘোষণা দিলে অহী অবতীর্ণ করে তাকে তিরস্কার করা হয়। ইব্ন্ কাসীর, কুরতবী, ও তাবারী একত্র বর্ণনাকারী। মা আয়শা কি করে ক্বোরআনের নির্দেশ অমান্য করে এবং রাসূল সঃ এর আজীবনের শিক্ষা পদদলিত করে দু'ভগ্নীপতি ও দু'ভাগ্নে মুহাম্মদ ইব্ন্ তালহা ও আব্দুল্লাহ ইব্ন্ যুবাইরকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যায়?

এ ঘটনার পরবর্তীতে ক্বোরেশ গোত্রীয় সাম্রাজ্যবাদের চাটুকার ও চামচারা হাদীস তৈরী করে, যে সাহাবাদের এসব ঘটনার সমালোচনা দুরে থাক, পর্যালোচনা করাও মহাপাপ। তাতে ঈমানই নাকি চলে যাবে। ওদের পর্যালোচনা করলেই যদি ঈমান যায়, তা'হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও তাদের হাযারে হাযার হত্যাকারীদের কি হবে? তারা বড়ো, না আল্লাহ্, তাঁর দ্বীন, তাঁর ক্বোরআন ও তাঁর রাসূল খাতামুন নাবিয়্যীন বড়ো? নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল সঃ-ই বড়ো।

ইসলামে ইনস্াফ ও সালিসীর কোনো স্থান নেই। ইসলাম শুধু মাত্র ন্যায়নীতি ও ন্যায় বিচারের দ্বীন। ইনসাফ হলো আরবী শব্দ "নিস্ফুন" থেকে। যার অর্থ হলো অর্ধেক। আর কোনো মূল জিনিসকে সমান দু'ভাগে ভাগ করার নাম "ইনসাফ"। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দু'টি নারী একটি শিশুকে তাদের নিজ সন্তান বলে দাবি করছে। বিচারকের নিকট এ বিচার গেলে বিচারক শিশুটিকে সমান দু'টুকরা করে কেটে দু'মহিলাকে দিয়ে দিলে এটা হলো ইনস্াফ। সালিসী হলো "সালিস্" হতে, অর্থাৎ তিন। দুই বিবাদমান পক্ষের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে তৃতীয় সত্য সৃষ্টিকারী সালিস, এবং তার বিচার হলো সালিসী। দৃষ্টান্ত হলো, উক্ত দু'মহিলাকে সে বলে দিলো যে, শিশুটি তোমাদের নিকট এক বছর করে থাকবে এবং একবছর করে তোমাদের সে মা ডাকবে। ইসলামে ন্যায় নীতি ও ন্যায় বিচারকে "আদল" বলে। তা'থেকে আদালত। ক্বোরআনে আদ্ল আছে, ইনস্াফ ও সালিসীর কোনো উল্লেখও নেই। ইস্লামী আদ্ল হলো সত্য উদঘাটন করে সত্যিকারের মাকে শিশুটি প্রদান করা এবং মিথ্যা দাবিদারকে শাস্তি দেয়া।

সাহাবী সাহাবিয়াদের ব্যাপারটিও তাই। ক্বোরআনের কোথাও সাহাবী নেই। আছে আল্লাহ্, রাসূল, ক্বোরআন, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। যারা যেখানে, যে সময়ে যেভাবে আল্লাহ্, রাসূল ও ক্বোরআনকে মানবে, তারা মু'মিন, মুস্লিম, মুত্তাকী, মুমিনাত, মুস্লিমাত ইত্যাদি। আর যারা তা মানবে না, তারা যে-ই হোক, তারা নিজের পায়ে কুঠারঘাতকারী। তাদের বিচার আল্লাহ্র হাতে। তারা কেউ আমাদের আদর্শ নয়। তাদের ভুল থেকে আমরা আল্লাহ্র পানাহ্ চাই। তাদেরকে নিষ্পাপ মনে করার ভ্রান্তি আমার ঈমানের চৌহদ্দিতে নেই। আদ্ল আমার মানদন্ড। ইনসাফ ও সালিসী নয়। আমি ন্যায়ের অনুসারী ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শক। সূরায়ে মুহাম্মাদের ৩৩ নং আয়াতে আমার পরিচয়। ৩৪ নং আয়াতে আমার প্রতিপক্ষের জন্য চরমপত্র ও সতর্কবানী। আমার জীবন মৃত্যুর একমাত্র লক্ষ্য হলো এ সূরার ৩৮ নং আয়াতের শেষ বাক্যের প্রতি বিশ্বের নির্যাতিত ও মুস্তাদআফ্দের বিরুদ্ধে ডাক দিয়ে মুস্তাদআফ্দের সংগঠিত করে তাদের কাতারে শামিল হওয়া, যে কাজটি আল্লাহ্র প্রীত ও প্রিয় খাতামুন নাবিয়্যীন যায়দকে নিয়ে তায়েফে সংকল্প করেছিলেন। আমীন।

আমার এ বুঝ ও এ পথের বাধাকে অপসারিত করার জন্য আমি সূরা মুহাম্মাদ, হুজুরাত, মুম্তাহানাহ্, তাহরীম ও সর্বশেষে সুরা তওবা কে তুলে ধরবো। তার সঙ্গে রাসুল সঃ এর সহীহ্ বাণীও প্রয়োজন মতো তুলে ধরবো। রাব্বি যিদ্নী ইল্মা, রাব্বিশরাহ্লি সাদ্রী।

সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াত অনুযায়ী আজ আরব জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক শাসক ও জনসমষ্টি চূড়ান্ত ভাবে ইয়াহুদীদের পাপের তলানী। এরা সম্পূর্ণ রূপে অভিশপ্ত। ভারতের আশি কোটি নিম্নজাত "দলিত" মুস্তাদআফ্দের মতো কোটি কোটি যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহরা আরব ভূখন্ডে ক্বোরেশী সাম্রাজ্যেবাদের সৃষ্ট রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচারে পিষ্ট হয়ে রাসূল সঃ এর অনুসারী "আমীরুল মুযাফফার" বা বিজয়ী আমীর ও ইমাম যায়দ ইব্ন্ হারিসাহ, বেলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহ্ বিন যায়দের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমান মুস্তাদআফ্ যায়দ, বেলাল, সালমান ও উসামাহ্ বিন যায়দদের এ কাজ। আরবী মুস্তাক্বির ধনকুবের, ইরানী শিয়া খোমেনী-খামেনী ও সুন্নী উসামাহ বিন লাদেনদের সম্প্রদায় ও তাদের সন্ত্রাস দিয়ে সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াতের বাস্তবায়ন হবে না, হবার নয়। আমরা সে আয়াতের ইমাম ও অনুসারী হিযবুল্লাহ হতে চাই। আল্লাহুম্মা আমীন।

সূরা মুহাম্মাদের ৩৮ নং আয়াতের সার কথা ঃ
রাসূল সঃ এর সাথে হিজরত করে মক্কা থেকে মাদীনায় গিয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তনকারী মুহাজিরদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে চরম সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়, "হ্যাঁ, তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে আল্লাহ্র পথে সর্বস্ব নিঃশেষ করতে। তারপরও যদি তোমাদের কেউ কার্পণ্য করো, জেনে রাখো, সে নিজের স্বার্থের বিরূদ্ধেই তা করবে। আল্লাহ্ সকল অভাব মুক্ত। আর তোমরা সবাই তাঁর দুয়ারে ফক্বীর। এরপরও যদি তোমরা সূরা মুহাম্মদের শিক্ষা ও শপথ থেকে মুখ ফিরাও, জেনে রাখো, তোমাদের বদ্লিয়ে অন্য এক জাতিকে এ দ্বীনের দায়িত্ব দেয়া হবে। তারা তোমাদের ন্যায় হবে না"।
রাসূল সঃ কর্তৃক এ আয়াত পড়ে শোনানোর পরই উপস্থিত মক্কী আরব মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের স্থলে তারা কারা হতে পারে? তখন তাদের মাঝে একমাত্র সালমান ফার্সীই চিহ্নিত অনারব ছিলো। রাসূল সঃ তার কাঁধে হাত মুবারক রেখে বললেন, "যদি দ্বীন ইসলাম ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিতাড়িত হয়ে আকাশে উঠে সপ্তর্ষী মন্ডলী হয়ে ঝুলন্ত হয়, তাহলেও এ আজমীরা তা নামিয়ে এনে ধরা পৃষ্ঠে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে।"
এখানে বিশেষ ভাবে বুঝতে হবে যে, তখন আরব বদ্বীপের আরবরা তাদের বাদে ইরানী ও ভারতীয় সবাইকে আজমী বলতো। রাসূল সঃ এর এ বাণী আবু হুরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছে। ক্বোরআনে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি নিজেকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে "গনী" বা ধনী বলে আখ্যায়িত করতে পারে না। তাই যে উমাইয়া খলিফাকে "উসমান গনী" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা ক্বোরআন বিরোধী, ক্বোরআনকে অমান্য করার নামান্তর। যদি আয়াতে "ওয়া আন্তুমুল ফুক্বারাউ ইল্লা উসমান" অর্থাৎ "ওসমান ব্যতীত তোমরা সবাই ফক্বীর" বলা হলেই উসমানকে "উসমান গনী" বলা যেতো। পরে আসলেই ওসমান ধনী ছিলো কিনা, উসমানের বিশেষ অধ্যায়ে তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

এবার আমরা সূরা হুজুরাতের শিক্ষায় যাবো। বোখারী মুসলিম থেকে আরম্ভ করে সকল হাদীস ও তাফ্সীর গ্রন্থে একবাক্যে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সূরাটি আবু বকর ও উমরের অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে তাদের সংযত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা সমূহ এ ভাবে হাদীস ও তাফসীরে বর্ণনা করা হয়। ইব্ন্ কাসীর, তাবারী, শাওকানী ও কুরতবী এবং মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত আবু বকর জাবির আল জাযাইরী রচিত আইসারুত্ তাফ্সীর একযোগে বর্ণনা করেছে, যে সুরা হুজুরাত আবু বকর ও উমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা প্রথমে সূরা হুজুরাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে তারপর সূরা মুহাম্মাদের মতো বিষয় ভিত্তিক তার আলোচনা ও পর্যালোচনা করবো। এ সূরায় মোট আয়াত ১৮টি।

সূরা হুজুরাত

(১) হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে বাড়বে না। আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ সব শোনেন সব জানেন।
(২) হে ঈমানদাররা, তোমরা রাসূলের স্বরের উর্ধে তোমাদের স্বরকে উচু করবেনা। তোমাদের নিজেদের মাঝে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলে থাকো, রাসূলের সাথে সে ভাবে কথা বলবেনা। তাতে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সকল আমল ঝরে যাবে।
(৩) আল্লাহ্র রাসূলদের সামনে যারা নিচু স্বরে কথা বলে, তাদের অন্তর আল্লাহ্র নিকট তাক্বওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
(৪) যারা তোমাকে ঘরের বাইর হতে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।
(৫) তুমি ঘর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্য্য ধারণ করতো, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।
(৬) হে ঈমানদাররা, কখনো কোনো মন্দ লোক যদি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা ভালো ভাবে যাচাই করে নিবে। পাছে তার কথা মতো কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন করে কৃতকর্মে লজ্জিত হতে না হয়।
(৭) তোমরা সর্বদা মনে রাখবে যে, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। অধিকাংশ ব্যাপারে রাসূল তোমাদের

কথা মানলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের ঈমানকে পছন্দনীয় করে তাতে তোমাদের অন্তরকে অলঙ্কৃত দেখতে চান। এবং তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানহীনতা, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃনাই করেছেন। এ গুণাবলীর লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

(৮) এ ভাগ্য আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ বিচারক।

(৯) কখনো দু'পক্ষ মু'মিন বিবাদে লিপ্ত হলে তাদের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা চালাও। তাতে যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে আল্লাহ্ নির্দেশ পালনে রাজী হওয়া পর্যন্ত সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো। অতপর যদি তারা ন্যায়ের দিকে ঝুঁকে, তাহলে ন্যায়নীতি অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন।

(১০) জেনে রাখো, মুমিনরা পরস্পর শুধু ভাই। তাই সর্বদা এ ভ্রাতৃত্বের বাঁধনকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট থাকবে। যদি রহমতে বাস করতে চাও, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে।

(১১) হে ঈমানদাররা, তোমরা তোমাদের কোনো পুরুষ সম্প্রদায় অপর পুরুষ সম্প্রদায়কে হেয় করবে না। হতে পারে ওরা এদের চেয়ে উত্তম। তদ্রূপ কোনো নারী সম্প্রদায়ও অপর কোনো নারী সম্প্রদায়কে তুচ্ছ করবে না। হতে পারে তুচ্ছকারিনীদের চেয়ে তুচ্ছকৃতরা উত্তম। তোমরা একে অপরের প্রতি কটাক্ষ করবেনা। তোমরা পরস্পরকে মন্দ উপাধিতে ডাকবে না। ঈমানের পর এ সমস্ত নীচতা ঘৃণ্য। এ স্বভাব থেকে যারা তওবা করবেনা, তারাই যালিম।

(১২) হে ঈমানদাররা, অধিকাংশ বাজে চিন্তাকে পরিহার করে চলবে। এর মধ্যে কিছু অনুমান পাপ। তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করবেনা। করো পশ্চাতে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করবেনা। কেউ যদি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খায়, তাকে যেমন অপসন্দ করো, এ কাজটি তদরূপ অপছন্দীয়। আল্লাহ্‌কে ভয় করে এসব থেকে তওবা করো। দেখবে আল্লাহ্ পরম দয়ালু, তওবা গ্রহণকারী।

(১৩) হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবাইকে এক নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর শুধু পরিচয় বহনার্থে তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করেছি। স্মরণ রাখবে, তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম। অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ খবর রাখেন।

(১৪) আরবরা বলছে "আমরা ঈমান এনেছি"। হে রাসূল, তুমি ওদের বলে দাও, "তোমরা আদতে ঈমান আননি। বরং তোমরা বল, আমারা আত্মসমর্পন করেছি" কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। ঈমান তখনই প্রবেশ করবে, যখন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। তখন তোমাদের আমলের কোনো ঘাটতি হবেনা। অবশ্যই আল্লাহ্ পরমদয়ালু ক্ষমাশীল।"

(১৫) একমাত্র খাঁটি ঈমানদার ওরাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান স্থাপনের পর আর কোনো প্রকার দ্বিধা দ্বন্দে ভুগেনা, অতঃপর স্বীয় সকল সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, এরাই ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী।

(১৬) এর বাইরে যারা ঈমানের দাবী করে, তাদের অসার দাবী সম্পর্কে রাসূল তুমি বলে দাও, "তোমরা কি গায়ের জোরে আল্লাহ্‌কে তোমাদের ধর্ম শিখাতে চাও?" আল্লাহ্‌তো আকাশ পাতালের সকলের খুঁটি নাটি সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

(১৭) হে রাসূল, আরবরা কি বলতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে কৃতার্থ করেছে? কখ্‌খনো নয়। রাসূল, বরং তুমি ওদের বলে দাও, "তোমরা ঈমান এনে আমাকে ধন্য করেছো ভেবো না" বরং তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্য হলে তোমাদেরই বলতে হবে, "আল্লাহ্‌ই আমাদের ঈমানের পথ প্রদর্শন করে ধন্য করেছেন"।

(১৮) পরিশেষে হে ঈমানদাররা, তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ্ আকাশ পাতালের সকল গোপন জানেন। তোমরা যে যেখানে যে ক্ষণে যা করো, তিনি তা দূরবিক্ষণ করেন।

"হুজুরাত বা পর্দার আড়ালের" এই সূরাটি ঈমানদার মাত্রের মনের সকল পর্দা দূর করে দেয়। আর দুর্বল ঈমানদার ও নাম সর্বস্ব ঈমানদারদের মনের পর্দা ক্বিয়ামতের পূর্বে দূর হবার নয়। সূরা মুহাম্মাদের ২৪নং আয়াতে বর্ণিত সকল তালা ওদের অন্তরে ঝুলছে।

আল্লাহ্‌র ক্বোরআনে যাদের অন্তর খোলে, সে মু'মিন ভাইদের নিয়ে আমি সকল বর্ণিত দৃশ্যপটে বিচরণ করতে যাচ্ছি।

আল্লাহ্ আমাদের অন্তর খুলে দিন। রাব্বিশ্রাহলী সাদ্রী ওয়া ইয়াস্সিরলী আম্রী।

এ সূরার প্রারম্ভে মূখ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ এর হিজরতের আট নয় বছর পর তাঁর বিদায়ের পূর্বক্ষণে তাঁর চার পার্শ্বে জমায়েত আরবদের ঈমানের সালতামামী ও হালখাতা প্রকাশ করেছেন। মতান্তরে মক্কা বিজয়ের পর বা বিদায় হজ্জের পর এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

(১) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়বেনা।

(২) রাসূল সঃ এর কণ্ঠস্বরের উর্ধ্বে কণ্ঠস্বর চড়াবেনা।

(৩) তাঁর সামনে নীচু স্বরে আদবের সাথে কথা বলতে হবে।

তা' না করলে সকল আমল ফুস্। সে যেই হোক। আবু বকর, উমর, আমি বা তুমি। চৌদ্দশ বারো বছর আগের ঘটনা হোক। বা চৌদ্দশ বারো বছরের পর আজকের ঘটনা হোক । এ তিনটি ঘটনা আবু বকর ও উমরের দ্বারা ঘটেছে। এর একটিও যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহরা ঘটায়নি। ইতিহাসের কোথাও একটি ঘটনাও দেখা যায়নি যে মস্তাদআফ্দের কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে বেড়েছে। রাসূল সঃ এর সামনে গলা চড়িয়েছে বা তাঁর সাথে সামান্যতম বেয়াদবী করেছে! এরা কি ক্বোরেশী আবু বকরদের চেয়ে কম মেধা ও বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলো? এ মুস্তাকবিরদের বাদ দিয়ে রাসূল সঃ কেনো মস্তাদআফ্দের যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে আবু বকর ও উমরদের তাদের অধীনে সাধারণ সৈনিকরূপে যুদ্ধে পাঠাতেন? এসব কি আল্লাহ্র রাসূলের খেয়াল খুশিমতো ছিলো? না আল্লাহ্র হুকুম? রাসূল সঃ তো আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত স্বীয় খেয়াল খুশির বশবর্তী হয়ে কিছু করতেন না!

এর সঠিক উত্তর বের করে ঈমান নবায়ন করে তারপর রাসূল সঃ এর আদর্শে বিশ্বে ইসলামের গণজাগরণের ডাক দিতে হবে। তা না হলেই ওঁতপাতা ইয়াহুদী, ব্রাহ্মণ, ক্বোরেশী, তুর্কী, মুঘল ও পাঠানদের প্রেতাত্মারা আন্দোলনকে পুনঃ ভিন্ন খাতে ও ভিন্ন পথে চালিত করবে। যেমনটি হযরত মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ এর পর ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ক্বোরেশীরা করে বিশ্ব রহমতকে লা'নতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর রিসালাতের সমাপনীর সময়। ক্বেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না। তাই রিসালাতের শেষ শিক্ষা দেয়া হয়েছে এ সূরাতে।

বদরের যুদ্ধের পর আবু বকর ও উমর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ এর অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি করে, যেমনটি সূরা মুহাম্মাদের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে। এবার ইয়ামেন থেকে বনী তামীমের প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূল সঃ এর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করে বায়আতের জন্য উপস্থিত হয়েছে। অন্যান্যদের সাথে আবু বকর ও উমরও দরবারে উপস্থিত। তদের কাজ ছিলো রাসূল সঃ কি করেন, তা'দেখা ও তা' শিখা। বোখারী বর্ণনা করছে যে রাসূল সঃ এর দরবারের শিষ্টাচার বর্জন করে আবু বকর রাসূল সঃ কে বলে "কা'কা ইব্ন্ মা'বাদকে এদের আমীর নিযুক্ত করুন"। তা'দেখে উমর বলে উঠে, "না, আকরা ইব্ন্ হাবিসকে আমীর নিয়োগ করুন"।

এরপর আর যায় কোথা? আবু বকর উমরকে বলে উঠে, তুমি আমার বিরুদ্ধাচারণ করছো। উমর আরেক হাত বেড়ে আবু বকরের উপর চড়াও হয়। এভাবে রাসূল সঃ এর দরবারে দু'ক্বোরেশী বাক বিতন্ডা আরম্ভ করলে সাত আসমানের উপর থেকে অহি নাযিল হয়ে এদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়।

তারপরও এরা শিক্ষা গ্রহন করেনি রাসূল সঃ এর সঙ্গে থেকে। এ যদি হয় নিকটবর্তিদের অবস্থা, তা'হলে বহিরাগত বেদুঈনদের ব্যবহার কি হতে পারে? এদের দু'কন্যা রাসূলের ঘরে। সে সুবাদে এরা সময় অসময় এসে রাসূল সঃ কে ঘরের বাহির থেকে ডাকাডাকি করতো। কুরতবী বর্ণনা করছে যে মা হাফসা ও আয়শা যখন রাসূলের মধুপান, যয়নাবের সাথে সময় কাটানো ও মারিয়া কিব্তিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তখন আল্লাহ্র রাসূল সঃ অতীষ্ঠ হয়ে "ইলা" তালাক করে প্রায় একমাস কাল স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে আলাদা বাস আরম্ভ করেন। পরে যখন আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে স্ত্রীদের তালাকের অনুমতি দিয়ে অহী নাযিল করেন, তখন উমরের টনক নড়ে। কারণ, এ ঘটনার প্রথম ঘটক মা হাফসা, পরে সে মা আয়শাকে সহযোগী করে রাসূল সঃ এর গৃহ ত্যাগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। উমরের মেয়ের মাধ্যমে ঘটনাটির মূল উৎস উমর জানতো। বিচিত্র নয় যে এ ধরনের ঘটনার পেছনে এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইংগিত ও সমর্থনও থাকতো। কারণ তখন রাসূল সঃ এর জয়ের পালা। এ জয়ের ঢেউএ চড়ে গোত্রীয় প্রাধান্য বিস্তারে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উজ্জল করনার্থে রাসূল সঃ এর ঘরে কন্যাদের ব্যবহার মোটেও বিচিত্র নয়। বরং পরবর্তী ঘটনাবলী চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাই প্রমাণ করে।

তালাকের ইখতিয়ার সম্বলিত অহি নাযিলের খবর জানা জানি হয়ে গেলে উমর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। দীর্ঘ একটি মাস তার কন্যা, আবু বকরের কন্যার সাথে মিলে রাসূল সঃকে ঘর ছাড়া করার ঘটনাটি কি চাট্টিখানী কথা? এতে তো আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। উমর তড়িঘড়ি রাসূল সঃ এর বাসস্থানে এসে তাঁর খাদেম রাবাহ্‌কে বলে যে সে রাসূল সঃ এর সাক্ষাৎ প্রার্থী। রাবাহ রাসূল সঃকে খবর দিলে তিনি উমরকে অনুমতি দেননি প্রথম বারে।

উমরের বর্ণিত রাওয়ায়েতেই প্রমাণ হয় যে সে ব্যাপারটি পূর্ব থেকেই জানতো। রাসূল সঃ যে "ইলা" করেছিলেন, তা' গোটা মাদীনায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। তাই সে বুঝেছিলো তালাক হলে মা হাফসারই তালাক হবে প্রথম। তারপর হবে মা আয়শার। তাই দ্বিতীয় বারও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তৃতীয় বার রাবাহকে ডাকাডাকি করে। তারপর রাসূল সঃ এর সামনে প্রবেশ করে। উমরের বর্ণনা মতেই জানা যায় যে, সে বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে বিমর্ষ রাসূলকে হাসিয়ে তালাক থেকে তার মেয়েকে রক্ষা করার প্রয়াস পায়। এ ব্যাপারে সূরা তাহরীমের আলোচনায় আরো তথ্য সংযোগ করা হবে।

উমরের মতো ব্যক্তিরাই যদি রাসূলকে হুজরার বাইর থেকে ডেকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তাহলে নির্বোধ মরুবাসীরা রাসূল সঃকে ডাকাডাকি করে কতই না পীড়া দিতো? এ অশোভন পীড়ার মূলেও ক্বোরেশী বুজুর্গরা? কই বেলাল, আম্মাররা তো কখনো এ কাজ করেনি!

এ আচরণ ও স্বভাবের ফলে আমাদের কথিত বুজুর্গ সাহাবীরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। প্রমাণ ৩ নং আয়াত। পরবর্তীতেও এরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছে দেখা যায়। মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় আবু বকর ও উমরকে বোখারী মুসলিমে শাইখাইন অর্থাৎ দু'গুরু রূপে আখ্যায়িত করা হয়। এ ঘটনার পর মুহাদ্দিসদের বর্ণনা মতে উমর নাকি এমন মৃদুভাষী হয়ে গিয়েছিলো যে উমরের মুখের কাছে কান না নিলে উমরের কথা শুনা যেতো না। কিন্তু বোখারীর "কিতাবুল ইতিসাম বিল্ কিতাব ওয়াস সুন্নায়" বর্ণিত হাদিস তা'সন্দেহাতীত খন্ডন করে দেয়। তাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সঃ তার মৃত্যুশয্যায় তার ক্বোরেশী সাহাবীদের হাবভাবে ইন্তেকালের পূর্বে খুব চিন্তিত হন। কারণ তারা উসামাহ্‌র নেতৃত্ব মেনে নিতে চাচ্ছিলো না। যেমনটি তার পূর্বে মুতার যুদ্ধে যায়দের নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি করেছিলো। উসামাহ্‌র নেতৃত্ব মেনে নিতে এবার আপত্তি করায় রাসূল সঃ স্পষ্ট করে বলে দিলেন, "তোমরা যে যে উসামাহ্‌র নেতৃত্বে যুদ্ধে যাবেনা, তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত"। (আল মিলাল্ ওয়ান্ নিহাল)

এ পরিস্থিতিতে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ বলেন, "একটুকরা কাগজ নিয়ে এসো, তাতে আমি আমার শেষ কথা লিখিয়ে দেই, যা'তে তোমরা আমার মৃত্যুর পর বিপথগামী না হও।" কতইনা দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, হতভাগারা সে মুহুর্তেও রাসূল সঃ এর নির্দেশ মানলোনা। কাগজ না দিয়ে তারা বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হলো রাসূলের শয্যার পাশে। উমর বলে, কাগজ দিয়ে দরকার নেই। রাসূল মাথা ব্যথায় অস্থির। অপর রাওয়ায়েতে আছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রলাপ বকছেন। উমর নাকি এ-ও বলেছে যে রাসূল সঃ এর পর ক্বোরআনই যথেষ্ট।

উমর কি রাসূল সঃ এর চেয়ে ক্বোরআন বেশী বুঝে ফেলেছিলো? তা না হলে সূরায়ে হুজুরাতে যা নিষেধ করা হয়েছিল, উমর তার পূনরাবৃত্তি কেনো ঘটালো, যে তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে উচ্চস্বরে এমন হট্টগোল বাধিয়ে ছিলো যে সে মুহুর্তে রাসূল সঃ উমরকে বলেছেন, "আমার পাশে বিতন্ডা করোনা, এখান থেকে বের হয়ে যাও?" উমর যদি ক্বোরআন এতো বুঝে ফেলে থাকে তা'হলে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর কিরূপে বলে যে রাসূল মারা যাননি? তিনি মূসা আঃ এর ন্যায় আল্লাহ্‌র কিতাব আনতে গিয়েছেন। তিনি আবার ফেরৎ আসবেন। যেমন মূসা আঃ এসেছিলেন। হযরত মূসা কি তার দেহ রেখে গিয়েছিলেন? রাসূল সঃ এর লাশ মুবারকতো উমরদের সামনে বিদ্যমান ছিলো! রাসূল কী কিতাব আনতে যাবেন? সে যাবত কি ক্বোরআন নাযিল হওয়া পূর্ণ হয়ে যায়নি? তাহলে কোন্ কিতাবের কথা বলে ছিলো যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট, কাগজ দেওয়ার প্রয়োজন নেই? উমরের এ কথাই কী বুঝায় যে, "যারা বলে যে রাসূল মৃত্যু বরণ করেছেন, তারা মুনাফিক?" আল্লাহ্, রাসূল ও ক্বোরআন সবই ভুল!? আবু বকর, উমর ও মুহাদ্দিসরা ঠিক, এতো হয় না। সাধু সাবধান! তা'না হলে সবকুল হারাবে।

এবার যাওয়া যাক ৬নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীরা, সাবধান! কোনো ভ্রষ্ট ব্যক্তি (ফাসিক) যদি কোনো কথা বলে তা বিশ্বাসের পূর্বে তার সত্য মিথ্যা ভালো করে যাচাই করে নিবে। তা না করলে তোমরা এমন ভুল করবে যে সে জন্য আজীবন অনুশোচনা করলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে না।"

কে এই ভ্রষ্ট ফাসিক্ব ব্যক্তিটি? এ লোকটিও এক ক্বোরেশী, উসমানের সতালো ভাই ওয়ালিদ ইব্‌ন্ উক্‌বা ইব্‌ন্ আবি

মুয়ীত। এ লোকটির পিতা উকবা সেই ব্যক্তি যাকে বদরের যুদ্ধ থেকে ফেরৎ আসার পথে রাসূল পথিমধ্যে তার শিরোচ্ছেদ করে মরুভূমিতে ফেলে আসেন। এ লোকটি উসমানের মায়ের দ্বিতীয় স্বামী। মক্কায় এ কাফেরটি রাসূল সঃ কে এমন কষ্ট দেয় যে, যুদ্ধবন্দি হওয়ার পর তাকে ক্ষমা করা হয়নি আল্লাহ্‌র নির্দেশে। এ কেউটে সাপের বাচ্চাকে এনে উসমান রাসূল সঃ এর দরবারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। সাপের বাচ্চা কি কখনো কল্যাণকর হয়? হয়না। তারই প্রমাণ দেয় ওয়ালিদ। রাসূল সঃ মুসলিম গোত্র বনী মুস্তালিক থেকে বাইতুল মালের যাকাত আনতে তাকে পাঠান। সে ষড়যন্ত্রমূলক মধ্যপথ থেকে ফেরৎ এসে রাসূল সঃ কে মিথ্যা বলে যে, বনী মুস্তালিকরা তাকে যাকাত দেয়ার পরিবর্তে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।

ঈমান আনার পর যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানানো অমার্জনীয় অপরাধ। তাই রাসূল সঃ আলীর নেতৃত্বে তাদের শাস্তি বিধানের জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। আলী গিয়ে দেখতে পায় যে, বনী মুস্তালিকের লোকেরা যাকাত একত্র করে রাসূলের দূতের আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। আলী সে পরিস্থিতিতে সন্দেহে পড়ে রাসূল সঃ কে বিস্তারিত ঘটনা জানায়। তখন আল্লাহ্ অহি নাযিল করে বনী মুস্তালিকের সততার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। অপরদিকে সাপের বাচ্চা ওয়ালিদ পালিয়ে গিয়ে মক্কায় রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা ও কুৎসা রটায়। রাসূল সঃ তার সম্পর্কে নির্দেশ জারী করেছিলেন যে ওকে যেখানেই পাবে, তার শিরোচ্ছেদ করবে। এমনকি কাবার গিলাফে ঝুলন্ত তওবারত পেলেও তাকে ক্ষমা করা যাবেনা। কারণ সে মুস্‌লিম উম্মার মধ্যে হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রের পাপে পাপিষ্ঠ।"

এ ঘটনার সাথে তথা কথিত সিহাহ্ সিত্তা ও তাফ্‌সীর এবং তারিখের কিতাবসমূহে আরেকটি লোকের নাম উল্লেখ রয়েছে। তার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্ আবি সারাহ। এটিও উসমানের আরেক সতালো ভাই, ক্বোরেশী ও বনী উমাইয়া গোত্রভুক্ত। এটাকেও উসমান এনে নবী সঃ এর দরবারে অনুপ্রবেশ করিয়েছিলো। বলা হয়, রাসূল সঃ নাকি এ ইব্‌ন্ সারাহ্‌কে দিয়ে কখনো অহী লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। এ লোকটিও রাসূল সঃ এর দরবারে প্রতারণামূলক কুকর্ম করে পালিয়ে যায়। মক্কায় গিয়ে সে প্রচার করে যে, সে অহী লিপিবদ্ধ করার সময় "আলীমুল হাকীমের" স্থানে "আযীযুন হাকীম" এবং আরো অনেক উল্টা পাল্টা লিখে ক্বোরআনকে বিকৃত করেছে। এ নরাধম আরো প্রচার করেছে যে সে নাকি বিকৃত করার পর তা রাসূল সঃ কে পুনঃ পড়িয়ে শুনালে নাকি রাসূল সঃ বলেছেন, "ঠিক আছে"। এতে সে মক্কাবাসী তার গুরুদের বুঝাতে চেয়েছে যে মুহাম্মাদ সঃ আসলে রাসূল ছিলেন না। তার নবুওত দাবী মিথ্যা। এ আব্দুলাহ ইব্‌ন্ সারাহ ক্বোরআনে বর্ণিত অপর "ফাসিক্ব"। রাসূল সঃ একেও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উসমান খলিফা হয়ে ইব্‌ন্ সারাহকে মিসরের সর্বময় ক্ষমতাধর গভর্ণর বানায় এবং ওয়ালিদ ইব্‌ন্ উক্‌বা ইব্‌ন্ আবি মুয়ীতকে গুরুত্বপূর্ণ ইরাকের শাসক নিয়োগ করে। ওয়ালিদ বাইতুল মালের অর্থে ইরাকে মদ্যপান ও নর্তকীদের আড্ডা জমাতো। কিন্তু একদিন মাতাল অবস্থায় ফজরের নামাজ তিন রাকাত পড়ালে তাতে মুক্তাদীরা আপত্তি করলে সে জানায়, "আপত্তির কী আছে, তোমরা আরো বেশী পড়তে চাইলে আসো, যতো রাকাত চাও পড়িয়ে দিচ্ছি"। তার এ আচরণের বিরুদ্ধে ইরাকবাসী মুস্‌লিমদের পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্ মাস্‌উদ উসমানকে বিস্তারিত লিখে জানালে উসমান ইবনে মাসউদকে মদীনায় তলব করে মস্‌জিদে নববীর চত্বরে মারওয়ানসহ তাকে শারীরিক ভাবে অত্যাচার করে। মা আইশা এর প্রতিবাদ করলে উসমান মা আয়শাকে নূহ্ ও লূতের স্ত্রীর সাথে তুলনার আয়াত পড়ে অপদস্থ করে। সেই শারীরিক অত্যাচারের কিছুদিন পর রাসূল সঃ এর প্রিয়তম সঙ্গী ইব্‌ন্ মাসউদ মৃত্যু বরণ করে। অপর দিকে ইব্‌ন্ সারার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে মিসরবাসী প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

এ হলো ক্বোরআনে বর্ণিত ফাসিক্বদের ক্রিয়া-কলাপ, যা রাসূল সঃ এর বিশ্ব রহমতের রিসালাতকে পরিবর্তন করে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর করে বিশ্বমানবতার দ্বীনকে কলঙ্কিত করেছে। এখন ক্বোরআনে বর্ণিত রাসূল সঃ এর সুন্নায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন না করলে বর্তমানে নামধারী মুসলমানদের আল্লাহ্ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল করে অন্য কোনো জাতিকে তাঁর দ্বীনের চূড়ান্ত উত্থান ও বিজয়ের জন্য নিয়োগ করবেন। যার ইশারা তিনি সূরা মুহাম্মদের শেষ আয়াতে দিয়েছেন। সূরা মুহাম্মদের পর সূরা হুজুরাত দিয়ে সে পথের দিকদর্শন উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠকদের বইয়ের এ অধ্যায় পড়তে ও বুঝতে হবে।

সূরা হুজুরাতের নবম আয়াতের মর্মে মুমিনদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ ভাইদের বিরোধের মতো মিটাতে হবে। ভ্রাতৃত্বে ফাটল ও ভাঙ্গন সৃষ্টির মাধ্যমে কখনো নয়। দশম আয়াতে তা আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেছেন, "হে মু'মিনরা সাবধান! তোমরা ঈমানদাররা শুধু পরস্পর ভাই। যদি রহমতে বাস করতে চাও, তা'হলে যে কোনো মূল্যে ভ্রাতৃত্বের

বাঁধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরো করার প্রচেষ্টায় থাকবে। এ পথে তাক্বওয়ার কোনো বিকল্প নেই।"

ত্রয়োদশ আয়াতে আল্লাহ্ ইসলামী ভ্রাতৃত্বে ফাটল ও ভাঙ্গন সৃষ্টির কারণ সমূহ বলে দিয়েছেন। তা'হলো ঈমানদাররা কখনো সাম্প্রদায়িক উপহাস ও ঠাট্টা করবেনা। পুরুষও না নারীও না। কখনো ইবলিস শয়তান তার মানুষ সন্তানদের দ্বারা কোনো মু'মিন নর নারীর মনে ঠাট্রা উপহাসের উদ্রেক করা মাত্রই তাকে শয়তানের প্ররোচনা মনে করে ভাবতে হবে যে আমার যে ঈমানী ভাই বা বোন সম্পর্কে আমার অন্তরে যে তাচ্ছিল্য বা উপহাসের উদ্রেক হয়েছে, তাতো ঠিক নয়। হতে পারে আমদের অজান্তে তারা আমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ঈমান ও আমলে অগ্রগামী। তা হলে রোজ ক্বেয়ামতে আমার বা আমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ মনের গোপন অবস্থা সব জানেন।

শয়তানের প্ররোচনা মানুষকে বর্ণ ও গোত্রবাদী বানিয়ে অভিশপ্ত করে। যেমনটি শয়তান নিজে বর্ণবাদী হয়ে চির অভিশপ্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ্ ইবলিসকে "ফাসিক" বলেছেন। ঈমান আনার পর ফাসেকী হলো নিকৃষ্টতম পাপ। ঈমান আনার পর যারা তাদের অতীত গোত্র ও বর্ণবাদী ফাসেক্বী থেকে তওবা না করে, তাদের ঈমান অসার। মূলতঃ এরা যালিম। (আয়াত-১১)

অমূলক অনুমান ও চিন্তা থেকে মানুষের অন্তরে শয়তানী ধ্যান ধারণার জন্ম হয়। এটাই পাপের বীজ। এ থেকে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ও পরচর্চার উদ্ভিদ জন্মায়। এ কাজটিকে আল্লাহ্ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সম ঘৃণ্য কাজ বলেছেন। কারো অন্তরে যখনই এ ধরনের শয়তানী কুমন্ত্রণার উদ্রেক হয়ে ঈমানী সংহতির পরিপন্থি কোনো কাজ করার পর স্মরণ হতেই তখনই তওবা করে ঈমানে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে আর মু'মিন থাকবে না।

ত্রয়োদশ আয়াতে আল্লাহ গোটা মানব জাতিকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের শাশ্বত মানদন্ড বলে দিয়েছেন এ বলে যে, "হে মানবজাতি, আমি তোমাদের একজোড়া নর-নারী থেকে উৎস করে শুধু মাত্র পরিচয়ের নিমিত্তে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করেছি। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের সমষ্টি থেকে একমাত্র অধিক মুত্তাক্বী ব্যক্তি, সবচেয়ে বড় সম্মানী। স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ সব খবর রাখেন।" এখানে অতীব গুরুত্ব সহকারে একটি বাক্য লক্ষ্য করতে হবে। তা'হলো আল্লাহ্ তোমাদের "মুত্তাকী ব্যক্তিরা" বলেননি। বলেছেন মুত্তাকী "ব্যক্তিটি"। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্‌র নিকট বেশী সংখ্যার কোনো মূল্য নেই। মানুষের মতো মানুষ একটি হলেই কোটি কোটি আধা মানুষ ও অমানুষ থেকে যথেষ্ট।

পেছনের ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নং আয়াতের একটু বিচার বিশ্লেষণে যাওয়া যাক। সূরাটি প্রচলিত মুসলিম জাতির দু'শেখ ও "খাইয়ারান" আবু বকর ও উমরকে নিয়ে অবতীর্ণ। রাসূল সঃ আদ্যপান্ত সূরা মুহাম্মদের ভিত্তিতে মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অবিভাজ্য ঐক্য স্থাপন করেন। সে বন্ধনকে দশ বছর ধরে আরো দৃঢ় করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর লাশ মুবারক এখনো দাফন করা হয়নি। তিরিশ হাযার সৈন্যের বাহিনী দাঁড় করিয়ে, স্বহস্তে পতাকা বেঁধে, মুহাজির ও আনসার সবার উপর উসামাহ্ বিন যায়দকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। যারা তাঁর এ নিয়োগের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, প্রচন্ডমাথা ব্যথা ও জ্বর নিয়ে শির মুবারকে পট্টি বেঁধে তিনি অন্যের কাঁধে ভর করে দু'বার মিম্বারে উঠে তাদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এবং তারপরও যারা উসামাহ্‌র নেতৃত্বে যুদ্ধে যাবে না, তাদের রাসূল সঃ লা'নত করে যান। ইসলামে যুদ্ধের ইমামতের মর্যাদা শান্তির ইমামতের উর্ধ্বে। কারণ, শান্তির দু'রাকাত, তিন রাকাত বা চার রাকাত সালাতের ইমামতী যে কেউ করতে পারে। কিন্তু জিহাদের ময়দান, যেখানে জানমাল সবকিছু দিয়ে ইমামতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, সে ইমামতী কি ইমামতে "ক্বোবরা" বা সর্ববৃহৎ ইমামতী নয়? এই বইয়ের প্রথম পাতায় আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবীকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা' সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে সে আয়াতটির মূলে ক্ষণিকের জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে। তা'হলে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হবে।

আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি তাঁর বিশেষ ক্রিয়ায় বিশ্বের নির্যাতিত, অর্থাৎ তাঁর বিশেষ পরিভাষায় "মুস্তাদআফদের ঈমাম বানাবেন।" তাও আবার পৃথিবীর ফিরআউন ও হামানদের শ্রেণীর মুস্তাক্‌বিরদের উপর সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে। গোটা পৃথিবীর একচ্ছত্র উত্তরাধিকার দেবেন তিনি মুস্তাদআফ্‌দের। আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ

অর্থাৎ তাদের ইমাম বানিয়ে গোটা পৃথিবীর কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করে উত্তরাধিকার দান করা হবে। এবং বিশ্বময় ফিরআউন, হামান ও তাদের স্বৈর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বিশ্বকে তাদের পরিণতি স্বচক্ষে দেখানো হবে।

রাসূল সঃ মক্কার নব্য ফিরআউনের অত্যাচারে মক্কা ত্যাগ করে মক্কা থেকে প্রায় সত্তর মাইল পূর্বে তায়েফে হিজরত করেন যায়দকে নিয়ে। তায়েফের ফেরআউনের অত্যাচারে উভয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কোনো প্রকার প্রাণে বেঁচে এক বনে আশ্রয় নিয়ে মুস্তাদআফদের প্রভূ আল্লাহ্‌র নিকট মক্কা ও তায়েফের ফিরআউনদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানান। يا رب, يا رب المستضعفين، أنت ربي ইয়া রাব্বাল মুস্তাদআফীন আন্তা রাব্বী, হে মুস্তাদআফদের প্রভু, আপনি আমার প্রভু! আল্লাহ তার মুস্তাদআফ রাসূল ও তাঁর মুস্তাদআফ্ সঙ্গী যায়দকেও কৃবুল করে নেন। তাই তিনি কোরআনে উল্লেখ করেছেন। وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

এই সেই যায়দ, যাকে তুমি পুরস্কৃত করেছো। আমিও তাকে পুরস্কৃত করেছি। এ পুরস্কারটি কী? যায়দকে দাসদশা থেকে মুক্ত করা? যায়েদ তো মূলে দাস ছিলোই না! সে তো মক্কার ক্বোরেশদের চেয়েও শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ বনী কালবের এক অপহৃত ব্যক্তি! বিশ্বকোষ পড়লে দেখা যায় যে ইয়াহুদী-খৃষ্টান, যারা আখেরী নবী সঃকে নবীরূপে স্বীকৃতি দেয়না, তারা লিখছে, মুহাম্মদ তার সঙ্গী যায়দের নিকট থেকে তাওরাত ও বাইবেলের বর্ণনা শুনে তার উপর ভিত্তি করে ক্বোরআন রচনা করে নবুওতের দাবি করেছে। যায়দের গোত্র যেহেতু শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের প্রতিবেশী ছিলো, তাই তারা পূর্ববর্তী ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসার ধর্মাবম্বীদের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানে এতো সমৃদ্ধ হয়েছিলো যে অপর এক ব্যক্তিকে নবী দাবী করার মতো তথ্য সরবরাহ করেছে! রাসূল সঃ ও ইসলামের শত্রু হলেও যায়দের গোত্র সম্পর্কে ইয়াহুদীদের বর্ণনা থেকে যায়দের মন মানসিকতার মান ও পরিমাণ আঁচ করা যায়।

বরং আমরা মু'মিনরা শত্রুদের বর্ণনা থেকে এ ধারণা পোষণ করবো যে ইয়াহুদী-খৃষ্টান প্রতিবেশীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তাওরাত ও বাইবেলের ইংগিত থেকে যায়দ খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ কে চিনে তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

তায়েফের হিজরতে আল্লাহর রাসূল সঃ ও তাঁর সহচর যায়দ মুস্তাদআফের মঞ্জুরী পেয়ে মাদীনায় হিজরত করে মাদীনায় মুস্তাদআফদের রাষ্ট্রের পত্তন করেন। দশ বছরের সংগ্রামে মক্কা ও তায়েফের মুস্তাক্‌বিরদের আল্লাহর সাহায্যে রাসূল পরাজিত করেন। মেরাজে দেখানো অভিশপ্ত বৃক্ষ মক্কাবাসী উৎপাটিত হয়। إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ "অবশ্যই তোমার প্রতিপালক মক্কার লোকদের ঘিরে ফেলেছেন" এর অর্থ বাস্তবায়িত হলো।

তারপর শুরু হলো সিরিয়ার ফিরআউনের বিরুদ্ধে অভিযান। এর উদ্বোধন করালেন রাসূল তাঁর প্রিয় যায়দকে দিয়ে। রাসূলের আদেশে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে লক্ষাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে শাহাদাত বরণ করে যায়দ প্রমাণ করলো যে, যায়দই সে সিদ্দীক, যা হওয়া অন্য কোনো গোত্রবাদীর ভাগ্যে জোটেনি। ঈমানের ক্ষেত্রেও প্রথম, শাহাদাত বরণেও প্রথম! এ-ই না হলো খাঁটি সিদ্দীক! যায়দের সঙ্গে রাসূল সঃ এর আদেশ পালন করে ধন্য হলো ক্বোরেশী মুহাজিরদের দিকপাল জা'ফর ইব্‌ন আবি তালিব ও আনসারদের নয়নমনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা।

রাসূল সঃ এর মিশন শেষ প্রান্তে। আল ক্বোরআনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক খাতামুন নাবিয়্যীন নিকৃষ্ট রোগাক্রান্ত জাতির মাঝে প্রেরিত হন। ঔষধ উদ্ভাবন করে তার ব্যবহার বিধির প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর বাণী শুনান তিনি।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আমি আল্ ক্বোরআন দিয়ে ঈমানদার জনগোষ্ঠীর রোগ নিরাময় ও রহমত অবতীর্ণ করলাম। কিন্তু মানব জাতির মধ্যে যারা যালিম, ক্বোরআন তাদের উত্তরোত্তর ধ্বংস বিধান করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

মু'মিন হলে ক্বোরআন শিফা ও রহমত। যালিমদের জন্যে ক্বোরআন আজরাঈলের চরমপত্র। ক্বোরআনই আহ্‌সানুল হাদীস, আস্‌দাকুল হাদীস ও আসাহ্‌হুল হাদীস। অর্থাৎ সবচেয়ে সত্যকথা ও সর্বোত্তমবাণী। কিন্তু এ ক্বোরআনকে গিলাফ্ ও জুযদানে ঢুকিয়ে রাসূল সঃ এর কিছু কিছু সত্য কথোপথন বা বাণীর সাথে অজস্র মিথ্যা বিবেক বুদ্ধি বিবর্জিত উদ্ভট বানোয়াট কিস্যা কাহিনী রচনা করে যারা তাকে "সিহাহ সিত্তা" বা সবচেয়ে সত্য ছয় কিতাব নামকরণ করে ইসলাম ও তার শেষ রাসূলের শিক্ষা থেকে মাবনজাতিকে বিপথগামী করেছে, সে ইবলিসের মানব সন্তানদের স্বরূপ উদঘাটন না করলে বিপন্ন মানবতার মুক্তির সন্ধান দেয়া যাবে না। তাই ক্বোরআনকে শক্ত হাতে ধরে তার কষ্টিতে রাসূল সঃ এর সত্যবাণী সমূহ বাছাই ও যাচাই করে ধর্মবেসাতী মোল্লাহ মৌলবীদের সর্বপ্রথম উৎখাত করতে

হবে। তারপরই খাঁটি ও হালালভোগী আলেমদের নিয়ে ক্বোরআন ও সহীহ্ সুন্নার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তা না হলে ক্বোরেশী, হাশেমী, সাইয়েদ, শিয়া, সুন্নী, বাঙ্গালী, হিন্দি, পাকিস্তানী, আফগানী, ইরানী ও সৌদী প্রভৃতি দাজ্জালরা পুনঃ ইসলামী আন্দোলনকে ঠিক সেভাবে বিপথে চালিত করবে, যেভাবে রাসূলের বিদায়ের পর আরব বর্বর ও তাদের ক্রীতদাস মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিররা করেছে। ন্যাড়া যেমন বেলতলায় শুধু একবারই যায়, দ্বিতীয়বার যায়না, তদরুপ আমি আমাকে ও আমার মু'মিন ভাইদের দ্বিতীয়বার শির্ক ও বিদ্‌আতের জালে ফাঁসাতে চাইনা। তাই কথাকে বারবার "ফাবি আইয়ে আলা'য়ে রাব্বিকুমা তুকাযযিবান" এর মতো পুনরাবৃত্তি করছি। ক্বোরআনের শিক্ষায় ক্বোরআনে ফেরত আনার জন্য আমার এ লেখা। তাই এতে ক্বোরআনের মতো পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে তা' মনে রেখে এ রচনাকে পড়তে ও বুঝতে হবে। তারপরই এর বক্তব্যকে ধারণ করার যোগ্যতা হবে। এ যোগ্যতা সম্পন্ন বাহিনীর প্রয়োজন আমার। অযোগ্য লোকদের নিয়ে আমার পরিবার গড়ে উঠবেনা। রাসূল সঃ এর আদর্শে যারা ক্বোরআনকে ধারণ করে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ হবে, আমি তাদের সঙ্গী হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে কৃতসংকল্প। ক্বোরেশী, উমাইয়া, আব্বাসী, মুঘল, পাঠান, শিয়া, সুন্নী বা হানাফী, হাম্বলীদের পথ, আমার পথ নয়। তাই সাহাবী তাবেঈদের ভেড়ার পালদের অন্ধ সনদ শুধু প্রত্যাখ্যানই করিনা, বরং আমি তাকে তাওহীদ, রিসালাত, ক্বোরআন ও রাসূলদের বুঝার পথে সবচেয়ে ক্ষতিকর বাধা মনে করি। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী দজ্জাল এবং তাদের প্রেতাত্মা তুর্কী ও মোঘল সাম্রাজ্যবাদের কেনা তথাকথিত মুহাদ্দিস বা হাদীস বর্ণনাকারীরা নিজ নিজ প্রভুদের দাজ্জালীকে বৈধতা দান করে তাকে পরবর্তী সম্ভাব্য সংস্কার আন্দোলনের বুলডোজার থেকে রক্ষার জন্য একটি নির্লজ্জ অভিনব প্রথা চালু করে গিয়েছে। তাহলো তাদের প্রথায় রাসূল সঃ এর বাণী বর্ণনা ও প্রচার করতে হলে যে কোনো হাদীস বর্ণনাকারীকে তার পূর্বের বর্ণনাকারী হয়ে রাসূল সঃ পর্যন্ত পৌছাতে হয়। তা' না হলে নকি হাদীস বুঝা বর্ণনা করা যাবে না। কি চমৎকার নির্লজ্জ প্রতারণার বেড়াজাল!

অথচ রাসূল সঃ এর বিদায়ের দিন থেকে দীর্ঘ নব্বই বছর যাবৎ একটানা তাঁর শিক্ষাকে ত্যাগ করে ক্বোরআনকে বর্জন করে, মুস্তাদআফ্ ও মাদীনাবাসী আনসরাদের ইসলামী রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে উৎখাত ও নির্মূল করে ক্বোরেশী ও উমাইয়া সাম্রাজ্যের অভিশাপ দিয়ে ইস্‌লামকে বিকৃত ও কলঙ্কিত করে দীর্ঘ নব্বই বছর পর হাদীস লেখা ও বর্ণনার প্রথা চালু করা হয়। আব্বাসীরা এসে তাদের পাপাচারকেও বৈধতা দেয়ার জন্য এ সিল্‌সিলা চালু রাখে। তাদের নামে খুত্‌বার প্রচলন করে যায়। যা' চৌদ্দশ ছরের পুরানো মিথ্যার বোঝাকে বহন করে আজো আমাদের কাঁধে বংশ পরম্পরায় নিক্ষেপ করছে। ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগে যে আজ চৌদ্দশ বছর পরও প্রত্যেক জুমা বা ঈদের খুতবায় শুধু দশজন ক্বোরেশী ব্যক্তির নাম নেয়া হয়। অথচ আল্লাহ পৃথিবীর বুক থেকে ক্বোরেশী তথা আরবদের সাম্রাজ্যকে শুধু নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়েননি, মক্কা মাদীনা থেকে আরম্ভ করে আজ বিশ্ব কোথাও কোনো মস্‌জিদেও কোনো ক্বোরেশী ইমামতের দাবীদার ইমামের অস্তিত্ব নেই। তারপরও বোখারী মুসলিমদের "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" ইমাম ও নেতা শুধু ক্বোরেশ বংশীয় হতে হবে, চালু থাকবে? কী বলো মুহাদ্দিস সাহেবরা? মসজিদের ইমামরা কি বলো? তোমরা ক্বোরেশ বংশীয় না হয়ে যে নামাজের ইমামতী করছো, তা'কি বৈধ হচ্ছে? ইমামতী ছাড়বে, না বলবে যে, "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" মিথ্যা? তোমরা কি ইয়াযীদ ও মারওয়ানের সিলসিলার ইমাম? ক্বোরেশী সিলসিলার ইমাম তালিকায় ৫, ৬ ও ৭ নং ইমাম হলো মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ ও মারওয়ান।

নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, ও মুহাম্মদ সঃ দের ইমামত মুস্তাদআফদের ইমামত। তাঁরা সবাই বাবা আদম আঃ এর সন্তান। তিনি মাটির সৃষ্ট। তাঁর সন্তানদের মধ্যে মুত্তাক্বীতম ব্যক্তিটিই সর্বোত্তম সম্মানী। কোনো বংশ ও বর্ণের কোনো পার্থক্য বা বৈষম্য নেই তাতে। এটাই ইসলাম। ইসলামী ঈমানের রশি ধারণ করে মুসলিম, মু'মিন, ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হতে হয়। যেমন পূর্বের নবীদের রশি ধরে রাসূল সঃ খাতামুন নাবিয়্যীন হয়েছিলেন। তদ্‌রূপ যায়দ, আম্মার, বেলাল, সালমান, সুহাইব, উসামাহরা স্ব-স্ব গোত্র ও বর্ণ বিসর্জন দিয়ে রাসূল সঃ এর অনুসারী হয়েছিলো। তাদের প্রতি যখনই রাসূল সঃ অমনোযোগী হয়েছিলেন তখনই অহী নাযিল হয়েছে, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ "ওদের চোখে চোখে রাখো, ওদের থেকে চোখ নামাবেনা।" (সূরা কাহ্‌ফ-২৮) ইতিহাসে একটি ঘটনাও এদের ব্যাপারে দেখা যায় না যে এরা কখনো আল্লাহ ও রাসূলের সীমা অতিক্রম করেছে, বা রাসূল সঃ এর দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলেছে। বা নিজ বংশ বা গোত্রের টান টেনেছে। অপর দিকে ক্বোরেশী খলীফা ও ইমাম এবং তাদের কন্যাদের ব্যাপারে কঠোর ভাষায় পূর্ণপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে, "আল্লাহ ও রাসূলের অগ্রগামী হবে না, রাসূলের স্বরের উপর গলা চড়াবেনা। তাঁর

সাথে নিজেদের মধ্যে যেমন বেপরওয়া কথা বলো, তেমন বলবেনা। তাঁকে বাহির থেকে ডাকাডাকি করবেনা এবং এরা তো নূহ ও লূতের স্ত্রীদের ন্যায়" ইত্যাদি।

তাই বংশানুক্রমিক সিলসিলা মুমিন ও মুত্তাকী মানব গোষ্ঠীর ধর্ম নয়। ওটা ইব্‌লিস ও তার সিলসিলার ধর্ম। ইবলিসের জ্বিন ও মানব সন্তানরা কখনো সিলসিলার বাইর হতে পারবেনা । তারা ক্বেয়ামত পর্যন্ত ঐ সিলসিলায় চলবে। কারণ, তাদের দিয়ে আল্লাহ্ জাহান্নাম বা নরক পূর্তি করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তাই সিলসিলার বেপারীরা সাবধান! সিলসিলার খদ্দের, মুরীদ ও আশেকরাও সাবধান! বুঝ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে তাওহীদ ও রিসালাতের সকল সিলসিলার শেকল ছিঁড়ে ফেরৎ না আসলে তোমাদের খবর আছে। তোমাদের দ্বারা জাহান্নামের উদর পূর্তি হবে?

প্রাসঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় কথা বলে পুনঃপুনঃ সূরা হুজুরাতে ফেরৎ যাচ্ছি। কারণ এ সূরাই আবু বকর উমরসহ ক্বোরেশী ও অক্বোরেশী মুস্তাকবির আরবদের ঈমানের চুলচেরা বিবরণ দিচ্ছে। তাও সাত আসমানের উর্ধ্ব থেকে অহী নাযিল হয়ে। কোনো সাহাবী, তাবেঈ, মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসের বর্ণনায় নয়। এখানে প্রত্যেক মুক্তিকামী আদম সন্তান, নর কি নারী, তাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিকট মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ তাক্বওয়া। বর্ণ, বংশ বা জাতপাত নয়।

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পূর্বে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। তাও এর মূল ব্যক্তিদ্বয় আবু বকর ও উমর। এরাই তাক্বওয়ার মানদন্ডের বাইরে, আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ বলে সকল মু'মিনদের বাদ দিয়ে ক্বোরেশী খেলাফত, ইমামত ও সাম্রাজ্যবাদের পত্তন করে। যার ফলে ক্বোরেশীরা পরিবার রূপে ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল হওয়া পর্যন্ত এরাই ইসলামের নামে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সকল প্রকারের কুকর্ম করে আল্লাহর আখেরী নবীর দ্বারা পূর্ণ করা দ্বীনকে কলঙ্কিত করে। এ সর্বনাশ কি কোনো লঘু পাপ যা সম্পর্কে হাল্‌কাভাবে দু'চার লাইন লিখে ছেড়ে দিলেই মুসলিম উম্মার উপর প্রলেপিত পাপ মুছে যাবে? কখনো নয়। তাই আসো। ঈমানদার বান্দারা, আমরা অন্তর দিয়ে ক্বোরআনে ডুব দেই।

এ সূরার ১৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূল! আরবরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বলো, তোমরা আদৌ ঈমান আনোনি। তোমরা শুধু পরাজয় দেখে আত্মসমর্পন করেছো। এটাই বলা তোমাদের সমীচীন। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। এখন থেকে তোমরা যদি সঠিক অর্থে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তা'হলেই তোমাদের আমল গৃহীত হবে, তোমাদের আমলের কিছুই আল্লাহ্ বাদ দিবেন না। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

এখানে অতিগুরুত্ব সহকারে একটি আরবী শব্দ স্মরণে রেখে তা সর্বদা মনে রাখতে হবে। তা' হলো "আল্ আ'রাব"। এর সোজা ও সরল অর্থ হলো, "আরবরা"। এ শব্দটি দিয়ে যে আরবরা গোটা মানবজাতির ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় মিথ্যার জাল বুনে বিশ্বকে প্রতারণা করে আসছে, তাকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা, বর্তমানে বিপন্ন মানব জাতির উদ্ধার ও মুক্তির জন্য ততটুকু প্রয়োজন, যতটুকু কা'বাকে ক্বোরেশী কাফের মুশরিকদের তিনশত ষাট দেবদেবীর প্রতিমা থেকে পবিত্র করে আখেরী নবী সঃ কে পুনঃ নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা, আঃ দের তাওহীদ ও রিসালাতের কেন্দ্রে পরিণত করতে প্রয়োজন হয়েছিল। তাই বাবা আদম আঃ ও মা হাওয়ার সন্তানদের এ অধ্যায়টি আদম সৃষ্টির লগ্নে ইবলিস শয়তানের চক্রান্তের ঘটনার মতো গুরুত্ব দিয়ে বুঝে পড়তে হবে। অন্যথায় ইব্‌লিসের বানানো সম্মুখ পশ্চাৎ ও ডান বামের চার দেয়ালীর খাঁচায় আবদ্ধ থেকে আদম সন্তানদের জাহান্নামের উদরপূর্তি করতে হবে। যেমনটি অভিশপ্ত ইব্‌লিস সেদিন ঘোষণা করেছিলো। তাই চলো আমরা সবাই একবার কায়মনে "আউযু বিল্লাাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম" পড়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আঁটঘাট বেঁধে এ অধ্যায়টি পড়ি ও বুঝি। ইতিহাসের রাস্তার এ মোড়টি যে বা যারা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, তাকে এবং তাদের পৃথিবীর সকল জ্বীন শয়তান ও তাদের মানব সন্তানেরা একত্র হয়েও বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। ফলে এরাই পৃথিবীর কাঙ্খিত ইমাম মাহ্‌দী ও তাঁর সৈনিক হয়ে বিশ্বের তাগুত মুস্তাক্‌বিরদের করাল গ্রাস থেকে মুস্তাদআফ্‌দের মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হবে। ইন্‌শা আল্লাহ।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে যখন কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ করে বাংলাদেশ থেকে পবিত্র মক্কা নিয়ে যান, তখন মক্কা পৌছে ইব্রাহিম আঃ ও মুহাম্মাদ সঃ দের আদর্শ ও লক্ষ্যহীন হজ্বের মেলা দেখে আমার ষষ্ঠ অনুভূতি জেগে উঠে। বিশেষ করে গয়া-কাশির পান্ডাদের আরবী সংস্করণ মুয়াল্লেম ও মুতাওয়েফদের কান্ডকারখানা দেখে আমি দস্তুর মতো বিস্মিত হয়ে যাই। তার সাথে পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বেদনাদায়ক তথ্যাদির যোগ হয় বিশ্বের তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের নেতা নামের ভিক্ষুকদের দেখে। এরা

প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের ইসলামবিরোধী সরকারসমূহের কার্যকলাপের ফিরিস্তি বর্ণনা করে আরবদের তেলের পয়সার কিছু উচ্ছিষ্ট লাভ করে মক্কা ও মদীনাকে ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের হাতে তুলে দেয়া আরব রাজা বাদশাদের ব্যাপারে নিজ নিজ দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে। যার ফলে বিশ্বের ইসলামী পূনর্জাগরণের প্রত্যাশী মানবগোষ্ঠির আজ এ দুর্দশা।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনদের নেতা হাসানাল হুদাইবী, পাকিস্তানের জামাতী নেতা আবূল আ'লা মওদুদী ও ভারতের আবুল হাসান নাদভী প্রভৃতি ও তাদের পার্শ্বচরদের ক্রিয়াকলাপ আমাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। আমি দেশে ফেলে যাওয়া বিধবা মা, তিন এতিম ভাই, একবোন ও ষাটদিন বয়সের একটি কন্যাসহ স্ত্রীর বিরহ ব্যথা মক্কা মদীনার বন্দিদশা দেখে প্রায় ভুলে যাই। শুরু হয় আমার নতুন দিক দর্শনের অধ্যায়।

চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে দেখি আরব দাজ্জালদের ভিক্ষা সংগ্রহ করে ইসলামী আন্দোলনের(?) নেতাদের ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ইউরোপ আমেরিকায় হিজরতের (?) ইবলিসী তামাশা। তারা স্বপরিবারে ঐ সমস্ত দেশে গিয়ে তাদের সন্তানদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট যৌন বিকৃত সহশিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশে এসে ইসলাম ও তাগুত ত্যাগের লেক্চার দেয়। একেই হয়তো "ভূতের মুখে রাম নাম জপ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূল সঃ এর ভবিষ্যদ্ববাণীর চূড়ান্ত দাজ্জালের পূর্বে এ ক্ষুদে দাজ্জালেরা দেশে এসে তাদের ও তাদের সন্তানদের আসল গুরু, ইয়াহুদীদের গণতন্ত্রের রাজনীতি করে। বরং তাদের সন্তানদের উলঙ্গ মেয়েদের সাথে সহশিক্ষার ন্যায় এরা বেপর্দা বেআব্রু নারী নেত্রীদের আঁচল তলে আশ্রিত রাজনীতি করে। আরবদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনা অর্থে ইয়াহুদী ধনলিপ্সা ও ভোগবাদের ব্যাঙ্ক-বীমা প্রতিষ্ঠা করে সম্ভাব্য ইসলামী নেতৃত্বদানে যোগ্য যুব শক্তিকে লক্ষ্যচ্যুত করে তাদের মূল "ইলাহ্" ইবলিসের শাগরেদ বানায়। এসব বিকৃতির মূলে "বনী আদম" অর্থাৎ আদম সন্তানদের তাদের আল কোর্আনে বর্ণিত "তাক্ওয়ার" জাতীয়তা ত্যাগ করে বর্ণবাদী জাতীয়তায় বিভক্ত হওয়া। তার সর্ব নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো ইব্রাহীম ও মূসা আঃদের আদর্শ ত্যাগ করে ইয়াহুদী হওয়া এবং আখেরী নবী সঃ এর মুস্তাদআফ্ ঐক্যকে জবাই করে তার স্থলে ''আল্ আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ'" চালু করা। এর পেছনে ইবলিসের যে আঠা কাজ করেছে, তা'হলো "আরব" শব্দের উৎপত্তি , আরবজাতি ও আরব জাতীয়তার মূল সম্পর্কে দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরে মিথ্যা প্রচার। আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর কিতাব আল্ কোরআন রক্ষিত না থাকলে আজ আমাদের সে মিথ্যা থেকে বের হওয়ার কোনো পথ থাকতোনা। সূরা মুহাম্মাদ ও সূরা হুজুরাত মানব জাতির হারানো পথ ফিরে পাওয়ার মাইল ফলক, আসমানী রিসালাত।

হুজুরাতে আল্লাহ্ প্রণীত আভিধানিক বর্ণর্না পড়ে তার সাথে সূরা তওবায় বর্ণিত আরবদের চার শ্রেণী বিভাগ পড়ার পর আরবজাতির আরবী ভাষার চূড়ান্ত দু'শীর্ষ অভিধান তাজুল আরুস্ ও লিসানুল আরবের "আরব" ধাতুর বিশেষণ পড়লেই দিবালোকের ন্যায় আখেরী নবী সঃ এর বিদায়ের পর মুসলিম উম্মার বর্তমান অবস্থার কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখান থেকে পূর্ণ উপলব্ধি সহকারে কালেমায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে মিল্লাতে ইব্রাহিম ও রিসালাতে মুহাম্মাদীতে প্রবেশ করা মাত্র বিশ্ব মুস্তাদ্আফীনের সূরা কাসাসের ৫ নং আয়াতে ওয়াদাকৃত ইমামতি ও জামাতের সূর্য উদিত হবে।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ ''তোমরা কক্ষনো রাসূলদের সাথে কৃত আল্লাহ্র ওয়াদার এদিক ওদিক হবে কল্পনা করবেনা"। (সূরা ইব্রাহীম-৪৭) এবার আমরা আল ক্বোরআনের অভিধানে আরব ও আরবী বর্ণবাদের মূলে প্রবেশ করছি। রাব্বিশ্রাহলী সাদ্রী , রাব্বি যিদ্নী ইল্মা। মিথ্যার জাল দেখতে জটিল হলেও তা'মূলত মাকড়সার জালের মত দুর্বল। আঘাত করলেই হাওয়া হয়ে যায়। তার চিহ্নও থাকেনা।

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের এ'কাজটি মাকড়সার ন্যায়। নিজ কল্পনায় জাল বুনে। অথচ মাকড়সার এ'ঘর দুর্বলতম । হায়! যদি তারা বুঝতো! (আন্কাবুত-৪১) অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের পর অবশ্যই "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর মিথ্যার উপর বানানো আরব জাতীয়তা, আরবী সাম্রাজ্যবাদ, আরবী সাহিত্য ও কাব্য কবিতা মাকড়সার জাল। তার দিন শেষ। খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর রিসালাতের দ্বারা হক্ব পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছে এবং অসত্য বা বাতিল চিরতরে তার কৌৎসিত্ব নিয়ে নগ্ন হয়েছে।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا অতএব বাতিলকে মিটে যেতে হবেই। (বনী ইস্‌রাঈল- ৮১) মক্কা বিজয়ের পর যখন জাযিরাতুল আরব; বা আরব দ্বীপের বর্বর অধিবাসীরা দেখলো যে সূরায়ে ক্বাসাসে বর্ণিত আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী মুস্তাদআফ্‌দের ইমামত ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে আর কোনো প্রতিরোধ টিকবেনা, তখন আরবরা চারদিক থেকে দলে দলে মাদীনা এসে মুস্তাদআফদের চূড়ান্ত আদর্শ নবীর হাতে আত্মসমর্পন করে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেতে লাগ্‌লো। এ প্রক্রিয়াকেই আল্লাহতায়লা ক্বোরআনুল কারীমে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا বলে বর্ণনা করেছেন। "যখন আল্লাহর সাহায্যে বিজয় সংঘটিত হবে, তখন দেখবে যে ঢেউয়ের মতো চারদিক থেকে জনগন আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করবে"। (সূরা নাস্‌র-১,২) এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, দ্বীন আল্লাহ্‌র। রাসূলের দ্বীন নয়। সকল নবী রাসূলরা আল্লাহ্‌র একমাত্র দ্বীন ইসলামের অনুসারী। তাদের কোনো পৃথক দ্বীন নেই। একমাত্র কাফের ও মুশ্‌রিকদের পৃথক পৃথক বহু দ্বীন রয়েছে। বাবা আদম আঃ থেকে রোজ ক্বেয়ামত পর্যন্ত ঈমানদার জনগোষ্ঠির একমাত্র দ্বীন ইসলাম। তাতে কোনো ব্যত্বয় নেই। রাসূল সঃ এর কাজ শেষ। তাঁর উস্‌ওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শের মডেল দাঁড় করা হয়ে গিয়েছে। যায়দকে মুহাজির ও আনসারদের উপর নেতৃত্ব দিয়ে রাসূল সঃ তাঁর কথিত সাহাবাদের ঈমানের বাছনী বা টেষ্ট পরীক্ষা নিলেন। তাতে বহু লোকের মূল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যায়। আল্ ক্বোরআনে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রশংসিত রাসূলের আজীবনের পরীক্ষিত যায়দের নেতৃত্ব মেনে নিতে যারা আপত্তি তুলেছিলো, তারা কি সত্যিকারে ঈমান এনেছিলো? এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেতে হবে। তা' না হলে খাঁটি ঈমান আনা দুষ্কর হবে। মুতা বা মৌতার অভিযানের পর মক্কা ও তায়েফ জয় হয়। তারপর তাবুকের অভিযান। এ অভিযানই রাসূল সঃ এর নেতৃত্বে মু'মিনদের শেষ যুদ্ধ অভিযান। ঠিক এর মাঝেই সূরায়ে হুজুরাত নাযিল হচ্ছে। তাতে আল্লাহ্ আবু বকর ও উমরদের ধোলাই করে অন্যান্যদের জন্য আচরণবিধি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলে দিচ্ছেন যে, তাক্বওয়ার মানদন্ডে কারো কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। ত্বাকওয়াহীন অবস্থায় আরবরা চারদিক থেকে ঢলের মতো মদীনায় আসছে। এখন যদি সুবিধাবাদী ঈমানের দাবীদারকে সত্যবাদী ঈমানদারদের থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা না হয়, তা'হলে তো রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর মক্কবাসী আরবরা তাই করবে, যা পূর্বে ইয়াহুদীরা করেছে ? আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ করলেন সত্যকে নির্দ্বিধায় বলতে। আল্লাহ্ তাঁর বাচন ধারায় বলছেন, "আরবরা বলছে, আমরা ঈমান এনেছি। রাসূল তুমি বলে দাও, তোমরা আসলে ঈমান আনোনি। তোমরা বিজয় দেখে শুধু আত্মসমর্পন করেছো। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। এ মৌখিক ঈমান এনে যদি তোমরা বাস্তবরূপে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো, তবেই তোমরা ঈমানদার রূপে গৃহীত হবে। তখন আল্লাহ্ তোমাদের আমলের কোনো অংশই প্রত্যাখান করবেন না। তিনি দয়ালু ক্ষমাশীল।" (হুজুরাত-১৪)। আরব দ্বীপটিই শুধু আরব ভূখন্ড। এর ভগ্নাংশ হলো দক্ষিন পূর্বে ইয়ামেন, পূর্ব উত্তরে ইরাক, উত্তর পশ্চিমে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। তার বাইরে মিশর, সিরিয়া, তিউনেশিয়া ও মরক্কো প্রভৃতি সব আফ্রিকা। এদের আরবী দাবী মিথ্যা ও অমূলক। রাসূল সঃ এর রিসালাতের ইসলামের পরিবর্তে ক্বোরেশী আরবদের মুস্তাকবিরির সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হলে এ সকল আফ্রিকান কাফ্রিরা বিজিত হয়ে তাদের উপনিবেশবাদী প্রভূদের সাথে জাতবদল করে আরবী বা আরব হয়ে যায়। যেমন বর্তমানে এ্যালেক্স হিলীর "দি রুট্‌স" এর বৃটেনবাসী কৃষাঙ্গরা কথায় কথায় "উয়ী বৃটিশার্স" বলে। রাসূল সঃ এর রিসালাতের দু'শ বছর পূর্বে বর্তমান আরবী আলিফ, বা, তা, ছা অক্ষরে লিখিত কোনো আরবী ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। হিজাযবাসী দরিদ্র, মরুদস্যু ও মেষপালক আরবরা কখনো শাসক বা সংগঠিত জাতি ছিলো না। তারা যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ দক্ষিণ পূর্বের ইয়ামেনী, ক্বাহ্‌তানী, আদনানী ও এরামদের দ্বারা শাসিত হয়েছে, কখনো উত্তর পূর্বের বেবিলোন ও কেলেডোনিয়ানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আবার কখনো পশ্চিমের গাস্‌সানী ও নাবাতীদের দ্বারা বশিভূত হয়েছে। এদের কখনো স্বরাজ বা স্বাধীন সংগঠিত সত্তা ছিলোনা। পূর্ব দক্ষিণের ইয়ামেনী কাহ্‌তানীদের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির উৎস ছিলো তাদের পূর্ব পাড়ের ভারতীয় পণ্য ও তার সওদাগরী আয়ের উপর ভিত্তি করে। উত্তর পূর্বের ইরাকী সীমান্তবাসীদের সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিলো পারস্য সাম্রাজ্য ও তার প্রভাবাধীন অঞ্চলের ঐশ্বর্যভিত্তিক এবং পশ্চিম সীমান্তে ছিলো গ্রীক ও রোমানদের সাম্রাজ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আরব দ্বীপের মূল ভূখন্ডের মধ্যবর্তি এলাকায় বসবাসকারী আরবরা মূলতঃ ছিলো তাদের চারদিকের তদানিন্তন শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে পালানো আত্মরক্ষাকারী গোত্র ও দলছুটরা। এদের মাঝে অনেক ঐ সমস্ত সমাজের

অপরাধীও ছিলো, যারা স্বদেশ থেকে পালিয়ে মরুভূমিতে অভয়ারণ্য গড়ে ছিলো। প্রথম শ্রেণীভূক্তরা মেষ পেলে যাযাবর জীবন যাপন করতো, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা শ্রমবিমূখ কামচোর মরুদস্যু ছিলো। কাফেলা লুট করা এবং রাতের অন্ধকারে জন বসতিতে আক্রমন করা এদের উপজিব্য ছিলো। মানুষ ধরে তাদের দাসদাসীরূপে বিক্রয়ে এদের বিবেকে বাধতোনা। মক্কার দাসদাসীদের হাট এদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিলো। হিজায ও নজ্দবাসীদের আরবী ভাষাও কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয়। হযরত নূহ আঃ এর পুত্র সামের বংশধরদের যে একাধিক ভাষা ছিলো, সে স্যামেটিক ভাষা সমূহের একটির অপভ্রংশই হলো আরবী ভাষা। ইয়ামেনী ক্বাহতানীদের মধ্যে যে প্রচলিত ভাষা ছিলো, তারই একটি "মূলছুট" ভাষা হলো মক্কার ক্বোরেশী ও হিজাযীদের ভাষা। যেটি পরবর্তীতে স্বতন্ত্র আরবী ভাষার রূপ নেয়। এ ভাষার অতীতের কোনো নির্ভরযোগ্য লিখিত প্রমাণও নেই। আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। এদের ভাষা চর্চাও মূলতঃ মৌখিক গল্প, রাতের আড্ডা ও কাব্য ভিত্তিক ছিলো। অধিকাংশ কাব্যই ছিলো যৌন বিকৃত অশ্লীলতা পূর্ণ। সে ধরনের কাব্যের সর্বকালে অনস্বীকার্য প্রমাণই হলো "সাবআ'মুয়াল্লাক্বা" বা ঝুলানো সপ্তক। এ নির্লজ্জ্য বিকৃত মানসিকতার কবিতামালাটি আল্লাহ্র ঘর কা'বার দেয়ালে ঝুলানো হয়েছিলো। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, এ ঘৃণ্য বিকৃতির কাব্য মালাগুলো ধর্মীয় বিদ্যালয়-মাদ্রাসা গুলোতে উচ্চ পর্যায়ের আরবী সাহিত্য বলে শতশত বছর ধরে পড়ানো হতো, এবং সম্ভবতঃ এখনো হচ্ছে। ক্বোরআন ও হাদীসের সাথে এগুলোকে পাঠ্য করেই ইসলাম ও তার শেষ নবী সঃ কে আরবী ধর্ম ও আরবী রাসূল বানানো হয়েছে, এবং পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসী, ক্বোরেশী খলীফা নামের লম্পটদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও নারী ও সূরার পাপকে লঘু পাপ বানানো হয়েছে। "আমি আরবী, আমার ভাষা আরবী, ক্বোরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী" বলে রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা হাদীস প্রচারিত হয়েছে। আরব ও আরবী শব্দের উৎপত্তি, আরবী ভাষা ও জাতীয়তার ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহীদের আমি লিসানুল আরব, তাজুল আরূস্, বিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ ও বর্তমানে সৌদীআরবের স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক "তারীখূল্ আরাবিয়্যুল ক্বাদীম ওয়াস্সীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ্" পড়তে বলবো। তাতে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝে আসবে। বিশেষ করে শেষোক্ত বইটি চমৎকার। উক্ত তথ্য সূত্র পড়ে তারপর ক্বোরআন পড়া মাত্র দিবালোকের ন্যায় ১৪১২ বছর ধরে লুক্কায়িত সত্য উদ্ভাসিত হবে। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আখেরী নবী সঃ কে মক্কায় প্রেরণ করে "আরাবিয়্যুম মুবীনে" ক্বোরআন নাযিল না হলে আজ আরবদের ভাষার নাম নিশানাও পৃথিবীর বুকে থাকতো না। আদ, সামূদ ও আইকাবাসীরা যেমন পৃথিবী থেকে আল্লাহ্র আযাব ও গজবে বিলুপ্ত হয়েছে, তাই আরবদের ব্যাপারে ঘটতো। যেমনটি আল্লাহ্র দ্বীন ও রাসূল সঃ এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে বিকৃত করার ফলে উমাইয়া, আব্বাসী, মূঘল, তুর্কী ও তাতারীদের ব্যাপারে ঘটেছে। আল্লাহ্ মক্কার ক্বোরেশদের সতর্ক করে বলেছেন, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ "হে রাসূল, মক্কাবাসীদের পূর্বের জাতিরাও আমার রাসূল ও রিসালাতের অমান্য করেছিলো। সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে তোমার জাতি তাদের এক দশমাংশও পৌছেনি।" (সূরা সাবা-৪৫) আমি তাদের ধরা পৃষ্ঠ থেকে এমন নিশ্চিহ্ন করেছি যে কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই। অন্ধ বিশ্বাসে আরবদের বানোয়াট ইতিহাস পড়লে মনে হয় তারাই ধরা পৃষ্ঠে প্রাচীনতম জাতি। যেনো বাবা আদম ও নূহেরও পূর্বপুরুষ! অথচ ভারতবর্ষের মহেনজোদারো, হরপ্পা, তক্ষশিলা ও ময়নামতির ধ্বংসস্তুপে আরবদের চেয়ে হাজারো বছর পূর্বের মুস্তাকবিরদের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়ে আছে। আরবদের অভিশপ্ত প্রতিবেশী ইয়াহুদীরা নিজেদের আল্লাহ্র সন্তান ও প্রিয়জন বলে দাবী করে ধ্বংস হয়েছে। তাদের পরিণাম রাসূল সঃ এর মুখে অহি মারফত শোনার পরও আরবরা তাদের অতীত শিক্ষা সংস্কৃতির এমন গাঁজাখোরী কাহিনী রচনা করে, যা পড়লে মনে হয় যেনো তারা বাবা আদম ও নূহ আঃ দেরও আলিফ-বা-তা-ছা-শিক্ষা দিয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্র নিরক্ষর খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর উপর নাযিল হওয়া ক্বোরআনের একটি সূরা বা তদৃশ কয়েকটি আয়াতও রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মিথ্যাভিজাত্যের ঘোড়ারোগে পাওয়া ইবলিসের ভাবশিষ্য ও সন্তান আদ, সামূদ, এরাম, নমরূদ ও ফিরাউনদের অনুকরণে আরব ক্বোরেশীরা সে সবই করলো, যাদের লোমহর্ষক পরিণাম তারা নামাজে পাঠ করেছে প্রায় আটশ বছর ধরে। আল্লাহ্ তাঁর ক্বোরআনকে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করে মানব জাতির চুড়ান্ত মুক্তি আন্দোলনের পথ উম্মুক্ত রেখেছেন। এখন বিপন্ন মানব জাতির ইচ্ছা। তারা চাইলে মুক্তির পথ বেছে নিতে পারে। চাইলে জাহান্নামেও আত্মাহুতি দিতে পারে। এখন গোটা মানব জাতি ধ্বংসের কানায় দাঁড়ানো। আর একটি ভুল পদক্ষেপই কাম তামাম করে দিবে। সে দুঃস্বপ্নময়

পরিণাম থেকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ দেয়ার একটি স্পষ্ট সঠিক প্রচেষ্টা এ লেখনী। চৌদ্দশ বারো বছর যাবৎ জমা হওয়া ভুল ও ভ্রান্তির মরিচা সাফ্ করার জন্য আমাকে অনিচ্ছা সত্বেও প্রেম-প্রীতি ও তোষণ-পোষণের মিষ্টি ভাষা বাদ দিয়ে অত্যন্ত অপ্রিয় ক্ষয়িষ্ণু ভাষা ও বাগধারা বেছে নিতে হয়েছে। কারণ মিষ্টি ভাষায় পাপিষ্ঠ আত্মার মরিচা ঝরেনা। তাই আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে সতর্ক করেছেন, তোমার মক্কাবাসী মুস্তাকবিররা আশা করে যে, তুমি তাদের ব্যাপারে সত্য প্রকাশে এতটুকু "তেল" মাখন লাগিয়ে তোষামুদ করো। তা হলে তদ্রুপ তারাও তোমার ব্যাপারে "তেল" মাখন প্রয়োগ করবে। খবরদার তুমি তা কখনো করবে না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ - وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ -وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ - مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

"কখনো তুমি মিথ্যুকদের কথা শুনবেনা। এরা চায় যে, তুমি ওদের তেল মাখো, তাহলে ওরাও তেল মাখবে। এরা মিথ্যা শপথকারী নিকৃষ্ট। অবিরত কুৎসা রটনাকারী, ভাল কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠ। কর্কশ এবং বিজন্মাও। (ক্বলম-৮-১৩) আরবীতে তেল, মাখন, গ্রীজ ও তদৃশ পিচ্ছিলকারী জিনিসকে "দুহ্ন্" বলা হয়। "আল হাক্কু মুর্রুন" সত্য অবশ্যই তেতো। সত্যের ধারক, বাহক ও প্রচারকরা কখনো সত্য প্রকাশে দ্বিধার শিকার হবে না। আল ক্বোরআনের "মুজিয এবং মু'জিযা" বা তার সর্বকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি অকাট্য প্রমান আমি এখানে তুলে ধরছি। তা'হলো আল্ ক্বোরআনে আরবদের বহুবচন "আল আ'রাব" ব্যতীত অন্য কোনো দ্বিতীয় শব্দ নেই। অর্থাৎ আরববাসী একব্যক্তি "আরবী" এবং বহু বচন আরবরা "আল আ'রাব", অথচ আল ক্বোরআনে আরবী ঘোড়া ও উটের বহু প্রতিশব্দ রয়েছে। অথচ কি তাজ্জবের বিষয় যে আরবের বহু বচন "আল আ'রাব", ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিশব্দ নেই!

ক্বোরআনে মুস্তাদআফীন ব্যতীত অপরাপর সকল আরবদের 'আল আ'রাব' নাম করে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, "আরবরা ঈমান আনেনি। ওরা কেবল আত্মসমর্পন করেছে মাত্র"। এরপর তারা মুস্তাদআফ্দের ইমামতের অধীনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলেই তাদের ইসলামে প্রবেশ স্বার্থক হবে। অন্যথা সব বিফল। যায়দ ও উসামাহর আমারাত ও ইমামাত তারই পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর আরবরা ফেল্ করেছে।

ইসলামে সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মরক্ষার সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা "জিহাদ"। সে অর্থে ইসলামী আন্দোলন প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। আগ্রাসী যুদ্ধবাজী ইসলামে নেই। তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সামনের বাধা অপসারণ করার সসীম যুদ্ধ ইসলামে বৈধ। যা সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মরক্ষা। সত্যের ছত্রছায়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা ও গোত্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো বৈধতা ইসলামে নেই। আল্লাহ্র কোনো নবী রাসূল তা করেননি।

আখেরী নবী সঃ এর বদর, উহুদ, আহ্যাব, মক্কা বিজয়, তায়েফ অভিযান ও মৌতায় যায়দের নেতৃত্বে জা'ফর ও ইব্ন রাওয়াহাদের প্রেরণ, সবই সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মরক্ষার সমর নীতি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় উসামাহর বাহিনী গঠন ও তার প্রেরণ তারই ধারাবাহিকতা মাত্র।

কিন্তু আবু বকর উমরদের "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" ভিত্তিক অভিযানসমূহ সত্যের ছত্রছায়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, গোত্র ও জাতীয় প্রতিষ্ঠার নামান্তর। এবং তারপর উমাইয়া আব্বাসীদের যুদ্ধবিগ্রহ সত্যের নামাবলী পরে নির্লজ্জ বর্বরদের রক্ত পিপাসু পাশব ভোগবাদের লড়াই বই কিছুই নয়। এটাকেই আল্লাহ্ সূরা মুহাম্মদের ১২ নং আয়াতে অপূর্ব শব্দ ও বাক্য শৈলীতে বর্ণনা করেছেন। আয়াতের প্রথমার্ধে রাসূল সঃ ও তার মুস্তাদআফ্দের জিহাদ ও দ্বিতীয়ার্ধে পরবর্তীদের চরিত্রের চিত্রাঙ্কন করেছেন। রাসূল সঃ এর ভাষায় ওদের "মুলকুন আদুদ্" কুকুরে কামড়ানো সাম্রাজ্যবাদ বলে অভিহিত করেছেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণে কিছু শব্দের একবচন ও তার বহুবচনের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো।

মূলধাতু	একবচন	অর্থ	রূপান্তর	বহুবচন	অর্থ
نبط	নাবাতুন	নাবাতী	ا نباط	আন্বাতুন	নাবাতীরা
حدث	হাদাসুন্	ঘটনা	أحداث	আহ্দাসুন	ঘটনাবলী
قول	ক্বাউলুন	কথা	أقوال	আক্বওয়ালুন	কথাসমূহ

حال	হালুন	অবস্থা	أحوال	আহ্ওয়ালুন	অবস্থাবলী
صوت	সাওতুন	শব্দ	أصوات	আসওয়াতুন	শব্দাবলী
مال	মালুন	সম্পদ	أموال	আমওয়ালুন	সম্পদসমূহ
خبر	খাবরুন	সংবাদ	أخبار	আখ্বারুন	সংবাদসমূহ
عرب	আরাবুন	আরব (?)	أعراب	আ'রাবুন্	আরবরা (?)

মু'মিনরা অন্যায়কারীদের তোষামোদ করতে পারেনা। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দিয়ে আমাদের তা শিখিয়ে দিলেন। তাই আমি আমার এ লিখনীতে Corrosive বা ক্ষয়কারী বাগধারা ব্যবহার করেছি। যাতে ১৪১২ বছরের মিথ্যার ধ্বংসস্তুপ খনন করে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার মতো সত্যের নিদর্শন বের করা যায়।

বোখারীর বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, আবু বকর ও উমরের আচরণের বিরুদ্ধে সূরা হুজুরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রাসূল সঃ এর মৃত্যুশয্যায় কাগজ কলম চাইলে উমর পুনঃ সে একই দৃশ্যের সৃষ্টি করে। অপর দিকে বোখারীর বর্ণনায়ই আমরা দেখতে পাই যে মদীনার সাবিত ইব্ন্ কায়স্ আন্সারী কোনো কারণে কখনো রাসূল সঃ এর সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলেছিলো। সূরা হুজুরাত নাযিল হলে সে আনসারী মনোবেদনায় বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে বসে যায়। দু'হাটুর মাঝে মাথা নিচু করে অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়ে। ক'দিন যাবৎ রাসূল সঃ তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জনৈক আনসারী জানায় যে সে গিয়ে রাসূল সঃ কে সাবিত্ ইব্ন্ কায়সের সংবাদ জানাবে। সে গিয়ে সাবিতকে ঐ অবস্থায় দেখতে পায়। সাবিত জানায় যে তার জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তার পরিণাম জাহান্নাম। কারণ, সে রাসূল সঃ এর সামনে স্বর উচু করে কথা বলেছে। রাসূল সঃ তার অবস্থা জানতে পেরে তাকে খবর পাঠান যে আল্লাহ্ তার তওবা ক্ববুল করেছেন। সে জাহান্নামের পথ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

মক্কার মুহাজির মুস্তাকবির ও মাদীনার আনসারী মুস্তাদআফদের মাঝে এ পার্থক্য বরাবরই দেখা যায়। রাসূল সঃ এর সাথে যে বা যারা যে যুগ ও যে জায়গায় বেআদবী করবে, তাদের আমল বরবাদ ও নিস্ফল। এ'টাই ক্বেয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদারদের জন্য শিক্ষা। রাসূলরা রাসূল। তাঁদের পরিবার পরিজন, পিতা হোক, মা হোক, স্ত্রী হোক, শ্বশুর শ্বাশুড়ী হোক, হোক ভাই বোন, সবার জন্য একই নির্দেশ। রাসূলকে রাসূলের মতো মানতেই হবে। "পীর মানেনা মা'য়, পীর মানেনা গাঁয়, ও পীর মানেনা ঘরের জানানায়" এ সূত্র এখানে অচল। যারা করবে, তারা ইব্রাহীম আঃ এর পিতা, নূহ আঃ এর স্ত্রী ও পুত্র এবং লূত আঃ এর স্ত্রীর শ্রেণীভূক্ত। নবী রাসূলদের পিতা-মাতা, তাঁদের পিতা মাতা অবশ্যই। তাঁদের স্ত্রীরা সে সুবাদে "উম্মাহাতুল মোমেনীন" বা ঈমানদারদের মা, যদি তারা নিজেরা ঈমানদার হয়। তারা নবুওত রিসালাতের মা নয়। আল্লাহ্র দ্বীন মানায় তারা সবাই আল্লাহ্র দাস-দাসী। না মানলে তাদের জন্য দ্বিগুন শাস্তি, যেমন মানলে দ্বিগুন পুরস্কার। তাই সকল আব্বাজান, আম্মাজান, দাদাজান, দাদীজান, নানাজান, নানীজান, সাবধান! যৌন তাড়নায় পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী হওয়া আলাদা। আর ঈমানী তাগিদের আত্মীয় হওয়া আলাদা। প্রথম শ্রেণী রক্তীয়। দ্বিতীয় শ্রেনী আত্মীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্তীয়রা দ্বীন ইসলামের শত্রু। আত্মীয়রা দ্বীন ইসলামের ভাই। "ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখ্ওয়াহ্" মু'মিনরাই শুধু ভাই ভাই, সূরা হুজুরাতের ব্যতিক্রমহীন শিক্ষা। তাই, ক্বোরেশে ক্বোরেশে ভাই ভাই, আরবে আরবে ভাই ভাই, হিন্দি হিন্দি ভাই ভাই ও বাঙ্গালী বাঙ্গালী ভাই ভাই, আল্লাহ্ ও রাসূলদের শিক্ষায়, নাই নাই!?

এ মহান সত্য জানা ও মানা ইসলাম ও ঈমান। মনে প্রাণে না মেনে ঠেলায় পড়ে গ্রহণ করা হলো ইসলাম। অর্থাৎ আত্মসমর্পন। তাই আল্লাহ্ অন্তর্যামী বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

"আরবরা বলেছে যে, আমরা ঈমান আনলাম, ঈমান এনেছি। তুমি বলো, বরং তোমরা ঈমানহীন আত্মসমর্পণ করেছো। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।" (সূরা হুজুরাত-১৪)

এ' আরবরা কি সকল আরব দ্বীপবাসী? না বেদুঈনরা শুধু? "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ"এর প্রবক্তা নব্য ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদীরা আরবী ব্যাকরণ ও বাগধারা পাল্টিয়ে সাত আসমানের উপর থেকে নাযিল হওয়া তাদের চেহারাকে আবৃত করার লক্ষ্যে নিজেরা সোজা হয়ে তওবা করে খাঁটি ঈমানদার না হয়ে আল্লাহর কালামকেই বাঁকা করার নিস্ফল

প্রয়াস পেয়েছে। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব স্বস্থানে দাঁড়িয়ে আছে,

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

"যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তোমাদের বদলিয়ে অন্য জাতিকে উন্নত করবো, যারা তোমাদের স্বভাবের হবে না" কে চূড়ান্ত সত্য প্রমাণ করতে।

কি আশ্চর্যজনক এ ক্বোরআনুম মাজীদুন ফী লাউহিম মাহফুজ! কার সাধ্য লৌহে মাহফুজে রক্ষিত ক্বোরআনকে বদলায়? যারাই একে বদলাতে চাইবে, তারাই বদলী হয়ে যাবে। কই আদ, সামূদ, এরাম, মূঘল, ও পাঠান মুস্তাকবির সাম্রাজ্যবাদীরা? আরবী ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম হলো মূল ধাতুর প্রথমে আলিফ্ এবং শেষ অক্ষরের পূর্বে আলিফ্ যোগ করলেই একবচন থেকে বহু বচন হয়ে যায়। যেমন نبط، أنباط এবং عرب أعراب। কিন্তু মানুষ যখন তার মৌলিক উপাদান হারিয়ে ফেলে, তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের কথায়ই ধরা খেয়ে যায়। তাজুল আরূস্ ও লিসানুল আরবের প্রনেতাদ্বয় তাদের পূর্বে প্রচলিত মিথ্যাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেদের কথায় ধরা পড়ে যায়। অন্যান্য প্রতি শব্দের গঠন ও সন্ধি বিচ্ছেদ তারা ঠিকই করে। আরব শব্দের কাছে গিয়েই তাদের পা পিছলে যায়। তাও মৌখিক। প্রমাণ ভিত্তিক নয়। মুখে তাদের জড়তা। কথায় কোনো প্রত্যয় নেই। বলে যে "নাবাত" থেকে যেমন "আন্‌বাত" হয়, তেমন হয়তো "আরব" থেকে "আ'রাব" হবে না। কেনো? কারণ কথিত আছে যে, বিজয়ের পর কিছু বেদুঈন রাসূল সঃ এর নিকট সাদ্‌ক্বা যাকাৎ চাইতে এসেছিলো! তারাই আ'রাব।

কি চমৎকার মিথ্যা কথা! আল্লাহ ক্বোরআনে বলেছেন, আরবরা বলছে, আমরা ঈমান এনেছি। এখানে তো "সাদ্‌ক্বা যাকাত নিতে এসেছে" উল্লেখ নেই? এখানে গোটা আরব জাতির ঈমানী দৈন্যতার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাও আল ক্বোরআনের ভাষায়। তারপর আরো ব্যাখ্যার্থে আল্লাহ বলছেন, "রাসূল! বলে দাও, তোমরা ঈমান আনোনি। তোমরা শুধু নিজেদের পরাভূত অবস্থায় সমর্পন করেছো। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।" এখানে আছে যাকাৎ সাদ্‌ক্বার কোনো ইংগিত?

ব্যাপারটি হয়েছে, "ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না।" নিজের কথাই প্রমাণ করলো যে, সে কলা খেতেই মন্দিরে প্রবেশ করেছে।

ভাষার স্বাতন্ত্র্যে আরবী ভাষা রাসূল সঃএর জন্মের অতিরিক্ত একশত বছর পূর্বে স্বাক্ষরে পৃথক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার পূর্বে ইয়ামেনী কাহ্‌তানীদের অধীনে তাদেরই "মিস্‌মারী" বর্ণমালায় আরবী লিখিত ও পঠিত হতো। তারপর ক্রমবিকাশে হিজায ও নজদবাসীরা পৃথক বর্ণমালা আলিফ্-বা-তা-ছা দিয়ে তাদের ভাষা চর্চা আরম্ভ করে। রাসূল সঃ এর রিসালাত প্রাপ্তি ও ক্বোরআন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত এ আরবী আঞ্চলিক ভাষা রূপে আরবদের গোত্রীয় খুনাখুনী, এক গোত্রের উপর অপর গোত্রের মিথ্যা আস্ফালন, দেব-দেবীর পুজা, প্রেম গাথা ও অশ্লীল কাব্যেই সীমিত ছিলো। কা'বা ঘরের দেয়ালে ইমরুল ক্বাইসদের ঝুলানো "সাব্‌আ মূয়াল্লাক্বা" তার অন্যতম প্রমাণ। যা পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে।

রাসূল সঃ খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সঃ এর উপর অবতীর্ণ ক্বোরআন ও তার দ্বীনই আরবদের সাত আকাশের ধন। ক্বোরআন ও তার বাগধারা এবং তার ধ্বজা দ্বীনকে ধরেই ওদের সত্যিকার উন্মেষ হয়েছিলো। পরে সূরা তওবায় বর্ণিত ৯৭ আয়াতে অধঃপতিত হয়ে আরবরা রাসূল সঃকে আরবী, ইসলামকে আরবী দ্বীন এবং প্রায় আল্লাহ্‌কেই (?) আরবী করনের ধৃষ্ঠতা পূর্ণ মহাপাপের পরিণামে বর্তমানে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পিঞ্জিরায় আবদ্ধ। পৃথিবীর প্রত্যেক শয়তানে ভরকরা জাতিরাই ভাষা ও গোত্রের মূর্তি তৈরী করে নিজেদের অভিশপ্ত করেছে, করছে। মুসলমান নামধারী সম্প্রদায় তাদের কালেমায় "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদন আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু" অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহর দাস ও রাসূল" বলার পরও ভেবে দেখে না, কই, মুহাম্মদ সঃ এর তো আরবী, ক্বোরেশী, হাসেমী, সুন্নী বা শিয়া হওয়ার কোনো উল্লেখ দূরে থাক, তার ইংগিতও নেই কালেমায়।

মৃত ব্যক্তিদের নামে মুস্তাকবির ইবলিসের মানব সন্তান ও শিষ্যরা এ কাজটি করে থাকে। ধর্মীয় ব্যক্তি, নবী রাসূলদের নামে পূর্বে ইয়াহুদীরা এ পাপের মহাগুরু। আখেরী নবী সঃ এর বিদায়ের পর ঐ বিদাআতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ক্বোরেশী চার খলিফা, বারো খলিফা, বারো ইমাম, আশারা মুবাশ্‌শারা ও জুমার খুৎবায় পঠিত দশচক্র তার গুরু, এবং বর্তমান বিশ্বে সরল বিশ্বাসে গড্ডালিকায় ভাসা সাধারণ মুসলমানরা তাদের শিষ্য।

এখানে হাস্যস্পদ হলেও আমাদের ক্ষুদ্র বাংলাদেশের একটি অতি সাম্প্রতিক সিভ্রমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। বর্তমানে

পত্র পত্রিকা এবং ব্যানারে পোষ্টারে দেখা যায় "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মুজিব"। মুজিবের মৃত্যুর পর জন্মানো এ চাটুকার কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী ভেবেও দেখালোনা যে ওদের উচ্চারিত নামটির প্রথমেই শেখ শব্দটি রয়েছে। এটি একটি অবাঙ্গালী শব্দ। মুজিবুর রহমানের আত্মীয় কাজী মাহবুব উল্লাহ রচিত বই "সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি" পড়লে যে কোনো বিবেকবান পাঠক বুঝবে যে, শেখ মুজিবের পূর্ব পুরুষ বাহির থেকে আসা এক ব্যক্তি ছিলো। অধ্যাপক গোলাম আযমের দাদার বাবা শেখ সুফী শাহাবুদ্দিনও বাংলার বাহির থেকে আসা এক সাধক ব্যক্তি ছিলো। বড়জোর দেড় দু'শ বছর পূর্বে এরা মুস্তাকবির মুসলিম নামধারী শাসক মুঘল পাঠান দস্যুদের অধর্ম ও অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব ও সালমানদের সাম্যের ইসলামের আদর্শ নিয়ে তা প্রচার করেছে। মনে রাখতে হবে যে তখন ক্বোরেশী মন্দিরবাদীদের ন্যায় ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ ও হিন্দু বৈষম্যবাদের যাঁতাকল এদেশের মুস্তাদআফ্‌দের নিষ্পেষিত করেছিলো। ফরীদপুরে শেখ মুজিবের পূর্ব পুরুষদের হিন্দুদের সাথে দস্তুর মতো লড়াই করে অস্তিত্ব টিকাতে হয়েছে এ কথা প্রয়াত শেখ মুজিব এক একান্ত সাক্ষাতে আমার কাছে উল্লেখ করেছে। সে সাক্ষাতে অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রয়াত চাচা শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলো। তারা দু'জন কলকাতায় পড়া লেখার সময় একত্র মুসলিম ছাত্রলীগ করেছে। এর উল্লেখ পরে এক প্রসঙ্গে কিছুটা বিস্তারিত লিখবো আশা করি।

এখানে প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উল্লেখ করছি, যে জাতীয় জীবনে হীনস্বার্থকে পাকাপোক্ত করার জন্য যারা শেখ মুজিবকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে গলাবাজী করছে, তাদের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তাদের সন্তান সন্ততিরা ইংরেজী মাধ্যমে লেখা পড়া করছে। ইউরোপে আমেরিকায় বসবাস করছে, ঘরে বাংলার চেয়ে অনেক বেশী হিন্দী ও ইংরেজী ডেক বাজাচ্ছে এবং সে তালে তালে নারী পুরুষ নির্বিশেষে বানরের মতো দেহ ও হাত পা নাড়াচ্ছে। জাতীয়তাবাদের পুরাতন সুরার স্বাদ ও গন্ধ সব যুগে এক। তা' ইয়াহুদী, খৃষ্টান, আরবী ও বাঙ্গালী যা-ই হোক। ঈমানের সাথে চোখ বন্ধ করার যাদের যোগ্যতা রয়েছে, তা'রা দিব্যি দেখতে পায় যে, প্রয়াত নবী রাসূল ও তাঁদের অনুসারী মানুষরা যেমন মহা তৃপ্তিতে অপর পাড়ে চূড়ান্ত পুরস্কার লাভের জন্য ক্বেয়ামতের অপেক্ষা করছেন, তেমনি মানুষকে পৃথিবীতে রক্ত, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ও রাষ্ট্রীয় সীমান্তে বিভক্ত ও আবদ্ধকারী মৃত ইয়াহুদী, খৃষ্টান, আরব, তুর্কী, মুঘল, পাঠান, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বাঙ্গালী প্রভৃতির আত্মা চরম আযাব ও উৎকণ্ঠায় কৃত পাপের জন্য অনুতাপ ও আর্তনাদ করছে, এবং মহাবিচারের দিনের মহাবিপদের কথা ভেবে, মাত্র আর একটি বার পৃথিবীতে তাদের কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ফেরত আসতে বিলাপ করছে। فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"যদি আর একটি বার আমাদের পুনঃ পৃথিবীতে পাঠানো হতো, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই খাঁটি ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।" (সূরা শুআ'রা-১০২)

আল্লাহ্ মুহাম্মদ সঃ কে শেষ নবী রূপে পাঠিয়ে তার দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করেছেন। মুহাম্মদ সঃ এর পূর্ণ আদর্শে যারা ঈমান আনে তারাই পূর্ণ ঈমানদার বা মু'মিন। যারা স্বার্থসিদ্ধির পথ দেখে, বা পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবীতায় ইসলামে প্রবেশ করেছিলো, তারা সূরা হুজুরাতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র পরিভাষায় أَسلمْنَا "আস্‌লাম্‌না" অর্থাৎ মেনে নিলাম বা আত্মসমর্পণ করলামের আওতাভুক্ত ছিলো। পূর্ণ ঈমানে প্রবেশকারী মু'মিন ছিলোনা তারা। মক্কা বিজয়ের পর থেকে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে আরব মরুর লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করেছিলো, তারা দু'চারজন বাদে বাদবাকীরা "আস্‌লাম্‌না" শ্রেণীভুক্ত ছিলো। একমাত্র যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব ও সালমন শ্রেণীর মুস্তাদআফ্‌রাই রাসূল সঃএর মাপের পূর্ণ মুসলিম ও মু'মিন ছিলো। তাই আল্লাহ্‌র হুকুম, শিক্ষা ও মান দন্ডে উত্তীর্ণ মুস্তাদআফ মাতা পিতার যোগ্যতম যুবক সন্তান উসামাহ্ ইব্‌ন্ যায়দকে রাসূল সঃ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অনুসারীদের আদর্শ আমীর ও ইমাম নিযুক্ত করে যান, এবং উসামাহর নেতৃত্ব অমান্যকারীদের অভিশাপ করে যান। এ সন্ধিক্ষণের সূক্ষ্ম বিচারে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত ক্বোরেশী বারো খলীফা বা বারো ইমামের উমাইয়া আব্বাসী ও সুন্নী শিয়া দাজ্জালী ফিত্‌না ও তার ১৪১২ বছরের ফলাফল বুঝতে হবে। তা' না হলে পুনঃ উসামাহ বিন্ যায়দের স্থলে বর্তমান বিশ্বে ইরানী শিয়া উত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড় করোনো আফ্‌গানী তালেবানদের সুন্নী আরবী সন্ত্রাসী উসামা বিন লাদেনের বিভ্রান্তিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিন্ লাদেন ও মোল্লা উমররা যদি খাঁটি ইসলামী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে সুন্নী আফগানী চক্র থেকে বের হয়ে ক্বোরেশী, আবরী, সুন্নী ও আফগানী গোত্র ও ফের্ক্বা মুক্ত হতে হবে। কারণ ইরানী শিয়া খোমেনী, খামেনীরা ১৪১২ বছর পূর্বে রসূল সঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুস্তাদআফ নেতৃত্বের মিথ্যা ধুয়া তুলে বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের পিয়াসীদের প্রতারিত করেছে। অতএব অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন

করে এবার আমাদের পা ফেলতে হবে। কারণ এবারের সফলতা যেমন ক্বেয়ামতের মতো চূড়ান্ত হবে, ব্যর্থতাও ক্বেয়ামতের পূর্বে ক্বেয়ামতের মতো চূড়ান্ত হবে। ঈমানের মূল গোড়ায় ফেরৎ নেয়ার উদ্দেশ্যেই আমি সূরা হুজুরাতের আস্‌মানী শিক্ষায় পাঠকদের পূনঃ নিয়ে যাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর ঈমানী মেধা দিয়ে এ অধ্যায়টি পড়তে ও বুঝতে সচেষ্ট হতে হবে। قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

"আরবরা বলছে যে তারা ঈমান এনেছে। রাসূল বলে দাও তোমরা ঈমান আনোনি। তোমরা বরং বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।"

এখানে "আরব দ্বীপের সকল অধিবাসীদেরই এ আয়াতে "আ'রাব" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, "আ'রাব" ব্যতীত আরব শব্দের অন্য কোনো বহুবচন নেই। আল ক্বোরআন দিয়ে আল্লাহ্ তার সকল সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছেন। পরে বর্ণ চোরেরা তাদের কুৎসিত চেহারাকে আড়াল করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় যে সমস্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। সবই অসার।

আরবী ভাষার অমরত্ব ও চির প্রতিষ্ঠার ভিত্, আল্লাহর কালামে আল্লাহ্ আল্ ক্বোরআনে সূরা শূ'আরার ১৯৮ আয়াতে "আজমি" শব্দের বহুবচন আ'জামিয়্যীন" উল্লেখ করে স্বয়ং আল্লাহ্ সূরা ফুসসিলাতের ৪৪ আয়াতে পূনঃ আরবী বাগধারায় আরবী-আজমীর এক বচন ও বহু বচনের ব্যাকরণ বিধি বলে দিয়ে সাধারণ আরবদের চারিত্রিক বক্রতার উল্লেখ করে দেন, এবং বিশ্বের মানব গোষ্ঠীকে জানিয়ে দেন যে, "আমি যদি ক্বোরআন কোনো অনারবের উপর অবতীর্ণ করতাম এবং সে যদি তা আরবদের পড়ে শোনাতো, তা'হলে আরবরা তাতে ঈমান আনতো না।"

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পূর্বে নাযিল হওয়া দীর্ঘ সূরা তওবায় আল্লাহ্ মক্কা মদীনা ও তায়েফবাসীসহ সকল আরবদের চূড়ান্ত চিত্র অঙ্কন করে দেন চিরদিনের জন্য। তাই সূরা তওবার অপর নাম "ফাহিদা" বা কেলেঙ্কারী ও গোমর ফাঁক। আল্লাহ্‌র বর্ণনায় শুধু যায়দ, বেলাল ও আম্মারসহ অন্যান্য মুস্তাদআফবৃন্দ এ নিন্দাবাদ থেকে মুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ্‌ই ক্বোরআনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে এদের প্রশংসা করে রাসূল সঃ কে সর্বদা এদের ব্যাপারে যত্নবান হতে তাগিদ দেন ولا تعدوا عيناك عنهم , ওদের উপর থেকে তোমার দৃষ্টি সরাবেনা।

আল্লাহ্ সূরা তওবায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরবদের প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করেন। তিন ভাগ বাদের খাতায়। একভাগ মাত্র গ্রহণের খাতায়।

১. ৯৭ আয়াতে বলা হয়, আরবরা কুফ্‌র ও মুনাফেক্বীতে চরম। এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর অবতীর্ণ দ্বীনের সীমারেখা সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতায় প্রথম শ্রেণীর। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় রূপেই আরবদের ব্যাপারেই এমত প্রকাশ করছেন। الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

২. আরবদের আরেক শ্রেণী রয়েছে যারা আপাততঃ দৃষ্টিতে মুসলিম হওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌র পথে দানকে জরিমানা জ্ঞান করে এবং তোমাদের বিপর্যয় চক্রের অপেক্ষায় রত। ওদের উপরই অভিশপ্ত চক্রের পতন হোক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা জ্ঞানী। (৯৮) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨)

৩.তোমাদের চার পাশের আরবরা, এমন কি মদীনাবাসী আরবদের মাঝেও বহু মুনাফিক্ব রয়েছে। ওরা মুনাফেক্বী রোগে চিরাক্রান্ত। রাসূল, তুমি তাদের চেনো না। আমি তাদের চিনি। আমি এদের ইহকাল পরকালে দু'বার শাস্তি দেবো। তারপর তাদের কঠিন শাস্তির বিবরে নিক্ষেপ করবো। (১০১) وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

৪. আরবদের মাঝে একশ্রেণী রয়েছে যারা সর্বান্তকরণে ঈমান এনে পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এরাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রাসূলের শুভেচ্ছা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে থাকে। সবাই জেনে রাখো, এটা বাস্তবিকই তাদের আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। অচীরেই আল্লাহ্ তাদের তাঁর রহমতের বেষ্টনীতে প্রবেশ করাবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ দয়ালু, ক্ষমাশীল। (৯৯) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা এ প্রক্রিয়ার প্রতিযোগীতায় অগ্রণী এবং এদের পর যারা এ প্রক্রিয়ার সঠিক অনুসারী হবে, ক্বেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ এদের উপর তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্তে তুষ্ট। আল্লাহ্ এদের সকলের জন্য নদ-নদী প্রবাহিত জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন। চিরদিন তারা তার বাসিন্দা হবে। এটাই হলো মহা বিজয়। (১০০)

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا এ হলো আল্লাহ্র বর্ণনায় তাঁরই বান্দা আরবদের চরিত্রের চিত্র। এ চিত্রকে সঠিক তওবার মাধ্যমে ঈমান এনে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য দ্বারা মোছার পরিবর্তে হঠকারিতার মাধ্যমে ক্বোরআন ও পুরো আরবী বাগধারাকে বিকৃত করে আরবরা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়াল করার অপচেষ্টায় মেতে উঠে। তারা কি আল্ ক্বোরআনের এ আয়াতেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি যে "সত্য সমাগত, মিথ্যার নাশ আসন্ন। মিথ্যাকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে?"

তারপরও কি তারা বলবে যে, "মিশরীয়রা ফেরআউনী ঐতিহ্যের পূজারী" বলতে মিশরের পল্লীবাসীদের বুঝায়? কায়রো, আসয়ুত ও ইস্মাঈলিয়া প্রভৃতি শহরবাসী বুঝায় না? "বৃটিশরা উপনিবেশী" বলতে পল্লীবাসী বুঝায়, লন্ডন, বার্মিংহাম ও ম্যানচেষ্টারের নগরবাসী বুঝায় না? "আমেরিকানরা বহিরাগত দখলদার" বলতে পল্লীবাসী বুঝায়, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও লস্এঞ্জেলেসবাসী বুঝায় না? "ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পৌত্তলিক" বলতে গ্রামীণ ব্রাহ্মণ্য বৈষম্যবাদ ও দেব-দেবীর পূজারী বুঝায়, দিল্লী বোম্বে ও কোলকাতাবাসী বুঝায় না? তদ্রুপ কেউ যদি বলে যে, "বাঙ্গালীরা মীরজাফরের জাত", তাতে কি বুঝায় যে মীর জাফরের জাত শুধু গ্রাম বাংলার জনগণ, ঢাকা, কোলকাতা ও রাজশাহী প্রভৃতির নগরবাসীরা বুঝায়না?

বিবেকবান মানুষ মাত্র উত্তর দেবে যে, তাতে গোটা জাতিই বুঝায়। দেশের কোনো বিশেষ শ্রেণী বুঝায় না। বরং প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে তাদের নগরবাসীরাই সাধারণতঃ ঐতিহাসিক মন্দ কাজে নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে কলঙ্কিত করে। তাই আ'রাব বা আরবরা বলতে গোটা আরব জাতিই বুঝায়। বরং আল্লাহ্ ক্বোরআনুল কারীমে যে পাপাচার ও অন্যায়ের উল্লেখ করেছেন, তার নেতৃত্বে মক্কার ক্বোরেশ ও তায়েফবাসী আরব ও তাদের অনুসারী শহর ও শহরতলীর আরবরাই অগ্রণী ছিলো। মানবসাম্য ও তাওহীদের কেন্দ্র কা'বাতুল্লাহকে যে ক্বোরেশরা ৩৬০ মূর্তির ঠাকুরঘর বানিয়ে অপবিত্র করেছিলো, তারাই "আশাদ্দু কুফ্রাও ওয়া নিফাক্বার ইমাম" বা আইম্মাতুল্ কুফ্র ছিলো। বিশেষ করে সূরা হুজুরাত অবতীর্ণ হওয়ার নায়কদ্বয় আবু বকর ও উমর মক্কার কোরেশ গোত্রের দু' ব্যক্তি ছিলো। কোনো মরুবাসী বেদুঈন ছিলো না। কথিত "ফাসিক্ব" ব্যক্তিদ্বয়ও উসমানের দু'সতালো ভাই ছিলো। তারা সবাই মক্কা নগরীবাসী ক্বোরেশী উমাইয়া গোত্রের ছিলো।

সূরা হুজুরাতের ১০ ও ১১ আয়াতে মুমিনদের যে অবিভাজ্য ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ্ এবং তাকে অটুট রাখার তাগিদ দিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "ঈমানদার পুরুষরা কখনো তাদের কোনো ঈমানদার ভাইকে কটাক্ষ করে কথা বলবেনা, তদরূপ কোনো ঈমানদার নারী অপর ঈমানদার নারীকে কটাক্ষ করবে না, ঈমানদার দাবীর পর এ কাজটি জঘণ্যতম পাপ, এ থেকে যারা তওবা করবে না, তারা নির্বিশেষে যালিম" এ সব নির্দেশ অমান্য করায় আমরা শহরবাসী আরবদের শীর্ষে দেখতে পাই।

অন্তর বিদীর্ণকারী ব্যথা ও শোকের সাথে আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বের রহমত, খাতামুন্ নাবিয়্যীন ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর দেহ মোবারকও তখনো দাফন হয়নি। সাক্বিফা বনু সাআ'দায় আবু বকর, উমর মাদীনার আনসারদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে বলছে "ক্বোরেশ থেকে ইমাম হতে হবে।" "আমরা আমীর হবো, তোমরা হবে উযির" তোমরা আমরা, আমরা তোমরা !!! সবাই মিলে "ইন্নামাল মুমিনূনা ইখওয়াহ" আর রইলো না। মদীনাবাসীর ঈমান, ত্যাগ, সহনশীলতা ও রাসূল সঃ প্রীতির সুযোগে ক্ষমতা দখলের পর ক্বোরেশী গোত্রবাদীরা, মদীনার আনসার বা অন্য কোনো অ-ক্বোরেশী মু'মিনকে কখনো নেতৃত্ব দেয়নি। ইন্না আক্রামাকুম ইন্দাল্লাহি আত্ক্বাকুম, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মুত্তাক্বীতম ব্যক্তিই সবচে' সম্মানী" শুধু ক্বোরআনেই রইলো। কার্যে পৃথিবীর মাটিতে তা আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হলো না। রাসূল সঃ যে বলেছিলেন, "যদি আনসাররা একদিকে যায়, আর গোটা বিশ্ব অন্য দিকে যায়, তা'হলে আমি অবশ্যই আনসারদের পথ বেছে নিবো" কোথা গেলো? মুহাজির, আনসার ও ক্বোরেশ অক্বোরেশীয় বিভক্তির নায়কও তো আমরা আবু বকর ও উমরকেই দেখতে পাই! তারা দু'জন কী বেদুঈন ছিলো? মোটেও না।

মাদীনায় মুসলিম নারীদের মাঝে, এমনকি খোদ আল্লাহ্র রাসূল সঃ এর ঘরে যতো ঝগড়া বিবাদ, তার প্রত্যেকটিতেই আমরা আবু বকর ও উমর কন্যা মা আয়শা ও হাফসাকে মূল ভূমিকায় দেখতে পাই। সূরা আহযাবে উল্লেখিত

খোরপোষের দাবীর আন্দোলন, সূরা তাহ্‌রীমের রাসূল সঃ এর মধু খাওয়া, মা যায়নাবের সাথে হুজুর সঃ এর ঘনিষ্টতা এবং মা মারিয়া ক্বিবতিয়ার সাথে রাসূল সঃ মিলন নিয়ে বাড়াবাড়ি, এ সবেই তো মা আয়শা ও হাফসা মূল! তাতে সাত আকাশের উপর আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। কঠোর ভাষায় অহী নাযিল হয়। মা আয়শা ও হাফ্‌সা কি কোনো মরুবাসী বেদুঈন ছিলো?

মা খাদিজাকে গালভাঙা ও ত্বকঢিলা বুড়ী বলা, মা সাফিয়্যাকে ইয়াহুদীয়াহ বলে কটাক্ষ করা, মা যায়নাবকে ক্রীতদাসের তালাকপ্রাপ্তা বলা এবং মা মারিয়ার পেটে জন্মানো ইব্রাহীমকে রাসূল সাঃ এর ঔরসজাত না হয়ে অন্যের ঔরসজাত বলা কি সূরা হুজুরাতের ১১ আয়াতের লঙ্ঘন নয়? মা আয়শার মতো মুফাস্‌সির, ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিস এ সমস্ত কাজ কি রূপে করলো! রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন রাসূল সঃ এর ঘরে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে কী তারা মুস্‌লিম উম্মার ঘরে ঘরে অশান্তির বীজ বপন করে যায়নি? ইনশাআল্লাহ সূরা তাহ্‌রীমের আলোচনায় তথ্য সূত্রসহ এ বিষয়ে আরো আলোচনা করবো।

বারাকাহ্, যায়দ, মা খাদিজা, বেলাল, আম্মার, ইবন্ মাসউদ, সুহাইব, খাব্বাব, মুসআব্ ও সালমান প্রভৃতির ন্যায় যারা স্বীয় অস্তিত্বের সবটুকু বিসর্জন দিয়ে ঈমান এনে তাতে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, সে সমস্ত মুস্তাদ্‌আফদের ঈমানের প্রশংসায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা পঞ্চমুখ। আল্লাহ্ এ শ্রেণীর ভাগ্যবান বান্দাদের সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে বলেন, "ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনার পর কোনো প্রকার দ্বিধা দ্বন্দের রোগে ভোগে না। পরন্তু এরাই খাটি।" এরা গোত্ররোগ, বর্ণরোগ, ব্যক্তি স্বার্থ ও স্বজন তোষণ প্রভৃতি থেকে উর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্‌কে গ্রহণ ও রাসূলকে বরণ করে। তাই আমরা হাদীস বা ইতিহাসের কোথাও একটি মাত্র ঘটনাও দেখিনা যে রাসূল সঃ এর রিসালাতের বিজয় শুরু হলে যায়দ, আম্মার, বেলাল, ইবন মাসউদ ও সুহাইবরা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে টেনে দল ভারি করার চেষ্টা করেছে। যায়দের গোত্র বনী কাল্‌ব এতো বড় গোত্র ছিলো যে শিক্ষা, দীক্ষা ও ধন সম্পদে কোনো দিক দিয়েই তখনকার ছোট বসতি মক্কাবাসীর চেয়ে তারা পিছিয়ে ছিলো না। বরং এখনো সৌদী আরব, ইরাক, ইয়ামেন ও সিরিয়ায় বনু কালবের বহু লোক রয়েছে। বরং বর্তমানে কোথাও ক্বোরেশ ও বনু উমাইয়ার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তদ্রূপ আম্মার, বেলাল ও সুহাইবদেরও ভাই বেরাদার ছিলো। কিন্তু ঈমানী আত্মীয়তার ভ্রাতৃত্বে প্রবেশ করার পর ইতিহাসে এদের কোনো রক্তীয় স্বজনদের উল্লেখ পাওয়া যায়না, এরাই রাসূল সাঃ এর পর তাঁর সুন্নাহ বা আদর্শের নমুনা।

অপর দিকে রাসূল সঃ-এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই ক্বোরেশী, হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রবাদ গোখ্‌রা সাপের ফণা তুলে ইসলামী উম্মার ভিতকে দংশন আরম্ভ করে। যার বিষে ১৪১২ বছর পরও আমরা কাতরাচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর রাসূলের আদর্শের বিশ্ব বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের ইমামদের অপেক্ষা করছি। ১৪১২ বছরের ধ্বংসস্তুপ খনন করে সত্যিকার রাসূল সঃ-এর আদর্শ খুঁজছি, যাতে আমরা যথার্থ ইমানের যথার্থ অনুসারী হতে ভুল না করি।

রাসূল সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফ্ অনুসারীদের ঈমানের মানদন্ডে মু'মিন না হয়ে যারাই ঈমানের দাবীদার হবে, আল্লাহ তাদের তিরস্কার করেন এ বলে যে এরা স্বয়ং আল্লাহকে তাদের ধর্ম শিখায়! মাটির সৃষ্ট আদমের সন্তান হয়ে আল্লাহর বর্ণিত তাক্বওয়ার মানদন্ড উপেক্ষা করে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও হাশেমী প্রভৃতি কুফরীর ফলে চেঙ্গিজ, হালাকু, তৈমুর ও ক্রুসেডারদের হাতে নির্বংশ হওয়ার পরও আরবরা তাদের ধারায় জাহিলিয়্যাত বর্জন করেনি। বরং ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট চরিত্রের হওয়ায় আল্লাহ্ বর্তমানে ওদের ইস্রাইলীদের মতো একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র দিয়ে আযাব দিচ্ছেন।

তাক্বওয়ার চার দেয়ালের বাইরে কোনো ঈমান নেই। জাতীয়তা ও গোত্রবাদের প্রবক্তাদের ধর্ম, জাতীয়তা ও গোত্রবাদ। পূর্বেও এরা মু'মিন ও মুসলিম ছিলোনা। এখনো নেই। ভবিষ্যতেও হবে না। বাবা আদমের সন্তানদের তাক্বওয়ার মানদন্ডেই ঈমানদার হতে হবে। জাতীয়তা ও গোত্র স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার হওয়া মাত্রই তারা ইবলিসের মানব প্রজন্ম। এদের জন্ম ও সম্পদে ইবলিস অংশ গ্রহণ করেছে। وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (সূরা বনি ইস্রাইল-৬৪)

ভাষা, জাতি, বর্ণ, প্রজাতি, ভৌগলিক সীমা ও রাষ্ট্রীয় সীমা সহ সকল বিভক্ত সত্তায় বিশ্বাসী জাতি "রাব্বুল আলামীন" আল্লাহ ও "রাহমাতুল্লিল আলামীন" রাসূলের "একস্রষ্টা এক সৃষ্টির দ্বীন" ইসলাম বহির্ভূত জাতি। আদি মানব আদম আঃ ও তাঁর সন্তান মানব জাতির সৃষ্টিলগ্নের শত্রু শয়তান ইবলিস এদের "ইলাহ্" এবং প্রভু। গোত্রবাদী ইয়াহুদী খৃষ্টান ও তাদের মিত্র বর্তমান আরববিশ্ব মসীহুদ্দাজ্জালের অগ্রসেনা। বিশ্বে ইসলামী উত্থানের চূড়ান্ত নেতা ইমাম মাহদীর এরা হবে সম্মিলিত শত্রু।

আখেরী রাসূল সঃ কে যারা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ না করে ভিতরে ভিতরে গোত্র ও জাতীয়তাবাদকে লালন করেছে এবং আজও করছে, তারা ১৪১২ বছর পরও এক জাত ও গোষ্ঠী। হোক না তারা আরবী, ক্বোরেশী, সাইয়েদ, মোঘল, তুর্কী বা পাঠান!

আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃ কে মক্কার ক্বোরেশদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তায়েফে তাঁর সঙ্গী যায়দকে সহ রক্ষা করেছেন। প্রাণ নিয়ে হিজরতের সময় গারেসওরে সঙ্গী আবু বকরও দৃঢ়তার পরীক্ষায় যখন বিচলিত হলো, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর "সাকীনা" নাযিল করে তাঁর বিশেষ সেনা পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ অভিযানেও বিশাল বাহিনী রাসূল সঃকে ফেলে পালায়। সে মুহূর্তেও আল্লাহ তাঁর বিশেষ "সাকীনা" অবতীর্ণ করেন তাঁর রাসূলের উপর। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেন। কতিপয় মুস্তাদআফ্ ব্যতীত অন্যদের রাসূল সঃ তাক্বওয়ার মানদন্ডে পূর্ণ মুমিন পাননি। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সঃকে জানিয়ে দিলেন, সাবধান! আরবরা ঈমান আনেনি। কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ করেছে। সাবধান! এরা শুধু তোমাকেই নয়, আসমান ও জমীনের সকল গোপন জানা আল্লাহ্কেও তারা তাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে চাইবে। (হুজুরাত-১৬) হে রাসূল সাবধান! পূর্ণ ঈমান না এনে যে তারা শুধু আত্মসমর্পণ করেছে, তাতেই তারা বলবে যে, "আমরা যতটুকু ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাতেই আমরা আপনাকে কৃতার্থ করেছি। কারণ তা না হলে আপনিও বিজয়ের মুখ দেখতেন না"। রাসূল বলে দাও ! "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করোনি। তোমরা যদি সত্যিই ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হও, তা হলে তোমরা স্বীকার করবে যে আল্লাহ্ই তোমাদের উপর কৃপা করেছেন যে তিনিই দয়া করে তোমাদের ঈমানের পথ প্রদর্শন করেছেন"। (হুজুরাত-১৭)

সত্যি কি ক্বোরেশ ও আরবরা খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর রিসালাতকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যতটুকু গ্রহণ করেছিল, তাতে তারা কি আদৌ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো উপকার করেছিল? না, আল্লাহ্ তাদের আদ ও সামূদের মতো সম্পূর্ণ নির্মূল নিশ্চিহ্ন না করে মিল্লাতে ইব্রাহীমের কাবাকে মূর্তি খানায় রূপান্তরকারী নিকৃষ্ট রুগ্ন জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠিয়ে তাদেরই প্রতি কৃপা করেছেন? তারপর তাদের স্বাধীন ইচ্ছা। ইচ্ছা করলে তারা ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ মুক্ত হতে পারে। ইচ্ছা করলে ঔষধে ভেজাল করে তাদের রোগকে আরো জটিল করতে পারে। ঔষধ হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর ভেজাল হলো "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ"।

বারাকাহ, যায়দ, খাদিজা, আম্মার, সুহাইব, ইব্ন্ মাস্উদ, খাব্বাব, সালমান ও উসামাহরা ঔষধ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নিরোগ হয়েছিলো। তাই তাদের পূনঃ রোগাক্রান্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। অপর পক্ষে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তাল্হা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবন্ আউফ এবং মা আয়শা ও হাফসাদের পূনঃ পূনঃ রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ স্বয়ং সূরা হুজুরাত, মুম্তাহানা, তাহরীম, আহ্যাব ও তওবার মতো দীর্ঘ দীর্ঘ সূরা নাযিল করে আমাদের জন্য ক্বেয়ামত পর্যন্ততার অকাট্য প্রমাণ সংরক্ষণ করেছেন।

খাঁটি বা আসলের সাথে কিছু সংমিশ্রন করলে ভেজালের সৃষ্টি হয়। তারপর ভেজালকে চলতে দিলে কিছু দিন পর ভেজালের "ভে" বাদ পড়ে শুধু "জাল" রয়ে যায়। বাবা আদম আঃ থেকে ধরাপৃষ্ঠে সবচেয়ে খাঁটি কথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। এ কালেমাই তাওহীদ। এ কালেমাই সকল নবী রাসূলদের রিসালাত। এ কালেমাই দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি ও সফলতার একমাত্র মন্ত্র। খাতামুন নাবিয়্যীন সঃকে দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করেছেন মুস্তাদআফ্ যায়দ, বারাকাহ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের আনুগত্য ও অনুসরণ দিয়ে, এ কালেমা পড়া মাত্রই কোনো খাঁটি ঈমানদারের জীবন সকল বর্ণ ও গোত্রবাদের ইবলিসী পঙ্কিলতা থেকে চিরতরে পবিত্র হয়ে তার জন্য তাক্বওয়ার দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গ তৈরী হয়। যেমন অতীতে মুস্তাদআফ্দের হয়েছিল এবং এখনো হবে। ভবিষ্যতেও হবে। এটাই আল্লাহর অপরিবর্তনীয় সুন্নাহ বা বিধান।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (সূরা ফাতহ-২৩ সূরা গাফির-৮৫, সূরা আহযাব-৬২ সূরা বনি ইসরাঈল-৭৭) আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবীর দ্বারা দ্বীনকে পূর্ণ করে নিজের ব্যাপারে ক্বোরআনে সাক্ষ্য দিয়েছেন "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই"। (আল ইমরান-১৮) রাসূল সঃ বলেছেন, বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সফল হবে। যে বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ রিসালাত পূর্ণ করে রাসূল সঃ উসামাহকে আমীর নিযুক্ত করে বিদায় নিয়েছেন। সূরা ক্বাসাস দিয়ে আল্লাহ তাই নির্দেশ করেছেন। আবু বকর উমররা তার সাথে ক্বোরেশী নেতৃত্ব যোগ করে ভেজাল করেছে। উসমান তাকে জাল দিয়ে পাকিয়েছে। আলী মৌনতা অবলম্বন করে তাতে সায় দিয়েছে। তখনো কিন্তু "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর উপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ব্যানার ঝুলছিল। কিন্তু মক্কী কুফরের মাথা আবু সুফ্ইয়ান ও হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়া এসে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর" ব্যানার অপসারণ করে "আল আইম্মাতু

মিন ক্বোরেশ" কে শীর্ষে তুলে তার নিচে বনু উমাইয়ার সাম্রাজ্যের সংযোগ করে নিজেকে "আনা ক্বায়সারুল আরব" বলে আসল ভেজাল বাদ দিয়ে শুধু জালের প্রচলন করে। তারপর থেকে ব্যানার বদলাতে বদলাতে আব্বাসী, মুঘল, পাঠান ও তুর্কী হয়ে হাসিনা, খালেদা, বেনজীর, তানসিসেলরে ও মেঘাবতীতে এসে মুসলমানরা ঠেকেছে। তাতেও কিন্তু তাদের ঈমান যাচ্ছেনা। কারণ মূলে যে বদরের প্রতিশোধ গ্রহণকারী, হামযার কলিজা ভোগী হিন্দার পুত্র ও নাতি ক্বোরেশী পঞ্চম ও ষষ্ঠ খলিফা মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ! তাও আবার রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরী করে?

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ সত্যের পর মিথ্যা ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা ইউনুস্-৩২) "মুস্তাদ্আফুন" ব্যতীত আরবরা, নগরবাসী কি মরুবাসী, কেউ নিখাদ ঈমান আনেনি। عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا সম্ভাব্য স্বার্থ ও অবশ্যম্ভাবী পরাজয় আঁচ করে الأعراب আল্ আ'রাব বা আরবরা আত্মসমর্পণ করে মাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছিলো। তাও রাসূল সঃ এর পক্ষে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়ের বদৌলতে।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন দেখবে লোকেরা কাতারে কাতারে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করবে। ইসলামে প্রবেশের পর যদি হতভাগারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে ব্রতী হতো, তাহলে তাদের সৌভাগ্যের কপাল খুলতো, তাদের আমল বরবাদ হতো না। জামাল, সিফফীন ও হাররা ঘটতোনা। বাগদাদ, স্পেন, দামেশ্‌ক ও দিল্লীর পতন হতো না। وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যে ব্রতী থাকলে তোমাদের কোনো আমলই বিনষ্ট হবে না। (সূরা হুজুরাত-১৪)

আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায়ই তারা রাসূল সঃ কে পেয়েছিলো। কিন্তু মুদ্রাদোষে তারা রাহমাতুল্লিল আলামীনের মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ তাই তাঁর রাসূল সঃ কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূল সঃ যেনো আরবদের ইসলামায়নে নিজেকে কৃপায়ীত না ভাবেন। বরং তিনি যেনো ক্বোরেশী, অক্বোরেশী, আনসার, মুহাজির, শহর বা মরুবাসী সবাইকে বলে দেন যে, রাসূল সঃ কে তাদের মাঝে পাঠিয়ে আল্লাহ্ গোটা আরব জাতিকেই কৃপা করেছেন। সে কথা যেনো তারা স্মরণ রাখে। قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ কাল, পাত্র ও স্থান নির্বিশেষে আল্লাহ মহাকাশ ও বিশ্বের সকল গোপন তথ্যাদি জানেন। তিনি সব কিছুর পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ করেন। পূর্বাপরের আগমনের অসার বৈশিষ্ট্য দাবি করে কেউ আল্লাহর কাছে পার পাবে না। তাক্বওয়ার পাথেয় উপার্জনের মাধ্যমেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে হবে। এতে সফলরাই রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু। কোনো কাল ও শ্রেণীর গন্ডিতে তা সীমাবদ্ধ নয়। (সূরা হুজুরাত-১৮) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

সূরা মুমতাহিনাহ্

এবার প্রবেশ করা যাক সূরা মুমতাহিনাতে। মক্কা থেকে রাসূল সঃ এর হিজরতের পথে যেমন সূরা মুহাম্মদ নাযিল হয়, তেমনি মক্কা বিজয়ের অভিযান কালে সূরা মুম্তাহিনা অবতীর্ণ হয়। মুমতাহিনা ও মুমতাহানা, দুটি নাম এ সূরার। অর্থ পরীক্ষক, পরীক্ষিতা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সূরাটি রাসূল সঃ এর কথিত সাহাবীদের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে নাযিল হয়। সাধারণভাবে এ সূরার বক্তব্য ক্বেয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদার জনগোষ্ঠীর ঈমানের মাপকাঠি। নরনারী নির্বিশেষে সবাইকে এ মাপে উত্তীর্ণ হতে হবে। নবী রাসূলরাও এ মানদন্ডের উর্ধ্বে নন। তাই অতীব গুরুত্ব দিয়ে এ সূরাটির অধ্যায়ন ও তার শিক্ষা শিরোধার্য করতে হবে।

যদিও কথিত হাদিসের বর্ণনায় দেখা যায় যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এক মক্কী, হাতেব ইবন আবি বালতাআর আরচণ নিয়ে এ সূরাটি নাযিল হয়, তবুও সকল ঈমানদার জনগোষ্ঠী ও তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ সূরার নীতিমালা অবশ্য পালনীয়। এর যে কোনো একটি নীতি বা ধারা লজ্ঘণকারী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আর ইসলামের অনুসারী থাকবেনা। এই পরীক্ষায় পাস করতেই হবে। তাই এর নাম পরীক্ষক ও পরীক্ষিতা। এর মোট আয়াত সংখ্যা তেরো। স্বয়ং রাসূল সঃও এ পরীক্ষার উর্ধ্বে ছিলেন না। কারণ, হযরত ইব্রাহীম আঃ কেও এ সূরায় ছাড় দেয়া হয়নি।

রাসূল সঃ মক্কা বিজয় অভিযানও অন্যান্য অভিযানের মতো গোপন রাখেন। তাঁর নিয়ম ছিলো, তিনি তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিতেন। কিন্তু কোথায় অভিযানে যাবেন তা বলতেন না। এমন কি উত্তর দিকে কোথাও যুদ্ধাভিযানে বের হলে তিনি মদীনা থেকে প্রথম দক্ষিণ দিক দিয়ে বের হতেন। যাতে গোপনীয়তা রক্ষা হয়। কারণ তিনি তার সঙ্গী আরবদের বিশ্বাসঘাতক প্রবণতা সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। যা আল্লাহ্ সূরা মুনাফিকুন ও তওবায় তাঁর রাসূলকে সাবধান করেছেন।

রাসূল সঃ এর মক্কাভিযানের ব্যাপারটি এবার আঁচ করে হাতেব এক মেয়েলোককে পত্রসহ মক্কায় পাঠিয়ে তার স্বজনদের সংবাদ দেয়ার পদক্ষেপ নেয়। মেয়ে লোকটি মাদীনা থেকে রওয়ানা হওয়া মাত্র আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে অহী মারফত তা জানিয়ে দেন। রাসূল সঃ অহী মারফত বলে দেয়া পথে আলী ও যুবায়রকে পাঠিয়ে মেয়েলোকটিকে পাকড়াও করে তার কাছ থেকে হাতেবের পত্র উদ্ধার করে।

হাতেব বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি ছিলো। হাতেব তার কর্মের পেছনে গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা স্বীকার করে প্রাণে রক্ষা পায়। কিন্তু পরবর্তীতে মুহাদ্দিসরা হাদিস দাঁড় করে যে বদরী সাহাবাদের সাতখুন মাফ। অর্থাৎ রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে, আল্লাহ্ নাকি রাসূল সঃ কে জানিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরা পরবর্তীতে যতো অন্যায়ই করুক না কেনো, সব মাফ।

আসলে এ কথাটি রাসূল সঃ ও আল্লাহর নামে প্রচার করা ডাহা মিথ্যা বই আর কিছুই নয়। রাসূল সঃ হাতেব কে কারণ দর্শাতে বললে হাতেব বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি জানেন যে, আমি ক্বোরেশী নই। ক্বোরেশদের সাথে সম্পৃক্ত একজন বহিরাগত। আপনি আল্লাহ্র হুকুমে মক্কা জয়ে যাচ্ছেন। আপনার বিজয় প্রতিহত করার শক্তি ক্বোরেশ ও মক্কাবাসীদের নেই। জয় আপনার হবেই। তবে মক্কায় বড় রকমের হত্যাযজ্ঞ হতে যাচ্ছে। মক্কায় আমার স্বজনরা রয়েছে। তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। তাই তারা আত্মরক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন করুক, সে জন্য আমি তাদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এ পত্র পাঠিয়েছিলাম। আমি মুর্তাদ বা কাফের রূপে এ কাজ করিনি।" উমর তার স্বভাব অনুযায়ী হাতেবের গর্দান উড়াতে রাসূল সঃ এর অনুমতি চেয়েছিলো। রাসূল সাঃ হাতেবের ওজর শুনে তা' গ্রহণ করেন, এবং হাতেব তার দোষ স্বীকার করে তাওবা করে। (আইসারুত তাফাসীর)

মানুষ জীবনভর পাপ করে, পরে ভুল বুঝে তওবা করে ভালো কাজ করলে তার মুক্তির পথ খোলে। তদ্রুপ জীবন ভর নেককাজ করে শেষ জীবনে ঈমান বিধ্বংসী কোনো পাপ করলে তার সর্বনাশ হয়ে যায়। এটাই চিরসত্য আল্লাহ্র অমোঘ বিধান। হাতেব ইব্ন্ আবি বালতাআর ঘটনাকে বিকৃত করে পরবর্তীতে ক্বোরেশী আরবদের মক্কা মদীনায় ঘটানো হত্যাযজ্ঞ, ব্যভিচার, গণধর্ষণ, ও কাবাঘরে অগ্নি সংযোগের অমার্জনীয় পাশবতাকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার অসতোদ্দেশ্যে মিথ্যা হাদীস বানানো ও প্রচার করা হয়, যে বদরী সাহাবীদের সকল অপরাধ পূর্ব থেকেই আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সাহাবী সাধারণের ক্রিয়া কলাপেরও কোনো সমালোচনা দূরে থাক, পর্যালোচনাই করা যাবে না। অথচ এ শয়তানী মিথ্যাচারই পৃথিবীর সকল বিপ্লবের ফলকে ঘুণের মতো খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

বিপ্লবের প্রথম সারির আত্মত্যাগী ব্যক্তিরা প্রায়ই বিপ্লবী আন্দোলন চলা কালে নিহত হয়। প্রথম সারির দু'চার জনসহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতারাই সাধারণতঃ বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে ক্ষমতায় আসীন হয়। এ পর্যায়ে আন্দোলনের সাথে সাধারণভাবে জড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিজেদের ক্বায়েমী স্বার্থবাদীরূপে দেশে ও জনগণের উপর চাপিয়ে বিপ্লবের ফায়দা কুক্ষিগত করার অপকর্মে লিপ্ত হয়। এ সময়ে মূল নেতৃত্ব যদি শক্তহাতে এদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ না করে, তা' হলে বিপ্লবের ফল সম্পূর্ণ উল্টো পথ নেয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ ক্ষেত্রে অমাদের দেশে ঘটে যাওয়া দুটি উদাহরণ তুলে ধরাকে আমি অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না। ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজ-ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যবাদ থেকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন হয়। মুসলিম লীগ নামের রাজনৈতিক দল তার নেতৃত্ব দেয়। পাকিস্তান অর্জিত হলে পরে মুসলিম লীগের লোকেরা তাকে তাদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির মিরাস বানিয়ে ফেলে। লুটপাট থেকে সকল অপরাধ তাদের বৈদিক অধিকারের রূপ ধারণ করে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কিছু বলা মাত্র তা' রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও ভারতের লেলানো কুকুরদের কাজ বলে অভিহিত হয়। ফলে পাকিস্তান আর জনগণের দেশ হয়নি। এভাবেই তার মৃত্যু ঘটে।

পাকিস্তানী দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুক্তি যুদ্ধ হয়। দেশ মুক্ত হওয়ার পর এদেশটি মুক্তি বাহিনীর মুক্তদূর্নীতির লীলাভুমি হয়। মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িতদের সাত খুন মাপ। তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তারা আল বদর, রাজাকার, ও পাঞ্জাবীদের দালাল।

এ শয়তানী ধারার জন্য পাকিস্তান কখনো কল্যাণ রাষ্ট্র হতে পারেনি। বাংলাদেশও পারছেনা। পারবেও না। অচিরেই কোনো ঐশী আদর্শের আন্দোলন বাংলার মাটি থেকে না উঠলে এদেশ ও দেশবাসীর পরিণাম মানব ইতিহাসের করুণতম ঘটনা হবে।

রাসূল ও রিসালাতের আন্দোলন ঐশী। গোত্র, বর্ণ ও সকল বৈষম্যবাদ নির্মূল করে বিশ্বজনীন সত্যে প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য। শেষ নবী সঃ কে দিয়ে আল্লাহ্ তার চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করে মুস্তাদআফ্দের বর্ণাঢ্য জামাত দাঁড় করেন। মক্কার মুস্তাকবিরদের হাতে নির্যাতিত যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও খাব্বাবরা সে জামাতের আদর্শ প্রথম সারি। তাক্বওয়া এ জামাতের নেতৃত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র মাপকাঠি ও মানদন্ড।

এ জামাতে শামিল হতে হয় পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, নিজের অর্জিত ধন, নিজের সাজানো ব্যবসা ও নিজের গড়া অট্টালিকা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র ও রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে। (তওবা-২৪) এ পথে পা বাড়ানোর পর আর পেছনে ফেরা যাবে না। পেছনে ফেরার নাম হলো "ইরতিদাদ", যারা এ কাজটি করে, তারা মুর্তাদ। জীবনভর, বদর, উহুদ, আহযাব, হুনাইন, খায়বার বা তাবুকের জিহাদে শরিক হওয়ার পর একটি মাত্র উল্টা কাজ করে জীবনাবসান হলেই সব শেষ। তওবা করে কাফ্ফারা আদায় করতে না পারলে বদর উহুদের দোহাই অচল, অসার। সব বরবাদ।

সূরা মুম্তাহিনা পরীক্ষার দাঁড়িপাল্লা। এ দাড়ি পাল্লায় সবাইকে মেপে নিজ নিজ অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। আমৃত্যু তাতে অনড় থাকতে হবে। নবী থেকে সাধারণ ঈমানদার নরনারী কারো জন্যে এ থেকে রেহাই বা অব্যাহতি নেই।

এবার আমরা প্রবেশ করছি, পরীক্ষার হলে। সূরা মুমতাহিনায়। দেখা যাক আমাদের কার অবস্থান কোথায়। এ কিন্তু প্রাথমিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক বা টেস্ট পরীক্ষা নয়। চূড়ান্ত পরীক্ষা। পাশ করলে পাশ, ফেল করলে ফেল। নকলের কোনো স্কোপ নেই। গার্ড দিচ্ছেন প্রত্যেকের সাথে দুজন করে। "কেরামান কাতেবীন" তাদের পরিচয়। হল সুপার খোদ আল্লাহ্।

(১) হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি অর্জনে আমার পথে জিহাদে বের হয়ে থাকো, তা হলে তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের সুহৃদ রূপে গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তা বিনিময় করতে পারবে না। তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছো বলে তারা রাসূল ও তোমাদের দেশ ছাড়া করেছে। তারপরও কি তোমরা গোপন বন্ধুত্ব বজায় রাখবে তাদের সাথে? অথচ আমি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল তথ্য জানি। তোমাদের মাঝে যেইবা এ কাজ করবে, নিশ্চিত জানবে যে সে সরল পথ থেকে পতিত।

(২) জেনে রাখবে, তারা তোমাদের বাগে পেলে তোমাদের শত্রু হবে। তোমাদের উপর হাত তুলবে। জঘণ্যভাবে গালি গালাজ করবে। তারা তোমাদের পূনঃ কাফের বানাতে সচেষ্ট হবে।

(৩) কিসের টানে এসব করবে? তোমাদের রক্তের স্বজন ও সন্তান সন্ততি রোজ ক্বেয়ামতে কোনোই কাজে আসবে না। সে দিন সকল সম্পর্ক ছুটে যাবে। তোমরা যেই যা করছো, আল্লাহ্ তা' সবই নিরীক্ষণ করেন।

(৪) এ ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলো ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীরা। ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের সম্প্রদায়কে বলে দিয়েছিলো, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের দাসত্ব করো, আমরা তাদের সাথে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। এবং এ মূহুর্ত থেকে চিরতরে তোমাদের সাথে শত্রুতা ও তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঘোষিত হলো। যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে। তবে ইব্রাহীম যে তাঁর বাপকে বলেছিলো, 'বাবা, যদিও আমি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার জন্য বিশেষ কিছু করার অধিকার রাখিনা, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করবো' এ কাজ তোমরা করতে পারবে না। এ কথা বলে ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীরা আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে বলেছিলো, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা সবকিছু ছেড়ে আপনার হাতে আমাদের সমর্পণ করলাম, ও আপনার পাণে ধাবিত হলাম। আমরা আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।"

(৫) "হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি কখনো আমাদের কাফেরদের নিপীড়নের পাত্র করবেন না। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আপনিই আমাদের প্রভু রূপে মার্জনা করবেন। আপনি পরাক্রমশালী বিচারক।"

ইব্রাহীম আঃ তাঁর মুশরিক পিতার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর একান্ত বন্ধু "খলীল" কে তা করতে নিষেধ করেছেন। প্রত্যেক মু'মিনকে তাই অনুসরণ করতে হবে। খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ কেও তা করতে হয়েছে। তিনি রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামীন। মুমিনদের জন্য সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর চেয়ে দয়ালু অকল্পনীয়। পিতা মাতার প্রতি তাঁর তুল্য দায়িত্বশীল কেউ হতে পারে না।

ইব্‌ন্ কাসীর তার সীরাতুন্নবী গ্রন্থে প্রথম খন্ডে ২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠায় আহ্‌মদ, বায়হাক্বী, হাকিম ও মুস্‌লিম থেকে বুরাইদা ও ইব্‌ন্ মাস্‌উদ থেকে বর্ণনা করেছে। তারা বর্ণনা করেছে যে রাসূল সঃ একদা যাত্রা পথে যাত্রা বিরতি করে তাঁর সঙ্গীদের তাদের স্ব স্ব অবস্থানে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। তারপর রাসূল সঃ আমাদের নিকট থেকে একটু দূরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি ভারাক্রান্ত মনে ফেরত আসেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূল সঃ বলেন, যে তিনি তাঁর মা আমিনার কবরের স্থান জানতে চেয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে আরজি পেশ করেন। জিব্রাঈল আঃ মারফত আল্লাহ্ তাঁকে আমিনার কবরস্থান দেখান। রাসূল সঃ তাঁর মা আমিনার কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে আমেনার মাগফিরাত ও তার জন্য শাফায়াতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তাঁকে শুধু যিয়ারতের অনুমতি দেন। মাগফিরাত ও শাফায়াতের অনুমতি দেন নি। রাসূল সঃ কবরের পার্শ্বে গিয়ে এমন কেঁদেছেন যে আমরা তাঁর কান্না শুনে কেঁদেছি। উমর রাসূল সঃ কে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে রাসূল সঃ বলেন "এ হলো আমেনা বিন্‌ত ওয়াহাবের কবর। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাই। আমাকে অনুমতি দেয়া হয়। আমি মাগফিরাতের অনুমতি চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাতে আমার কান্না পায়"। বুরাইদা বলে যে সে ঘটনার মতো রাসূল সঃ কে কখনো কাঁদতে দেখা যায় নি।

মুহাজির ইব্‌ন্ দিসারও বুরাইদা থেকে একই প্রকার বর্ণনা করেছে। অন্য এক রাওয়ায়াতে বাইহাকী, হাকিম, আসাম্ম থেকে গোড়ায় আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছে যে, রাসূল সঃ বহুক্ষণ কেঁদেছেন। আমরা তাঁকে বলেছি, "আপনার কান্নায় আমরাও কেঁদেছি এবং আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছি"। রাসূল সঃ আমাদের পার্শ্বে এসে বললেন, "তোমরা কি ভয় পেয়েছো?" আমরা বললাম, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, যে কবরের কাছে আমাকে কাঁদতে দেখেছো, আমাকে মুনাজাত করতে লক্ষ্য করেছো, তা হলো আমেনা বিন্‌ত ওয়াহ্‌বের। আমি যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তা দেওয়া হয়। কিন্তু তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করে এ আয়াত নাযিল হয়, "নবী এবং যারা ঈমানদার, তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার বৈধ নয়। হোকনা তারা নিকটতম জন। মুশরিকরা জাহান্নামী জানার পর তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা যাবে না। ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য না জেনে মাগফিরাত কামনার বিশেষ অঙ্গিকার করেছিলো। পরে যখন স্পষ্ট হলো ইব্রাহীমের নিকট যে, তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু, তৎক্ষণাৎ ইব্রাহীম তা'থেকে বিরত হয়ে যায়। অবশ্যই ইব্রাহীম কোমল হৃদয় সহনশীল ছিলো।" (সূরা তওবা-১১৩, ১১৪)

মুসলিম আনাস থেকে বর্ণনা করেছে, এক ব্যক্তি এসে রাসূল সঃ কে প্রশ্ন করে, "আমার পিতা কোথায়?" উত্তরে রাসূল সঃ বলেন, "সে জাহান্নামে"। লোকটি চলে যেতে আরম্ভ করলে রাসূল সঃ তাকে ডেকে বলেন, "তোমার বাবা, আমার বাবা জাহান্নামে"।

বাইহাকী আবু নাঈমের বর্ণনায় আমের ও তার বাবা সা'আদ থেকে বর্ণনা করেছে যে, জনৈক আরব রাসূল সঃ এর খেদমতে এসে বলে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাবা স্বজনদের উপকার করতো। মৃত্যুর পর এখন আমার বাবার অবস্থান কোথায়? রাসূল সঃ বললেন, জাহান্নামে।

বর্ণনাকারী বলছে যে প্রশ্নকারী লোকটি যেনো রাসূল সঃ এর উত্তরে একটু ব্যথা পেলো। তারপর প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার বাবা কোথায়? উত্তরে রাসূল সঃ স্পষ্ট করে বললেন, যেখানেই কোনো কাফেরের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিবে(?)।

সৃষ্টির সেরা মানুষ আল্লাহ্‌র বড়ই প্রিয়। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়, তখন তার চেয়ে ঘৃণ্য আর হয় না। হোক তারা নবী রাসূলদের পিতামাতা। ঈমান আনার পর প্রত্যেক মু'মিন নরনারীর প্রথম কাজ হলো কাফের মুশ্‌রিকদের সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে মু'মিনরা পরস্পর ইস্পাত ঢালাই প্রাচীরের ন্যায় একক সত্তায় রূপান্তরিত হওয়া।

ইব্রাহীমী আদর্শের গুরুত্বকে আরো প্রত্যায়নের জন্য আল্লাহ্‌ জাল্লাজালালুহু পুনঃ বলেন ঃ

(৬) যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং পরকালের সফলতা প্রত্যাশা করে তাদের জন্য সন্দেহাতীত উত্তম আদর্শ রয়েছে তাদের মধ্যে। এর পরও যারা সে আদর্শ থেকে মুখ ফিরায়, এ শ্রেনীর মানব সন্তানের আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি একাই যথেষ্ট প্রংসার্হ।

(৭) এ মানদন্ডে তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যাদের সাথে শত্রুতা ক্রয় করবে, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে তোমাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তাদের তোমাদের দিকে মোড় ঘোরাতে পারেন। আল্লাহ্‌ পারঙ্গম। ওরা মোড় ঘুরিয়ে সঠিক পথে আসলে আল্লাহ্‌ তাদের অতীত ভুল ক্ষমা করে দিবেন। তিনি পরম দয়ালু।

(৮) হ্যাঁ, যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্‌গহস্ত হয়নি, বা তোমাদের ভিটাবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেনি, আল্লাহ্‌ সে ধরনের লোকদের সাথে সদ্‌ভাব বজায় রাখতে ও ন্যায় বিচারে নিষেধ করেন নি। বরং আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদের পছন্দ করেন।

(৯) সম্পর্ক বজায় রাখার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কঠোর নিষেধাজ্ঞা ওদের বেলায়, যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, ভিটাবাড়ী থেকে তাড়িয়েছে এবং তোমাদের বহিষ্করনে সহযোগিতা করেছে, এদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে, তারা নিশ্চিত যালিম।

(১০) হে ঈমানদার নরেরা! যখন ঈমানদার নারীরা হিজরত করে তোমাদের সাথে মিলিত হতে আসবে, সে পরিস্থিতিতে যদিও আল্লাহ্‌ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক ভাবে অবগত, তবুও তোমরা তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নিবে। তোমাদের পরীক্ষায় যদি প্রতীয়মান হয় যে এ নারীরা সত্যিকারে মু'মিনাত, তাহলে তোমরা তাদের, কাফের স্বামী ও অভিভাবকদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। কারণ এরা পরস্পর কারো জন্য হালাল বা বৈধ নয়। এদের পেছনে কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা' তাদের পরিশোধ করে দাও। এবং তোমরা যা পাবে তা কাফেরদের কাছ থেকে চেয়ে নাও। ইদ্দত পূর্তির পর ওদের প্রাপ্য দিয়ে তোমরা তাদের বিবাহ করাতে কোনো দোষ নেই। তবে কাফেরদের সাথে দেয়া হাতের বাঁধন আর রাখবেনা। তোমরা পরস্পরের ব্যয়ীত দেনা পাওনা বিনিময় করে মুমিন নারীদের দায়মুক্ত করবে। এটা তোমাদের করণীয় আল্লাহ্‌র আদেশ। আল্লাহ্‌ সব জেনেই এ নির্দেশ দিয়েছেন।

(১১) তবে তোমাদের স্ত্রীদের খাতে যদি কাফেরদের কাছে তোমাদের কোনো পাওনা থাকে, এবং তা'যদি তোমরা দাবি করো, তবে কাফেরদেরও তাদের স্ত্রীদের খাতে ন্যায্য পাওনা মেটাতে হবে। সমানে সমান। এ ব্যাপারে তোমরা বেশী করে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। যাঁতে তোমরা বিশ্বাসী।

(১২) হে নবী, তোমার কাছে যখন মু'মিন নারীরা ঈমানের বায়আত নিতে আসবে, তখন নারীদের ব্যাপারে তোমাকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণতঃ কোনো পুরুষ ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করলে বায়আতে তাওহীদে অনড় হওয়া, শির্কমুক্ত থাকা এবং ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার করতে হয়। কিন্তু এ আয়াতে দেখা যায় যে, নারীদের ঈমানের অঙ্গীকারে আল্লাহ্‌ নরদের চেয়ে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করে রাসূল সঃ কে তার অঙ্গীকার নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ই নরনারীর স্রষ্টা ও উভয়ের অন্তর্যামী। তিনি তাঁর জানা রহস্য দিয়ে নারীকে রহস্যময়ী করেছেন। নারী ভালো হলে ধরা পৃষ্ঠ জান্নাত সম। মন্দ হলে জাহান্নাম।

এবার দেখা যাক, মৌখিক ভাবে ঈমান ঘোষণা করলেও কার্যতঃ মেয়েদের সত্যিকার ঈমানদার হতে কী কী মেনে

চলতে হবে। (ক) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবেনা। (খ) চুরি করবেনা (গ) ব্যভিচার করবেনা। (ঘ) সন্তান হত্যা করবেনা। (ঙ) দু'হাত ও দু'পায়ের মধ্যস্থল দিয়ে কোনো মিথ্যা বা কেলেঙ্কারীর জন্ম দিবেনা। (চ) শরিয়ত, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোনো বিধান মেনে নিতে অবাধ্য হবে না।

প্রথম চারটি শর্ত সহজ বোধ্য। তা নিয়ে ব্যাখ্যায় যাবো না। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শর্ত দুটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বুঝতে ও তা' মেনে চলতে হবে। তা' না হলে ঈমানের দাবী পূরণ হবে না। পঞ্চম শর্তটি হলো দু'হাত ও দু'পার মধ্যস্থিত অঞ্চল দিয়ে মিথ্যা ও কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করবেনা। দু'হাত ও দু'পার মাঝ থেকে কী ফিৎনার জন্ম দেয়া হয়, বা যায়? কয়েক যুগ পূর্বে এর সঠিক ব্যাখ্যা নিরূপণ কষ্টকর হতো ও তাতে দ্বিমত করা যেতো। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়া আবিস্কৃত হয়ে তা' বিশ্বময় দিবানিশি চালু হওয়ায় তা জলবত তরল সহজ হয়েছে। এ সত্যকে কিছু নীচ নির্লজ্জ নারী পুরুষ ছাড়া কেহ অস্বীকার করবেনা। পূর্বে যখন দেখা যেতো যে মেয়েরা ঘরের বাইরে রাস্থাঘাট ও হাট বাজারে বক্ষ ও উরু সন্ধি দুলিয়ে বেড়াতো, তাতে কটাক্ষ করা হলে বলা হতো যে এ দৃষ্টিকোণ পুরুষ প্রাধান্য রোগের বহিপ্রকাশ। আসলে মেয়েরা তা' ভাবেনা, করে না। প্রকৃতির সৃষ্টির কারণেই তা' মেয়েদের চলার সময় দেখা যায় বা মনে হয়। আসলে তেমন কোনো মানসিকতা নারীদের মাঝে নেই। কিন্তু এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ভিডিও ইন্টারনেটের চাবি ঘুরালে কী দেখা যায়? বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ মিথ্যুক ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেক বিবেকবান নারী পুরুষ আঁতকে উঠে বলতে বাধ্য যে, এ কী হচ্ছে? মেয়েরা হস্তদ্বয় ও পদযুগলের সন্ধিকে কিভাবে নাচাচ্ছে? ঘরে ঘরে এ কুকুরীদের এ কান্ড সপরিবারে দেখছে। এ কুক্কুরী বলাটা আমাদের প্রতিক্রিয়াশীলদের দেয়া গালি নয়। এ নাম এ সমস্ত মিডিয়ার আবিস্কর্তা ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজকদের দেয়া "বিচ" এর অনুবাদ মাত্র। এ গোস্তনাচানো ও বেচার পেশাকে ওরাই "ফ্লেশ ট্রেড" বা মাংস ব্যবসা নাম দিয়েছে। আমরা দেইনি।

বিশ্ব স্রষ্টা আলাহ্ বলেছেন, ঈমানদার নারীরা তা করবেনা। এ প্রতিজ্ঞা করলেই তারা ঈমানের তালিকায় প্রবেশ করবে। নইলে নয়। কারণ, তা'ছাড়া মেয়েরা উরুসন্ধির বাঁধন একটু ঢিলা করলেই স্বামীর ঘরে অন্যের বীজ ঢুকিয়ে দিবে। যা পূর্বে মক্কায় হিন্দারা করেছে, বর্তমানে ডায়না, মেডোনা ও মনিকারা করছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় যে এ ধারায় পূর্বাপর কী মিল! তাফ্‌সীরে কাশ্‌শাফের প্রণেতা ইমাম যমখ্‌শরী তার কিতাব রবীউল আবরারে উল্লেখ করেছে যে, হিন্দা বিন্‌ত উৎবা ন্যুন চার পুরুষ কুকুরের কুকুরী ছিলো। তন্মধ্যে আব্বাস অন্যতম। মুয়াবিয়াকে আব্বাসের ঔরস জাত বলা হয়। তখন যেহেতু ডি এন এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না, তাই ট্রেকারদের দিয়ে তা' নির্ণয় করা হতো। এ চরিত্রের কুকুরীগুলো তাদের পেটের সন্তানকেও কুকুরী নামকরনে লজ্জা পেতো না। হিন্দার পুত্র "মুয়াবিয়া" যার অর্থ "কেউ কেউ করা কুক্কুর" (দেখো, সকল আরবী অভিধানে একই অর্থ লেখা রয়েছে।)

বদর, উহুদ, আহযাব ও খায়বারের যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়াভিযানে এ সূরা নাযিল হয়েছে। বিজয় কালে অভিযানে শুদ্ধি অভিযান না হলে বিজয় টিকেনা। তাই আল্লাহ্ শুদ্ধি প্রণালী বাত্‌লাচ্ছেন রাসূল সঃ ও মু'মিনদের।

বদরের প্রতিশোধ কল্পে উহুদের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। মক্কার মেডোনা হিন্দা তার বাপ চাচা, উৎবা ও শায়বা হত্যার নায়ক হামযাকে হত্যার জন্য ওয়াহশীকে হস্ত ও উরুর মধ্যস্থল নাচিয়ে প্রলুব্ধ করছে। (দেখো-দি মেসেজ) উহুদের ময়দানে যুদ্ধের পূর্বের রাতে মদ্য ও হিন্দাদের ঢালাঢালী ও ঢলাঢলী চলছিলো বলে সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মাগাযীতে দেখা যায় যুদ্ধের প্রথমার্ধে যখন রাসূল সঃ ও মু'মিনীনের জয় সূচীত হচ্ছিলো, তখন হিন্দা তার সহজাত সহচরীদের নিয়ে যখন পালাচ্ছিলো, হিন্দারা কাপড় তুলে ঐ নিষিদ্ধ অঙ্গ দেখিয়েই পালাচ্ছিলো। সে দিন তীরন্দাজরা যদি রাসূল সঃ এর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ না করতো, তা হলে সে দিনই হিন্দা, আবু সুফ্‌ইয়ান ও মুয়াবিয়াদের ইতিহাসের ইতি হয়ে যেতো। তীরন্দায প্রহরীদের ভুলে ওয়ালিদের পুত্র খালিদ পেছন থেকে আক্রমন করে যুদ্ধের ধারা পাল্টিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ সাহায্যে রাসূল সঃ কে প্রাণে রক্ষা করেন। তিনি ক্ষতবিক্ষত হন। তাঁর দান্দান শহীদ হয়। তাঁর সমবয়সী চাচা হামযা শহীদ হয়। হিন্দা তার নাক কান কেটে মালা তৈরী করে গলায় পরে। বুক কেটে কলিজা বের করে চিবায়। মানব ইতিহাসে হিন্দাই একমাত্র পাষন্ডী পাতকী যে মানুষের কলিজা খেয়েছে। যার স্বামী আবু সুফইয়ান আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নবীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত কুফরী শক্তির নেতা, "রা'সুল কুফর ওয়াল আহ্‌যাব" রূপে দীর্ঘ বাইশ বছর যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করে কুখ্যাত হয়। তার ছেলে মুয়াবিয়া ইসলামের পর পুনঃ জাহিলিয়াতের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তার নাতি ইয়াযিদ কারবালার ঘটনা ঘটায়। মদীনায় গণ ধর্ষণ করায় ও কাবায় অগ্নি সংযোগ করে তাকে ভস্মিভূত করে।

কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্র নির্দেশে, আল্লাহ্র ঘরের মর্যাদা রক্ষার্থে মক্কায় রক্তপাত এড়াতে রাসূল সঃ যখন মক্কার কাফের ও তাদের নেতা আবু সুফ্ইয়ান ও তার কথিত স্ত্রী ও পুত্র মুয়াবিয়া এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠ, হাকাম ও মারওয়ানদের সাধারণ ক্ষমায় "তোলাক্বা" বলে প্রাণ ভিক্ষা দান করেন, তখনকার এ আত্মসমর্পণকে যে সমস্ত ভাড়াখাটা মুহাদ্দিসরা তাদের ইসলাম গ্রহণ বলে উল্লেখ করেছে, তাদের কোন শ্রেণীর মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায়?
মক্কা বিজয়াভিযান কালে হাতিবের একটি ছোট্ট ভুল যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট এতো বড়ো ভুল বলে পরিগণিত হয়েছে, সেখানে ইসলামের গোটা ইতিহাসকে বিকৃতকারীদের পাপ কতোটুকু জঘন্য?
"ক্বালাতিল্ আ'রাবু আমান্না" অর্থাৎ, আরবরা বলেছে, আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি, আল্লাহ্ বলেছেন, ওরা ঈমান আনেনি, মাত্র আত্মসমর্পন করেছে, এ'কথাই আরবদের ব্যাপারে আল্লাহ্র আরশ থেকে অবতীর্ণ একমাত্র

সত্য। وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

কথা ও বর্ণনায় আল্লাহর চেয়ে কে বেশী সত্যবাদী হতে পারে? (সরা নিসা-৮৭-১২২) ইব্‌ন আব্বাস? বোখারী,মুসলিম? মুহাদ্দিস মুফাসসিররা? আল্লাহর বর্ণিত চূড়ান্ত সত্যের পর যারা তাঁর চেয়েও সত্য বলার দাবি করে, তারাই আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে বাড়া ইবলিসের উম্মত। তারা যে বা যারাই হোক, তাদের সমুদয় আমল বরবাদ ও অসার। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। এদের পরিণাম থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই।
মক্কা বিজয়াভিযানে রাসূল সঃ যাচ্ছেন। আল্লাহ্ বলছেন, হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহ ও তার শত্রুদের প্রতি কোনো প্রকার বন্ধুত্বের দূর্বলতা প্রকাশ করবেনা। তোমাদের মাঝে যে তা' করবে, সে সিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। (সূরা মুমতাহিনার ১ম আয়াত)
রাসূল সঃ মক্কার পথে। চতুর আব্বাস মাঝপথে চাচাত্বের সুযোগ নিতে রাসূল সঃ ভাতিজার পিছু নেয়। ঈমানের নামে আত্মসমর্পণ করে। যদি সত্যিই ঈমান আন্‌তো, তা'হলে পেছনের পাপের শ্রাদ্ধ করতে কুফরের মাথা আবু সুফ্ইয়ানের মাথা কাটার মহা সুযোগ নিতো। কিন্তু পরকীয়া সম্পর্কের টানে হিন্দার খসমকে বাঁচাতে তৎপর হয়ে ইহকাল পরকালের মহাকল্যাণের সুযোগ হারায়। আব্বাসের চক্রান্তে আবু সুফ্ইয়ান প্রাণে বেঁচে যায়। মক্কা বিজয়ের পূর্ব রাতেও পাপাত্মা ঈমান আনলোনা, যা পূর্বে সবিস্তার এ বইতে বর্ণনা করা হয়েছে। মুয়াবিয়াও ঈমান আনেনি। এরা সবাই "তোলাক্বা"। রাসূল সঃ এর আল্লাহ্ কর্তৃক শিখানো নিয়ম ছিলো যে কোনো ব্যক্তি ঈমান আনলে তার জাহেলী অশোভন নাম রাসূল সঃ বদ্‌লিয়ে ভালো নাম রেখে দিতেন, যেমন তিনি আবদুল উয্‌যা থেকে আবু বকরের নামে আব্দুল্লাহ রেখেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। মুয়াবিয়া শব্দের অর্থ ইংরেজীতে সে শ্রেণীর কুকুরী, যা যৌন মিলনের জন্য যে কোনো কুকুরকে আকর্ষন করে বেড়ায়। মুয়াবিয়া শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ "বিচ"। (দেখো-অক্সফোর্ড ডিকশনারী), আরবী অভিধানেও মুয়াবিয়া বলে ঐ সমস্ত ভ্রষ্টা নারী ও বেশ্যাদের বুঝায়, যারা দেহ দানের জন্য পুরুষদের আকর্ষণ করে বেড়ায়। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে Bitchশব্দের অর্থ লিখেছে, Female Dog, Wolf or Fox: (Abusively) Human female who deliberately use her sexual attraction to get men round her(see advanced learners dictionary of Current English, Oxford University Press, London.
আরবী অভিধান আল মাওরিদ্, আল্ মুন্‌জাদ ও ক্বামূসুল আস্‌রী দেখো, তাতে মুয়াবিয়া শব্দের অর্থ লেখা আছে,
خاصة إمراة بغي، مومس، عاهرة، أنثي الثعلب، أنثي الذئب، أنثي الكلب، الكلبة.
অর্থাৎ কুকুরী, মাদি কুকুর, মাদি নেকড়ে, মাদি শৃগাল, বিশেষ করে বেশ্যানারী ও ব্যাভিচারিনী।
ইসলাম আল্লাহ্র একমাত্র দ্বীন। মানবজাতির ইহকাল পরকালে স্বর্গারোহনের সিড়ি। তার শেষ নবী উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ্, খুলকুন আযীম, বা উত্তম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের প্রতীক। নাম মুহাম্মদ ও আহমদ্। অর্থাৎ প্রশংসিত ও সর্বোত্তম প্রশংসিত। তিনি কী তাঁর হাতে ঈমান গ্রহনকারী, বা কথিত অহী লিখকের এ'নাম রাখ্তে বা পূর্বে দেয়া নাম বহাল রাখতে পারেন? তারপর এ লোকটি চতুর্থ বা পঞ্চম খলীফা হবে মুস্‌লিম উম্মার, এবং এর নাম হবে এই?! এর পক্ষে যারা মিথ্যা রচনা করেছে, তাকে যারা সত্য বা সম্ভব বলে গ্রহণ করে তার প্রচলন করেছে এবং এখনো এর পক্ষে রয়েছে বা থাকবে, এরা কারা???!!
আল্লাহ্ ও রাসূল সঃ-দের নিচে যারা আহ্‌বার, রোহ্‌বান ও সাহাবী তাবেঈদেরও সমান্তরালে মান্য ও বিশ্বাস করার ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, তাদের দুর্গতির ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। আরও আক্কেল গুড়ুম করার কেচ্ছা রয়েছে। মক্কা জয়

হয়েছে। রাসূল সঃ "মু'মিনাত" অর্থাৎ মু'মিন নারীদের বায়আত নেয়ার শর্তাবলী বর্ণনা করছেন। এখানেও হিন্দাকে দুধ মধু দিয়ে ধোয়া মোছা সতী সাবিত্রী রূপে চিত্রিত করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চালিয়েছে আবু সুফ্ইয়ান, মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদদের পোষ্য ও চোষ্য মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারীরা। মক্কা বিজয়ের মাধ্যামে মক্কার মুশরিক নরনারীদের পতনের পর ইসলাম ও ঈমানে প্রবেশে ইচ্ছুক নারীরা রাসূল সঃ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বায়আত হতে হাত বাড়ালে রাসূল সঃ তাঁর হাত গুটিয়ে নেন। এবং বলেন যে মেয়েরা পুরুষের হাতে হাত দিয়ে বা হাত স্পর্শ করে বায়আত হবেনা। তা' নাজায়েয। তারা দূর থেকে মুখে শপথ বাণী উচ্চারণ করে বায়আত হবে। বায়আতের তৃতীয় শর্ত "ব্যাভিচার করবেনা" বললে নাকি হিন্দা চাদর বা বোরকার মধ্য থেকে রাসূল সঃ-কে প্রশ্ন করেছিলো যে "ইয়া রাসূলুল্লাহ, স্বাধীন নারীরা কী ব্যভিচার করে?" কী অপূর্ব সতী সাবিত্রী? সিপাহে সাহাবার কোনো পূজারী কোনো মুশরিক হয়তো ভাববে যে তাদের সাহাবীর মাকে ভারতীয় হিন্দু নারীর সাথে তুলনা করা হলো? তোমাদের জানার জন্য বলছি যে, হিন্দা মানেই হিঁদুনী। হিন্দ থেকে হিন্দা।

মুসলিম নামধারী জাতির কতইনা দুর্ভাগ্য যে ঐ সমস্ত নষ্ট ও নষ্টাদের অনুন্যপায় আত্নসমর্পণ বা নাম কা ওয়াস্তে ইসলামে প্রবেশ করাকে তারা বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সকল সত্তাকে উৎসর্গ করে যারা ইসলামে প্রবেশ করে, তাদের মান তাদের দৃষ্টিতে গৌণ হয়ে যায়। যার ফলে মুস্তাদআফ্রা পেছনে পড়ে যায়, আর সুযোগ সন্ধানী মুস্তাকবিররা সম্মুখে এসে যায়। এবং পরে ক্ষমতা দখল করে এরা কল্যাণের বিপ্লবকে নস্যাত করে পুনঃ ধর্মের লেবাসে জাহিলিয়্যাতের হিংস্র থাবা উম্মার ঘাড়ে বসিয়ে দেয়।

কি কখনো হয় যে, হযরত ইব্রাহীমের রিসালাতের সামনে পরাজিত নমরুদ কলেমা পড়ার পর নমরুদ ইমাম হবে এবং ইব্রাহীম আঃ তার অনুসারী মোক্তাদী হবেন? একি কখনো ভাবা যায় যে মূসা আঃ এর রিসালাতে ফেরআউন নীল নদে ডুবার সময় ঈমান এনে মুসলিম হলে মূসা আঃ ফেরআউনের অধীনে তার প্রজা হবেন? তদরূপ এ কি কখনো কল্পনীয় যে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর রিসালাতের একুশ বছর যাবৎ বিরুদ্ধাচারী আবু সুফ্ইয়ান ও তার পরিবারবর্গ প্রাণ ভিক্ষায় রক্ষা পেয়ে রাসূল সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফ্দের উপর দন্ড মুন্ডের কর্তৃত্ব লাভ করবে?

এ ভুল ও ভ্রান্ত ধারনার ফলেই মুসলমান নামধারী বিপথগামী জাতি আত্মপরিচয় হারিয়ে প্রথমে ক্বোরেশী আধিপত্যবাদ, তারপর উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদ ও তারপর একের পর এক হালাকু খান, তাতার, তুর্কী, মুঘল ও পাঠান দুর্বৃত্তবাদে পিষ্ট ও নিঃস্ব হয়ে ইমরান খান, ক্লে, ও টাইসনদের মতো ধর্ষণকারী লুচ্চা লম্পটদের ইসলাম গ্রহনের কথা শুনে তাদের মাথায় তোলার পাঁয়তারায় লেগে যায়। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ

এর ঘোষিত বিধান হলো ঃ খيارکم في الجاهلية خيارکم في الإسلام و شرارکم في الجاهلية شرارکم في الإسلام

অর্থাৎ জাহেলিয়্যাতে যারা উত্তম, তারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম হবে এবং জাহিলিয়্যাতে নিকৃষ্টরা, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা পেছনে থাকবে। এটাই হলো আদি অনন্ত কাল ধরে সত্যের বিধান। এ সত্যের সার সংক্ষেপে হলো,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ(সূরা ওয়াকিআহ-১০)

এরপরও কী কোনো ঈমানের দাবীদার আল্লাহ্‌র দাসীনারী হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের সম্মুখে ও পশ্চাদের মাংস উদাম করে তা'প্রদর্শনের কল্পনা করতে পারে? নারী প্রগতির পশ্চিমা পাশবতার Bitch বা কুকুরী হতে পারে? মুমিন নরনারীরা ঈমানের ভিক্ষুক ও ভিখারিণী হয়। ঈমানী জীবনযাপন তাদের জীবিকা, তাদের বাঁচা মরার পাথেয়। যৌন জীবন মলমূত্র ত্যাগের মতো। কোনো মানুষ যেমন পায়খানায় ঢুকে মলমূত্র ত্যাগের বেশী সময় পায়খানায় কাটায়না, তেমনি তারা যৌনতা নিয়ে নিছক যৌন বর্জ্য ত্যাগের বেশী ভাবেনা ও সময় ব্যয় করেনা।

অপরদিকে বেঈমান বা কার্যতঃ ঈমানহীন জীবন যাপনকারী নারী পুরুষ কাম ও যৌন ধ্যাণধারণা নিয়েই বাঁচে ও মরে। তাদের পড়ালেখা, ব্যবসা বানিজ্য, চাকুরী বাকুরী সব ঐ যৌন উদ্দেশ্যে। ফ্রয়েড এদের পিতা মাতা। শৃগাল, কুকুর ও শুকর সহ ইত্যাকার ইতর প্রাণীর চেয়েও এরা নিকৃষ্ট। ওরা প্রজননের তাগিদে বিশেষ করে যৌন ক্রিয়ার পাগল হয়। আর এ দো'পায়া পশুগুলো বারো মাসই এর ভিখারী ও ভিখারিণী। নিষ্পাপ শিশুর ক্ষিধা পেলে পিতা মাতাকে পেটের আচ্ছাদন তুলে তাদের ক্ষুধার কথা প্রকাশ করে। অনেক সময় ভিখারী ভিখারিণীরাও তা করে থাকে। তবে তা' নিশ্চয়ই অভাবের, দারিদ্র্যের প্রকাশ ও প্রমান। কিন্তু যে সমস্ত তথাকথিত স্বাধীন মেয়েরা পেট, বুক, উরু ও মাংস প্রদর্শন ও প্রকাশ করে বেড়ায়, এরা স্বভাবের দরিদ্র। অভাবীদের অভাব দূর করলে ওরা ভালো মানুষ হয়ে যায়।

কিন্তু এ স্বভাবী নারীরা মৃত্যু ও জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে তা' থেকে বিরত হয় না।
এখানে নরপশুদের চেয়ে নারীপাশবীদের কথা এজন্য একটু বেশী বলা হলো যে নরপশুগুলো তুলনামূলক ভাবে আত্মসচেতন। তাই তারা মেয়েদের মতো উলঙ্গ হতে চায়না, হয় না। কিন্তু ঈমানহীন নারী, শীত কী গ্রীষ্ম, সবকালেই উদাম। তাই আল্লাহ্ আল্ ক্বোরআনে অন্যান্য সকল পাপে পুরুষদের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ব্যভিচার ও নির্লজ্জ অশ্লীলতায় নারীদের অগ্রণী বলে উল্লেখ করেছেন। الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي অর্থাৎ ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ অর্থাৎ "যানিয়াতু" যেনাকারিনী الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ খাবিসাত্, খবীস্ নারী। وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ আল্ ক্বোরআনে তিন জায়গায়ই আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আদালতের ন্যয়বিচারের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই প্রত্যেক ঈমানদার নরনারীকে সিজদায় পড়ে যেতে হয়। কী আশ্চর্য মানদন্ড ও ন্যায় বিচার। পবিত্র চরিত্রের নর ও নারীকে তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। সূরা নূরের ২৬ নং আয়াতে প্রথমবার আল্লাহ্ পবিত্র নারীদের প্রথমে উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিতীয়বার পবিত্র চরিত্রের নরদের প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

অতএব সাবধান! প্রত্যেক ঈমানদার নরনারীকে এ পরীক্ষক সূরার নিরিখে প্রতিপদে সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে নারীদের। কারণ নারীরা নারীপানির অদৃশ্য টানে বাপ ভাইকে ছেড়ে অজানা অচেনা এক পুরুষের সঙ্গের জন্য পরের বাড়ী আসতে হয়। দেহ দিয়ে অন্যের সন্তান ধারণ, প্রসব ও লালন পালন করতে হয়। স্বভাবজাত লজ্জা শরম জলাঞ্জলী দিতে হয়। একমাত্র আল্লাহ্র বিধান পালনে এ পিত্রালয় ত্যাগ হলেই তা বৈধ ও স্বার্থক। ঈমানহীন লোকাচারের কারণে এ ঘরবদল হলে তা চরম নিরর্থক। একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করলে এখানে বিষয়টি স্পষ্ট হবে মনে করি। মনে করিনা অপ্রাসঙ্গিক হবে।

একবার কয়েকজন আধুনিক, তথাকথিত সংস্কার মুক্ত মহিলা আমার কাছে এসেছিলো। তারা নামে মুস্লিম। সামাজিক নামাজ রোজা করে। কিন্তু আল্লাহ্র শরী'আ মানেও না, মানার প্রয়োজনও বিশ্বাস করে না। তারা সমাজের একটি উচু মানের জনকল্যাণ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত। দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তারা কারো কাছে জানতে পেরেছে আমি নাকি একজন ইসলামী বিশেষজ্ঞ।

তাদের সমস্যা ছিলো দ্রুত অবক্ষয়মান একটি বিষয়। তা হলো যে তাদের দৃষ্টিতে তাদের সমাজে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের পিতা মাতা বেশী আদর ও আহ্লাদ করায় প্রায়ই ছেলেরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। পড়া লেখাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের মতো করে না। অনেক ক্ষেত্রে হিরোইন ও মাদকাসক্ত হয়ে পিতা মাতার জন্য এরা কাল হয়। বিয়ে শাদী করিয়ে দিলে হয় তারা বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। নয় বউ পালার অযোগ্য হয়ে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপর বোঝা হয়। অথচ সেকেলে ইস্লামী আইনে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন ভাগের উত্তরাধিকারী হয়।

এ পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে, মেয়েকেই স্বামীর সংসার ও বাবা মার দেখা শুনার দায়িত্ব নিতে হয়। তাই তাদের জানা ও জিজ্ঞাসার বিষয় ছিলো যে ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনে রদবদল করে এ পরিস্থিতির কোনো সমাধান বের করা যায় কি না?

আমি মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শুনে নিশ্চিত হলাম যে তাদের সমস্যাটি কোনো দ্বীন ও ঈমানের বিষয় নয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই হলো আর্থিক, সামাজিক ও বস্তুতান্ত্রিক। এ সমস্যার মূল সমাধান ইসলামের পূর্ণ পালন ও বাস্তবায়নে। প্রশ্ন উত্থাপক মহিলারা ও তাদের সংস্থাটি সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের মূল ধনিক ধারার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

ঈমানী দায়িত্বে আমি প্রথমে তাদের দ্বীনের দিকে ডেকে বলি যে, সমস্যাটির জন্ম ও তার সৃষ্ট জটিলতার কারণ হলো কার্যকর ভাবে ইসলাম ত্যাগ এবং নামকা ওয়াস্তে ধর্মীয় সংস্কার। মূলতঃ তারা মুসলিম নয় এবং তাদের ও তাদের পিতা-মাতা এবং বাপ-দাদার বিবাহ ও সংসার ধর্মও ইসলাম বহির্ভূত ছিলো। তাদের জন্ম ও তাদের সমস্যার জন্ম হলো ইসলাম ত্যাগ করায়।

তাই সমস্যার মাত্র দু'টি সমাধান রয়েছে। প্রথমটি হলো তওবা করে নতুন করে ঈমান এনে ইস্লামী আমূল বিপ্লব ঘটানো। তারা একটু ভেবে জানালো যে, প্রথমটা তাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই তারা দ্বিতীয়টি জানতে চাইলো। আমি তাদের জানালাম যে, দ্বিতীয় সমাধানটি খুব সহজ তাদের জন্য। তারা অলরেডী সমাধানের অর্ধেক পথ এগিয়ে আছে। শুধুমাত্র সাহস করে ঘোষণা দিয়ে আগ্বাড়লেই তাদের সমস্যা চিরতরে চুকে যাবে।

খুব আগ্রহ ও ঔৎসক্যের সাথে তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। আমি একটু থেমে নির্দ্বিধায় তাদের জানালাম যে, আল্লাহ্‌র পুর্ণাঙ্গ বিধান ইস্‌লামে পিতা-কন্যা, মা-ছেলে ও ভাই-বোনে বিবাহ হারাম বা নিষিদ্ধ। ইসলাম না মানলে তাতে কোনো বাধা নেই। তাই তাদের সমস্যাটি যেহেতু সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে এবং তারা কেউ ঈমানদার মুসলিম নয়, তাই সংস্কার মুক্ত হয়ে ভাই-বোন, পিতা-কন্যা ও মা-ছেলে বিয়ে করে নিলে আর কোনো সমস্যা থাকবেনা। সম্পদও ভাগ হবে না। সব সম্পদ নিজেদের ঘরে, নিজেদের মধ্যে থেকে যাবে।

আমার সাদা মাটা সাফ জবাব শুনে মাথা নিচু করে তারা এমন ভাবে উঠে চলে গেলো যে আর একটি কথাও কেউ বললো না। অথচ মহিলারা তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও খুব তার্কিক যুক্তিবাদীনী ছিলো।

আল্লাহর বিধান ও তার রাসূলের আদর্শ ত্যাগের জন্য আজ বিশ্বে মানুষ সকল প্রাণীর চেয়ে বিপন্ন। ওয়াল আস্‌র্‌, ইন্নাল ইন্‌সানা লাফি খুস্‌র্‌। তার মধ্যে নারী জাতি ধ্বংস গহব্বরের একবারে কিনারে দাঁড়িয়ে। দু এক পা'বাড়লেই ধপাস্‌। ঘর ভাঙ্গা, পর পুরুষের জন্য বাইরে প্রসাধনী করে বিচের মতো বিচরণ করা এবং এইচ্‌ আই ভি জীবানু বহন ও ছড়ানো আজ কাদের কাজ? W.H.O. বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবধান বানী "ঘাতক এইড্‌স্‌ ও নারী থেকে সাবধান"! কি বুঝায়?

রাসূল সঃ বলেন যে নারীই (পর পুরুষের দৃষ্টিআকর্ষক) প্রসাধন করে ঘরের বাইর হবে, আল্লাহর কসম সে ব্যভিচারিণী, সে ব্যভিচারিণী, সে ব্যভিচারিণী, أيما إمراة استعطرت و خرجت، فهي زانية فهي زانية
(তিরমিযী-আব্‌ওয়াবুল ইস্‌তিযান, আবু দাউদ কিতাবুত তারাজ্জুল) অতএব প্রত্যেক ঈমানদার নারীকে হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় মধ্যস্থ পাপাচার থেকে বেঁচে চলতেই হবে। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি স্বামীর সাথেও বেপর্দা বাইরে বের হলে ব্যভিচারিণী হবে।

মক্কা বিজয়কালে জাহিলিয়্যাত্‌ ত্যাগ করার অঙ্গীকার করেই রাসূল সঃ এর উপস্থিতিতে মেয়েদের মু'মিনাত হওয়ার বায়আত্‌ হতে হয়েছে। এখানো মু'মিন নারীরূপে পরিগণিত হতে ঐ শর্তসমূহ পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। ষষ্ঠ শর্তটি ভাষার দিক দিয়ে সংক্ষেপ হলেও অর্থের দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তা' হলো দ্বীনের কোনো ব্যাপারে মেয়েরা অভিভাবক ও স্বামীর অবাধ্য হতে পারে না। মেয়েরা যোগ্যতার যে স্তরেই পৌছাক, তাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের পুরুষ অভিভাবক বা স্বামী আল্লাহ্‌র বিধানেই একধাপ উর্ধ্বে। وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (সূরা বাক্বারা-২২৮) মেয়েরা এ শর্তাবলী পালন করে পরীক্ষিতা হওয়ার এ সূরার মোট ১৩ টি আয়াতের বিষয় বস্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে।

এ সূরাটির নামের মধ্যে লুকায়িত দুটি অর্থ নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক ঈমানদার মানুষ মাত্রকে বুঝতে ও তা পালন করতে হবে। নবী ইব্রাহীম আঃ থেকে আখেরী নবী মুহাম্মদ সঃ কে এ সূরা অনুযায়ী মুশরিক পিতা-মাতাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। তাদের অনুসারী প্রত্যেক ঈমানদার নরনারীকে মুশরিক পিতা মাতা ও রক্তীয়স্বজন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সূরার দুটি অর্থ মুম্‌তাহানা ও মুম্‌তাহিনায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মুমতাহিনা, পরীক্ষক, এবং মুমতাহানা, পরীক্ষিতা। উভয় অর্থেই সূরাটি মৌলিক।

বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়া ও বুঝার জন্য আল্লাহ্‌ ক্বোরআন নাযিল করেছেন। এ ক্বোরআনকে বুঝে ধারণ করা ও পালন করার জন্য অন্যান্য সকল মানব রচিত বই পুস্তকের বিদ্যা ত্যাগ করতে হয়। তবেই একটি লোক ইলমে লাদুন্নী ও ইল্‌হামী জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। তা' না করলে বর্তমান মুসলমান নামধারী অভিশপ্ত জাতির সদস্য রূপেই মরতে হবে, যাদের আল্লাহ্‌ "কিতাবের কিছু বিশ্বাসকারী, কিছু অবিশ্বাসকারী" বলে ইহকালে লাঞ্চনা ও পরকালে কঠোর শাস্তির অভিশপ্ত জাতি রূপে চিহ্নিত করেছেন।

আল্লাহ্‌ বলেছেন খাঁটি ঈমানহীন মানবজাতি বিপন্ন। তাঁর শেষ নবী বিদায়ের পূর্বে বলে গিয়েছেন,
ما تركت أكبر فتنة للرجال من النساء "আমি বিদায় কালে পুরুষ জাতির জন্য মেয়েদের চেয়ে বড়ো বিপদ আর কিছু রেখে যাচ্ছি না"।

মেয়েরা ভালো হলে যেমন কল্যাণের শেষ নেই, তদ্‌রূপ নষ্ট হলে দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। ফিরআউনের স্ত্রী যেমন কল্যাণের মাপকাঠী, নূহের স্ত্রী তেমন অকল্যাণের উদাহরণ। বিবি খাদীজা যেমন আখেরী রিসালাতের পালিকা সেবিকা, হিন্দা তেমনি রিসালাতের সৈনিক হাম্‌যার বুক চিড়ে কলিজা ভক্ষক পাতকী। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে হক ও

বাতিলের পার্থক্য চূড়ান্ত রূপ নেয়। নারী পুরুষ উভয়কে রাসূল সঃ এর হাতে বায়আতের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করতে হয়েছে। মু'মিনুন মু'মিনাত, কাফিরুন কাফিরাত, ক্বেয়ামত পর্যন্ত এ মানদন্ড চলবে।

মেয়েদের দ্বারা ঘর বাঁধা হয়। ঈমানদার হলে মেয়েরা গৃহলক্ষী। বেঈমান হলে বেড়াকাটা ইদুর হয়। তাই "রাব্বান্না আ'তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাহ্" উত্তম স্ত্রী "ওয়াফিল্ আখিরাতি হাসানাহ্" বেহেশ্ত। "ওয়াক্বিনা আযাবান্নার", পৃথিবীতে অবাধ্য স্ত্রী, পরকালে জাহান্নামে।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সঃ এর পবিত্র হাতে বায়আতকারিণী গৃহলক্ষীদের কাবিন নামা হচ্ছে (১) আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও শরীক করবেনা। (২) চুরি করবেনা। অর্থাৎ বাপের বাড়ির সম্পদ স্বামীর বাড়ি পাচার করবেনা এবং স্বামীর বাড়ির কিছু বাপের বাড়ি পাঠাবেনা। অভিভাবকের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে মেয়েরা কোনো কিছু এদিক ওদিক করবেনা। (৩) ব্যভিচার করবেনা। (৪) সন্তান, তাদের গর্ভজাত, হত্যা করবেনা। (৫) হস্ত ও পদ যুগলের মধ্যস্থিত অঙ্গ দিয়ে স্বামীর ঘরে অন্যের সন্তান ঢুকাবেনা। (৬) পুন্যময় কাজে অভিভাবকের অবাধ্য হওয়া চলবে না। এ ছ'দুয়ার অতিক্রম করার শপথ নিয়ে মুসলিম ও মুমিন নারীদের ঘর বাঁধতে হবে। তা' না হলে ওদের সংসার হিন্দা, আবু সুফ্ইয়ান, আবু লাহাবের স্ত্রী ও আবু সুফ্ইয়ানের বোন উম্মে জামিল "হাম্মালাতাল হাতাব" এর জাহান্নাম। এখন রাসূল সঃ নেই। ১৪০০ বছর পূর্বে তিনি বিদায় নিয়েছেন। এখন মুমিন মেয়েরা কার হাতে বায়আত্ হয়ে ঈমান ও ইসলামের ঘর বাঁধবে? ঈমানদার নারীদের পিতা তাদের বিবাহের পূর্বে তাদের অভিভাবক ও ইমাম। বিবাহের পর ঈমানদার স্বামী তাদের অভিভাবক ও ইমাম।

এ ঘর বাঁধা অনুষ্ঠানটি উত্তমরূপে সমাধা হয় ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক লোকালয়ের রাষ্ট্রীয় নায়েব, শাসক, ও ইমামের মাধ্যমে। বর-কনের পিতা বা অভিভাবক তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এ বৈবাহিক সম্প্রদান সম্পন্ন করবে। এ সমাজপতি বিচারকই পূর্বে কাজী রূপে চিহ্নিত ছিলো। তার উপস্থিতিতে ও নেতৃত্বে বিবাহ তালাক থেকে আরম্ভ করে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ও সালাতের ইমামতিই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলাম ও ঈমান ত্যাগের ফলে আজ সমাজের এক চরম লোভী, হালাল-হারাম নির্বিচারে বিবাহের ছদ্ম নামে পতিত পুরুষ ও পতিতা নারীকে সহঅবস্থান ও সহবাসের লাইসেন্স প্রদানকারী এক নীচ চরিত্রের "কাজী" মোল্লার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়। উকিল বাপ ও উকিল শ্বশুর নামে আবার এ অনুষ্ঠানে দু'শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এর মাধ্যমে বহু ব্যভিচার ও অঘটনের জানালা খোলা হয়েছে।

জাহিলী ও কুফরী প্রথার নারী পুরুষের হস্ত প্রদান "ইসামুল কাওয়াফির" কে নির্মূল করে আল্লাহকে সাক্ষী করে বিবাহ অনুষ্ঠান ইসলামী। এ অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশে মানুষ সাক্ষীকেও বাধ্যতামূলক করেছেন। সাক্ষীর ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে আল্লাহ্ পুরুষদের অর্ধেক কেনো করেছেন, এজন্য কিছু বেঈমান নয়, অর্ধ ঈমানদার মেয়েদেরও আল্লাহ্‌র উপর আপত্তি রয়েছে বলে শোনা যায়। মূলতঃ মানব জাতির উপকারার্থেই আল্লাহ্ মেয়েদের স্মরণ শক্তি একটু খাটো করে দিয়েছেন। এ বিষয়টি আমি গত চল্লিশ বছর যাবৎ ভেবেছি। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানী ফিল্ড মারশাল আইয়ুব চৌকিদার যখন মেয়েদের ভোট কেনার উদ্দেশ্যে মুসলিম পরিবারিক আইন পরিবর্তনে ক্বোরআনে হাত দেয়, তখন খাজা নাজিমুদ্দিন সহ অন্যান্য নেতারা ক্বোরআনের আইনের বিরোধিতার জন্য আইয়ুব খাঁর সমালোচনা করে। সে সময় একদিন একদল মহিলা নাজিমুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে চড়াও হয়। তার মধ্যে সুফিয়া কামালও ছিলো। আমি তখন উপস্থিত। মেয়েরা ঢুকেই সবাই একসাথে হৈ চৈ করে খাজা সাহেবের সাথে তর্ক আরম্ভ করে দেয়। লোকে জানে যে খাজা সাহেব সোজা সরল প্রকৃতির লোক ছিলো। সেদিন কিন্তু খাজা সাহেব ব্যতিক্রম চরিত্রের প্রমাণ রেখেছিলো। খাজারা সাধারণত বাড়িতে ঢাকাইয়া উর্দুতে কথা বলতো। বাংলা কম বলতো। খাজা নাজিমউদ্দিন যেহেতু কেমব্রীজে পড়া বার এট-লও ছিলো, তাই বাড়িতে ইংরাজীও বলতো। মেয়েদের চেঁচামেচিতে খাজা সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে দৃঢ় কন্ঠে আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী মহিলাদের বললো, "তোমরা টিপিক্যাল লেডীজ্ এ্যাটিচিউড্ নিয়ে কথা বললে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবোনা। একজন একজন করে কথা বললে তোমাদের কথার জবাব আমি দিবো।"

খাজা সাহেব এসব মেয়েদের মা, খালাদের অনেককে চিনতো। তাদের "বীচরূপী" বিচরণের অনেক ঘটনাও খাজা সাহেব জানতো। খাজা সাহেব গুরু গম্ভীর কণ্ঠে প্রগতিবাদী মহিলাদের জানালো যে আল্লাহ্‌র বিধান নারী পুরুষ সবার কল্যাণের সর্বোত্তম আইন। খাজা সাহেব তার জীবনে মন্ত্রী, উজির আলা, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল বা

প্রধান মন্ত্রী থাকা কালীন, কখনো কোনো মহিলার অধিকার ও মান ইজ্জত হরণ করেনি। সাক্ষী রূপে খাজা সাহেব তার একমাত্র স্ত্রী লেডী শাহবানুকে ডেকে উপস্থিত করলো। মেয়েরা তার ভদ্রোচিত ব্যবহারে সংযত না হয়ে চিল্লা-চিল্লি আরম্ভ করলে খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন ঐ সমস্ত মেয়েদের মা খালাদের কেলেঙ্কারীর হাটে হাড়ি ভাঙ্গা আরম্ভ করে। নামধরে খাজা সাহেব বলা আরম্ভ করে যে, আইয়ুব খাঁ ঢাকায় জি, ও, সি থাকাকালীন ঢাকা ক্লাবে তোমাদের অমুকের মা অমুক, অমুকের খালা, অমুকের বোন অমুক, আইয়ুব খাঁ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়নি? উজীরে আলা রূপে আমার কাছে বিচার আসেনি? লন্ডনে গিয়ে আইয়ুব খাঁ ক্রিষ্টান কিলারের উরু ধরে টানা টানি করেনি? আর বলো, আমি কি তোমাদের কারো মা খালার সম্ভ্রমে হাত দিয়েছি? খাজা নাজিমুদ্দিনের এ' মূর্তিদর্শনে প্রতিবাদী মহিলারা জোকের মুখে চুন পড়ার মতো চুপষে যায়, এবং হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় মধ্যস্থিত স্থানের কাপড় সামলাতে আরম্ভ করে। এ অবস্থা দৃষ্টে খাজা সাহেব তাদের প্রতি স্নেহ বৎসল শুভাকাঙ্খীর মতো শেষ কথা বললো যে আমার চেয়ে আইয়ুব খাঁর নিকট তোমাদের অধিকার কখনো নিরাপদ নয়, একথা মনে করে তোমরা যেতে পারো। খাজা সাহেব আরো বললো যে শিকারী যেরূপ শিকার করার পূর্বে চরে ধান ছিটায়, তারপর বালিহাঁস পড়লে যে নির্বিচারে গুলি করে শিকার করে, সেরূপ নারী শিকারীরা মিথ্যা অধিকারের কথা বলে নারীদের সর্বস্ব লুট করে। আইয়ুব খাঁ তোমাদের তাই করতে চায়। মহিলারা চুপ। খাজা সাহেব ও তার বেগম লেডী শাহবানু মহিলাদের চা ও কেক দিয়ে আপ্যায়ন করে বিদায় কালে আবার অত্যন্ত ভক্তির সাথে বললো যে "আল্লাহ্‌র চেয়ে যে তোমাদের বেশী শুভাকাঙ্খী, সে শয়তান। যেমন , ইবলিস মা হাওয়াকে শুভাকাঙ্খী সেজে বেহেশ্‌ত্‌ থেকে তাড়িয়ে পৃথিবীতে মস্‌লা পিষছে এবং পিষাচ্ছে" বলে একটু রসিকতা করে নারীবাদীদের বিদায় দিলো।

একেই বলে শুভাকাঙ্খা ও শুভাকাঙ্খী । তাই প্রত্যেক পিতা, ভাই, স্বামী ও অভিভাবককে আল্লাহ্‌র ঈমানদার বান্দারূপে নারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে নায়েবে রাসূল বা রাসূল সঃ এর ওয়ারাসাতের প্রমাণ রাখতে হবে। তা'হলে আমরা মক্কা বিজয় কালে আল্লাহ্‌র ও রাসূলের শিক্ষা, সূরা মুম্‌তাহিনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সফল নায়েবে রাসূল হবো। কাজীদের অভিশাপ থেকে সমাজ মুক্তি পাবে।

সাক্ষীর ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের অর্ধেক হওয়ার ব্যাপারটি আমার নিকট পূর্বে স্পষ্ট হলেও সম্প্রতি তা সুস্পষ্ট হয়েছে। পূর্বেও আমি এ ব্যাপারটি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবতাম। আমি আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী ও আমার বাবা-মাকে দেখেছি। তাদের প্রত্যেক জোড়াকে তুলনামূলক মানদন্ডে মেপেছি। নিঃসন্দেহে আমার দাদার স্ত্রী রূপে অর্ধাঙ্গীনী হলেও যোগ্যতার মাপে দাদী অর্ধেক ছিলো না। আমার নানীও নানার অর্ধেক গুণের অধিকারী ছিলো না। আমার জননী মাও আমার পিতার অর্ধেক মেধা সম্পন্ন ছিলোনা। তাদের সবাইকে তাদের স্বামীদের এক চতুর্থ নম্বর দিলেও পক্ষপাতিত্ব হয়।

আসলে ঈমানহীন বা ধর্ম নিরপেক্ষ দম্পতিরা মূল সত্য থেকে পতিত ও পতিতা বলে ওরা প্রায়ই পশু পাশবী। তাই তাদের মাঝে তফাত্‌ দেখা যায় না। বরং পশুদের মধ্যে যেহেতু "লেডিজ ফার্ষ্ট", মরদগুলো মাদীদের পেছনে চলে, যেমন কুকুরীর পেছনে কুকুর, শূকরীর পেছনে শূকর, মুরগীর পেছনে মোরগ ও গাভীর পেছনে ষাঁড়, তাই দেখলে মনে হয় মাদী গুলোই মরদা গুলোর চেয়ে বুদ্ধিমান। কিন্তু ঈমানী মূল্যরোধে দীপ্ত নরনারীর মধ্যে নরেরাই আগে চলে। "লেডস ফাষ্ট"। তাই সে ক্ষেত্রে পুরুষই বেশী বুদ্ধিদীপ্ত। কারণ, মানুষ পশুসম হলে তার খাদ্য থেকে সংগৃহীত শক্তি পেটের নিচে, নাভির নিচে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে লিঙ্গ তাদের মাথা ও মস্তিস্কের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ঈমানদার নরনারী যেহেতু ঈমানের তাগিদে হারাম-হালাল বেছে খায়, এবং হালাল উর্ধ্বলোকে গতি সৃষ্টি করে, তাই তাদের খাদ্যের শক্তি পেট থেকে বক্ষ ও মস্তিষ্কের দিকে উর্ধে ধাবিত হয়ে সাত আকাশের উর্ধ্বে আরশের মালিকের দিকে ধাবিত হয়। তাই সে ক্ষেত্রে পুরুষ নারী স্ত্রীর চালক ও চালিকা শক্তি হয়। এটাকেই আমি وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষরা নারীদের চেয়ে একধাপ উচুতে" এর অর্থ বলে মনে করি।

এমনিতেই মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ভুল প্রবণ হওয়া বোধগম্য। পুরুষদের ন্যায় মেয়েদের স্মৃতি প্রখর হলে মানব প্রজন্মের চক্র কোথাও না কোথাও বাধা প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিলো। গর্ভধারণ ও প্রসব বেদনা মেয়েদের জীবনে একটি অতীব কষ্টকর অধ্যায়। গর্ভধারণ থেকে সময় পূর্তি, প্রসব বেদনা, প্রসব ও দুগ্ধ প্রদান সীমা পার পর্যন্ত একটি প্রতি মুহুর্তের বোঝা মেয়েদের উপর। এটাকেই ক্বোরআনে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা "কুরহুন" এবং "ওয়াহ্‌নুন"

বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম শব্দের অর্থ দুঃসহ এবং দ্বিতীয় শব্দের অর্থ কষ্টকর বলা যেতে পারে। একবার এ কষ্ট সহার পর দ্বিতীয় বার সন্তান ধরতে যাওয়া অবশ্যই অতীত কষ্ট ভুলে যাওয়ারই নামান্তর। কিছু দিন পূর্বে বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের ইংলিশ ট্রান্সক্রিপশন মেয়েদের প্রসবকালীন কষ্ট, কান্না, প্রলাপ, বিলাপ ও অদ্ভুত চিৎকারের শব্দচিত্র প্রচার করেছে। ধারাবাহিক এ শব্দচিত্র প্রচার সপ্তাহ কালের বেশী চলেছে।

এ অপূর্ব প্রতিবেদন ও শব্দ চিত্রে রানী, রাজকুমারী থেকে প্রায় সর্বস্তরের বহুদেশীয় ও বহুভাষী মায়েদের শব্দ বিবরণ প্রচারিত হয়েছে। এতে আমি যে জিনিষটি আশ্চার্যন্বিত হয়ে লক্ষ্য করেছি, তা হলো, সে সময় একটি মেয়েও তাদের মানবীয় ভাষায় তাদের কষ্ট প্রকাশ করেনি। প্রত্যেকেই সে বিশেষ সময়টিতে বিভিন্ন জীবজন্তুর মতো বিকট ও অদ্ভুত শব্দ করেছে। আমি হালাল কামাই ও নবীদের সুন্নতের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিজ হাতে প্রায় বিশবছর যাবৎ গরু ছাগল পালন করছি। তাতে পশুর প্রসব কালীন ব্যথার প্রকাশ এবং জবাই কালে ও পরের শব্দ মনোযোগ সহকারে প্রত্যক্ষ করেছি। বিবিসির প্রচারিত শব্দচিত্রের পশুদের বিকট করুণ শব্দের সাথে হুবহু মিল! আমি তা শুনতাম আর তখন বলতাম, "সুবহানাল্লাহিল্ খাল্লাক্বিল আযীম" আল্লাহ্ তোমার সৃষ্টির লীলা এতো অদ্ভুত ও অভিন্ন? মানুষ পশুর মিলন, সন্তান ধারণ ও প্রসব একই পাশব ক্রিয়া বলে তাদের প্রসবকালীন ব্যথার প্রকাশও একই রূপ করলে? আশ্রাফুল মাখলুকাত, জীবশ্রেষ্ঠ মানুষেরটাও পৃথক করলে না! পরে ভেবে দেখলাম যে ব্যাপারটি একই প্রকার হওয়াইতো ঠিক! যৌনবোধ, ক্রিয়া, গর্ভধারণ ও প্রসব তো সকল পশু প্রাণীরই এক। জীবন যাপন ও লালন-পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেই মানুষ পশুতে পার্থক্য। ধর্ম ও লক্ষ্যহীন মানুষতো আল্লাহ্র বর্ণনা ও দৃষ্টিতে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট, ইতর প্রাণীর চেয়েও ইতরতরো! তাই আল্লাহ্ ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সকলকে একই অবস্থায় রেখেছেন! ভূমিষ্ট হবার পর মানুষ তার সন্তানকে মানুষ রূপে এবং শৃগাল, কুকুর, বানর ও ছাগল নিজ নিজ বৈশিষ্টে গড়ে তোলে। মানুষের মধ্যে যারা যথার্থ মানুষ, তারা ধর্মীয় আচার আচরণে তাদের সন্তানদের মানুষ করে। আর যারা মানুষরূপী দোপায়া পশু, তারা মানুষ-পশুরূপেই তাদের গড়ে। প্রসব বেদনা ও সন্তান ধারণের দায়িত্ব থেকে পালাতেই হয়তো পশ্চিমা সমাজের মুয়াবিয়া, বিচ, বা কুকুরীরা তাদের কুকুরদের সহায়তায় গর্ভনিরোধক বড়ি ও কন্ডম তৈরী করে এ সূরা মুমতাহানায় বর্ণিত সন্তান হত্যার পথ আবিষ্কার করেছে। তাই ওদের সমাজে কাম্য সন্তানের সংখ্যা কমে অনাকাঙ্খিত জারজ সন্তানে ভরে গিয়েছে। কুকুর কুকুরীর অবাধ মিলনে ঘটনাক্রমে গর্ভবতী হয়েই ওরা সন্তান জন্ম দেয়। তাই সরকারী অনুদান ও উৎসাহ ভাতার ব্যবস্থা ঘোষণা সত্তেও ওদের জন্মের হার বিপদ জনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে ও পাচ্ছে। প্রবাসী এশিয়ান ইমিগ্রেন্টদের সংখ্যা ওদের সমাজে বেড়ে চলেছে।

আমাদের দেশে আমার জীবনে আমি একটিমাত্র মেয়েকে দেখেছি যে প্রসব বেদনার ভয়ে দ্বিতীয় সন্তান ধারণ করেনি। মেয়েটির নাম আয়শা বেগম বা বানু। পাকিস্তান আমলের ডিয়েনফা মটর্সের মালিক খাজা সদরুদ্দীনের মেয়ে। খাজা শাহাবুদ্দীনের ছেলে খাজা সাঈদের স্ত্রী। মেয়েটি সাজ-গোজে ও দেখতে সোফিয়া লোরেনের মতো ছিলো। যতোটুকু মনে পড়ে হয়তো খাজা নাজিমুদ্দীনই আয়েশাকে বলেছিলো,"তোমার আর বাচ্চা হয় না কেনো?" এর উত্তরে আয়েশা নিজ কোমর, পেট ও বুকে হাত দিয়ে প্রসব বেদনার এমন অভিনয় করলো যে উপস্থিত সবাই হেসে খান খান। তারপর মুখে বললো, "বাবা এক মর্তবা গাবকা বিচি খায়া, দুস্রি মর্তবা জিন্দেগীমে নেহি"। প্রায় বিশ বছর পূর্বে এ আয়শাকে দুবাইতে বাজারে দেখেছি। বুড়ী হলেও ঠিক একই চলন। অথচ তার মায়ের, মনে পড়ে ষোল কি আঠারোটি সন্তান হয়েছে। রাসূল সঃ বলেছেন ঃ الدنيا متاع و خير متاعها المرأة الصالحة

পৃথিবী একটি সম্পদের ভান্ডার। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার নারী। ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও বিবি মারইয়ামরা যেমন তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, নূহ ও লূত আঃ দের স্ত্রীরা তার নিকৃষ্ট রূপ। হিন্দা ও বর্তমান নারীবাদী মেয়েরা তার দৃষ্টান্ত।

তাই সর্বযুগে মু'মিন নারীদের আখেরী নবী সঃ এর মক্কা বিজয় কালে দেয়া বায়আতের ছয় শর্ত বা ছয় অসূলে ইসলামে প্রবেশ করে মেয়েদের সার্থক স্ত্রী ও মা হতে হবে। সন্তান হলে তার জন্য মুহাম্মাদ ও আহমাদ শব্দের মতো প্রশংসা বাচক সুন্দর নাম রেখে তাদের ইব্রাহীম ও মুহাম্মদী আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তবেই তারা যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাদের মতো নবী আদর্শের ধারক ও বাহক হবে। তা না হলে হিন্দা হয়ে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদদের বংশ বিস্তার করবে। ইসলাম হবে রাজতন্ত্র ও ইবলিসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাহন। বাধা দিলে ঘটানো হবে কারবালা। তাই এবার চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে সব কিছু বুঝে।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী সাম্প্রাদায়িকতার পাকিস্তান ভেঙ্গে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের জাহিলিয়্যাত নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে আমি সকল জাতীয়তাবাদ নির্মূলের কেন্দ্র কা'বার মুল্লুকে হিজরত করে চলে যাই। সেখানে গিয়ে ইব্রাহীম আঃ মুহাম্মদ সঃ দের পদচিহ্ন খুঁজে বেড়ানো আমার একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। মক্কা মাদীনায় দেখতে পাই "মুলকুন আ'দুদ্" বা কুকুরে কামড়ানো রাজতন্ত্রের জাহিলিয়্যাত। তাই খুঁজতে থাকি আসল কুকুরের সন্ধান। ক্বোরআনে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন বিকৃত ও ত্যাগকারীদের কুকুরের মানব প্রজন্ম বলে অভিহিত করেছেন। (সূরা আরাফ-১৭৬) ক্বোরআনে একটি প্রভুভক্ত কুকুরের উল্লেখ রয়েছে। সেটি হলো আস্‌হাবে কাহ্‌ফ্ বা গুহাবাসীদের কুকুর। আমি আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞ মানুষ-কুকুরদের কথা বলছি।

মক্কা মদীনায় দীর্ঘ ন' বছর কাটিয়ে মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের নমুনা দেখলেও কোথাও খুঁজে মুয়াবিয়া নামে কোনো লোকের খোজ পাইনি। তাই রাসূল সঃ এর রিসালাত বিদায় দিয়ে ক্বোরেশী ও উমাইয়া সিজারবাদ প্রতিষ্ঠার পর দাঁড় করানো মিথ্যা হাদীসের মূল গ্রন্থাদি ঘাটা আরম্ভ করি। আরবী ভাষার শব্দের ভাব প্রসারক অভিধান লিসানুল আরব ও তাজুল উরুস খুলে দেখি যে লিসানুল আরবে এওয়া, আওয়ী ও মুয়াবিয়া শব্দের অর্থ কুকুরের ডাক ও কুকুরী লিখেই প্রসঙ্গ ধামা চাপা দিয়েছে। অথচ অন্যান্য বহু শব্দের বিশ্লেষণ করেছে পাতার পর পাতায়। তাজুল উরুসে দেখতে পেলাম শব্দার্থসহ মুয়াবিয়ার পরিচয়ও। তবে তাতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে যে মুয়াবিয়া সিংহাসন দখলের পর আলীর ভাই জাফর ইবন্ আবি তালেবের ছেলে আব্দুল্লাহকে তখনকার দিনে দশ লক্ষ দিরহাম দান করে মুয়াবিয়ার নামে তার এক পুত্রের নামকরণে রাজী করায়। দশ লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে মুয়াবিয়া তার নামের দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড় করায়। তারপর আব্দুল্লাহকে আবু মুয়াবিয়া বলে প্রচার করা হয়। তারপর মাইসুনকে ধর্ষণের পর ইয়াযিদের জন্ম হলে পরে ইয়াযিদের পুত্রের নাম রাখা হয় দ্বিতীয় মুয়াবিয়া। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে এ গোবরের পদ্ম ফুল দ্বিতীয় মুয়াবিয়া তার বাপদাদা পূর্ব পুরুষের কুষ্টি উদ্ধার করে। তারপর মারওয়ান কর্তৃক মুয়াবিয়াদের ষোল কলায় পূর্ণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পয়সা ও উৎকোচ দিয়ে বহু মুয়াবিয়া ও মারওয়ান তৈরী করে তাদেরকে সাহাবী ও মুহাদ্দিস পর্যন্ত বানানো হয়। যা আল্লাহ্‌র বর্ণিত "আশাদ্দুকুফ্‌রাও ওয়া নিফাক্বার" আরবদের জন্য জলবৎ তরল। এদের "ইসাবাহ" ও "উস্‌দুল্‌গাবাহ্" কিতাবে কোথাও ২৪ কোথাও ১৭ জনের সংখ্যায় উঠানো হয়েছে। ঈমান ত্যাগ করে বিপথগামী হলে কী-না সম্ভব? শয়তান এদের জন্য সবই সম্ভব করে দেয়।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ কোটি মুসলমান রয়েছে। তাদের মধ্যে ক'জন মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াযীদ্ খুঁজে পাওয়া যাবে? ক'জন পাওয়া যাবে, যার নামের সাথে মুহাম্মদ নেই?

আমাদের ষোল কোটি জনসংখ্যার দেশে টেকনাফ্ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত জরীপ করে দেখা যাক না ক'জন সুন্নীর নাম বা তাদের সন্তানদের মাঝে ক'জন অহী লেখক (?) মুয়াবিয়া নামের রয়েছে? একজনও পাওয়া যাবে? আমার সাথে আলাপ করতে এসে ক্বোরআন ও সহীহ্ বা সঠিক কথিত হাদীসের ভিত্তিতে যখন ওরা পেরে উঠেনা, তখন দু'একজন অযথা তর্ক করতে চায়, তখন আমি বলি যে, যাও, তোমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে কারো নাম মুয়াবিয়া, মারওয়ান, হিন্দা ও ইয়াযীদ রেখে আসো। তারপর তোমার সাথে পরবর্তী আলাপ করবো। তখন আর মুখ দিয়ে কথা সরে না। তাতেই প্রমাণ হয় যে, শয়তান মানুষেরাও ভালো নামে শয়তানী করতে চায়। নিজ পরিচয় ও নিজ চারিত্রিক নামে তা করতে নারাজ। কারণ, তাতে যে শুরুতেই ধরা খেয়ে যায়! সত্যের শুরুও সত্য, মধ্যও সত্য এবং শেষও সত্য। মিথ্যার শুরু ঝলমলে, মধ্য নোংরা, এবং শেষ এমন লানত্ যে, কেউ তার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চায় না। তাই মিথ্যা ও বাতিলের বেসাতীরা সাবধান! তোমরা চেয়ে দেখো আল্লাহ্‌র কালামে কী দৃঢ়তা? সূরা মুমতাহিনা শুরু করেছেন এ বলে যে, "হে ঈমানদাররা, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুর সাথে সখ্যতা করবেনা"। মাঝে একে একে মুমিন নরনারীকে সকল করণীয় ও বর্জনীয় বুঝিয়েছেন। তারপর শেষে পুনঃ বস্তুসংক্ষেপ করে বলে দিচ্ছেন, "হে মুমিন সম্প্রদায়, তোমরা কখনো আল্লাহ্ যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাদের সাথে মৈত্রীত্ব করবে না। কারণ তারা অবিশ্বাসী কাফির। কাফিররা যেমন মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ, ওরাও পরকাল ও পরিণাম সম্পর্কে নিরাশ।"

রাসূল সঃ পরিখার যুদ্ধ বা আহ্‌যাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া ঝড় তুফানে ক্বোরেশ ও তাদের সম্মিলিত বাহিনীর পলায়নের পর বলেছিলেন যে ক্বোরেশরা আর কখনো সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিমদের মুখামুখি হবে না। তাদের পরাজয় সন্নিকট। তাই হলো। মক্কাভিযানে মক্কাবাসী সামান্য প্রতিরোধও করতে সক্ষম হয়নি। তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। আব্বাস শেষ সময়ও আল্লাহ্ ও মুমিনদের চিরশত্রুকে নিধনে আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ কে সাহায্য করতে ব্যর্থ হলো। বরং তার

মজ্জাগত জাহিলিয়্যাতের হাতে পরাজিত হয়ে আবু সুফ্য়ানকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলো। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সঃ এর প্রাথমিক পরাজয় দেখে আবু সুফয়ান আব্বাসকে ডেকে পুনঃ মক্কায় গিয়ে কুফুরী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ মদদ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করলে তাদের আশা মাটি হয়ে যায়। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যে, আব্বাসের হাঁক ডাকে নাকি পলায়নপর সৈন্যরা ফেরত এসে যুদ্ধ করে বিজয় সূচিত করে। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ অহী নাযিল করে ওদের মিথ্যা ফাঁস করে দেন যে হুনাইনে সবাই পালিয়ে ছিলো। রাসূল সঃ সহ গুটিকয়েক বিশেষ ঈমানদার দৃঢ় হয়ে সামনে এগিয়ে ছিলেন। তারা উসামাহ, আইমান, ও বারাকাহ। তখন আল্লাহ্ ফেরেশতা সৈনিক পাঠিয়ে রাসূলকে বিজয় দান করেন। (সূরা তওবা-২৫)

গাঁজাখোর মিথ্যুকরা বর্ণনা করেছে, আব্বাসের গলার আওয়াজে নাকি গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যেতো। তার আওয়াজের এ্যাটম বোমের শব্দে নাকি পলায়নপর যোদ্ধারা ফেরৎ এসে যুদ্ধের মোড় পাল্টে দেয়। সাফা মারওয়ায় উঠে নাকি হাঁক ছাড়লে আব্বাসের গর্জনে বহু এসে যুদ্ধের মোড় পাল্টে দেয়। সাফা মারওয়ায় উঠে নাকি হাঁক ছাড়লে আব্বাসের গর্জনে বহু নারীর গর্ভপাত হতো। সব যুগেই গাঁজার নেশা একই? বরং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে তখন আব্বাসের সে রকম কোনো তেলেস্মাত থাকলে অবশ্যই সে আবু সুফ্য়ানের পক্ষে তা' ব্যবহার করে মুসলিম নারীদের গর্ভপাত ঘটিয়ে রাসূল সঃ এর অনুসারীদের বংশ নিপাত করতো, যেমনটি পরবর্তীতে এ যুগল ও তাদের সন্তানেরা ঘটিয়েছে।

আল্লাহ্র ডবল সতর্কবাণী ''আল্লাহ্ ও তোমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না"। মুম্তাহিনার শুরু ও শেষ হুকুম। আব্বাস যেমন তা পালন করেনি, উসমান ইবন্ আফ্ফানও তেমন মানেনি। আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল সঃ মক্কার দু'পাপিষ্ঠ সম্পর্কে মক্কাভিযানের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, ''ওয়ালীদ ইব্ন্ উকবা ও আব্দুল্লাহ ইব্ন্ আবি সারাহ্কে কা'বার গিলাফে ঝুলন্ত অবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থী অবস্থায় পেলেও তাদের হত্যা করবে"। এরা দুজনই ওসমানের সতালো ভাই। ওয়ালীদ মাদীনায় গিয়ে রাসূল সঃ এর সাথে মিথ্যা বলে প্রায় দু' গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলো। পরে পালিয়ে মক্কা এসে মিথ্যা প্রচার করে। এর বিরুদ্ধে হুজুরাতের ৬নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন্ সারাহও মাদীনায় গিয়ে রাসূল সঃ এর দরবারে যোগ দেয়। পরে মুর্তাদ হয়ে পালিয়ে এসে রাসূল সঃ এর নামে মক্কা এসে কুৎসা রচনা করে ও রটায়। ক্বোরআন সম্পর্কে মিথ্যাপ্রচার করে।

মক্কা বিজয়ের পর ওসমান এ দু'নরপিশাচকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখে। পরে অবস্থা ঠান্ডা হলে রাসূল সঃ এর সামনে এনে এদের জন্য ক্ষমার সুপারিশ করে। দু'দু'বার রাসূল সঃ ওসমানের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নেন। রাসূল সঃ লজ্জাশরম ও ভদ্রতার মুর্ত প্রতীক। নিলর্জ্জভাবে ওসমান তৃতীয় বার এদের এনে সুপারিশ করে। রাসূল সঃ চেহারা মুবারক অন্য দিকে ফিরিয়ে বলেন "যাও"। ওসমান ওদের নিয়ে গেলে রাসূল সঃ দুঃখ করে সাহাবী নামের তাঁর পার্শ্বের লোকদের বলেন, "তোমরা কেউ এ'দুটো পাপিষ্ঠের গর্দান উড়াতে পারলে না? আমি ক'বার প্রত্যাখ্যান করি"? নির্বোধরা বলে, আপনি যদি একটু চোখে ইশারা করতেন? রাসূল সঃ বলেন, আল্লাহ্র রাসূলরা চোখের বক্র ইশারায় কাজ করে না। তাদের জন্য কী রাসূল সঃ এর পূর্ব ঘোষণা ও দু' বার প্রত্যাখ্যান করা যথেষ্ট ছিলোনা?

মুমতাহানার বারো নং আয়াতে আল্লাহ ছয় শর্ত পূরণ করলেই ঈমানদার নারীদের দ্বীনে প্রবেশের বায়আত নিতে বলেছেন। এর পরই নারীরা অতীতের পাপ মুক্ত হয়ে রাসূলের দোয়া ও আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের যোগ্য হবে। অন্যথা নয়। মুমতাহানার তেরো নং, অর্থাৎ শেষ আয়াত মু'মিনদের জন্য সর্বকালে একটি চরম নির্দেশ। তা'হলো, ঈমানদার জাতি কখনো আল্লাহর অভিশপ্ত জাতির সাথে মৈত্রিত্ব গড়তে পারবে না। আল্লাহ ও রাসূলের অভিশপ্তরা মূলতঃ কাফিরদেরই শামিল। এরা সমভাবে পরকালের কল্যাণে নিরাশ ও অবিশ্বাসী। রাসূল সঃ মক্কা অভিযানে যাদের অভিশপ্ত করেছেন, তাদের পক্ষ যারা অবলম্বন করেছে, তারা মুমতাহানার শেষ আয়াত অমান্যকারী, পরীক্ষায় ব্যর্থ। এরা আব্বাস বা ওসমান যে-ই হোক। এখনো যারা এ কাজটি করবে, তারা নির্বিশেষে ইসলামী বিপ্লবের কাফেলার অযোগ্য। এদের সঙ্গে নেয়া চলবেনা।

মুম্তাহিনার পরীক্ষায় এরা পাশ করেনি। আরবদের এ ঘোড়ারোগকেই আল্লাহ্ সূরা তওবায় وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ "আল্লাহ্র নাযিল করা আদেশের সীমাজ্ঞানহীন" বলে অভিহিত করেছেন। (তওবা- ৯৭) ওসমান

সিংহাসনে বসে তার এ দু'ভাইকে ইরাক ও মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করে। এদের অত্যাচার-উৎপীড়নে মিশর ও ইরাকবাসী মুস্লিমরা মাদীনা এসে ওসমানের কাছে ন্যায় বিচার না পেয়ে ওসমানকে হত্যা করে। পরে ওসমানের বিশেষ অধ্যায়ে এ নিয়ে আরো আলোকপাত করা হবে। ইন্শা আল্লাহ্।

মূল কথা হলো, আল্লাহ্ ও রাসূলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মু'মিন উপাধি লাভ করে তা' ধারণ ও লালন করা ইসলাম। গোত্রবাদ,স্বজনপ্রীতি, ও জাতীয়তা পূজা ইসলামে হারাম। এটাই শির্ক। সব পাপের ক্ষমা আছে। শির্কের নেই।

এবার আমরা রাসূল সঃ এর পারিবারিক জীবনাদর্শে প্রবেশ করবো। নবী রাসূলগণ, তাঁরা সর্বযুগে, সর্বস্থানে মানবজাতির জন্য আদর্শ। তাঁদের স্ত্রী-পরিজন নবী রাসূল নয়। তাদের ভালোরা যেমন সৌভাগ্যবান, উত্তম, তাদের মন্দরা হতভাগা, নিকৃষ্ট। তাই আল্লাহ্ ক্বোরআনুম মজীদে নবী রাসূলদের পরিবারের সদস্যদের ভালোমন্দ অবস্থা ও তাদের পরিণাম বিশদ ,ভাবে বর্ণনা করেছেন।

খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, আহমাদ ও মুহাম্মাদ মুস্তাফা সঃ এর জীবন ও তাঁর স্ত্রী পরিজনদের সফলতা ও ব্যর্থতা মানব জাতির জন্য চূড়ান্ত মাপকাঠি। রাসূল সঃ খুলুকুন্ আযীম, মহত্তম চরিত্র, তাঁর মাঝে আল্লাহ্ দিয়ে দিয়েছেন আমাদের জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। তাঁর স্ত্রীদের সফলতায় তারা দ্বিগুন ফল লাভ করবে। ব্যর্থতায় দ্বিগুন শাস্তি ও তিরষ্কার পাবে। (সূরা আহযাব- ৩০)

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমরা লাউহে মাহফুজে রক্ষিত ক্বোরআনের একটি সূরা তাহরীম দিয়ে বুঝবো, বুঝাবো, এবং প্রত্যেক ঈমানদার নরনারী তার শিক্ষাকে আমাদের সব কিছু উৎসর্গ করে পালন ও ধারণ করার শপথ নিবো। শুধু আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য তা' মোটেও করবোনা। আল্লাহ্ আমাদের ক্বোরআন ও তাঁর রাসূলের আদর্শে বিশ্বে চূড়ান্ত বিপ্লবের সূচনা করার তৌফিক ও সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

সূরা তাহ্রীম

এ সূরাটির দু'টি নাম (১) তাহ্রীম (২) সূরাতুন্নবী (আইসারুত্ তাফাসীর)

এ সূরার বিষয়বস্তু অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি এর সারসংক্ষেপে কলম ধরার পূর্বে বিশেষ করে শয়তান থেকে পানাহ্ চেয়ে আউযুবিল্লাহ পড়ে তারপর বিসমিল্লাহ পড়ে নিয়েছি। মেয়েরা ভালো হলে ঘর, ধরায় বেহেশ্ত । মন্দ হলে ঘর জাহান্নাম। রাসূল সঃ তাদের "হেবালাতুশ্ শায়াতীন" বা শয়তানের রশি বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি নারীজাতিকে পুরুষ জাতের জন্য সবচেয়ে বড়ো ফিত্নাও বলেছেন। নারীরা শয়তানের সহজ বাহন ও মাধ্যম। বিজ্ঞাপন, প্রচার মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, চলচিত্র, হোটেল পর্যটন কেন্দ্র, রাস্তাঘাট ও হাটবাজারে কী দৃশ্যমান? স্বামীর জন্য গৃহে সাজার চেয়ে গৃহের বাহিরে স্বামীর অর্থে বাইরের পুরুষের জন্য সাজ গোজ করে কাপড় পরেও উলঙ্গ হয়ে দেহ প্রদর্শনীতে তারা বেশী যত্নবান। তাই রাসূল সঃ তাদের "কাসিয়াতুন্ আ'রিয়াত" পোশাক পরা উলঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ও আল ক্বোরআনে ব্যভিচার ও অশালীনতায় এবং খাবাসাতের পাপে নারীদের পুরুষের অগ্রণী বলে উল্লেখ করেছেন।

এ ব্যাপারটি অতীতেও সত্য হলে বর্তমানে ঘর ভাঙ্গায় নারী-স্বেচ্ছাচার যে সর্বকালের মহামারির রূপ ধারণ করেছে তা ভালো করে বুঝতে ও বোঝাতে হবে। তা না হলে মানব সভ্যতার এ সংকটের সমাধান চিহ্নিত করা যাবে না।

নবী রাসূলগণ যেমন শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁদের অনুগত স্ত্রীপরিজন তেমনি উৎকৃষ্ট সত্যের অনুসারী। তাঁদের অবাধ্য স্ত্রীপরিজন মানব প্রজাতির কুলাঙ্গার। প্রথম শ্রেণী যেমন সর্বকালে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, দ্বিতীয় শ্রেনী তেমনি সর্বকাল ও সর্বজন ঘৃণিত।

মুহাম্মদ সঃ নবী সম্প্রদায়ের পূর্ণতা ও সমাপ্তির মোহর। তাঁর বাধ্য, অনুগত স্ত্রীরা সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-আদর্শের সীলমোহর। তারা, তাদের তদরূপ সন্তানরা এবং তাদের আদর্শের অনুসারীরা সর্ব যুগে রিসালাতের ঘরের আদর্শ, "আহ্লে বাইত"। যেমন হযরত ইব্রাহীমের আহলে বাইত্, তাঁর অনুসারীরা, শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ এবং ক্বেয়ামত

পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীরা। তার জন্য তাঁদের বংশের ও রক্তের হতে হয় না, হবে না।

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

নিঃসন্দেহে ইব্রাহীমের স্বজন হওয়ার যোগ্য তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করে, এবং এ'নবী এবং যারা মু'মিন। আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক। (আল ইমরান-৬৮) আর যারা ইব্রাহীম আঃ ও আখেরী নবী সঃ এর অবাধ্য ছিলো, বা হবে, তারা তাঁদের ঔরসজাত, তাঁদের স্ত্রী ও তাঁদের রক্তের নিকটতম হলেও তারা রাসূল সঃ ও রিসালাতের ঘরের যোগ্য, "আহলে বাইত" নয়। قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

"আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়"। (বাক্বারা-১২৪) রাসূল সঃ এর ঘরকে যারা ঈমান, তাক্বওয়া, আনুগত্য ও গৃহশান্তি প্রতিষ্ঠায় আদর্শ ঘর রূপে গড়েছে, তারা মুসলিম জাতির ঘরকেই গড়েছে। তারাই নিঃসন্দেহে উম্মাহাতুল মু'মিনীন, মু'মিন জাতির আদর্শ মা। তাদের দেখেই পরবর্তী মু'মিনদের শান্তি ও সৌহার্দের ঘর গড়ে উঠবে। আর যারা রাসূল সঃ এর ঘরে অবাধ্যতা, অশান্তি ও গৃহ বিবাদের ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা রাসূল সঃ এর ঘরের সাথে মুসলিম উম্মার ঘরভাঙ্গা ও গৃহ বিবাদের হোতা। তারা রাসূল সঃ এর ঘরের হয়েও তাঁর আহ্‌লে বাইত নয়। এ শ্রেণীর স্ত্রীদের পক্ষাবলম্বন রাসূল সঃ এর জন্যও আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিষিদ্ধ। এ সূরায় আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়তম রাসূল সঃ কেও জরিমানা বা কাফ্‌ফারা আদায়ের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কীভাবে স্ত্রীদের কতটুকু ছাড় দেয়া যাবে, কতটুকু যাবে না। তাই এ সূরাটিকে আদ্যপান্ত সকল ঈমানের দাবীদার নরনারীকে পড়তে, বুঝতে, মানতে ও মানাতে হবে। অন্যথা, তাদের ঘর ঈমানের ঘর বা সংসার হবে না।

বোখারী, মুসলিম, তাবারী, ফাতহুল ক্বাদীর ও ইব্‌ন কাসীরসহ সকল রাওয়ায়াতকারী একমত যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছে রাসূল সঃ এর ঘরে মা আয়শা ও হাফ্‌সার আল্লাহ্‌ ও রাসূল সঃ বিরোধী নারী সংকীর্ণতা, সতীনের হিংসা এবং রাসূল সঃ এর মতো স্বামীর বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিরুদ্ধে। এর ফলে রাসূল সঃ এক মাসাধিক ঘরছাড়া হয়েছিলেন। ঘরের বাইরে আশ্রয় দাঁড় করে বিশ্ব রহমতের রাসূল সঃ রাবাহ্‌ নামে এক খাদেমকে নিয়ে অযত্নে মাটিতে পাথর কুচির উপর ঘুমাতেন ও দিন কাটাতেন। তাতে তাঁর পিঠ ও দেহ মোবারকের বিভিন্ন স্থানে দাগ বসে যায়। মাদীনায় রাসূল সঃ এর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ ঘটনা ঘটে। অবাধ্য, অবিবেচক ও দয়ামায়াহীন স্ত্রীদের এ অশোভন আচরণে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠে। আল্লাহ্‌ ও রাসূল যাদের প্রিয়, তাদের জন্য এর চেয়ে শোক, দুঃখ এবং হৃদয় বিদারণের ঘটনা আর কী হতে পারে? যাদের কাছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সঃ এর অবাধ্য স্ত্রীরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের থেকে অধিক প্রিয়, তারা কারা? তাদের সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এরা হয় পিতৃহীন, নয় পিতা থাকলেও পিতৃপরিচয় গৌণ। মাতৃপরিচয়ই এদের সব। এদের মা, বোন ও কন্যারা ক্বোরআন অমান্যকারী ক্বোরআনী শিক্ষা ও আদর্শ থেকে পতিতা। পুরুষগুলো পতিত।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا....... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

পুরুষরা নারীর রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, আল্লাহ পরস্পরকে যে বৈশিষ্টে সৃষ্টি করেছেন, এবং যে ব্যয়ভার বহন করে, তার বিচারে। .... পুরুষদের এ ক্ষেত্রে একধাপ উপরে অবস্থান দেয়া হয়েছে। (নিসা-৩৪, বাক্বারা-২২৮)

এখানে যে পুরুষদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ক্বোরআনের মানদন্ডের পুরুষ। প্রচলিত বাজারী পুরুষ নয়। এক কথায় এদের জীবন পতিত ও পতিতার সংসার। ইসলাম, আল্লাহ্‌র বিধানে এর কোনো স্থান নেই। ইসলামে প্রতিটি নর আল্লাহ্‌র দাস। প্রতিটি নারী আল্লাহ্‌র দাসী। দাস দাসী মনিবের আইনে মনিবের রাজ্যে বাস করবে। তবেই তারা উন্নীত ও উন্নীতা। মনিবের অবাধ্য হলেই তাদের পতন ঘটে। তখন, তওবা করে পুনঃ নিঃশর্ত আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তারা পতিত, পতিতা। তাদের ঘর সংসার পতিত ও পতিতালয়। অন্য কোনো সংজ্ঞা এদের নেই। হতে পারে না। মানবীয় বিবেচনায় স্বয়ং রাসূল সঃ স্ত্রীদের একটু ছাড় দেয়ায় আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল ও তাঁর স্ত্রীদের কোথায় নামিয়ে ধোলাই করেছেন, তা' দেখার পরও কি কোনো মানুষ অন্য কিছু ভাবতে পারে?

আল্লাহ্‌, তাঁর শেষ নবী, নবীর স্ত্রী ও মু'মিনদের দাম্পত্য জীবন সূরা তাহ্‌রীমের মানদন্ডে শেষ বারের মতো তাঁর দাঁড়ি-পাল্লায় মেপেছেন। তারপর কোনো নবী আসবে না। তাই মাপামাপিটাও শেষ বারের জন্য। পাঠকবৃন্দ, এসো, আমরাও আমাদের এ মানদন্ডে মেপে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করি। তা না হলে রক্ষা নেই।

বর্ণনাকারী, বোখারী, মুস্‌লিম, আহমদ, ইব্‌ন জরীর, ইব্‌ন্‌ কাসীর ও ফতহুল ক্বাদির প্রভৃতির মতে ন্যূনপক্ষে

তিনটি অঘটনের প্রতিকারে সূরা তাহরীম বা সূরাতুন্নবী নাযিল হয়েছে।

১. রাসূল সঃ কখনো মা যায়নাবের ঘরে গিয়ে মধু পান করে একটু সময় কাটাতেন, তাতে মা হাফসা ও আয়শা ঈর্ষান্বিতা হয়ে ঠিক করে যে, রাসূল সঃ তাদের কাছে আসলে তারা মিথ্যা বলবে যে রাসূল সঃ মুখ থেকে মাদকতা সৃষ্টিকারী মাগাফিরের দুর্গন্ধ আসছে। এভাবে তারা রাসূল সঃ এর আরো কজন স্ত্রীকে নাকি তাদের পক্ষে টানতে সক্ষম হয়। রাসূল সঃ তাদের সান্নিধ্যে আসলে তারা সবাই মা আয়শা ও হাফসার শিখানো মিথ্যা বলে যে রাসূল সঃ এর মুখ মুবারাক থেকে মাগাফিরের দুর্গন্ধ আস্ছে। রাসূল সঃ বলেন "আমি তো মাগাফির পান করিনি। আমি যায়নাবের ঘরে মধুপান করেছি। কেউ যায়নাবকে এক কৌটা মধু দিয়েছে। তা'থেকে আমি শুধু মধুপান করেছি"! তাতেও মিথ্যা চক্রান্তের সুতা কাটেনি। বরং মিথ্যার সাথে আরো মিথ্যা যোগ দিয়ে তারা বলে, মধুপান করে থাকলে তাতে নিশ্চয়ই মৌমাছি যায়নাবের সংগৃহিত মধুতে মাগাফিরের ফুলের রেণু মিশ্রিত মধু মিশিয়ে থাকবে। উদ্দেশ্য তো তাদের তারা রাসূল সঃ কে যেকোনো মূল্যে যায়নাবের সান্নিধ্যে যেতে ঠেকাবে।

২. দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে যে, রাসূল সঃ একবার নাকি মা হাফসার খালি ঘরে বিবি যায়নাবের সাথে মিলিত হন। তা' জানতে পেরে মা হাফসার ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠে। তাই মা আয়শার সাথে একজোট হয়ে মাগাফিরের প্লট তৈরী করে তা' রাসূলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে।

৩. তৃতীয় ঘটনাটি মা মারিয়াকে নিয়ে। তৎকালীন মিশরের খৃষ্টান রাজা রাসূল সঃ এর পত্র পেয়ে তা' পাঠান্তে তাওরাত ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী তাঁকে শেষ নবী রূপে চিনতে পেরে তাঁর প্রতি তার সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ তার রাজকীয় বংশের এক সুন্দরী খৃষ্টান মহিলাকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠায়। সঙ্গে বহু মূল্যবান আতর, পোষাকাদি, সওয়ারী ও সেবার জন্য খাসী করা সেবকও পাঠায়। রাজা নিজে ইসলাম গ্রহণ করলে তার রাজসিংহাসন হারাতে হবে ভয়ে সে রাসূলের প্রতি প্রকাশ্যে ঈমান আনতে পারছেনা, তাও জানায়। মহিলার নাম মারিয়া, যাকে আরবীতে মারইয়াম ও ইংরেজীতে মেরী বলা হয়। রাওয়ায়েতে দেখা যায় যে, এ সুন্দরী মিশরীয় মহিলার আগমনে মা আয়শা ঈর্ষাকাতর হয়ে যায়। হাফসা তো বটেই। একবার নাকি রাসূল সঃ হাফসার অনুপস্থিতিতে তার ঘরে মা মারিয়ার সাথে মিলিত হন। হাফসা তা' জানতে পেরে মা আয়শার সাথে মিলে ষড়যন্ত্র পাকায়।

খুব সম্ভবতঃ তিনটি ঘটনাই ঘটেছে এবং মা আয়শা ও হাফসা তা' নিয়ে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট দাঁড় করিয়ে আরো দু একজনকে সঙ্গে টেনে অন্যায় ঘটনা ঘটায়। রাসূল সঃ তো আল্লাহ্‌র নূরে ধোলাই সত্য ও সরলতার প্রতীক। নারীর কুটিল প্রকৃতির কথা না ভেবে তিনি হয়তো বলে থাকবেন, যে যায়নাবের ঘরে আর মধু পান করবেন না। একজনের ঘরে অন্য স্ত্রীর সাথে মিশবেন না। বা মিশর থেকে আগত মা মারিয়ার সাথে তিনি স্বামীর সম্পর্ক স্থাপন করবেন না। তিনি হাফসাকে বলেছিলেন যে, সে যেনো এ ঘটনা আর কাকেও না বলে এবং এনিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করে।

কিন্তু অর্ধ বুদ্ধির জটিল নারীচরিত্র এখানেও নিজেকে সামলাতে পারলোনা। রাসূল সঃ এর নিষেধ অমান্য করে তার মিথ্যা সাফল্য প্রচারে লেগে যায়। মহানবী রাসূল সঃ এর স্ত্রীর মর্যাদা ও মান দূরের কথা, সাধারণ নিষ্ঠাবান স্ত্রীর মানদন্ডও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে আল্লাহর রাসূল সঃ যাকে আল্লাহ্ অপবিত্র মুশরিক পিতা মাতার পঙ্কিলতা থেকে শৈশব থেকে ধুয়ে মুছে বারাকাহর মতো এক অসাধারণ পালিকা দিয়ে বড়ো করেছেন, মা খাদিজার মতো স্ত্রীর দ্বারা পরিচর্যা করিয়ে খাতামুন নাবিয়্যীনের আসনে বসিয়েছেন, এ সূরার আয়াত নং-চার-এ আল্লাহ বলেছেন, রাসূলের স্ত্রী হয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাসূলের পারিবারিক জীবনকে দুর্বিসহ করবে, আর রাসূলের অভিভাবক আল্লাহ্ সব দেখেও তামাশা উপভোগ করবেন, তা কি ভাবা যায়? আল্লাহ একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য সূরা নাযিল করে এদের হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেন।

মক্কার মুশরিক আবু বকর ও উমরকে আল্লাহ্ যেরূপ ঈমান এনে রাসূল সঃ এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন, তদরূপ তাদের দু' কন্যা আয়শা ও হাফসাকে আল্লাহ্ করুণা করে নবী সঃ এর স্ত্রী রূপে মু'মিন জাতির আদর্শ মা হওয়ার সুযোগ দান করেছিলেন। তা না হলে তাদের কী মূল্য ছিলো? তাদের তো বুঝা উচিত ছিলো যে তারাও আল্লাহর দাসী। ইসলাম ও রিসালাতের মা নয়। ইসলাম তাদের পেট থেকে জন্মায়নি। তাদের এ দৈন্যতার জন্যই আল্লাহ্ তাদের পেটে রাসূল সঃএর কোনো সন্তান দেননি। এ আক্কেল নিয়ে সন্তান হলে কি রক্ষা ছিলো?

এবার আমরা আল্লাহ্‌র আরশের আদালতের বিচার ও তার রায় পর্যবেক্ষণ করবো। যাতে সর্বোচ্চ আদালত, আহ্‌কামুল হাকিমীন, তাঁর রাসূলকেও অব্যাহতি দেননি।

১. হে রাসূল! তুমি কেনো আল্লাহ্‌র হালালকে হারাম করলে? তুমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও? এ তো তোমার পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি আল্লাহ্‌ দয়ালু, ক্ষমাশীল, তাই তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

২. তবে তুমি যে স্ত্রীদের সাথে ভুল অঙ্গীকার করেছো, এরূপ যদি অন্য কোনো ঈমানদারও করে বসে, তাহলে তোমাদের বাধ্যতামূলক ভাবে জরিমানা আদায় করে তা ভাঙতেই হবে। মনে রাখবে যে একমাত্র আল্লাহ্‌ই তোমাদের মনিব। স্ত্রীরা নয়। আল্লাহ্‌ কিন্তু সবজানা বিচারক।

৩. যখন নবী তাঁর কোনো স্ত্রীর নিকট একটি কথা গোপন রাখতে বলেছিলো, তখন সে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহ রাসূলকে তাঁর সে স্ত্রীর কান্ড প্রকাশ করে দেন। রাসূল স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বলেন, আর কিছু অপ্রকাশিত রাখেন। স্ত্রী যখন দেখলো যে তার চরিত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে, তখন সে রাসূল সঃ কে বললো, "আপনাকে তা আবার কে বলে দিলো?" রাসূল বললেন, "তিনি সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন, তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।"

৪. তোমাদের দু'জনের অন্তরে কিন্তু কালিমা পড়ে গিয়েছে। তওবা করেই যা মোচন সম্ভব। আর যদি হঠকারিতা করো স্বামীর বিরুদ্ধে, তা'হলে জেনে নাও যে, অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাঁর মনিব, জিব্রাঈল ও সৎকর্মশীল ঈমানদাররা তাঁর স্বজন। তারপর ফেরেশতা সকলতো তাঁর সাহায্যকারী আছেই।

৫. রাসূল যদি তোমাদের সবাইকে তালাক্ব দেয়, তা'হলে রাসূলের অভিভাবক তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রীর যোগাড় করে দিবেন। যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, খাঁটি ঈমানদার, অল্পতে তুষ্ট, তওবার উপর স্থির, ইবাদতে মগ্ন, বেশী বেশী রোজা পালনকারী নূঢ়া ও অনূঢ়া।

৬. হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অবাধ্যতা থেকে তোমাদের নিজ ও পরিজনকে জাহান্নামের দহন থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হও, যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর। নরকাগ্নির পরিচালনায় এমন ফেরেশতাদের নিয়োগ করা হয়েছে যারা নির্দয় ও কঠোর। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত শাস্তিদানে তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করবেনা। বরং যেরূপ হুকুম করা হবে, ঠিক তাই পালন করবে। নবীর স্ত্রী , নবীর পুত্র বা রক্তীয় স্বজন কাকেও রেয়াত করবেনা।

৭. এ বিধান অমান্য করে যারা কুফুরী করবে, তাদের কোনো ওজর আপত্তি শোনা হবে না। কর্মে যা কামাবে, তারই ফল ভোগ করবে।

৮. হে বিশ্বাসীরা, এ যাবৎ যারা ভুল করে পাপ করেছো, তারা আল্লাহর কাছে দৃষ্টান্ত মূলক তওবা করো। তাতে হতে পারে তোমাদের পাপ পূণ্যের যোগ বিয়োগের পর নদ-নদী প্রবাহমান জান্নাতে সেদিন তোমাদের স্থান হবে, যেদিন আল্লাহ্‌ নবী ও তাঁর অনুসারীদের লজ্জিত অপমানিত করবেন না। বরং সেদিন ডানে বামে নূরের আলোতে পথ দেখিয়ে তোমাদের জান্নাতের পানে পরিচালিত করা হবে। তখন তোমরা আরজ করবে, " হে আমাদের প্রভু, জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত আপনি নূরের পথ প্রদর্শন পূর্ণ করুন, আমাদের ত্রুটি মার্জনা করুন, আপনার সর্বক্ষমতা আছে" ।

৯. হে নবী, অকৃতজ্ঞ ও কপটদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করো। এদের পরিনাম জাহান্নাম। কতইনা নিকৃষ্ট পরিণতি।

১০. এ বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ অকৃতজ্ঞ নারীদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, নূহ এবং লূতের স্ত্রীদ্বয় দিয়ে। তারা উভয় আমার দু'সুযোগ্য প্রিয়ভাজন দাসের অধিনস্থ ছিলো। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। দু'নেক বান্দার অধীনস্থতাও তাদের অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষায় আল্লাহ্‌র নিকট কোনো কাজে আসেনি। বরং তাদের ক্বেয়ামত ঘটা ও তার বিচারের পূর্বে এই পৃথিবীতেই জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশের আগাম রায় দেয়া হয়েছে।

১১. এ বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর প্রিয়ভাজন উত্তম মু'মিন নারীদেরও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। তাদের প্রথম হলো ফেরআউনের স্ত্রী । কারণ, সে তার পাপাত্মা স্বামীকে ত্যাগ করেছিলো। বলেছিলো প্রভু আমার, আপনি আপনার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য এক বাসস্থান নির্মাণ করে দিন। ফেরআউনের পাপাচার থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। গোটা পাপী জাতি থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

১২. দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো, ইমরান তনয়া মারইয়াম। সে যৌনাঙ্গের সতীত্ব রক্ষাকে তার জীবনের সম্বল করেছিলো। মানুষের অপবাদ অবশ্যম্ভাবী জেনেও সে তার প্রতিপালকের অভিপ্রায় মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলো। আল্লাহ্‌র কিতাব

সমূহেও সে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো। তখন আমার রূহ ফুকিয়ে তাকে গর্ভদান করে দিলাম। সে অনিন্দ্য তুষ্ট নারীদের অন্যতম ছিলো।

কি চমৎকার আল্লাহ্‌র ক্বোরআন। কতই স্পষ্ট আল্লাহ্‌র বাণী। তিনি একা, অনন্য একক। আহাদ্, আস্ সামাদ। সকল অভাব মুক্ত । কারো নিকট ঠেকা নেই। সৃষ্টির সকল অণু-পরমাণু প্রতিক্ষণ তাঁর দুয়ারে ফক্বীর। তাঁর দান ব্যতিত কারো এক মুহূর্ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শক্তি নেই।

নবী রাসূলদের এ শিক্ষা আচরণ ও প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন। মানুষ রূপে কখনো কোনো ভুল হলে, তাঁদেরও রক্ষা নেই। কাফ্‌ফারা দিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আর অন্যরা? হোক্ না তারা নবী রাসূলদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা স্ত্রী সন্তান, তাঁর আগে বাড়ার কারো অধিকার নেই। আগে বাড়া মাত্রই কোনো সতর্ক বাণী ছাড়াই সকল আমল শেষ। (হুজুরাতের প্রথম আয়াত)

আখেরী নবী সঃ এর ঘরে একসাথে প্রায় ন'জন স্ত্রীর সমাবেশ। তা কি যৌন কারণে ঘটিয়েছেন? তা কখনো নয়। তা' হলে একজন বাদে সব বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা কেনো? এ তো এক বিধবা আশ্রম। ঘুণে ধরা সমাজকে ভেঙ্গে গড়ার আন্দোলনে আশ্রয় কেন্দ্র ও আশ্রম অনস্বীকার্য। মানুষ গড়ার শিবির ও আশ্রমে যারা আত্মোৎসর্গী, বাধ্য ও অনুগত, তারা উত্তম আদর্শ। যারা আত্মকেন্দ্রিক, অবাধ্য ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী, তারা নিকৃষ্ট।

যে সংসারে একাধিক মা বা স্ত্রী থাকে, সেখানে যারা শৃঙ্খলা, শান্তি ও আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তারা পুরস্কৃত হবে, না যারা ঘরকে কুরুক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে, তাদের পুরস্কৃত করতে হবে? শান্তি ও সৌহার্দ ভঙ্গকারীদের পুরস্কৃত করলে কি কোনো ঘর, সমাজ ও সভ্যতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব? মোটেও না।

পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের জন্য আল্লাহর ব্যতিক্রমহীন বিধান হলো, কোনো বৈধ কাজেই স্বামী, পিতা, পরিবার প্রধান, সমাজপতি, রাষ্ট্র প্রধান ও ইমামের আদেশ নিষেধ কখনো অমান্য করা যাবে না। তদরূপ এ প্রধানরা তাদের অধীনস্থদের এ ধরনের অবাধ্য কাজে কোনো রেয়াতই দিতে পারবে না। স্ত্রীদেরও না, সন্তানদেরও না, সমাজের অধীনদেরও না এবং নামাজের অধীন মোক্তাদীদেরও না। তাতে প্রশ্রয় ও ছাড় দিলে কখনো কোনো কল্যাণ হয় না। বরং অকল্যাণ জন্ম নিয়ে পরিবার, সমাজ ও উম্মত ধ্বংস হয়ে যায়।

রাসূল সঃ তাঁর কোনো এক স্ত্রীর অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দিলে তার কুফল দ্বিতীয় স্ত্রীর মাঝে সংক্রামিত হয়। এ দু'জন আবার তাদের ব্যাধি অপরাপর স্ত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। ফলে রাসূল সঃ কে তাঁর ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। রাসূল ঈলা করে স্ত্রীদের বর্জন করে পৃথক বাস আরম্ভ করেন।

আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের আদর্শকে পূর্ণ ও চূড়ান্ত রূপদানের জন্য প্রথমে তাঁর প্রিয়তম নবীকে ধরেন। তোমার স্ত্রী দের মনোরঞ্জনার্থে আল্লাহর্ বৈধকেই অবৈধ করলে? তা' হবে না। তোমার এ অন্যায় নমনীয়তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করে ভাংতে হবে। তদরূপ প্রত্যেক ঈমানদারদেরই করতে হবে। কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক। স্ত্রীরা নয়। আমি তোমাদের প্রতি দয়ালু ক্ষমাশীল বলে এ লঘু শাস্তি। তা' না হলে আরো কঠোর শাস্তি বিধান হতো।

রাসূল সঃ কে ছাগল দুম্বা জবাই দিয়ে কাফ্‌ফারা দিয়ে তার মাশুল আদায় করতে হয়! ঈমানদারদের ঘরে স্ত্রীরা আল্লাহ্‌র বিধান ও ক্বোরআন বিরোধী সমস্যা সৃষ্টি করবে, তা কি কখনো ক্ষমার যোগ্য হতে পারে? যে ঘর খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর ঘর, যে ঘরে কথায় কথায় অহী নিয়ে জিব্রাঈল আঃ অবতীর্ণ হয়, সে ঘরে মা হাফসা ও আয়শা কি করে এমন ঘটনা ঘটায়?!!

কিছু কিছু জ্ঞানহীন, ঈমানী শিক্ষা বর্জিত নির্বোধ ও নির্লজ্জ লোকদের বলতে শুনা যায় যে, এ সমস্ত অশোভন ঘটনা এই জন্য ঘটানো হয়েছে, যাতে তার ফলাফল অন্যান্য লোকদের শিক্ষণীয় হয়। এ ধরনের অপরাধে কোনো অপরাধ বা গুনাহ্ নেই। বাহ্‌বা এক পাপ ঢাকতে মহাপাপের সৃষ্টি! তাই যদি হয়, তা' হলে ইবলিস যে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অমান্য করেছিলো, তাতে তো কোনো অন্যায় করেনি! তার এত বড়ো শাস্তি হলো কেনো? আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম, আসল শয়তান ও তার মানুষ প্রজন্ম থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাই।

এ অপরাধে মা হাফসা ও আয়শার অস্তিত্বে দাগ লেগে গিয়েছে। إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا এ দু'জনের অন্যায় প্ররোচনায় অন্যান্য নবীস্ত্রীদের উচিৎ ছিলো প্রতিবাদী হয়ে ঐ দু'জনকে সংযত করা। তা' না করে তাদের সমর্থন করেছে বা নীরবতা অবলম্বন করার ফলে তাদের সবার উপর তালাকের অসি ঝুলিয়ে দেন আল্লাহ্ স্বয়ং। মা উম্মে সালামা, উম্মে হাবিবা ও মারিয়ারা এতে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ বা ইংগিতও কোনো বর্ণনায় পাওয়া

যায়না। মা হাফ্সা, আয়শা, সাওদা ও সাফিয়া পর্যন্ত নবীস্ত্রীদের এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জড়িত পাওয়া যায়। অন্যান্যরা রাসূলের পক্ষে প্রতিবাদী হয়নি বলে সবাইকে তালাক প্রদানের আওতায় আনা হয়। মা আয়শা ও হাফ্সাকে তো বলা হয়, তওবা না করলে তোমাদের দুজনের রক্ষা নেই। এরপরও যদি অন্যায় হঠকারিতা করো, তাহলে আমি আল্লাহ্ স্বয়ং রাসূলের অভিভাবক। জিব্রাঈল আঃ ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনরা তাঁর পক্ষে, আর ফেরেশতাদের সৈন্য বাহিনী তো আছেই।

কতো বড়ো হুমকি ও তিরষ্কার! শিষ্টের সহায়তা ও পুরস্কার এবং দুষ্টের দমন ও তিরস্কারই আল্লাহ্র বিধান, দ্বীন ও শরিয়ত। এর অবাধ্যরাই কাফের। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ সত্য স্পষ্ট বর্ণনার পর তা' অমান্যকারীদের কোনো ওজর আপত্তি অগ্রাহ্য।

তওবার মতো তওবা (তওবাতুন নসূহা) করেই ঈমানদার নামধারীদের আল্লাহ্, রাসূল ও ক্বোরআন বিরোধী পাপ মোচন করে পুনঃ দ্বীনে প্রবেশ করতে হবে। কাফের মুশরিকরা সাধারণ সরল তওবা করেই ইসলামে প্রবশে করতে পারে। কারণ তারা কাঁচা মাল। মুসলিম ও মুসলিম নামধারীদের মতো পঁচা মাল নয়। খুব মনোযোগ দিয়ে সূরা তাহ্রীম পড়তে ও বুঝতে হবে। "ইয়া আইয়ু হাল্লাযীনা আমানু তুবু" বলা হয়েছে। অর্থাৎ হে ঈমানদাররা তওবা করো। হে কাফেররা, বলা হয়নি।

তারপর রাসূল সঃ কে সরাসরি "হে নবী" বলে আদেশ করা হচ্ছে যে, হে নবী, কাফের ও মুনাফিক নারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নাও। এরা বাইরের সাধারণ নারী নয়। হযরত নূহ আঃ ও লূত আঃ দের স্ত্রীদের মতো দ্বীন ইসলামের আতুরঘরের আম্মাজান এরা। মা আয়শা ও মা হাফ্সার অপরাধ এতোটুকু গড়ায় যে তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর পূর্বেকার দু'সম্মানী নবীর অভিশপ্ত স্ত্রীর সাথে সরাসরি তুলনা করেন!

এখানে একটি প্রশ্ন আমাদের অন্তরে স্পষ্টতই জাগে যে আখেরী নবী সঃ এর ঘরে মা আয়শা ও হাফ্সার কার্যকলাপ যদি হযরত নূহ আঃ ও লূত আঃ এর স্ত্রীদের মতো হয়, তা হলে তাঁর ঘরে কারা ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া ও বিবি মারইয়ামের মতো ছিলো? বা আদৌ কি তেমন কেউ ছিলো?

একটু পরিস্কার নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই আমরা দেখতে পাই যে হযরত মূসা আঃ এর মিশরীয় সমাজের ফেরআউনের মতো আখেরী নবী সঃ এর যুগে আবু জেহ্ল, আবু লাহ্ব ও আবু সুফ্ইয়ানরা মক্কার ফেরআউন ছিলো। তাদের তুলনায় আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীরা অনেক নগণ্য ছিলো।

রাসূল আহ্যাব, বা আদ্, সামূদ ও আসহাবুল আইকাদের ন্যায় সম্মিলিত কুফ্রী শক্তির নেতা আবু সুফ্য়ানকে রাসূল সঃ তাঁর সময় কালের ফেরআউন বলেছেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। এমনকি উমর মুয়াবিয়াকে, "ফেরআউনু হাযিহিল্ উম্মা" অর্থাৎ এ উম্মতের ফেরআউন ও কিস্রা বলেছে বলে দায়েরাতুল মা'আ'রিফ সহ অন্যান্য গ্রন্থ প্রমাণ করছে। হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করার পর তাকে পুনঃ নবায়ন করতে স্বয়ং আবু সুফ্য়ান মাদীনা যায়। এ ক্বোরেশী ফেরআউনের কন্যা রামলা বিন্ত আবি সুফ্ইয়ান, বা মা উম্মে হাবিবা তার পিতার প্রভাব প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করে রাসূল সঃ এর উপর ঈমান এনে পিতার অত্যাচারে প্রাণ ও ঈমান রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। সেখানে তার স্বামী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে মা উম্মে হাবিবা তাকে ত্যাগ করে একাকী হয়ে যায়। পরে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর অভিভাবকত্বে রাসূল সঃ এর সাথে উম্মে হাবীবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ হিজরত করে মদীনায় এসে রাসূল সঃ-এর সাথে মিলিত হয়। চুক্তি নবায়নের জন্য মাদীনায় এসে যখন আবু সুফ্য়ান তার মেয়ের ঘরে গিয়ে তার বিছানায় বসতে যাচ্ছিলো, তখন তার বিছানা গুটিয়ে তাকে তার উপর বস্তে দেয়নি। আবু সুফ্য়ান কারণ জানতে চাইলে তার মেয়ে নির্দ্বিধায় জানায় যে, সে মুশরিক, নাপাক বা অপবিত্র বিধায় তাকে তার বিছানায় বসতে দেয়নি। কারণ তাতে রাসূলুল্লাহ সঃ ও এসে বসেন। মা উম্মে হাবীবা তার ভাই মুয়াবিয়াকেও কখনো পাত্তা দেয়নি। এ মহিয়সী রাসূল সঃ এর ঘরে ফেরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত। মা উম্মে হাবীবা মা আয়শা ও হাফসার চক্রান্তে কখনো শরীক হয়নি। তারপর প্রশ্ন রয়ে যায়, তা হলো বিবি মারইয়ামের দৃষ্টান্তে কাকে পাওয়া যায়? আল্লাহ তাঁর খাতামুন নাবিয়্যীনের ঘরে তারও ব্যবস্থা করেছেন। মিশরের রাজা মুকাউকিস্ রাসূল সঃ কে খাতামুন নাবিয়্যীন জানার পরও সিংহাসন বাঁচাতে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু একজন ডিভাউট খৃষ্টান রূপে রাসূল সঃ এর প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাজা তার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্মানী ঘরের দু'মহিলাকে রাসূল সঃ এর খেদমতে প্রেরণ করে। রাসূল সঃ তন্মধ্যে একজনকে নিজের জন্য কবুল করেন। এ খৃষ্টান মহিলা আখেরী নবী সঃ কে

তার জীবনে এক চরম পাওয়া রূপে গ্রহণ করে। তার নাম মারিয়া বা মারইয়াম। তার পেটেই আল্লাহর তাঁর নবীকে তাঁর শেষ সন্তান ইব্রাহীম দান করেন। মা খাদিজার মৃত্যুর পর কারো পেটে রাসূল সঃ এর কোনো সন্তান হয়নি মারিয়া ব্যতিত। এ মহিলা রাসূলের ঘরে দীর্ঘ দিন পর আনন্দের সৃষ্টি করে। মা আয়শা ও হাফসাদের চাওয়া পাওয়ার কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি এ মারইয়াম। তাই মা হাফসা ও আয়শাদের দুঃখজনক চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে তাকে। ইব্রাহীম জন্ম নিলে রাসূল সঃ মা আয়েশাকে খুশি করার জন্য ইব্রাহীমকে এনে মা আয়শার কোলে দেন। ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে মা আয়শা তাকে অন্যের মতো দেখতে বলে মারিয়ার চরিত্রে কলঙ্কের ইংগিত করে। পরে পরীক্ষার পর তা মিথ্যা অপবাদ প্রমাণ হলে আয়শা বলে যে সে ঈর্ষায় ঐ মন্তব্য করেছিলো। (সাইয়িদাতু বাইতিন্ নবুউয়াহ্, ডঃ আয়শা বিন্‌তুশ্ শাতী) মা আয়েশা অধ্যায়ে এর বিবরণ আসবে।

আল্লাহ্ আল ক্বোরআনে যেমন সব কিছুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তেমনি তার রাসূলের জীবন ও ঘরে সকল শিক্ষার দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ - كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

আমি অবশ্যই এ ক্বোরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটিয়েছি। তুমি যদি কোনো দৃষ্টান্ত তুলে ধর, তা'হলে অবিশ্বাসীরা বলবে যে, তোমরা বাতিলপন্থী। এভাবে আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তরে মোহর মেরে দেই। (সূরা রুম ৫৮-৫৯)

মানব জীবনে, নর কি নারী, প্রত্যেকেরই ঈমান আনার পর তৃপ্ত, বাধ্য ও অনুগত হওয়া সর্বপ্রধান কাজ। এতে সফল হলে পর নবী রাসূলদের সাথে কৃত সকল বরকত ও রহমত তাদের উপর নেমে আসে। অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হলে নেমে আসে সকল অশান্তি ও বিড়ম্বনা। নবী রাসূলদের শিক্ষা পেয়ে, “যা শুনলাম তা মানলাম” (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) বললে মনের অবস্থা ও অবস্থান বিবি আসিয়া, মারইয়াম খাদীজা, বারাকা, বেলাল, যায়দ, আম্মার, সালমান ও উসামাহ্‌দের অনুরূপ হয়। “শুনলাম, আর মানলামনা” (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) বললে নবীদের ঘরে বাস করলেও নূহের স্ত্রী, লূতের স্ত্রী এবং নূহের পুত্রবৎ হয়ে পৃথিবীতে জীবদ্দশায়ই জাহান্নামী হওয়ার রায় কপালে জুটে।

আল্লাহ্ তার রাসূলদের পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে সিরাতুল মুস্তাক্বীমে পুনঃ পুনঃ ফেরৎ আসার জন্য। বনী আদমের দুটি ধারা। একটি হলো মুত্তাকী হয়ে আল্লাহ্‌র খলিফা স্বরূপ মুত্তাকীতম ইমামের অধীনে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ নির্বিশেষে এক অভিন্ন জাতি, উম্মতে মুসলিমা হওয়া। এর প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও একে টিকিয়ে রাখার জন্য জানমাল দিয়ে জিহাদ করা। এর নাম ইসলাম। এর শেষ নবী মুহাম্মদ সঃ। যায়দ, বারাকাহ্, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান, ও উসামাহরা তার আদর্শ অনুসারী।

ইবলিসের মুস্তাক্বির, আধিপত্যবাদী বর্ণ, রক্ত ও গোত্র এবং ভৌগলিক বিভক্তির বহুজাতিক ধ্যান ধারণাই কুফর ও শির্ক। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, ক্বোরেশী, তুর্কী, মুঘল ও পাঠান, গোত্রবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইবলিসী মুস্তাকবিরবাদ। এর ইমাম, মোক্তাদী, যে নামেই হোক, এরা জাহান্নামের জ্বালানী।

নবী রাসূল সঃ এর ঘরে ক্বোরেশী উম্মে হাবিবা, উম্মে সালমা, ইয়াহুদী বংশোদ্ভুত সাফিয়া ও মিশরী মারিয়ারা সকল সত্তা বিসর্জন দিয়ে একাকার হয়ে তারা মুমিনদের আদর্শ মাতা, উম্মাহাতুল মুমেনীন। বাইরে আরবী যায়দ, হাবশী বিলাল, রুমী, সুহাইব ও পারস্যের সালমানরা, “ইন্নামাল্ মু'মিনুনা ইখওয়া” মুসলিমরা শুধু ভাই ভাই।

নবুওতের ঘরে মা আয়শা ও হাফসার জুটি এবং বাইরে আবু বকর ও উমরের জুটি, এবং তার আদলে শুধু ক্বোরেশী খেলাফত ও ইমামত যতো সুন্দর মোড়কেই সাজানো হোক না কেনো, ক্বোরআন ও রিসালাতের সকল মানদন্ডে তা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। যার ফলে মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানও রাসূলের উত্তরাধিকারী মুসলিম জাতির খলিফা!!!?

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসত্যকে সাময়িকভাবে ভুলেও গ্রহণ করলে সে ছিদ্রে বিরাট মিথ্যা প্রবেশ করে হিমালয় হয়ে তা চেপে বসে যায়। তাকে উৎখাত করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মা আয়শা ও হাফসার সীমাবদ্ধ অন্যায় আবদারকে সাময়িকভাবে প্রশ্রয় দেয়ায় খোদ রাসূল সঃ এর কী অবস্থা হয়েছিলো? তা'হলে আমরা কোথায়? মা আয়শার ও হাফসার অশোভন ক্রিয়া কলাপকে সমর্থন ও গ্রহণযোগ্য করার ফলে রাসূল সঃ এর ঘরের আদর্শ মাতা উম্মে সালমা,

উম্মে হাবীবা, মারিয়া এমন কি মা খাদিজাও প্রায় বিস্মৃত। কেনো? আল্লাহ্‌র দ্বীন, ক্বোরআন ও রিসালাত কি দু'আম্মাজানের তুলনায় নিস্প্রভ হতে পারে? তা'হলে যারা রাসূলের আদর্শ ধারণ করে তা পালন করেছে, তাদের মূল্যায়ন কোথায়?

১৪১২ বছর পর কেনো আমি এ গ্রহণে গ্রাস করা আলোর দিগন্তকে পরিষ্কার করতে কলম ধরেছি? প্রশ্নকারীদের আমি বলছি, মিথ্যা বাসি হয়, সত্য কখনো বাসি হয় না। মানব জাতির মুক্তির সূর্যোদয়ের দিগন্তকে মেঘমুক্ত না করলে যে আমারও মুক্তির পথ নেই! তাওহীদ, ক্বোরআন ও রিসালাতের যে বুঝ আল্লাহ্‌ আমাকে দিয়েছেন, তারা সাক্ষ্য তো আমাকে দিতেই হবে। তা না হলে আমি অপরাধী হবো, আমার পাপের বোঝা কে নিবে? ক্বেয়ামত যে সে দিন, যে দিন কেউ কারো বোঝা কাঁধে নিবে না। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কেহ অন্য কারো ভার বহন করবেনা। এ কথাটি পাঁচ জায়গায় একই ভাষায় আল ক্বোরআনে পুররাবৃত্তি করেছেন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌। (সূরা আনআম-১৬৪, সূরা বনী ইস্রাঈল-১৫, সূরা ফাতির-১৮, সূরা ঝুমার-৭, এবং সূরা নাজম-৩৮)।

বলা হয় যে সূরা তাহরীম নাযিল হওয়ার পর মা আয়েশা ও হাফ্‌সা নাকি তওবা করে বিধৌত হয়ে ছিলো। কিন্তু রাসূল সঃ এর মৃত্যু শয্যায় তাদের পিতাদের দিয়ে সালাতের জামাত দাঁড় করার ক্রিয়াকলাপে রাসূল সঃ কর্তৃক তাদেরকে ''সাওয়াহিবাতু ইউসুফ'' বা ইউসুফ আঃ এর ঘটনার জুলেখাদের সাথে তুলনা কি বুঝায়? রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর মা আয়েশার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের হত্যাযজ্ঞে ক্বোরআন ও আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ এর শিক্ষা পদ দলিত করে মদীনা থেকে সুদূর ইরাকে গিয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া কী প্রমাণ করে?

মা উম্মে সালমা কঠোর ভাষায় মা আয়শাকে নিষেধ করেও ঠেকাতে পারেনি। এ যুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে তার জন্ম না হওয়াও উত্তম ছিলো বলতে, মা উম্মে সালমা কুণ্ঠাবোধ করেনি। হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় যখন উমর সহ কথিত সাহাবীরা রাসূল সঃ এর নির্দেশ অমান্য করলে মর্মাহত রাসূল সঃ কে একাই ইহরাম খোলার পরামর্শ দিয়ে নিজ হাতে রাসূল সঃ এর মাথা কামিয়ে আবু বকর, উমর, ও আলীদের রাসূলের আনুগত্ব শিক্ষা দেয় যে মহিয়সী আম্মাজান, তিনিই উম্মে সালমা। কই, রাসূল সঃ এর কোনো কঠিন সমস্যায় মা আয়শা বা মা হাফ্‌সা কোনো উল্লেখযোগ্য পরামর্শ দিয়ে স্বামী রাসূল সঃ কে সাহায্য করেছেন, তার তো কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেখছিনা !

সমস্যা সৃষ্টিই তাদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর তার বোনকে পথিমধ্যে থেকে জোর করে ফিরিয়ে না আনলে মা হাফ্‌সাও উষ্ট্র বা জামালের যুদ্ধে মা আয়শার সাথী হতো।

এ সমস্ত ভুলগুলোকে ভুল বলে মেনে নিলে আমরা রাসূল সঃ কর্তৃক সাবধান করা বহু "ফিত্‌নাতুন নিসা" বা নারীদের ঘটানো ফিৎনা এড়াতে সক্ষম হতাম। নারী সুলভ সীমাবদ্ধতায় ক্বোরআনের শিক্ষার আলোকে মা আয়শা ও হাফসাকে স্ব স্ব মর্যাদায় আসীন করায় তাদের অমর্যাদা কোথায়? হে রাসূল, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ভাবের গঠন ও গড়নের চৌহদ্দি মাফিক আমল করে থাকে, তা তুমি বলে দাও। (বনী ইস্রাইল-৮৪)

ইসলামের পর আল্‌ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ থেকে জন্ম নেয়া সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসরা তাদের প্রভুদের সেবায় যে কোনো মিথ্যা দাঁড় করাতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। ভাবতেও অকল্পনীয় বোধ হয় যে, যেখানে আল ক্বোরআনে স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে যে "হে রাসূল! তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র হালালকে কেনো হারাম করছো" সেখানে বহু রাওয়ায়েতে সন্দেহাতীত ভাবে মা হাফ্‌সা ও আয়শার তিনটি ঘটনা প্রমাণিত, যেগুলো তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী প্রামাণ্য ভাবে বর্ণিত, তার পরও এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস (?) নির্লজ্জ মিথ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে ! তারা বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছে যে রাসূল সঃ মা হাফসাকে নাকি গোপনে বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর, পর পর আবু বকর ও উমর তাঁর খলিফা হবে। একথাটি কাকেও না বলতে রাসূল সঃ মা হাফসাকে বলেছিলেন। কিন্তু খুশীর চোটে নাকি মা হাফ্‌সা তা'পেটে হজম করতে পারেনি। তাই মা আয়শার নিকট ফাঁস করে দেয়! এদের বিকৃত চরিত্র এখানেই শেষ নয়। তারা তাদের রুচী অনুযায়ী বর্ণনা করে যে রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে রাসূল সঃ যদি তাঁর স্ত্রীদের তালাক্ব দিতেন, তা হলে নাকি আল্লাহ্‌ ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া ও হযরত ঈসা আঃ এর মা বিবি মারইয়ামকে রাসূল সঃ এর সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করতেন! ইন্না লিল্লাহ্‌, নাউযুবিল্লাহ! এদের যৌন বিকৃতির নোংরামী আল্লাহ্‌র রাসূলকেও বাদ দেয়নি। আখেরী নবী সঃ এর শানে এ ধরনের মিথ্যা যারা কল্পনা ও বর্ণনা করে, তারা কোন

শ্রেণীর মানুষ? মহান চরিত্রের অধিকারী, উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক রাসূল সঃ আল্লাহ্‌র ভাষায়, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ- لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'তুমি নিশ্চিত মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত" এবং "তোমাদের সকলের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ"। রুচীশীল ও ঈমানভিত্তিক কোনো বিবেকবান মানুষ কি ভাবতে পারে যে রাসূল সঃ তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলের মাকে বিবাহ করার মতো আশা পোষণ করতে পারেন, বা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এ রুচী গর্হিত আশ্বাস দিবেন?

যৌন বিকৃত পূর্ববর্তী অভিশপ্ত ইয়াহুদীরাও তাদের হারামভোগী ধর্ম-বেসাতীরা এধরনের বিকৃত মানসিকতা ছড়াতো। এদেরই আল্লাহ্ কুকুর সদৃশ বলে ধিকৃত করেছেন। মরুবাসী আরবদের মাঝে তাদের প্রতিবেশী বিকৃত ইয়াহুদীদের বিকৃতির লক্ষণ দেখে রাসূল যে আশংকা প্রকাশ করেছেন, "তোমরা আমার পর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণে বিপথগামী হবে" তার সত্যতা তারা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে।

তাওরাত ও বাইবেল পড়লে দেখা যায় যে ইয়াহুদীরা নবী রাসূলদের নামে তাঁদের মৃত্যুর পর কতো জঘন্য মিথ্যা আরোপ করেছে। হযরত লূত আঃ কে মদ্যপান করে তাঁর কন্যার সাথে ব্যভিচারের কথা লিখেছে। হযরত দাউদকে তাঁর সেনাপতির স্ত্রীকে ধর্ষণের অপবাদ দিয়েছে। হযরত সুলাইমানের পুত্রের তার বোনকে ধর্ষণের মতো বিকৃতির ঘটনা তৈরী করতে ওদের বাধেনি। আরবরা ওদেরই অনুসারী হবে বলে রাসূল সঃ তাদের সতর্ক করে গিয়েছিলেন। কিন্তু "আল্লাহ্‌র সীমা লংঘনে নিকৃষ্ট" আরবরা তাই করলো।

ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে যে, কিভাবে ক্বোরতবী ও ইবন কাসীরদের মতো তফসীরকারীরা তাদের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করতে পারে যে রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে আল্লাহ্ তাঁকে আয়শা ও হাফ্সাকে তালাক্ব দিলে তাদের পরিবর্তে বিবি আসিয়া, বিবি মারইয়াম ও হযরত মূসা আঃ এর বোনের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। পরবর্তী রাসূল পূর্ববর্তী রাসূলের মাকে বিয়ে করবেন, একথা সাধারণ মানুষ কি কল্পনা করতে পারে? কত হাযার বছর পূর্বের হযরত মূসা আঃ এর বোনকে এনে আরবরা তাদের আরবী ও ক্বোরেশী নবীর সাথে বিয়ে দিয়ে উপরে উঠবে, এ-ই বা এই বিকৃত চিন্তার উৎস? শয়তানের ওহীর অনুসারী মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির নামের এ শ্রেণীর মিথ্যাচারের ফলেই মুস্লিমদের সাথে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের শত্রুতা বাড়ে এবং পরে ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু হয়ে তা আজো বিভিন্ন ধরনে চলছে।

আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাওহীদের ভিত্তিতে সকল আদম সন্তানদের এক করা। ইবলিসের ধর্ম হলো মানুষকে বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত করে হানাহানির শত্রুতা সৃষ্টি করে তাকে জিইয়ে রাখা। রাসূলরা এসে পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন নবায়ন করে যান। আখেরী নবী মুহাম্মদ সঃ সে ধারার শেষ রাসূল। তিনি নবী রাসূলদের মাঝে সকল পার্থক্যের অবসান করে বিদায় নেন এবং এক নবী সম্পর্কে অন্য নবীর সম্মান বোধের চরম শিক্ষা তিনি দিয়ে যান। ক্বোরআন সে শিক্ষার দলিল। কিন্তু ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পোষ্য মুহাদ্দিসদের বর্ণনা পড়লে কী মনে হয়? রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আবু বকর ও উমর কীভাবে এ গোত্রবাদ চালু করে?!

আমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূলগণ ও ক্বোরআনে বিশ্বাসীরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, নারী জাতির ইতিহাসে ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্ত মুযাহিম্, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্য নারী। যার উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, তার চেয়ে সৌভাগ্যবান কে? তার পরই দ্বিতীয় নাম ইমরানের মেয়ে, হযরত ঈসা রূহুল্লার মাতা মারইয়াম। তাদের দু'জনের পরই অন্যান্য মহিয়সী ধন্য মহিলার মর্যাদা। প্রমাণ আল ক্বোরআন। পরবর্তীতে যে সকল আল্লাহ্‌র দাসীরা বিবি আসিয়া ও বিবি মারইয়ামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, তারা ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাদের মর্যদায় ভুষিত হবে। তাতে কোনো ব্যত্যয় হবার নয়। হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহের ঘরে বিবি হাজেরা ও সারা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হযরত নূহ ও লূতের ঘরে ওয়ালেহা ও ওয়ালিআ হওয়া অকল্পনীয়। তাই আল্লাহ্ ক্বেয়ামতের পূর্বেই তাঁর বিচারে তাদের জাহান্নাম প্রেরণ করেছেন।

ফেরআউন ইতিহাসখ্যাত পরাক্রমশালী নৃপতি। সাম্রাজ্য, প্রাসাদ,ভোগ বিলাস ও প্রতাপ প্রতিপত্তিতে ভূ-স্বর্গের অপর নাম ছিলো ফেরআউনের রাজত্ব। তার সম্রাজ্ঞী, তার স্ত্রী মহারানী আসিয়া বিন্ত্ মুযাহিম এসব ত্যাগ করে, চোখে না দেখা ও ভোগে না পাওয়া বিশ্বাস ও ঈমানের আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে পালক পুত্র মূসার ডাকে ঈমান এনে ফেরআউনের অত্যাচারের পথ বেছে নেয়া কি চাট্টিখানি কথা! তাই আল্লাহ্ তাকে সকল মহান নারীর উপর সম্মানে অভিষিক্ত করেছেন। আমার ঈমানী বিচারে মূসা কালিমুল্লাহ আঃ-কে পেলে বিবি আসিয়া যে মর্যাদায় আসীন হয়েছেন,

আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে পালন করে বারাকাহ্ সে সারিতে নিজের আসন করে নিয়েছেন। তার পর আল্লাহ্ বারকাহকে যায়দের মতো স্বামী ও উসামাহর মতো জঠরের সন্তান দান করেছেন। তার পূর্বে আল্লাহ্ বারাকাহকে আইমানের মতো পুত্র দান করেছিলেন যে হুনাইনের যুদ্ধে যখন আক্রমনের আকস্মিকতায় আবু বকর উমাররাও রাসূল সঃ কে ফেলে পালিয়েছিলো, সে পরিস্থিতিতে রাসূল সঃ এর সাথে দৃঢ় থেকে শাহাদাত বরণ করেছে। তাই আল্লাহ্র বিচারে আসিয়া ও বারাকাহ্রা অনন্যা। তাদের লালন পালনে মূসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের আবির্ভাব হয়। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে যে নারীরা স্বামীর ঘর করে সন্তান ধারণ বা লালন করবে, তাদের মধ্য থেকেই ইমাম মাহদী ও তার অনুসারীর দল জন্ম নিবে। যারা বিশ্বে মুস্তাকবিরদের নির্মূল করে মুস্তাদআফদের ইমামত প্রতিষ্ঠা করবে। সকল নবী রাসূলরা তাদের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তাদের প্রতি তাঁদের সম্মিলিত আর্শিবাদ জ্ঞাপন করবেন। ইনশা্ আল্লাহ্।

অপর দিকে, মাতৃগর্ভে আসার পর মা যাকে আল্লাহ্র দ্বীনের খেদমতের জন্য ঘোষণা করে দান করে, জন্মের পর সে সন্তান আল্লাহ্র এমন নৈকট্য লাভ করে যে আল্লাহ বেহেশত থেকে তার জন্য ফলমূল পাঠাতেন, সে মারইয়াম? পিতা-মাতা ও মেয়ের ঈমান ও সতিত্বের কিংবদন্তির অমর প্রতীক এবং তার পেটে দ্বিতীয় আদম ঈসা রুহুল্লাহর অলৌকিক জন্ম, এসব যাকে অলঙ্কৃত করেছে, তাকে আল্লাহ্ দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন। কারণ, এসব সত্ত্বেও বিবি মারইয়াম "ভালো ঘরে ভালো"র দৃষ্টান্ত ছিলেন। কিন্তু বিবি আসিয়া চরম খারাপ ঘরে চরম ভালোরই উজ্জলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাই আল্লাহ্ আহকামুল হাকিমীন, বিচারক শ্রেষ্ঠ, তাকে প্রাপ্য মর্যাদা দান করেছেন। ফেরআউনের ভয়ে ভুমিষ্ট শিশুকে বাক্সে করে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়া ভাইকে সুনিপুন বুদ্ধিমত্তায় হত্যা থেকে বাঁচিয়ে পুনঃ মায়ের কোলে ফেরৎ আনা, মূসা আঃ এর বোন কলিমা এক অনন্য গাঁথার হিরক খন্ড। আসিয়া, মারইয়াম ও কলিমা, এ তিন মহিয়সী মহিলা যেমন আল্লাহর প্রিয়তম "দাসী শ্রেষ্ঠা" সর্বকালে, সকল মু'মিন নরনারীর তেমনি সার্বজনীন নয়ন মনি। আল্লাহ্ তাদের মনিব, অভিভাবক। আল্লাহ্ই তাদের যোগ্য জোড়া বেছে তাদের পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যারা বিকৃত মস্তিস্কে বিকৃত চিন্তায় উদ্ভট হাদিস তৈরী করে তাদের আখেরী নবী সঃ এর সাথে বাসর ঘর সাজায়, তারা কি আদৌ আল্লাহ্ ও রাসূল সঃ এর উপর বিশ্বাসী কোনো জীব? না যৌন বিকৃত বিকারগ্রস্থ কিছু দোপায়া পশু? ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ক্বোরেশী আরবী বর্ণবাদী এক শ্রেণীর বর্বর আল্লাহ্র দ্বীন তাওহীদের অনুসারীদের বিভিন্ন নবীর নামে বিভক্ত উম্মত, সম্প্রদায়, সুন্নী ও শিয়া প্রভৃতি ফেরক্বায় বিভক্ত করে সে আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত পরস্পরের মাধ্যমে জিইয়ে রাখছে। ফলে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সম্প্রদায়ের নবী রাসূলদের চরিত্র সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা প্রচার করছে।

এক মুহূর্তের জন্য আমরা আমাদের ধর্মীয় অবস্থান পরিবর্তন করে দেখি। মনে করি যে, আমরা ঈসা আঃ এর উম্মত। তারপর যদি শুনি যে মুহাম্মাদ নামে এক ব্যক্তি পরে এসে নবুওত দাবি করে প্রচার করছে যে সে আমাদের নবীর মা, অর্থাৎ বিবি মারইয়ামকে পরকালে বিয়ে করবে। তা'হলে আমরাই কি তাকে নবী বলে বিশ্বাস করবো, না আমাদের নবীর মা সম্পর্কে অবমাননা কর উক্তির জন্য তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের চিরশত্রু হবো? অবশ্যই জাতশত্রু হবো। এভাবে আখেরী নবী সঃ এর রিসালাতকে বিকৃতকারী নব্য আরবী ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের জয়যাত্রাকেই ব্যহত করেনি, বরং ইসলামকে ইয়াহুদী খৃষ্টবাদী বিকৃতির মতো আরেকটি বিকৃত ধর্ম রূপে চিত্রিত করে গোটা মুসলিম জাতিকে ইয়াহুদীদের মতো একটি তৃতীয় জাত রূপে কলঙ্কিত করেছে। আল্লাহ্র গযবে এ তিনটি জাতি আজো পরস্পরকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করার জন্য নিজ নিজ কল্পিত মেসাইয়া, পুনরুত্থিত যীশু ও ইমাম মাহদির অপেক্ষা করছে। তাদের কোনো দলই ভাবেছেনা ও বুঝছেনা যে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে বান্দা এসে পুনঃ মানবজাতিকে তওহীদের পতাকা তলে একত্রিত করবেন, তিনি সর্বপ্রথম এ তিন মিথ্যাদ্বীনের দাবীদারদের সম্মিলিত নেতা, দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন।

কার্যতঃ এরা নামে তিনজাত হলেও কামে তারা এক অভিন্নজাত। পরকালে বিশ্বাসহীন লাগামহীন ভোগবাদ এদের ধর্ম, উলঙ্গ নারীদেহ এদের ক্বেবলা এবং ইং-মার্কিন ইয়াহুদী লবীর দাজ্জাল এদের ইমাম। আসল ইমাম ময়দানে নামার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা ইয়াহুদী, মিথ্যা খৃষ্টান ও মিথ্যা মুসলমান তাঁর বিরুদ্ধে এক হয়ে যাবে। তার প্রমাণ হলো, এরা সবাই জাতিসংঘের সদস্য। মৌলবাদ ঠেকাতে তারা এক। প্রকৃত মৌলবাদের বিপ্লবের নেতাই হবে, মেসাইয়া, মসীহ ও মাহদী। ওয়াল্লাহু আ'লাম্।

খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর মৃত্যুর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মুস্তাদআফ্ নেতৃত্বের কাঠামোকে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টিয়ে যে

নতুন কালেমা "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" ভিত্তিক বারো খলিফা ও বারো ইমামের বারো ভূতের ঘূর্ণিকল চালু করা হয়, তারই ঘূর্ণিঝড়ে আমরা ১৪১২ বছর যাবত ঘুরপাক খাচ্ছি। এ চক্র হতে বের হলে এমনিতেই কিছুকাল মাথা ঘুরতে থাকে। এ মহা ঘুরপাক Vicious Circle থেকে মানব জাতিকে বের করার প্রয়াস এ বই লেখা। তাই পুনরাবৃত্তি করে চক্রের মূলে আঘাত করতে হচ্ছে।

এ Vicious Circle একমাত্র মহামন্ত্র হলো সূরা মুহাম্মাদের একটি ছোট্ট আয়াত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে ইমানদাররা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের, এবং বরবাদ করো না তোমাদের সকল প্রচেষ্টাকে। (মুহাম্মদ-৩৩) এর দ্ব্যর্থহীন অর্থ হলো, উপরে আল্লাহ্ এবং নীচে রাসূল ব্যতীত তৃতীয় করো আনুগত্য করো না। রাসুল আল্লাহ্র শিখানো কথার বাইরে কিছু বলামাত্রই তাঁর ঘাড়ের রগ কাটা যেতো। তা থেকে রক্ষার কোনো পথ ছিলো না। তাই রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য। مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

তার বাইরে কেউ মুখ ফিরানো মাত্রই তাকে রক্ষা করার তোমার কোনো শক্তি থাকবেনা। (সূরা নিসা-৮০) وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

রাসুলের কথার বাইরে কোন সাহাবী,সে শ্বশুর আবু বকর ও উমর হোক, বা রাসূলের স্ত্রী মা আয়শা হোক অথবা হাফ্‌সা , কারো কোনো কথা শোনা, মানা ও বিশ্বাস করা যাবে না। করা মাত্র সূরা মুহাম্মদের ৩৩ নং আয়াত থেকে খারিজ হতে হবে। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ক্ষমার অযোগ্য কাফের রূপে মৃত্যু হবে। (সূরা মুহাম্মদ-৩৪)

আমার ঈমানী সাক্ষ্যদানের এ পর্যায়ে বুকফাটা দুঃখ হয় যে, যেখানে আবু বকর ও উমরের রাসূল সঃ এ দরবারে বেআদবী আচরণের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র আরশ থেকে চরম কঠোর ভাসায় নাযিল হওয়া সাবধানবাণী সূরা হুজুরাতের প্রথম চার আয়াত, তারপর ১৩ নং আয়াতে তাক্বওয়া ব্যতিত সকল প্রাধান্যের ধারণা নিপাত, সূরা তওবায় গারে সওরে রাসূল সঃ হিজরত কালে বিচলিত ও অস্থির হওয়ায় নাযিল হওয়া "সাকীনা" থেকে ক্বোরআনের ভাষায়, আবু বকরের বাদ পড়া, রাসূল সঃ এর বিদায় হজ্জের ভাষণে আরব অনাবর ও সাদা-কালোর সকল বৈষম্য অবৈধ ঘোষণা, তার পূর্বের বছর আবু বকরের হজ্জের একক নেতৃত্বকে মাঝপথে আলীকে পাঠিয়ে ভাগাভাগি করে দেয়া এবং সর্বশেষ রাসূল সঃ এর অন্তিম শয্যায় উসামাহকে সূরা ক্বাসাসের নির্দেশানুযায়ী সবার উপর আমীর নিযুক্ত করে তার নিয়োগের বিরোধিতা ও প্রতিবাদকারীদের চরম ভাষায় ভর্ৎসনা করে "যারা উসামাহর অভিযানে অংশ গ্রহণ করবেনা, তাদের উপর লা'নত" বলার পরও কি করে আবু বকরের মুখ থেকে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বাক্য বের হলো?!!! কেনোইবা মা আয়শা রাসূল সঃ এর ঘরে খোরপোষের বাড়তি বরাদ্দের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তালাক্বের হুমকির মুখোমুখী হলো? তার পর কেনো না শোধরে মা হাফসাকে নিয়ে একের পর এক, মধুপানের ঘটান, মা যায়নাবের ঘটনা এবং মা মারিয়ার ঘটনা ঘটিয়ে "নূহ ও লূতের" স্ত্রীর সাদৃশ্য অর্জন করতে গেলো, যা, ক্বেয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত হবে?!!

বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ক'জন ছিলো ক্বোরেশীরা? মক্কা জয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ যখন তাঁর শেষ নবী সঃ কে দিয়ে ক্বোরেশদের পরাজিত করে তাদের জাহেলী গর্বকে পদদলিত ঘোষণা করে তাদের তোলাক্বা বলে প্রাণ ভিক্ষা দিলেন, তারপর পুনঃ কেনো ক্বোরেশী মূর্তির পুনর্বাসন? সারা বিশ্বে যখন তাওহীদের পতাকতলে আসার ওয়াদা ও সুসংবাদ আসলো, কাবা যখন ৩৬০টি পাথুরে মূর্তি থেকে পবিত্র হলো, আবু সুফ্‌য়ান ও হিন্দারা প্রাণ ভিক্ষায় প্রাণে রক্ষা পেলো, তখন গোত্রবাদের অদৃশ্য মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেনো? তা শুনে কি আবু সুফ্‌য়ানের মনে তার হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের মৃত আশা পুনর্জীবিত হয়নি? কুফুরীর ইমামতে তো সে-ই শুধু আবু বকরেরই নয়, তার পিতা আবু কোহাফাদেরও অবিসংবাদিত নেতা ছিলো?! রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে যখন মক্কাবাসীর উল্লাস দেখে রাসূল সঃ এর নিয়োজিত গভর্নর ও ইমাম উত্তাব ইব্‌ন উসাইদকে প্রাণ বাঁচাতে আত্মগোপন করতে হয়েছিল, তারপর মক্কার মুর্তাদদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান কেনো চালানো হয়নি? মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জে আবু বকরদের উপস্থিতিতে মসজিদুল হারামের চত্তরে মক্কাবাসী রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকার করছিলো, তা' তারা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পরই তো ভঙ্গ করেছিলো? সূরা তওবার ১২ নং আয়াতে তো আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন, "তারা যদি

অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, তা'হলে কুফুরীর ইমামদের খতম করে দিবে, তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি থাকবে না, যাতে তারা আর কখনো বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি করতে না পারে।" আবু বকর ও উমরের নতুন ক্বোরেশী ইমামত প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহ্র এই আদেশ মক্কার মুর্তাদদের বিরুদ্ধে কেনো কার্যকর হয়নি? আবু বকর ও উমর ক্ষমতায় বসে কেনো আর একবারও নিজেরা জিহাদী অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি? তা তো সম্পূর্ণরূপে রাসূল সঃ এর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ হয়েছে! রাসূল সঃ যখন মৃত্যু শয্যায় উসামাহর নেতৃত্বে সর্ববৃহৎ যুদ্ধাভিযানের ব্যবস্থা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তারপর কেনো আর কখনো উসামাহকে কোনো যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া হয়নি? এর কোনো সদোত্তর আছে কি?

রাসূল সঃ এর নিজ হাতে বাঁধা যুদ্ধের পতাকা নিয়ে উসামাহ অভিযানে গেলে যে অবিস্মরণীয় জয় ও সাফল্য নিয়ে উসামাহ ফিরে, তা কি আর কখনো পরে ঘটেছে? তখনকার পরাশক্তি রোমানরা বিনা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিলো। কারণ তারা উসামাহর অভিযানকে তাওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী রাসূল সঃ এর রিসালাতের প্রমাণ স্বরুপ পেয়েছিলো। কিন্তু রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর ক্বোরেশী-আরবী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে পর রোমানরাও তাদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার যুদ্ধে নেমে পড়ে। কারণ, তারপর তা' আর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিলোনা। নব্য আরব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘাত ছিলো। যেমনটি পরে পারসী বা পারস্য সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংঘাত হয়ে ছিলো। এখানে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাবতে ও বুঝতে হবে। তা'না হলে ঈমান বুঝে আসবেনা। আল্লাহ্র দ্বীন ইসলামে মুহাজির ও আনসার দুটি শ্রেণী বা ভাগের নাম নয়। এটি একটি অবিভাজ্য প্রক্রিয়া মাত্র। এক শ্রেণীর লোক তাগুতী কুফর ও জাহেলিয়্যাত ত্যাগ করতে অনুন্যপায় হয়ে ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এরা সঠিক মুহাজির। এ দেশ ত্যাগী মানুষদের যারা একই বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য গ্রহণ করে আশ্রয় দেয়, তারা আনসার। এ প্রক্রিয়ায় উভয় মুসলিম হয়। মুহাজির ও আনসারের দু'দুটি শ্রেণী হয় না। যারা এ প্রক্রিয়ার পর আলাদা আলাদা পরিচয়ে দুটি পৃথক শ্রেণী সৃষ্টি হয়, বা রয়ে যায়, এরা সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর মুনাফিক মাত্র। মুহাজিরও নয়, আনসারও নয়।

আরো স্পষ্ট ও সহজভাবে বিষয়টি বুঝা ও বুঝানোর জন্য এখানে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একটি মেয়ে কোনো অবস্থাতেই সাবালক হওয়ার পর বাপের বাড়িতে তার বাপ ভাই বা চাচা মামার সাথে যৌন সম্পর্ক করে তার নারী ধর্ম বৈধভাবে পালন করতে সমর্থ হচ্ছে না। তখন তাকে বাপ ভাইর বাড়ি ত্যাগ করে ধর্মীয়ভাবে এক পরপুরুষের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। এ মেয়েটিকে প্রথম কনে বলা হয় এবং পুরুষটিকে বর। পরে এরা কনে-বর একত্র হয়ে স্বামী-স্ত্রী বা দম্পত্তি হয়ে সন্তান জন্ম দেয়। এ সন্তানরা যেমন একটি কনের বা একটি বরের হয়না, বরং এক দম্পতির সন্তান হয়, তেমনি ঈমানী মুহাজির আনসাররা দারুল হিজরাতে একত্র হলে তারপর তাদের সন্তানরা মুহাজির আনসার নামের পৃথক প্রজন্ম হয় না। বর-কনে বিয়ের পরও যদি বর-কনে রয়ে যায়, দম্পতি না হয়, তা'হলে বলতে হবে যে, এরা বিবাহিত দম্পতি নয়, এরা অবৈধ পাশব লিভটুগেদার করছে। এদের উৎপাদিত সন্তানও যার যার, তার তার। এরা মানব জাতির কলঙ্ক।

আরো বলা যেতে পারে যে চিনি এক আলাদা বস্তু, পানি আলাদা বস্তু। পৃথক পৃথক থাকলে এগুলো দু'বস্তু। চিনি এবং পানি একপাত্রে একত্র করা হলে পরস্পর মিশে গিয়ে শরবত হয়। মিশে না গেলে পানিও পানি নয় চিনিও চিনি নয়। বরং উভয়টি বা একটি অন্য বস্তু। তদ্রূপ লবন পানির ব্যাপারটা। মিশে গেলে স্যালাইন। না মিশলে উভয়টি, নয় একটি অখাঁটি। খাঁটি মুহাজির আনসার একত্র হলে দ্বিজাতির অস্তিত্ব চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। রাসূল সঃ আল্লাহর বাণী إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "মুনিনরা শুধু ভাই ভাই" এর ভিত্তিতে তিনি নিজেসহ আনসার মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বাধন করে তাদের একক সত্য ও সত্তায় মিশে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, "ফোক্বারাউল মুহাজিরীন" অর্থাৎ মুস্তাদআফ্ মুহাজির ও আনসাররা একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুস্তাকবির মুহাজিররা আনসারদের সাথে সেভাবে মিশে যায়নি। এতে অন্যায়ের ভাগ তিনি মক্কী মুহাজিরদের মাঝে বেশী লক্ষ্য করেছেন। তাই রাসূলের মৃত্যুরপর আবু বকর ও উমর যা' ঘটিয়েছিলো, সে আশঙ্কা রাসূল সঃ পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন। সেজন্যই তিনি বলেছিলেন যে, যদি পৃথিবীর মানুষেরা এক দিকে যায়, এবং আনসাররা অপরদিকে যায়, তা'হলে তিনি আনসারদের সঙ্গী হবেন। (বোখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন, যদি আমার ভাগে ও ভাগ্যে হিজরত না হতো, তা হলে আমি একজন আনসার হতাম।

হিজরত করা সহজ কাজ। কারণ, হিজরতের পবিত্র নামের ফাঁকে বহু ধান্ধাবাজ ও ভাগ্যান্বেষীও দেশ ত্যাগ করে মুহাজিরদের কাফেলায় গিয়ে স্থান নেয়। যেমন বর্তমানে কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত লোকদের সাথে প্রতারক ও ভূয়া উদ্বাস্তুরা ভীড় জমায়। প্রথমে এদের বুঝা ও চেনা যায় না। সময় গেলে এদের আসল রূপ প্রকাশ পায়। তাদের নির্লজ্জ আচরণে খাঁটি মুহাজির ও উদ্বাস্তুরা তাদের সাথে অধিকাংশ সময়ে পেরে উঠে না। কারণ প্রকৃত মুহাজিরশ্রেণী নিষ্ঠাবান ও আদর্শবাদী হয়। কিন্তু ভাগ্যান্বেষীরা নির্লজ্জ হয়, বর্ণচোরা হয়।

মুহাজির হওয়ার চেয়ে আনসার হওয়া বহু কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ, মুহাজিরদের আশ্রয় ও অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করেই আনসারদের দায়িত্ব শেষ হয় না। যে কারণে মুহাজিররা দেশ ত্যাগ করে, তাদের শক্তিশালী শত্রুদের শত্রুতার প্রধান লক্ষ্য বস্তু হয় আনসার বা আশ্রয়দাতারা। আগ্রাসন, আক্রমণ ও চক্রান্তের মূল শিকার হয় তারা। রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তাঁর লাশ মুবারক তিন দিন দু'রাত বিনা দাফনে ফেলে রেখে নতুন কালেমা, "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে ক্বোরেশী মুহাজিররা প্রথমে উম্মতকে দু'টুকরা করে। তারপর তারা প্রথমে "তোমরা আমরা" এবং পরে "আমরা আমীর, তোমরা উযীর" বলে সত্যিকারে রাসূল সঃ এর দাফনের পূর্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাকেই দাফন করেছে। এতে মাদীনার আনসাররা ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় মুক হয়ে যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল রচিত হায়াতু মুহাম্মাদ, আবু বকর, ইমাম ইব্‌ন্ কুতাইবার আল ইমামাহ্ ওয়াসসিয়াসাহ্ প্রভৃতি দেখো)।

বিনা জানাযায় রাসূলের দাফন হয়। অপকর্ম ঢাকার জন্য মিথ্যার পাহাড় দাঁড় করা হয়। তন্মধ্যে পাষন্ডরা বলে, রাসূলের জানাযা আবার কে পড়াবে? তাই যে যার মতো একা একা জানাযা পড়েছে! হলো কথাটা? রাসূল সঃ মদীনায় দীর্ঘ দশ বছর মু'মিনদের জানাযা পড়েছেন, এবং বলেছেন, صلوا كما رأيتموني أُصلي তোমরা , আমি যেভাবে সালাত আদায় করি, সে ভাবে সালাত আদায় করো"। অথবা "তোমরা যেরূপ আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো, সেভাবে তোমরা সালাত আদায় করো।" যারা আবু বকরকে রাসূল সঃ এর বানানো খলীফা প্রমাণ করণার্থে মিথ্যা দাঁড় করেছে যে রাসূল সঃ সপ্তাহ কাল আবু বকরের ইমামতীতে সালাত আদায় করেছেন, তারা কেনো আবু বকরের দ্বারা রাসূল সঃ এর জানাযার অনুষ্ঠান করিয়ে দু'চারটি হাদিস দাঁড় করাতে ব্যর্থ হলো? তাতে তেমন কী দোষ বা আপত্তি ছিলো? তার কারণ হলো মহাসত্য যে, "মিথ্যা যতো সুচতুরতার সাথেই দাঁড় করানো হোক না কেনো, তার ফাঁকেই মিথ্যার মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ লুকিয়ে থাকে।"

আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের কালেমা শুনেই আবু সুফ্য়ান ও মুয়াবিয়া মরুনেক্‌ড়েদের জিহ্বায় পুনঃ পানি এসে যায়। বনু উমাইয়ার উসমান ইবন আফ্‌ফান ক্ষমতায় বসলে তো সে লালা ভাষা হয়ে ফুঠে উঠে। সুদের ব্যবসায়ী বন্ধু ও তার স্ত্রীর প্রণয়ী আব্বাসের চক্রান্তে, সে পরাজয়ের পর নতুন ব্যবসায় পার্টনার হয়েছিলো আব্বাসের সাথে। সে ভেবে ছিলো হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সঃ পরাজয়ের মাধ্যমে তাদের যৌথ ব্যবসা পুনঃ হাতে আসবে। তা হয়ে হয়েও হলো না। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও তাঁর খাঁটি মু'মিন সঙ্গীদের উপর বিশেষ সাকীনাহ্ নাযিল করে সে যাত্রা রাসূলের বিজয়কে সুসংহত করে দেন।

উমরের পর উসমান যখন রাজা হলো, তখন বনু উমাইয়ার লোকেরা তার দরবারে ভীড় জমালো। রাজারা স্বয়ং যুদ্ধে যায় না। উযীর নাযির ও সৈন্য সামন্তদের ময়দানে পাঠায়। রাজা মারা গেলে রাজ্য কি করে থাকবে!? রাসূল সঃ ইমামুল মুজাহিদীন ছিলেন। তাই তিনি খোদ দশ বছরে ২৪টি যুদ্ধে গিয়ে নিজে তা পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদরা মৃত্যুর মাধ্যমে শাহাদতকামী হয়। তাই মৃত্যু তাদের কাম্য। ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতারা নিজেরা যুদ্ধে না গিয়েই প্রমাণ করেছে যে, তারা আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অনুসারী নয়। রাসূল সঃ আল্লাহ্‌র দ্বীনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তের সম্পর্ক কেটে আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় হিজরত ও জিহাদ করেছেন। ক্বোরেশী আরবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পার্থিব হিজরত ও ঈমানকে এমন শক্ত হাতে ব্যবহার করেছে যে, তাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য পৃথিবীতে টিকে থাকাকালীন শেষ দিন পর্যন্ত অক্বোরেশী কোনো ব্যক্তি এক দিনের জন্যও খেলাফতে বসতে পারেনি। এভাবে তারা ক্বোরআনে বর্ণিত তাক্বওয়ার মানদন্ডকে নির্মূল করে ছিলো। আর ক্বোরেশ বংশে জন্মানো রাসূল সঃ আল্লাহ্‌র নিয়োজিত আল্লাহ্‌র দাসী বারাকার দ্বারা পালিত হয়ে, ছিন্তাই করে হাটে বেচা দাস যায়দ সিদ্দিককে দিয়ে মওতায় শাহাদতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যায়দ ও বারাকাহর মুস্তাআফ্ যুবক সন্তান উসামাহকে দিয়ে

তাঁর "উস্ওয়ায়ে হাসানা" বা নবুওতী আদর্শের মোহর মেরে সত্যের পর বিপথ গমন ব্যতীত কী থাকে? (ইউনুস-৩২)। فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ বিদায় নেন ।

উমাইয়া রাজত্বের স্থপতি উসমানের বায়আতের অনুষ্ঠান শেষে উমাইয়াদের ঘরোয়া দরবার বসে। তাতে আবু সুফইয়ান এসেই দাঁড়িয়ে বলে, "হে বনি উমাইয়ার লোকেরা, খেলাফত বনী তাইম ও বনী আদিতে যাওয়া দেখেই আমি তাতে প্রলুব্ধ হয়েছি। এবার তো তা' তোমাদের ঘরে এসেছে। তোমরা তা' তোমাদের মধ্যে এভাবে গিলে ফেলো, যেভাবে একটি শিশু ছোট্ট গোলক গিলে ফেলে। আল্লাহ্‌র শপথ! এটা ছাড়া বেহেশ্‌ত দোজখ বলে
কিছু নেই।" ভর বাজারে গোমর ফাঁক দেখে উস্‌মান, আবু সুফায়ানকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠে।

قم عنى، فعل الله بك و فعل

উঠ এখান থেকে, আল্লাহ্ তোমাকে যা'তা করুক। (আল্ আগানী, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা-৩৫৪)।

উমাইয়াদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ফলে আবু যার গিফারীকে নির্বাসিত হয়ে মরুভূমিতে একা একা মৃত্যু বরণ করতে হয়। এ নির্লজ্জ বর্বরতাকে সুগার-কোটেড করার জন্য বহু হাদীস বানানো হয়। অথচ রাসূলের মুতাওয়াতির সাক্ষ্য রয়েছে আবু যার সম্পর্কে, "পৃথিবীর পৃষ্ঠে পদচারণাকারীদের মাঝে এবং বৃক্ষরাজির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মাঝে আবু যারের চেয়ে কোনো সত্যবাদী নেই, হবে না।"

আরেকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মুহাজির আনসারদের ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করে আমরা বুঝতে পারি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো দ্বিতীয় মাদীনার দাবি তুলে। ইসলাম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান রাসূল সঃ এর মাদীনার ইশতিহার পুনরুজ্জীবিত করবে। তাই হিন্দুপ্রধান ভারত থেকে মুহাজিররা পাকিস্তানে হিজরত করে আসলো। তদানিন্তন পূর্ব বাংলা, সিন্দু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা আনসার হয়ে মুহাজিরদের গ্রহন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মৌখিক আদর্শ ও বাস্তবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ ও মুহাম্মাদ আলী জিন্নার মাঝে যতোটুকু পার্থক্য, তার চেয়ে বেশি পার্থক্য হলেও উক্ত প্রদেশ সমূহের সাধারণ লোকেরা ১৯৪৭ সালে বহু ক্ষেত্রে ১৪২২ বছর পূর্বের মুহাজির আনসারের ঘটনার পুণরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলো। কিন্তু আসল মুহাজিরদের সাথে ভাগ্যান্বেষী উদ্বাস্তুরাই সংখ্যাগরিষ্ট ছিলো। মিথ্যা মুহাজিরদের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারে আনসাররা কিছু দিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মিথ্যা মুহাজিররা নতুন পাকিস্তানে অধিকাংশ চাকুরী ও ব্যবসা দখল করে নিয়ে, প্রদেশসমূহের মূল বাসিন্দাদের উপর কুশাসন ও শোষণের যাতাকল চালায়। ফলে ভুয়া মুহাজিরদের শত্রুতায় আনসাররা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল আদর্শ ইসলামকেও ভুয়া মনে করতে বাধ্য হয়। পরিণামে পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাঙ্গালী পাঞ্জাবী-বিরোধ সৃষ্টির উৎসেও এ স্বার্থান্বেষী বিহার ইউপির প্রবঞ্চক মুহাজির চক্র। এদেশে এসে এরা ক্বোরেশী, হাশেমী, সাইয়েদ, সিদ্দিকী ও ফারুক্বী প্রভৃতি তাদের নামের আগে-পিছে লাগায়। মূলে যে এরা আবু সুফ্য়ান, মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াহুদীদেরই প্রেতাত্মা ছিলো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ উদ্বাস্তুরা নুতন রাষ্ট্রে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়। পরে বৈষম্য দূর করণের দাবী উঠলে ওদের অনেকে পূর্বের হাস্যস্কর প্রাচুর্য্যের গল্প বলতো। কেউ কেউ নাকি এমনও বলতো যে, দেশ বিভাগ ও হিজরতের পূর্বে ভারতে তাদের বহু সম্পদ ও এমন জমিদারী ছিলো যে তিন একরের পুদিনা ক্ষেত ছিলো। বড়ো বড়ো পুকুর ও দিঘি ছিলো যে, তার কোনো কোনোটায় হেলেশ মাছ্লীও (ইলিশ মাছ) ছিলো! এদের নির্লজ্জ আস্ফালনে প্রকৃত মুহাজির ও আনসাররা হারিয়ে যায়, যেমনটি মূল মাদীনায় ঘটেছিল। পাকিস্তান এক দিনের জন্যও কাঙ্খিত পাকিস্তান না হওয়ায় এদের ষড়যন্ত্র কার্যকর ভাবে দায়ী ছিলো।

ভেঙ্গে যাওয়া পাকিস্তানের মুহাজির প্রধান করাচী ও হায়দারাবাদের বিহারীরা প্রথমে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জামাতে ইসলামীকে ব্যবহার করে। মূলতঃ জামাতে ইসলামের নামসর্বস্ব ইসলামের সাথেও এ মুহাজির ক্বওমের (?) কোনো আদর্শিক মিল ছিলোনা। পরে যখন সিন্ধিদের সাথে স্বার্থের সংঘাত বাধঁলো, তখন তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে স্বীয় মূর্তির রূপ ধারণ করে এবং জামাতে ইসলামীকে ছুড়ে ফেলে দেয়। বর্তমানে আলতাফ হোসেন নামে যে লোকটি পাকিস্তানী মুহাজিরদের নেতা, এবং লন্ডনে নির্বাসনে থেকে পাকিস্তানে হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব করছে, এটি উপ মহাদেশে মুহাজির নামের সর্বশেষ উলঙ্গ কুলাঙ্গার। সর্ব সম্প্রতি আলতাফ হোসেন ভারতের সাথে মিলে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে পৃথক করে করাচী ও বেলুচিস্তানের সমুদ্রতীরে হংকং ও সিঙ্গাপুরের ধাঁচে বিলাসপুরী গড়ার বুলি আওড়াচ্ছে। এ

জাতের মুহাজিরদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে ভবিষ্যতের ইসলামী বিশ্বয়নের কথা ভাবতে হবে। তা'না হলে ১৪১২ বছর পূর্বে মাদীনায় যা'ঘটে ছিলো, তা'পুনঃ ঘটবে।

আদম সন্তান মানবজাতি তার উৎস থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতই থাকবে। তার জীবনে রহমান ও শয়তানের টানাপোড়েন থাকবেই। ঈমানদার হয়ে মুস্তাদআফ নবীদের কাতারে শামিল হলে তার জীবন সফল। ঈমান হারিয়ে ইবলিসের দলের হলে মুস্তাকবিরদের পরিণাম ক্রয় করবে।

ঈমানহীন মানব জাতি শয়তানের শিকার, খাদ্য। একমাত্র দৃঢ় ঈমানই তার রক্ষার দূর্গ। ঈমানে আমলে ঢিল পড়লেই শয়তানের জন্য তার দুয়ার খুলে যায়। তখন তার ঘর হয় শয়তানের ঘর, স্ত্রী সন্তান, পরিবার, শয়তানের সংসার!

নিঃশর্ত আনুগত্যহীন ঈমান, দেয়ালহীন ঘরের মতো। নিঃশর্ততা মানুষকে নিঃস্বার্থতা দান করে। স্বার্থ আস্লে যাদের ঈমান টল্টলায়মান হয়, তারা মানুষ হয়েও পশুর অধম। জাহান্নাম এদের ঠিকানা। মানুষকে দৃঢ় ঈমান দিয়ে তার বর্তমান ভিত্ গড়তে ও ভবিষ্যত পরিণাম নিশ্চিত করতে হবে। এর নামই তাক্বদীর। নবী, রাসূল ও ইমাম মানুষকে ডাক দেয়ার অধিকার রাখে। কারো তাক্বদীর বা ভাগ্য গড়া ও বদলানো রাসূল সঃ এরও আওতাধীন ছিলোনা। কোনো কোনো সাহাবী দূরে থাক, তাঁর প্রিয়তমা তনয়া ফাতিমাকেও তিনি উদ্ধার করতে অপারগতা ঘোষণা করে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে বলেছেন ঃ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

মানুষকে যখনই আমি অনুগ্রহ করি, সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ম্বর হয়ে আমা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ অকৃতজ্ঞতার জন্য যখন তাদের বিপদ স্পর্শ করে, তখন তারা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। হে রাসূল, বলে দাও যে প্রত্যেকেই তার পাত্র অনুযায়ী আমল করে। স্মরণ রাখবে, কারা সঠিক পথে চলো, তোমাদের প্রতিপালক তার পাকা খবর রাখেন। (সূরা বনী ইস্রাঈল-৮৩,৮৪)।

এর পূর্বের আয়াতে ক্বোরআনকে ঈমানদারদের সর্বরোগের মহৌষধ বলে তাকে আবার ক্বোরআন ত্যাগকারীদের জন্য সর্বনাশা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরতের পূর্বে হিজরতের প্রস্তুতি স্বরূপ খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর উপর এ সূরা নাযিল হয়। সূরা মে'রাজ এর অপর নাম।

ক্বোরেশী হওয়া সত্বেও যদি ক্বোরেশে জন্মানো রাসূল সঃ এর অনুসরণে আবু বকর, উমর ও তাদের কন্যা মা আয়শা ও হাফ্সা রাসূল সঃ এর মুস্তাদআফ অনুসারীদের মতো রাসূলের অনুগত হতো,কতইনা উত্তম আদর্শ হতো! তাদের আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বহু আয়াত ও দীর্ঘ সূরা নাযিল হয়। অথচ মুস্তাদআফদের বিরুদ্ধে একটি আয়াতও নাযিল হয়নি। বরং রাসূল সঃ কখনো মুস্তাদআফদের উপর থেকে সাময়িকভাবে দৃষ্টি সরিয়ে মুস্তাকবিরদের প্রতি মনোযোগ দেয়া মাত্রই একাধিকবার স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে তিরস্কার করেছেন। তাওহীদ ও তাক্বওয়ার মানদন্ডের পর "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" নিশ্চিত রূপে আত্মঘাতি বাক্য। নাউযুবিল্লাহ। এ কথার কোনো বৈধতা যদি ইসলামে থাকতো, আর রাসূল সঃ যদি তা' মক্কায় ঘোষণা দিতেন, তা হলে রাসূল সঃ এর মক্কা থেকে হিজরত করার কোনো দরকার হতোনা। আবু জেহল, আবু সুফ্ইয়ান ও আবু লাহবরা যখন শুনতো যে তাদের ভাতিজা মুহাম্মাদের নতুন দ্বীন বিশ্বে ক্বোরেশ বংশের একক নেতৃত্ব নিয়ে নাযিল হয়েছে, তা'হলে নিশ্চিতরূপে আবু জেহল, আবু তালেব, আবু সুফইয়ান ও আবু লাহ্ব সবার পূর্বে সে কালেমা পড়ে প্রথম চার সাহাবীর স্থান দখল করতো। ক্বোরেশের গুরুত্বহীন শাখা, বনী তাইম ও বনী আদির আবু বকর ও উমর সে প্রতিযোগীতায় অনেক পেছনে পড়ে যেতো। মুস্তাকবির আবু জেহ্ল ও আবু সুফ্ইয়ানদের রিসালাতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রধান কারণই ছিলো, মুহাম্মাদ কেনো যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইবন্ মাসউদ্ ও সুহাইবদের মতো মুস্তাদআফ্দের তাদের সমান মর্যাদায় আসীন হওয়ার কথা বলছে?! তারা কল্পনাই করতে পারে নি যে পৃথিবীতে মুস্তাদআফদের ইমামত প্রতিষ্ঠার অপর নামই ইসলাম। এ রিসালাত নিয়েই নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা এবং সকল নবীরা পূর্বে প্রেরীত হয়ে ছিলেন।

অথবা এ কথা যদি প্রচারিত হতো যে মক্কায় এক নতুন নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন যিনি বলেন যে তাঁর রিসালাত ক্বায়েম হলে পর বিশ্ব একক ক্বোরেশের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তা হলে মাদীনার লোকেরা মক্কা এসে এ নবীর দ্বীন কখনো গ্রহণ করতো না, এবং আক্বাবায়ে ঊলা ও সানীর মতো কোনো ঘটনার কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হতো না। কারণ, মাদীনায় পূর্বে থেকেই গোত্রবাদী বৈষম্যের ইয়াহুদীরা ও তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইব্ন্ উবাই সিংহাসন তৈরী করে পূর্ব

থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলো। মক্কা থেকে ক্বোরেশী আবদুল্লাহর মেষপালক এতীম ছেলে মুহাম্মাদকে আমদানী করার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতো না ।

গাত্র ও গোষ্ঠির স্বার্থের দাবী এমন বিষ, যা দাবিদারদের শয়তানের কাতারে দাঁড় করিয়ে তাদের পতন অনিবার্য করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ভাবতে পারি যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সরকার চলছে। এ সরকার অনৈসলামী দলীয় হলেও ঐক্যমত্বের ছাপ দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে দু'দলের দু'ব্যক্তি আনওয়ার হোসেন ও আব্দুর রবকে মন্ত্রী সভায় নিয়েছে। তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগে তার ও তার দলের বিরূদ্ধে আন্দোলন চলছে। এখন যদি এমন হয় যে, শেখ হাসিনা ঘোষণা করে যে তার বাবা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। এদেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তার বাবা, মা ও ভাইরা জীবন দিয়েছে। তাই এখন থেকে বাংলাদেশে শুধু তার বংশের লোকেরাই রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হবে। তা'হলে এ সরকার ক'দিন টিকবে? এক সপ্তাহের বেশি আয়ু কল্পনা করা যায়? বাকশাল করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ফল কী হয়েছিলো?

তাওহীদ ও তাক্বওয়ার সাম্যের দ্বীনের শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ এর উপর নাযিল হওয়া ক্বোরআন, রাসূলের জীবন, তাঁর আচরণ এবং বিদায় হজ্জে তার ভাষণের উপর যাদের ঈমান আছে, তারা কখনো কি ভাবতে, মানতে ও বিশ্বাস করতে পারে যে, তাঁর সংগ্রামের ফল হবে ক্বোরেশ গোত্রের ইমামত ও কামড়ে খাওয়া উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদ?

কিন্তু হাজার দুঃখ হলেও সত্যে যে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আবু বকরের মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্য "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর উপর ভিত্তি করেই আবু বকর খলিফা হয়, তারপর উমর, তার পর উসমান, তারপর মুয়াবিয়া, তারপর ইয়াযীদ, তারপর মারওয়ান এবং তারপর বাগদাদে হালাকু খানের হাতে নির্মূল হওয়া ক্বোরেশরাই। আলী খলিফা হয়নি। তার হাতে আয়শা, হাফ্সা, তালহা ও যুবাইর কেউ বায়আত হয়নি। দীর্ঘ ষাট বছর পর্যন্ত ক্বোরেশ শাসিত মুসলিম বিশ্বে জুমা, ঈদ ও হজ্জের খুৎবায় আলীকে সরকারী ভাবে গালী দেয়া হয়েছে। ষাট বছরের মাথায় উমর ইবন্ আব্দুল আযীয এসে খুৎবা থেকে তা বাদ দেয়। যাকে খলিফা ও ইমামরা মস্জিদে মস্জিদে সপ্তাহে একবার গালি দিয়েছে, মুসল্লীরা তা শুনে সে ইমামদের পিছনে নামায আদায় করেছে, সে কী খলীফাতুল মুসলিমীন ছিলো? এগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে যারা আজো ঈমান ও ইসলামের নামে মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়, তাদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। বাবা আদম থেকে মুহাম্মাদ সঃ পর্যন্ত প্রচারিত, পালিত ও প্রদর্শিত ইসলামের বিজয় তুফান আসছে। "উপরে তাওহীদ, নিচে রিসালাত" এ পতাকাবাহীদের দ্বীন ইসলাম। রাসূলের নিচে সাহাবী ও তাবেঈদের তাবেদারীর ধর্ম ইসলাম নয়। তা শ্রেণী পূজা। জাহিলিয়্যাত।

এখানে একটি ঘটনা বলা যেতে পারে। আমি ব্যবসায়ী কাজে বোম্বেতে ছিলাম। তখন দেওবন্দের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিলো। তদানিন্তন দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহ্তামিম ক্বারী তৈয়ব সাহেব তখন বোম্বেতে শেঠদের নিকট থেকে দান খয়রাত গ্রহণের জন্য এসেছিলো। তার বাসস্থান ছিলো সিলেটের মাস্টার আজীজুল হকের গদিতে। মাস্টার সাহেব আমারও ব্যবসায়ী বন্ধু। তাই মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেবের সাথে প্রায় ঘনিষ্ঠ সাক্ষাত হতো। একত্র খাওয়া দাওয়াও হতো। একবার সাহাবাদের ব্যাপারে কথা উঠলো। আমি স্পষ্ট আমার মতামত ব্যক্ত করলাম। আমার কথা শুনে শান্ত প্রকৃতির ক্বারী তৈয়ব সাহেবও একটু গরম হয়ে গেলো। তার সাথে তার লোটা ও কেটলীবরদার কিছু অল্প বয়স্ক দেওবন্দী মৌলবীরা তো অগ্নিশর্মা?

আমার পড়ালেখা ও জানাশুনা যে প্রচলিত মৌলবী মোল্লাদের মতো ধার করা ছিলোনা, মৌলিক ছিলো, তা তৈয়ব সাহেব টের পেয়ে আমার কথার বেশ গুরুত্ব দিতো। কিন্তু সাহাবাদের ব্যাপারে আমার মন্তব্যে দেওবন্দের মুহ্তামিম্ সাহেব তার পোষাকে একটু বেশিই ফুলে উঠেছিলো। সকালকার নাশতার মজলিস ছিলো। তাতে মাস্টার আজিজুল হকও ছিলো। ক্বারী সাহেব একটু ঝাঁজালো ভাবে আমাকে বলতে চাইলো যে সাহাবাদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ ছিলো পিতা মাতার ঝগড়ার মতো। আমরা নাকি সাহাবাদের সন্তানদের ন্যায়। তাই পিতা মাতার ঝগড়ায় সন্তানদের জড়ানো অনভিপ্রেত। আমি ক্বারী তৈয়ব সাহেবকে ঝাপটে ধরলাম। আমি শক্ত ভাষায় বললাম যে ক্বারী সাহেব যে ক্বোরআন পড়ে, তা সে বুঝে পড়ে কিনা? উত্তরে বললো যে বুঝেই পড়ে। আমি বললাম যে ক্বোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন যে নবী সঃ মুমিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীরা মুমিনদের মাতা স্বরূপ। তাই নবীর কথা মানতে হবে। নবীর স্ত্রীদের মু'মিনরা কখনো বিয়ে করতে পারবে না। তারা মাতৃতুল্য বলে। কিন্তু সাহাবারা পিতা নয়। তাদের স্ত্রীরাও মা নয়। সাহাবীরা মরলে বা স্ত্রীদের তালাক দিলে আমরা তাদের বিয়ে করে সন্তানের মা বানাতে পারতাম।

সাহাবীরা ভাই, শালা ও সম্বন্ধীর ন্যায়, এবং তাদের স্ত্রীরা, স্ত্রী, জেঠশ ও শালীদের ন্যায় বই কিছু নয়। আমার স্পষ্ট ক্বোরআনী দলিল ও যুক্তিতে ক্বারী তৈয়ব সাহেবের রাগের বেলুন পুচকে গেলো। বুদ্ধিমান মাস্টার সাহেব হেসে বললো, হযরতজ্বী "ইয়ে গুন্ডা মাওলানা হায়" মাস্টার সাহেবের কথা শুনে ক্বারী সাহেবও হেসে দিলো। "গুন্ডা" শব্দে আমি আপত্তি জানালে মাস্টার সাহেব অট্টহাসি দিয়ে বললো, ভাই আমি আসামের নিকটের লোক। আসামীরা যে কোনো বড়ো জিনিস ও বড়ো ব্যক্তিকে গুন্ডা বলে। শুনে আমিও হাসলাম। এ মজলিসেই তৈয়ব সাহেব আমাকে দেওবন্দের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে দাওয়াত দিলো। আমি তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম।

এর এক দুদিন পর মসজিদুল হারামের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন্ সুবাইয়েল দেওবন্দের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বোম্বে আসে। শেখ সুবাইয়েলও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসম ছিলো। বোম্বের ওবেরয় শেরাটনে তৈয়ব সাহেব শেখ সুবাইয়েলকে সাহাবী সম্পর্কে সাহাবীদের ব্যাপারে আমার মতামত বললে সেখানেও এনিয়ে মজাদার আলাপ হয়। এবং আমার উপস্থিত উত্তর নিয়ে হাসা হাসিও হয়।

তখনই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে দেওবন্দের অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধী ও জগজীবন রাম আসবে। ইন্দিরাজ্বী দেওবন্দীদের জশন, অর্থাৎ উৎসবের উদ্বোধন করবে। এ সংবাদ পত্রিকায় পড়ে দুপুরে খাওয়ার সময় মাস্টার সাহেবের বাসায় ক্বারী তৈয়ব সাহেবকে বললাম যে আমি দেওবন্দের উৎসবে যাবোনা। কারণ জানতে চাইলে বললাম যে ঈমানের প্রশ্ন জেগেছে। কী ভাবে, জানতে চাইলে আমি বললাম যে, না যাওয়ার পক্ষে অহী নাযিল হয়েছে। আমার কথায় আশ্চর্য হয়ে ক্বারী সাহেব বলে উঠলো, "সান্জিদা বাত করনে ওয়ালা আদমী ফের ইয়ে কেয়সী বাহ্কী বাত কর রাহে হেঁ? কেয়া ফেরসে অহী নাযিল হোনে লাগি?" অর্থাৎ যুক্তি পূর্ণ কথা বলার লোক আবার এ খাপছাড়া কথা কি বলছে? নুতন করে অহী নাযিল হয় কি ভাবে? আমি বলেছিলাম যে রাসূল সঃ কে অহীর জন্য অপেক্ষা করতে হতো। তেইশ বছর ধরে তাঁর উপর অহী নাযিল হয়ে তা পূর্ণ হয়েছে। তাঁর উসিলায় আমাকে অহী পেতে মোটেও অপেক্ষা করতে হয় না। শুধু ঈমানের সাথে ক্বোরআনে হাত দিলেই আমি অহী পাই। তিরিশ পারা অহী সব সময় আমার হাতের কাছে মৌজুদ থাকে। আমি তাকে সূরা নিসার ৬০ নং আয়াত পড়ে শোনালাম। যার স্পষ্ট অর্থ হলো, হে রাসূল, তুমি কি ওদের দেখছোনা, যারা মূল অর্থে ঈমানদার না হয়েও নিজেদের মনে করে যে তারা তোমার উপর ও তোমার পূর্বের নবীদের উপর নাযিল হওয়া কিতাবের উপর ঈমান এনেছে? তারা তাগুতের দুয়ারে বিচার প্রার্থী হচ্ছে, অথচ তাগুতকে অস্বীকার করতে তারা আদিষ্ট! শয়তান ওদের বিপথে এতো দূরে ঠেলে দিতে চায়, যেখান থেকে তাদের ফেরত আসা অসম্ভব হয়ে যায়!

আল্লাহ্ এ ধরনের লোকদের তাদের সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা করুন। সেদিন মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেব কেঁদে ফেলেছিলো। আমি যখন বলেছিলাম যে ইন্দিরা গান্ধি ও জগজীবন রাম কি তাগুত কি না? উত্তরে মাওলানা শুধু বলেছিলো, "বস্ কিজিয়ে, ইত্মামে হুজ্জত হো গিয়া।" আমাদের দেশের দেওবন্দী মৌলবীদের সত্যকে এভাবে মেনে নেয়ার যোগ্যতা কি আছে? আমার মায়ের দাদা মৌলবী আব্দুল্লাহ নোয়াখালভী দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতা ৪র্থ ছাত্র। আমার দাদা মৌলবী আব্দুল হামিদ মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহীর সে ছাত্র, যার সাথে শেষ কথা বলে গাংগুহী দুন্ইয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আশরাফ্ আলী থানবী আমার দাদার সহপাঠি সুহৃদ বন্ধু ছিলো।

বাবা আদম আঃ আমাদের সকলের বাপ। তাঁর স্ত্রী মা হাওয়া আমাদের মা। হযরত নূহ দ্বিতীয় আদম রূপে আমাদের পিতা। হযরত ইব্রাহীম আঃ মুসলিম জাতির আদর্শ পিতা। শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃও আমাদের পিতাসম। তাই তাঁদের স্ত্রীরা আমাদের মা। মায়েদের আমরা মাতৃত্ব থেকে বাদ দিতে পারবোনা। তবে পিতা-মাতার বিবাদে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে আমরা পক্ষ বিপক্ষ হতে পারবো। চার মা আছে। দু মা ঝগড়াঝাটি করে সংসারকে কুরুক্ষেত্র করে রাখে। দু'মা সংসারকে শান্তিরনীড় বানায়। উভয় কখনো সমান নয়। আমার বাবার বাড়ি, আমার বাবার। বাবার বাড়ি আমার ও বাবার বাড়ি। এ বাড়ি আমার মায়ের স্বামীর বাড়ি। মায়ের বাপের বাড়ি নয়। বাপের বাড়ি ছেড়ে মা স্বামীর বাড়ি এসেছে। সংযত ও শালীন হলে এ বাড়ি মার স্বামীর, তার সন্তানদের এবং তারও বাড়ি বটে। তালাক হলে তাকে চলে যেতে হয়। স্বামীর বাড়িকে তার বাপের বাড়ি মনে করা চলবেনা। এ সত্য মনে রাখতে ও বুঝতে হবে । নবী রাসূল বাদে তাঁদের অনুসারীরা, নর নারী মিলে দ্বীনী ভাই-বোন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (সূরা হুজুরাত-১০) এদের মধ্যে বিয়ে শাদী হয়। তাই কেউ ভাই, কেউ দুলা ভাই, কেউ সম্বন্ধি ও কেউ শালা। মেয়েরা কেউ বোন, কেউ ভাবী, কেউ শালী। তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিবাদ হলে অবশ্যই তার বিচার করে মিটমাট

করতে হবে। তা' আল্লাহর হুকুম। তা'হলে সমাজ রহমতের হয়। তাদের মধ্যে বিচার বিবেচনা না হলে তা আল্লাহ্‌র গযব ডেকে আনে। সাহাবীরা ভাই ছিলো। তাদের ভালো মন্দের বিচার হতেই হবে। তা না হলে তারা বাপদের উপরে উঠতে চায় কখনো। যেমন "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর ভাইরা বাবা রাসূলুল্লাহর উপরে উঠে আল্লাহ্‌র নে'মতকে বদলিয়ে উম্মতকে জাহান্নামের কিনারায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا (সূরা ইব্রাহীম-২৮,২৯)

আমাদের ঠিক এ মূহুর্তে এবাউট টার্ন করতে হবে। তা না হলে জাহান্নাম।

ক্বারী তৈয়ব সাহেব আমাকে বলেছিলো, "আপনি ক্বোরআনের আয়াত এতো গুছানো কেমন করে পান?" উত্তরে বলেছিলাম যে আমি দাওরায়ে হাদীসের চেয়ে বেশি দাওরায়ে ক্বোরআন করি। আপনারা দাওরায়ে হাদীস করে প্রকৃত অর্থে দাওরায়ে ক্বোরআনের পথ রুদ্ধ করেছেন। তাই আপনারা হাদীস পান পূর্বে, এবং ক্বোরআন পেলেও অনেক পরে পান। মাদ্রাসায় দাওরায়ে ক্বোরআন চালু করুন। তা'হলে ক্বোরআন আপনাদের প্রাণশক্তি "রবিউল্ ক্বালব" হবে। পরে দেখা গেলো যে ইন্দিরা গান্ধি দেওবন্দীদের জশনে এসে তাদের আশীর্বাদ করেছে এবং ক্বারী মাওলানা তৈয়ব সাহেবের ছেলে সালেম মিয়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে "ইন্দিরা জ্বী যিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়েছে।

আল হামদু লিল্লাহ্। সাহাবীদের আল্লাহ্‌র কালাম দিয়ে বাপের ভুল পদ-মর্যাদা থেকে ভাইয়ের মর্যাদায় আনা হয়েছে। এবার আরেকটি মারাত্মক শয়তানী যুক্তিকে খন্ডাতে যাচ্ছি। যদিও এ যাবত কেউ আমাকে বলেনি, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি যে কোনো কোনো নির্বোধ অথবা শয়তানে ভর করা আদমী না কি বলে যে, আবু বকর, উমর, ওসমানরা এবং তাদের উত্তরসূরী সাহাবীরা যে সমস্ত ভুল করেছে, সে গুলো নাকি স্বয়ং আল্লাহ্ই তা' করিয়েছেন, যাতে পরবর্তীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে সক্ষম হয়। বাহ্‌বা। এ যে ক্বেয়ামতের দ্বীন ইবলিসের মামলা খালাস করার মোক্ষম ওকালতী! সেদিন ইবলিস কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলবে, বিচারপতি! ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর মতো আপনি আমাকে দিয়ে প্রথম বেআদবী ও বদ্‌তামিযী করিয়ে বনী আদমকে তা থেকে শিক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার কোনো দোষ ছিলোনা। আমাকে বেকসূর খালাস দিন। তখন কি হবে?

আসল কথা হলো كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের দ্বারা আল্লাহ্‌র বিচারে দায় বদ্ধ। (সূরা তূর-২১, সূরা মুদ্দাস্‌সির-৩৮) প্রত্যেককেই তার মন্দ কাজের দায়বদ্ধতা থেকে ভালো কাজের মুদ্রার বিনিময়ে মুক্তিপত্র ক্রয় করতে হবে। নবী রাসূল ব্যতীত এ থেকে কারো রেহাই নেই। কারণ তাঁরা মানুষরূপে কোনো ভুল করা মাত্রই আল্লাহ্ তা' তাৎক্ষনিক পৃথিবীতেই শোধরে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল, কিতাব ও অহীর শিক্ষা দিয়ে মানুষকে পথ দেখান। কাকেও দিয়ে পাপ করিয়ে পাপের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে পথ দেখান না। তা যুল্‌ম। আর আল্লাহ্ কারো উপর যুল্‌ম করেন না। মানুষ নিজে নিজেই নিজের উপর যুল্‌ম করে। إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (সূরা ইউনুস-৪৪) এধরনের কথা যারা ভাবে ও বলে, তা' তারা অজ্ঞতা বশতঃ বললে তওবা করে ঈমান নবায়ন করতে হবে। যারা জেনে শুনে বলবে, বা বলে, তারা ঈমান ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কারণ তা' আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলা। এধরনের অমার্জনীয় ধৃষ্টতা থেকে প্রত্যেক ঈমানদার মাত্রকে আল্লাহ্‌র দারবারে পানাহ চাওয়া কর্তব্য।

আল্লাহ্ নিরাকার, নিরং ও নিবর্ণ। এটাই আল্লাহ্‌র রং বা সিব্‌গাতুল্লাহ। আল্লাহ্‌র এ রঙ্গের চেয়ে উত্তম আর কোনো রং নেই। صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

(সূরা বাক্বারাহ-১৩৮) এ আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও তাঁর রাসূলদের মতো ঈমান পাথির্ব জীবন থেকে পরকালীন জীবনে বেহেশ্‌ত যাওয়ার রেল লাইনের দুটি পট্টি। এর যে কোনো একটি স্থানচ্যুত হলেই দূর্ঘটনা এবং পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক এবং নবী রাসূলদের নীচে অন্য কারো অনুসরণ, পার্থিব জীবন থেকে পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার লাইন। কারণ এ পথে চললে সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)। أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

রাসূলদের অনুসরণে আল্লাহ্‌র পথে চলার প্রতিযোগিতা করাকে আল ক্বোরআন "মুসাবিক্বাত" নাম দিয়েছে। এ প্রতিযোগিতায় যারা অগ্রণী হয়, তারাই "সাবেকুন" বা "সাবিকুনাল আউয়ালুন"। এ প্রতিযোগিতার জন্য কোনো যুগ বা কাল নির্ধারিত নেই। যারা এ যুগেও প্রতিযোগিতায় প্রথমশ্রেণী পাবে, তারাও ''আস্ সাবেকুনাল আউয়ালুন"। এর পথে হিজরত ও মুনাসিরাত করে তাওহীদ ও ঈমানের ইমাম ও সৈনিক হতে হয়। তবে হিজরত করা সহজ। আনসার হওয়া কঠিন। তাই রাসূল সঃ মুহাজির না হয়ে আনসার হওয়ার কামনা করে ছিলেন। لولا الهجرة لكنت احدا من الأنصار এখন হিজরত করে দারুল হিজরত তৈরী করে মুহাজির ও আনসার একত্র হওয়ার একটি দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত। যারা এ সুযোগ গ্রহণ করবে, তারা নবী রাসূলদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ "সাবেকুনাল আউয়ালুন" হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটতম বান্দা, "উলা ইকাল্ মুক্বাররাবুন" হবে। অর্থাৎ নবী রাসূলদের পর এরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হবে।

আবু বকর ও উমররা রাসূল সঃ কে পেয়ে অবশ্যই আবু সুফ্ইয়ান, মুয়াবিয়া, আব্বাস ও ইবন্ আব্বাস থেকে উন্নত শ্রেণীর মু'মিন মুস্‌লিম হয়েছিলো। তাই খেলাফতে বসে আবু সুফয়ানকে শাসাতে ও তার উপর চাবুক তুলে বলতে পেরেছিলো যে "ইসলাম আমাদের উপরে তুলেছে এবং তোমাদের নীচে নামিয়েছে।" কিন্তু তারা রাসূল সঃ ও মুস্তাদআফ্‌দের মতো সকল বর্ণ ত্যাগ করে "সিবগাতুল্লাহ" এর পর্যায়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। তাই তাদের দ্বারা ক্বোরেশী বর্ণবাদের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সিব্‌গাতুল্লাহের বর্ণবাদ মুক্ত বিশ্বজনীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা তাদের সীমাবদ্ধতা ছিলো। হয়তো বা মনে দোষ ছিলো না। তাই আমি মনে করি।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের গায়ের রং ও বর্ণ বহু। সাদা, কালো, বাদামী, হলদে, লাল ও গোলাপী। এটা বর্ণাঢ্য, বর্ণের সমাহার। বর্ণবাদ নয়। এটা বুঝা ও তা ধারণ করা সিব্‌গাতুল্লাহ। কোনো একটি বর্ণকে ধারণ করে তার প্রবক্তা হলেই বর্ণবাদী হয়ে যায়। "ইয়াহুদীরা আল্লাহ্‌র বেটা ও আল্লাহ্‌র বন্ধু" এবং "ক্বোরেশীরাই ইমাম হবে" এগুলো বর্ণবাদ। "আমি তোমাদের এক নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করে বহু জাতি ও উপজাতির পরিচয় দান করেছি শুধু পরিচয়েরই উদ্দেশ্যে, বৈষম্য সৃষ্টির জন্য নয়। তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, মুত্তাক্বীতম ব্যক্তিটিই"। বর্ণবাদ এ মহাসত্য থেকে স্খলন। বিদায় হজ্জে রাসূল সঃ এর ভাষণ, এর চূড়ান্ত সত্যায়ন, ও উসামাহর নিয়োগ তার বাস্তবায়ন। এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً

আল্লাহ্ তা'য়ালার এ ইচ্ছার বাস্তব রূপ দিয়েই বিদায় নেন রাসূল, খতিমুন্ নাবিয়্যীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন। আমি মনে করি যে এ যাবৎ উপরে আমি যা যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করে এসেছি, তা প্রত্যেক সত্যান্বেষী মানুষকে একটি পরিস্কার ধারণা দিয়েছে। নবী রাসূলদের বিদায়ের পর স্বার্থান্বেষী মহলের চাক্রান্তে সত্যান্বেষীরা পেছনে পড়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তই বেশি। الحياء الشعبة من الإيمان إذا لم تستحي فافعل ما شئت রাসূল সঃ বলেছেন লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। তাই সত্যান্বেষী ঈমানদাররা লাজ শরমের অধিকারী হয়। অপর পক্ষে স্বার্থান্বেষীরা নির্লজ্জ হয়। নবী রাসূলরা কোনো গোত্রপরিচয় নিয়ে আসেন না। তাদের নিবেদিত অনুসারীরা সব ত্যাগ করে নবীদের অনুসরণে আল্লাহ্‌র রঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। তাই আমরা, যায়দ, বেলাল, ইব্‌ন্ মাসউদ, আম্মার ও সালমানদের ইসলামী পরিচয় ব্যতীত অন্য কোনো পরিচয় পরে আর পাই না। রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর ক্বোরেশী, উমাইয়া, হাশেমী ও আব্বাসী পতাকা উত্তোলনের পরই বেলালের নামে হাব্‌শী, সুহাইবের নামে রুমী এবং সালমানের নামে ফার্সী যোগ করা হয়। তারা কখনো তাদের নামের পেছনে লেজুড় লাগায় নি। বরং তারা এগুলোকে চরম অপছন্দ করেছে বলেই প্রমাণ মিলে। হযরত সালমানকে তার গোত্রীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করার জন্য যখন তার বাপ-দাদা ও বংশ পরিচয় বলার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র বান্দা দ্বীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়-

أنا سلمان بن الإسلام، أنا سلمان بن الإسلام، أنا سلمان بن الإسلام অর্থাৎ আমি ইসলামের বেটা সালমান, আমি ইসলামের বেটা সাল্‌মান, আমি ইসলামের বেটা সাল্‌মান। এ হলো সাবেকুনদের পরিচয়। তাই রাসূল সঃ বলেছেন سلمان منا أهل البيت "সালমান আমার আহলে বাইতে"। যায়দ, বেলাল, আম্মার, ও সালমানদের পরই আবু বকর উমররা মুসলিম ছিলো। তারা প্রথম মুসলিম ও পরে ক্বোরেশী ছিলো। কিন্তু নিশ্চিত রূপে আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, আব্বাস ও ইব্‌ন্ আব্বাসরা প্রথমে ক্বোরেশী, হাশেমী ও আব্বাসী ছিলো এবং পরে মুসলিমের লেবাস লাগিয়ে ছিলো। এখনো বিশ্বে যে সৌদি, মিশরী, ইরাক্বী, তুর্কী, ইরানী, আফ্‌গানী ও বাঙ্গালী মুসলমান রয়েছে, এরা সবাই নিজ নিজ জাতীয়তার ধারক বাহক। এরা আবু সুফয়ান, মুয়াবিয়া ও আব্বাসের প্রেতাত্মা মুসলমান। আবু

বকর ও উমরদের মতো মুসলিমও নয়। যায়দ, বেলাল, আম্মার ও সালমানদের ধারে কাছে, দূরের কথা। এ হলো আমার সত্যোদঘাটনের পর্যালোচনার ফল। যারা নিজেদের জন্য, বিভেদের অর্থে ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য সমালোচনা করে, তাদের জাত, পাত ও ধর্মের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। পরবর্তী ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত কাফেলা তৈরী হবে বিশ্ব 'মুস্তাকবির তাগুতদের বিরুদ্ধে' মুস্তাদআফ নবীদের অনুসারী যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইব্‌ন্‌ মাসউদ, সালমান, ও উসামাহদের পতাকাবাহীদের দ্বারা। ইনশ্‌াআল্লাহ। সময় নিকটবর্তী। فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "অগণিত কল্যাণের প্রতিযোগিতার পানে দৌড়াও, অগণিত সম্পদ অর্জনের দিকে ধাবিত হও।" (সূরা বাকারা-১৪৮, মাঈদা-৪৮)।

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করি যে, বিগত ১৪১২ বছরের গোলক ধাঁধাঁর চর্কীতে চড়ে যারা দিশাহারা হয়েছে, আমার লেখনিতে তাদের সম্বিৎ ফেরত্‌ এসেছে। তারা ধাঁধাঁর চক্কর থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঘূর্ণিতে চড়া মানুষ ঘূর্ণি ছেড়ে নামলেও কিছুক্ষণ মাথা ঘুরতে থাকে। তাই শিশুরা যেমন খেলার সময় ঘুরে থামার পর, যাতে ঘুরে পড়ে না যায়, সেজন্য কয়েক পাক উল্টো ঘুরে নেয়, তদ্রূপ আমার পাঠকদের প্রাপ্ত সত্যের উপর ধীর স্থীর করার জন্য আমি কয়েক পাক উল্টো ঘুরাবো।

<u>তাই আমাদের অতীতের প্রধান প্রধান মুস্তাকবির ও মুস্তাদআফ সাহাবী ও উম্মাহাতুল্‌ মু'মিনিনদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখবো। যাতে তাদের সঠিক মূল্যায়ণ হয়, এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা তাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে ধন্য হতে পারি এবং তাদের সদ্‌ক্বায়ে জারিয়ার ঋন পরিশোধ করতে সক্ষম হই।</u>

ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর সহীহ বাণী দু'প্রধান উৎসের সাথে মিল ইতিহাস থেকে আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবন্‌ আউফ ও সা'আদ ইব্‌ন্‌ আবি ওয়াক্কাস এবং অপর দিকে যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইবন্‌ মাসউদ, খাব্বার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহর সংক্ষিপ্ত তুলনা মূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো। পাশাপাশি মা খাদীজাহ, উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা, হাফসা, আয়শা, ও মারিয়া ক্বিবতিয়ার রাসূল সঃ-এর ঘরে তাদের অবস্থানও তুলে ধরার চেষ্টা করবো। যাতে আগত দিনের ইসলামী কাফেলায় অংশ গ্রহণকারী নারীরা তাদের গঠন ও লক্ষ্য স্থীর করায় দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। আমি এ জটিলতম কাজে শুধু আল্লাহ্‌র সাহায্য চাই। আর পড়ছি وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

প্রতিপালক আমার, আপনি আমাকে ইলম বাড়িয়ে দিন, আমার অন্তরকে খুলে দিন এবং আমার আরদ্ধ কাজ সহজ করে দিন। আমীন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঈমানদার মানুষদের জীবনে কোনো পরীক্ষা বা বিপদ আসলে বলতে হয়, "আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।" এ শ্রেণীর আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে রয়েছে সীমাহীন শুভেচ্ছা ও করুণা। এরাই সঠিক পথের পথিক। أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (সূরা বাক্বারা-১৫৬,১৫৭) মানব জাতির জীবনে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ এর রিসালাতের তুল্য অন্য কোনো সৌভাগ্যের ঘটনা নেই। তদরূপ তাঁর রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান ও বিকৃত করার চেয়ে কোনো দুর্ঘটনা নেই। মুহাম্মাদ সঃ গোটা সৃষ্টির জন্য রহমত রূপে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁকে যারা গ্রহণ করেছে ও করবে, তারা মানব জাতির সেরা। তাঁকে যারা বর্জন ও তাঁর অর্পিত রিসালাতকে বিকৃত করেছে ও করবে, তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব।

আল্লাহ্‌ "রাব্বুল আলামীন" তাঁর শেষ নবী "রাহমাতুল্‌লিল আলামীন" রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে সকল সৃষ্ট ও সৃষ্টির আনুগত্য ও দাসত্ব মুক্তির সনদকে সীল-মোহর মেরে দিয়েছেন। পার্থিব জীবনে মানব নরনারীকে জীবনের সকল কালে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ অনুগত মুত্তাক্বী ব্যক্তির ইমামতের অধীনে জীবনযাপন করে মরতে হবে। ইমামের আনুগত্যের "বায়আত" প্রত্যেক মানুষের ঘাড়ে থাকতেই হবে। তা না হলে তাদের মৃত্যু জাহিলিয়্যাত বা কুফরের উপর হবে। (মাসনাদে আহমাদ) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ (সূরা নিসা-৫৯) ক্বোরআনের নির্দেশের সাথে এ হাদীসের সাথে মিল রয়েছে, তাই নিঃসন্দেহে তা' সত্য। ঈমানদারদের সমসাময়িক ইমামের আনুগত্যই এর অর্থ। মানুষের দু'জীবন, দু'সিড়ি বা দু'ধাপ এবং দু'পা। ইহকাল পরকাল। এক

পা' পৃথিবীতে, আরেক পা আখেরাতে। আখেরাতের সিড়ি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের দু'টি ধাপ। এর বাইরে হলেই দুপায়া মানুষ চার পায়া পশুর চেয়েও অধম। মানুষ পা দিয়ে ধরার মাটিতে চলে। মাথা তার সোজা আকাশের দিকে। তাতে যেনো সে ইঙ্গিত করে, সে এখন ধরায় হলেও মূলে সে মর্ত্যের। অন্যান্য চতুষ্পদরা ধরার দিকে মুখ করে হাটে। ধরায়ই তাদের জন্ম, ধরাই তাদের শেষ।

পশুরা চার দেয়ালের প্রাণী। মানুষের বানানো চার দেয়ালী খাঁচায় তাদের জন্ম মৃত্যু। আর মানুষ? কখনো চার দেয়ালী খাঁচা তার জীবন নয়। তাই তার মে'রাজ হয়েছে। এখনো সঠিক ঈমান ও সালাতে মানুষের মে'রাজ হয়।

রাসূল সঃ এর রিসালাত, মক্কা বিজয়, ক্বোরেশ নেতৃত্বের পরাজয়ের মাধ্যমে শির্ক ও কুফুরীর পরাজয় এবং বিদায় হজ্বের ভাষণ মানব মুক্তির ঘোষণা। এ সবে চার ব্যক্তির খেলাফত দূরে থাক, এক ব্যক্তির খেলাফতেরও কোনো উল্লেখ নেই। তা সত্বেও 'আমরা প্রথমে খেলাফত, তারপর চার ক্বোরেশীর খেলাফত, তারপর বারো ক্বোরেশীর খেলাফত এবং শেষ পর্যন্ত "ভূপৃষ্টে যে পর্যন্ত মাত্র দু'জন ক্বোরেশ বংশীয় থাকলেও ইমামত ও নেতৃত্ব ক্বোরেশেরই হতে হবে" এতে কি করে ঢুকলাম? কে বা কারা, কখন, কীভাবে এগুলো বানালো? কীভাবে বোখারী ও মুসলিম এ কথা লিখলো? তারপর তাও "সহীহ?"

এ খাঁচা ভেঙ্গে মানুষকে মুক্তির পথ সৃষ্টি নয়, হারানো পথ স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার কাজ। প্রথমে আল্লাহ্ আমাকে মুক্ত করেছেন। আমি খাঁচা ভাঙ্গা মুক্ত বিহঙ্গ। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের আদর্শে ক্বোরআন ও সহীহ্ ক্বাওলে রাসূলের ভিত্তিতে মুক্তি পাগল নর-নারীকে আমি যায়দ, বেলাল, আম্মার, বারাকাহ, সুমাইয়া, খাদিজা, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের ক্বাফেলা তৈরীর আযান দিচ্ছি।

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আবু বকর একজন মুত্তাক্বী মু'মেন রূপে মুসলিম উম্মার ইমাম হলে তাকে মেনে নেয়ার যৌক্তিকতা ভাবা যেতো। কিন্তু "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর কালেমার উপর তা অকল্পনীয়। তাতে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ দের রিসালাতকে ত্যাগ করতে হয়। তারপর থাকে, নমরুদ, আদ, সামূদ, ফেরআউন ও আবু জেহ্ল আবু সুফয়ানরা। ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, ও মুহাম্মাদ সঃ উধাও! তারপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ইলাহ কোথায় থাকেন?! মে'রাজে সকল নবীদের সাথে সালাতের ইমামতী করে সালাত ক্বায়েমের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আমরা সিদ্দীক, ফারুক, যূন্নুরাইন ও মাওলা আলীদের খাঁচায় কি করে ঢুকে ছিলাম, তা' একটু খতিয়ে দেখি।

কে এ আবু বকর ?

আবু বকরের জন্ম ক্বোরেশের বনী তাইমে। বনী তাইম গুরুত্ব ও সম্মানে বনী উমাইয়ার তুল্য ছিলোনা। বস্তুতঃ এরা বনী উমাইয়া বনী হাশেমের অনুগত ক্বোরেশ গোত্রের এক শাখা ছিলো।

আবু বকরের পিতার নাম ছিলো উসমান। ডাক নাম ছিলো আবু ক্বোহাফাহ্। আবু বকরের নাম ছিলো মতান্তরে আব্দুল উয্যা বা আব্দুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল সঃ তার পৌত্তলিক নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রেখে দেন। তবে সে আজীবন আবু বকর নামেই পরিচিত হয়। ইতিহাসে সে নামেই অমরত্ব লাভ করে।

তার পিতা কট্টর মুশরিক ছিলো। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সে মুস্লিম হয়নি। মক্কা বিজয় কালে আবু সুফ্য়ানদের মতো "তোলাক্বা" রূপে সাধারণ ক্ষমা প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়। পরে ভালো ঈমানদার হওয়ার কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং তার ছেলে খলীফা হওয়ার পরও আবু ক্বোহাফার অন্তরে আবু সুফয়ানের প্রতিই তার আনুগত্ব বেশি ছিলো।

আবু বকরের স্ত্রী, মা আয়শার মাতা উম্মে রুম্মানও রাসূলের উপর ঈমান আনেনি। মক্কা বিজয়ের পরও ঈমান এনে উল্লেখযোগ্য কোনো মু'মিনা হয়েছে তেমন কোনো সাক্ষ্যও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মাদীনায় হিজরতের পর তার স্ত্রী, মুশরিক অবস্থায়ই মাদীনায় যাতায়াত করতো বলে ইতিহাসে প্রমাণ মিলে। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যে, এ হতভাগী মুশরিক মহিলা তার মেয়ে মা আয়শা ও আসমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আবু বকরের ঘরে যাতায়াত করতো। তখনো আবু বকর তাকে তালাক দেয়নি, বা সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেনি। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট পাওয়া যায়না যে কিরূপে এমন একজন মুশরিক মহিলা তার কন্যা ও তাদের পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলো বা তার অবস্থা

কি ছিলো?

আবু বকর শান্ত প্রকৃতির মোটামুটি স্বচ্ছল কাপড় ব্যবসায়ী ছিলো। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণতা ছিলো তার মাঝে। প্রায় সমবয়সী রূপে হবু রাসূল মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর সাথে তার বন্ধুত্ব ছিলো। রাসূল হওয়ার পূর্বেও মুহাম্মাদ সঃ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আবু বকর প্রভাবান্বিত ছিলো। তাই রিসালাত প্রাপ্তির পর আবু বকর বয়স্ক ক্বোরেশী পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাসূল সঃ এর উপর ঈমান আনে।

বিশ্ব তাওহীদের কেন্দ্র কা'বায় মূর্তি পুজা অন্যায় এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর রিসালাত যে বিজয়ী হবে, তা আবু বকর তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলো। তবে বয়স্কদের মধ্যে আবু বকর কোনো মতেই প্রথম ঈমানআনা ব্যক্তি নয়। প্রথম ব্যক্তি যায়দ। জাহিলী বর্ণবাদী আরব ঐতিহাসিকরা যে লিখেছে, যে রাসূল সঃ এর প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদের মধ্যে আবু বকর, গোলামদের মধ্যে যায়দ এবং শিশু বা কিশোরদের মধ্যে আলী প্রথম ঈমান এনেছিলো, তাতেই ওদের গোত্র ও বর্ণবাদী জহিলিয়্যাতের সনদ মিলে। তবে প্রায় প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে যায়দই সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ভাগ্যবান পুরুষ বলে প্রমাণিত হয়। ক্বোরআনও তার সাক্ষ্য দেয়। ঈমান আনয়নের সময় যায়দের বয়স ছিলো ৩২ বছর এবং আবু বকরের ৩৭ বছর।

আবু বকর সত্যের ডাক এবং রাসূল সঃ এর রিসালাতের উজ্জল ভবিষ্যত বুঝতে পেরে তারই স্বগোত্রীয় দু'জামাতা তালহা ও যুবাইরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বনু উমাইয়ার ওসমান ও তার ভগ্নীপতি আব্দুর রহমান ইবন্ আউফকেও আবু বকর নতুন দ্বীনে প্রবেশের আহ্বান জানায়। সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস সহ এরা সবাই আবু বকরের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে কথিত ক্বোরেশী দশ ব্যক্তির "আশারায়ে মুবাশ্শারায়"এ ছয়জন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আবু বকরের কথিত "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর এরাই একনিষ্ঠ সমর্থক। এদের সমর্থন ও সহযোগিতায়ই বিশ্বজনীন ইসলাম রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর প্রথমে ক্বোরেশ ও পরে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের সাম্রাজ্যবাদ ও ভোগবাদ প্রতিষ্ঠার বাহন রূপে ইসলামের শত্রুদের হাতে কলঙ্কিত হয়।

আবু বকর তার ব্যক্তি-সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে রাসূল সঃ কে তার রিসালাতের প্রচারে সাহায্য করে। বেলালের মতো আরো দু'চারজনকে তাদের অত্যাচারী মনীবদের হাত থেকে মুক্তিপন আদায় করে আবু বকর চিরধন্য হয়।

আবু বকর ঈমান আনার ফলে ক্বোরেশী কাফের ও মুশরিকদের দ্বারা জীবনের উপর হুমকি স্বরূপ কোনো অত্যাচার ও বিপদের সম্মুখীন হয়নি। তাই তাকে হাবশায় হিজরত করতে হয়নি। রাসূল সঃ যখন শে'আবে আবি তালিবে তিন বছর অবরুদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন, সে অবরোধ ভাঙ্গা বা তা রহিত করার কোনো প্রচেষ্টায় ইতিহাসে আবু বকরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রাসূল সঃ মক্কাবাসীর অত্যাচার ও তাওহীদের ডাক প্রত্যাখ্যানের ফলে স্বজন ও স্বগোত্র থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মক্কা ত্যাগ করে তায়েফে হিজরত করার সময় আবু বকর তার সঙ্গী হয়নি। একমাত্র যায়দই সে অবিস্মরণীয় ঘটনায় রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়। তায়েফে অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা তাঁর জীবনে সবচেয়ে কষ্টকর ঘটনা বলে রাসূল সঃ বর্ণনা করেছেন।

বহু লোকের নিক্ষিপ্ত পাথরবৃষ্টিতে হুজুর সঃ ক্ষতবিক্ষত হন। তাকে আঁড় করতে গিয়ে যায়দের সারা দেহ ছাড়াও মাথা রক্তাক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্র শেষ নবী সঃ মতান্তরে দীর্ঘ আঠারো দিন বা মাসাধিক এক বাগানে আশ্রয় নিয়ে যায়েদের সেবা শুশ্রুষায় কোনো প্রকার সুস্থ হলে পর মক্কায় তাঁকে পুনঃ প্রবেশ করা ও আশ্রয় দাতার জন্য খোঁজ করতে হয়। রাসূল সঃ যায়দকে পাঠিয়ে মক্কায় গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত মুতআম ইব্ন্ আদি রাজী হয়ে তার গোত্রের লোকজনদের নিয়ে রাসূল সঃ কে আশ্রয় দিয়ে পুনঃ মক্কায় ফেরৎ আসার ব্যবস্থা করে।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষনে ইতিহাসে আমরা আবু বকর, উমর ও পরবর্তী ক্বোরেশী আশারায়ে মুবাশ্শারাদের কোনো ভূমিকা দূরে থাক, তাদের কোনো উল্লেখই পাইনা! বহু খুঁজে, হাযার পৃষ্ঠার হাদীস ও তারীখ পড়ে তার কোনো সদুত্তর আমি পাইনি। সে ঐতিহাসিক ঘটনাকালেই রাসূল সঃ মুস্তাদআফদের রব, আল্লাহ্র দরবারে তাঁর আসল "সানিয়াসনাইন্" যায়দকে নিয়ে মুস্তাদআফদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফরিয়াদ করেন। আল্লাহ্ তা কবুল করে উল্টো মক্কা ও তায়েফবাসীকে অবরোধ করার সুসংবাদ দেন إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ মে'রাজের মাধ্যমে। (বনী ইসরাঈল-৬০) তারপরই মক্কার মুস্তাক্বিরদের ত্যাগ করার নির্দেশ আসে। রাসূল সঃ মাদীনার কৃষক মুস্তাদআফদের মাঝে হিজরত করে চলে যান। মাদীনার মুস্তাকবির ইয়াহুদীরা মক্কার মুস্তাকবির কাফের মুশরিকদের সাথে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র

নূরকে মিটাতে গিয়ে, বস্তুতঃ তারাই মিটে যায়।

হিজরতের সময় আবু বকর রাসূলের সঙ্গী হয়। এ হিজরত যাত্রা নিঃসন্দেহে তায়েফের ঘটনার চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। ব্যাপারটি ছিলো মক্কা ত্যাগ করে মাদীনায় চলে যাওয়া। মাদীনায় পূর্ব থেকে বায়আত করা মাদীনাবাসী রাসূল সঃ কে "স্বাগতম" জানিয়ে গ্রহণ করতে অধীর অপক্ষোয় ছিলো। মিলাদ অনুষ্ঠানে পঠিত "তালাআল বাদরু আলাইনা" সে অভ্যর্থনা গানেরই অংশ বিশেষ।

হিজরতের পথে রাসূল সঃ এর সওর পর্বত গুহায় তিনদিন অবস্থান ও তার ঘটনা আমাদের জন্য এ ধরার পৃষ্ঠ থেকে আল্লাহ্‌র আরশের সাথে প্রত্যক্ষ সিড়ি। যেমনটি হযরত মূসা কালীমুল্লাহের জন্য নীল নদ পার হওয়ার জন্য মহাসড়ক তৈরী হয়েছিলো।

মক্কা বিজয়ে ক্বোরেশী কাফের ও মুশরিকদের মিথ্যা জাত্যাভিজাত্যের পরাজয় ও তা নির্মূল হওয়ার পর সূরা তওবা নাযিল হয়। এ সূরায় আরবদ্বীপের মুশরিকদের অবস্থান ও নব দীক্ষিত রাসূল সঃ এর সঙ্গী সাহাবীদের সর্বশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে আবু বকরের অবস্থান সবচেয়ে স্পষ্ট করে চিত্রিত হয়েছে। এ সফরে আবু বকর একমাত্র রাসূল সঃ এর সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো।

রাসূল সঃ এর রিসালাত ও জীবনের সমাপনী সূরা তাওবা , বারাআত ও ফাদিহায় বিদায় হজ্ব ও তাবুক অভিযানে তাঁর সঙ্গীরা কে কোথায়, তার বিবরণ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাঁর কালামে। এখানে কোনো সাহাবী ও মুহাদ্দিসের কিছু যোগ বিয়োগ দেওয়ার সাধ্য নেই।

মক্কা বিজয় শেষ, বিদায় হজ্জও শেষ। শুধু তাবুক অভিযান বাকি। তারপরই রাসূলের বিদায়ের পালা। তাঁর বিদায়ের পর থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারদের রাসূল সঃ এর জীবদ্দশার মতো তাঁর রিসালাত প্রতিষ্ঠা ও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুগে যুগে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। মুস্‌লিম নামধারি কোনো জাতি একাজ করতে ব্যর্থ হলে আল্লাহ্‌ তাদের অভিশপ্ত করে বাদ দিয়ে অপর কোনো জাতিকে দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল সঃ এর মিশন চালিয়ে নিবেন। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ্‌ মুহাজির আনসারদের যে সতর্ক বাণী শুনিয়েছেন, তারই পুনঃ প্রত্যায়ন করলেন সূরা তওবার ৩৯ নং আয়াতে।

রাসূল সঃ কে কিভাবে আল্লাহ্‌ সাহায্য করেছেন এবং কিভাবে একাই রাসূল হিযরতের সময় নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তোমরা যদি ভবিষ্যতে রাসূল সঃ কে সাহায্য না করো, তা'হলে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেই যাবেন। যেমনটি অতীতে করেছেন। হিজ্‌রতের সময় মক্কার কাফেররা তাঁকে যখন বের করে দিয়েছিলো, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিটি (?) যখন তারা দু'জন গুহায় ছিলো, তখন তার সঙ্গীটিকে বলতে হয়েছিলো, "শোকে বিহব্বল হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে রয়েছেন।" হাযেনা, শোকাহত হওয়া। "লা তাহ্‌যান" অর্থাৎ তুমি শোকাহত বা শোকে বিহব্বল হয়োনা। সওর গুহায় মক্কার কাফেররা আবু বকরদের দেখে ফেলার আশংকায় আবু বকর ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলো বলেই আল্লাহ্‌ সে দৃশ্যকে "শোকাহত" হওয়ার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। রাসূল সঃ সঙ্গে রয়েছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে রক্ষা করবেন এবং সে অবস্থায় আবু বকরের দৃঢ়তার অভাব ঘটেছিলো বলেই লা'তাহযান বলে রাসূলকে আবু বকরকে শান্ত করতে হয়েছিলো। তা না হলে আবু বকরের দ্বারা এমন কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, যাতে কাফেররা রাসূল সঃ এর অবস্থান জেনে যেতো, এবং অঘটন ঘটতে পারতো।

ঠিক এমন অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিলো হযরত মূসার হিজরতের সময়। রাসূল সঃ এর মতোই হযরত মূসা রাতে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছিলেন দেশ ত্যাগ করে। ফেরআউনের লোকেরা পিছু ধাওয়া করে আসছে দেখে হযরত মূসার সাহাবীরাও আবু বকরের মতো অস্থির হয়ে গিয়েছিলো, "এখন কি হবে, আমাদের যে ধরে নিয়ে যাবে?" তখন মূসা কালীমুল্লাহ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছেন,

"কখনো ধরে নিয়ে যেতে পারবেনা, কারণ আল্লাহ্‌ স্বয়ং আমার পক্ষে"। (সূরা শুআরা-৬২) মূসার আঃ এর সঙ্গী বনী ইস্রাঈলীদের চেয়েও পোক্ত ঈমানের অধিকারী বলে আবু বকরকে ভাবার কোনো কারণ নেই। হযরত মূসার সঙ্গীরা

হযরত ইব্রাহীম আঃ এর বংশধর। তারা মূসা আঃ এরও পূর্বের নবীদের বহু কারামত ও অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জানতো। কিছু দিন পূর্বে তারা স্বচক্ষে দেখেছে যে হযরত মূসার লাঠি ফেরআউনের যাদুকরদের যাদুর অজগর সাপদের কিরূপে সাবাড় করেছিলো। আবু বকররাতো রাসূল সঃ এর তখনো এমন কোনো চাক্ষুস মো'জিযা দেখেনি। তা ছাড়া রাসূল সঃ সব সময় মক্কাবাসীদের ঈমানকে নওমুসলিমের ঈমান রূপেই দেখেছেন এবং উল্লেখও করেছেন। এবং বার বার আশংকা প্রকাশ করেছেন যে তারা রাসূল সঃ বিদায়ের পর ইয়াহুদীদের ন্যায় তাঁর শিক্ষাকে ত্যাগ করে গোত্রবাদী হয়ে মুস্তাদআফ মুহাজিরদের তাদের বিবাদের মাঝে বলির পাঠা বানাবে। (মুসলিম, ইবন্ মাজাহ)

উপরোল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট আল্লাহ্ বলেন যে, যখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও গুহায় রাসূল সঃ এর সাহায্যকারী সঙ্গী হতে ব্যর্থ হলো, তখন আমিই আমার রাসূলের সাহায্যকারী যে আমার "সাকীনা" (নিশ্চিন্ততা বা মনের প্রশান্তি) তাঁর (রাসূলের) উপর নাযিল করি, এবং তাঁকে (রাসূলকে) তোমাদের অদৃশ্য সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাহায্য করি। এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের বাক্যকে নিচু এবং আল্লাহর বাক্যকে উচু করেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তওবা-৪০)

আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের দীর্ঘ ২২ বছর পর ক্বোরআনুল করিম দ্বারা আল্লাহ চিরদিনের জন্য আবু বকরের অবস্থান ও স্থান নির্ধারিত করে দেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে সূরা তওবা নাযিল আরম্ভ হয়। আবু বকর তার বাইশ বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে। তার পূর্বের বছর আবু বকর ও উমরের আচরণের বিরুদ্ধে সূরা হুজুরাত নাযিল হয়। আল্লাহ্ অতীত ভবিষ্যতের গায়েব জানেন। যাতে পরবর্তীতে দাজ্জাল ও কুচক্রীরা রাসূল সঃ এর নিচে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষকে পূজনীয় দাঁড় করে ইসলাহের পর ফাসাদ, অর্থাৎ সংস্কারের পর কুসংস্কারের জন্ম দিতে না পারে, জন্ম দিলেও যেনো তা ক্বোরআনের শিক্ষায় নির্মূল করা যায়, আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়ে দেন।

ক্বোরআনের স্পষ্ট আয়াত ও রাসূল সঃ এর সাবধানবাণী সত্ত্বেও রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর আবু বকর কর্তৃক উচ্চারিত "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" ভিত্তিক পরবর্তী ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদকে দাঁড় ও বৈধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাস মুহাদ্দিস ও মুফাফসিররা পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণে ক্বোরআনের অর্থে তাহরীফ বা বিকৃতি করার নির্লজ্জ বোকামী করে। তারা এ আয়াতে যতো গুলো "হু" শব্দ 'সর্বনাম' আছে, তন্মধ্যে দু'টি "হু" চুরি করে আবু বকরের উপর প্রয়োগের অপচেষ্টা করে ধরা খায়। তারা বলতে চেয়েছে যে আল্লাহ আবু বকরের উপর মনের প্রশান্তি নাযিল করেন এবং আবু বকরকে অদৃশ্য সৈন্য বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। আবু বকরের উপর যদি আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি এবং সৈন্য নাযিল হয়, তা' হলে তো, নাউযু বিল্লাহ, সে নবী বা রাসূল হয়ে যায়। আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রত্যক্ষ কিছু নাযিল হয় তো শুধু নবী রাসূলদের উপর। অন্যদের উপরতো তা কখনো নাযিল হয় না।

নির্বোধ ও নির্লজ্জদের খোঁড়াযুক্তি হলো যে রাসূল সঃ তো আল্লাহর রাসূল। তাঁর অন্তরে তো সর্বদা প্রশান্তি আছেই। তাই সওর গুহায় প্রশান্তিটি নাযিল হয়েছে বিশেষ করে আবু বকরের উপর। তারপরও প্রশ্ন রয়ে যায় যে, তা হলে অদৃশ্য সৈন্য বাহিনীও কি আবু বকরের সাহায্যার্থে নাযিল করা হয়েছিলো? এ ব্যাপারে তথ্য ও সত্য চোরেরা তেমন কিছু বলেনি। চুপ মেরে আছে।

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূল সঃ, তাঁর রিসালাত ও তাঁর ক্বোরআনকে ইয়াহুদীদের প্রেতাত্মাদের প্রতারণা থেকে রক্ষার্থে এ সূরারই ২৫ নং আয়াতে ওদের কাপড় খুলে দিগম্বর করে দিয়েছেন। যাতে তারা আর কোনো বিবেক সম্পন্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরা সকল শির্ক ও মুশরিকদের প্রয়োজন মুক্ত। আখেরী নবী সঃ যে মুক্তির চূড়ান্ত ঘোষক, আযানদাতা, "আযানুম্ মিনাল্লাহি", সূরা তাওবা তাঁর চির ভাস্বর ভাষণ বা খুতবা। এক আদমের সন্তানদের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদে চিহ্নিত ও বিভক্ত করা, আল্লাহ, সকল রাসূল সঃ ও ক্বোরআনকে অমান্য করা। এ শির্ক থেকে মুক্ত করার একমাত্র তাক্বওয়াভিত্তিক ইমামত প্রতিষ্ঠাই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর রিসালাত। বিদায় হজ্বের ভাষণ তার ঘোষণা। যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ সে ঘোষণার বর্ণাঢ্য নমুনা।

কিন্তু রাসূলের মৃতদেহ অসমাহিত রেখে তিন দিনের জাহিলী ঝগড়াঝাটি করে তাওহীদের ব্যানার মুড়িয়ে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়া হয়েছে, পরবর্তীতে তাকে হালাল করার যে দাজ্জালী চালু করা হয়েছে, তার মূলোৎপাটন এ বই'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যাতে "মাশরিক্বাইন ও মাগরিবাইনে" "আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না

মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামুন নাবিয়্যীন" খচিত পতাকাতলে বিশ্বের মানুষ অন্ততঃ একবার সকল রক্ত ও বর্ণ বৈষম্যহীন তাক্বওয়া ও তাওহীদের ভিত্তিতে এক জাত ও এক উম্মত হতে পারে। এ লক্ষ্যেই আমাদের শেষ নবী, "রাহমাতুল্লিল আলামীন।"

রাসূল সঃ এর হিজরতের আট বছর পর হুনাইনের অভিযান সংঘটিত হয়। তাতে প্রায় পনের হাজার সৈন্য শক্তি রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়। মাদীনা থেকে মক্কা বিজয়ে আগত দশ হাজার এবং মক্কা বিজয়ের পর নবদীক্ষিত আরো পাঁচ হাজার যোগ দেয়। এতো বড়ো সংখ্যায় এ যাবত রাসূল সঃ কোনো যুদ্ধে যাননি। জনসংখ্যা দেখে আবু বকর বলেছিলো "এবার আর সংখ্যালঘুতার কারণে আমাদের পরাজয় হবেনা"। এ ধরনের ধ্যান ধারণা ইসলামে ভুল ও ভ্রান্ত। সংখ্যাধিক্যে ইসলামের বিজয় আসে না। وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ

একমাত্র বিজয় আসে আল্লাহর সাহায্যে। এ হলো ইসলামের শিক্ষা। (সূরা আল ইমরান-১২৬, আনফাল -১০)

সাকীফ্ ও হাওয়াযিনের লোকেরা যখন আক্রমণ করলো, তখন রাসূল সঃ-কে ফেলে মাত্র হাতে গোনা কজন বাদে সবাই ময়দান ছেড়ে পালায়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় তিনজন, পাঁচজন কি অতিরিক্ত সাতজন মাত্র রাসূল সঃ-এর চারপাশে বর্মের মতো হয়ে টিকে থাকে। তার মধ্যে আইমান, উসামাহ ও বারাকাহ অন্যতম। আইমান তাতে শাহাদাত বরণ করে। বৃদ্ধা বারাকাহ পালানো দূরের কথা, এক পাথরের উপর উঠে পলায়নরত লোকদের ডেকে বলতে আরম্ভ করেন, "তোমরা রাসূলকে ফেলে কোথায় যাচ্ছো? ফিরে এসে মোকাবেলা করো। আল্লাহ্ তোমাদের পদ দৃঢ় করে দিবেন, ইত্যাদি"। ...ثبتكم الله و يثبت أقدامكم

আবু বকর ও উমর, কেউ সে অবস্থায় টিকেনি। পলাতকদের মধ্যে তারাও। এ অবস্থায় বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন, ثُمَّ

وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ،ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর "সাকীনা" (মনের প্রশান্তি) নাযিল করেন তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনদের উপরও। (তওবা-২৬) সওরের গুহায় যারা নাযিল হওয়া "সাকীনাকে" আবু বকরের উপর অবতীর্ন বলে বলেছিলো যে রাসূল সঃ এর অন্তরে তো রাসূল রূপে সর্বদা সাকীনা থাকেই, তাই তা আবু বকরের উপরই নাযিল হয়েছিলো, তারা এবার কি বলবে যে, আট বছর পর, নাউযুবিল্লাহ, রাসূলের অন্তর সাকীনা থেকে খালি হয়ে গিয়েছিলো? এও কি কখনো কোনো বিবেকবান মানুষ ভাবতে পারে? পূর্বেও আল্লাহ্ রাসূলের উপরই সাকীনাহ নাযিল করেছিলেন, হুনাইনেও তাঁরই উপর নাযিল করেছেন। হিযরতের সময় আবু বকর যেরূপ ভীত হয়েছিলো, হুনাইনেও সেরূপ ভয়ে পালিয়েছিলো। ثُمَّ

وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ"অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে" এর মধ্যে আবু বকরও অন্তর্ভূক্ত।

রাসূল সঃ কে আল্লাহ্ শৈশব থেকে ইয়াতীম করে লালন পালনের বিশেষ ব্যবস্থা করে রিসালাতের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। যেমন হযরত মূসা আঃ কে গড়েছিলেন। وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي আমার জন্য তোমাকে বিশেষভাগে গড়ে নিয়েছি। (ত্বাহা-৪১) যাদের দিয়ে নবী রাসূলদের গড়া হয়, তারাও আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন মা হওয়া সত্বেও আল্লাহ মূসা আঃ এর মাকে গড়ে নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি মুহাম্মাদ সঃ কে চূড়ান্ত রিসালাতের জন্য গড়ার জন্য বারাকাহকে বিশেষভাবে নিয়োগ করেছিলেন। তা, না হলে যায়দ, বারাকাহ, আইমান ও উসামাহর অনন্য টীম কি করে ভাবা যায়?

আবু বকর ও উমর প্রভৃতিরা তাদের বংশীয় কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে তাদের সীমা ও সাধ্যানুপাত ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এটাকেই আল্লাহ ক্বোরআনে "শাকিলা" বলে অভিহিত করেছেন। তাই সম্পূর্ণ ক্বোরেশী মুদ্রামুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যার ফলে পরবর্তীতে রাসূল সঃ এর নামে এমন কথাও বানিয়ে প্রচার করতে হয়েছে যে, দু'জন ক্বোরেশী থাকলেও ক্বোরেশ থেকেই নেতা হতে হবে। তাও বোখারী মুসলিমে?

আবু বকর মাদীনা গিয়ে বদর থেকে আরম্ভ করে সকল যুদ্ধে রাসূল সঃ এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোনো যুদ্ধে তার কোনো অসাধারণ বীরত্বের বর্ণনা পাওয়া যায় না। বা কাকেও যুদ্ধ প্রান্তরে স্বহস্তে হত্যা করেছে, তেমন উল্লেখও নেই। বদর যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে আগবেড়ে রাসূলকে সূরা মুহাম্মাদের শিক্ষা পরিপন্থী পরামর্শ দিয়ে তা কার্যকর করায় রাসূল সঃ কে সেজন্য আল্লাহর তরফ থেকে কঠোর কথা শুনতে হয়েছে।

ঈমান এনে দীর্ঘ একুশ বছর রাসূল সঃ এর সংস্পর্শে থাকার পরও আল্লাহ্ ও রাসূল সঃ এর অগ্রগামী হওয়া ও রাসূলের দরবারে বেআদবীর জন্য সূরা হুজুরাত নাযিলের প্রথম কারণ আবু বকর।

রহমত ও স্নেহের সাগর রাসূল সঃ আবু বকরকে ভালোবেসেছেন। হিজরতের সময় তাঁর গোপনীয়তায় আবু বকরকে সঙ্গী করেছেন। আবু বকর নির্ভীক দৃঢ়তার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হলেও হিজরতে রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলো। গুহায় ভয়ে ঘেমে যাওয়া ও অস্থিরতার প্রকাশ আবু বকরের নিজের ভাষায়। একে যারা নিজের প্রাণের জন্য নয়, রাসূল সঃ এর জীবন রক্ষার চিন্তা বলে অতিরঞ্জিত কল্প কাহিনী তৈরী ও বর্ণনা করেছে, তা পরবর্তীতে আবু বকরের ভূমিকাকে নিষ্কলুষ করার প্রচেষ্টার অংশ বলা চলে। আল্লাহ তাঁর যে রাসূল সঃ কে তাঁর দ্বীন পূর্ণ করার জন্য পাঠিয়েছেন, তাঁকে স্বীয় হিফাজতে নিয়ে যে হিজরত করাচ্ছেন, তার সঙ্গী যে হবে, সে তো সব চেয়ে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হবে! কারণ সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গী হয়েছে যাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন।" وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (সূরা মায়িদা-৬৭) সাপ বিচ্ছুর দংশনের কিসসা কাহিনী অবান্তর বাড়াবাড়ি। গুর গম্ভীর ঘটনার সাথে এগুলো জুড়লে পরিবেশ হাস্যকর ও হালকা হয়ে যায়।

আবু বকরও রাসূল সঃ কে তার সাধ্যানুযায়ী ভালোবেসেছে। বিবাহযোগ্য বড়ো মেয়ে ছিলো না বিধায় কিশোরী কন্যা আয়শাকে নিজে যাচক হয়ে বিবাহ দিয়েছে রাসূল সঃ এর সাথে। মা আয়শা তখন আট নয় বছরের কিশোরী। আবু বকর তাকে খেজুর ও পানাহার দিয়ে রাসূল সঃ এর দরবারে পাঠাতো। মনে রাখতে হবে যে তখনো পর্দার নির্দেশ নাযিল হয়নি। রাসূল সঃ আবু বকরের সুপ্ত বাসনা বুঝতে পেরেই কিশোরী আয়শাকে বিবাহ করে আবু বকরকে ধন্য করেছেন।

বিকৃত রুচির লোকেরা যে বর্ণনা করেছে রাসূল সঃ স্বপ্নে দেখে রেশমী চাদরে ঢাকা আয়শাকে স্বপ্নের কথা বলে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন, আবু বকর তাতে রাজী হতে চায়নি, এ সমস্ত মিথ্যা কথা। এ সমস্ত কাহিনী দ্বারাই বাচালেরা ইসলাম ও রাসূল সঃ বিরোধীদের বলার ও লিখার ইন্ধন যুগিয়েছে যে মোহামেডানদের নবী মুহাম্মাদ কিশোরী ধর্ষণকারী যৌন বিকার গ্রস্থ ছিলো। নাউযু বিল্লাহ। আরব বিশ্বের খ্যাতনামা জীবনচরিত রচয়িতা আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের মতে মা আয়শার বিয়ের সময় তার বয়স ছিলো দশ এগার, এবং রাসূল সঃ এর ঘরে তাকে তুলে দেয়া হয় তের বছর বয়সে। তাই বাস্তবধর্মী প্রতীয়মান হয়।

মাদীনায় হিজরতের পর থেকে রাসূল সঃ এর মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকরের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই বলা চলে। কোনো যুদ্ধে যেমন কোনো বীরত্বের গাঁথা নেই, তেমনি কোনো উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ারও প্রমাণ মিলে না। খায়বারের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিলো। তাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে দেখা যায়। খন্দক বা পরীখার যুদ্ধকালীন প্রায় একমাসের মতো মাদীনা অবরুদ্ধ ছিলো। আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব কাফের ও ইয়াহুদী চক্রের মরণকামড় ঘটতে যাচ্ছিলো। পরিখা খননের দিন-রাতের শ্রম ও ক্ষুধার কষ্টে রাসূল সঃ পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। সে সংকটকে খোদ আল্লাহ বলেছেন যে ঈমানদারদের অন্তরআত্মা কন্ঠনালির কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলো। সে সংকট মোকাবেলা ও নিরসনের ইতিহাসে আবু বকরের কোনো ভূমিকা দেখা যায় না। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, সালমান ফারসীর পরামর্শে মাদীনা রক্ষার পরিখা খনন করা হচ্ছে, এবং নাঈম ইবন মাসউদ নামী এক মাদীনাবাসী এক কুট চাল চেলে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ওদের নাস্তানাবুদ করে দেয়। তারপর আল্লাহর পাঠানো সৈন্য, ঝড় বৃষ্টি ও শৈত্য প্রবাহ এসে আবু সুফইয়ানদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মেরুদন্ড ভেঙ্গে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য করে।

মোট কথা, স্বল্পভাষী, ধীরস্থির মানুষ আবু বকর মাদীনায় হিজরত থেকে আরম্ভ করে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রায় নীরব জীবনযাপন করে। নবম হিজরীতে যখন আরব বদ্বীপের কাফের মুশরিকদের সাথে সকল সন্ধিচুক্তি বাতিলের সূরা তওবা নাযিল আরম্ভ হয়, তখন রাসূল সঃ আল্লাহ্র নির্দেশে তাওহীদবাদীদের হজ্বের নিয়মাবলী প্রচারের জন্য হজ্ব মৌসুমে আবু বকরকে এক প্রতিনিধি দলসহ মক্কায় পাঠান। পরে হয়তো আল্লাহ্র তরফ থেকেই রাসূল সঃ এর উপর নির্দেশ হয় যে আবু বকরের একক নেতৃত্বে এ হজ্ব হলে পরে আবু বকরের নেতৃত্বের ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই মধ্যপথে রাসূল সঃ আলীকে পাঠিয়ে দ্বৈত নেতৃত্ব করেছেন। আবু বকর তার সঙ্গীদের নেতৃত্ব দেয় এবং আলী আরাফাতের ময়দানে খুতবা দেয় এবং সালাতের ইমামতি করে। সূরা তওবার প্রথম আয়াতসমূহ আলী কর্তৃক আরাফায় ঘোষিত হয়। এভাবে দ্বৈত দায়িত্ব দিয়ে ক্বোরেশী দু'ব্যক্তির ভবিষ্যত একক নেতৃত্বের ভুল ধারণার সম্ভাবনা

নিরসন করান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দিয়ে। কারণ ইমামত তো প্রতিষ্ঠিত হবে মুস্তাদআফদের! আল্লাহ্র নির্দেশিত মুস্তাদআফ ইমামত প্রতিষ্ঠায় রাসূল নীরবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া আরম্ভ করেন।

তার প্রাতিষ্ঠানিক কাজ শুরু করেন রাসূল রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যায়দের নেতৃত্বে মুতা বা মওতায় যুদ্ধাভিযান দিয়ে। যায়দের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্বোরেশী অক্বোরেশী মুস্তাকবিরদের তরফ থেকে আপত্তি উঠে। এ আপত্তি প্রকাশ্যে নয়। পেছনে পেছনে, গোপনে গোপনে। যা মুনাফিকদের স্বভাব। ক্বোরেশের সবচেয়ে বেশী নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি জাফর ইবন্ আবি তালিবকে যায়দের অধীনে সহকারী রূপে নিয়োগ করা হয়।

রাসূল সঃ এর নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। আপত্তি উত্থাপকদের ঈমান ও সকল আমল বরবাদের ব্যাপার! রাসূল সঃ যখন আপত্তি উত্থাপকদের তিরস্কারার্থে মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন, তখন তো আমরা নাঙ্গা তরবারী হাতে রাসূলের দু'পার্শ্বে আবু বকর ও উমরকে দেখছিনা যে রাসূল সঃ এর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের বিরুদ্ধাচারনকারীদের গর্দান উড়িয়ে দেবো বলে হাঁক ছাড়ছে! তা হলেই না তারা রাসূলর পরে এক নম্বর দু'নম্বর ব্যক্তি হতো! পরে কি করে তারা "শেইখাইন" হলো? হিসাবে তো মিলেনা?

তাতে প্রমাণ হয় যে, যায়দের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপকদের মধ্যে আবু বকর ও উমররাও প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ছিলো! তখনকার দু'টি পরাশক্তির একটি রোমান সাম্রাজ্য। তাদের এলাকায় অভিযান পাঠানো কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। অবশ্যই তা পরবর্তী নেতৃত্বের পরীক্ষা ছিলো।

যেমনটি পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে, যায়দ সে পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ইমামের পদাঙ্ক অনুসরণে জাফর ও ইবন রাওয়াহাও সোনালী অক্ষরে ইতিহাস রচনা করেছে। অপর দিকে খালেদ ইবন্ ওয়ালিদ ও তার সঙ্গীরা প্রাণ নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে ফুররার নামে নিন্দিত হয়েছে।

<u>রাসূল সঃ এর নিকট স্পষ্ট, কারা সত্যিকারের সিদ্দীক এবং কারা গায়ে আলখেল্লা জড়িয়ে সিদ্দীক। যায়দ সর্বপ্রম ঈমান এনে যেমন ঈমানের প্রথম সিদ্দীক, মওতায় যাওয়ার পূর্বে মৃত্যু ও শাহাদাতের আগাম সংবাদ পেয়ে রণক্ষেত্রে চাক্ষুস শাহাদাত দেখে তা বরণ করে শাহাদাতের তালিকায়ও প্রথম সিদ্দীক। এরাই সিদ্দীকে আকবর উপাধির যোগ্য।</u>

যায়দ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাত্ বরণের পর মক্কা বিজয় হয়। তারপর রাসূল সঃ বিদায় হজ্বে যান। সঙ্গে এবার বিরাট দল। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবন্ আউফ এবং পরবর্তী ক্বোরেশী আশারা মুবাশশারা, সবাই বিদায় হজ্বে রাসূল সঃ এর সাথী ছিলো। লক্ষাধিক লোক হযরত ইব্রাহীম খলীল আঃ এর মিল্লাতের শেষ নবী সঃ এর ইমামতে হজ্ব আদায় করতে এসে রাসূল সঃ এর মুখ থেকে নিসৃত ঘোষণা শুনলো, "তাক্বওয়া ব্যতীত মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আজ থেকে সকল জাহেলিয়্যাত খতম"। আরাফার ভাষণে রাসূল সঃ তার সওয়ারীর পিঠে জাবালে রহমতের পাদদেশে তাঁর জীবনে একমাত্র হজ্বে বনী আদমের সাম্য ও মুক্তির ঘোষণা দিয়ে গেলেন। তাঁর সওয়ারীর পিছনে আবু বকর নেই, উমরও নেই। তাঁর রাদীফ উসামাহ্ বিন যায়দ। তারপরও আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ? রাসূল সঃ বিদায় নিলেন, বললেন যে "হয়তো আগামী বার আমি আর তোমাদের মাঝে থাকবোনা। আমার কাজ শেষ।"

ফেরার পথে গাদিরে খুমে রাসূল সঃ সবাইকে থামিয়ে আলী ও তার পরিবার বর্গের প্রতি বন্ধুত্ব ও সৌজন্য মূলক ব্যবহার ও সম্পর্ক বজায় রাখার বিশেষ তাগিদ দিয়ে যান। আলীর প্রতি পরবর্তীতে আবু বকর ও উমর ছাড়াও ক্বোরেশের অন্যান্য শাখার বৈরী মনোভাব রাসূল সঃ লক্ষ্য করে যান। যা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আলী, ফাতেমা, ও হাসান হুসেইনের সাথে পরবর্তীতে যা ঘটেছে, তার সদোত্তর কি কেউ দিতে পারবে? আবু বকরের বায়আতে আলীকে বাধ্য করার জন্য ফাতেমা ও আলীর সাথে আবু বকর ও উমর যা করেছে, তা কি রাসূল সঃ এর উপস্থিতিতে করা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারতো?

আল্লাহর রাসূল সঃ এর নিকট সাত আসমানের উপর থেকে সব খবর আসতো। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম শেষ নবীকে বলে দিয়েছিলেন যে, তার বিদায়ের পর তাঁর আবু বকর, উমর সহ আরব মরুর নও মুসলিমরা কি কি ঘটাতে পারে। তারই সাবধান বাণী সূরা হুজুরাত নাযিল করে আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর ঘরের কোনো কোনো স্ত্রী কী কী ঘটাতে পারে, তারও চরম পত্র নাযিল করে দিয়েছেন সূরা তাহরীমে।

তাই আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মুস্তাদআফ্দের ইমামত প্রতিষ্ঠা করতে হবে"। রাসূল সঃ এরপর ক্বোরআনে নাম উল্লেখ সহকারে আল্লাহ্র পুরস্কৃত ও রাসূলের পরীক্ষিত বিজয়ী সেনাপতি যায়দের পুত্র, রাসূল

সঃ এর পালক মাতা বারাকার জঠরের সিংহ শাবক উসামাহ, হুনাইনে রাসূলের বর্ম ও মক্কা বিজয়ের পর কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশে রাসূলের একমাত্র সঙ্গী কি মুস্তাদআফ ইমামতের উত্তম নির্বাচন ছিলোনা? এর উত্তরে কি কোনো ঈমানদারের "না" বলার শক্তি আছে? যারাই দ্বিমত পোষণ করবে, তারা আল্লাহ, ক্বোরআন ও রাসূল কিছুই মানে না বলা ছাড়া উপায় নেই! রাসূল সঃ ও ক্বোরআনের পরশে আবু বকর ও উমরদের অস্তিত্বের সৃষ্টি। রাসূল, রিসালাত ও ক্বোরআন তাদের সৃষ্টি নয়। কতো অগণিত আব্দুল উযযা, আব্দুল কাবা ও উমর পৃথিবীতে জন্মে পুনঃ মাটিতে মিশে গিয়েছে, তার কি কোনো হিসাব আছে? খবরদার, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়বে না। তাহলে সব শেষ।
আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল সঃ বিদায় কালে আল্লাহর দলের সৈনিক, হিযবুল্লাহ ও জুনুদুল্লাহ দাঁড় করে ইমাম ও সেনাপতি রূপে এক অসাধারণ যুবককে চূড়ান্ত নিয়োগ করে দিয়ে যাচ্ছেন। হায়াত মওত আল্লাহর হাতে। স্বাভাবিক আয়ু দিলে ন্যূন পঞ্চাশ রছরের জন্য বিশ্বে মুস্তাদআফদের ইমাম দাঁড়িয়ে গেলো। আত্মসমর্পনকারী আরবরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাদের জন্য দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনাময় নেতার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হলে তেমন জাতির ভাগ্য থেকে আল্লাহ রহমতের নেতৃত্ব প্রত্যাহার করে গযবের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেন। (বনী ইস্রাঈল-১৬, আল ফুরকান-৩৬, নামল-৫১, মুহাম্মদ-১০)
আল্লাহ ও রাসূল সঃ এর নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনা হলো। এ সর্বনাশা বদতামিযী কোনো এক ব্যক্তির মুখ থেকে বের হয়নি। দু'চার জনের পক্ষ থেকেও হয়নি। তেমন হলে সে দু'চার জনকে ধরে শিরোচ্ছেদ করে দিলেই তা নির্মূল হয়ে যেতো। সে জন্য রাসূল সঃ কে মৃত্যু শয্যা থেকে প্রচন্ড মাথা ব্যাথা নিয়ে মাথায় পট্টি বেঁধে মিম্বারে আরোহন করে বিরুদ্ধাচারণ কারীদের নিন্দা ও লানত করে যেতো হতো না। দু'চারজন বাজে লোকের এ স্পর্ধা হলে তো "শাইখাইন" আবু বকর ও উমরের কর্তব্য ছিলো রাসূল সঃ এর অনুমতি নিয়ে নাঙ্গা তলওয়ার উচিয়ে ঘাড় থেকে মস্তক আলাদা করে দেয়া? কারণ এ শ্রেণীর লোকদের চেয়েও কি কোনো জঘন্য কাফের হতে পারে? সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে।
মক্কা বিজয়, তায়েফ বিজয় এবং বিদায় হজ্বের বিরাট সমাবেশ দেখে পার্থিব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লোভী কুকুরদের বুঝতে বাকী ছিলোনা যে আল্লাহর রাসূলের তোলা ঢেউয়ে বিশ্বজয়ের সূচনা হবে। তাছাড়া রাসূল সঃ বহুবার বলেছেনও যে, "তোমাদের হাতে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়ে তাদের ধনরত্ন পেলে তোমরা কি করবে?" এখানে সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনা উল্লেখ করছি-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس و الروم أى قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو غير ذلك، تنافسون ثم تحاسدون و تدابرون ثم تباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على بعض

পাপীর বেটা আমরের ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে রাসূল সঃ বলেছেন, "পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করলে তোমরা কোন্ জাতিতে রূপান্তরিত হবে?" উত্তরে আব্দুর রহমান ইবন আউফ বলেছিলো "আল্লাহ যা বলতে বলেছেন তাই বলবো বা যা করতে নির্দেশ করেছেন, তাই করবো "। রাসূল সঃ বলেছিলেন "না তোমরা অন্য কোনো জাতি হয়ে যাবে? তোমরা ভোগের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে, একজনের পেছনে আরেক জন লাগবে, তারপর পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত হবে, এবং এরূপে তারপর তোমরা দরিদ্র মুহাজিদের দিকে ছুটে গিয়ে একজনের ঘাড়ে আরেকজনকে ফেলে মারবে?" (মুসলিম ৭ম খন্ড, কিতাবুল জুহদ, ৩৮৫, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)
মোদ্দা কথা মক্কা ও তায়েফ বিজয় এবং রোম পারস্য জয়ের রাসূলের ভবিষ্যত বাণী শুনে মক্কার ক্বোরেশী নওমুসলিমরা আঁচ করতে পারে যে, দারিদ্র্য পীড়িত আরবদের হাতে ধনভান্ডার আসছে। রাসূল সঃ আল্লাহর নির্দেশে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব, সালমান ও উসামাহদেরই তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়ে যাবেন। তাই তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে। রাসূল সঃ এর অসুস্থতা দেখে তারা তাদের ভবিষ্যৎ রক্ষার্থে মরণকামড় দেয়ার প্রস্তুতি নেয়।
রাসূল যায়দকে প্রধান সেনাপতি বানাচ্ছেন, তাতে তারা আপত্তি তুলছে। রাসূল তাদের বাধা মানছেন না। বরং যায়দের গৌরবউজ্জল সাফল্যের পর তার সতেরো বছরের যুবক ছেলে, রাসূল সঃ ও রিসালাতের পালকমাতা বারাকাহর পেটের সন্তান এবং রাসূল সঃ এর দু'প্রিয়তমের মিলনের ফসল, রাসূল সঃ এরও মুবারক মুখ থেকে বলা

"আমার প্রিয়দের স্মৃতি আমার প্রিয়তম উসামাহ'র" সর্বজন স্বীকৃত ইমামত প্রতিষ্ঠা হলে ক্বোরেশী জাহিলিয়্যাতের চির কবর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তারা দেখতে পেলো। বাইরের শত্রুদের শত্রুতা মানুষকে তেমন পীড়া দেয় না যেমনটি ঘরের মানুষের বৈরীতা যাতনা দেয়। একেই বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ। আল ক্বোরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তাঁর নবীদের তাঁদের রক্তীয় স্বজনদের অত্যাচারের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষ করে সূরা ইউনুস ও হুদ এর দৃষ্টান্ত। রাসূল সঃ বলেছেন, "হুদ ও ইউনুস আমাকে বুড়িয়ে ফেলেছে"। তারপর তাঁর জীবনাবসানের পূর্বক্ষণে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী ও তাদের বাবাদের অশুভ পায়তারা!

মাদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মতো ইয়াহুদীবাদ থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া আরো কিছু মুনাফিক ছিলো। আল্লাহ্ তাদের মুখে চুন-কালি দিয়ে পরাজিত করে তাঁর রাসূল সঃ কে মক্কা, তায়েফ ও মাদীনায় "ফাতহুম মুবীন" অর্থাৎ স্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছেন। তাদের তরফের বিপদ কেটে দিয়েছে। কারণ আহযাব ও খায়বারের পর তো মাদীনায় ইয়াহুদীরা ছিলোনা? তাদের তো মাদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো! রাসূল সঃ এর মৃত্যুর বহুপূর্বেই আব্দুল্লাহ ইব্ন্ উবাইকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মাদীনাকে তার ষড়যন্ত্র মুক্ত করেছিলেন। শেষ বিপদ দাঁড়িয়েছিলো ঘরের শত্রু বিভীষণরা। তাকে সামলাতে আল্লাহ্‌র রাসূলকে মৃত্যু শয্যায় হিমশিম খেতে হচ্ছে। এক টুকরা কাগজ ও কলম চাচ্ছেন, দিচ্ছেনা! কাগজ কলমও কি আব্দুল্লাহ ইব্ন্ উবাই থেকে চেয়েছিলেন? তা তো নয়। তা হলে "যতো দোষ নন্দ ঘোষ" কেনো?

আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান হলো, পূর্ববর্তী দুশ্চরিত্র জাতিসমূহের পাপাচার ও তার ফলাফলের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে পরবর্তীদের সাবধান ও সতর্ক করা। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় যে পরবর্তী নির্লজ্জ ও অপরাধীরা নিজেদের পাপরাশিকেও পূর্ববর্তীদের উপরে চাপিয়ে নিজেরা গঙ্গাস্নাত রয়ে যায়।

মুসলিম নামধারী কুলাঙ্গারদের বানোয়াট তাফ্সীর ও হাদীস খুললে দেখা যায় যে, সকল পাপ ও অপরাধ শুধু আদ, সামুদ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের। তাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ্ মুখোজ্জল করুন সে সমস্ত খাঁটি মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসদের, যারা বলে দিয়েছে যে পূর্ববর্তী পাপীষ্ঠ জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো যাতে পরবর্তীরা সে পাপগুলো না করে। পরবর্তীতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যারাই এ পাপগুলো করবে, তারাই তার দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তীরা নয়।

বিশেষ করে ইব্ন্ আব্বাসের বর্ণনা পড়া মাত্রই দেখা যায়, সব দোষ নন্দ ঘোষের। সে ও তার বাপ দাদারা দুধেধোয়া নিষ্পাপ। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেতো যে, তার সমসাময়িক, মুয়াবিয়া, মারওয়ান, ইয়াযীদ, ইব্ন্ যিয়াদ ও হাজ্জাজরা কোন ইয়াহুদীদের ঔরসজাত ছিলো যে আল্লাহর রহমতের দ্বীনকে কুকুরে কামড়ানো সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত করেছিলো? এখনই বা আরবদেশে যে সাদ্দাম, আসাদ, হুসনী মুবারক, কাযযাফী, আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও ফাহাদরা ইয়াহুদীদের খেলাফত ক্বায়েম করে ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, জর্দান, মরক্কো ও জাযীরাতুল আরবে যে কান্ড করছে, তারা কোন্ ইয়াহুদীদের সন্তান? আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, কুয়েত ও আমিরাতে যা চলছে, তারাই বা কোনো ইবন উবাইদের ঔরসজাত?!

রাসূল সঃ তাঁর জীবনে সর্ববৃহৎ সমর সজ্জা প্রস্তুতি ও নিজহাতে পতাকা বানিয়ে ও বেঁধে তিরিশ হাজারেরও বেশী সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে তাঁর নিয়োগ করা সেনাপতি উসামাহর হাতে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে প্রদান করে বললেন, "যারা উসামাহর অভিযানে যাবে না, তাদের প্রতি লা'নত।" এ লা'নত কার? আল্লাহ্ ও রাসূলের। (আল মিলালু ওয়ান্ নাহল-২১ পৃষ্ঠা) আবু বকর ও উমর সহ শিশু নারী ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকল সুস্থ ও সবল মুহাজির ও আনসারকে বাধ্যতামূলক উসামাহর অধীনে যুদ্ধে যেতে আদেশ দেয়া হয়। ইসলামে জিহাদের ইমামত নামাজের ইমামতের উর্ধ্বে। জিহাদের ইমাম সালাতেরও ইমাম। কিন্তু সালাতের ইমাম সব সময় জিহাদের ইমাম হয় না। তাই প্রথমটাকে বলা হয় ইমামতে কুবরা এবং দ্বিতীয়টাকে ইমামতে সুগরা বা বড়ো ইমামত ও ছোটো ইমামত। উসামাহ জন্মসূত্রে পিতা-মাতা এবং রাসূল সঃ এর বিশেষ লালন-পালনে, শিক্ষা-দীক্ষা, আদব ও আখলাক্ব এবং ক্বোরআন ও সুন্নাতে রাসূলের জ্ঞানে অসাধারণ তীক্ষ্ম প্রতিভাধর যুবক ছিলো বলে সীরাত গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। তা না হলে রাসূল সঃ তাকে সবার উপর প্রাধান্য কেনো দিতে যাবেন? তিনি কি আল্লাহর হুকুম ব্যতীত এতো বড়ো একটি কাজ করতে পারেন? তিনিতো তাঁর সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুধু অহীর আদেশেই করতেন?! এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি তাঁর খেয়াল খুশী মতো করতেন, নাউযুবিল্লাহ্, তা করে যদি বলতেন যে এ আল্লাহর হুকুম, এবং যারা তা' পালন করবেনা, তাদের

উপর আল্লাহর লানত, তা' হলে কি তা' আল্লাহর নামে বানিয়ে বলা হতোনা? তা হলে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর ঘাড়ের রগ কেটে দেয়ার হুমকি কার্যকর হতো না?

যে সমস্ত মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা বলে বা বলবে যে সেনাপতি ও ইমামতো এক নয়, তাদের জন্ম জাহিলী উপনিবেশবাদী বেতনভোগী লুটপাটের সেনাবাহিনীর আতুর ঘরে। ইসলাম, ইসলামী জিহাদ, বিশ্ব ইসলামী ইমামত প্রতিষ্ঠা ও শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে এদের কোনোই ধ্যান ধারণা নেই। এদের কথায় কান দেয়াও নির্বুদ্ধিতা। যার নির্দেশে শত শত, হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্তের সমুদ্র সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষ বেহেশতে যাবে, তাদের তুলনা শান্তিতে ঘরে বসে দু'চার রাকাত নামাজের ইমামের সাথে।?

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে কড়া ভাষায় বলে দিয়েছেন, "তোমাকে ধৈর্য্য সহকারে সে সমস্ত মুস্তাদআফদের সাথেই জীবন কাটাতে হবে, যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল আল্লাহকেই ডাকে, তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই চায়। তুমি পার্থিব জীবনের জৌলুস কামনা করে ওদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে সমস্ত মুস্তাকবিরদের অনুসারী হয়ো না, যাদের নফ্স পূজার জন্য আমি তাদের অন্তর আমার যিকির থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। কারণ তাদের কাজ হলো সীমালঙ্ঘন"। (সূরা কাহ্ফ-২৮)।

মক্কার কোনো এক ক্বোরেশী মুস্তাকবির এসে রাসূল সঃ কে বলেছিলো যে তোমার মজলিস থেকে বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইব্ন্ মাসউদ ও খাব্বাবদের উঠিয়ে দিলে আমরা এসে তোমার কথা শুনতে আসতে ও বসতে পারি। কিন্তু এ ছোটোলোকগুলো তোমার চারপাশে থাকলে তাদের উপস্থিতিতে তাদের সাথে আমাদের বসা সম্ভব নয়। সরল সদিচ্ছায় রাসূল সঃ ভেবেছিলেন যে সমাজের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো তাঁর দাওয়াতের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে। তাই তিনি বেলাল ও আম্মারদের সাময়িকভাবে উঠে যেতে বলেছিলেন। আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে অহী নাযিল করে তিরস্কার করে তা থেকে রাসূল সঃ কে বিরত করেন। তারপর রাসূল সঃ মুস্তাদআফদের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনেন। এরপর মুস্তাদআফরা যে পর্যন্ত রাসূল সঃ এর দরবার থাকতো, রাসূল তাদের ছেড়ে দরবার থেকে কখনো উঠতেন না। ফলে মুস্তাদআফরা নিজেরা দরবার থেকে উঠে গিয়ে রাসূল সঃ কে উঠার সুযোগ করে দিতো।

উপরে উল্লেখ করা মুসলিমের হাদীসে রাসূল সঃ আব্দুর রহমান ইবন আউফদের যা থেকে সাবধান করেছিলেন, রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পূর্বেই সে ক্বোরেশী মুস্তাকবির আশারায়ে মুবাশ্শারারা তার রিহার্সেল আরম্ভ করে দিয়েছিলো। তখনো রোম পারস্য বিজয় হয়নি। শুধু আভাস পেয়েছিলো।

রাসূল তাঁর তথাকথিত পার্শ্বচরদের হাবভাব দেখে তারপর ঘটিতব্য ব্যাপার আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই উসামাহর ব্যাপারটিকে লিখিতভাবেও নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তার প্রমাণ সূরা কাসাসের আয়াত নং ৫ ও উসামাহর নিয়োগ। তাঁকে কাগজ কলম দেওয়া হলোনা। সূরা হুজুরাতের কঠোর আদেশ অমান্য করে তাঁর সামনে উচ্চস্বরে বিবাদ করে বলা হলো, "রাসূল মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রলাপ বকছেন, কাগজ দেয়ার দরকার নেই"। আল্লাহ্ বলেন, রাসূল অহীর বাইরে কিছু বলেন না। আর ওরা বলছে, রাসূল প্রলাপ বকছেন! এরা কি সূরা হুজুরাত নাযিলের পর তাওবা করেছিলো? না এরা আব্দুল্লাহ ইবন্ উবাই মুনাফিক বা অন্য কোনো ইয়াহুদী খৃষ্টান ছিলো?

রাসূল সঃ তাঁর জীবনের শেষ কথা ও শেষ দোয়া দিয়ে যান তাঁর প্রিয়দের সন্তান তাঁর প্রিয়তম উসামাহকে। তারপর আর তিনি কারো সাথে কোনো কথা বলেননি। তিনি চোখ বুজেন এবং বিদায় নেন পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ মানব সমাজ থেকে। إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

"অবশ্য তুমিও মরবে, তারাও মরবে, তারপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতন্ডা করবেই।" (সূরা ঝুমার-৩০-৩১) ক্বেয়ামতের দিন আমি অন্ততঃ রাসূল সঃ এর পক্ষ নিয়ে ক্বোরআনের আয়াত অনুযায়ী বাক-বিতন্ডায় শরিক হবো। দেখবো রাসূল সঃ জিতেন, না ঐ সাহাবীরা। ক্বোরআনের এ স্পষ্ট আয়াতের পরও বিরোধ! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন!!

রাসূল সঃ ইন্তেকাল করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন। উমর ইবন্ আল খাত্তাব বলেছে নাকি রাসূল মরেননি। তাঁর লাশ মুবারক মৌজুদ। রাসূল নাকি হযরত মূসার মতো অহী আনতে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গিয়েছেন। আবার তিনি ফিরে আসবেন। একি ছেলেখেলা! ক্বোরআন কি বলেছে আর উমর কি বলেছে? যারা রাসূল সঃ ইন্তেকাল করেছেন বলেছে, তারা নাকি মুনাফিক্ব! উপরের আয়াতটি কি কোনো মুনাফিক্বের বানানো? ঈমান ও ইসলাম যে ভাববাদী ধর্ম নয়। এ'যে বাস্তববাদী আল্লাহ্র দ্বীন! সুস্থ হলে বাস্তববাদী হও। পাগল হলে পাগলা গারদে

যাও। আল্লাহ্‌র দ্বীনে পাগলের ইমামতি নেই। সঠিক প্রেম সঠিক মানুষকে পাগল করে না। দৃঢ় ও স্থীর করে। পাগল প্রেমিকের সাথে বাস্তববাদী প্রেমিকা বিয়ে বসে না। বড়োজোর বেচারা পাগলের জন্য সমবেদনা থাকে। কারণ পাগলের সাথে ঘর করা যায় না। আল্লাহ্‌র পাগল ইব্রাহীম, আল্লাহ্‌র পাগল মূসা, আল্লাহ্‌র পাগল ঈসা, ও আল্লাহ্‌র পাগল মুহাম্মাদ সঃ গণ। তাঁদেরও পাগল বলা হয়েছে। তাঁরা কি আল্লাহ্‌র বিধান ও ক্বোরআন বিরোধী ভাববাদ ও পাগলামী করেছেন?

ধীরস্থীর ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ আবু বকর। তাই রাসূল সঃ এর ইন্তেকালে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে শান্তভাবে। ক্বোরআনের আয়াত পড়ে সে মানুষকে বুঝিয়েছে যে এ মৃত্যুই স্বাভাবিক। মু'মিন হতে হলে সর্বপ্রথম চাই এ ধীরস্থীরতা। সাধারণ নেতা ও শাসনকর্তা হতে হলে সেখানে ধীরস্থীরতা অপরিহার্য। সেখানে বাবা আদম আঃ থেকে আরম্ভ করে খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ পর্যন্ত সকল নবীদের রিসালাত বাস্তবায়নের ইমাম যে হবে, তার মস্তিষ্ক কতোটুকু ঠান্ডা হওয়া প্রয়োজন? মুহাম্মাদ সঃ এর খেলাফতই হলো বিশ্ব ইমামতের সনদ ও মসনদ।

উমর ইবনুল খাত্তাব অপ্রকৃতস্থ হয়ে নাঙ্গাতলোয়ার নিয়ে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর ঘটনাকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা না করে বরং রাসূলের নিয়োগকৃত উসামাহর ইমামত বিরোধীদের গর্দান উড়ানোর হুমকি দানই স্বাভাবিক ছিলো। তা'তো সে করেনি! বরং পরবর্তিতে আবু বকরকে নিয়ে সাক্বীফা বনী সা'আদায় ক্বোরেশী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপারেশনের পক্ষে এ্যানেস্থেশিয়া প্রয়োগের প্রচেষ্টা বলেই তার হুমকিকে মনে হয়।

অপর দিকে রাসূল সঃ এ মৃত্যুতে স্বাভাবিক শোক প্রকাশের পর আবু বকর এক তাৎপর্যপূর্ণ কথা ঘোষণা করে। শুনতে অতীব সুন্দর তার কথাটি ছিলো, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله حي لا يموت

"তোমরা যারা এতোদিন মুহাম্মাদের পূজা করেছো, আজ সে মুহাম্মাদের জীবনাবসান হয়েছে। এবং যারা আল্লাহর পূজা করেছো, আজ সে আল্লাহ্‌ জীবিত, তাঁর মৃত্যু নেই। (বোখারী) আমি শৈশব থেকেই প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করি। আল্লাহ্‌ আমাকে ক্বোরআন ও আল্লাহ্‌র রাসূলদের জীবনী বুঝার যখন থেকে বুঝ দান করেছেন, তখন থেকে আমি খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর শৈশব, নবুওতী জীবন, তাঁর মৃত্যু ও তারপর তাঁর পরের খেলাফত ও মুসলিম জাতির দুরাবস্থার কারণ বুঝার অধ্যাবসায় আরম্ভ করি। সর্বপ্রথম যখন রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর আবু বকরের উচ্চারিত এ বাক্যদুটি পড়ি, তা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এ কেমনতরো কথা যে মানুষ রাসূল সঃ কে পূজা করবে? আবু বকর একথা দিয়ে কাদের প্রতি ইংগিত করছে? রাসূল সঃ এর জীবনে এমন কথা তো ভাবাও যায় না! রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় যদি কেউ বা কোনো শ্রেণীর লোক তাঁকে পূজা করে থাকে, তাহলে আবু বকরের সে যোগ্যতা বা শক্তি কোথায় যে সে তাকে ঠেকায়! আবু বকরকে কি রাসূল সঃ এর চেয়ে তাওহীদবাদী ভাবা যায়? প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর আমি দেশী-বিদেশী বহু ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তিদের কাছে জানতে চেয়েছি। কিন্তু কারো কাছে তার মনঃপুত উত্তর পাইনি। প্রায় এক যুগ ধরে মক্কায় বহু পুস্তক ঘেটেছি। লক্ষ লক্ষ টাকার দুষ্প্রাপ্য কিতাব বই কিনেছি। একদিকে বাবা আদম ও ইব্রাহীম আঃ-দের দ্বারা নির্মিত আল্লাহ্‌র ঘর কা'বার ছায়ায় দেশ-বিদেশ থেকে আগত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর অনুসারী বলে দাবীদার হজ্ব ও ওমরা আদায়কারীদের চাল চলন ও বলন কথন লক্ষ্য করেছি, অপর দিকে ইসলামের উপর রচিত প্রাচীন, মধ্যযুগ ও অধুনা কিতাবাদীর পৃষ্ঠা উল্টিয়েছি। ক্বোরআন ব্যতীত অন্য কিছুতেই তৃপ্তি পাইনি। ইলমে লাদুন্নী বা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ধারক বাহক নবী রাসূলরা। তাঁদের শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ সে জ্ঞানের পূর্ণ প্রজ্ঞা ও প্রভাত। তাঁকে আল্লাহ আদেশ করেছেন পড়তে "রাব্বি যিদ্‌নী ইলমা", হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। আমার বাপ দাদার দেয়া নামের তিনটি অংশই আখেরী নবী সঃ এর নাম ও গুনবাচক। মায়ের নামও হাজেরা। বাবা আল্লাহর বন্ধু। তারপর শৈশবে পিতৃহারা হয়ে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীরূপে আমি বরাবরই স্পর্শকাতর আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই সবকিছু একত্র করে আল্লাহ্‌র ঘর ধরে তাঁর কাছে উসিলা চেয়ে রাব্বি যিদ্‌নী ইলমার মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম। মক্কা ও সৌদী সমাজের নিচতলা ও উপরতলা সব দেখে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃ দের আদর্শে বাইতুল্লাহ মুক্ত ও পবিত্র করার জন্য অন্তর উজাড় করে দোয়া করতে লাগলাম। যাতে পুনঃ মক্কা বিশ্ব মুসলিমের জন্য মুক্তাঙ্গন হয়। বর্তমানে মক্কা ও মদীনা নিকৃষ্ট মুশরিকদের হাতে জিম্মী ও বন্দি। যাদের অভিভাবক ওয়াশিংটনের খৃষ্টান ও তেলআবিবের ইয়াহুদী চক্র। এরা সবাই পরস্পর Cousin

এর মধ্যে হঠাৎ করে ইরানে শিয়া বিপ্লব ঘটলো। এরা সুন্নীদের মতো মুদ্রার অপরপিঠ বর্ণবাদী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে একটি অতিব মৌলিক দিকদর্শন দিলো। তাও দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দিয়ে। শব্দ দুটি "মুস্তাকবির" ও "মুস্তাদআফ"।

আল্লাহ্র দ্বীন ও শয়তানের ধর্ম এ'দুটি মাত্র বাগধারায় সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ্র সকল ঈমানদার বান্দারা সর্বস্থানে ও সর্বযুগে মুস্তাদআফ্। ইবলিস্ শয়তান ও তার মানুষ অনুসারীরা সর্বস্থান ও সর্বকালে মুস্তাকবির। মুস্তাদআফরা বাবা আদম থেকে ক্বেয়ামাত পর্যন্ত "মুস্তাদআফুন"। তাদের কোনো পৃথক জাত, বর্ণ ও ভেদাভেদ নেই। তারা শুধু ভাই। "ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াহ্"। নবী রাসূলরা এদের মানদন্ড।

মুশরিকরা ইবলিসের অনুসারী বহুজাতিক সত্তা। বরং এরা যতো জন ততো মত, যতো মন ও ততো রং। এরা মানব বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ। "তাহ্সাবুহুম জামীআঁও ওয়া কুলুবুহুম শাত্তা" আল্লাহ্র ভাষায় এদের সংজ্ঞা। এরা সবাই তাগুত। মুস্তাকবিররা কখনো খাঁটি ঈমানদার হতে পারে না। মুস্তাদ্আফদের জন্যই আল্লাহ্র দ্বীনের দুয়ার পূর্ণ খোলা। হেদায়েত প্রাপ্তির প্রত্যেক প্রত্যাশীকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে আল ক্বোরআন অনুযায়ী জান্নাত ও জাহান্নামের সড়ক দুটির নাম ফলক্ "মুস্তাদআফুন" ও "মুস্তাক্বিরুন"। আল ক্বোরআনের তেরো জায়গায় আল্লাহ্ তাঁর মুস্তাদআফ বান্দাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ৫৫ স্থানে "মুস্তাকবির" খচিত। ইরানী বিপ্লব আমার জন্য একই সাথে দুঃখ ও আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। দুঃখের এ অর্থে যে ইরানের শিয়ারা সত্যের সন্ধান পেয়ে, সত্যের পতাকা উত্তোলন করে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে প্রতারিত করে মিথ্যার গহবরে পতিত হলো। আনন্দের এ অর্থে যে সুন্নীদের ন্যায় শিয়ারাও ক্ষমতা পেয়ে মুস্তাকবির হয়ে প্রকৃত মুস্তাদআফদের পথ পরিষ্কার করে দিলো। সুন্নী ও শিয়া যে রাসূল সঃ এর নামে বানানো সম্পূর্ণ মিথ্যা জালিয়াতপূর্ণ দুটি তথাকথিত হাদীসের অবৈধ পেটে জন্ম নেয়া দাজ্জালী ফিত্না, তা' দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো। হাদীস দুটি পূর্বে উল্লেখ করা হলেও স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পূনঃ তার উদ্বৃতি দিচ্ছি। (১) "আমার পর পর বারো জন খলিফা হবে, এবং তারা সবাই ক্বোরেশ বংশ থেকে হবে"। এ বারো জনের মধ্যে মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানও অন্তর্ভূক্ত। এরা সুন্নীদের পূর্ব পুরুষ। (২) "আমার পর বারো জন ইমাম হবে, তারা সবাই ক্বোরেশ বংশোদ্ভূত"। আলী থেকে এদের শুরু। এদের বারো নং ইমাম নাকি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে সুন্নীদের ভয়ে আত্মগোপন করে আছে। এরা শিয়াদের পূর্ব পুরুষ। এরা উভয় গোত্রীয় রক্তীয় বর্ণবাদী, এবং সমশ্রেণীর "মুস্তাকবিরুন"। ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে এদের সন্ত্রাসীরা মুখোমুখি। "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এদের উৎস কালেমা।

এ অবস্থায় আল্লাহ্ আমার অন্তর "রাব্বিশরাহলী সাদরী"র অর্থে খুলে দিলেন। আমি হঠাৎ করে দেখতে পাই যে, আল্লাহ্র রাসূল সঃ ক্বোরআন ও মুস্তাদআফ যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহরা একই মহাসড়কে সমান্তরালে। কোনো বক্রতা ও ভাঁজ নেই। রাসূল সঃ এর দিকে দাঁড়ালে ক্বোরআন ও মুস্তাদআফদের একই কাতারে দেখা যায়। মুস্তাদআফদের দিকে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে ক্বোরআন ও রাসূল সঃ কে স্পষ্ট দেখা যায়। এদের ফাঁকে ফাঁকে আনসারদেরকে শূন্যস্থান পূরণকারীরূপে প্রায় একাকার মনে হয়। সত্যিকারের সহীহ্ হাদীস এদের ধারা বিবরণীর ন্যায় বুঝা যায়।

কিন্তু "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ, খোলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশ্বারা, আসহাবী কাননুজুম, পৃথিবীতে দু'জন ক্বোরেশী পাওয়া গেলেও ক্বোরেশ থেকে ইমাম হতে হবে এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত ইমামত ক্বোরশদেরই থাকবে" বোখারী মুসলিমের এ সহীহ(?) হাদীস সমূহের উপর দাঁড়ালে ক্বোরআন ও মুস্তাদআফ ও মাদীনার কোনো হদিস পাওয়া যায়না। কোথাও কোথাও খুব নিরিক্ষণ করলে খুব কষ্টে কখনো কখনো হঠাৎ করে রাসূল সঃ এর আওয়াজের মতো কিছু শব্দ শোনা যায়। তাও তাঁর কন্ঠস্বর কি-না, যাচাই করার কোনো উপায় নেই। রাসূল সঃ কে সশরীরে দেখা দূরের কথা।

তখন আমি "রাব্বি যিদনী ইলমা"র আলোকে অক্ষরিত গড় মিলের অবস্থান পরিবর্তন করে বাস্তব প্রামান্য চিত্র দেখার জন্য চৌদ্দশ দশ বছর পেছনে চলে যাই। ঈমানের বাস্তবে সকল ঈমানদাররা বাবা আদমের কয়েক মুহূর্ত ছোটো। আমরা সবাই মিলে "আলাস্তু বিরাব্বিকুম" এর মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। এ পৃথিবীতে ক্রমিক পদ্ধতিতে আগে পরে এসে পার্থিব ঝামেলায় পড়ে আমরা সে সম্মেলনের শপথবাণী ভুলে যাই বলে আল্লাহ্ নবী রাসূলদের পাঠিয়ে আমাদের সম্মেলনের মাইনিউট্স স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এ ব্যবস্থা আল্লাহর বাড়তি দয়া ও মেহেরবাণী। তা না করলেও আমাদের সবাইকে রোজ ক্বেয়ামতে আলাস্তুর অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই পার্থিব জীবনের হিসাব দিতে হতো। নবী রাসূলরা সনাতন সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে প্রেরিত। নতুন করে কোনো সত্য প্রচার বা সৃস্টি করার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁদের নেই। তাই, "নবী পাঠাননি কেনো, আমরা নবী রাসূল পাইনি," এ সমস্ত কথা

ক্বেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্কে বলা যাবে না। বললে তিনি শুনবেনও না, মানবেনও না। তিনি শুধু রেকর্ড বাজিয়ে শুনাবেন, "আলাস্তু বিরাব্বিকুম, ক্বালু বালা।"

আলাস্তুর আলোকে আমি বাবা আদম থেকে খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সঃ কে, তাঁদের রিসালাত সহ সবকিছু দেখতে পাই। দেখায় ভুল হয় কিনা, যাচাই করার জন্য লাউহে মাহফুজে রক্ষিত কিতাবের অনুলিপি আল্ ক্বোরআন খুলি ও পড়ে দেখি। সব পরিস্কার হয়ে যায়।

এ ভাবেই মদীনায় চলে যাই চৌদ্দশ দশ বছর পেছনে। গিয়ে দেখি রাসূল সঃ কবরে। ক্বোরেশী ইমামরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করছে। আবু বকর প্রথম ক্বোরেশী খলিফা ও ইমাম। রাসূল সঃ এর মুয়াযযিন বেলাল মাদীনা ত্যাগ করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে। উসামাহ কোনো দায়িত্বে নেই। আম্মার, ইব্ন মাসউদ, সুহাইব ও সালমানদের একই অবস্থা।

রোম পারস্য জয় হয়েছে। মদীনায় সম্পদের বন্যা। উসামাহ, আম্মার ও সালমানদের মোটামুটি ভালো ভাতা দেওয়া হচ্ছে। দেখা হলে কাকেও "মারহাবা ইয়া আমীরী" বলা হতো। ইতিহাসে দেখা যায় যে উমর খলিফা হওয়ার পর উসামাহকে দেখলে "আমার আমীর" বলে সৌজন্য প্রকাশ করতো, এবং উসামাকে তার ছেলে আব্দুল্লাহর চেয়ে বেশী ভাতা দিতো। আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আব্দুল্লাহ ইব্ন্ মাসউদদের প্রতিও সৌজন্যও প্রকাশ করা হতো। কারণ, আল্লাহ্ ও রাসূলের দরবারে এ মুস্তাদআফদের অসাধারণ মর্যাদা রয়েছে, তা' ক্বোরআনে বর্ণিত। তাদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন আবু বকর ও উমরদের ক্ষমতার পক্ষে কল্যাণকর ছিলো না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে এদের কোনো করণীয় ছিলোনা। রাসূল কর্তৃক দেয়া সকল দায়িত্ব থেকে এদেরকে অবসর দিয়ে তাদের স্থলে ক্বোরেশী ধূর্ত মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আসী, খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ও মুগীরাদের সকলগুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন, الولد سر لابيه "পুত্র পিতার গোপন চরিত্রের প্রমাণ"।

তাই পিতা প্রশংসিত হলে মনে করতে হবে যে পুত্রের মধ্যে সৎ গুণাবলীর সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি পিতা নিন্দিত হয়, তা হলে পুত্র হতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর এ নিন্দা যদি স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকে ক্বোরআনে বর্ণিত হয়, তা হলে তো সর্বনাশ! সাপ বিচ্ছুর চেয়েও এদের ব্যাপারে সাবাধান হতে হবে। এরূপ নিন্দিত পিতার ঔরসে যদি ব্যতিক্রমধর্মী ভালো সন্তান জন্মে, তা হলে সে পুত্রই পিতার নিন্দা করে নিজেকে তা'থেকে মুক্ত করে নিবে। এ শ্রেণীর পুত্ররা মানব কুলের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের দৃষ্টান্ত সাইয়েদুনা ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ আঃ। হযরত ইব্রাহীম সঃ তার পিতা আযরকে অকাট্য যুক্তি দাঁড় করে ত্যাগ করে আল্লাহর খলীল হয়েছেন। আখেরী নবী তাঁর পিতা-মাতা, দাদা ও গোটা ক্বোরেশ গোত্রপতিদের তাদের শির্কের জন্য নিন্দা করে ত্যাগ করে খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীনের মুকুট অর্জন করেছেন।

আমি দেখতে পাই যে, রাসূল সঃ এর মৃত্যুতে তাঁর ইমামতের পরিসমাপ্তি ঘটে অভিনব ক্বোরেশী ইমামত প্রতিষ্ঠিত হতেই এ'দুয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম তফাত রাসূল এর মুয়ায্যিন বেলাল বুঝে ফেলে। তাই আবু বকরের ইমামতির আযান দিতে বললে বেলাল তাকে সঠিক উত্তর দিয়ে বোবা বানিয়ে দেয়। যার প্রতিউত্তরে আবু বকর টু শব্দটি করেনি। কারণ বেলাল, সে মুস্তাদআফ্ যার মাকে আল্লাহ্ আব্রাহার ধ্বংসের পর তার সাক্ষী স্বরূপ রক্ষা করে তার পেটে জন্মিয়ে আখেরী রাসূলের হাতে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মেরাজে গিয়ে রাসূল সঃ বেলালের পদধ্বনি বা আযানের ধ্বনি শুনে আসেন। মাদীনায় তাকে দিয়ে আযানের প্রচলন করেন। মক্কা বিজয়ের পর তাকে কাবার উপর উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"র আযান দিয়ে ক্বোরেশী-আরবী পৌত্তলিক নেতৃত্বের উৎপাটন করেন। তাই আবু বকর ও উমররা এদের সামনে তুলনামূলক নিস্প্রভ। আমি দেখতে পাই যে, আলী ও ফাতেমা আবু বকরের একচ্ছত্র ক্বোরেশী ইমামতির বায়আত হচ্ছে না। রাসূল সঃ এর নিকট ফাতেমার মর্যাদা সম্পর্কে নতুন করে বলার কি কিছু আছে? রাসূল সঃ এর মেয়েদের মধ্যে বিবি ফাতেমাই সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। মক্কায় রিসালাত প্রাপ্তির পর রাসূল সঃ এর উপর কাবায় সালাতরত অবস্থায় সিজদায় কাফিররা আস্ত উটের ভুড়ি এনে রাসূল সঃ এর উপর চাপিয়ে দেয়। তখন ফাতেমা এসে সে অবস্থায় তা সরাতে চেষ্টা করে। তখন তার বয়স পাঁচ ছ' বছর। অন্যান্য মেয়েরা বড়ো ছিলো বিধায় বিবাহ হয়ে স্বামীর বাড়ী চলে গিয়েছিলো। ফাতেমা সর্ব কনিষ্ঠ ছিলো বলে সর্বদা বাবার সাথে থাকতো। পঁচা উটের ভুড়ির নিচে দমবন্ধ হতে দেখে "ওয়া আবাতাহ, ওয়া আবাতাহ", হায় আব্বু, হায় আব্বু বলে কেঁদে কেঁদে সরাতো, লোক ডাকতো। মা খাদিজার মৃত্যুর পর এ ক্ষুদে মেয়েটিই বাবার দেখা শুনা করতো। বহুদিন পর মা আয়শার ও সাওদার সাথে রাসূল সঃ এর

বিবাহ হলে তারপর আলীর সাথে ফাতেমার বিবাহ হয়। সে পর্যন্ত খাতামুন নাবিয়্যীন পিতার সংসারের দায়িত্ব ফাতিমাই পালন করে। এ সবে সহজেই অনুমেয় যে এ পিতা-পুত্রির মধ্যে সম্পর্ক কতো নিবিড় ছিলো। তাই রাসূল সঃ বলতেন যে ফাতিমা তাঁর দেহের টুকরা, তাকে যে খুশি করবে, সে রাসূল সঃ কে খুশী করবে। তাকে যে কষ্ট দিবে, সে রাসূল সঃ কে কষ্ট দিবে। রাসূল সঃ ইন্তেকাল করেছেন। তখনো তাঁর দাফন হয়নি।

ওদিকে রিসালাতের কালেমায় তাইয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাদ দিয়ে জাহেলিয়াতের কালেমায়ে খবীসা "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" উচ্চারিত হয়ে উম্মত দু টুকরায় জবাই হয়ে গোত্রীয় ভিত্তিতে আবু বকর ফাতেমার পিতার স্থল দখল করে। ফাতেমা সাধারণ অংকে দেখতে পায় যে তার পিতা যুগ যুগ ধরে কাবা ঘরের সেবাইত বনী হাশিমের। বনী হাশেম ক্বোরেশের একক ধর্মীয় নেতা। তার শ্বশুর আবু তালিব কাবার ঠাকুর ছিলো। সে হিসাবে ইসলামের নেতৃত্ব যদি ক্বোরেশদের জন্যই নির্ধারিত রয়ে যায়, তা হলে তা অবশ্যই তার স্বামী আলীর হাতেই আসা যৌক্তিক। কারণ, আলীর বড়ো ভাই জাফর বেঁচে থাকলে অবশ্যই সে আবু তালিবের স্থলাভিষিক্ত হতো। সে নাই যখন, তখন আলীই তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ আলী রাসূল সঃ এর ঘরেই আশৈশব লালিত পালিত। মেয়ে মানুষের এ হিসেব হওয়া স্বাভাবিক। আনসার, মুস্তাদআফ ও অন্যান্য সকল ঈমানদারদের বাদ দিয়ে যখন আবু বকর ও উমর ক্বোরেশবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তখন আলীও তাদের দাবী দিয়েই আবু বকর ও উমরকে ঘায়েল করেছিলো এ বলে যে, তাহলে বনী হাশিমেরই তা প্রাপ্য। তাল্‌হা, যুবাইর ও আব্বাস এ যুক্তি ধরেই আলীর ঘরে জমায়েত ছিলো। পরে আবু বকর ও উমর তাদের সমর্থকদের নিয়ে জোর করে তালহা ও যুবায়রের বায়আত নেয়। পরে আলীকে ধরে আনতে গেলে ফাতিমা দরজা বন্ধ করে তাদের বাধা দেয়। সে অবস্থায় উমর ফাতিমার ঘরের চার দিকে লাকড়ি জমা করে আগুন লাগাতে চেষ্টা করে। এ অবস্থায় এক পর্যায়ে উমর দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে সদল-বলে আলীকে ধরে নিয়ে যায় মসজিদে নববীতে। তাতেও আলী আবু বকরের হাতে বায়আত হয়নি। এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে যে, তা হলো রাসূল সঃ যদি সত্যিই সুন্নীদের মতানুযায়ী নামাজের ইমামতির দ্বারা আবু বকরকে খলিফা হওয়ার ইংগিত করে যান, তাহলে কি তা' আলী জানতো না? জেনেও কি আলী তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে?

উমরের ধাক্কাধাক্কীতে দরজা ভেঙ্গে তার আঘাতে অন্তঃসত্তা ফাতিমা নাকি মাটিতে পড়ে গেলে তার গর্ভপাত ঘটে। সে জটিলতায় নাকি ভুগে ছ'মাস পর ফাতিমা মৃত্যু বরণ করে। ঘটনার এ অংশটি হতে পারে শিয়াদের বানানো। কিন্তু ফাতিমা যে আবু বকরের হাতে বায়আত হয়নি এবং ছ'মাস পর তার মৃত্যু হয়েছে, তা সর্বস্বীকৃত সত্য। তাতে কোনো দ্বিমত নেই। মৃত্যুর পূর্বে ফাতিমা অসিয়ত করে যায় যে আবু বকর ও উমর যেনো তার জানাযায় অংশগ্রহণ না করে। তাই হয়। ফাতিমার মৃত্যুর পর আলী তার জানাযা পড়ে দাফন করে। আবু বকর ও উমরদের ফাতিমার জানাযায় শরিক করা হয়নি।

এভাবে আবু বকরের মাধ্যমে ক্বোরেশী ইমামত বা খেলাফত চালু হয়। রক্তপাত এড়িয়ে মুস্তাদআফ্ ও আনসাররা আল্লাহ্ ও রাসূলের আমানত বুকে ধারণ করে নিজ নিজ ঈমান বাঁচানোর পথ বেছে নেয়। কারণ, অপর পথ ছিলো খুনাখুনি ও মারামারির। সে নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র পথে ধৈর্য্য ধারণকেই তারা তাদের করণীয় স্থির করেছিলো। আবু বকর উমরের যুগ কেটে যায়। আসে উসমানের যুগ। ক্বোরেশী উমাইয়াদের যুগ। রাসূল সঃ এর অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হাকাম, মারওয়ান, ওয়ালীদ ইবন্ উকবা ও আব্দুল্লাহ ইবন সারাহদের যুগ। এদের হাতে দৈহিকভাবে নির্যাতিত হয় ইব্‌ন্ মাসউদ ও আম্মার। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী, অন্যায়ের প্রতিবাদী জুন্দুব্ ইব্‌ন্ জুনাদাহ ওরফে আবু যর গিফারী সত্য বলার অপরাধে উসমান কর্তৃত নির্বাসিত হয়ে একাকী এ নির্জন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করে। অথচ আল্লাহর চূড়ান্ত নবী বলেছেন, ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لحن من أبي ذر

"ধরার ধুলা ও বৃক্ষের ছায়া আবু যরের চেয়ে সত্যবাদীকে পদচারণ ও বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম নিতে দেখেনি।" ইবন মাসউদ আবু জেহেলদের মার থেকে বেঁচে হিজরত করে রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়ে ইসলামের বিজয় দেখে। বদরের যুদ্ধে আবু জেহলের মাথা কাটে। কিন্তু উসমানদের হাতে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। (দেখো, আল্ ইমামাহ্ ওয়াস্‌সিয়াসাহ, ইবন কুতাইবাহ) সে যাত্রা মা উম্মে সালমার হস্তক্ষেপ ও শুশ্রুষায় আম্মার প্রাণে বেঁচে যায়। উসমানের পর আলীর ক্বোরেশী ও হাশেমী ইমামত আরম্ভ হয়। উসামাহকে ধরে আনা হয় আলীর পক্ষ নিতে। রাসূল সঃ এর নিয়োগকৃত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আশরায়ে মুবাশিশারা ও সকল মুহাজির ও আনসারদের ইমাম ও

আমীর, প্রধান সেনাপতি উসামাহ্ পূর্ববৎ নিরপেক্ষ থাকতে চাইলে তাকে গণপিটুনি দেয়া হয়। নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বারাকাহ, যায়দ ও রাসূলের "হিব্ব ইবনুল হিব্ব" স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যায়। কোথায়? জুরুফে। এ জুরুফ সে ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে ছাউনী করে তিরিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে তার হাতে পতাকা বেঁধে রাসূল সঃ জীবনের অন্তিম কালে উসামাহকে সর্বাধিনায়ক করে পতাকা হস্তান্তর করে শেষ বারের মতো হাত তুলে দোয়া করে বুকে হাত মুছে বিদায় নেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। রাসূলের সেনাপতি রাসূলের নির্বাচিত স্থানে নির্বাসিত হয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে হিজরী ৫৪ সনে। (দেখো, দাইরাতুল্ মা' আরিফুল ইসলামিয়্যাহ, দ্বিতীয় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) আল্লাহ্ নাম সহ ক্বোরআনে প্রশংসিত যায়দ, রাসূল সঃ এর পালকমাতা বারাকাহর সন্তান ও রাসূল সঃ এর প্রিয়তম উসামাহকে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পরও দীর্ঘ ৪৫ বছর জীবিত রেখে আরব মরুবাসীদের দেখালেন, "তারা যদি তাক্বওয়া, বিদায় হজ্জের ভাষণ ও রাসূল সঃ এর নিয়োগের শিক্ষায় উসামাহর ইমামতের অনুসারী হতো, তা'হলে কি তাদের উপর বনী ইসরাঈলের উপর গৃহ বিবাদ ও যুদ্ধে فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ "নিজেরা নিজেদের হত্যা করার" আযাব নাযিল হতো? উমর, উসমান, আলী, তালহা ও যুবায়ররা কি এভাবে মরতো? আয়শার পেছনে উটের যুদ্ধে কি তোদের পনের হাজার সাহাবী কচুকাটা হতো? আলী মুয়াবিয়ার সিফফীন যুদ্ধ হতো? মুয়াবিয়া, মারওয়ান, মুগিরা ও আমর ইবন্ আল আসীদের চার কুচক্রীর মরণ ফাঁদ সৃষ্টি হতো? হাররার যুদ্ধ, মাদীনায় গণধর্ষণ ও কা'বায় অগ্নিসংযোগের মতো বিয়োগাত্মক ঘটনা ঘটতো?

রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় উসমান ও মারওয়ান চক্র কি আম্মার ও ইবন্ মাসউদের গায়ে হাত তোলার কল্পনাও করতে পারতো? আলীই বা উসামাহর উপর কোনো দুর্ব্যবহার করার দৃশ্য ভাবতে পারতো? আমি মনে করি না, বিশ্বাস করে ইয়াক্বীনের সাথে বলতে পারি যে এ সব কিছুর পেছনে মাত্র একটি কারণ, তা হলো আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা। রাসূল সঃ তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে গিয়েছেন, "যারা উসামাহর আনুগত্য করবে না, তাদের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের লানত"। এ লানত অমান্যকারীদের প্রায় সকলের পরিণাম উসামাহ ৫৪ হিজরী পর্যন্ত জীবিত থেকে স্বচক্ষে দেখে গিয়েছে। এ কি করে সম্ভব যে মসজিদে নববীতে রাসূল সঃ এর নিয়োগকৃত, বহুবার বহু প্রকারে বলা রাসূলের প্রিয়তম পালক মা, প্রিয়তম পালিত যায়দের পুত্র ও তাঁর হিব্ব ইবনুল হিব্ব, উসামাহ ঐ মসজিদেই দৈহিকভাবে নির্যাতিত হবে, যার মিম্বারে দাঁড়িয়ে রাসূল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাকে মুসলিম উম্মার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে যান? তার অধীনে আবু বকর, উমর ও আলীরা সবাই সাধারণ সিপাহী ছিলো! যায়দের অধীনে জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা তবুওতো দু'উপসেনাপতি ছিলো। উসামাহর অধীনে তো এরা তাও ছিলো না। শুধু ছিলো সাধারণ সৈনিক। "রাম শালিকের ঘাড়ের রো" রাসূল সঃ দেখেছিলেন। তাকেই বশ করার জন্যই আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল সঃ মুস্তাদআফ্ ইমামের সর্বোত্তম আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে অমান্য করার ফলেই পরবর্তী সকল বিপর্যয় এসেছে, এবং এ পর্যন্ত তারই জের চলছে। এ বই লিখে সে রিটার্ডেড ওয়াচকে রিঅর্ডার্ড বা উল্টে দেয়া ঘড়িকে ঠিক করে দেয়া হচ্ছে। তার বেশী কিছুই করা হচ্ছে না। ইসলাম আল্লাহ্র দ্বীন। আবু বকর, উমর, আলী ও মা আয়শাদের পকেটধর্ম দুরে থাক, খোদ রাসূল সঃ এর পৈত্রিক ক্বোরেশদেরও ধর্ম নয়। ইসলাম শুধুমাত্র আল্লাহ্র দ্বীন। আদম থেকে খাতামুন নাবিয়্যীন পর্যন্ত সকল নবী আল্লাহর দাসরূপে সে দ্বীনের অনুসারী। তাতে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতির কারো অধিকার ও শক্তি নেই। কিন্তু করতে গেলেই ঘাড়ের রগ কেটে দেওয়ার জন্য ঝুলন্ত তরবারি রয়েছে। ক্বোরআনে নবী রাসূল থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রের জন্য আল্লাহর কঠোর নির্দেশ রয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "হে ঈমানদাররা, সাবধান! তোমরা আল্লাহ্র সাক্ষী স্বরূপ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অতন্দ্র দন্ডায়মান থাকবে, যদিও তা তোমার বিপক্ষে, পিতামাতার বিপক্ষে, অথবা তোমার নিকট জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। হোক না তাদের কেউ স্বচ্ছল বা দুস্থ। যে যাই হোক না কেনো, তাদের অভিভাবকত্বের জন্য আল্লাহ্ সর্বোত্তম। তোমাদের সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। সাবধান! বাতিকগ্রস্থ হয়ে সত্য বলতে তোত্লাবে না। বা পাশ কাটিয়ে যাবেনা। যদি তেমন কিছু করো, জেনে রাখবে, তোমরা যে যাই করবে, আল্লাহ্ তার সঠিক খবর রাখেন।" (সূরা নিসা-১৪) কারোই ইসলাম গ্রহণ করে ও ঈমান এনে আল্লাহ্ ও রাসূলকে কৃতার্থ করার কোনো সুযোগ নেই। সবাইকে কৃতজ্ঞ হতে হবে স্বীকার করে যে

আল্লাহই হেদায়েতের পথপ্রদর্শন করে তাদের কৃতার্থ করেছেন। এ স্বীকৃতি ও অনুভূতি যাদের থাকবে না, তাদের ঈমানের দাবি মিথ্যা। (সূরা হুজুরাত-১৭)। يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ক্বোরেশের ব্যক্তিবর্গ আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও অন্যান্যরা বাপ দাদার শির্ক ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরা ধন্য হয়েছিলো, আল্লাহ্, আল্লাহ্র দ্বীন ও রাসূল সঃ এর মাথা তারা নিলামে কিনেনি যে তাদের ভুল ভ্রান্তিকেও শোভিত ও অলঙ্কৃত করে গিলতে গিলাতে হবে। আল্লাহ্র নবী রাসূলরা ব্যতীত নবীদের পিতা মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ প্রত্যেক নরনারীকে আমৃত্যু নেক কাজ করে নাজাত পেতে হবে। জীবনের কোনো স্তরে, বদর উহুদের মতো যুদ্ধে রাসূলের সাথী হয়ে জিহাদ করে, পরে ভুল পথে মারামারি কাটাকাটি করলে পিছনের ভালো কাজ কোনো কাজে আসবে না। বরং পৃথিবীতে শান্তির পর অশান্তি সৃষ্টির পাপে নিশ্চিত জাহান্নামে যেতে হবে।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"সংস্কারের পর পৃথিবীতে কুসংস্কার প্রবর্তন করবে না" বলে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন। (সূরা আরাফ-৫৬) সবাইকে ঈমান আনার পর থেকে বিপথগমন থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আশা ও ভয়ে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকতে হবে। وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (সূরা আরাফ-৫৬)। আম্মার, ইবন্ মাসউদ ও উসামাহরা কি করে মার খেলো, এবং মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানরা আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুস্‌লিমীন হলো, তা দেখা যাক। রাসূল সঃ এর সতর্কবাণী, الولد سر لأبيه "পুত্র পিতার সুপ্ত চরিত্রের বিকাশ" উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাই ভালো পিতাদের সন্তানদের কাছ থেকে ভালোর আশা করতে হবে, এবং পাপিষ্ঠ পিতাদের সন্তানদের অনিষ্ট থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে আল্লাহ্ কিছু ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র দোষের এরূপ কদর্য চিত্র পবিত্র ক্বোরআনে বিশেষ করে কেনো আঁকতে যাবেন? পুত্ররা এরূপ পিতাদের বিপরীত কাজ করেই তাদের পিতাদের দোষমুক্ত হতে হয়। যেমন হয়েছেন নবী কুলের পিতা ইব্রাহীম ও খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সঃ। রাহমাতুল্লিল আলামীন সঃ তো তাঁর মুশরিক পিতা-মাতা ও দাদা পরদাদাদের রোপণ করা শির্ক ও কুফরের "শাজারায়ে মালউনা" বা অভিশাপ্ত বৃক্ষকেই সমূলে উপড়ে মক্কা ও কাবাকে মুক্ত করে বাবা ইব্রাহীমের বালাদুল আমীনকে পুণঃ প্রতিষ্ঠা করে বিদায় হজ্বে বিশ্ব মানবমুক্তির সনদ ঘোষণা করে গিয়েছেন।

বেলাল, আম্মার, যায়দ, সুহাইব, ইবন্ মাসউদ ও সালমানরা ইসলামে প্রবেশের পর আর কখনো তাদের বংশ ও গোত্রের জাহিলিয়্যাতের উল্লেখ করেছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তারা নবীদের অনুসরণে তাওহীদে প্রবেশের পর সকল অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছিলো। যা ক্বোরেশী ও হাশেমী আবু বকর, উমর ও উসমানরা পারেনি। এমনকি আলীও তা থেকে পূর্ণ মুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছিলো। ফলে এরা "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর মতো আত্মঘাতি চক্রে পড়ে গিয়েছিলো। অথচ তারা সে খাঁটি ঈমানে প্রবেশ করেছিলো, যা কখনো আমর ইবনুল আসি, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, মুগীরা, আব্বাস, ইবনে, আব্বাস, মুয়াবিয়া ও মারওয়ানরা করেনি। তাই এরা ক্ষমতা হাতে পেয়েই আবু বকর, উমর ও আলীদের সন্তানদেরও ক্ষমা করেনি। তাদের নির্বংশ ও নির্মূল করার সকল বর্বর নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতে সামান্য লজ্জাবোধও করেনি। মুয়াবিয়া, একমাত্র উসমানের ছেলে সাঈদ ইবন্ উসমানকে পুরস্কৃত করেছে। সাঈদ তার ভোগবিলাসের অর্থের টানপড়লেই সে সোজা দামেশকে গিয়ে ভরা রাজদরবারে মুয়াবিয়াকে বলতো, "তুমি যে, আমার বাবাকে কোরবানীর বক্রা বানিয়ে রাজা হলে, আমাদের ভাগ কই?" তদুত্তরে মুয়াবিয়া হেসে তার দরবারীদের বলতো, "দেখো, আমি হলাম ক্বায়সারুল আরব, আর ও হলো খবীসুল আরব," তারপর সাঈদকে বলতো, যতো সৈন্য লাগে নিয়ে যাও এবং যে কোনো সীমান্ত এলাকা আক্রমণ করে তোমার যা প্রয়োজন লুট করে নিয়ে নাও। সাঈদ তাই করতো।

আবু বকর ও উমর কি করে আমর ইবনুল আস, মুগিরা ইবন্ শু'বা, মুয়াবিয়া ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ প্রভৃতিকে কি কারণ ও বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলো, তা' আজও স্পষ্ট নয়। এক মাত্র ক্বোরেশী ব্যতীত মুস্তাদআফ ও আনসারদের উপর এদের প্রাধান্যের কোনো কারণ অনেক চিন্তা করেও আমি আজো খুঁজে পাইনি। আবু সুফইয়ান, মুয়াবিয়া ও হাকাম এবং মারওয়ানের ব্যাপারে রাসূল সঃ এর যে

সমস্ত সতর্কবাণী ও নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়, আমর ইবনুল আসী ও খালিদের পিতা সম্পর্কে ক্বোরআনে আল্লাহ্ পাকের কঠোর নিন্দাবাদ কোনো মতেই তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং ক্বোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট উচ্চারিত বাণীতো অনেক বেশী গুরুত্ব পাওয়ার কথা !

ক্বোরআনে খালেদের পিতা ওয়ালীদ এবং আমরের পিতা আসী বা আস্ সম্পর্কে যা উল্লেখ রয়েছে, আমরা তা একটু ভেবে দেখি। কারণ, إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا কোরআনই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যা বিশ্বাসীদের সফলতার নিশ্চিত সুসংবাদ প্রদান করে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৯)।

খালেদের পিতা ওয়ালীদ সম্পর্কে আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেন, "তুমি মিথ্যুক কসম খাওয়া নীচ লোকটির কথা শুনবেনা। এ লোকদের মাঝে চোগলখুরী করে বেড়ায়। ভালো কাজে বাধাদানকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী পাপীষ্ঠ। রূঢ়, এবং সর্বোপরি বেজন্মা হারামজাদা। সন্তান ও সম্পদের অধিকারী বলে তার এতো দম্ভ! যখন আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, বলে, "এ তো প্রচলিত পুরাতন কাহিনী! "আমি তার নাকে দাগ দিয়ে দিবো" (সূরা ক্বালাম-১৩-১৬)

আমর ইবনুল আসি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে রাসূল, তুমি কি কাফিরটিকে দেখো না, যে আমার আয়াত অমান্য করে বলে যে পরকালেও সে প্রাচুর্য্য ও সন্তানের অধিকারী হবে? সেকি উঁকি মেরে গোপন জেনে নিয়েছে, না সে আল্লাহ্র সাথে চুক্তি করেছে? না, তা কখনো নয়, ও যে বাজে বকছে তা' আমি লিখে রেখে পরকালে তার শাস্তি বাড়িয়ে দিবো। সে দিন সে সন্তান ও ধন সম্পদহীন একা আমার দরবারে আনীত হবে। সেদিন আমি ব্যতীত তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না। (সূরা মারইয়াম-৭৭-৮০)

এতো গেলো আবু বকর ও উমরের নিয়োগকৃত দু'ক্বোরেশী রাজপুত্রের পিতৃপরিচয় কোরআনের ভাষায়। এবার হাদীসের বর্ণনায় আমর ইবনুল আস, মারওয়ান, মুয়াবিয়া ও তার মা হিন্দার ব্যাপারে একটি মাত্র ঘটনাচিত্র অবলোকন করা যাক।

আনাস্ ইবন্ মালিক বর্ণনা করছে যে, মুয়াবিয়া রাজা হওয়ার পর রাসূল সঃ এর চাচাতো বোন আরওয়া বিন্ত হারিস ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব একদা মুয়াবিয়ার রাজদরবারে উপস্থিত হয়। মহিলা প্রসিদ্ধ বিদূষী সম্মানীয়া বৃদ্ধা ছিলো। মুয়াবিয়া তাকে দেখেই স্বাগত জানিয়ে বললো, "ফুফু তুমি কেমন আছো?" উত্তরে বুড়ী বললো, "তুমি কেমন আছো ভাতিজা? আমরা আর কেমন থাকতে পারি! তুমিতো নেআমতের কাফের। আলীর সাথে অন্যায় করে তুমি যা নও সে নাম ধারণ করেছো। যার কোনো অধিকার তোমার নেই। (অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন সেজেছো) এতে তোমার ও তোমার বাপ দাদার কোনো প্রতিদান নেই। ইসলামে তোমার কী ভূমিকা আছে? মুহাম্মাদ সঃ এর উপর যা নাযিল হয়েছে, তুমি তার বিরুদ্ধে কুফরী করেছো। আল্লাহ্ তোমার পূর্বাপর সবাইকে লাঞ্ছিত করেছেন, তোমাদের মুখ মন্ডলকে করেছেন বিকৃত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ সত্যান্বেষীদের সত্য দান করেছেন। আল্লাহ্র কালেমা বিজয়ী হয়েছে। আমাদের নবী সঃ আল্লাহ্র সাহায্যে বিজয়ী হয়েছেন। যদিও মুশরিকরা তা কখনো মেনে নেয়নি। তারপর আমরা আহলে বাইতরা দ্বীনের ভাগ্যে সৌভাগ্য হয়েছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সূ-উচ্চমর্যাদা দিয়ে তাঁর নিকট ফিরত নিয়ে যান। তখন থেকে আমাদের উপর দুর্দিন নেমে আসে। আমাদের অবস্থা দাঁড়ায় ফেরআউনের অধীনে মূসার সম্প্রদায়ের মতো। আমাদের পুরুষদের হত্যা করে নারীদের জীবিত রাখা হয়। রাসূল সঃ এর চাচাতো ভাই আলীর ভাগ্য হয় তোমাদের হাতে মূসার পর হারুনের ন্যায়। তারপর আজ পর্যন্ত আমাদের আর কোনো শান্তি নেই। হয়তো আমাদের দিন শেষ হবে জান্নাতে, আর তোমাদের দিন শেষ হবে জাহান্নামে।"

এ পর্যায়ে আমর ইবনুল আস বলে উঠে, "থামো বিভ্রান্ত বুড়ী! কথা সংক্ষেপ করো এবং দৃষ্টি অবনত করে কথা বলো।"

উত্তরে আরওয়া বললো, "তুই কে? তোর কি মা নেই"? আমর বললো, "আমি আমর ইবনুল আস"।

আরওয়া বললো, "হে অস্পৃশ্য গণিকার বেটা, তোর ধমকেই আমি থেমে যাবো? এবার শোন তোর পরিচয়। আল্লাহ্র কসম! তুই তো রক্ত, মাংস ও মজ্জায় ক্বোরেশদের কোনো বৈধ সন্তান নইস্। তোর জন্মের পর ছ'জন ক্বোরেশী ব্যভিচারী তোর পিতৃত্বের দাবী করেছে। জাহিলিয়াতের হজ্বের মৌসুমে আমি তোর মাকে মিনায় দেখেছি প্রত্যেক লুচ্চার সাথে। তা থেকে তোর উৎস। তুই তাদের মতো।"

তারপর মারওয়ান এসে যোগ দিয়ে বলে, হে ভ্রষ্টা বুড়ি! তোমার দৃষ্টিশক্তিও রহিত, তোমার জ্ঞানবুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। তোমার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। আরওয়া তাকেও এক চোট নিলো এবং বললো, "বেটা তুই এলি আবার আমাকে চুপ করাতে! তুই তো হাকাম বাদে আবু সুফইয়ান ইবন্ আল্ হারিস্ ইবন্ কালদার অনুলিপি! চোখের নীলাভ, চুলের লালিমা, চামড়ার রং ও সর্বদেহে তারই মতো। আমি হাকামকে দেখেছি লম্বা দেহ, ছিম ছাম গড়ন ও লম্বা চুলওয়ালা। তোর আর হাকামের মাঝে তো কোনো সাদৃশ্য নেই, হালকা চিক্না অশ্বের তুলনায় পেটমোটা আসন্নপ্রসবা গর্ধভীর চেয়ে! তোর মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর আমি যা বলছি। যদি সে সত্য বলে, তা হলে তোর বাপের সত্য পরিচয় বলবে।"

এ বলে আরওয়া মুয়াবিয়ার দিকে তাকিয়ে পুনঃ বলে, "আল্লাহ্‌র ক্বসম, তুমিই এদের আমার পেছনে লেলিয়েছো। তাই তুমি ও তোমার মা হিন্দার পরিচয় শুনে নাও। উহুদের যুদ্ধে হামযার শাহাদাতের পর তোমার মা দম্ভ করে বলেছিলো,

"আমরা তোমাদের থেকে বদরের বদ্‌লা নিলাম,	نحن جزين كم بيوم بدر
যুদ্ধ ও যুদ্ধের দিন, আগুন ও উম্মাদনার রূপ,	والحرب يوم الحرب ذات سعر
আমার বাবা উতবার শোকে আমার ধৈর্য্য ছিলোনা,	ما كان عن عتبة لى من صبر
আমার বাবা, আমার চাচা, আমার ভাই ও আমার জামাতা, এদের আমি হারিয়েছিলাম বদরের যুদ্ধে।	أبى و عمى و أخي و صهرى
ওয়াহ্শীকে দিয়ে আমার বুকের জ্বালা নিভিয়েছি।	شفيت و حشى غليل صدري
মনকে তৃপ্ত করেছি, আমার ব্রত পূর্ণ করেছি!	شفيت نفسى و قضيت نذرى
ওয়াহ্শীর জন্য, তার কৃতজ্ঞতায় আমার জীবন,	فشكر و حشى على عمرى
মৃত্যুর পর কবরে আমার হাড় গোড় মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত"।	حتى تغيب أعظمى فى قبرى

তদুত্তরে আমি তখন বলেছিলাম ঃ	فأجبتها
"হে কুফর প্রধানের মেয়ে,	يا بنت رقاع عظيم الكفر
বদর বা অন্য কোথাও সর্বত্রই তুমি ছিলে ঘৃনিতা,	زيت في بدر و غير بدرج
অচিরেই হাশেমী বীরদের হাতে,	صبحك الله فبيل الفجر
রাত পোহানোর পূর্বেই তোমার ধ্বংস আসবে	بالهاشمين طوال الزهر
প্রত্যেক রণাঙ্গনে ধারালো অসির আঘাতে	بكل قطاع حسام يفرى
হামযা ও আলীর ন্যায় সিংহ ও বায পাখীর নখরে	حمزة ليثى و على صقرى
তোমার বাপ ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে	إذ رام شبيب و أبوك غدرى
তুমি দিয়েছিলে তোমার বক্ষের লুকানো জিনিস	أعطيت و خسى ضمير الصدر
ওয়াহ্শী তোমার বুকের কাপড় খুলেছে	هتك و حشى حجاب الستر
তারপরও কি তোমার মতো পতিতার গর্বের কিছু আছে?	ما للبغايا بعد ها من فخر

আরওয়ার ধোলাইকাব্য শোনার পর মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও আমর ইবনুল আসদের তিরস্কার করে করে বলেছিলো, "তোমরা দুজন শেষ পর্যন্ত আমাকেও ন্যাংটা করলে?" মুয়াবিয়া প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো, "দোহাই তোমার ফুফু, মেয়েদের কেলেংকারীর ঝাঁপি বন্ধ করে বলো কী উদ্দেশ্যে তুমি এসেছো?"

উত্তরে আরওয়া তার প্রয়োজনীয় ছ'হাজার দিনার চাইলো। মুয়াবিয়া অর্থ দিয়ে কি করবে জানতে চাইলে আরওয়া তার বিবরণ দিলো। মুয়াবিয়া তৎক্ষনাৎ তা দান করলো। কিন্তু শেষে আরওয়াকে আরেকটু খোঁচা মেরে বললো, "ফুফু আলী হলে কিন্তু এ অর্থ তোমাকে দিতোনা।"

এর উত্তরে এ বিদুষী মহিলা চমৎকার সুন্দর জবাব দিয়েছিলো। সে মুয়াবিয়াকে বললো, "তুমি সত্য বলছো। আলী

তো আমানতের রক্ষক ছিলো। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক বাইতুল মালের সম্পদ বন্টন করতো। আর তুমি তো আমানতের ভক্ষক আল্লাহ্‌র মালের খেয়ানতকারী। যারা প্রাপক নয়, তাদের দাও, প্রাপকদের বঞ্চিত করেছো। আল্লাহ্ তার কিতাবেই প্রাপকদের হিস্যা বর্ণনা করেছেন। আলী সে ভাবেই বন্টন আরম্ভ করেছিলো। কিন্তু তুমি তার সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলে। তাতে আলী জড়িয়ে গিয়ে বিদায় নিলো। আলী বেঁচে থাকলে আমাকে, অথবা কাকেও চাইতে আসতে হতো না। না চাইতেই সবাই নিজ নিজ প্রাপ্য পেতো। আমি তোমার দ্বারে তোমার মালের ভিক্ষা চাইতে আসিনি যে দান করে কৃতার্থ করবে। তারপরও তুমি আলীর বিরুদ্ধে বলবে? আল্লাহ্ তোমার মুখের দাঁতগুলো ফেলে দিক, তোমাকে তোমার পাপেই নিপাত করুক"।

এ বলে আরওয়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কাব্যে আলীর জন্য শোক করতে লাগলো। মুয়াবিয়া তাকে থামিয়ে বললো, ফুফু তুমি এ অর্থ নিয়ে তোমার প্রয়োজনে ব্যয় করো। তারপরও প্রয়োজন হলে আমাকে লিখো। তোমার ভাতিজা তোমার প্রয়োজন মেটাতে কার্পন্য করবে না।" (দাইরাতুল মা'আরিফিল ক্বারনিল ইশরীন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা - ২১৫)।

ক্বোরআন ও হাদীস নামের বর্ণনায় এর পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ না থাকলে এগুলোকে অবিশ্বাস করা যেতো। আমর ইব্‌নুল আস, খালিদ ও মারওয়ানদের এরূপ কুষ্টিনামা যারা অবিশ্বাস করবে বা করতে বলবে, তারা নিজেরা প্রমাণ করবে যে তাদের নিজেদেরই কোনো কুষ্টি নেই। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে ওদের কুকীর্তির প্রমাণ দিয়েছে।

আমি ভেবে আশ্চার্যন্বিত হই এবং আবু বকর ও উমরের উপর দুঃখ হয় যে তারা কি করে ইসলামের পর পুনঃ ক্বোরেশী জাহিলিয়্যাতের ফাঁদে পড়লো।? মুস্তাদআফ্‌দের এবং আনসারদের বাদ দিয়ে কী করে ক্বোরেশের কুখ্যাত পাপীষ্ঠদের সন্তানদের তারা মুসলিম উম্মাহর কাফেলার অগ্রসেনা নিয়োগ করলো? তারা কি ভেবেছিলো যে, তাদের পালা কুকুর রূপে এরা তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে? অথচ তাদের আরবী ভাষাতেই একটি অতিপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য রয়েছে, "সাম্মিন্ কালবাকা, ইয়া'কুলুক, অর্থাৎ "তোমার কুকুরকে ভালো খাইয়ে মোটা তাজা করো, সে তোমাকেই খাবে"। আবু বকর ও উমর ক্বোরেশের গুরুত্বহীন শাখার লোক ছিলো। তাদের বাপ দাদাদের মক্কায় কোনো নেতৃত্ব ছিলো না। অপর দিকে উমাইয়াদের হাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিলো, যেমন বনী হাশিমের ছিলো ধর্মীয় নেতৃত্ব। রাসূল সঃ বনী হাশেম ও বনী উমাইয়া উভয়কেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরাজিত করে উৎখাত করে যান। তারপরও কি আবু বকর ও উমর ভাবেনি যে তাদের, মুস্তাদআফদের ও আনসারদের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ ভেঙ্গে তারা ক্বোরেশী নেতৃত্বের দাবিতুলে ক্ষমতাসীন হলে আলটিমেটলী ক্ষমতা সে সমস্ত ক্বোরেশীদের সন্তানদের হাতেই যাবে, যাদের আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে "শয়তান" বলে আখ্যায়িত করেছেন?

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

মুমিনদের সাথে দেখা হলে তারা বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি, এবং যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একাকি মিলিত হয়, তখন বলে আমরা তো ওদের সাথে তামাশা করছি। (সূরা বাক্বারা - ১৪)

আমার ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে যে, রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর উসামাহর নেতৃত্ব ও উসামাহর অভিযান বাতিলের যে দাবী উঠে, সে বাতিলের আন্দোলনের নেতৃত্ব কি করে উমর দিয়েছিলো? আবু বকর অপঘাত ও অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আমার কাছে একমাত্র কারণ হলো যে, আবু বকর তার জীবনে শ্রেষ্ঠ ভালোকাজটি করেছে উসামাহর অভিযান বাতিল না করে। আর আত্মঘাতি ভুল করেছে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে। আবু বকর-উমর যুগলের সাক্বীফা বনী সাআদায় তাক্বওয়ার মানদন্ড ভেঙ্গে ক্বোরেশী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় এদের মোটা বুদ্ধিতে আসেনি যে, ইসলাম ও ঈমানের মূলনীতি বাদ দিয়ে ক্বোরেশী গোত্রীয় প্রাধান্যের ভিত্তিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তা পরিণামে অবশ্যই ক্বোরেশী গোত্রীয় নেতৃত্বের মূল ঘরেই চলে যাবে। ধর্মীয় ঠাকুরগিরি বনী হাশেমের হাতে থাকলেও রাজনীতি ও অর্থনীতির নেতৃত্ব বনু উমাইয়ার করায়ত্ব ছিলো। তার নেতা ছিলো আবু সুফয়ান। আবু বকর ও উমরের বাবাদেরও আবু সুফয়ানের সামনে দাঁড়ানোর সাহস ছিলোনা। তাই ইসলামের বিজয়ের পর আবু সুফয়ানকে ধমক দিলে তা শুনে আবু বকরের অন্ধ পিতা আবু ক্বোহাফা আতঁকে উঠেছিলো এ বলে যে, একি, আমাদের রাজাকে ধমকাচ্ছো?

আবু বকরের সফলতা একটিই। তা হলো উসামাহর অভিযানকে বাতিল না করা। আবু বকরের ঠান্ডা মাথায় এ বুঝ এসে ছিলো যে, যাই করি না কেনো, রাসূল সঃ এর হাতে বাঁধা অভিযানের পতাকা খোলা যাবেনা। তা হলে আল্লাহ্‌র গযব নামবে। তার কানে সম্ভতঃ তখনো গুঞ্জরীত হচ্ছিলো রাসূল সঃ এর অন্তিম সতর্কবাণী, "উসামাহর অভিযানে

যারা যাবেনা, তাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত"। তাই তার রক্ষা।
যাকাত দিতে অনিচ্ছুকদের বিরুদ্ধে আবু বকরের অভিযানের কোনো গুরুত্বই আমার কাছে নেই। মূল ইসলাম ঠিক থাকলে তারপর রাজস্ব ও যাকাতের প্রশ্ন। মূল উপড়ে ফেলে যাকাত নিয়ে কাটাকাটি খুনাখুনী তো স্বার্থের দ্বন্দ্ব! কাপড়ের ব্যবসায়ী হিসাবে অর্থের যোগ বিয়োগ বুঝা আবু বকর কেনো, যে কোনো সাধারণ মানুষও বুঝে। আল্লাহ্‌, নূহ, ইব্রাহীম, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের রাজস্ব আদায়কারী রূপে পাঠাননি। তাদের পাঠিয়েছেন দ্বীন ও ঈমান শিক্ষা দিতে। দ্বীন ও ঈমান ভিতরে ঢুকলে মানুষ নিজেই হিসাব করে তার খুমস্‌ ও যাকাত দিতে অধীর হবে। কারণ খুম্‌স্‌ ও যাকাত না দিলে কারো ঈমানই প্রমানিত হবে না। ফলে তার সালাত, সাউম ও হজ্ব কিছুই ক্বুবুল হবে না।
দরিদ্র মক্কাবাসী আবু বকররা তাওহীদ ও রিসালাতের গুরুত্বের চেয়ে মনে হয় বেশী মনে রেখেছিলো রাসূল সঃ এর মুখ থেকে শোনা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যর আসন্ন পতন ও তাদের ধনরত্ন হস্তগত হওয়ার ভবিষ্যত বাণী। মুস্তাদআফ যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব ও সালমানরা গুরুত্ব দিয়ে শুনেছিলো মুস্তাদআফ্‌ ইমামতের অধীনে বিশ্বে ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের ক্বোরআনী ওয়াদা। هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর দ্বীনের পূর্ণ বিকাশ ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে। (তাওবা - ৩৩) তাই যায়দ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবন্‌ রাওয়াহাকে নিয়ে পার্থিব রোমান সম্পদ লাভের জন্য নয়, পরকালের পরম ধন শাহাদাত অর্জনের দৃষ্টান্ত ক্বায়েম করে যায়। পরেও মুস্তাদআফ্‌রা এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। কিন্তু ক্বোরেশী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজ্যজয়ীরা নিজেদের দেহের রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের পূর্বেই দেখা যায় বুভুক্ষ নেকড়ের ন্যায় রুগ্ন পারস্য ও রোমান ভেড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু রাজ্য বিস্তার করে। রাসূল সঃ এর মুস্তাদআফ্‌ ইবন মাসউদ ও উসামাহরা নির্যাতিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তাই আজ শুধু ক্বোরআন আমাদের জন্য তাদের আদর্শ ধারণ করে তাদের অসমাপ্ত ইমামত প্রতিষ্ঠার ডাক দিচ্ছে।
আবু বকর ও উমরদের প্রতিষ্ঠিত খালেদ, আমর ইবনুল আস, মুগিরা ও মুয়াবিয়ারা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর সকল শিক্ষা লঙ্ঘন করে ইসলামের জোব্বা পরে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নামে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করে। এদের ক্রিয়াকলাপ পড়ার সময় অবশ্যই এদের অতীতকে স্মরণ রাখতে হবে। কারণ এদের পরের কাজগুলো পূর্বের কাজের নতুন সংস্করণ ধরে বুঝতে হবে যে এরা মূলতঃ ঈমানই আনেনি। প্রাণ রক্ষা বা ভবিষ্যত ভাগ্যগড়ার জন্য শুধু পালাবদল করেছে মাত্র। যারা নবপ্রতিষ্ঠিত ক্বোরেশী সরকারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছে, তাদের যাকাত অস্বীকারকারী বলে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করা হয়। অথচ ইসলামী ইমামতের ভান্ডারে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দেয় অর্থ যাকাত। কোনো গোত্রীয় চক্রকে পরিশোধ করা অর্থ যাকাত নয়। এ দ্বিধায় পড়ে বহু সরল প্রাণ লোক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। কারণ রক্ত, গোত্র, বর্ণ, জাতি ও উপজাতীয় ধ্যান ধারণা ত্যাগ করার পর পুনঃ গোত্রীয় জাহিলিয়্যাত প্রচারিত ও প্রচলিত হয়েছিলো। মনে রাখতে হবে যে, আরব মরুর লোকেরা প্রায় সকলেই গোত্রবাদী উপজাতি ছিলো। তারা সোজা ভাবলো, আমরাও তো ক্বোরেশেরই মতো, বা তার চেয়ে বড় গোত্র ও উপজাতি। আমরা ক্বোরেশদের কেনো কর দিতে যাবো? আমরা তো আল্লাহ্‌র দ্বীন ক্বুবুল করেছিলাম। রাসূল সঃ সে সাম্যের ডাকই দিয়েছিলেন!
"তাক্বওয়া তাওহীদ গৌণ, অর্থ ও রাজস্ব মূখ্য" দ্বন্দ্বের গৃহযুদ্ধে এমন এমন অঘটন ঘটতে লাগলো যে ইসলামে তা চিন্তাও করা যায় না। হাযার হাযার লোক মরেছে, তাদের ছেলে-মেয়ে দাস-দাসী হচেছ। স্ত্রীরা পরের ভোগের বস্তু হচেছ। কারো সুন্দরী স্ত্রী নজরে পড়েছে, তাকে হত্যাকরে তার স্ত্রীকে ধরে এনে স্বামীশোকে বিদ্ধস্ত নারীকে সে দিনই ধর্ষণ করা হয়েছে। মালিক বিন্‌ নুওয়াইরাকে তার পরমা রূপসী স্ত্রীকে দেখে খালেদ নামাজরত অবস্থায় ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। তার স্ত্রী লায়লাকে নিয়ে সে দিন সে রাত্রেই খালেদ ভোগ করেছে। মালিকের ভাই মুতাম্মিম ছুটে গিয়ে আবু বকর, আলী, উমর ও অন্যান্যদের মাদীনায় এ ঘটনা জানিয়েছে। উমর, আলী, সাআদ ও আবু উবাইদারা আবু বকরকে বলেছে খালেদকে বরখাস্ত করে ডেকে এনে রজম, অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করে ইসলামী শাস্তি দিতে। আবু বকর তাকে বরখাস্ত না করে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করে। কারণ, তখন খালেদ আবু বকরের যাকাত আদায়ের যুদ্ধে নিয়োজিত একক সাইফুল্লাহ (?)। সাইফুল্লাহ কৈফিয়ত পাঠায় যে মালিক মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিলো, যাকাত না দিয়ে। আলী ও উমররা বললো যে যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলেও যুদ্ধে কোনো নারী বন্দি হলে তা কোনো সেনাপতি তাকে তার ইচ্ছা মতো তার ভাগে নিয়ে তাকে যথেচ্ছা ভোগ করতে পারে না। তা ছাড়া ইদ্দত পূরণের পূর্বে কোনো

বিবাহিতা নারীর সাথে সহবাস ইসলামে আমার্জনীয় অপরাধ! এতো অপরাধ সত্ত্বেও খালেদের শাস্তিও হয়নি (?)। ইসলাম ও ঈমান এদের নিয়ন্ত্রক ছিলো, না এরা ইসলামের অভিভাবক?

আবু বকর খালেদকে আল্লাহ্ ও রাসূলের শরিয়তের উর্ধ্বে রেখে বাইতুল মাল থেকে মালেক বিন নুওয়াইরার রক্তের জরিমানা পরিশোধ করেছে। তার অর্থ মালিক মুর্তাদ ছিলোনা। মুর্তাদ হলে তার দিয়াত পরিশোধ করতো না আবু বকর। কেনো খালেদকে আবু বকর স্পর্শ করেনি? আবু বকর নাকি বলেছে যে, খালেদ ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন! ইজতিহাদ তো সেখানে প্রযোজ্য যেখানে ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর স্পষ্ট নির্দেশ নেই! যেখানে ক্বোরআনে বার বার বলা ও রাসূলসহ সকল মুমিনদের আমল রয়েছে, সেখানে ইজতিহাদ কিসের? একটি মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে চারটি মিথ্যা সৃষ্টি করতে হয়। এটা তারই প্রমাণ। এভাবেই যে ইসলাম এসেছিলো গোটা মানব জাতিকে মানুষ করতে, রাসূলের বিদায়ের পর তা ক্বোরেশদের খপ্পরে পড়ে আরবী-ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রাসাদে সেবা-দাসী হয়েছিলো। আজও তার সে দশা। তা থেকে তাকে মুক্ত করে আযান দিলেই বিশ্বমুক্তির সুব্হে সাদেক হবে। খালেদের ইজতিহাদ বুঝতে কি ক্বোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র ভাষায় তার বাপের চরিত্র বর্ণনা যথেষ্ট নয়? উহুদে পেছন থেকে আক্রমন করে ৭০ জন মুমিনকে হত্যা, হামযার মুস্‌লা ও রাসূল সঃ কে মৃতপ্রায় আহত করা কি কোনো ইংগিত বহন করে না? মওতার যুদ্ধে সদলবলে খালেদের পলায়নে কিছু বুঝায় না? মক্কা বিজয়ের অভিযানে রাসূল সঃ এর আদেশ অমান্য করে আট ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং রাসূল সঃ এর দুঃখ প্রকাশ কি কোনো গুরুত্ব বহন করে না? তার পরও খালেদ কি করে একমাত্র সাইফুল্লাহ হয়ে সাত খুন মাফ পায়?!!

দুঃখের এখানে শেষ নয়। এ বিষয়ে আরেকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরেই এ প্রসঙ্গ এখানে শেষ করতে চাইবো।

পাক ভারত উপমহাদেশে একটি ফার্সি ভাষায় ঘৃন্য গালি আছে। যা মুখে আনতেও কোনো ভালো মানুষ লজ্জা বোধ করে। ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতে এর প্রচলন বেশী। বাংলাদেশে এর বাতাস লাগলেও তার প্রচলন নেহাত কম নয়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে শব্দটি আমাকে লিখতে হচ্ছে। শব্দটি "মাদার চোদ"। মাকে ধর্ষণকারী বা মায়ের সাথে ব্যভিচারকারীকে, বা সে ধরনের নিম্নচরিত্রের কোনো লোককে এ গালী দেয়া হয়। সুদের সাথে জড়িত কারবারি লোকদের আল্লাহ্র রাসূল সঃ এ পাপের পাপী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার জানামতে কার্যকর ভাবে এ পাপ করেছে, এমন কোনো ঘটনা আমি জানি না। কিন্তু মনজুর ইবন্ যিব্বান নামক এক ব্যক্তি রাসূল সঃ এর আমলে এ পাপটি করেছে। সুন্নীদের মতে সে পাষন্ড নরপিশাচটিও নাকি সাহাবী ছিলো!

এ খবিস লোকটি তার বাপ মরার পর তার সৎ মাকে বিবাহ করে। রাসূল সঃ সংবাদ পেয়েই তাকে হত্যার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু পশুটি তা টের পেয়েই তার মাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এবং বিভিন্ন স্থানে বাস করে তার মায়ের পেটে তিনটি ঔরসজাত সন্তান জন্ম দেয়। তার মা'টির নাম মুলাইকা।

রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর এ নরপিশাচটি এসে আবু বকরের নিকট স্বীকার করেছে যে, সে নাকি তা না জেনে করেছে। চল্লিশ বার ক্বসম করে নাকি সে তা বলেছে। এখন প্রশ্ন হলো যে একথা কি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে? চল্লিশ বার নয় হাজার বার ক্বসম খেলেও?

রাসূল সঃ যখন জেনে তার শাস্তি বিধান করতে লোক পাঠালেন, তখন সে তা জেনে যখন পালালো, তখনও কি সে তা জানতে পারেনি? রাসূল সঃ যখন তার অপরাধ জেনে তাকে হত্যা করতে আদেশ দেন, তখন সে আদেশ কার্যকর করা আবু বকর ও উমরের একমাত্র কর্তব্য ছিলো। নতুন করে তদন্ত করে রাসূলের বিচারের পর সানী-বিচারের অধিকার তাদেরকে কে দিলো? এ খবীসটি থেকে মুলাইকাকে পৃথক করেই আবু বকর তাকে ছেড়ে দেয়। তারপর উমরের আমলে মনযুর তার মায়ের প্রতি পুনঃ আসক্ত হয়ে কাব্যরচনা করে তা গেয়ে বেড়ায়। তা শুনে উমর তাকে ডেকে এনে নাকি ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেয়। বা সাবধান করে দেয়। আসলে জানা যায় যে, সে ঐ মাদারচোদ হারাম সম্পর্ক রেখেই মধ্যে মধ্যে মিথ্যা ক্বসমের প্রহসন করে তার পাপ চালিয়ে যেতো।

১৯৭৮ সানে মাদীনার প্রসিদ্ধ লেখক মুহাম্মাদ হুসাইন যায়দান রচিত বহু প্রমাণসূত্রের বই "সিরাতু বাতাল্" অর্থাৎ বীর সাহাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পড়লে বুঝায় যে, রাসূল সঃ কাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং কাদের রেখে বিদায় নিয়েছিলেন। এ ঘটনা সত্য না হলে ১৪১২ বছর ধরে আমাদের এ অবস্থা হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আমাদের তো বিশ্বের রাসূল সঃ এর পদাঙ্ক অনুসরণে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিলো! রাসূল সঃ-এর পর ক্বোরেশদের প্রচলিত দ্বীনই কি ইসলাম? না, নাউযুবিল্লাহ্, ক্বোরআন মিথ্যা?

আল্লাহ্ সত্য, নবীরা সত্য এবং ক্বোরআন চূড়ান্ত সত্য। এ তিনের সমান্তরালে যে বা যারা ঠিক, সর্বকালে সর্বস্থানে তারা ঠিক। তার সাথে অমিল, তারা, যে-ই হোক, যে কালেরই হোক, তারা ভ্রান্ত। মুহাম্মাদ হুসাইন যাইদান খুব ভক্তি ও যত্নের সাথে মদীনায় বসে তার দীর্ঘ জীবনের পড়া লেখার ফসল স্বরূপ এ বই রচনা করে প্রকাশ করেছে মুসলিম উম্মাকে তাদের গৌরবোজ্জল অতীত সম্পর্কে জ্ঞাত করতে। মদীনায় ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে তার কর্ম জীবন শুরু। তারপর সৌদী সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে সে দায়িত্ব পালন করেছে। রাবেতারও সে সহকারী প্রধান ছিলো। দেশী বিদেশী বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সে সৌদী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তার রচিত ২৬০ পৃষ্ঠার বইটিতে সংক্ষেপে অথচ তথ্য ও তত্ত্বে যা লিখেছে তা পড়লে বহু অজানা ঘটনা সহজ ভাবে জানা ও বুঝা যায়। অকল্পনীয় উপায়ে আল্লাহ্ এ বই খানা আমাকে পৌছে দেন। মনযুর ও মুলাইকার ঘটনা আমাকে ভীষন ভাবে নাড়া দেয়।

আমার সাধনা, হারানো নাজাতের সূত্রকে খুঁজে তা দিয়ে বিপন্ন মানবতাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

বহু জানা ও পড়া বইয়ের মাঝে এটিকে একটি পুস্তিকা বলা চলে। এর বেশী নয়। কিন্তু তন্মধ্যে মায়ের সাথে এ ব্যভিচারী লোকটির ইতিহাস আমাকে বেশ কিছু লোক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। তালহার মতো ব্যক্তি কি করে পরে মুলাইকাকে বিবাহ করে? মনযুর ও মুলাইকার অবৈধ সুন্দরী মেয়েকে কি রূপে হাসান ইবন্ আলী বিয়ে করে? পিতা মাতার পাপে সন্তান দোষী হয়না সর্বক্ষেত্রে, তা ঠিক নয় তাদের বিয়ের জন্য সমাজে সে শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, তাদের সাথে তাদের সম্বন্ধ হবে। যারা ইসলামী সমাজের আদর্শ, শীর্ষ স্থানীয় বলে বিবেচ্য, তাদের জন্য তো তা কখনো মানায় না? শোভন নয়!

যৌন সংযম মানুষকে শিখরে তোলে। যৌন বিকৃতি মানুষকে পশুর চেয়েও ইতর ও নীচ বানায়। তাই এটি মানুষ অমানুষের মানদন্ড। আল্লাহ্ ও রাসূলদের উপর ঈমান এনে যারা সে সত্যের উপর দৃঢ় হয়, তারা সর্ব যুগে সিদ্দীক ও সিদ্দীকূন। যা ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়, তাই ফোরকান। কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি যেমন সিদ্দীক হয় না, তেমনি কোনো ব্যক্তি বিশেষ ফারুক হয় না। সিদ্দীক, সিদ্দীকে আযম বা ফারুক ও ফারুকে আযম নামে যে পরবর্তীতে আবু বকর ও উমরকে বুঝানো হয়েছে, তা আদৌ ঠিক নয়। তাতে ব্যক্তিপূজার মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি হয়ে মূল সত্য থেকে বিচ্যুতি ঘটায়। চার খলিফার চার বেড়া দিয়ে যে খাঁচা তৈরী করে ইসলামের মুক্ত মে'রাজের বোরাক্বকে খাঁচাবন্দী করা হয়েছে, আমাকে সে খাঁচা থেকে মুক্ত করে অন্যান্য চারের খাঁচা থেকেও আল্লাহ্ মুক্ত করেছেন। চার খলিফার মতো, চার ইমাম, চার মাযহাব, ও চার তরীকার পিঞ্জিরা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালনার্থে আমি এ বই লিখছি। এরপর আর কোনো বই লেখার আমার ইচ্ছা নেই। শুধু এই বইর বক্তব্য সারা বিশ্বে পৌছানোর জন্য প্রয়োজন বোধে একে উর্দু ও আরবীতে অনুবাদের ইচ্ছা রয়েছে। বাকী আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী।

ইসলাম জামাতী বা সংঘবদ্ধ জীবনের নাম। সেখানে মুক্তাদীদের নির্ধারণ ও নিযুক্তিতে জামাত হয় না, হবে না। এক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এক ইমামের নির্দেশে ক্বোরআনের শিক্ষায় ইমামের আনুগত্যে জামাত গঠিত হয়। যে বা যারা ইমামের অনুসরণ করবে, স্বার্থক। যারা করবে না তারা ব্যর্থ। একাধিক, দু'তিন বা চার ইমামের বিভক্তি ঈমানের রাজ্যে নেই। কুফরীর রাজ্যেই তা সম্ভব। فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ কুফরীর ইমামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো বিরতি নেই। এরা নির্মূল হওয়া পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। (সূরা তওবা -১২)

বন্দিদশার খাঁচার দু'বেড়ার বাঁধ খোলা হয়েছে। সিদ্দীকী বেড়ার পর ফারুকী বেড়া অপসারণ করতে যাচ্ছি। যদিও সিদ্দীকী বেড়ার বাঁধ খোলার প্রতিক্রিয়ায় ফারুকী বেড়ার অর্ধেক খুলে গিয়েছে। তবুও ফারুকী বেড়া পূর্ণ খুলতে হবে। কারণ, ফারুকী বেড়ার প্রচার ও প্রসার বেশী হয়েছে। ফারুকী বেড়ার পর যুন্নুরাইন ও মাওলা আলীর বেড়া খুব সহজেই খুলে চার দিগন্ত মুক্ত হয়ে যাবে। এতে এ চার বান্দা খাটো না হয়ে তাদের মূল অবস্থা ও অবস্থান স্পষ্ট হবে এবং তাদের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আমাদের করণীয়ও চিহ্নিত হবে। ইনশাআল্লাহ্। ইয়া আল্লাহ্, পুর্ববর্তীদের ব্যাপারে অন্তরে কোনো ক্লেদ নয়। পরিচ্ছন্নতা দান করুন! আমীন।

আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের প্রথম ইমাম আবু বকরের মৃত্যু আসন্ন মনে করে আবু বকর ওসমানকে ডেকে তার জীবদ্দশায়ই লিখিত ভাবে উমরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়। আবু বকরের সিদ্ধান্ত ও ফরমান জারীতে কারো সাথে পরামর্শ করেছে, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথাও নেই। শুধু ওসমান ইবন্ আফ্‌ফান, আবু বকরের নির্দেশে তা

লিখেছে, এর মোটামুটি তথ্য পাওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে আলীকে যে মোটেও জানানো ও জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তা নিশ্চিত। তাতে সাক্বীফার পর আলী যে উমরকে বলেছিলো, "আবু বকরকে দিয়ে দুইয়ে নাও, দুধ তোমার ভাগেই আসবে" সে কথা ঠিক হলো। বনু তাইমের আবু বকর, বনু আদির উমর ও বনু উমাইয়ার ওসমান এবং আবু বকরের দু'মেয়ের জামাতা তালহা ও যুবাইর কার্যতঃ বনু হাশিমের আলীকে প্রায় একঘরে করেই রাখলো।

আবু বকর ক্ষমতায় বসে নিজেকে রাসূলের খলিফা, "খলীফাতু রাসুলিল্লাহ" বলে স্থাপিত করেছিলো। তাই উমর ক্ষমতায় বসে প্রথম প্রথম নিজেকে রাসূলের খলীফার খলীফা, খলীফাতু খলীফাতু রাসূলিল্লাহ নামে চালালো। কিছু দিন পর পরবর্তী "চার চালাক" এর আমর কি মুগীরা এসে "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আমিরাল মুমিনীন" বলে উমরের পদবী খলিফা থেকে আমীরুল মু'মিনীন বানালো। এরূপে ফকীর থেকে আমীর নামের প্রচলন হয়। তা থেকেই মুস্তাকবির আমীরে মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস ও মুগীরারা স্ব স্ব প্রদেশে নিজেদের নামের সাথে আমীর সংযোগ করে। মুস্তাদআফ্‌রা শুধু দেখছে যে মুসলিমে বর্ণিত রাসূল সঃ এর আশঙ্কা কিভাবে বাস্তবরূপ নিতে যাচ্ছে।

উমর নবুওত প্রাপ্তির ষষ্ঠ বছরে রাসূলকে হত্যা করতে এসে অপর প্রান্তে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তার ইসলাম গ্রহণে মক্কায় রাসূল সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফ্ সাহাবীদের শক্তি বৃদ্ধির যে কথা পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যায়, তাতে অতিরঞ্জিতার পরিমাণই বেশী। কারণ, উমর খুব দরিদ্র ছিলো। তার জীবিকার মূলধন ছিলো তাঁর দেহ ও দৌহিক শক্তি। গোত্রও কোনো প্রভাবশালী ছিলো না। সাপ্তাহিক বাজার, হাট ও মেলায় মল্লযুদ্ধ ও খেলা দেখিয়ে যা কিছু উপার্জন হতো, তা দিয়েই তার জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। সরল মনমানসিকতা ও সাহস ছিলো।

রাসূল সঃ ও মুস্তাদআফ্‌দের উপর যে আবু লাহাব, আবু জেহেল, উতবা, উমাইয়া ও আবু সুফ্‌য়ানদের নির্যাতন হতো, তাকে উমর কোথাও বাধা দিয়ে প্রতিহত করেছে, এমন কোনো প্রমান নেই। শিআ'বে আবি তালিবে যে দু'বছরের অধিক রাসূল সঃ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তা ভাঙ্গার কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে সমর্থ হয়নি।

মক্কাবাসী থেকে নিরাশ হয়ে যখন রাসূল সঃ যায়দকে নিয়ে তায়েফ হিজরত করেন, সে সময় উমরের ভূমিকার তেমন কোনো ইংগিতও কোনো ইতিহাসে নেই। অথচ তায়েফের ঘটনা রাসূল সঃ এর জীবনে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে আবু বকর সহ আশারায়ে মুবাশ্‌শারাদেরও কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এমন একটি ঘটনাকালে এরা কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিলো, ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ কোথাও না পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার।

হিজরতের সময় উমর প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে মাদীনা রওয়ানা হয়। তাকে কেউ বাঁধা দিতে যায়নি। বদরের যুদ্ধে আলী, হামযা, বেলাল, ইবন মাসউদ ও আম্মাররা যেরূপ ইতিহাস সৃষ্টিকারী সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, তেমন কোনো ঘটনা উমরের নেই। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যে, বদরের যুদ্ধে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। বেশীর ভাগ বর্ণনায় তার কোনো উল্লেখ মিলেনা। উহুদের যুদ্ধে প্রাথমিক বিজয়ের পর রাসূল সঃ এর আদেশ অমান্য করার ফলে যে পরাজয় নেমে আসে, তাতে হুজুর সঃ মারাত্মকভাবে আহত হন। সে মুহুর্তে যারা বর্ম হয়ে রাসূল সঃ কে রক্ষা করে, তাদের মধ্যে উমরের উল্লেখ নেই। যুদ্ধ শেষের পর আবু সুফয়ানের লম্ফ-ঝম্ফ এবং দম্ভোক্তির উত্তরে রাসূল সঃ এর সেখানো বুলি আবু সুফ্‌য়ানের কান পর্যন্ত পৌছাতে উমরের দরাজ গলা ব্যবহৃত হয়। সে যুদ্ধে উমর আহত হয়েছিলো কিনা জানা যায়নি।

বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে আবু বকর ও উমর দু'মেরুর দু'প্রস্তাব পেশ করে। অথচ সূরা মুহাম্মাদে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে বেড়ে কোনো প্রস্তাব করা অনুচিত ছিলো। সাহাবীদের নিকট রাসূল সঃ পরামর্শ চেয়েছেন, তেমন কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া রাসূল সঃ প্রশ্ন করে পরামর্শ চাইলেও ইসলামের আদব হলো, উত্তরে সবাই বলবে, "আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আ'লামু" আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সঃ উত্তম জানেন। সে ক্ষেত্রে আবু বকর ও উমরের আগ বেড়ে প্রস্তাব করে রাসূল সঃ এর মতকে প্রভাবান্বিত করা অনাকাঙ্খিত ছিলো। এরূপ আরেক সীমা লজ্ঘনের প্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাত নাযিল হয়। যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করার প্রস্তাব করে আবু বকর। উমর প্রস্তাব করে যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করার। স্বাভাবিক ভাবেই দুটি প্রস্তাবের একটি ঠিক, অপরটি ভুলছিলো। ভাগ্যক্রমে উমরের মতের পক্ষে আয়াত নাযিল হয়। পরে এটাকেই বাড়িয়ে হাদীস প্রচার করা হয় যে রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে তাঁর পর কেউ নবী হলে উমর নবী হতো। নবুওত কি এতো সহজ ও সাধারণ ব্যাপার যে খোদ রাসূল সঃ তার সম্পর্কে এ ধরনের হালকা উক্তি করবেন?

তা'ছাড়া হুজুর সঃ খাতামুন নাবিয়্যীন। তাতে কি খোদ রাসূল সঃ এর সন্দেহ ছিলো যে সাধারণ লোকদের তিনি নবী হওয়ার যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিবেন? নাউযুবিল্লাহ!

উহুদের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের দাফনকালে রাসূল সঃ বলেছেন, "এদের ব্যাপারে আমি রাসূলরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং দিবো যে, এরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত বরণ করেছে।" তখন আবু বকর বলেছিলো "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন না?" রাসূল সঃ স্পষ্ট বলেছেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবো না, তার কারণ, আমি জানি না তোমরা পরে কী ঘটাও! অতঃপর আবু বকর বলেছিলো, আপনার পরে আমরা কি বদলিয়ে যাবো?" রাসূল সঃ উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ তোমরা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের অনুসরণে বদলাবে।" তখন আবু বকর নাকি কেঁদেছিলো। (মুয়াত্তা মালিক, উহুদের শহীদদের দাফন অধ্যায় দেখো) তারপরও প্রতারকরা তাদের স্বার্থে আবু বকর উমরদের মূর্তি তৈরীর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। চার খলিফার চার দেয়াল, তারই চার মূর্তি।

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাদীনায় উমরের উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নেই। যুদ্ধের ময়দানে নয়। দ্বীন প্রচারের কোনো ক্ষেত্রেও নয়। উহুদের পর পরিখার যুদ্ধ বা আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় এক মাস মাদীনায় রাসূল সঃ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় অবরুদ্ধ জীবন কাটান। আমর ইবন্ আবদে উদ্দ পরিখা পার হয়ে এসে মুস্‌লিমদের মধ্যে থেকে কাকেও তার সাথে মুক্বাবিলা করার জন্য তর্জন গর্জন করতে থাকে। আলী বলে উঠে "আমি তার মুকাবিলা করবো।" রাসূল সঃ বলেন, "থামো, এ যে আমর।" আমর সত্যিই এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলো। তাই কেউ তার ডাকে সাড়া দিলো না। সে দ্বিতীয় বার হাঁক ছাড়লো। এবারও আলী ব্যতীত কেউ শব্দ করলো না। এবারও রাসূল সঃ বললেন, "থামো আলী এ যে আমর"। তার উত্তরে আলী বললো 'হোক না সে আমর!" রাসূল সঃ আলীকে অনুমতি দিলে এক তুমুল দ্বৈতযুদ্ধে আলী আমরের ঘাড় উড়িয়ে দেয়। সাধারণ ভাবে আমরা জেনে এসেছি যে উমর এক অসম সাহসী বীরপুরুষ ছিলো। তাই আমি হাযার পৃষ্ঠা উল্টিয়েছি উমর ইবন আল্ খাত্তাবের কোনো বীরত্বপূর্ণ কীর্তির সন্ধানে। কিন্তু নির্দ্বিধায় আমি বলছি যে তার একটি দৃষ্টান্তও পাইনি। আহযাবের পর হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা। সেখানে রাসূল সঃ প্রথমে উমরকে মক্কাবাসীর সাথে সমঝোতার জন্য তাঁর দূত রূপে যেতে আদেশ করেন। উমর ভয়ে যায়নি। সে ওসমানের নাম প্রস্তাব করে। কথা তো তা'নয়! রাসূল সঃ এর আদেশ মনঃপূত হোক কি না হোক, বিনা বাক্যে "সামে'না ওয়া আতা'না অর্থাৎ শুনলাম ও মানলাম" বলে প্রাণ দিয়েও তা'পালন করতে হবে। তা তো উমর করেনি? আপাতঃ দৃষ্টিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি উমরের মনপুত হয়নি। তাই উমর প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করেছে। এ'তো সম্পূর্ণ ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর অমান্য করা! উম্মতের তথা মানবজাতির জন্য আল্লাহ ও রাসুলের এক বিধান। ক্বোরেশী আবু বকর ও উমরদের জন্য কোনো গোপন আয়াত নাযিল হয়েছিলো নাকি? হুজুরাতের পর ও রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্বে রাসূল সঃ কে কাগজ কলম দিতে বাধা দেয়ায় কি সে প্রশ্ন জাগে না? এ সমস্ত বদ্দু স্বভাবকে যারা শোভন করে কল্প ও গল্প তৈরী করে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে, তার গোড়ায় গিয়েই আগত দিনের বিশ্বআন্দোলনের ডাক দিতে হবে। আল্লার রাসূল কী চুক্তি করবেন, কার জন্য দোয়া করবেন বা কী লিখবেন, তাও কি কোনো সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করে করতে হবে? খাতুমুন নাবিয়্যীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীনের কি অন্য কোনো সঙ্গী বা সাহাবী আবু বকর, উমর এবং তাদের দু'কন্যা মা আয়শা ও হাফসার মতো আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে আচরণ করেছে? তারপরও তারা দু'ব্যক্তি ও তাদের দু'কন্যার অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি করে ঘরে-বাইরে উম্মতের উপর পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হলো? বৈশিষ্ট্যতো আল্লাহ দিয়েছিলেন মুস্তাদআফ যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের! এর সঠিক উত্তর পেলেই ১৪১২ বছরের অমানিশা কেটে সূর্য্যোদয়ের সুবহে সাদেক হবে।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

আবু বকররা ভাবে নাকি যে, তারা ইসলামে প্রবেশ করে তোমাকে কৃতার্থ করেছে? রাসূল, বলে দাও "তোমাদের ইসলামের বড়াই আমার উপর করোনা। বরং তোমরা যদি ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও, তা হলে জেনে নাও যে, আল্লাহই তোমাদেরকে আমার দ্বারা ঈমানের পথ প্রদর্শন করে কৃপা করেছেন।" (হুজুরাত-১৭) আবু বকরের মনের বাসনা লক্ষ্য করে রাসূল সঃ আয়শাকে বিবাহ করে তাকে কৃপা করেছেন। তার দৃষ্টান্তে উমরও গিয়ে তার মেয়ে হাফসাকে বিবাহ দিয়ে রাসূল সঃ এর সান্নিধ্য চাইলে তা' ক্বুবুল করে তাকেও ধন্য করেন।

www.facebook.com/eholo.islam

খানিস্ ইব্‌ন হুযাফার সাথে পূর্বে হাফসার বিবাহ হয়েছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর অষ্টাদশী মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে উমর আবু বকরকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আবু বকর অসম্মতি জানায়। তারপর প্রস্তাব করে ওসমানকে। ওসমানও অপ্রস্তুতি জানায়। উমর গিয়ে রাসূল সঃ কে তার দুঃখের কথা জানালে রাহমাতুল্লিল আমীন সঃ স্বয়ং বিয়ে করে হাফসাকে উম্মুল মু'মিনের মর্যাদা দান করেন। রাসূল সঃ ধন্য হয়েছেন, না উমর ও তার কন্যা?

রাসূল সঃ কে খাটো করে কারো অস্বাভাবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তাকে মেনে নেয়ার মতো ঈমানী দুর্বলতা থেকে আল্লাহ আমার অন্তরকে মুক্ত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনন্য মর্যাদায় বিশ্বাসই আমার ঈমানের শিকড়, গুড়ি ও কান্ড। এর ডালপালা দূরে থাক, এর একটি পাতা ছিড়ে ফেলেও কাকেও সে স্থানে আমার অন্তর গ্রহণ করতে রাজী নয়। আল হামদুলিল্লাহ।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূল সঃ খাইবার অভিযানে যান। দুর্গ বিজয়ের জন্য আবু বকরকে পাঠালে সে ব্যর্থ হয়ে ফেরত্ আসে। পরে উমরকে পাঠান। উমরও তার বন্ধুর মতো বিফল হয়ে আসে। অতঃপর আলীকে পাঠানো হয়। আলী সফল হয়।

এর পর মক্কা বিজয় হয়। তারপর হুনাইনের যুদ্ধ হয়। হাওয়াযিনদের অতর্কিত প্রচন্ড আক্রমনের মাথায় যারা রাসূল সঃ কে পেছনে ফেলে পালায়, তাদের মধ্যে উমরও একজন। পরে তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, ব্যাপারটি বুঝে উঠার পূর্বেই পলায়ন পর্বটি ঘটে যায়। তাই এটাই হয়তো তাক্দীর বা আল্লাহর নির্ধারিত ছিলো। (বোখারী ও মুসলিমে উমর থেকে বর্ণিত) চমৎকার ব্যাখ্যা বটে! ভুল করবো আমি, দোষটা হবে তাকদীরের! তা হলে তো সব ভুল ও অপরাধই তক্দীরের কাজ হয়ে যায়! কোনো মানুষের আর দোষ থাকে কই? না, প্রত্যেক মানুষই তার যোগ্যতা ও মান অনুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। এটাই আল ক্বোরআনে আল্লাহর ভাষায়,

"শা-কিলা" বা আকৃতি প্রকৃতি। قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

রাসূল সঃ বলে দাও, প্রত্যেকেই তার প্রকৃতির মাপে আমল করে থাকে। তোমাদের প্রতিপালক চলার পথে কে সঠিক, তা সর্বাপেক্ষা সঠিক জানেন। (বনী ইস্‌রাঈল-৮৪) আবু বকর ও উমর কেউ তাদের সীমার উর্ধ্বে বা নিচে ছিলো না। আল্লাহ ও রাসূল সঃ তাদের প্রতি কৃপা করেছেন। রাসূল সঃ আয়শা ও হাফসাকে বিবাহ করেছেন। তাদের সবার কর্তব্য ছিলো নিজ নিজ সীমায় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা। বোখারী মুসলিমে দেখা যায় যে উমর তার মেয়ে মা হাফসাকে সতর্ক করে বলেছে "হাফসা, তুমি আয়শার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাসূলের ঘরে অশান্তির কারণ হয়ো না। আল্লাহর শপথ, তুমি জেনেছো যে, রাসূল সঃ তোমাকে পছন্দ করেন না। যদি আমি না হতাম, তা'হলে অবশ্যই রাসূল তোমাকে তালাক্ব দিতেন।"

আবু বকর, উমর, মা আয়শা ও হাফসা। এ পিতা পুত্রি চতুষ্টয়কে তাদের সীমা লঙ্ঘন থেকে সতর্ক করে তাদের সীমার মধ্যে থাকার জন্য চরমপত্র রূপে সূরা হুজুরাত ও তাহরীম নাযিল হয়েছে সাত আসমানের উপর থেকে। অন্য কারো ব্যাপারে তো এতো বিস্তারিত অহী নাযিল হয়নি!

বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর বিশ্ব রহমত আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কাবাঘর অপবিত্রকারী নাপাক মুশরিক, বিশ্বমুশরিক ক্বোরেশদের উৎখাত করে কাবাকে বিশ্ব মুসলিমের জন্য সম অধিকারের মুক্তাঙ্গন করার ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তাঁর খলীল ইব্রাহীম আঃ কে দিয়ে। তাকে পুনঃ পবিত্র ও মুক্ত করার জন্য প্রেরিত নবী সঃ এর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ কা'বা একটি মাত্র গোত্রের লোকদের নেতৃত্বের অধীনে যাবে, তা' কেমন করে হয়? তাও আবার সে গোত্রটি, যারা কাবাকে ৩৬০টি মূর্তির মন্দিরে পরিণত করেছিলো! যারা নবী সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফ সঙ্গীদের পিটিয়ে সর্বহারা করে দেশ ছাড়া করেছিলো, তারা পুনঃ ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যেই নেতৃত্ব থাকতে হবে, এমন হাদীস দাঁড় করিয়েছে! তা কি যাচাই বাছাই না করে কোনো সুস্থ বিবেকবান ঈমানদার মেনে নিতে পারে? আবু বকর ও উমর দ্বারা এর প্রবর্তন হয়। তাই ক্বোরআন ধরে গোড়াঘরে আমাকে প্রবেশ করতে হয়েছে ঈমানের তাগিদে। ঘরে ঢুকে দেখি ১৪১২ বছর ধরে জানালা দিয়ে দেখা সত্য, দরজা দিয়ে দেখা সত্য থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই একের পর এক দরজা খুলে আমাকে সকল কোঠা তল্লাসী করে দেখতে হচ্ছে। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (সূরা বাক্বারা - ১৮৯)। আমি যা যা দেখছি, তা' বর্ণনা করছি। ক্বোয়ামতের দিন, আমি সাক্ষ্য দিবো। তাই এ বই আমার সাক্ষ্যনামা। কোনো সাধারণ পুস্তক রচনা মোটেই নয়।

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্বে অসাধারণ কোনো কৃতিত্ব দুরে থাক, উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তেমন দু'আল্লাহর বান্দা কি করে একটি কথিত বাক্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে এমন ভাবে নিন্দনীয় সাম্রাজ্যবাদের ভিতে দাঁড়িয়ে যায় যে, তাদের প্রতিষ্ঠার সামনে আল্লাহ, তাঁর কিতাব এবং রাসূলও গৌণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়? তাদের নিছক সীমাবদ্ধতায় ঘটে যাওয়া একটি ভুলকে পূঁজি করে সুযোগসন্ধানী কাফের আবু জেহ্ল ও আবু সুফয়ানের বংশধরেরা যদি রাসূল সঃ এর বিপ্লবকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়, তা'হলে তাকে ক্বোরআন ও রিসালাত মূলে পুনঃ ফেরৎ আনাই সর্ববৃহৎ কাজ। তা'না হলে মানবজাতি কেনো, সৃষ্টির বিপর্যয় ঠেকানোর আর কোনো পথ নেই। এ কথা বুঝে, স্মরণ রেখে, সে দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ বইর প্রতিটি লাইন ও বক্তব্য পড়তে হবে। অন্যথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে।

মক্কা বিজয় ও হজ্বের মাধ্যমে রাসূল সঃ এর বিদায়ের প্রস্তুতি হচ্ছে। তিনি তা আরাফাত ও মিনার খুতবা বা ভাষণে স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃ কে তাঁর রিসালাতের শেষ পর্যায়ে আদেশ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে রাসূল! তুমি নিঃসংশয়ে তোমার প্রতিপালক কর্তৃক তোমার প্রতি যা' অবতীর্ণ হয়েছে, তা' ঠিক ঠিক পৌছে দাও। তা পৌছানে তুমি কারো ভয় করবেনা। তা করলে তুমি তোমার রিসালাত পৌছালে না। আল্লাহ তোমাকে জনগণ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা মাঈদা - ৬৭)

এ আয়াতটি শিয়া ও সুন্নী দাজ্জালদের বিতর্কের আয়াত। শিয়ারা বলে এ আয়াত আল্লাহ কর্তৃক আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারী ইমাম ও খলীফা বানানোর আয়াত। রাসূল সঃ নাকি আবু বকর ও উমর চক্রের ভয়ে সংশয়গ্রস্থ ছিলেন। তাই ভয়ে ভয়ে গাদীরেখুমে আলীকে তাঁর মাওলা ও বন্ধু বলে ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর গদীনশীন বানিয়ে যান। এ ব্যাপারে শিয়ারা ইবন্ মাসউদের নামে এক মিথ্যা হাদীসও বানিয়েছে যে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্বে তারা নাকি পড়তো بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أن عليا ولى الله

অর্থাৎ "যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে যে আলী আল্লাহর বন্ধু, তা' নিঃসংকোচে ঘোষণা দাও"। পরে নাকি আয়াতের আলীর অংশটুকু ক্বোরআন থেকে মুছে ফেলা হয়। ক্বোরআন সম্পর্কে কি জঘন্য মিথ্যা প্রচার! এ মিথ্যার জবাবে সুন্নীরা মা আয়শার স্মরণাপন্ন হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, রাসূল সঃ ক্বোরআনের কোনো শব্দ বা অক্ষর বাদ দিয়েছেন কিনা? উত্তরে মা আয়শা বলেছে, "না'বাদ দেননি। বাদ দিলে তিনি 'আবাছা ওয়া তাওয়াল্লা' বাদ দিতেন। কারণ, তাতে ইবন্ মাক্তুমের প্রতি অমনোযোগী হওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃ কে ভর্ৎসনা করেছেন"। عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ

কি চমৎকার! যেমন শিয়ারা, তেমনি তাদের চাচাতো ভাই সুন্নীরা! ক্বোরআনের কোনো কিছু বাদ দেয়া হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, "আমি ক্বোরআন নাযিল করেছি, আমিই তার হেফাজত করবো" কি প্রত্যেক ঈমানদাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তার জন্য মা আয়শা থেকে ফতোয়া নিতে হবে কেনো?!

আসলে "আশাদ্দু কুফ্রাওঁ ওয়া নিফাক্বার" আরবী নব্য মুসলমানদের ঘাড়ে চাপা জাহিলিয়্যাত রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর পুনঃ ওদের মন মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তাই তারা ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া, শিয়া ও সুন্নীতে বিভক্তির পর বিভক্তি সৃষ্টি করে তাদের বাপ দাদার রক্তের খাস্লাত প্রমাণ করেছে।

তা' না হলে রাসূল সঃ যখন আল্লাহর নাযিল করা ক্বোরআনের নির্দেশ মোতাবেক মুস্তাদআফ্ ইমামত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুস্তাকবির রোগের চিকিৎসা করে ঔষধ ব্যবস্থা করে যান, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা বাদ দিয়ে পুনঃ রোগাক্রান্ত্র হওয়ার বিষ কেনো তারা পান করে নিজেরাও রুগ্ন হলো এবং বিশ্বকেও রোগাক্রান্ত্র করলো?

রাসূল সঃ আবু বকর বা আলী কাকেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান নি। কারণ তারা ক্বোরেশী গোত্রবাদী এইচ আই ভি আক্রান্ত ছিলো। মুস্তাদআফ্ হওয়ার ঔষধ তারা সেবন করেনি। যেমন যায়েদ, বেলাল, আম্মার, সোহাইব, সালমান, খাব্বাব ও উসামাহরা সেবন করেছিলো। ঐ রোগাক্রান্ত্রদের আল্লাহর পর তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশী চিনতেন। তাই উহুদের শহীদদের দাফন কালে আবু বকরদের সীল্ মেরে দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে উসামাহর আনুগত্যের রশি

তাদের গলায় পরিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তিনি আবু বকর ও উমরদের কেনো ভয় করতে যাবেন? উপরে বর্ণিত মাঈদার আয়াতেই তো আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে তিনি তাঁর রাসূলকে কুচক্রি মানুষদের হাত থেকে রক্ষা করবেন! আবু বকর, উমর, ওসমান, ও আলী তারা রাসূল সঃ কে বাদ দিলে কী থাকে? অখ্যাত সামান্য কাপড়ের বেপারী, হাট বাজারে মাস্তানী করে জীবিকা নির্বাহকারী, অজ্ঞাত ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র মূর্তির সেবাইতের পুত্র! রাসূল সঃ এর পরশ পাথরের স্পর্শ পেয়ে তা যে যতো টুকু গ্রহণ করেছিলো, ততোটুকুই তারা হয়েছিলো। যতোটুকু ধারণ করে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পেরেছে, ততো টুকুই তাদের সাফল্য। যতোটুকু ত্যাগ করেছে, ততোটুকু তাদের নিজেদের ব্যর্থতা। ব্যর্থতা আল্লাহরও নয়, তাঁর রাসূলেরও নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অভাব মুক্ত। مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে রাসূলের অনুগামী হবে, সে আল্লাহর অনুগত হবে। যে মুখ ফিরাবে, তার রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে আমি তোমাকে পাঠাইনি। (সূরা নিসা - ৮০) ব্যস্, এখানেই আমাদের সকলের মামলা ডিস্‌মিস্। তা থেকে, আবু বকর, উমর ও আলী কারো অব্যাহতি নেই। চার খলিফার চার দেয়ালীর খাঁচার কোনো বৈধতা ইসলামে নেই, যেখানে তাকওয়া একমাত্র মাপকাঠি, যেখানে গোত্রের প্রাধান্যের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যাত, জাহিলিয়্যাতের বর্ণচোরা প্রত্যাবর্তন।

এখানে একটি তিক্ত সত্য উল্লেখ না করলে পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা হলো যে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা ক্বোরেশী মুহাজিরদের মাঝে আন্তঃগোত্রীয় ঈর্ষা বিদ্যমান ছিলো। ক্বোরেশীদের এ রোগ রাসূল সঃ শুধু জানতেনই না, বরং রাসূল সঃ তা নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তাই দুঃখ করে বলেছেন, لولا الهجرة لكنت أحدا من الأنصار "যদি হিজরত না হতো, তা হলে অবশ্যই আমি আনসারদের একজন হতাম"। আবু বকর, উমর ও উসমানদের মধ্যে বনী হাশেমের আলীর বিরুদ্ধে সব সময় একটি বৈরী মনোভাব কাজ করতো। বনী হাশেমের আলীর মধ্যেও তার বাপদাদার কাবার পৌরহিত্যজনিত বৈশিষ্ট্যের ধারণা ছিলো। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল্লাহর রাসূল হওয়ায় আল্লাহ তাকে 'আলাম্ নাশ্‌রাহ' করে সকল সংকীর্নতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করেছেন। তিনি বনী হাশেম দুরে থাক, কখনো ক্বোরেশী ও আরবী বলে নিজেকে প্রকাশ করেননি। কাকেও বৈষম্য বোধে তা বলতে শোনা মাত্রই বলতেন, "তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাত রয়েছে"।

আবু বকর, উমর ও উসমানরা বাইরে, এবং ঘরে মা আয়শা ও হাফসা, কখনো আলী ও ফাতেমার প্রতি আকৃষ্ট ছিলো না। গৃহবিবাদে সর্বদা আলী রাসূল সঃ এর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে তাঁকেই সমর্থন দিতো। যা স্বাভাবিক ও উচিৎ ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা যেতো মা আয়শা ও হাফসার বিরুদ্ধে। কারণ, রাসূল সঃ এর ঘরে ঘটা সকল অশান্তির পেছনে ঐ দু'জন আম্মাজান হতো। ফলে ফাতেমাও তার পিতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। যা আবার আয়শা ও হাফসার বিরুদ্ধে যেতো। বিবি ফাতেমা তার মা খাদীজাতুল কোব্‌রার কন্যা। সে তার মাকে পিতার সংসার করতে দেখেছে। তার অতুলনীয়া মায়ের পর সৎ মাদের কান্ড কারখানা দেখে রাসূল পিতার প্রতি ফাতেমা স্বভাবতঃই সহানুভূতিশীল হতো। এসব মিলে মা আয়শা ও হাফসার সাথে ফাতিমার হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিলোনা, অনুমেয়।

রাসূল সঃ ইন্তেকাল করেছেন। সবাই শোকে মুহ্যমান। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর রাসূল সঃ তাঁর পরবর্তী ইসলামী জিহাদের ঝান্ডা উঁচু রাখার জন্য মুস্তাদাআফ্ বারাকাহ ও যায়দের ছেলে, রাসূল সঃ এর প্রিয়তম সুযোগ্য উসামাহকে আমীর ও ইমাম নিযুক্ত করে সর্ববৃহৎ যুদ্ধাভিযান প্রস্তুত করে যান। এদের নেতৃত্বে রোম পারস্য সাম্রাজ্যের পতন হবে, না ক্বোরেশী নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে হবে? বিশ্বের মুস্তাদআফ্‌রা আর্তনাদ করে বললো, "আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একজন সাহায্যকারী অভিভাবক দিয়ে আমাদের মুস্তাকবিরদের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করুন।" তখনকার দু'পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য নির্মূল করে তার স্থলে উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" মুস্তাদআফ্‌দের দোয়ার ফল রূপে কি উচ্চারিত হয়ে ছিলো? না তখনকার পরাশক্তি তাগুতকে উৎখাত করে উসামার নেতৃত্বে মুস্তাদআফ্‌দের ইমামত প্রতিষ্ঠা আল্লাহর পছন্দ ছিলো?

নিশ্চয়ই মুস্তাদআফ্ ইমামতের দ্বারাই তখনকার বিশ্বের মুস্তাদআফদের মুক্তির রিসালাত দিয়েই আল্লাহ রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ কে পাঠিয়ে ছিলেন। সূরা ক্বাসাস পড়িয়ে আল্লাহ সে প্রশিক্ষণই তাঁর রাসূলকে দিয়ে বলেছেন, আমি মুস্তাদআফ্‌দের ইমামরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে তোমাকে পাঠিয়েছি। রাসূল সঃ সে কাজ সামাধা করে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর লাশ মুবারক পড়ে আছে। তাঁর শিক্ষা, "মৃতের জানাযা পড়ে যতো শীঘ্র সম্ভব

দাফন করবে"।

তখন করণীয় কী ছিলো? আলী, আবু বকর ও উমররা রাসূল সঃ এর নিয়োগকৃত তাদের আমীরের ইমামতিতে রাসূল সঃ এর জানাযা আদায় করে তাঁকে দাফন করে উসামাহর অধীনে বর্ণ, গোত্র ও রক্তের বৈষম্যহীন অভিযান বিশ্বজয়ে বেরহয়ে পড়বে! কারণ, তারা সবাই যে, উসামাহর অধীনে সাধারণ সিপাহী! পচিত গলিত ক্বোরেশী রক্তের উত্তরাধিকার ছাড়া, আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীদের আর কী বৈশিষ্ট্য ছিলো? তাদের কার পিতা মাতা উসামার পিতামাতার তুল্য ছিলো? কে যায়দ ও উসামাহর মতো রাসূল সঃ এর সান্নিধ্য ও সার্বক্ষনিক তারবিয়াত্ পেয়েছিলো? কেইবা রাসূল সঃ এর পর যায়দের মতো এতোগুলো যুদ্ধের নেতৃত্বের সৌভাগ্য পেয়েছিলো? প্রত্যেক যুদ্ধে যায়দ বিজয়ী হয়ে, "আল আমীরুল মুযাফ্ফার" বা বিজয়ী সমর নায়ক উপাধী পেয়েছিলো। আমরা এ অনন্য বৈশিষ্ট্য মিথ্যা হাদীসের ধুম্রজালে বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার ফলে আল্লাহ আমাদের বিশ্বময় ইবলিসের গোত্রবাদের দাসের হাটের দোপায়া প্রাণীতে রূপান্তরীত করেছেন।

রাসূল সঃ এর লাশ মুবারক পড়ে আছে। তিনি সোমবার দুপুরে ইন্তেকাল করেছেন। সোমবার দিন গেলো। রাত গেলো। মঙ্গলবার এলো, দিন গেলো, রাত গেলো, বুধবার এলো, দিন গেলো। রাতে রাসূল সঃ এর দাফন হলো। তাও রাসূল সঃ এর শিখানো, পড়ানো ও নির্দেশিত সমষ্টিগত জামাতের জানাযা ছাড়াই! কেনো? কে ক্ষমতায় বসবে, তা নিয়ে বিবাদ!

ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ সরল ছিলো। রাসূল সঃ আল্লাহর নির্দেশে মুস্‌লিম উম্মাহর জিহাদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে দিয়েছেন! ইসলামে সালাতের ইমামতের চেয়ে জিহাদের ইমাম বড়ো। তাই তাকে "ইমামাতুল কোবরা" বলা হয়। জিহাদের ইমামের পেছনে জানমাল সবদিয়ে জিহাদ করতে হয় এবং সালাতের জামাত আদায় করতে হয়ে। কিন্তু সব সালাতের ইমামের পেছনে, বা তার অধীনে জিহাদ করা যায় না। এ সোজা ও সরল অঙ্ক তো যে কোনো ঈমানদার মাত্রের বুঝার কথা !

রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় যারা যায়দ ও উসামাহর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজী হয়নি, তারা তো জীবিত। তারাই এই অমার্জনীয় দেরীর কারণ। রাসূল সঃ এর জানাযা ও দাফন ক্রিয়ায় তো মাদীনার মুনাফিক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সমর্থকরা বাধা দিতে আসেনি? তখনতো আর কোনো ইয়াহুদী মাদীনায় ছিলোনা। রাসূল সঃ তাঁর জীবদ্দশায়ই তাদের মাদীনার সীমার বাইরে দেশান্তরিত করে গিয়েছিলেন। উবাই ও তার লোকেদের মাথা তোলার সুযোগ কোথায়? উবাই তো পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে! রোমান সাম্রাজ্যকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিরিশ হাযার সৈন্য প্রস্তুত। উবাইর দু'চারজন নয়, দু'চার হাযারও মাথা তুললে এক নিমিষে তাদের ঘাড় থেকে মাথা ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা প্রস্তুত। তারপরও এমনটি কেনো হয়েছিলো? তা কি এখনো ভেবে দেখার সময় আসেনি? বিশ্বের মুস্তাদআফ নরনারী ও শিশুরা যে শেষ বারের মতো ক্রন্দনরত ফরিয়াদ করছে!

পালাবদলের ঘটনাটি বুঝা ও বুঝানোর জন্য আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অবস্থান ও অকুস্থলের মধ্যে পাঠকদের আনা নেয়া করতে হচ্ছে। কারণ এর মাঝে ১৪১২ বছর কেটে গিয়েছে। ও দিকে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর আরবরা বর্তমানে মক্কা মাদীনা আব্দুল্লাহ ইবন্ উবাইদের বংশধর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের হাতে সমর্পন করে বিশ্বময় ইসলামের পুনর্জাগরণের সৈনিকদের মৌলবাদী বলে নির্মূল করার জন্য পেট্রো ডলারের বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থের যোগান দিচ্ছে। তাদের দেশে অনারব মুসলিমরা "আজনবী" বিদেশী। তারা ব্যতীত বাকী মুসলিমবিশ্ব "মিসকীন" বা ভিক্ষুক। বিভক্ত আরবদেশ সমূহে চেপে বসা মুস্তাকবিররা তাদের অত্যাচারের জাহান্নাম থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে যে সমস্ত শেষ যমানার যায়দ, বিলাল, আম্মার, সালমান, সুহাইব ও উসামাহ্রা এসে যুদ্ধ করে খুন পিপাসু হিংস্র কম্যুনিষ্ট ভাল্লুকদের পরাজিত করে রাশিয়ান সাম্রাজ্য বিস্তারের হাত থেকে গোটা আরব বিশ্বকে রক্ষা করেছে, তাদের স্বদেশে ফেরত যেতে দুরের কথা, আফগানিস্তানেও বেঁচে থাকতে দিতে নারাজ! তারা দাবি তুলছে, এদের তাদের হাতে তুলে দেয়া হোক, তাদের তারা জবাই করবে। যেমনটি তারা আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর নিকট ১৪২০ বছর পূর্বে চেয়েছিলো। এরা আর ওরা কি আসলে পৃথক চীজ? আমি বিশ্বাস করি, সময়ের ব্যবধানে হলেও তারা ও এরা এক ও অভিন্ন।

যায়দ, বেলাল, আম্মার, খাব্বাব, ইবন মাসউদ, সুহাইব ও মুসআবদের নিয়ে মাদীনায় হিজরত করে রাসূল সঃ যে আশ্রয় কেন্দ্র দাঁড় করিয়েছিলেন, সেখানেও আবু জেহল ও আবু সুফ্য়ানরা তাদের নির্মূল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো। মক্কা বিজয়ে তারা পরাজিত হলেও "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর বদৌলতে পরে তারা

মাদীনাবাসী থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে। তাদের হত্যা করেছে। নির্বিচারে তাদের নারীদের ধর্ষণ করেছে। মসজিদে নববীকে তাদের আগ্রাসনের ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছে। তাদের ধর্ষণে এক হাজার কুমারী গর্ভবতী হয়ে ছিলো। ক'হাজার ধর্ষিতা হলে এক হাজার গর্ভবতী হয়? অন্যূন দশ হাজার! ক'হাজার বিবাহিতারা ধর্ষিতা হয়েছিলো, বা কতো সংখ্যক তাদের মধ্যে অবৈধ সন্তানের মা হয়েছিলো, তার হিসাব করা তো সম্ভব হয়নি! এক কথায় বলা চলে যে, তারা মাদীনায় কোনো ঘর বাকী রাখেনি ধর্ষণ থেকে। কোথায়? মাদীনাতুর রাসূল! যেখানে বিশ্বের মাতৃজাতির সতিত্ব রক্ষার সৈনিকদের দুর্গ তৈরী হয়েছিলো! ট্রাজেডী এখানেই শেষ নয়। রাসূল সঃ এর মেয়ে ফাতেমার ঘরের দু'নাতির মধ্যে নানা রাসূলের আদর্শের ধারক হুসেইনকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক নিয়ে ক্বোরেশী খেলাফতের পঞ্চম খলিফা ইয়াযীদ খেলা করে বলেছে, "বদরের প্রতিশোধ নিলাম"। যেমনটি তার দাদী হিন্দা করেছিলো হামযার নাক, কান ও কলিজা নিয়ে। তারপরও আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের ক্রোধ কমেনি। হুসেইনের পরিবারের পর্দানশীন মেয়েদের অর্ধোলঙ্গ করে দামেশকের রাস্তায় ঘুরানো হয়েছে। তারপরও হরকতে জিহাদের সিপাহে সাহাবারা রাসূল, মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদদেরকে একত্র করে হালুয়া তৈরী করে বিশ্বকে গিলিয়ে খেলাফত ক্বায়েম করবে?

তায়েফ হিজরতে নির্যাতনে রক্তাক্ত হয়ে মুস্তাদআফ্ রাসূল তাঁর একমাত্র মুস্তাদআফ সঙ্গী যায়দকে নিয়ে রাব্বুল মুস্তাদআফের দরবারে যে মুস্তাদআফ রাষ্ট্রের প্রার্থনা করেছিলেন, মেরাজের মাধ্যমে তারই মঞ্জুরী পেয়ে রাসূল মাদীনায় যায়দ ও উসামাহর দ্বারা তার দৃষ্টান্ত রেখে যান। আবু বকর উমরের দূর দৃষ্টির অভাবে মুসলিম উম্মাহ্ তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পথহারা ও দিশাহারা হয়েছে। আল্লাহ আমাকে সে হারানো দিশার সন্ধান দিয়েছেন বলে আমি তা বলে ও লিখে আমার দায়িত্ব পালন করছি।

এখানে আমি পুনরাবৃত্তির মতো আবারও সতর্ক করবো যে, আবু বকর ও উমর কোনো বিতর্কের উর্ধ্বে নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সীমিত সাধ্যানুযায়ী তা পালন করে গিয়েছে। আলীর পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে শিয়ারা আবু বকর ও উমরকে যে দোষে দোষী করে, সে দোষে আলীও সমান ভাবে দোষী। বরং আমার বিচারে আলী একটু বেশী দোষী। কারণ, আলী রাসূল সঃ এর যে শিক্ষা ও সান্নিধ্য পেয়েছে, তার দশ ভাগের এক ভাগও আবু বকর উমর পায়নি। তা ছাড়া আলী, যায়দ ও উসামাহকে আবু বকর ও উমরের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছে ও চিনেছে। রাসূল সঃ এর রিসালাত প্রাপ্তির সময় আলী মাত্র সাত-আট বছরের শিশু। তার বড় ভাই জাফর বিশ বাইশ বছরের যুবক। যায়দ বত্রিশ তেত্রিশ বছরের পরিপক্ক ও পরিণত বয়সে রাসূলের ছায়াসম সঙ্গী। রাসূলের উপর ঈমান আনা সর্বপ্রথম ব্যক্তি। ক্বোরআনে নাম সহ প্রসংশিত একমাত্র মর্দে মু'মিন। রাসূল সঃ তাকে সেনাপতি করে একের পর এক অভিযানে পাঠাচ্ছেন। যায়দ সফলতা নিয়ে ফিরছে। শেষ মেষ আলীর জ্ঞানী-গুণী বড়ভাই জাফরকেও যায়দের অধীনে মউতার অভিযানে পাঠনো, এসব আলীর জন্য ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কী ছিলো? জাফরের দীপ্ত ঈমান ও সূরা মারইয়ামের উপস্থাপনায় সম্রাট নাজ্জাশীর মতো খৃষ্টান ধর্মের দিকপাল ইসলাম গ্রহণ করে। জাফরের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির সামনে আমর ইবনুল আসের মতো ধূর্ত শিয়াল মুখে চুন-কালী মেখে নাজ্জাসীর দরবার থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে। এ সব তো আলীর জানা ছিলো। তারপরও জাফরকে যায়দের অধীন মওতার যুদ্ধে পাঠানো আলীর জন্য কি স্পষ্ট ইংগিত ছিলো না যে রাসূলের বিদায়ের পর মুস্তাদআফ্ ইমামত প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? পুনঃ তারপরও যায়দের আঠারো বছরের যোগ্য সন্তান উসামাহকে মুহাজির আনসার সকল মুসলিমদের উপর প্রধান নিয়োগও কি আলীর অন্তরদৃষ্টি খোলার জন্য যথেষ্ট ছিলোনা? এ কেমন করে হয়?!

আলীর তো এ সমস্ত দেখে তার সঠিক মূল্যায়ণ করে যায়দ ও উসামাহর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো! আলীর দৃষ্টিতেও কি যায়দ ও উসামা ক্বোরেশী নয় বলে তুচ্ছ ছিলো? ক্বোরেশদের মাথায় কিসের শিং ছিলো যে তারা শিক্ষিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত বনী কালবের চেয়েও বেশী অভিজাত ছিলো? কাবাঘরের ঠাকুরগিরী, মুর্তি পূজা ও ধর্ম ব্যবসা করে পরের ধনে পোদ্দারী করা এবং ডাকাতি ও ছিন্তাই করে আনা দাস-দাসীর হাট মিলানো ছাড়া ক্বোরেশের কী গর্বের মূলধন ছিলো? রিসালাত ও ক্বোরআন নাযিলের পর তো ক্বোরেশী হওয়া একটি গালী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো! সূরা ক্বোরেশ নাযিল তো তা ক্বোরেশদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঝুলন্ত অসি স্বরূপ ছিলো! মক্কা বিজয়ের পর উত্তাব ইবন্ উসাইদকে রাসূল সঃ কর্তৃক মক্কার আমীর, গর্ভনর ও ইমাম নিয়োগ করার পর ক্বোরেশের আর বাকি ছিলো কী? পরে নির্লজ্জ মুহাদ্দিস ও ইবন্ আব্বাসরা উত্তাব ইবন উসাইদের ক্বোরেশী হওয়ার মিথ্যা কাহিনী তৈরী করতেও পিছপা হয়নি। এমন কি শেষ রক্ষার জন্য যায়দ ও উসামাহকেও বনী হাশেমের লোক বলে চালানোর প্রয়াস পেয়েছে।

(দেখো, বালাযারী, আনসাবুল আশরাফু ও আল মিলাল ওয়ান্ নিহাল)। সর্বোপরি সূরা তওবা নাযিল হয়ে যখন মক্কা বিজয়ের এক বছর পর মক্কায় মুশরিকদের "নাজাস্" বা অপবিত্র বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে ওরা কা'বায় প্রবেশ দূরে থাকে, কাবার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবেনা, তাতে তো ক্বোরেশদের কবর রচিত হয়ে গেলো! কারণ, ক্বোরেশরা যে লাত, মানাত, হুবল ও উয্যাদের দেবদাস ও সেবা-দাস! সাধারণ মুশরিকরা যদি নাপাক হয়, তা হলে মুশরিকদের ঠাকুর ক্বোরেশীরা তো নাপাক তৈরীর খাজাতে পরিণত হয়েছিলো? তাই হয়তো সুন্নী দাজ্জালরা, বিশেষ করে গরম সুন্নীরা, মুশরিক আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালেবকে খাজা আব্দুল মুত্তালিব ও খাজা আবু তালেব বলে নামের পূর্বে লিখে। (দেখো আসাহ্হুস্ সিয়ার)

এ পরিস্থিতিতে কতইনা উত্তম হতো যদি আলী দোদুল্যতা কাটিয়ে উঠে উসামাহর ইমামতিতে রাসূল সঃ এর জামাতে জানাযা আদায় করে তাঁকে দাফন করতো! তাতে আবু বকর ও উমর কর্তৃক মুহাজির ও আনসার রূপে ঐক্যবদ্ধ উম্মাকে দুভাগে বিভক্ত করে বিবাদ সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি হতো না! রাসূল সঃ এর জানাযা ও দাফন সম্পন্নের মাধ্যমে আলী সহ আহলে বাইতের সমর্থন পুষ্ট মুস্তাদআফ্ ইমামত প্রতিষ্ঠার পর তার বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুললে ত্রিশ হাজার সশস্ত্র সৈনিক প্রস্তুত। বায়আতের পর তা অমান্যকারীদের শিরোচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন রাসূল সঃ!

আলীর দূরদৃষ্টির অভাব প্রতিষ্ঠিত ঐক্যে ফাটল আরম্ভ হয়েছিলো। এক দিকে রাসূল সঃ এর লাশ ঘিরে বসে আলী, তালহা, যুবায়র ও আব্বাস। একবার আবু সুফ্য়ানের কুপরামর্শে আব্বাস আলীকে খলিফা রূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার পেছনের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে আলী আব্বাসকে শক্ত ভাষায় নিরস্ত্র করেছিলো।

অপরদিকে দুর্বোধ্য ভাবে উমর মসজিদে নববীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আবোল তাবোল বকা আরম্ভ করেছে। নাঙ্গা তলওয়ার হাতে নিয়ে বলছে রাসূল সঃ মারা যাননি। মুনাফিকরা তাঁর মৃত্যুর মিথ্যাগুজব প্রচার করছে। রাসূল সঃ হযরত মূসার ন্যায় কোহেতুরে গিয়েছেন অহী আনতে। রাসূল সঃ আল্লাহর কিতাব নিয়ে ফিরবেন। যারা বলবে যে, রাসূল সঃ ইন্তেকাল করেছেন, তাকে উমর হত্যা করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এধরনের উক্তির একটিও কোনো বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ঈমানদারের পক্ষে উচ্চারণ করা অকল্পনীয়। রাসূল সঃ মৃত্যুবরণ করবেন, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর মৌলিক শিক্ষার প্রাথমিক সবক। রাসূল সঃ মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁর মরদেহ সামনে, তিনি কিরূপে মূসা আঃ এর ন্যায় অহী আনতে যান? হযরত মূসা কি দেহ রেখে শুধু আত্মা নিয়ে তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন? তা তো নয়! সুস্থ সশরীরে তিনি গিয়েছিলেন। উমরের মতে কি রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্বে পূর্ণ ক্বোরআন নাযিল হয়নি যে আরো অহী আনতে তিনি যাবেন? এর প্রত্যেকটি কথা ইসলাম, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী। কি করে উমরের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হয়? ইসলাম ও ঈমান যারা বুঝেনা, বা তা মানেনা, সে ধরনের কিছু লোক উমরের প্রতি অতিভক্তির ভানকরে বলে যে, রাসূল সঃ এর মৃত্যুতে শোকে উমরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, তাই এরূপ করেছে। তারা জানে না যে, একথা বলেও তারা এ ধরনের সাফাই দিতে গিয়ে শুধু উমরকেই ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানহীন বা দুর্বল মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি প্রমাণ করছেনা, মূল ইসলামী শিক্ষার মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। ইসলামের মৌলিক কথা হলো যে মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহর শেষ নবী। তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ ক্বোরআন নাযিল হয়ে তাঁর রিসালাত পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ হয়েছে আল্লাহর দ্বীন। ক্বোরআন বলেছে খাতামুন নাবিয়্যীন অন্যান্য নবী রাসূলদের মতো মৃত্যু বরণ করবেন। তিনি বিদায় হজ্জে বলেছেন যে তাঁর বিদায় আসন্ন। এতো সব বলার পরও নাঙ্গা তলওয়ার উচিয়ে ঐ সমস্ত কথা উমর কী ও কেনো বলেছে? যে ব্যক্তিটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হয়েছে, তার মুখ থেকে ঐ ধরনের উক্তি তো কোনো বিচারেই সমর্থনযোগ্য নয়! কোনো পরিবারের কোনো সন্তান পিতার মৃত্যু শোকে এরূপ ভারসাম্যহীন আচরণ করলে তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা সাজানো যায়। কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা যায়না। ধীরস্থীর কোনো সন্তানের উপরই পরিবারটির ভবিষ্যত দায়িত্ব অর্পণ করা যায়।

ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর একমাত্র দ্বীন। তাঁর শেষনবী সঃ বিশ্বপরিবারের সকল সদস্যদের আদর্শ। আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীরা সে পরিবারের সদস্য। কেউ নবী বা রাসূল নয়। তাদের কারো কাছে অহীও আসেনি। তাদের ব্যাপারে রাসূল সঃ বহু সর্তকবাণী প্রচার করে তারপর তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাই তাদেরকে গ্রহণ বা বর্জনে খুব সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য। তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে যে সর্বনাশ হয়েছে, দীর্ঘ ১৪১২ বছর যাবৎ তার মাশুল দিয়ে আজও মুসলিম উম্মাহ মুক্ত হতে পারেনি।

প্রতিষ্ঠিত মূলসত্য থেকে সাময়িক ভাবে অমনোযোগী হলেও শয়তান তার ফাঁকে সর্বনাশা বিভ্রান্তির বীজ বপন করে দেয়। এ ব্যাপারে রাসূল সঃ দেরও অব্যাহতি নেই। বাবা আদম, হযরত সুলাইমান, হযরত আইউব ও আখেরী নবী সঃ দের জীবনে এরূপ ঘটনা শয়তান ঘটিয়েছে। একদা রাসূল সঃ কা'বায় সূরা নাজ্‌ম তেলাওয়াত করছিলেন। লাত, মানাত ও উয্‌যার কথা তেলাওয়াতের সময় রাসূল সঃ একটু থেমে ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন যে, যদি কাবায় উপস্থিত মুশরিকরা এদের পূজা ত্যাগ করে ঈমান আনতো! এ সময়টুকুর মধ্যেই শয়তান রাসূল সঃ এর স্বর নকল করে কাফেরদের কানে পৌঁছে দেয় যে, রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে, এ সমস্ত প্রধান দেব-দেবীদের শাফাআত ও সুপারিশও আল্লাহ শুনবেন। এ শুনা মাত্র মুশরিকরা সিজদায় পড়ে যায়। পরে তারা প্রচার করে যে মুহাম্মাদ সঃ তাদের দেব-দেবীর গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করেছেন। এ শয়তানী গুজব মক্কা থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। তা'শুনে সেখানে হিজরতকারী মুসলিমদের একদল মক্কায় ফেরৎ এসে পুনঃ মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হয়। রাসূল সঃ মূল ব্যাপারটি জানতে পেরে ব্যথিত হন। জিব্রাঈল মারফত আল্লাহ তার রাসূল সঃ কে মূলঘটনা জানিয়ে দেন। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা হজ্বের ৫২ নং আয়াত ও আইসারুত্‌ তাফাসীর, ইবন্‌ কাসীর ও কুরতবীতে তার তাফসীর দেখো)।

রাসূল সঃ এর মৃতদেহ রেখে উমরের উপরোল্লেখিত কীর্তিকলাপ ও কথাবার্তা শোকে মুহ্যমান মাদীনাবাসীর মাঝে এক ত্রাসের সৃষ্টি করে। রাসূল সঃ এর দাফনে হৃদয় বিদারক দেরী ও বিশৃঙ্খলার ফাঁকে সম্ভবতঃ লাত, মানাত ও উযযার ঘটনার মতো কোথাও "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর মতো সর্বনাশা বিষাক্ত কথা শয়তান প্রচার করে দেয়। ফলে আবু বকর, উমর ও আনসারদের মাঝে সাক্বীফা বনু সা'আদায় বিবাদ লাগিয়ে দেয়। তাতে রক্তক্ষয়ী সংঘাত হতে হতে বেঁচে যায়। আবু বকর না থামালে, সেখানে উমরের উগ্র কথাবার্তায় প্রায় যুদ্ধ বেধে গিয়েছিলো। এর মধ্যে ক্বোরেশী রূপে আবু বকরের নির্বাচন হয়ে গেলেও উম্মত দু'টুকরা হয়ে যায়। মাদীনাবাসীর অসীম ধৈর্য্য ও ভদ্রতায় রক্তক্ষরণ এড়িয়ে যায় বটে। আবু বকর, উমর ও উসমান ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত কোনো মাদীনার আনসারকে তারা কোনো দায়িত্বপূর্ণ নিয়োগ দেয়নি। একমাত্র আলী এসে মাদীনাবাসীদের সাথে রাসূল সঃ এর অসীয়ত অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য সদ্ব্যবহার করেছে। মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ান এসে মদীনাবাসীর প্রতিদানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে ক্বোরেশী ইমামতের পরিণাম হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেয়।

আবু বকর ও উমর খেলাফত কবজা করে তাদের কুটনৈতিক তৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাসূল সঃ এর গোসল, কাফন ও দাফনের কাজে এদের কোনো অংশ গ্রহণের প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের আনুগত্যের বায়আত আদায়ে তারা লেগে যায়। এর মধ্যে দু'দিন দু'রাত গিয়ে তৃতীয় দিন এসে যায়। সোম, মঙ্গল গিয়ে বুধ আরম্ভ হয়ে যায়। এ অবস্থা কি কল্পনা করা যায়? কতইনা হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা!

অপর দিকে উসামাহ, বিলাল ও শাকরান পানি এনে তা'দিয়ে হুজুর সঃ এর গোসলের ব্যবস্থা করে। আলী নিজ হাতে গোসল করাচ্ছে। উসামাহ ও বিলাল পানি ঢালছে। আব্বাস, ফজল ইবন্‌ আববাস ও কুস্‌ম ইব্‌ন্‌ আব্বাসও সহায়তায় ছিলো। আশ্চর্যন্বিত হয়ে ভাববার বিষয় যে, এসময় পরবর্তী প্রথম খলিফা সিদ্দীকে আকবর, দ্বিতীয় খলিফা ফারুকে আযম, ও তৃতীয় খলিফা যিন্নুরাইন কাউকেই কোনো কাজে দেখা যাচ্ছেনা ! চতুর্থ খলিফা আলীকেই দেখা যাচ্ছে মুস্তাদআফ্‌দের নিয়ে গোসল, কাফন ও কবর খোদার কাজ করছে। অথচ ক্বোরেশী খেলাফত ক্বায়েম হওয়ায় আলীকে তার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ষাট বছর জুমা, ঈদ ও হজ্বের খুৎবায় গালী খেতে হয়েছে !

পাক ভারতে সকল মাদ্রাসায় পঠিত সঠিক তথ্য বহুল উর্দু ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থ "আসাহ্‌হুস সিয়ার" আমার মতে উর্দু ভাষায় সবচেয়ে উত্তম সিরাতের কিতাব। যারা মুল আরবীতে রচিত অসংখ্য সীরাতগ্রন্থ পাঠে অপারগ, তাদের জন্য আব্দুর রউফ দানাপুরীর আসাহহুস্‌ সিয়ার অমূল্য সম্পদ। রাসূল সঃ এর ইন্তেকাল, তাঁর গোসল, কাফন ও দাফন সম্পর্কে এ কিতাবের ৫৪২, ৫৪৩ ও ৫৪৪ পৃষ্ঠা পড়া মাত্র যে কোনো বিবেক বুদ্ধিমান আল্লাহর বান্দা বুঝবে যে, রাসূল সঃ এর ইন্তেকাল ও তাঁর দাফন কি অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে। এ কেলেঙ্কারীকে মোছার জন্য পরবর্তীতে এমন সকল অলৌকিক কল্প কাহিনী তৈরী হয়েছে যে তা পড়া মাত্র "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্য বুঝে আসে।

এভাবে রিসালাত বিদায় নিয়ে খেলাফত চালু হয়। দু'বছরের কিছু বেশী আবু বকর রাষ্ট্র চালায়। উমর সত্যিকার অর্থে তার ডান হাত রূপে কাজ করে। আবু বকরের মৃত্যু উপস্থিত হয়। আবু বকর ওসমানকে ডেকে এনে তার পরবর্তী

খলিফারূপে উমরের নামে ফরমান লিখে যায়। কিন্তু রাসূল কাগজ কলম চাইলে তাঁকে তা দেয়া হয়নি। বিশ্ব বিখ্যাত মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল রচিত আবু বকরের জীবনীতে দেখা যায় যে, আবু বকরের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার কাতেব ওসমানকে ডেকে যখন ফরমান লিখাচ্ছিলো, তখন "আমি তোমাদের উপর খলিফা বানাচ্ছি" লেখার পরই আবু বকর অজ্ঞান হয়ে যায়। অতঃপর ওসমান নিজে থেকে আবু বকরের বেহুশ অবস্থায়ই "আমি উমর ইবন্ আল খাত্তাবকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করছি" লিখে দেয়। (দেখো, আবু বকর সিদ্দীক, আধুনিক প্রকাশনী- ৪২১পৃ.) এখানেও এ কথাটি স্পষ্ট হয় যে, বনী হাশেমের আলীকে খেলাফত থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে বনী তাইম, বনী আদি ও উমাইয়া পূর্ব থেকেই একমত ও একজোট ছিলো।

শুরু হলো উমরের শাসন। আবু বকরের সোয়া দু'বছরের পর দীর্ঘ দশবছর চলে উমরের শাসনকাল। তার আমলেও মুস্তাদআফ্‌রা দৃশ্যপট থেকে পেছনে নিক্ষিপ্ত থাকলেও তাদের কিছুটা লোক দেখানো হলেও মর্যাদা ছিলো। উমর কিছুদিনের জন্য আম্মার ইবন্ ইয়াসিরকে ইরাকের গভর্ণর বানায়। তারপর তাকে অপসারিত করে মুগিরাকে সে স্থলে নিয়োগ করে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদকেও উমর নব অধিকৃত ইরানী সাম্রাজ্যের নবদীক্ষিত মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য ওস্তাদ রূপে নিয়োগ করে। কিন্তু মূল নেতৃত্বে আবু বকরের নিয়োগকৃত মুস্তাকবির মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস ও মুগিরারা আরো মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একমাত্র খালিদ ইবন্ ওয়ালিদকে উমর অপসারণ করে। কিন্তু ক্বোরআনে ধিকৃত ওয়ালিদের পুত্রকে উমর ব্যভিচারের শাস্তি দেয়নি। তাই খালেদের বরখাস্তের ব্যাপাটি রহস্যাবৃতই রয়ে যায়। এতো বড়ো অপরাধের শাস্তি তো ইসলামে কোনো অবস্থাতেই শুধু পদ থেকে অপসারণ নয়! আল্লাহর আদিষ্ট শরিয়তের একটি বিধান লঙ্ঘন হলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজাযের আরবরা আরবদের মধ্যে সবচেয়ে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছিলো। ইব্রাহীম খলিল আঃ মক্কায় বসতি স্থাপন কালেই তাকে "গাইরা যি যার্‌আ" অর্থাৎ অনুর্বর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাওহীদ ও দ্বীনের খেদমতের জন্য হযরত ইব্রাহীম মক্কাবাসীকে ফলমূল দিয়ে খাদ্যদানের দোয়া করেছিলেন আল্লাহর দরবারে। কিন্তু কুলাঙ্গার মক্কাবাসীরা বাইতুল্লাহকেই ৩৬০টি মূর্তির মন্দিরে রূপান্তরিত করে আল্লাহর গযবে পুনঃ দারিদ্র্যে পতিত হয়।

আল্লাহ তাঁর আখেরী নবীকে পাঠিয়ে পুনঃ তাঁর আদর্শ বাবা হযরত ইব্রাহীমের কেন্দ্রকে শির্কের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন। রাসূল সঃ তাঁর মিশন পূর্ণ করে বিদায়ের পূর্বে সে অর্ধাহারী, অর্ধনগ্ন ও খালিপদ হুফাতুন উরাতদের বলে যান যে, তাদের হাতে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়ে তাদের সম্পদের ঢল নামবে। তখন যেনো তারা সম্পদের ভোগে নিমজ্জিত না হয়। কিন্তু আশাদ্দু কুফরান্ ওয়া নিফাক্বার মরুবাসীদের মজ্জাগত দোষ যায়নি। তারা প্রথমেই ইসলামী ইমামতকে রাসূল সঃ এর মৃত্যুতে তাঁকে বিনা জানাযাতে দাফন করে তদস্থলে ক্বোরেশী সাম্রাজ্যেবাদের সূচনা করে তা প্রত্যাখান করে।

আবু বকর ও উমরের ব্যক্তিচরিত্রে তার রং না ধরলেও তাদের নিয়োগকৃত নব্য ক্বোরেশী রাজপুত্র মুয়াবিয়া, খালেদ, আমর ইবনুল আস ও মুগীরাদের চোখ ও জিহ্বায় ক্ষুধাতুর নেকড়ের মেষের পাল দেখলে যেরূপ পানি আসে, তা এসে গিয়েছিলো।

ক্বোরেশী গোত্রীয় খেলাফতকে মানতে অস্বীকারকারীদের তারা "মানেঈনে যাকাত" বা যাকাত দানে অস্বীকারকারী ও মুর্তাদ নামে অভিহিত করে কঠোর হাতে দমন করে। মূলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর হঠাৎ করে একচ্ছত্র কর্তৃত্বের দাবী করে ক্বোরেশরা ক্ষমতা দখলের ফলেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাআদ ইবন্ উবাদার মতো ব্যক্তি, মাদীনার আনসারদের প্রধান, সে আবু বকরের হাতে বায়আত হয়নি এবং আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত তার পেছনে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করেনি। উমরের হাতেও বায়আত হয়নি। পরে বিলালের মতো হিজরত করে মাদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় মৃত্যু বরণ করেছে। "আল আইম্মতু মিন ক্বোরেশ" এর মধ্যে সামান্যতম সত্য থাকলে অবশ্যই তা সাআদ ইবন্ উবাদা ও বিলাল রাসূল সঃ এর মুখে শুনতো। এ কথাটি সে ছুরি, যা রাসূল সঃ এর রেখে যাওয়া উম্মতকে দু'টুকরা করে জবাই করে দিয়েছে।

উমরের খেলাফতে আরবরা রুগ্ন পারস্য সাম্রাজ্য ও রোমানদের উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলামের শেষ নবীর অনুসারী বলে অগ্নিপূজক পারসিক ও হযরত ঈসা আঃ এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত রোমান সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদের অন্তরে তার একটি বিরাট প্রভাবও পড়েছিলো। রাসূল সঃ ও ইসলামের নামের এ প্রভাবকে নব্য

আরবযোদ্ধারা প্রচন্ড ক্ষিপ্রতার সাথে কাজে লাগিয়েছে। ফলে পর পর উমরের আমলেই পারস্য ও রোমান পরাশক্তি মৃয়মান হয়ে যায়। সম্পদের বন্যায় উমর তার স্বভাবগত সরলতা ও কৃচ্ছতায় নিজেকে রক্ষা করে প্রায় ফকীরি জীবন যাপন করে যায়। কিন্তু গভীর বুঝশক্তির অভাবে উমর এমন এমন ভুল করে যায় যে, তা স্মরণ হতেই ১৪১২ পরেও আল্লাহর ভয়ে আমার শরীর শিউরে উঠে। আমি আমার মন হতেই আঁতকে উঠি। অনেক সময় তাহাজ্জুদে ক্বোরআন তেলওয়াত কালে কান্নায় আমার দম আঁটকে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এখানে প্রকৃত ঈমানদার পাঠকদের জন্য সংক্ষেপে আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা ও ক্বোরআনের আলোকে, পরবর্তী ক্বোরেশী, উমাইয়া, আব্বাসী, তুর্কী, মুঘল ও পাঠান সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদীরা যে বিকৃত ও দুর্নাম করেছে, তার কিছু মৌলিক কথা তুলে ধরা হচ্ছে। তা হলে পাঠকদের নিকট মুসলিম নামধারী জাতির উপর বর্তমানে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চেয়েও মারাত্মক গযবের কারণ বুঝে আসবে। ফলে ভুল সংশোধন করে তওবা করে পুনঃ ঈমান এনে রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর রেখে যাওয়া আদর্শে বিশ্বমানবের মুক্তির পথ প্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। মেসাইয়া, মসীহ ও মাহ্দীর আগমনস্বপ্নে বিশ্বের বিপদগামী ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ও মুসলমানরা বিভোর। কিন্তু এদের কারোই হুশ নেই যে এরা প্রত্যেকেই আল্লাহর রাসূল মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের রিসালাত ত্যাগ করে দাজ্জাল হয়ে মহা দাজ্জাল, মসীহুদ্দাজালের অগ্র সেনা হয়ে আছে। এরা ভুল বুঝে, তা ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার করে তওবা করে পুনঃ ঈমান না আনলে এরাই হবে দাজ্জালের বাহিনী। এবং মাহদী ও মসীহ হবেন এদের প্রতিপক্ষ।

আল্লাহর দ্বীন বুঝে নির্ভেজাল ঈমানদার হলে তাদের অন্তরে ফারাসাতের জন্ম হয়। রাসূল সঃ বলেছেন,

اتقوا فراسة المرمن، فإنه ينظر بنور الله

"মুমিনের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হবে। কারণ সে আল্লাহর নূরে দেখে"। খাঁটি মু'মিন হলে তাই হয়। ফেরআউনের দরবারের এক মু'মিন ব্যক্তি মূসা আঃ এর পক্ষ অবলম্বন করে ফেরআউনের পরিণাম সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে হযরত মুসার বিরুদ্ধাচারণ থেকে বিরত হতে বলে। তাগুত মুস্তাকবির তাতে কর্ণপাত না করে নিজের ও গোটা জাতির ধ্বংস ডেকে আনে। ফেরআউনের স্ত্রী মু'মিনা হয়ে স্বামী ও জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে পার্থিব জীবন থেকেই ক্বেয়ামত ঘটার পূর্বে জান্নাতবাসী হয়। আখেরী নবী সঃ এর উপর ঈমান এনে ইয়াসির, স্ত্রী সুমাইয়া ও পুত্র আম্মার গোটা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সপরিবারে রাসূল সঃ এর মুখে গোটা পরিবারের বেহেশতের সার্টিফিকেট লাভ করে। পিতা-মাতা ইয়াসির ও সুমাইয়া ইসলামের প্রথম শহীদ স্বামী-স্ত্রীর গৌরব অর্জন করে। আম্মার প্রাণে বেঁচে রাসূলের এমন সঙ্গী হয় যে, সে ইসলামে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাতার মর্যাদা অর্জন করে। সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ সে মসজিদকে "মাস্জিদুত্তাক্বওয়া" নাম দেন। রাসূল সঃ তাঁর ক্বোরেশী মুশ্রিকদের অত্যাচারে মক্কার কা'বা ত্যাগ করে দেশান্তরিত হলে ক্বোবায় যাত্রা বিরতি কালে বাইতুল্লাহ ত্যাগের শোকে কাতর আম্মার পাথর যোগাড় করে রাসূলকে বলে, "রাসূলুল্লাহ, আমরা মক্কায় বায়তুল্লাহ্ ফেলে চলে এসেছি, আমাদের জন্য এখানে আপনি মসজিদ তৈরী করে দিন না?" আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সঃ সঙ্গে সঙ্গে আম্মারের প্রস্তাবে রাজী হয়ে আম্মারের জড়ো করা পাথর দিয়ে মসজিদে ক্বোবার ভিত রচনা করেন। আল্লাহ আল্লাহ!! এ যেনো সে পিতা পুত্র ইব্রাহীম খলীল ও ইসমাঈল জবীহের ক্বাবা নির্মাণ! আজো সে মসজিদে ক্বোবা ইয়াসির ও সুমাইয়ার পুত্র আম্মারের বিজয় পতাকা উড়াচ্ছে। মাদীনায় রাসূল সঃ মসজিদে নববী নির্মাণ করছেন। সবাই মাথায় করে পাথর বহন করে আনছে। ক্বোরেশী বড়োলোকেরা আম্মারের মাথায় দ্বিগুণ তিনগুণ বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। স্বরচিত কবিতা পড়ে আম্মার ফুর্তিতে সে পাথর টানছে। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত বোঝায় ক্লান্ত হয়ে রাসূল সঃ কে আম্মার বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওরা আমাকে দিয়ে আমার বহন ক্ষমতার উর্ধ্বে বোঝা দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে।" রাসূল তা দেখে ও শুনে তাকে স্বহস্তে সাহায্য করে পাথর নামিয়ে নিজের চাদর দিয়ে আম্মারের দেহ পরিষ্কার করে রিসালাতের আদর ও স্নেহে বলেন, "ওরা তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। তোমাকে হত্যা করবে বিপথগামী বিদ্রোহীরা"। মসজিদে নববী নির্মাণরত সকল মুহাজির এ আনসাররাও এ হাদীসের সাক্ষী। তাই এ হাদীসটিকে "হাদীসে মুতাওয়াতির" বা সর্বজন স্বীকৃত রাসূল সঃ এর ভবিষ্যত বাণী বলে বলা হয়েছে। রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের তৃতীয় বা চতুর্থ ঈমাম আবু সুফয়ান ও হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়ার লোকেরা সিফ্ফীনের যুদ্ধে আম্মারকে হত্যা করে নিজেদের বিপথগামী বিদ্রোহী হওয়ার প্রমাণ দেয়। যায়দ ইবন্ হারিসা রাসূল সঃ এর উপর ওহী নাযিল হতেই

সর্বপ্রথম তাঁর উপর ঈমান এনে যেমন প্রথম হয়, তদরূপ অসম যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে শাহাদাতবরণ করতে হবে জেনেও ইসলামের একমাত্র শহীদ সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে শুরু ও শেষে প্রথম হয়। খালেদরা শাহাদাত থেকে পালিয়ে ফূররার সেনাদলের প্রথম হয়। এ-ই হলো আসল ও নকল ঈমানের সাত আসমানী সনদ।

এ ঈমানের যারা সন্ধান পায়, তারাই, ফারাসাত, বাসীরাত ও দিরায়াতের অধিকারী ঈমানদার। এদের অন্তর দৃষ্টি খুলে যায়। এরা আলাস্তুর আদি অতীত দেখে, তাৎক্ষণিক বর্তমান দেখে এবং সুদূর ভবিষ্যত অর্থাৎ আখেরাতও পৃথিবীতে বসে দেখে। তারাই রোজ কেয়ামতে ডান হাতে আমলনামা পেয়ে বলবে,

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ "তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমার পড়ার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে বসেই আমি আমার আমলনামা পড়ে এসেছি।"

এ শ্রেণীর আম্মার ও যায়দরা সেদিন এক চরমতৃপ্তির জীবনে প্রবেশ করবে। প্রকান্ড সুপরিসর জান্নাতে তাদের বাসস্থান হবে। আল্লাহ বেহেশতের ফলেভরা বৃক্ষদের আদেশ করবেন যে তারা যেনো তাদের ফলে ভরা ডালা ন্যুব্জ করে ওদের মুখের কাছে নিয়ে ধরে। অতঃপর আল্লাহ ওদের বলবেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

"তোমরা যেহেতু আমাকে চর্মচক্ষে না দেখেও আমাকে উপস্থিত মনে করে ইহসান করে পৃথিবীতে বন্দেগী করে এসেছো, তাই আমিও তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের জন্য বেহেশত সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা মজাসে তা ভোগ করো"। (আল-হাক্কাহ-১৯-২৪)

মুস্তাকবিরী ত্যাগ করে মুস্তাদআফ্ হলে আল্লাহ এ অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। নবী রাসূলগণ এ পথ দেখান। পিতা, মাতা, রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় জাহেলিয়্যাত ত্যাগ করে নবীদের রঙ্গে রাঙ্গালে এ জীবন নসীব হয়। ইয়াহুদী, আরবী, ক্বোরেশী, সাইয়েদ, মুঘল, পাঠান, হিন্দি ও বাঙ্গালী গোত্রবাদী হলে সে চক্ষু অন্ধ থেকে যায়। যেমনটি ইবলিসের হয়েছে।

এ ব্যাধি রেখে ঈমান আনলে ঈমানের ঘরের দরজা এদের জন্য খোলে না। শুধুমাত্র কখনো কখনো জানালা খোলে। তা দিয়ে তারা জানালা দিয়ে ঈমান দেখে গিয়ে পুনঃ ফেরত গিয়ে জাহিলিয়্যাতের ঘরে গিয়ে বাস করে। আনুষ্ঠানিক নামাজ-রোজা করা সত্ত্বেও, এরা ও এদের ধর্মবেসাতী, যাজক, পুরোহিত ও মোল্লারা ধর্মান্ধ বিপথগামী। হযরত মূসা, ঈসা, ও মুহাম্মদ সঃ দের আদর্শ বর্জনকারী বর্তমান, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও নামধারী মুসলমানরা তার দৃষ্টান্ত।

আমাদের বর্তমান সময়ের ইসলামী পুনর্জাগরণের কিছু ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে। বর্ণনা সংক্ষেপ করার জন্য ভারত বর্ষের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মিশরের হাসানুল বান্না ও পাক ভারতের মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা মওদুদীর উল্লেখ করবো।

তার পূর্বে দিক নির্দেশনার জন্য একবার পুনঃ আমরা রাসূল সঃ এর দু'ক্বোরেশী সাহাবী আবু বকর ও উমরের ঈমানী দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করবো। তারা রাসূল সঃ ও ক্বোরআনের অকাট্য বর্ণনায় মক্কার কুফর ও শির্কের অতীত ও বর্তমান দেখে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদার উজ্জল ভবিষ্যত বিজয়ের উপর ঈমান এনে তার ফলাফল স্বচক্ষে দেখতে পায়। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টির অভাবে তারা দূর ভবিষ্যতে বিশ্বজনীন বিজয়ের রূপরেখা দেখতে পায়নি। তাই তারা ইসলামের বর্ণ ও গোত্রবাদহীন বিশ্বজনীনতা বাদ দিয়ে সংকীর্ণ ক্বোরেশী গোত্রবাদ দিয়ে ইসলামকে বন্দি করে ফেলে।

ইসলাম ও তার চূড়ান্ত নবীর কাজ হলো সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে বনী আদম অর্থাৎ মানব জাতিকে তাওহীদের ভিত্তিতে একজাতিতে পরিণত করা। প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা শির্কের সীমা ও সীমান্ত ভেদ করে আল্লাহর দ্বীন বিশ্বময় ছড়ানো। কখনো রাজ্যজয় করে গোত্র বিশেষের সাম্রাজ্য ছড়ানো নয়। তাঁদের মিশন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে যুক্ত করা। ধর্মের নামে যুদ্ধ করে বিজিত জাতিকে বিজয়ী জাতির গোলামে রূপান্তরিত করা নয়। কিন্তু আমরা কি দেখতে পেয়েছি? উমরের আমলে পারস্য জাতির পরাজয় হয়েছে উমরের সেনাদের হাতে। ধন সম্পদের সাথে ইরানী সাধারণ যুদ্ধ বন্দিরাই মাদীনায় আনীত হচ্ছেনা। আনীত হয়েছে পরাজিত পারস্য সম্রাটের দু'কন্যাও। উমর তাদেরকে দাস বিক্রয়ের বাজারে বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। আলী তা জানতে পেরে দৌড়ে এসে বলে একি? আল্লাহ কি তাঁর শেষ নবীকে প্রেরণ করেছেন আমাদের দ্বারা জাতি সমূহকে পরাজিত করে তাদের হাট-বাজারে বিক্রি করে আমাদের দাসদাসীতে পরিণত করতে? আলীর প্রশ্নের কোনো সদুত্তর উমর দিতে পারেনি। কারণ আল্লাহর সে বান্দা সে গভীরতার মানুষ ছিল না। তাই আলী ঐ রাজকুমারী দুটিকে মাঝ পথ

থেকে ফেরৎ এনে একজনকে তার মিল্‌কুল ইয়ামীন রূপে গ্রহণ করে। অপরজনকে আব্দুল্লাহ ইবন্ উমরকে দান করে তাদের রক্ষা করে। পরে এরা ইসলাম ক্ববুল করে। ইসলাম ও ঈমান শিক্ষা দেয়ার জন্য ইসলামে পরাজিতদের বন্দি বানানোর নিয়ম। পরাজিত মানুষদের বন্দি করে বাজারে দাসরূপে বিক্রি করাতো কাফের যালেমদের ব্যবসা! এরূপ এক ইরানী প্রকৌশলী আবু লুলু ধৃত হয়ে মাদীনায় আসে উমরের আমলে। তাকে মুগীরা বিন শু'বার দাসত্বে দেয়া হয়। সে বাতাসে চালিত আটাকল বা উইন্ড মিল তৈরী করতে জানতো। মুগীরা তাকে মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য করতো। আবু লুলুর পক্ষে সে পরিমাণ অর্থ আদায় কষ্টসাধ্য ছিলো বলে সে খলিফা উমরের দরবারে আবেদন করেছিলো। উমর অর্থের পরিমাণ শুনে মুগীরার পক্ষে রায় দিলে তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়ে উমরকে হত্যার চেষ্টায় আহত করে। পরে তাতেই খলিফা উমরের মৃত্যু হয়। উমরের এ ধরনের মৃত্যু যেমন দুঃখজনক, তার সাথে সাথে আরো একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। তা হলো উমরের পুত্র উবাইদুল্লাহ ইসলামী ও রাষ্ট্রীয় আইনের তোয়াক্কা না করে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে আবু লুলু, তার স্ত্রী, এক ইরানী রাজকুমার হরমুযান, তার স্ত্রী ও তার শিশু কন্যাকে সহ মোট সাত জনকে নিজ হাতে হত্যা করে। এরপরও কে বলবে যে ইসলাম এদের চরিত্র বদলিয়ে ছিলো? কি নৃশংসতা!

আমরা কোথাও একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাজ্য জয় করে বিজিতরাজ্যের মেয়েদের হাটে বাজারে বিক্রি করতে বলেছেন, বা রাসূল নিজে কখনো একটি নর বা নারীকে বিক্রি করতে বাজারে পাঠিয়েছেন? উমররা এগুলো কোথায় পেয়েছিলো? ইসলামে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত শত্রু সেনাদের পরাজয়ের পর তাদের বন্দী করে, মুসলিমদের মাঝে বন্টনের নিয়ম করা হয়েছিলো এজন্য যে অমুসলিম জাতি সমূহ মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে দ্বীন ক্ববুল করবে, না হয় তাদের অধীনে থেকে নিরাপদ জীবন যাপন করবে বা সাধ্য মতো শ্রম করে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করবে। তা থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত নাগরিক কর দিবে, যাকে আরবীতে জিয্‌য়া বলে। এ'কর কখনো কারো সাধ্যাতীত হবেনা, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের উপর এ কর নেই। বরং তারা রাষ্ট্রীয় ভান্ডার থেকে ভাতা পাবে।

আলী যে ইরানী রাজকুমারীকে গ্রহণ করেছিলো মিলকুল ইয়ামিন রূপে, তাকে ব্যবহার করে আলী উম্মুল ওয়ালাদ বা সন্তানের মা রূপে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। তাতে ইরানীরা আলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম আবু হানিফার দাদা ইরানী যুতী যুদ্ধবন্দী হয়ে আলীর ভাগে আসে। পরে সে তার পুত্র সাবেত সহ ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের ঔরসে ইমাম আবু হানিফার মতো মুসলিম মনিষীর জন্ম হয়।

মুগীরা কে? মিসর থেকে ব্যবসা করে ফেরত্ আসা তেরজন ব্যবসায়ী তায়েফবাসীকে নেশাকর মদ্যপান করিয়ে বেহুশ অবস্থায় তেরজনের গলা কেটে মুগীরা তাদের সর্বস্ব লুটে পালিয়ে মাদীনায় চলে যায়। সেখানে নিরাপত্তার জন্য ইসলাম গ্রহণের ভাওতা করে। তারপর এ জঘন্য খুনী তার ডাকাতির বখরা নিয়ে রাসূল সঃ এর সামনে উপস্থিত হয়। রাসূল সঃ তার লুণ্ঠিত রাহাজানির পয়সা গ্রহণ করেননি। ইসলাম ও তওবার ঘোষণা দিয়ে মাদীনা থাকার অনুমতি পায় মুগীরা। উমরের আমলেই এ মুগীরা ব্যভিচাররত অবস্থায় ধরা পড়ে। তাতে প্রস্তর নিক্ষেপে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হতে যাচ্ছিলো। আবু সুফিয়ানের এক জারজ সন্তানের মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ায় এ প্রতারক সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পায়। মুয়াবিয়ার আমলে সে কুফার শাসক হয়। ইয়াযীদকে মুয়াবিয়ার যুবরাজ বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার পরামর্শ ও তা কার্যকর করার পথ বাতলায় এ মুগীরা।

এখন প্রশ্ন হলো যে, এ ধরণের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে তাতে তো বাধা দেয়া যাবেনা! কিন্তু অমুসলিমদের বন্দী করে এনে কি মুসলিম বানাতে এদের হাতে তুলে দেয়া যায়? একি কখনো ভাবা যায়? এ ধরণের ভুল যে কতো দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েছে, তা গণনা করা অসম্ভব। রাসূল সঃ তো বলেই দিয়েছেন,

خيارکم في الجاهلية خيارکم فی الإسلام، و شرارکم في الجاهلية شرارکم في الإسلام

"তোমাদের মধ্যে জাহিলিয়্যাতে যারা উত্তম, তারা ইসলামেও উত্তম হবে, জাহিলিয়্যাতে তোমাদের মন্দরা ইসলামেরও মন্দ হবে।" তারপরও আমরা কেনো ভুল করবো? আমরা কি আল্লাহ ও রাসূলকে না মেনেই সাম্রাজ্য বিস্তারের ইসলামী সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারী রয়ে যাবো?

মুগীরাদের মতো সাহাবী (?)দের চক্রান্তে উমরের মতো খলিফার জীবননাশ হয়েই মুসলমান জাতির দুর্দশা কাটেনি। এর জের স্বরূপ সুন্নীরা গোটা ইরানীদেরই উমরের হত্যাকারী জাতি বলে অভিযুক্ত করে আসছে এবং অপর দিকে

শিয়ারা রাসূল, আলী,রাসূলের পরিবার বা আহলে বাইতের এক নম্বর শত্রুরূপে উমরকে চিহ্নিত করে আসছে। আজো এর বিষক্রিয়ায় কমতি নেই। শিয়া সুন্নীর বিরোধে ইরান-ইরাক যুদ্ধ হয়েছে। সুন্নী সাদ্দামের কাদেসিয়ার যুদ্ধে(?) মক্কা মাদীনা সহ গোটা আরববিশ্ব সম্মিলিত ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্রের দাজ্জাল আমেরিকার কাছে বিক্রি হয়েছে। (এ থেকে মুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে খামেনী, রাফসাঞ্জানী ও ইরানী শীর্ষ আলেমদের লেখা আমার বিস্তারিত পত্র পড়ো) বর্তমানে ইরান-আফগানিস্তান সীমান্তে সে শিয়া-সুন্নী বিরোধের অজগর সাপ তার দু'পাটি দাঁত বের করে বিশ্ব মুসলিম উম্মার উত্থানকে বাধা দিচ্ছে। মূল গোড়ায় আসল উসামাহকে প্রত্যাখ্যান করায় এক নকল আরব সুন্নী উসামাহ দাঁড় করিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। উসামাহ বিন যায়দ ও উসামাহ বিন লাদেনের মাঝের পার্থক্য যারা বুঝবে, আল্লাহ তাদের দিয়ে তাঁর দ্বীন ও রাসূলের উত্তম আদর্শ উসওয়াতুন হাসানার বিশ্ব মুক্তির ফৌজ তৈরী করবেন। ইনশাআল্লাহ।

সুন্নীদের চার খলিফার দ্বারা "তৈরী কাল কুঠরীর" বাইরের চার দেয়ালে আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীর নাম অঙ্কিত হলেও ভিতরের দেয়ালের চার দিকে রয়েছে, মুয়াবিয়া, মারওয়ান, আমর ইবনুল আস ও মুগিরা। ঠিক তরমুজের মতো। বাইরে সবুজ ভিতরে লাল। এ চারটি ঘাতকের স্বরূপ উম্মোচিত হওয়া মাত্রই চার খলিফার চার দেয়ালের জিন্দান খানা ভেঙ্গে মুসলিম উম্মাহর উত্থানের সূর্য উদিত হবে। কতোইনা দুঃখের বিষয় যে, আবু বকর ও উমরের অপরিণামদর্শীতায় এ চারটি কুচক্রী বিশ্ব রহমতের ইসলামকে কলঙ্কিত করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলো!

এ প্রশ্নের সদোত্তর কোথায় পাবো যে রাসূল্লাহর স্থান দখল করে আবু বকর ও উমররা কেনো নিজেরা যুদ্ধ পরিচালিত করতে গেলো না? এ তো ক্বোরআনের শিক্ষা ও রাসূল সঃ এর আদর্শ বর্জন! রাসূল সঃ যখন তাঁর জীবনের সমরাভিযানের অর্ধেকের চেয়েও বেশী খোদ নিজে পরিচালনা করে তাতে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে আবু বকর, উমর ও উসমানরা নিজেরা কেনো যুদ্ধে গেলো না গদী দখলের পর? তাদের জন্য কি অন্য নিয়ম ক্বোরআনে নাযিল হয়েছিলো? না তাদের জীবনের মূল্য রাসূল সঃ এর জীবনের চেয়ে বেশী ছিলো? না তারা সাম্রাজ্যবাদী রাজা হয়ে গিয়েছিলো যে তাদের জীবনের মূল্য বেশী বলে অন্যদের সেনাপতি বানিয়ে রাজ্য জয়ের জন্য পেশাদার সৈন্যাভিযান পরিচালনা করবে? তারা নিজেরা যুদ্ধে গিয়ে রাসূলের সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে তো আর মুয়াবিয়া, আমর, মুগীরা ও মারওয়ানরা মুসলিম জাতির ভাগ্যবিধাতা হতে পারতোনা?

আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য যারা যায়দ, বিলাল, ইবন্ মাসউদ, আম্মার, সালমান ও উসামাহদের মতো করবে, ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য আমাদের স্বীকৃতি থাকবে অবনত মস্তকে। যারা ইসলামের তাক্বওয়ার মানদন্ডের পর ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া ও আব্বাসী বর্ণবাদী পতাকা উত্তোলন করে উম্মাহকে বিভক্ত করবে, সর্বকালেই তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাবে, এরা কারা? পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো যুগে যারা আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্যের ধারকবাহক হবে, আমি তাদের দলে। যারা এ আনুগত্যে শর্ত প্রয়োগ করবে, তাদের সাথে আমি নেই।

মিশরে হাসানুল বান্নারা ইসলামী পুনর্জাগরণের ঝান্ডা তুলেছিলো। তাদের প্রারম্ভ প্রশংসনীয় ছিলো। তারা মুল ক্বোরআন ও রাসূলের আদর্শের ডাক দিয়েছিলো। চমৎকার পুস্তিকাও তারা লিখে ছড়াচ্ছিলো। কিন্তু "পাছে লোকে কিছু বলে" রোগে তারা আক্রান্ত হয়ে যায়। ক্বোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ "আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের, তার ব্যতিক্রম করে তোমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করোনা" সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহর আদেশ। প্রথমে এ পথে চলে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ বা ইখওয়ানীরা ওসমানের ও তার চাচাতো ভাই মুয়াবিয়ার সঠিক সমালোচনা করে আরব জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন পায়। পরে সূরা আরাফে বর্ণিত ১৭৫ ও ১৭৬ আয়াতে বর্ণিত কুকুররা যখন সাহাবীর পর্যালোচনার সমালোচনা আরম্ভ করলো, তখন আর তারা দৃঢ় থাকতে পারলোনা। ভয়ে তারা সত্যের আক্রমণ ত্যাগ করে আত্মরক্ষার গলীতে ঢুকে পড়লো। সত্যের মহাসড়ক ত্যাগ করে আত্মরক্ষার চোরাগলিতে প্রবেশ করার পর কুকুরগুলো আরো বেশী করে তাদের পিছু নেয়। ফলে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরে তারা তা থেকে বের হতে সশস্ত্র ডাকাতদের আশ্রয় নেয়। রাজা ফারুকের সাম্রাজ্যবাদের লেলানো চাটা মোল্লা কুকুরদের চক্র থেকে বাঁচার জন্য তারা একই সাম্রাজ্যবাদের নিমকহারাম সৈন্যবাহিনীর জেনারেল নজীব ও কর্ণেল নাসেরদের খপ্পরে পড়ে যায়। গরমতেল থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়ার ন্যায়। নজীব ও নাসেররা কিং ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য হাসানাল

বান্নার লোকদের সমর্থন লুফে নেয়। বলা হয় যে, নাসের নাকি এক সময় ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীনদের ক্যাডার ভুক্ত সদস্য ছিলো।

স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর মিশর উমরের আমলে তার সেনাপতি আমর ইবনুল আসের হাতে বিজয় হয়। বিজয়ের পর উমর আমরকেই মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করে। উমরের সরলতা ও তার গভর্নরের গড়লতার কোনো তুলনা ছিলোনা। চিন্তা ও বুঝের গভীরতার অভাব থাকলেও উমর তার বুঝমতো সকল সত্তা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিলো। আমর ইবনুল আস ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। উমরের চেয়ে বয়সে বড়ো, আমরের বাপের নামেই বুঝা যায়, আমর কি চরিত্রের ও বৈশিষ্টের ছিলো। বাপের নাম "আস" অর্থাৎ পাপী। "দুষ্ট দমনে দুষ্টের ব্যবহার" এর ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও উমর আমরের ব্যাপারে সতর্ক ছিলো। কোনো প্রকার ধূর্তামী ধরা পড়তেই উমর তাকে "আস ইবনুল আস" বা "আস ইবনুল আসী" বলে পত্রে সম্বোধন করে আমরকে শাসাতো। আস ইবনুল আস্ বা আস্ ইবনুল আসীর অর্থ হলো "পাপীর বেটা পাপী।" পিতা, মাতা উভয় দিক থেকেই এ লোকটি দাগী ছিলো। যেমন ছিলো মুয়াবিয়া। তার পিতা চতুর কসাই ছিলো। হজ্ব মৌসুমে মীনায় পশু মাংসের কসাই ও নারী মাংসের বেশ্যার দোকান বসাতো। উস্দুল গাবাহ গ্রন্থে দেখা যায় যে, আমরের মা এক নষ্টা সুন্দরী নারী ছিলো। নাম ছিলো সালমা। বাপ ছিলো হারমালাহ্। উকাজের হাট থেকে তাকে ফাকিহাহ্ বিন মুগীরাহ ক্রয় করেছিলো। তার সখ পূর্ণ হওয়ার পর তাকে আবদুল্লাহ ইবন্ জাদ্আন ক্রয় করে। তার থেকে হাত বদল হয়ে আস ইবন্ ওয়াইলের ঘরে আসে। সে থেকেই আমরের জন্ম। (আসাহ্হুস্ সিয়ারের ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্টায় আমরের ইসলাম গ্রহণ দেখো)।

এ সমস্ত কুষ্টিনামায় পাকিস্তান ভাঙ্গার মূল অপরাধী ভূট্টোর সাথে আমরের হুবহু মিল। ভূট্টোর মাও প্রথমে নেহেরু পরিবারে বাঈজী ছিলো। সেখান থেকে এককালে সিন্দুপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হেদায়েত হোসেন তাকে ক্রয় করে আনে। সর্বশেষে তাকে শাহনাওয়াজ ভূট্টো ক্রয় করে। তার পেটে ভূট্টোর জন্ম হয়। বাল্যকালে তার নাম ছিলো ঘাসীরাম। শাহনাওয়াজ ভূট্টোর বৈধ স্ত্রীর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় শেষ-মেষ উত্তরাধিকার সৃষ্টির তাগিদে শাহনাওয়াজ ভূট্টো তার কেনা হিন্দু দাসীর পুত্র ঘাসীরামকে জুলফিকার আলী নাম রেখে গেজেট নোটিফিকেশন করে। (দেখো, নতুন দিল্লীস্থ বিকাশ পাবলিকেশনের ভূট্টো ফ্যামেলী, ও লাহোর থেকে প্রকাশিত যিন্দেগী ১৯৭৪)

আমর ইবনুল আসের পিতৃ পরিচয় তো আল্লাহ তা'তালাই সূরা মারইয়ামের ৭৭-৭৯ আয়াতে অমর করে দিয়েছেন। যেমনটি আল্লাহ খালেদের পিতা ওয়ালিদের চিত্র অঙ্কন করেছেন সূরা ক্বলমের ১০-১৬নং আয়াতে এবং সূরা ক্বিয়ামার ৩১-৩৩ আয়াতে। শেষোক্ত সূরার ব্যক্তি সম্পর্কে মতোভেদ রয়েছে তাফ্সীর ও হাদীস বিশারদদের মাঝে। কেউ বলছে সে ব্যক্তিটি হলো আবু জেহ্ল, কেউ বলছে ওয়ালিদ ইবন্ মুগীরাহ! যাই হোক, লোক দুটি একই জাত ক্বোরেশের, আল্লাহ ও রাসূলের নিকৃষ্ট শত্রু।

ঈমান ও ইসলাম ব্যক্তিকে যেমন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান করে, কুফর, শির্ক ও বিদ্আত তেমনি মানুষকে ধূর্ত ও চালাক করে। আমাদের ধীমান ও বুদ্ধিমান ইমাম ও নেতা চাই। চালাক ও ধূর্তদের আমরা শয়তানের দলের দিকে ঠেলে দিলেই লাভ। খালেদ ও আমররা পিতা-পুত্র ও গোত্রসহ আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুতা করে যখন দেখতে পেয়েছে যে তাদের পতন আসন্ন এবং অবধারিত, তখন প্রাণে বাঁচার তাগিদে মক্কা বিজয়ের পূর্বক্ষণে উভয়ই কেউ কাকে না বলে একা একা মক্কা থেকে মাদীনার দিকে রওয়ানা হয়। উভয়ই কুফরের শীর্ষ নেতা হওয়া সত্ত্বেও জানতো যে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দ্বীন রহমত। তাই সে রহমত ভিক্ষা করার জন্যই কাকেও না বলে রাহমাতুল্লিল আলামীনের দয়ার আশায় মক্কা ত্যাগ করে মাদীনার পথে ধাবিত হয়েছিলো। আল্লাহর চক্ষু সর্ববিদ্যমান। তাঁর শত্রু চুপি চুপি সবার দৃষ্টি এড়ালেও আল্লাহর পর্যবেক্ষণ এড়াতে সক্ষম হয়নি। রাতের অন্ধকারেও যিনি দেখেন, তিনি পথিমধ্যে আমর ও খালিদকে একত্রিত করে দেন। অন্ধকারেও একজন আরেকজনের আওয়াজ শুনে চিনে ফেলে। উভয় উভয়ের মতলবও বুঝে যায়। এভাবে তারা দুজন গিয়ে ঈমান এনে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। উমর খালেদকে পদচ্যুত করলেও আমরকে বহাল রাখে। মিশরের গভর্নর থাকা কালে এক ঘটনা ঘটে যায়। আল্লাহর দ্বীন ইসলামে ঈমানদাররা পরস্পর ভাই। আরব-অনারব বা সাদা-কালোতে কোনো পার্থক্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। রাসূল সঃ এর এ আহ্বান শুনেই আফ্রিকানরাও সাম্যের ইসলাম গ্রহণ করে। মিশর আফ্রিকান দেশ। এক মিশরী যুবক তার এক আরবী মুসলিম যুবক ভাইয়ের সাথে ঘোড়দৌড়ে পাল্লা দেয়। তাতে আফ্রিকান যুবক বিজয়ী হয়। তারপর আর যায় কোথায়! আরবী যুবক চাবুক মেরে মিশরী যুবককে বুঝিয়ে দেয় যে, ক্বোরেশী আমীরের পুত্রের সাথে ঘোড়দৌড়ে বিজয়ী হলেও বিজয়ী হওয়া

যায় না। প্রকৃত বিজয়ী হতে হলে ক্বোরেশী হতে হয়। আমর ইবনুল আসের ছেলের সাথে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়ে সে বেআদবী করেছে। ফলে বেত্রাঘাতের কাজ করেছে!

যুবকটি তার জানা ইসলামী সাম্যের বিশ্বাসে পুনঃ মিশরের আমীরের দরবারে বিচারপ্রার্থী হয়। আমীর আমর ইবনুল আস তার পুত্রের পক্ষে রায় দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে ক্বোরেশী রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামী সাম্যের উর্ধ্বে। তাতে মিশরী যুবকটি এতোই মর্মাহত হয় যে, সে মদীনায় এসে উমরের নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থী হয়। উমর যে রাসূল সঃ এর শিক্ষাকে আমরদের চেয়ে উন্নত মানে গ্রহণ করে ছিলো! তাই সে সঙ্গে সঙ্গে পত্রবাহক পাঠিয়ে আমরকে তার পুত্রসহ এনে মাদীনায় তলব করে উপস্থিত করে। আমর শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার কুফর ও জাহেলী অজুহাত দাঁড় করিয়ে তার নব্যফেরআউন ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু উমর তার কোনো যুক্তি না শুনে মিশরী যুবকের হাতে তার ছেলেকে চাবুক মারিয়ে ন্যায় দন্ড বহাল রাখে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরের মতো লোকদের এতো প্রয়োজন কেনো দেখা দিলো যে, তাদের মুসলিম জাতির দন্ডমুন্ডের বিধাতার পদে বসাতেই হবে? ইসলামে নতুন মুস্তাক্বির শ্রেণী কেনো তৈরী করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো আবু বকর ও উমরদের? রাসূল সঃ আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে যখন মুস্তাদআফ্‌দের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করছিলেন, তখন উমরদের কেনো তা ভালো লাগলো না? ইসলামে প্রবেশের পর আমর ও মুগীরাদের বাপ দাদার পাপ-রক্তের শুদ্ধি ও শোধনের জন্য তো অপরিহার্য ছিলো যে ইসলামের অনুশাসনে আমর তাদের বাপের কসাইর পেশায় মিনায় হজ্জের মৌসুমে বেশ্যার মাংসের দোকান না দিয়ে, হালাল ক্বোরবানীর মাংস ও পশুর পেশা করে দু'এক পুরুষ শুদ্ধি হতো? খোদ রাসূল সঃ যখন পরীক্ষামূলক আমরদের ক্ষুদ্র দায়িত্বে আমীর বানিয়ে দেখেছেন যে আমর ইবনুল আস স্বপ্নদোষ হওয়ার পর গোসল না করে তায়াম্মুম করেই ইমামতি করে ইসলামের বিধানের উপহাস করেছে, তারপর তো আর রাসূল আমরকে আর কোনো দায়িত্ব দেননি? তারপরও কি করে আবু বকর ও উমররা এদের পুনর্বাসনে এতো যত্নবান হয়? এজন্যই নয় কি যে তারা ক্বোরেশী ছিলো! যেখানে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর রাসূলের বিজয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামে প্রবেশ করলো, তখন তো এমন কোনো প্রয়োজন কোনো অবস্থাতেই হতে পারেনা যে আল্লাহ যাদের বাপদের ইতরবৃত্তি ক্বোরআনে বর্ণনা করে সাবধান করেছেন, তাদের ও তাদের সন্তানদের অভিষিক্ত করতে হবে? আবু বকর ও উমরদের এ দৃষ্টান্তের ফলেই তো ওসমান তার দুধভাই ক্বোরআনে বর্ণিত ফাসিক ও মুর্তাদ আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ্‌কে মিশরে গভর্নর নিযুক্ত করে তার পাপাচারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মুখে চুন কালি লেপন করে!

ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর উত্তম আদর্শের আলো যেমন মিশরের ফিরআউনী অন্ধকার বিদূরণে সূর্যের রৌশনীর বিকিরণ ঘটিয়েছিলো, তদ্‌রূপ আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের নব্য জাহিলিয়্যাতের দুঃশাসন মিশরের ইতিহাসে কালো অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলো। হাসানাল বান্নাদের ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর আদর্শ তুলে ধরে নজিব ও নাসেরদের দ্বারা কিং ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করার পর সরাসরি সূরা মুহাম্মাদের টেক্সট্ বা মূলে গিয়ে ৩৩ নং আয়াতে অবস্থান নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা একমাত্র কর্তব্য ছিলো। কিন্তু দেখা গেলো যে তারা ইসলামের পর ক্বোরেশী খেলাফতের জগাখিচুড়ি পুনঃ প্রবর্তনের প্রচার ও প্রয়াসে লিপ্ত হলো। যার বাইরে আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীর চার দেয়াল, ভিতরে মুয়াবিয়া, মারওয়ান, আমর ইবনুল আস, মুগীরা ও আব্দুল্লাহ ইবন্ আবি সারাহদের ক্ষমতা ডাকাতির দাবার আসর। তাই ৩৩ নং আয়াত অনুযায়ী ইখওয়ানীদের প্রচেষ্টার ফল আল্লাহ বরবাদ করে দেন। তাদের উত্থানের রকেট মুহাম্মাদী উসওয়ায় কিছু দূর উঠে ক্বোরেশী পাপের বোঝায় পুনঃ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমার অন্তর্দৃষ্টির দৃশ্যপটে আমি রাতের অন্ধকারে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে ক্বোরআনে প্রবেশ করে চলচ্চিত্রের মতো এসব দেখতে পাই। তখন আমার অন্তর ফেটে যাবার উপক্রম হয়। তখন সকল নবীদের উপর পার্থক্যহীন দুরুদ ও সালাম পাঠে আল্লাহর দরবারে উসিলা চেয়ে আমার সান্ত্বনা আসে। নবী রাসূলদের উপর সালাম ও দুরুদে অন্তর শান্ত হয়। বর্ণ ও গোত্রবন্দী সাহাবী তাবেঈদের মানলে ফিত্‌না জন্ম নেয়।

ভারতবর্ষে বৃটিশ-বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী এসে দু'শ বছর দেশটাকে লুটে নিয়ে যায়। তা থেকে দেশটাকে মুক্ত করার আদর্শ খোঁজা হয় আন্দোলনের জন্য। আবুল কালাম ইসলামের একফালি আলো ছড়িয়ে দেয় বৃটিশ ভারতে। দেওবন্দের বর্ষিয়ান আলেম মাওলানা মাহমুদুল হাসান তাতে যুবকের মতো প্রেরণা পায়। দেওবন্দ ছেড়ে ময়দানে নেমে পড়ে। তার আহবানে গান্ধির মতো ব্যক্তিও প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে খেলাফত আন্দোলনের পক্ষে এসে পেছনে দাঁড়ায়। ভারতে ইসলামের দুটি ধারা রয়েছে। একটি ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের সাম্যের সনাতন ধারা। যা আরব

দেশে রাসূলের পর ক্বোরেশী উমাইয়া আব্বাসী দস্যুবৃত্তির নৈরাজ্য শুরু হলে তা থেকে পালিয়ে আসা খাঁটি মুসলিমদের তাবলীগ ও তা'লীমে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মর্তব্য যে তাদের দ্বারাই তদানিন্তন ভারতের জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ ইসলাম গ্রহণ করে।

অপর ধারা আসে ক্বোরেশী উমাইয়া ও আব্বাসীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের। ভারত ব্রাহ্মণ্যবর্ণবাদের শাসন শোষণের লিলাভূমি ছিলো। তার মধ্যে মুহাম্মাদ সঃ আচরিত কল্কিঅবতারের আদর্শের মুখোশ পরে ভারতের মুস্তাদআফদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে উমাইয়া আব্বাসী কপট ধর্মাচার। বিশাল ভারতে তাদের প্রেতাত্মা মুঘল পাঠানরা প্রায় আটশ বছর ধরে ইসলামকে কলঙ্কিত করে। পরে বৃটিশ শাসন রূপে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে আল্লাহর আযাব এসে এদের ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন বাগদাদে ও স্পেনে আল্লাহ্ই আব্বাসী ও উমাইয়াদের হালাকু খান ও ক্রুসেডারদের হাতে নির্মূল করেন। বাগদাদ ও স্পেনে আলহামরা ও দারুল আবইয়াদ সহ অসংখ্য ফেরআউন নমরুদ ও সাদ্দাদের প্রাসাদ তৈরী হয়। বর্তমানে বিশ্বদাজ্জালের কেন্দ্র "হোয়াইট হাউজ" ঐ দারুল আব্ইয়াদ এরই ইংরেজী ভাষান্তর। তার আদলে ভারতে মুঘল পাঠান দাজ্জালরা শ্বেত পাথরের তাজমহল, কুতুব মীনার ও শীষমহল তৈরী করে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ নির্বিশেষে জনগণের রক্ত শুষে। তাদের দাজ্জালীর ফলে রাসূলের ইসলাম চাপা পড়ে যাওয়ায় ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা আর বাড়েনি। কারণ, মযলুম মুস্তাদআফরা যালেম মুস্তাকবিরদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। করতে পারেনা।

ভারতের উর্বর মাটিতে হাজার হাজার বছরের বর্ণ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার, আটশ বছরের উমাইয়া, আব্বাসী ও মুঘলাই লুটতরাজ এবং দু'শো বছরের বৃটিশ শোষণের পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর যায়দ, বিলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহদের মুস্তাদআফ্ বিপ্লবের এক অনন্য সম্ভাবনা ছিলো। আবুল কালাম আযাদের মাঝে এর একটি অগভীর হলেও স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু সম্ভবতঃ ব্যক্তিজীবনে আমলে রুহানিয়্যাতের সাধনা ছিলোনা বলে তার গভীরে আবুল কালাম পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও তার শাগরেদ হুসেইন আহমাদ মাদানীদের মধ্যে প্রচলিত তাক্ওয়া পরহেজগারীর রং থাকা সত্ত্বেও তাদের মন মগজের পুরোটার উপরই ক্বোরআন ও রাসূলের প্রত্যক্ষ ইসলাম থেকে বিকৃত ক্বোরেশী খেলাফত তথা উমাইয়া আব্বাসী, তথা মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও মুগীরাদের সাহাবী ইসলামের মোহর মারা ছিলো। তাই তারা ভারতের মাটিতে বসে তাদের মাথার উপরের সাত আকাশের আরসের মালিক আল্লাহ, যিনি তাঁর মু'মিন বান্দার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটে অবস্থান করেন, তাঁর নৈকট্য ও উপস্থিতি অনুভব না করে মক্কার ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তুপের পেঁচা শরীফ হুসেনের আশীর্বাদ ও সাহায্যের জন্য মক্কা মাদীনায় চলে যায়। আবুল কালাম কিন্তু পরামর্শ দিয়েছিলো না যেতে। তার সঠিক ধারণা ছিলো যে, ভারতে থেকেই আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হোক। কিন্তু শাইখুল হিন্দের সাথে মাদ্রাসায় পড়ূয়া মোল্লা, তারপরও আবার নামের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ মাদানীর হোসেইন্ আহমদ মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে আরব মুল্লুকে নিয়ে যায়। তার বোধহয় হুশও ছিলোনা এবং জানাও ছিলোনা যে, সে সময় ক্বোরেশী বংশের দাবিদার শরীফ হুসেইন যে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে তুর্কী খেলাফতের উৎপাটনের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলো! কারণ, তখন ইস্তাম্বুলের তুর্কী খেলাফত "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি"! সে মুহূর্তে শরীফ হোসেনের প্রয়োজন ছিলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার নতুন প্রভু ইংরেজদের আস্থা অর্জন করা। কারণ, বেঈমান ক্বোরেশী আরবদের খোদাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।

ঠিক সে মুহূর্তে ভারত থেকে বৃটিশ উৎখাতের আন্দোলনের দু'পরিকল্পনাকারীকে পেয়ে ক্বোরেশের শরীফ হোসাইন ইংরেজ এজেন্টের হাতে তাদের ধরিয়ে দেয়। আন্দামান দ্বীপে বৃটিশ চরেরা শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে রোগ শোকে অর্ধমৃত করে লাশ হওয়ার পূর্বে মুক্ত করে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। তখন তার আর জীবনীশক্তি ছিলো না। তারপরও নাকি শাইখুল হিন্দ আবুল কালাম আযাদের হাতে ইমামতের বায়আতের নির্দেশ দিয়ে খেলাফত আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেছিলো। কিন্তু মুমূর্ষ শাইখের আদেশ তার শাগরেদরা শুনেনি। কারণ, আবুল কালাম আযাদ তাদের মতো কোনো মাদ্রাসার দাস্তারবন্দ মোল্লা ছিলো না বলে তারা তাকে ইমাম মানতে রাজী হয়নি। এ অবস্থায় আবুল কালাম খেলাফত আন্দোলন ও মোল্লাদের ত্যাগ করে ভারত থেকে "ইংরেজ তাড়াও" আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। ভারত স্বাধীন হলে পর এ মোল্লারাই তাদের মাদ্রাসা মসজিদের পৌরহিত্বের জন্য মাওলানা আযাদের দুয়ারে ধর্না দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইন্দিরা গান্ধী ও জগজীবন রাম যিন্দাবাদ বলে দেওবন্দী ইসলামের শত বার্ষিকী উদযাপন করেছে। একেই আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন "আল্লাহ

যালেমদের বিপথগামী করে যাচ্ছেতাই করে ছাড়েন" (সূরা ইব্রাহীম-২৭ আয়াতের শেষাংশে) ধর্মব্যবসায়ী রাব্বাই, পাদ্রী ও মোল্লারা সর্বকালে এ ধরণের নির্লজ্জই হয়।

অপরদিকে আরেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আবুল কালামের লেখনী থেকে প্রেরণা পেয়ে আবুল কালাম জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পথ হারা হলে সে পথের আলোক বর্তিকা নিয়ে আগে বাড়ে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাওহীদী এক ও অভিন্ন সত্তার দিকে আবুল আলা বলিষ্ঠ কলমে লেখনী চালায়। কলমের জোর থাকা সত্ত্বেও কুলবের জোরের অভাবে আবুল আলা, আবুল কালাম বিরোধী শিবির মুসলিম জাতীয়তাবাদের জালে আটকা পড়ে প্রথমে পাকিস্তানী এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানী হয়ে যায়। কলম আর কুলবের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আবুল আলা বৃহত্তর ভারতে থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পৌত্তলিকতা ও আরব মরুর ক্বোরেশী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃ দের মুস্তাদআফদের পক্ষে হাল ধরে থাকলে সে আজ ভারতের আশি কোটি, পাকিস্তানের দশ কোটি ও বাংলাদেশের দশ কোটি, মোট একশত কোটি মুস্তাদআফ্দের সামনে বিশ্বের ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শক হতে পারতো। আবুল আলা তা পারেনি। ইসলামের প্রবক্তা হলেও আবুল আলা সাইয়েদ ছিলো। সাইয়েদ হলে ক্বোরেশী হতে হয়। আর ক্বোরেশী হলে মুস্তাকবির হতে হয়। তাই বেচারা তার ছেলেমেয়েদের কোনো অসাইয়েদের সাথে বিয়ে শাদী দিতেও পারিনি।

বর্ণগোত্রের রোগ এতো গভীর যে এতে আক্রান্ত হলে এ থেকে মুক্ত হতে হলে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের মতো পিতা-মাতা, ভাই-বেরাদার ও গোষ্ঠি-জ্ঞাতির সকল রক্তীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর আত্মীয়তায় যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের নিয়ে মুস্তাদআফীনের চুল্লীতে ঝাঁপ দিতে হয়। যেমনটি দিয়েছিলেন ইব্রাহীম আঃ নমরুদের অগ্নীকুন্ডে। আবুল আলা তা পারেনি সাইয়েদ বলে। সাইয়েদদের মূলে মুয়াবিয়া ও মারওয়ানরা দুর্ব্যবহার করেছে বলে প্রতিপক্ষ সাইয়েদ ও শিয়াদের ক্ষোভ রয়েছে। সে ধরনের একটু ইংগিত দিতে গিয়েই মুয়াবিয়া মারওয়ানদের অনুসারী মিথ্যা সাহাবী পূজারীদের নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচারে ভীত হয়ে আবুল আলাকে আত্মরক্ষামূলক পলায়ন করতে হয়েছে। সত্য কখনো অর্ধেক বলতে নেই। সম্পূর্ণ মিথ্যা বলতে হয়। নয়তো সম্পূর্ণ সত্য বলতে হয়। অর্ধসত্য জঘন্য মিথ্যা। পূর্ণ মিথ্যা কুফর। পূর্ণ সত্য ঈমান। অর্ধেক সত্য মুনাফিক্বী। জারজ সন্তানের মধ্যেও অর্ধেক সত্য থাকে। তার মা ঠিক থাকে বাপ ঠিক নেই। হাসানাল বান্না, সাইয়েদ কুতব ও আবুল আলাদের কর্তব্য ছিলো সূরা মুহাম্মাদ, সূরা হুজুরাত, সূরা মুমতাহিনা, সূরা তাহরীম, ও সূরা তওবা দিয়ে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" কে উপড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহ ও ক্বোরআনের মানদন্ড তাক্বওয়াকে রাসূল সঃ এর মতো ধারণ করে আবু বকর ও উমরের অবস্থান পরিষ্কার করা। একমাত্র তাক্বওয়ার মানদন্ড ছাড়া যেখানে আবু বকর ও উমর টিকেনা, সেখানে ওসমান, মুয়াবিয়া ও মারওয়ানরা কারা? তিরিশ পারা ক্বোরআনের কষ্টিপাথরে, রাসূল সঃ এর আমৃত্যু আচরণের প্রমাণে যা মিথ্যা প্রমাণিত, সে সত্য বলতে জিহ্বা কাঁপবে কেনো?

আবুল কালাম আযাদ ব্যতীত কোনো আল্লাহর বান্দা এ যাবত সাহস করেনি বলতে যে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বাক্যটি রাসূল সঃ এর মুখ থেকে বর্ণিত পরবর্তী উম্মতের কর্তব্য কোনো নির্দেশিকা নয়। বরং রাসূল সঃ তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর ক্বোরেশী সঙ্গীরা পরবর্তীতে যা ঘটাবে, তার ভবিষ্যতবাণী করেছেন মাত্র। কারণ, রাসূল যায়দ ও উসামাহকে নিয়োগ করে ক্বোরেশী আবু বকর ও উমরদের যে প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রকাশিত আশঙ্কা হতে পারে ঐ বাক্যটি। কারণ তা ক্বোরআনের উল্টা, এবং কার্যতঃ আল্লাহ পৃথিবী থেকে ক্বোরেশদের নির্মূল করে প্রমাণ করেছেন যে, তা হতে পারেনা। এখন বিশ্বে কোনো ইমামতের দাবীদার ক্বোরেশী এক ব্যক্তিও নেই বলে কি বিশ্বে ইসলামী ইমামত কায়েম হবেনা? তুর্কীরা যে শত শত বছর তুর্কী খেলাফত চালালো, তা কি ছিলো? এখন যে মসজিদ সমূহে বিশ্বভরে অক্বোরেশী মোল্লারা সালাতের ইমামতি করছে, তা কি হচ্ছে? সকল ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া ও আব্বাসী বাদ পড়ে যে বর্তমানে আরব দ্বীপে নাজ্দের সৌদী পরিবারের অধীনে মক্কা, মাদীনা ও হজ্বের ইমামত হচ্ছে, এ সব কী? আবুল কালাম যে এতোটুকু বলতে পেরেছে, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ।

মিশরের হাসানুল বান্না, ভারতের শাইখ মাহমুদুল হাসান, হুসেইন আহমাদ মাদানী ও পাকিস্তানের আবুল আলারা সাহাবী নামের আমর, মুগীরা, মারওয়ান ও মুয়াবিয়াদের চক্র কেটে বের হতে পারেনি বলে আল্লাহ এদের ও এদের অনুসারীদের নিজ নিজ দেশে নজিব, নাসের, আনওয়ার সাদাত, নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, বাজপাঈ, জিন্নাহ, ভুট্টো, ইয়াহ্ইয়া, হাসিনা ও খালেদার করুণার পাত্র করেছেন। যেমনটি উমর, আবু বকররা, মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস্,

খালেদ, মারওয়ান ও মুগীরাদের চক্রের উর্ধ্বে উঠতে না পারায় পরবর্তীতে নিয়তি আবু বকর ও উমরদের সন্তানদের ঐ চার চক্রের মূল আবু সুফয়ান ও হিন্দার পুত্র পৌত্রের হাতে লাঞ্ছিত ও নিশ্চিহ্ন করেছেন।

এ পুস্তকে এ যাবত পাঠকদের, বিশেষ করে, অন্ধবিশ্বাসী খেলাফতে রাশেদা নামের কুপে পড়া মানুষদের সীমাবদ্ধতার দেয়ালে ফাটল সৃষ্টির জন্য নানানভাবে সত্য বুঝানোর চেষ্টা করে ইতিহাসের গোড়ায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। আল্লাহর রহমতে আশা করি যে বই পড়ে যারা এ যাবৎ আমার ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছে, তারা পূর্ণসত্যে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমুক্ত হতে না পারলেও তাদের বাস্তব দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির বদ্ধ কপাট খুলেছে। তারা অনেক কিছু এখন দেখতে ও ভাবতে পারছে।

এবার আমি সাধারণ ভাবে মানব সভ্যতার এবং বিশেষ ভাবে মুসলিম উম্মাহর সবচাইতে মারাত্মক ক্ষতিকারক ভুলের দিকে পাঠকদের নিয়ে যাবো। এ অধ্যায়টি যারা বিশ্বজনীন ঈমান ও তাওহীদ নিয়ে পড়বে ও বুঝবে, তারা শুধু মুক্ত মানুষই হবে না, তারা নিশ্চিত বিশ্বমানবের মুক্তির কাঙ্খিত ইমাম মাহ্দী, মাসীহ ও মেসাইয়ার সৈনিক হবে। ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি রূপে। মানুষ তাঁর খলিফা। মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। তাকে আল্লাহ সজ্জিত করেছেন উত্তম জ্ঞান দিয়ে। অন্যান্য প্রাণী, বিশেষ করে পশুকে তাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তার দেহেই সংযোজিত করে দিয়েছেন। এমনকি অনেক বৃক্ষ, লতা ও উদ্ভিদকে কাঁটা দিয়েছেন। পশুকে শিং, ধারালো নখর, বিষাক্ত দাঁত ও বিষাক্ত রাসায়নিক দিয়ে তৈরী করেছেন, প্রয়োজনে আত্মরক্ষা ও শিকার করে জীবন ধারনের জন্য। মানুষকে কিন্তু আল্লাহ তার একটিও দেননি। তা হলে মানুষ কি করে বাঁচবে ও আত্মরক্ষা করবে?

মানুষকে আল্লাহ শুধু উন্নত জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। তার জ্ঞানের উৎস হলো আল্লাহর দান। যে যতো আল্লাহর নিকট, সঠিক জ্ঞান ততো তার নাগালে। যুগে যুগে তিনি তাঁর জ্ঞানের ভান্ডার দিয়ে বিশেষ দূতও পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের ভুলে যাওয়া পাঠ পুনরায়ত্ব করতে পারে। অসাধারণ বিশ্বাসী মানুষদের কিন্তু পুঁথিপুস্তকের প্রয়োজন হয়না। তারা যে যে দিকে তাকায়, সৃষ্টির মাঝে তারা আল্লাহর দৃশ্যমান কিতাবের পৃষ্ঠা চলচ্চিত্রের ন্যায় দেখতে পায়। এদেরই আল্লাহ নবী রাসূল রূপে নির্বাচিত করে আল্লাহর ইল্‌মের অনুলিপি দান করেন। একেই আমরা আসমানী কিতাব ও অহী নামে চিনি। নবী রাসূলদের শেষ ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ সঃ আমাদের শেষ নবী। তাঁর উসিলায় আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নবী রাসূলদের শিক্ষা আল্ ক্বোরআন রূপে পেয়েছি। রাসূল সঃ নিরক্ষর ছিলেন বলে আমাদের মতো অক্ষরের সীমাবদ্ধতা তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেহেতু বিশেষ কিছু ভাষার অক্ষরমালার সাহায্যে কারো কারো লিখিত বইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে জ্ঞান আহরণ করে, সেহেতু তাদের জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তারা সীমাবদ্ধ জ্ঞান, শ্রেণী ও শ্রেণীর লোকে পর্যবসিত হয়। অপর দিকে আল্লাহ প্রদত্ত ঈমানী দূরঅতীত দৃষ্টি, বর্তমান গভীর দৃষ্টি ও দূরভবিষ্যতের গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষরা যখন অন্তরদৃষ্টি দিয়ে তাকায়, তখন সৃষ্টির সকল দিক ও সকল কাল একটি মাত্র দিক ও একটি মাত্র কাল হয়ে ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত হয়ে তাদের আয়ত্বে এসে যায়। এ দৃষ্টি শক্তিকেই রূহানীশক্তি বা ঈমানী ফারাসাত বলা হয়। আল্লাহর নবী ও রাসূলরা এ শ্রেণীর জ্ঞানী ও দ্রষ্টা। নবী রাসূলকে হুবহু অনুসারীরা তাঁদের এ জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।

সকল নবী রাসূলগণ ইসলামী উম্মার প্রেরিত পুরুষ। ইসলাম যেমন এক ও অভিন্ন, ইসলামী উম্মাহও এক এবং অবিভাজ্য। কোনো নবী রাসূল তাঁর নিজ নামে বা পরিচয়ে আলাদা উম্মাহ সৃষ্টি করেননা। করতে পারেননা। তার অনুমতিও নেই। পথহারা, পথ ভোলা ও উৎস এবং পরিণতির মধ্যে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলা মানবগোষ্ঠিকে পুনঃ অবিচ্ছেদ্য মূলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়ার জন্য আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন। আল্লাহ এক, তাঁর সৃষ্টি মানব জাতিও এক। আল্লাহর একত্বে মানবজাতিকে একজাতিতে পরিণত করাই হলো তাওহীদ। এ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন ঈমান, এবং এ ঈমানে আত্মসমর্পণ করা হলো ইসলাম। এ কাজটি যারা সঠিক ভাবে সম্পাদন করে, তারা মুসলিম। যারা ঈমানের দাবীর পর মানুষকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান, তথা ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া, আব্বাসী, শিয়া ও সুন্নী প্রভৃতি শ্রেণী ও ভাগে বিভক্ত করে ও নিজেরাও হয়, তারা মুমিন ও মুসলিম নয়। তারা ফের্ক্বা বা সম্প্রদায়। ঐক্যের পর অনৈক্যের বীজ বপন করে বলে এরা ধর্মহীনদের চেয়েও অধার্মিক।

অতএব, পাঠকদের মধ্যে যারা হারানো পথ পেতে চায়, তাদের স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, "উম্মতে মুসা" "উম্মতে ঈসা" ও "উম্মতে মুহাম্মাদ" ধরনের পরিভাষা মারাত্মক ভুল। এতো দিন না জেনে যারা এ ধারণা পোষণ করেছে, তাদের তওবা করে একক "উম্মতে মুসলিমায়" প্রবেশ করতে হবে। কারণ, ইমাম মাহদী, মসীহ্ ও মেসাইয়া বিশ্বে পুনঃ এ চূড়ান্ত উম্মতে মুসলিমাহ্ প্রতিষ্ঠা করবেন।

কোনো ব্যক্তির পক্ষে নবী বা রাসূল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র আল্লাহই নবী ও রাসূল নিয়োগ করেন। আর নবুওতের সিল্‌সিলাও শেষ। আর কোনো নবী রাসূলের আবির্ভাব হবে না। তার কোনো প্রয়োজনও আর রয়নি। কারণ সকল নবী রাসূলদের প্রতি নাযিল করা অহী আল-ক্বোরআনে একত্রিত। আখেরী নবী সঃ ব্যতীত অন্য কোনো নবী রাসূলদের ভাগ্যে তিরিশ পারা সন্নিবেশিত আল্লাহর কিতাব জুটেনি। তাঁকে দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত প্রানান্তকর নবুওতী পরীক্ষা দিয়ে ত্রিশ পারা অহীর আল ক্বোরআন লাভ করতে হয়েছে।

প্রত্যেক নবী রাসূল আল্লাহ কর্তৃক দায়িত্ব দেয়া কাজ সম্পাদনের সীমায় আবদ্ধ ছিলেন। আরব্ধ কাজের সীমা অতিক্রম করার সাধ্য কারো ছিলোনা। করলেই ঘাড়ের রগ কর্তিত হওয়ার ঝুলন্ত তরবারী তাদের মাথার উপর ছিলো। কিন্তু নবীদের অনুসারী মুমিনদের কর্মক্ষেত্র নবী রাসূলদের চেয়ে ব্যাপক। তাদের কাজ হলো সকল নবী রাসূলগণের রিসালাতের সমন্বয় করে গোটা মানব সমাজে তাঁদের আনীত তাওহীদ ও শরীয়ত ক্বায়েম করা। বিশেষ করে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর বিদায়ের পর ইসলামী উম্মাহর ইমামের দায়-দায়িত্বের সীমা সারা বিশ্ব। সকল নবীদের আনীত শরীয়ত বা বিধানকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করে তাকে পূর্ণতা দান পরবর্তী ইমাম বা নেতার কাজ। আখেরী নবী সঃ কে মে'রাজে নিয়ে আল্লাহ তাঁকে দিয়ে নবীদের ইমামত করিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর রিসালাত সকল নবীদের রিসালাতের সমাপ্তি। তাঁর পরবর্তি ইমামের দায়িত্ব বিশ্বজনীন ইমামত প্রতিষ্ঠা। বিশ্ব ইমামতের কাজ করে যারা ক্বেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে দাঁড়াবে, তাদের ভাগ্যে নবী রাসূলগণ ঈর্ষান্বিত হবেন।

আরবী, ক্বোরেশী, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সুন্নী ও শিয়া রোগের সঙ্কীর্ণতায় যারা ভুগবে, তারা এ কাজের জন্য অযোগ্য। নবীদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার বাইরে এক পা'ও তারা বাড়াতে পারবে না। নবী রাসূলগণ কখনো কখনো নাযিলকৃত অহীর নির্দেশ না থাকায় জরুরী পরিস্থিতির মুক্বাবিলা করতে গিয়ে মানবীয় সীমাবদ্ধতায় ভুলও করেছিলেন। পরে আল্লাহ অহী বা জিব্রাঈল আঃ কে পাঠিয়ে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর বিদায়ের পর সে দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই শুধুমাত্র তিরিশ পারা অহীর ভিত্তিতে যে বা যারা শেষ নবীর আচরিত সুন্নায় ইমামতের দায়িত্ব পালনে সফল হবে, তাদের দিন উপস্থিত। রাসূল সঃ এর নিচে কোনো ব্যক্তিকে অনুকরণযোগ্য মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ রাসূল সঃ ও ক্বোরআনের উপর ঈমান চলে গিয়ে সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। কারণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ বলে দিয়েছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা শুধু আনুগত্য করবে আল্লাহর, আর আল্লাহর রাসূলের। তা না করে তোমাদের সকল আমল বরবাদ করোনা। (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩) কথিত সাহাবী, ইমাম ও পীর, এ থেকে কেউ বাদ নেই।

ক্বোরআনের উপর নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত ঈমান আনলে ঈমানের আকাশ নীল হয়ে সারা দিন সূর্য, পূর্ণিমাতে সারারাত চাঁদ এবং অন্যান্য রাতে তারকা মন্ডলী দেখা যায়। স্বার্থ ও শর্তসাপেক্ষ ঈমান হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মেঘে ঢাকা সূর্য, চাঁদ ও তারার মতো কখনো দেখা যায়, কখনো দেখা যায় না।

ইয়াহুদী, নাসারা ও আরব মুস্তাকবিরদের ঈমান স্বার্থ ও শর্তসাপেক্ষ ছিলো বলে তাদের ক্রিয়া কলাপ সন্দেহাতীত প্রমাণ করেছে। তা থেকে শেষ নবীর সঙ্গী আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলী কেউ ব্যতিক্রম নয়। তাদের মধ্যে মাত্র ডিগ্রীর পার্থক্য ছিলো। ক্বোরেশী, আরবী ও হাশেমী প্রভৃতি রোগ থেকে এরা কেউই মুক্ত ছিলো না। তাই তারা কখনো মেঘে ঢাকা সূর্য ও চাঁদের ন্যায় আল্লাহকে দেখেছে, কখনো তা দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে।

যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, আব্দুল্লাহ ইবন্ উম্মে মাকতুম, আবদল্লাহ ইবন্ মাসউদ, খাব্বাব, সালমান, ও উসামাহ মুস্তাদআফ্‌রা সকল স্বার্থ ও শর্তের উর্ধ্বে আল্লাহ ও রাসূলকে সব দিয়ে গ্রহণ করেছিলো। তাই তারা মুক্ত আকাশের চাঁদ-সুরুজের মতো আল্লাহ ও রাসূলকে সর্বদা দেখতে পেতো। তাই তারা কখনো আবু বকর ও উমরদের ক্বোরেশী ফিৎনায় জড়ায়নি। বিলাল সঙ্গে সঙ্গে ক্বোরেশী ইমামের মুয়ায্যিন হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তা থেকে পৃথক হয়ে নিজের ঈমান বাঁচিয়ে বিদায় নিয়েছে। সর্বশেষে উসামাহও আলীর হাশেমী ইমামত স্বীকার করে নির্যাতন ভোগ করে নির্বাসিত হয়ে ঈমান বাঁচিয়ে গিয়েছে।

উমর জেরুজালেম তার ক্বোরেশী জেনারেলদের হাতে অবরুদ্ধ হলে সেখানকার ইয়াহুদী খৃষ্টানদের অত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যায়। রাসূল সঃ এর সংস্পর্শ তার ব্যক্তিচরিত্রকে এতো সুন্দর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো যে যাত্রাকালে উমর তার গোলামকে একবার উটের পিঠে বসিয়ে নিজে রশি টেনেছে, আরেকবার তার গোলাম উমরকে উটে বসিয়ে রশি টেনে জেরুজালেম পৌঁছেছে। এ দৃশ্য ভাবলে আমার মনে হয় যে আমি মানুষ না হয়ে যদি সে উটটা হতাম! তা হলেও ধন্য হতাম।

কিন্তু যখন দেখি যে উমর জেরুযালেমের ইয়াহুদী খৃষ্টানদের নিয়ে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর মে'রাজ সকল নবীদের ইমামতির দৃষ্টান্তে ইমামতি করতে ব্যর্থ হলো, তখন সে ভুল ভেবে আর্তচিৎকারে আমার বুক ফেটে যায়। পরাজিত নয়, অবরুদ্ধ মূসা ও ঈসার কথিত অনুসারীরা, যখন বলেছিলো যে, "হে উমর, তুমি শেষ নবীর খলিফা রূপে এসেছো, যার পূর্বের নবী ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা। তুমি আমাদের নিয়ে সালাত কায়েম করে আমাদের আত্মসমর্পণ পূর্ণ করো"। এর চেয়ে কি উত্তম কোনো কথা হতে পারে? তখন যদি উমর মেরাজে অন্যান্য নবীদের নিয়ে রাসূল সঃ এর সালাতের দৃষ্টান্তের বর্ণনা দিয়ে তাদের নিয়ে সালাতের জামাত করে চিনি-পানির মতো সবাইকে এক করে ফেলতো, তখন কি ঘটনাটিইনা ঘটতো? রাসূল সঃ এর তোলা ঢেউয়ে তখন পারস্য ও রোমান পরাশক্তি ধরাশায়ী। কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ইয়াহুদী খৃষ্টানদের খন্ডিত ধর্মের কেন্দ্র জেরুজালেম ও বায়তুল মাক্দিস উমরদের হাতে এসেছে। তখন আল্লাহর একমাত্র দ্বীনের তাওহীদী ঝান্ডা উত্তোলনে কিসের বাধা ছিলো? সদ্য নাযিল হওয়া সূরা তওবায় যেখানে স্পষ্ট করে আল্লাহ বলে দিয়েছেন উমরদেরকে যে, তোমাদের মাঝে যে রাসূল এসেছে, তাকে একমাত্র দ্বীনে হক্ব অর্থাৎ সত্য দ্বীনের নির্দেশাবলী দিয়ে সাজানো হয়েছে, তাঁকে দ্বীনের সম্পূর্ণের (?) উপর বিকশিত ও উদ্ভাসিত করণার্থে। করুকনা বিশ্বের মুশরিকরা তা অপছন্দ"। এ আয়াতটি هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ক্বোরআনে আল্লাহ এ আয়াতটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। প্রত্যেকবারই "দ্বীন" শব্দটিকে অর্থবহ ভাবে একবচনে বলেছেন। বহুবচনে বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহর একমাত্র দ্বীনের ষোলআনা বা একশততম পূর্ণতায় শেষ নবী সঃ কে জাহির বা বিকশিত করা হয়েছে। তাঁকে কোথাও "অন্যান্য দ্বীনের" বা "সমস্ত ধর্মসমূহের" উপর বিজয়ী বা জয়যুক্ত করবেন বলা হয়নি। তাই যদি হতো তা হলে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী আয়াতটি হতো ঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الاديانِ كُلِّها

অর্থাৎ দ্বীনের এক বচনের স্থলে اديان আদ্য়ান এবং কুল্লিহির স্থলে كلها হতো। তা হলেই বুঝাতো যে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে এক পৃথক সত্য দ্বীনের হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁকে অন্যান্য দ্বীন সকলের উপর জয় যুক্ত করার জন্য। তা হলে, ইব্রাহীম মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের দ্বীন আলাদা আলাদা প্রমাণিত হতো এবং অন্যান্য নবীরা ইসলামের নবী রাসূল হতেন না। তা কি কখনো হতে পারে? আল্লাহর যেমন এক হওয়া সত্য, তদ্রূপ আল্লাহর দ্বীন ইসলাম এক এবং তাঁর সকল নবী রাসূলগণ এক ও অভিন্ন হওয়া সত্য। এ বুঝ যাদের হয় এবং তা যারা মানে, তারা তাওহীদবাদী মুসলিম। যারা তা বুঝেনা ও মানেনা, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সঃদের দ্বীন ও উম্মতকে পৃথক পৃথক মনে করে ও মানে, তারা নির্বিশেষে সবাই মুশরিক ও নাপাক। যারা সকল রাসূলদের পার্থক্যহীন ভাবে বিশ্বাস করে ইসলামকে একমাত্র দ্বীন রূপে বুঝে ও মানে, একমাত্র তারাই মুমিন, তারাই মুসলিম।

রাসূল সঃ তাই বুঝিয়ে গিয়েছেন। আবু বকর ও উমররা তাদের সীমাবদ্ধতায় আখেরী নবী সঃ এর আনীত দ্বীনকে ইয়াহুদী ও খৃষ্ট ধর্মের তুলনায় আরেকটি নতুন ধর্ম রূপে বুঝে রাসূল সঃ কে আরবী ও ক্বোরেশী এবং ইসলামকে মুহাম্মাদী ধর্মরূপে চিত্রিত করেছে। তা থেকেই মুসলমানদের "মোহামেডান" বলার উৎপত্তি হয়। যেমন ইয়াহুদীরা ইয়াহুদা থেকে ইয়াহুদী, খৃষ্টানরা খৃষ্ট থেকে খৃষ্টান, তেমনি মুসলমানরা মুহাম্মাদ থেকে মোহামেডান।

এ অর্থেই আল্লাহ সূরা হুজুরাতে বলেছেন যে মরুবাসী বেদুঈনদের অন্তরে এখনো সত্যিকারের ঈমান প্রবেশ করেনি। وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ক্বোরেশীও আরবী উমর তাই জেরুজালেম দখলের পর হযরত মূসা ও হযরত ঈসার উপর ঈমান আনা লোকদের আহ্বান ও প্রস্তাবের পরও তাদের সামনে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর রিসালাত উপস্থাপন করে মে'রাজে রাসূলের নবীদের জামাতের সদৃশ্য জামাত দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে। সে ঘটনা থেকেই ইসলাম, খৃষ্টান ও ইয়াহূদী ধর্ম নামে তিনটি ধর্ম হয়ে এ তিন জাতি আজো একজন অপরজন কে মোটানোর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এবং

প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাহ্দী, মসীহ ও মেসাইয়ার আগমণের অপেক্ষায় দাঁত ধারাচ্ছ।

এভাবে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর তাঁর একত্রিত করা মুসলিম উম্মাহকে প্রথমে মুহাজির-আনসারে দু'টুকরা করে হত্যা করে ক্বোরেশী চার খলিফার চার তক্তার কফিন বক্সে ঢুকানোর পর জেরুজালেমে তার জানাযা হয়। এরপর সে কফিন ক্বোরেশের চার কুচক্রী, মুয়াবিয়া, মারওয়ান, মুগীরা ও আমর ইবনুল আসদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তারপর উমরের আরেকটি ভুলে সে কফিনে শেষপেরেক বা লাষ্টনেইল লেগে যায়। তারপর থেকে রাসূল সঃ এর পূর্ণ করা রিসালাতের দ্বীন কফিন বন্দী। আরবীতে কফিনকে "তাবুত" বলা হয়। সে কফিন ভেঙ্গে ইসলামকে মুক্ত করার জন্য আমার এ লেখনী।

ঘটনাটি আমার জন্য এতো দুঃখজনক ও শোকাবহ যে তা ভাবতেই আমি বিমুঢ় হয়ে যাই। ভাবি যে কিভাবে তা ঘটে গেলো? ইসলামের বিধানের শিক্ষা যে ইসলামে কখনো বেতন ভোগী ইমাম ও নেতা হবেনা এবং কখনো বেতন ভোগী পেশাদার সেনাবাহিনীও হবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার জানমাল দিয়ে আল্লাহর রেজিষ্টার খাতায় সৈনিকরূপে তালিকা ভুক্ত হয়। সূরা তওবার **১১১**নং আয়াত অনুযায়ী সৈনিকরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর **১১২** নং আয়াত অনুযায়ী পত্যেকটি সুস্থ সবল ঈমানদারের সেনাশিবিরের জীবন আরম্ভ হয়। শাহাদাত প্রাপ্তি বা মৃত্যু পর্যন্ত তার এ জীবন। **১১২** নং আয়াতে বর্ণিত ন'টি অনুশীলনে তার সৈনিক জীবন চলবে। (ক্বোরআন খুলে এ ৯টি কর্তব্য দেখে নাও)।

কাফের, মুশরিক ও মুস্তাকবির সাম্রাজ্যবাদীরা রাজ্যবিস্তারের জন্য বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। বেতন ও ভাতার সুযোগ সুবিধা তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে যখন তাদের বেতন ভাতা বেশীর নিশ্চয়তা দেয়, তারা তারই অনুগত হয়। পুরাতন পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যে শক্তির উৎসই ছিলো তাদের বেতনভুক্ত সেনাবাহিনীর সমরশক্তি। আখেরী নবীকে আল্লাহ তৎকালীন পৃথিবীতে সবচাইতে দুর্বল, দরিদ্র ও অনৈক্য বুদ্দু জাতির মাঝে পাঠান ইসলামের রূহানী সৈনিক তৈরীর পাঠ দিয়ে। যেমন বড়ো চিকিৎসককে পাঠানো হয় দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের ঔষধ উদ্ভাবন করতে। ঔষধ আবিষ্কৃত হয়ে গেলেই প্যাটেন্ট করে বিশ্ব বাজারে তাকে ছাড়া হয়। আল্লাহর রাসূল সঃ ক্বোরআনের وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا শেফা বা রোগ নিরাময় ফর্মূলায় ঔষধ আবিষ্কার করে পরীক্ষামূলকভাবে তা দিয়ে মরুর রুগ্নতম জাতিকে সুস্থ করে রাসূল বিদায় হজ্জে বলে যান যে, "ঔষধ বিধিমতো ব্যবহার করলে তোমরা সুস্থ থাকবে। কখনো রোগাক্রান্ত হবেনা। বরং নিজেরা সুস্থ থেকে অন্যান্য জাতিদের উপর তা প্রয়োগ করলে সারা বিশ্ব তাতে সুস্থ হবে। খবরদার, যদি ঔষধে ভেজাল করবে, তা হলে তোমরা অত্যাচারী যালেম হবে। তা হলে এ ফর্মূলাই তোমাদের ধ্বংস করে দিবে"।

বেতনহীন ইমামত ও সেনাবাহিনীর ধাক্কায় ক্বায়সার বা কিস্‌রা, বা সিজার ও খসরুর সিংহাসন ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস নেমে গেলো। বেতন ভুক অজেয় সৈন্যবাহিনী দাঁড়াতে পারলোনা অর্ধাহারী, অর্ধ-উলঙ্গ নবীর শিক্ষাপ্রাপ্ত রূহানী সৈন্যদের সামনে। তা দেখেও অগভীর ও অদূরদর্শী উমর আত্মঘাতি ভুল বুঝে ভুল করে ফেললো। সে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাজানো পেশাদার সেনাবাহিনী দেখে তাদের আদলে নথিভুক্ত করে মুসলিম যোদ্ধাদের সেনাবাহিনী দাঁড় করে তাদের জন্য বেতন ভাতাও নির্ধারিত করে দিলো। ফলে তারা কেন্দ্রে ক্বোরেশী খলিফার সৈনিক হলেও প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার সেনাপতি খালেদ, মুয়াবিয়া, আমর ও মুগিরাদের সৈনিক হয়ে যায়। তারা আর নামকা ওয়াস্তেও আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর সেনাবাহিনী রইলো না। রাসূলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুস্তাদআফরা নেতৃত্ব থেকে বাদ পড়লো। এখন সরাসরি মুস্তাকবিরদের সৈনিক ও সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে গেলো। এরা ইরান, সিরিয়া, মিশর ও ভারতসহ রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে ধনসম্পদ আহরণ ও নরনারীদেরকে বন্দী করে নতুন করে ইসলামী দাসদাসী কেনা-বেচার প্রচলন করলো। এ বেতনভুক সৈন্যরাই মাদীনা আক্রমণ করে হাজার হাজার আনসারদের হত্য করেছে। তাদের হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং মসজিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছে।

এভাবেই বেতনভুক নিয়মিত সৈন্যবাহিনী তৈরী করে হিয্‌বুল্লাহর সেনাবাহিনীর বিলুপ্তি ঘটানো হয়। এজন্য আমি উমরের এ ধরনের সৈন্য তৈরীকে ইসলামী উম্মাহর কফিনের শেষ পেরেক বলে অভিহিত করেছি। উমরের সদিচ্ছা ছিলো। তার প্রমাণ মিলে। কিন্তু গভীরতা ও দূরদৃষ্টিহীনতা ছিলো যে তার প্রমাণ আজো বিদ্যমান। বর্তমানে নামকা-ওয়াস্তে যে মুসলিম দেশগুলো রয়েছে, তাতে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী গণবাহিনীর পথে, নিয়মিত সেনাবাহিনী ও তাদের সম্মুখ দালাল, মুস্তাকবির তাগুত রাজনীতিকরা জগদ্দল পাহাড়ের ন্যায় বাধা। মিশরে ইখওয়ানীদের বিনাশ,

সিরিয়ায় ইখওয়ানীদের নিধন, আলজেরিয়ায় ইসলামীদের মুলোৎপাটন, ইরাকে ইসলামের নাম নেয়াই আজরাঈলের পত্র, এবং তুরস্কে ইসলামের নাম নেওয়াই দন্ডনীয় অপরাধ। এ সবের পেছনে কি বেতন ভাতাসহ জাতির আয়ের সিংহভাগ শোষণকারী সেনাবাহিনী নয়? কামাল পাশা, নাসের, সূকর্ণ, আইয়ুব খান ও সাদ্দামরা কি মুয়াবিয়া, মারওয়ান, মুগীরা ও আমর ইবনুল আসদের প্রেতাত্মা নয়?

আল্লাহ তাঁর খলিফা মানুষদের হিংস্র প্রাণীর মতো দাঁত ও নখর না দিয়ে তাঁদের ঈমানের মুকুট পরিয়ে ঈমান, জান, মাল ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ক্বোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের শত্রু দমনে সবাই সশস্ত্র হবে, যাতে তোমাদের ও আল্লাহর শক্ররা তোমাদের ভয়ে কম্পমান থাকে।" (সূরা আনফাল-৬০) রাসূল সঃ বলেছেন السلاح زينة الرجال "পুরুষের অলঙ্কার অস্ত্র"। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রত্যেক ঈমানদারদের সশস্ত্র করেছেন। শয়তান তার অবৈধ মানুষ সন্তানদের দ্বারা গঠিত হিযবুশ্ শাইতান বা শয়তানের সেনাদের বিশ্বময় অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। শয়তান সর্বপ্রথম এ কাজটি করিয়েছে তার খলিফাদের দ্বারা সাধারণ মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তার নামে নিরস্ত্র করে। তারপর জন সাধারণকে নিরস্ত্র করে দেশের সেনাবাহিনী নাম দিয়ে সশস্ত্র দস্যুদের জাতির উপর চাপিয়ে দিয়ে জাতি সমূহকে স্ব স্ব রাজনৈতিক লুটেরা ও সেনাবাহিনীর জিম্মী করে দিয়েছে।

জনগণের হাতে অস্ত্র থাকলে কোনো জাতিকে বহিঃশক্তি আক্রমণ করতে সাহস করেনা। তারপর ইসলামের মতো আদর্শে দীক্ষিত জাতির দিকে চোখ তুলে তাকানোর কথাই তো কোনো বেঈমান শক্তি কল্পনা করতে পারেনা! কারণ মুমিন সৈনিক তো সত্যের জন্য শাহাদাত বরণকেই জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি মনে করে! অপর পক্ষে ভোগবাদী বেঈমান তার মৃত্যুকে সকল প্রাপ্তির শেষ মনে করে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখা যেতে পারে যে, আফগানীদের মতো একটি ক্ষুদ্রজাতি তাদের ঘরে ঘরে অস্ত্র থাকার ফলে বৃটিশ উপনিবেশবাদ বার বার চেষ্টা করেও তাদের পদানত করতে সক্ষম হয়নি। সে ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য থাকার ফলেই আজ আফগানীরা রাশিয়ার মতো একটি পরাশক্তির পরাজয় ঘটিয়েছে। আফগানী ঐতিহ্যের সাথে আরব দেশ থেকে নব্য আরবী মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ান, হিংস্র হুসনী মুবারক, হাফেজ আল আসাদ, ফাহাদ ও সাদ্দামের দেশসমূহ থেকে কিছু ইসলামী জাগরণ প্রত্যাশী আরব মুস্তাদআফ্রা যোগ দিয়ে যোদ্ধা হওয়ায় আরব তাগুতদের তাদের ভয়ে ঘুম হারাম হয়নি? আফগান সীমান্ত পার হয়ে আফগান ঐতিহ্যের কিছু সুন্নী যোদ্ধা দাঘেস্তান ও চেচনিয়ায় প্রবেশ করায় রাশিয়ার পুটিনদের আতংকের পরিধি কি? ভিয়েতনামের মতো একটি ছোট্ট দেশে গণফৌজের হাতে আমেরিকার কি গতি হয়েছিলো? সর্বশেষ বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের মতো দুর্বল জাতির গণপ্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কি পরিণতি হয়েছিলো?

এ সমস্ত দেশগুলোতে জনগণের হাতে অস্ত্র আসায় নিয়মিত সেনাবাহিনী তাদের সামনে টিকতে পারেনি। ইসরাঈলের মতো তিরিশ লক্ষ জনসংখ্যার একটি জাতিকে অস্ত্রের সাথে একটি ভ্রান্ত ধর্মীয় আদর্শে উজ্জীবিত করার ফলে সত্যিকারের ঈমানহীন বিশ কোটি আরবদের অবস্থা কী?

আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীনের শেষ নবী সঃ এর হাতে আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশে গড়া পরীক্ষিত মুস্তাদআফ্ যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের বর্ণাঢ্য সেনাজাতির আদর্শ বহাল রেখে উসামাহর অধীনে আবু বকর, উমর ও আলীসহ মুহাজির আনসার প্রধানরা ইস্পাত ঢালাই প্রাচীর হয়ে জিহাদ করে ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিশর জয় করে সে জাতি সমূহের সামনে আল্লাহ ও রাসূলের মুস্তাদআফ ও ইমামতের আদর্শ তুলে ধরলে দৃশ্যপট কি হতো? পারস্য সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের যাতাকলে পিষ্ট মুস্তাদআফ্ জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে তাদের স্মৃতিতে বিদ্যমান ঐ সমস্ত সাম্রাজ্যের মুস্তাকবিরদের যুলুম, অত্যাচার ও শাসন শোষণের পরিবর্তে উসামাহ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব আররুমী, সালমান আল্ ফারসী ও আবু বকর, উমর ক্বোরেশীদের এক কাতারে দেখে যায়দ, বিলাল ও সালমানদের রূহানী প্রশিক্ষণে একক ফৌজ হলে কি তার সামনে পৃথিবীর কোনো শক্তি দাঁড়ানোর সাহস করতো?

তার পরিবর্তে আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের এক জাহেলী গোত্রবাদের সীমাবদ্ধ বন্ধ্যা, আটকুঁড়ে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে লিপ্ত খেলাফতের অধীনে দেশ জয় করে তার নরনারীদের বন্দী করে এনে ইসলামী দাস-দাসীর হাট মিলানো কি একই রূপ হতে পারে? পরে তো তাই হলো! চার খলীফার তিন খলিফা আত্মকলহে নিহত হলো। আমরা কি একটি দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে পারি যে, যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, ইবন্ মাসউদ, সালমান ও উসামাহরা

কখনো আন্তঃকলহ করেছে, বা রাসূল সঃ জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর রাসূল সঃ এর কোনো একটি আদেশ অমান্য করেছে বা তাঁর কোনো সুন্নতের খেলাফ কোনো কাজ করেছে? কখনো পারবোনা। তারা বদরের যুদ্ধে ক্বোরেশী আবু জেহেলদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, আলী ও হামযা ব্যতীত অন্য কোনো ক্বোরেশী কি তা করেছে? উহুদে তো ওসমানসহ বহু খান্দানী রাসূলকে ফেলে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিলো? এরপরও রাসূলের আদর্শে বিশ্বমুস্তাদআফ সেনাবাহিনী কেনো তৈরী হলোনা? তিন দিন কেনো রাসূল সঃ কে বিনা দাফনে রাখা হয়েছিলো? কেনই বা তাঁকে তাঁর শেখানো জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়েছিলো? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরেই বিশ্বজনীন মুস্তাদআফ্ মুক্তিফৌজ তৈরীর পথে বাধার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্তমানে ইয়াহুদী-খৃষ্টান আঁতাতের দাজ্জাল আমেরিকা একমাত্র পরাশক্তি। অন্যান্য খন্ডিত রাষ্ট্রসমূহ ঐ বড়ো দাজ্জালের পদলেহী ক্ষুদে দাজ্জাল। তাদের সেনাবাহিনী মানবমুক্তির পথে প্রধান বাধা। প্রত্যেক দেশের জনগণ তাদের অর্থে গড়ে উঠা রাজনৈতিক বাটপার ও সেনাবাহিনীর হাতে জিম্মী, বিনে পয়সার দাস। যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক শরীরচর্চা থেকে জাতিসমূহের যুবশক্তিকে বঞ্চিত করে পঙ্গু রাখার জন্য নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বেপর্দা সহশিক্ষা ও ইলেকট্রনিক প্রচার যন্ত্রে চব্বিশ ঘন্টার যৌন ব্যভিচার পশ্চিমা দাজ্জালের মোক্ষম অস্ত্র। এ অস্ত্র দিয়ে পাশ্চাত্য পাশবতার ইবলিস ও তার মানব সন্তানরূপী দাজ্জালরা ঘরে ঘরে ছেলেদেরকে পিতার সাথে এবং মেয়েদের মায়ের সাথে যৌনাচার করাচ্ছে। ইন্টারনেট, ভি, সি, আর ও টেলিভিশনে পিতা-পুত্র ও মা-মেয়ে চব্বিশ ঘন্টা একত্রে বসে উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ যৌনাচারের বিশ্রী ইংগীতবহ দৃশ্য দেখে ও সংলাপ শুনে। তাতে মা মেয়ে উষ্ণ হয়ে মানসিক ভাবে একই পুরুষের সাথে যৌনাচার করে। অপর দিকে একই নারীর অঙ্গ ভঙ্গি ও আবেদনে কুকুর হয়ে পিতা-পুত্র একই নারীর সাথে যৌন মিলনের আস্বাদ গ্রহণ করে। আমার এ স্পষ্ট কথায় ধরা-খাওয়া নরনারীরা বা তাদের কিছু নির্লজ্জ বা মিথ্যুক অংশ হয়তো বলবে যে, আমরা সে রকম কিছু মনে করিনা, আমরা শুধু বিনোদনের জন্যই তা দেখে থাকি। উত্তরে আমি ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদী হারামজাদা ও হারামজাদীদের বলবো, তা হলে তোরা জিহ্বা বের করে লোলুপ দৃষ্টিতে ঐ বাক্সটির দিকে তাকিয়ে থাকিস কেনো? আবার হয়তো কেউ বলবে যে কথাটি অনস্বীকার্য্য সত্য হলেও লেখক তাদের গালি দিলো কেনো? উত্তরে বলবো যে, এ গালি কোথায়! এতো তাদের সঠিক পরিচিতি! এ আল্লাহর নিষিদ্ধ বা হারাম পন্থায় এ সকল নরনারীদের জন্ম, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্ম, তাদের শিক্ষা ও জীবন! এদেরই স্বয়ং আল্লাহ ক্বোরআনে খাবীসাহ ও খাবীস বলে নামকরণ করেছেন। আমি শুধু তাদের ব্যাপারে নাযিল হওয়া আয়াত বাংলা ভাষায় তেলাওয়াত করেছি মাত্র, গালি দিলাম কোথায়?!

এখানে আমি পাঠকদের নিয়ে সূরা সাবার ৩১, ৩২ ও ৩৩, তিনটি আয়াত পড়বো। হাজার হাজার বছর পূর্বে সাবা জাতির এক সমৃদ্ধ সভ্যতা আল্লাহর আযাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাদের রানী "কুইন অব শিবা" খ্যাত বিলকিস রানী। তাদের উত্থান ও পতনের বর্ণনার জেরটেনে বিশ্বের পুরাতন ও অধুনা ধনী ও দরিদ্র পাপী অর্থাৎ মুস্তাকবির সমাজপতি পাপী ও তাদের ভোট ও করদাতা মুস্তাদআফ পাপীদের মাঝে ক্বিয়ামতের দিন কি কথাবার্তা হবে, তার রেকর্ডকরা আগাম বর্ণনা আল্লাহ এ তিনটি আয়াতে বাজিয়ে শুনাচ্ছেন।

"যে কাফির নরনারীরা বলে যে তারা ক্বোরআন ও তার পূর্বের নাযিল হওয়া তাওরাত ও বাইবেলেও বিশ্বাস করেনা, তাদের তোমরা দেখতে চাও যে, তারা ক্বেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালকের মুখোমুখি হয়ে শোষক ও শোষিতরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কি বলবে? মুস্তাদআফরা মুস্তাকবিরদের বলবে, "আপনারা সমাজের হর্তা-কর্তা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম"। তদুত্তরে মুস্তাকবিররা তাদের ভোটের ও ভ্যাটের মুস্তাদআফদের বলবে, "আমরা কি তোদের সত্য আসার পর তা গ্রহন করতে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোরাই দেশবাসী জনতা পাপিষ্ঠ ছিলি"। তদুত্তরে মুস্তাদআফ পাবলিক তাদের শাসক মুস্তাকবিরদের বলবে, "স্যার, আপনাদের কথা ঠিক, তবে আপনারা যে গণতন্ত্র, পার্লামেন্ট, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন দ্বারা দিবা-নিশি চব্বিশ ঘন্টা দুষ্ট-চক্র সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে ও তাঁর সাথে শির্ক করতে জাতিকে বাধ্য করেছিলেন, তাই আমরা আপনাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারিনি।" তখন পাপী মুস্তাকবির ও তাদের পাপের ভোটার ও ভ্যাটের মুস্তাদআফরা দেখবে যে আল্লাহ্‌র আযাবের ফেরেশতারা গলায় জড়ানো বেড়ী নিয়ে উপস্থিত। তা দেখে তারা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে সোনারগাঁ, শেরাটন, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী ও বারিধারা এবং বস্তিবাসী, জনি ওয়াকার, স্কচ্ হুইস্কি, ভদকা ও ফেন্সিডিল পানকারীরা নির্বিশেষে একত্রে শৃঙ্খলিত হয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত হবে। কর্মফলের আস্বাদন থেকে কি কেউ অব্যাহতি পাবে?"

বিশ্বে আল্লাহ্‌র দ্বীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বারা পূর্ণতা পাওয়ার পর সেদিন যদি আবু বকর ও উমর "তালগাছের ভাগটা" নিজেদের পক্ষে না রেখে আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে যায়দ, বিলাল ও সালমানদের ন্যায় বিনা স্বার্থ ও শর্তে গ্রহন করতো, তা হলে কি আরব-অনারব, সাদা-কালো ও শিয়া-সুন্নীদের বিভাজন সৃষ্টি হয়ে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা হতো? কখনো হতোনা। সূরা ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদে আল্লাহ সে নিশ্চয়তা প্রদান করে বলেছেন, হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি আল্লাহকে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সাহায্য করো, তা হলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করে তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দিবেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ভিত নড়বেনা। يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

ইসলাম পরিবার ভিত্তিক সমাজ। ইবলিসের সমাজ, পরিবার ভাঙ্গার গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। ইসলামে দুটি ঈমানদার নরনারী তাদের ধর্মীয় পার্থিব জীবন যাপনের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হালাল খেয়ে হালাল বীজ দিয়ে সন্তান জন্ম দেয়। সন্তানের সাত বছর বয়স হলে তাকে ধর্মীয় শিক্ষায় সামরিক শিক্ষার শারীরিক শৃঙ্খলার ক্লাশে ভর্তি করতে হয়। দশ বছর হতেই ছেলে মেয়ের বিছানা পৃথক করে স্ব স্ব ভূমিকা পালনের জন্য তাদের প্রস্তুত করে সালাতের পাঁচবার হাজিরা, কাতারের শৃঙ্খলা ও ইমামের আনুগত্যের কড়া-কড়ি আরম্ভ হয়ে যায়। আপন ভাই বোনের বিছানা পৃথক করার মতো মুসলিম উম্মাহর ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পূর্ন রূপে আলাদা হতেই হবে। সাত বছর বয়স থেকে শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণ চৌদ্দ পনের বছরে পৌছুলে তারা বালেগ-বালেগা হয়ে জীবন স্বাতন্ত্র্যে ছেলেরা যোদ্ধা ও মেয়েরা গৃহদূর্গ গঠনের দায়িত্বে পদার্পণ করবে। ছেলেরা ঘরে পিতার কাজে পড়ার ফাঁকে সাহায্য করে ভবিষ্যত পিতার প্রশিক্ষণ নিবে। স্কুল-কলেজে বছরে চার মাস তাদের শিক্ষা কোর্সে সমাজ পরিচালনা ও দেশ রক্ষার কর্মশালার শিক্ষা সমান্তরালে চলবে।

পিতামাতার বাড়ী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মাঝে ছাত্ররাজনীতির ইবলিসী, মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ রূপে পরিগণিত হবে। ছাত্রজীবনে পিতামাতার আনুগত্য ও উস্তাদের আদব শিক্ষার মাঝে ছাত্র রাজনীতি, আদম ও আল্লাহ্‌র মাঝে ইবলিসের অনুপ্রবেশ। বিশেষ করে গোলাম আযমরা ইসলাম ও ধর্মের নামে ছাত্র রাজনীতিতে টেনে শিক্ষার্থীদের যে বিভ্রান্ত করে, তা দাজ্জালের উম্মত তৈরীর মাদ্রাসা। কারণ, পাঠকদের একটি কথা সর্বদা বুঝতে হবে যে দাজ্জাল ধর্মীয় নেতা হবে। সে মূসা আঃ এর নামে মিথ্যা মেসাইয়া, ঈসা আঃ এর নামে মিথ্যা মাসীহুদ্দাজ্জাল ও আখেরী নবী সঃ এর নামে মিথ্যা মাহদীর বেশভূষা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। ধর্মের নামে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী যুবক যুবতী এবং প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীরা তওবার সুযোগ নিতে পারবেনা। কারণ, শয়তান তাদের এ ধারণায় ব্যস্ত রাখে যে, "তোমরাতো ধর্মেই আছো। তোমাদের আর তওবা কিসের?" যেমন পূর্বে ইয়াহুদী নাসারারা ছিলো, মধ্যযুগে মক্কার ক্বোরেশরা ছিলো, এবং তারপর শিয়া সুন্নী হয়ে, সর্বশেষে সুন্নীরা ইখওয়ানী, জামাতী ও দেওবন্দী সব মিলে সিপাহে সাহাবা নামে দেশ-বিদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসী। অপরদিকে শিয়ারা হিযবুল্লাহ্‌র নামে মধ্য প্রাচ্যের লেবাননে সন্ত্রাসী। এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সিপাহে মুহাম্মাদ নামে হত্যা যজ্ঞে লিপ্ত। মূলতঃ এরা আল্লাহ্‌, ক্বোরআন ও রাসূল অমান্যকারী। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও মুয়াবিয়াদের নামে বিভক্ত বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী। এদের মূলে কোনো পিতা মাতা ও শিক্ষক নেই।

অপর দিকে মুজিব ও জিয়াদের ধর্মহীন রাজনৈতিক স্বার্থসর্বস্ব বিপথগামী ছাত্ররা কখনো বিবেকের দংশনে ভুল বুঝে অনুশোচনা করে তওবা করে খাঁটি ঈমানদার হতে পারে। বিষয়টি সহজ ভাবে বুঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। যৌনী ও যৌনাঙ্গের স্বাধিকারের দাবীদার কোনো নারী বেশ্যা হয়ে ব্যভিচারিণীর জীবন যাপন করতে গিয়ে কোথাও হোচট খেয়ে খাঁটি তওবা করে কোনো ভালো পুরুষের পায়ে পড়ে স্ত্রী বা মিলকুল ইয়ামীনের মর্যাদা পেয়ে ঘরে ফিরে মানুষ হতে পারে। তার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কোনো বিবাহিতা নারী স্বামী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারিণী হলে তার পক্ষে তওবা করে ভালো হওয়া মুশকিল। কারণ সে ধর্মীয় অনুশাসনের স্বামীর ঘরভাঙ্গা পাতকী। তাকে কোনো ভালো পুরুষ গ্রহণ করবেনা। তদরূপ যারা প্রচলিত ধর্মীয় রাজনীতির বেশ্যাবৃত্তি ও তাদের ফীডার ধর্মীয় ছাত্র সংগঠন করে, ওদের মানুষ হয়ে পিতামাতার ঘরে ফেরা বহু কঠিন। কারণ, তারা যে ধর্মীয় রঙ্গমঞ্চের শিল্পী! ওরা ওদের নেতাদের মতো নষ্ট। ওদের কোনো পিতা মাতা ও অভিভাবক নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ, ধর্মহীন, ধর্মদ্রোহী ও কুশিক্ষিত পশু সভ্যতার

ধারক বাহক নরনারী মানব শ্রেণী, যৌন তাগিদে জোড়া বাঁধে। এরা কাবিন নামায় ধর্মে মুসলিম, মাযহাবে হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী, মালেকী বা শিয়া সুন্নী উল্লেখ করলেও এরা আদৌ মুসলিম নয়। এদের নামাজ, রোজা ও হজ্ব যাকাত সব মিথ্যা ও অসার। এরা ব্যক্তি, পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্‌র বিধান, হালাল-হারাম কিছুই মানেনা বলে, এরা মুশরিক ও মুর্তাদ। সামাজিক স্বীকৃতির বিবাহের লাইসেন্স বানিয়ে এরা প্রকৃত ইসলামী বিচারে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। স্বামী-স্ত্রী মিলে এরা রাস্তাঘাটে বেপর্দা চলে ব্যভিচারের জীবন্ত প্রসার ঘটায় এবং বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী মিলে টেলিভিশন ও ইন্টারনেট প্রভৃতির সামনে নারীটি মাইকেল জ্যাকসন ও ক্রিকেটের হনুমান প্রভৃতি পুরুষদের পেশী দর্শনে উত্তেজিত হয়, এবং নরটি নটী-নর্তকীদের দেখে পাশব মিলনে একত্র হয়। নারী-পুরুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে শয়তান থেকে পানাহ না চেয়ে মিলিত হলে শয়তান তাদের মিলনে শরীক হয় বলে রাসূল সঃ বলেছেন। আরব দেশে এখনো কোনো লোকের অশালীন আচরণ দেখলেই ঈমানদার লোকেরা বলে, "লাম্ ইয়াসুম্মা আবুহু" অর্থাৎ তার জন্মকালে তার বাবা বিসমিল্লাহ পড়েনি। তাই এদের মিলনে সন্তান জন্মিয়ে ছেলে হলে শিশু অবস্থাতেই রাস্তা-ঘাটে হাত পা মুড়িয়ে বলিং ব্যাটিং এর মতো হাত পা নাড়ে এবং মেয়ে হলে ভারত নাট্যমের মুদ্রা করে কোমর দুলিয়ে চলে। এই মা মেয়েরা হোটেলে গিয়ে ক্রিকেটারদের অটোগ্রাফ শিকারে যায় এবং সুযোগ পেলে ওদের বীজ নিয়ে আসে।

ইসলামে এ বিনোদন অকল্পনীয়। যোদ্ধা জাতির হিযবুল্লাহ তৈরীর কারখানা মুসলিম নরনারীর ঘর। পুরুষদের জামাতের ফরজ সালাতের স্থান মসজিদ। সুন্নাহ ও নফল পড়ার স্থান ঘর। নারীদের ঘর সৈনিক জন্ম ও তার লালন পালনের সদন। ছেলেরা সৈনিক ও মেয়েরা সৈনিকের স্ত্রী ও মা হওয়ার প্রশিক্ষণ পাবে। ছেলেরা ঘরে বাইরে শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে আদর্শ সৈনিক রূপে গড়ে উঠবে। মেয়েরাও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের শিক্ষার সাথে আদর্শ শিক্ষিকা, আদর্শ ডাক্তার ও নার্স হওয়ার প্রশিক্ষণের সঙ্গে হালকা অস্ত্র ব্যবহার ও অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শী হবে। বৎসরে শুক্‌নো মৌসুমে উত্তম বিনোদন রূপে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কর্মশিবিরও হতে পারে। জাহেলী ও কুফরী সমাজে বর্তমানে নারী পুরুষরা যে মেলা খেলায় ও বনভোজন এবং সিনেমা নাটকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তা দিয়েই নিজেদের ব্যয়েই এ প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। রাষ্ট্রের বা জনগণের রাজস্বের অর্থ তাতে ব্যয় হবে না। নিজেদের ব্যয়ে এ কাজ করলে তাতে প্রত্যেকের অংশিদারীত্ব বা সেন্স অব পার্টিসিপেশনের দায়িত্ব বোধ সবার অন্তরে থাকবে। প্রত্যেকটি ঘর একটি মিনি সেনা শিবির ও মিনি অস্ত্রাগার হবে। বড় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকবে সেনা ছাউনীতে। ব্যক্তিগত এসলটিং রাইফেল প্রত্যেকের ঘরে থাকবে। যেমন অলংকার থাকে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও পৌরুষের অলঙ্কার অস্ত্র। ঈমান, সালাত ও আমলের সাথে ঘরে ঘরে অস্ত্র থাকলে কি বর্তমান সভ্য ও স্বাধীন সমাজ নামের ইতর সমাজে যে ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি ও ধর্ষণ হয়, তা কি কল্পনাও করা যাবে?

বর্তমানে জনগণকে নিরস্ত্র করে খন্ডিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর লুটেরা রাজনীতিকরা তাদের স্বার্থের নিরাপত্তার জন্য বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী তৈরী করে জনগণকে যৌন বিকৃতির বিনোদনে নেশাগ্রস্ত করে শোষণ করছে। সামরিক শাসনের দস্যুবৃত্তি, না হয় ঔপনিবেশিক বর্গীয় শোষণ। এর বাইরে মানব জীবন অকল্পনীয়। রাষ্ট্রীয় সীমানার চার দেয়ালীতে সেনাবাহিনীর বেষ্টনী। দেশীয় আভ্যন্তরীণ শোষণে রাষ্ট্রীয় চোরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী। ঘুষখোর হারামখোর মন্ত্রী পরিষদ, সাংসদ ও আমলাদের নিরাপত্তার ফাঁকে পুলিশের কাজ হলো চোর-ডাকাত ও অপরাধীদের লালন-পালন করে ওদের বখরা দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়া। এ চেইনে নিচ থেকে উপর ওয়ালাকে কে কতো দিবে, তার নিরিখে বদলী ও পোষ্টিং হয়। দেশের জনগণ নিরস্ত্র ভেড়া বকরি। তাদেরকে খানেওয়ালা সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও অপরাধীরা সশস্ত্র। এ কেমনতরো সভ্যতা বা স্বাধীনতা?? সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের চাবিকাঠি এ জনগণকে নিরস্ত্র করায়। জনগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র হলে তা অকল্পনীয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"তোমরা তোমাদের সামর্থের শেষ বিন্দু পর্যন্ত ব্যয় করে আল্লাহ ও তোমাদের চেনা শত্রুদের বিরুদ্ধে, এবং তোমাদের অজানা শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি ও অশ্বশক্তিতে সজ্জিত হয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। যাতে আল্লাহ্‌র শত্রু ও

তোমাদের শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত থাকে। এ সামরিক প্রস্তুতিতে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তা পূরণ করে দিবেন। তা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবেনা।" (আনফাল-৬০)

এখানে আল্লাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গিকার করেছেন। তা হলো আল্লাহর সৈনিক জাতি বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে যা ব্যয় করবে, তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় বলে নামকরণ করেছেন। এখানে বিশেষভাবে বলেছেন যে, জিহাদ ও প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দে যে রাজস্বের ঘাটতি হয়, তার ক্ষতিপূরণে আল্লাহ ভর্তুকী প্রদান করবেন। প্রতিরক্ষা ও জিহাদ ক্ষেত্রে ব্যয়ে আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার ও নির্দেশের পর কি কোনো গোত্র বা শ্রেণীর হাতে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করে কোনো জাতি মুসলিম হতে পারে? কখনো নয়। ঘটনাক্রমে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ্ আফগান জাতির মধ্যে গণঅস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার ঐতিহ্য রাখার ফলে অন্যতম পরাশক্তি আফগানিস্তানে আগ্রাসন করে ফেঁসে যায়। ফলে রাশিয়া ভেঙ্গে যায়। তা না হলে রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করতে পারলে পরের দিন ইন্ডিয়ার সাথে মিলে পাকিস্তান নিয়ে উষ্ণ সাগরে তার নৌবহর গড়ে তুলে চোখের নিমিষে কুয়েত, আমিরাত ও ওমান নিয়ে যেতো। দক্ষিণ ইয়ামেনে কম্যুনিষ্টরা ছিলো। সাদ্দাম ইরাকে রাশিয়ার "ওয়াচ ডগ" ছিলো। সিরিয়ায় আসাদ রাশিয়ান অস্ত্রাগারের পাহারাদার ছিলো। লিবিয়ার কায্‌যাফীও রাশিয়ার কমরেড ছিলো। এ পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে রাশিয়ান ভাল্লুক জালে না আটকালে আরব বিশ্বের বর্তমান শেখ ও বাদশা ফাহাদরা কোথায় থাকতো?

ইসলাম ও রাসূলের আদর্শে গড়ে উঠা মদীনার গণবাহিনীর হাতে তখনকার পরাশক্তি পারস্য ও রোমানদের পরাজয়ের পর উমরের আত্মঘাতি ভুলে বেতনভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য বাহিনী তৈরী না হলে আজ পৃথিবীর মানচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নতরো হতো। বাইতুল মাক্‌দিসে উমর সে দিন ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের তাওহীদের ইমামতি করে যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ্‌দের বর্ণাঢ্য হিযবুল্লাহ ও তার সেনা বাহিনী অটুট রাখলে আর কখনো ক্বোরেশী মুস্তাকবির রাজত্ব কায়েম হয়ে রোম, পারস্য, মিশর ও ভারত জয় করে রাজকুমারীদের বাজারজাত করার এবং পুরুষদের দ্বারা দাসের হাট সমৃদ্ধ করার মতো কলঙ্ক নিয়ে ইসলাম দুর্নামের ভাগি হতো না। ভারতের শাইখুল হিন্দ, মিশরের হাসানুল বান্না, আলজেরিয়ার আব্বাসী মাদানী ও ইরানের খোমেনীরা সাহাবীদের দ্বারা শিয়া-সুন্নী ও মুহাজির-আনসার বিভক্তির পতাকা তোলা পুরাতন মদ নতুন বোতলে পরিবেশনের ভুলে ব্যর্থ হতো না।

ভুল ভুলই। ভুল দিয়ে ভুলের সংশোধন করা যায় না। নবী রাসূলরা অহীর স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় কখনো ভুল করেছেন। আল্লাহ অহী ও জিব্রাঈল আঃ কে পাঠিয়ে পরে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। নবীদের জন্য আল্লাহর এ বিধান ছিলো। নবীদের অনুসারীদের বেলায় এ বিধান অকল্পনীয়। ঈমানদারদের জন্য সর্বকালে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ, "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে অনড় থাকবে, তা না হলে তোমাদের সকল শ্রম পন্ড।" আল্লাহ ও রাসূলের যারা আগে বাড়বে, বা রাসূলের সামনে স্বর চড়িয়ে যারা কথা বলবে, তাদের অজান্তে তাদের সকল আমল শেষ। তিরিশ পারা ক্বোরআন আমাদের জন্য সংরক্ষিত। আমাদের সামনে, ঘরে ঘরে তা মওজুদ। তারপরও রাসূলের মৃত্যুর পর আল্লাহ ও রাসূলের আগে বাড়া, রাসূল সঃ এর সামনে গলা চড়িয়ে বিবাদ করা, অন্যান্যদের মতো রাসূলের সাথে আচরণ করা, মৃত্যুকালে কাগজ-কলম দিতে বাধাদান করা ও মৃত্যুকালে রাসূলের নিয়োগকৃত তাঁর হাতে বাঁধা পতাকাবাহী উসামাহর নেতৃত্ব অমান্য করাও সম্পূর্ণ অবৈধ ক্বোরেশী গোত্রবাদী দু'নেতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খেলাফত নিয়ে আমরা আল্লাহকে আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে ব্যস্ত?! তাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের পূর্বেই সাবধান করে বলে দিয়েছেন, وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

আল্লাহর নাযিল করা সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। তার অর্থ হলো, আল্লাহর নাযিল করা সীমারেখা বুঝার যোগ্যতা এদের কম বা নেই বললেও অত্যুক্তি হবেনা! (সূরা তাওবা-৯৭) আবু বকর ও উমরদের এ সীমাবদ্ধতা ধামাচাপা দিয়ে পরবর্তিতে ইসলামের আলখেল্লায় জাহিলিয়্যাতকে চালু রেখে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা ক্বোরআন ত্যাগ করে আহসানুল হাদীসের বিরুদ্ধে মিথ্যা হাদীস দাঁড় করে তাকে আবার "সহীহ্" নাম দিয়ে তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে মানবজাতিকে অভিশপ্ত ও অভিসম্পাতিত করেছে, সে চক্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে মুক্তির পথ বের করার জন্য এ কলম ধরা হয়েছে। এ পথে সকল বাধা ও ভুল বুঝাবুঝির দেয়ালসমূহ অপসারণ ব্যতীত এর বিরাম হবেনা। ইন্‌শা আল্লাহ।

নবীকুলের পঞ্চরত্ন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা অর্থাৎ প্রথম চারজনের বিদায়ের পর তাদের কারো সাহাবী চক্রের দ্বারা গঠিত খেলাফতচক্র চালু হয়নি। তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু শেষজন, খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর পর ক্বোরআনের

আয়াত দিয়ে চক্র তৈরীর সকল সম্ভাবনা চিরতরে নিষিদ্ধ করার পরও এ বিদআত বা পরবর্তী সকল বিদআতের জন্মদাতা বিদআত্কে কিরূপে দাঁড় ও প্রতিষ্ঠিত করা হলো, তা কি বুঝার সময় এখনো আসেনি? নবী রাসূলদের অনুসারী ইমাম মাহদীর সৈনিকদের বুঝতে হবে যে রাসূল সঃ এর সতর্কবাণী ও ভবিষ্যতবাণীর "ছোট দাজ্জালেরা" অল্‌রেডী এসে গিয়েছে। বড় দাজ্জাল মসীহুদ্দাজ্জাল বস্তুবাদী ভোগবাদী ধনরত্ন, আই,এম,এফ,ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আনবিক বোম্ব, সেক্সবোম্ব, নারী নেতৃত্ব, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তা, মাথা গণনার গণতন্ত্র, চরিত্র ও পরিবার বিধ্বংসী ইন্টারনেট ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যম, আন্তমহাদেশী ক্ষেপনাস্ত্র এবং সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে সুপার-সোনিক অর্থাৎ শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন বাহনে চড়ে ক্লোনিং বিজ্ঞানে প্রতিপ্রাণীর অনুরূপ তৈরীর ক্ষমতা নিয়ে সর্ববিদ্যমানের সর্বত্র বিচরণে বেহেশত-দোজখ নিয়ে আসছে। ওয়াশিংটনে জুডো-খৃষ্টান এ্যান্টি ক্রাইষ্ট মহড়া পূর্ণ করে তৈরী। এর পরিচয় হলো নামে মসীহ কামে দাজ্জাল বা কামে দাজ্জাল নামে মসীহ। অর্থাৎ এক চক্ষু তার। তাকে চিনে বিশ্ব সভ্যতা বাঁচাতে হলে ইহকাল-পরকালের দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ইমাম ও তার অনুসারী চাই। ক্বোরআনের শিক্ষায় সকল নবীদের আদর্শের সমন্বিত ইমাম ও সূরা তওবার "হজ্জে আকবর" দাজ্জাল নিধনের মহাসমাবেশ। দাজ্জাল দৃশ্যতঃ আমেরিকা থেকে আসলেও তার আত্মার ব্যাঙ্ক ইসরাঈলের তেলআবিবে দেখা যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে আরবদ্বীপ ও তার পাশে বসবাসকারী প্রায় বিশকোটি আরব তাদের ভাষায় নাযিল হওয়া ক্বোরআন তাদের মাঝে থাকা সত্বেও বিশ্বে তারা ক্বোরআন ত্যাগকারী মুর্তাদ জাতি। ঐ ভূমির মুস্তাদআফরা তাদের অধুনা মুস্তাকবির নমরূদ, ফিরআউন, আবু জেহল, আবু সুফয়ান, মুয়াবিয়া, ও ইয়াযীদের হাতে পুরাতন যুগের দাসত্বের চেয়েও আষ্টেপৃষ্টে শৃঙ্খলিত। বুঝের এ পর্যায়ে একটি কথা খুব গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখতে হবে যে, আসমানী কিতাবের দাবীদার "আহলে কিতাব" ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান তিনটি জাতির মধ্যেই মুস্তাদআফ রয়েছে। তাদের প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ জাতির মুস্তাকবিররা জিম্মী করে রেখেছে। সত্যিকারের ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী ডাকদিলে এরা সবাই নিজ নিজ তাগুত মুস্তাকবিরদের ত্যাগ করে সত্যিকারের মেসাইয়া, মসীহ ও মাহদির জামাতে যোগ দিবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইয়াহুদী মুস্তাদআফরা শুধুমাত্র ইয়াহুদী মুস্তাকবিরদের হাতে জিম্মী। খৃষ্টান মুস্তাদআফরা খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সম্মিলিত চক্রের হাতে বন্দী। আরব ভূমির নব্য যায়েদ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহরা ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আরব শাসক সম্মিলিত মুস্তাবিরদের লৌহ যিন্দানে আবদ্ধ। পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিম জনতা ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও তাদের পোষ্য সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক বর্গীদের শোষণের যোগানদার। ভারতের আশি কোটি মুস্তাদআফ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ব্রাহ্মন্য বর্নবাদী নিপীড়নের শিকার। তারা জুডো-খৃষ্টান চক্রের চেয়েও নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা পিষ্ট। পূর্বে তারা আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের আরবী বর্বরতা ও তাদের প্রেতাত্মা মুঘল পাঠান মুস্তাকবিরদের হাতে দীর্ঘ আটশ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় নির্যাতিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মুস্তাদআফ্দের অবস্থা আরো করুণ। তারা রাজ্যজয়ী দস্যুদের হাতে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়নি। আরব মরুর দস্যুদের হাত থেকে ঈমান ও প্রাণ বাঁচিয়ে দেশ ত্যাগ করে বাংলা মুলুকে আসা দরিদ্র শেখ ও ইসলাম প্রচারকদের হাতে ইসলাম কবুলকারী খাঁটি মুসলিমরা বর্তমান বাঙ্গালী মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ। পশ্চিম থেকে আগত ঐ সমস্ত শেখ ও সূফীরা তাদের নিজ দেশে মুস্তাদআফ শ্রেণীর লোক ছিলো। তাদের জীবনাদর্শ রাসূল সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফ অনুসারী যায়দ, বিলালদের অনুরূপ সাদা সিধা সাম্যবাদী ছিলো। ফলে ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী বৈষম্যের সমাজে এদের ঈমানী জীবনের প্রতিফলন ঘটে এবং দলে দলে নির্যাতিত দলিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগুরু হয়ে যায়। এরা নিজগুনে ও শ্রমে জমি-জমা আবাদ ও চাষ করে সচ্ছল হালালভোগী মুসলিম সমাজের পত্তন করে পূর্ব বাংলায়। পশ্চিম বাংলায় মোঘলাই বিকৃত ইসলাম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাই সেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়ে যায়। তাদের উপর আলীবর্দী খাঁ ও সিরাজুদ্দৌলাদের মতো মুসলিম নামের কলঙ্কদের শাসন আল্লাহ ও রাসূলের দ্বীনকে আরো কলঙ্কিত করে। ঘরের শত্রু বিভীষণ, মীর জাফরকে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা শিয়া দুষ্টক্ষত সিরাজুদ্দৌলাদের উৎখাত ও নির্মূল করেন। ওদের পাপে বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের উপর নেমে আসে সাত সমুদ্রপাড়ের বেনিয়া ফিরিঙ্গি হার্মাদদের দুঃস্বপ্নময় শাসন। ফিরিঙ্গীরা এ দেশে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যেকে পাকাপোক্ত করার জন্য ভারতীয় ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের সাথে আঁতাত করে বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের আবাদ করা চাষাবাদের জমি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে তাদের জমি জমা হুকুমদখল করে হিন্দুদের জমিদার বানিয়ে দেয়। ফলে পূর্ব বাংলা, যা বর্তমানে বাংলাদেশ, তার সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা

জমিহারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। তারপর শুরু হয় বাংলার ইসলামী সাম্যের অনুসারী মুসলিম সমাজের উপর হিন্দু জমিদারদের বৈষম্যের শাসন শোষণের দু'শ বছরের নিপীড়ন। কৃষি প্রধান নয়, কৃষি সর্বস্ব বাঙ্গালী মুসলিমরা রাতারাতি জমির মালিক থেকে বাবুদের স্বেচ্ছাচারের প্রজা হয়ে যায়। রাসূল সঃ এর বর্ণিত এক ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখা যায় যে পূর্বের এক حارث الحراث হারিসুল হাররাস, অর্থাৎ কৃষিসর্বস্ব এক দেশ থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি, المنصور ইমামতের পতাকা উত্তোলন করবে। কৃষিকর্ম করে যারা খায়, তারা ভূপৃষ্ঠে সর্বোত্তম হালাল ভোগী। নবীদের কাজ সমাধাকারীদের প্রথম গুনই হবে, তারা হালাল ভোগী হবে। রাসূল সঃ বলেছেন, "যারা নিজ হাতে উৎপন্ন করে আহার গ্রহণ করে, আমি তাদের ঈর্ষা করি। আমি যদি স্বহস্তে উৎপন্ন করে খেতে পারতাম! আমার ভাই দাউদ নিজ হাতে উৎপন্ন করে খেতেন।"

হিমালয়ের বন্যায় পলিতে ভরাট বাংলার মাটির মতো উর্বর পবিত্র মাটি এবং তার উপর বাসকারী আবাদকারী একেশ্বরবাদী তাওহীদী মুসলিমরা ন্যায় ও শান্তিপ্রিয় মানবসমষ্টি এক অভিন্ন জাতি হিসেবে বাস করতো। এদের মধ্যে আরবী মুসলমান ও তাদের বিজিত এলাকার মুসলমানদের মতো জাতপাতের ব্যাধি ছিলোনা। ভারত ও পাকিস্তানে সাইয়েদ, পাঠান, মুঘল, সিদ্দিকী, ফারুকী, রাজপুত প্রভৃতির ব্যাধি এতো মারাত্মক যে এদের মুসলিম বললে ইসলামের অবমাননা ও অপব্যাখ্যা হয়। একমাত্র ক্বোরেশী রোগের সাথে এদের তুলনা হয়। এরা আবু সুফয়ান, আব্বাস ও মুয়াবিয়াদের মতো আগ্রাসী শক্তির হাতে পরাজিত হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে মুসলমান হয়ে কুফরী অবস্থার সকল জাত পাতের পার্থক্য ও বিদ্বেষ শুধু জিইয়েই রাখেনি, বরং তার সাথে আরো নতুন নতুন জাতিভেদের জন্ম দিয়েছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ পাকিস্তান হওয়ার পর ভারতের ঐ সমস্ত এলাকার লোকেরা মুহাজির নামে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলায় এসে এ সমাজেও তার কিছু বিষ ছড়িয়ে যায়। বাংলায় ক্বরবরপূজা, পীরপূজা ও মাযারপূজার প্রচলন পূর্বে তেমন ছিলো না। কিন্তু ঐ ব্যাধিগ্রস্ত লোকগুলো এসে এ সমাজকেও তারা নানা প্রকার শির্কে আক্রান্ত করে যায়। বাংলাদেশ হওয়ার পর এদেশে ওদের ফেলে যাওয়া শির্কের বীজ বহু শির্কের প্রসার ঘটিয়েছে। মুশরিক মুসলমান ও ওদের দেবদেবীর পূজারী কাফেরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তো নেই বরং কুফর থেকে সরাসরি তাওহীদে আসা যতো সহজ ও সম্ভব, শির্ক থেকে ইসলামে প্রবেশ ততো কঠিন। যেমনটি মক্কার ক্বোরেশ ও অন্যান্য মুশ্‌রিকদের অবস্থা ছিলো। মদীনার কাফেররা তাওহীদের নবীর আগমনের খবর পেয়ে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলো, যা মক্কার মুশরিকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

উপরে উল্লেখিত তথ্যে আমার দ্ব্যর্থহীন অভিমত হলো যে জিন্নার মতো কুটিল মুসলমানদের নেতৃত্বে পাকিস্তান হয়ে পূর্ব বাংলায় ঈমান ও ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ঐভাবে ভারতভাগ না হয়ে ইংরেজ বিতাড়িত হলে সম্মিলিত বা অখন্ড ভারতে সত্যিকার সাম্যবাদের ইসলামী উত্থানের নেতৃত্ব দিতো বাংলার জাত-পাতহীন ও শির্কমুক্ত মুসলিম নেতৃত্ব, যেমন ১৯০৫ সালে মুসলিম লীগের জন্ম ঢাকায় হয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। আমার এ কথা বলতেও দ্বিধা নেই যে, যে শেখ মুজিবরা জিন্নার নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে পঁচা পচেছিলো, পাকিস্তান না হলে তাদের সে পচন ধরতো না। অখন্ড ভারতে দিল্লী কেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মুজিবরা তাদের পূর্ব পুরুষের শেখ নামের তাৎপর্য খুঁজে পেয়ে খাঁটি মুসলিম হয়ে রাসূল সঃ এর ভবিষ্যদ্বাণীর "গাযওতুল্ হিন্দ" বা ভারত অভিযানের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতো। সুযোগ সন্ধানী হয়ে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিন্‌কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান" ও পাকিস্তান যিন্দাবাদ বলে ২২ পরিবারের লুটপাটের পাকিস্তান বানিয়ে তাদের কারো বীমা কোম্পানীর দালালী করে পরে আবার জয় বাংলা বলে সে পাকিস্তান ভেঙ্গে ২২ হাজার কোটিপতি লুটেরার বাংলাদেশ বানিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতোনা। তার মেয়েটিও আজ ইসলামের প্রদত্ত পারিবারিক ভূস্বর্গ স্বামীর সংসার গড়ার কাজ বাদ দিয়ে মা আয়শার ভুলের দৃষ্টান্তে নূহ ও লুতের স্ত্রীদের পরিণামের পথ বেছে নিয়ে ক্বিয়ামতের আলামত হতোনা। আল্লাহর ভাষায় ক্বোরআনে প্রশংসিত ফেরআউনের স্ত্রী বা বিবি মারইয়ামের মহিমার পথ বেছে নিতো। আল্লাহর বিধানে যে নরনারী একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, সে ক্বেয়ামত পর্যন্ত সে দৃষ্টান্ত অনুসারীদের সওয়াব বা পূণ্য পাবে। আর যারা আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করার দৃষ্টান্ত দাঁড় করায়, ক্বেয়ামত পর্যন্ত সে সে পাপের অনুসারীদের পাপের পূর্ণ যোগফল নিজের নামে জমাকৃত পাবে। مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا (নিসা-৮৫)

একথা ঈমানদার নরনারীদের জন্য লেখা হচ্ছে। বেঈমান পশু পাশবীদের জন্য লেখা হচ্ছেনা। তাই তোমরা আমার লেখা পড়ে ভ্রুকুটি করে সময় নষ্ট করোনা। বিরতিহীন পাপ করে তোমরা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকো। আমি ক্বোরআনী ঈমানে দিব্যদৃষ্টান্ত দেখে লিখছি। সে দৃষ্টি তোমাদের নেই। যারা পার্থিব জীবনে পরকাল সম্পর্কে অন্ধ, পরকালে তারা আরো অন্ধ বা বিভ্রান্ত হবে। وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (বনী ইসরাঈল-৭২)

পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব বাংলার মুসলিম মুস্তাদআফরা জুডো-খৃষ্টান দাজ্জাল ও তাদের দেশীয় পাঞ্জাবী, বিহারী, ইউপি ও সিপি থেকে আগত নব্য মুস্তাকবির ও তাদের বাঙ্গালী বাফুনদের দ্বারা প্রতারিত ও শোষিত হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর এখন পূর্ব বাংলার মুসলিমরা ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার দো'রাস্তার মুখে দন্ডায়মান। একপথ জুডো-খৃষ্টান দাজ্জালের বিশ্ববাদের বেশ্যায়ন, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য মূর্তিবাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক আগ্রাসন এবং তাদের সৃষ্ট মূর্তিবাহিনী ও ফুর্তিবাহিনীর লুটপাট। মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের নামে এদের জন্ম। দ্বিতীয় পথ হলো গায্ওয়াতুল হিন্দ, ভারত মুক্তির আন্দোলনে অগ্রণী হওয়া।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী দাজ্জালের পরীক্ষার মুখে পূর্ব বাংলার শেখের বাচ্চা মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। তৃতীয় কোনো পথ তাদের সামনে খোলা ছিলোনা। এক পথ পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার, আরেক পথ পাকিস্তান ভাঙ্গার। রাখার ও ভাঙ্গার উভয় পক্ষেই তিন শ্রেণীর লোক ছিলো।

পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলো কিছু প্রকৃত ঈমানদার মুক্তি পাগল, কিছু রেজাকার আলবদর নামে "রোজগার বাহিনী" ও বাদবাকি লুটপাটের ফুর্তি বাহিনী। পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে কিছু সত্যিকার মুক্তিপাগল বিবেকবান মানুষ, কিছু ঈমানহীন মূর্তি বাহিনী ও বাদবাকি ফুর্তি বাহিনী ছিলো।

ইসলাম তথা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে রক্ষার জন্য কিছু লোক পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা আবশ্যক মনে করে যে শান্তির প্রচেষ্টা করেছিলো, তারা অবশ্যই বর্তমান ভারতীয় আধিপত্যবাদ আঁচ করতে পেরে তখন তা করেছিলো। এরা অবশ্যই তাদের অবস্থানে মুক্তিকামী মুক্তিবাহিনী ছিলো। তারা কোনো অবস্থাতেই রাজনৈতিক ফায়দা লুটকারী নিন্দনীয় রেজাকার আলবদর ছিলোনা। দ্বিতীয় শ্রেণী সুযোগসন্ধানী স্বার্থশিকারী ছিলো। ধর্মকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছার জন্য তারা সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে ময়দানে নেমেছিলো। তৃতীয় শ্রেণী ছিলো ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের নির্লজ্জ ফুর্তিবাহিনী। প্রথম শ্রেণী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে আদর্শবাদী ছিলো। সংখ্যায় তারা কম হলেও নগণ্য ছিলোনা। এরা ত্যাগী আদর্শবাদী ছিলো। এ শ্রেণীর লোক প্রত্যেক সমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ। যে সমাজ ও জাতি এদের সঠিক মূল্যায়ন করে, তারা সফল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিলো, বলা চলে, ধর্মবেসাতী নির্লজ্জ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থপরায়ণ শ্রেণী। এদের সংখ্যা অনেক। এদের নেতারা জনগণের দুর্বলতার দিকগুলো চিহ্নিত করে তা, তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। এরা মূলতঃ সমাজ ও জাতির নিকৃষ্টতম কুৎসিত ব্যক্তিবর্গ। মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামের সুযোগ সন্ধানী নেতৃত্ব এর দৃষ্টান্ত। এরা এদের রাজনৈতিক ব্যর্থতায় নিশ্চিত ছিলো যে জনগণের সমর্থন নিয়ে তারা কখনো ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হবেনা। তাই সাম্প্রাদায়িকতা ও ধর্মের ব্যানার ঝুলিয়ে দেশের কোমলমতি যুবশ্রেণীকে তাদের স্বার্থের বলিরূপে ব্যবহার করতে, ওদের জান, মাল ও মা বোনের মান ইজ্জতও নিলাম করতেও এরা কুণ্ঠাবোধ করেনি। ধর্মকেও এদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে বলে এরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। তৃতীয় শ্রেণী সমাজের ভাসমান ইতর শ্রেণী। এদের কোনো ধর্ম, জাত, দল বা আদর্শ নেই। যখন যেমন সুযোগ পায়, তা থেকে ফায়দা লুটার জন্য প্রয়োজনীয় রূপ ধারণ করে তৎপর হয়ে যায়। এদেরই ফুর্তি বাহিনী নামকরণ করেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাথে এদের স্বার্থের মিল থাকায় এরা পরস্পর সম্পূরক। সমাজকে মুক্ত ও সুস্থরূপে গড়তে পরগাছার মতো এদের নির্মূল করা অপরিহার্য। এ দু'শ্রেণী মিলে সমাজকে ঘুণের মতো নিঃশেষ করে ফেলেছে। প্রথম শ্রেণী এদের নির্লজ্জ বিচরণে স্বীয় মান ঈমান রক্ষার্থে ঘরবসা হয়ে যায়। যে জাতি উঠতে চায়, তাদের প্রথম কাজ হলো এদের খুঁজে বের করে তাদের পেছনে প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

এবার ৭১ এর স্বাধীনতার পক্ষীয়দের বিশ্লেষণে আসা যাক। পাকিস্তান যে ধর্মীয় আদর্শ ও সামাজিক ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তা পাকিস্তানী মুস্তাকবির শাসকশ্রেণী, শোষক সেনাবাহিনী ও তাদের আমলা শ্রেণী একদিনের জন্যও হতে দেয়নি। প্রতিক্ষেত্রে বেঈমানী ও বৈষম্যে পূর্ব বাংলার বঞ্চিত মানুষ ধুঁকে ধুঁকে

মরছিলো। তার উপর ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খাঁর লুচ্চালম্পট সেনাবাহিনীর পৈশাচিক কান্ডে দেশবাসী বজ্রাহত হয়। কিংকর্তব্য বিমূঢ় জাতির বিবেকমান শ্রেণীর অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রথমে স্বীয় জানমাল ও পরিবারবর্গের মান-ইজ্জত রক্ষার্থে ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়। সমাজে তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকায় তারা পাকিস্তান সৃষ্টির মূলআদর্শ বিরোধী চক্রের সাথে মিশে যায়। তা ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ ছিলোনা। ধর্ম নিরপেক্ষ, ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহী রাজনৈতিক শিবিরেও ব্যক্তি চরিত্র ও বিশ্বাসী জীবনে কিছুসংখ্যক ঈমানদার লোক ছিলো। যেমন ছিলো বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর মাঝেও। কিন্তু মূল নেতৃত্ব ভারতীয় রামরাজ্যের কালী, ইন্দিরা দেবীর আঁচলে বাঁধা মূর্তিবাহিনীর হাতে ছিলো বলে ভারত থেকে বৃটিশ তাড়ানোর আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য মাওলানা আবুল কালাম, নামের সাথে আযাদ যোগ দিয়ে যেমন গান্ধী নেহেরুর দলে চলে যায়, তদরূপ আমাদের মৌলবী আব্দুস সামাদ ও মুশতাকরা নামের সাথে আযাদ যোগ দিয়ে মূর্তিবাহিনীর সাথে একাকার হয়ে যায়। তাছাড়া হয়তো তাদের কোনো উপায় ছিলো না। পাকিস্তানী দুঃশাসন থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিম সত্তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঁচার মুক্তি সংগ্রামে যোগদানকারীরা তাদের সংখ্যালঘুতার কারণে পানিতে লবণ মিশার মতো মিলিয়ে যায় সংখ্যাগুরু ভারতীয় আর্শীবাদপুষ্ট মূর্তি বাহিনীর মহাগঙ্গায়। এখানেও বিরাট সংখ্যক ফুর্তিবাহিনী তাদের লুটপাট ও ধর্ষণের স্বার্থে তৃতীয় শক্তি রূপে যোগ হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর মূর্তিবাহিনী ও ফুর্তীবাহিনী এক হয়ে যায়। আসল মুক্তিকামী লোকেরা এদের কনুইর গুতায় ছিটকে পড়ে, "বিস্মৃত সৈনিক" এর স্মৃতিসৌধে হারিয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছিলো মুসলিম উম্মাহর আদর্শ পিতা ইব্রাহীম ও বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সঃ দের আদর্শের মক্কা ও মাদীনার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য । সে সংগ্রামে মদীনবাসীর মতো পূর্ববাংলার মুসলিমদের দান ছিলো শতকরা ৯৭। পাঞ্জাবীদের অংশিদারীত্ব ছিলো মাত্র শতকরা ৫১ ভাগ। অর্থাৎ দেড় শতাংশ কম হলেই আর পশ্চিম পাকিস্তান, পাকিস্তান হতো না। কিন্তু চেতনাহীনতা, না ভাগ্যের পরিহাস যে মদীনায় ঘটা সে ভুল এখানেও ঘটে গেলো? আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের মতো এ ক্ষেত্রেও মুহাজির নামের কুলাঙ্গাররা পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসে তাকে আবু সুফয়ান, মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদদের মূলে ঠেলে দেয়?!

আল্লাহর দ্বীন পেটে-ভাতে বৈষম্যহীন সাম্যের। যতো পেট ততো রুটি। মর্যাদার তাক্বওয়া ব্যতীত কোনো মানদন্ড নেই। তার বাইরে যারাই অন্য মানদন্ড দাঁড় করাবে, তাদের মৃত্যু অনিবার্য। হোক না তারা ইব্রাহীম আঃ এর বংশধরের দাবীদার ইয়াহুদী বা খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সঃ এর বংশের দাবীদার ক্বোরেশী আবু বকর ও উমররা! কোনো অব্যাহতি বা ব্যতিক্রম নেই। এটাই সুন্নাতুল্লাহ, আল্লাহর অমোঘ বিধান। উমরদের "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর সংকীর্ণ ধারায় বিশ্ব মুসলিম গণবাহিনী একটি গোত্র বিশেষের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পরিবর্তে নব্য আরব্য সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। জেরুজালেমে নবীদের ঐক্যবদ্ধ তাওহীদের জামাত না হওয়ায় তিন জাতি, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আরব মুসলমানের দ্বন্দ্বের ত্রিশূল গ্রথিত হয়ে মানব জাতির বুকের রক্ত আজো ঝরছে। অথচ জেরুজালেম সে জায়গাটি, যেখানে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে মক্কার কা'বা থেকে নিয়ে মেরাজের পথে মসজিদুল আক্বসায় নিয়ে উঠান। সেখানে তাঁকে দিয়ে নবীদের জামাত করে তাতে ইমামতির মাধ্যমে সকল নবীদের একমাত্র উম্মত "ইসলামী উম্মাহর" প্রতীকী অভিষেক করান। ক্বোরআনে আবার তাকে স্পষ্ট উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন, "এ হলো তোমাদের ও আমার নবীদের একক উম্মত। আমি তোমাদের সকলের প্রতিপালক। অতএব, একমাত্র আমাকে ভয় করবে ও আমার দাসত্ব করবে।" এ আয়াতটি ক্বোরআনে আল্লাহ দু'জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা মু'মিনুনে। وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

(সূরা আম্বিয়া-৯২, মুমিনুন-৫২) ক্বোরআনের বর্ণনা, রাসূলের রিসালাত ও তাঁর মেরাজের শিক্ষা যারা বুঝেনি, বা বুঝে থাকলেও তা তারা পালন করেনি, তাদের ব্যাপারে আমরা কি মতামত পোষণ করবো?

ইসলামে রাষ্ট্রীয় ভান্ডারের ভাতা বন্টনে সমতা অলঙ্ঘনীয়। বাইতুলমালের বন্টনে কোনো বৈষম্য চলবেনা। রাসূল সঃ বাইতুল মাল বন্টনে সে নীতি আমল করে সকল বিশ্ববাসীদের জন্য অবশ্যকরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে যান। বাইতুল মাল বন্টনে বৈষম্য করলে যেমন ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য নষ্ট হয়, তেমনি রাষ্ট্রের পৌরহিত্বে সমাজের এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ জমার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। যারা রাষ্ট্রীয় অনুদান ভোগ না করে নিজেদের স্বাধীন ব্যবসা ও শ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ করে, তারা তাদের আয়ের খুমস্ ও মূলধনের যাকাত আদায়ের পর তাদের সম্পদ অনুযায়ী বৈধ আয়-ব্যয়ের জীবন যাপন করবে। যেখানে রাষ্ট্রের কোনো বাধা-নিষেধ প্রয়োগের অধিকার নেই। কিন্তু যারা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে জড়িত

এবং রাষ্ট্রের ভাতার উপর নির্ভরশীল, তাদের মাঝে সম্পদ বন্টনে রাসূল সঃ সাম্যতা বিধান করে যান। তার পর আবু বকর, ক্বোরেশী মুহাজির রূপে ক্ষমতায় বসলেও সম্পদ বন্টনে রাসূল সঃ এর আচরিত নিয়ম পালন করে যায়। উমর ক্ষমতায় বসে তাতে আমূল পরিবর্তন আনে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও। হিজরত ও রাসূল সঃ এর সাহচর্যে, পুরাতন ও নতুন, দূর ও নৈকট্যের বিচারে বায়তুল মাল বন্টন আরম্ভ করে। তার দশ বছরের দীর্ঘ শাসনে এরই ফলে এক শ্রেণী, বিশেষ করে আশারায়ে মুবাশ্শারা ধরনের লোকদের জীবনে প্রাচুর্য ও সম্পদ জমার মন্দ ফল প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। শ্রেণী বিভাগের লক্ষণ ফুটে উঠে। উমর তার শাসনের শেষ দিনগুলিতে তার মন্দফল বুঝতে পেরে নিজের ভুলে আক্ষেপ করে বলেছে, "যদি বিগত দিনকে ফেরৎ আনা যেতো, তাহলে আমি তাই করতাম। সম্পদ বন্টনে সাম্য এনে যাদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ জমা হয়েছে, তা বাজেয়াপ্ত করতাম।" উমর তা করার ঘোষণাও দিয়েছিলো। কিন্তু দারিদ্র্যের পর বাড়তি ভোগের মজা যাদের জিভ ও জীবনে লেগে যায়, তারা তা হতে দেয়নি। সে ভাবেই কুচক্রী মুগিরার ইরানী দাসের হাতে উমরের জীবনাবাসন ঘটে বলে আমার বিশ্বাস। পরে ওসমান, তালহা, যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবন আউফ প্রভৃতির হাতে মিলিয়নকে মিলিয়ন দিনার ও দিরহাম জমার কারণ উমরের হাতে বৈষম্য মূলক সম্পদ বন্টন থেকে শুরু হয়ে ওসমানের আমলে তা বন্যার রূপ ধারণ করে। তাতেই বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো রাসূল সঃ এর কৃচ্ছতার আদর্শ ভেসে গিয়ে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ভোগ বিলাসকেও হার মানানো ক্বোরেশী ইমামতের ইতিহাস রচিত হয়।

"আল হা-কুমুত্তাকাসুর" ও "ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাযাতিল্লুমাযাহ্" এ সূরার কঠোর সতর্কবাণী যারা সালাতে প্রতিনিয়ত পড়তো বলে মনে করা হয়, তারা সম্পদ জমার মতো অভিশপ্ত কাজে কি করে লিপ্ত হয়েছিলো, এ প্রশ্নের জবাব কে দিবে? তারা কি ক্বোরআন বুঝতো না, না তাতে বিশ্বাস করতো না! রাসূল সঃ যখন মৃত্যুকালে তাঁর বর্ম ঋণের দায়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখে যান, তখন উসমান ও আব্দুর রহমান ইবন আউফরা গণী ও ধনী হয়ে থাকলে তারা কোথা ছিলো? ইয়াহুদীর কাছে তাঁর বন্ধক রাখার পরিস্থিতিই বা কিরূপে সৃষ্টি হয়!?

এক্ষেত্রে আরেকটি তাক্ লাগানো তথ্য আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। রাসূলের প্রতি প্রথম ঈমান আনা লোকদের মধ্যে বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ ও আবু যাররাও ছিলো। তাদের কারো কাছে সম্পদ জমা হয়ে তো তাদের পদস্খলন ঘটাতে পারেনি!

তাতে যে ক্বোরেশী অভিজাতদের চেয়ে তাদের ঈমান ও আমলের মান উন্নততরো প্রমাণ হয়, তা কি অস্বীকার করার সাধ্য কারো আছে? তাই মুস্তাদআফদের নেতৃত্বকে যারা উৎখাত করেছে, তারা সবাই মুসলিম উম্মাহর পতন ঘটিয়েছে বলা যায় না?

বিধান ইসলাম এয়ারটাইট বেলুনের মতো নিশ্ছিদ্র। তাতে সূচের ছিদ্রও সর্বনাশ ডেকে আনে। এ বাতাস বেরিয়ে সর্বনাশ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ ক্বোরআনের আয়াত নাযিল করে আবু বকর ও উমরদের সতর্ক করে দিয়েছেন আগে ভাগেই। "তোমরা শুধু আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকবে। খবরদার! নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবেনা। তা হলে শক্তির উৎস কেটে যাবে এবং তোমাদের চাকার বাতাস বের হয়ে যাবে। সাবধান! দৃঢ় থাকবে। অবশ্যই স্মরণ করবে যে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী।" وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (সূরা আনফাল-৪৬) **এগুলো কাদের জন্য ক্বোরআনে বলা হয়েছে? আবু বকর ও উমরদের বাদ দিয়ে মুস্তাদআফদের জন্য, না দেড় হাযার বছর পর আমাদের জন্য? মুহাদ্দিস মুফাসসিররা জবাব দিবে কি? নিজেরা বিবাদ করে ইচ্ছে মতো খেলাফত ক্বায়েম করে, তাকে ক্বোরেশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পুনঃ তাকে তিরিশ বছরের মাথায় ঝাড়ুমেরে তাড়িয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে এখনো আল্লাহ ও রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার নেককাম বলে চালাতে চাইলে কিন্তু দুর্ভোগ আছে। আল্লাহ ও রাসূলের নামে মিথ্যা প্রচারকারী কাকেও ছাড়া হবে না। ইন্শাআল্লাহ। জেনে রাখবে যে অজ্ঞতার ক্ষমা আছে। হঠকারীতা ও একগুয়েমীর ক্ষমা নেই। আবু বকর উমরদের মরু চরিত্রের নবদীক্ষা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহই ক্বোরআনে আমাদের সূরা তওবা নাযিল করে বলে দিয়েছেন। তার ভুলব্যাখ্যা করে আর মানব জাতিকে বিভ্রান্ত করলে কাকেও ছাড়া হবেনা। ক্বেয়ামতের দিন ক্বোরআনে বর্ণিত ও রাসূল সঃ কর্তৃক সাবধানকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে হয়তো আবু বকর ও উমররা মাফ পেয়ে যাবে। আমরা**

তোমরা তো আর তা পাবো না! কারণ আমরা ১৪০০ বছর যাবৎ পূর্ণ ক্বোরআন ধারণকারী পুরাতন ও আদি মুসলিমদের দাবিদার!

জোশ ও ভাবের মানুষ উমর তার সমসাময়িক মানুষদের বুঝতো। তাই চাবুক নিয়ে ঘুরতো। এদিক ওদিক করা কাকেও পেলেই দু'ঘা লাগিয়ে দিতো। দেখা যায় কখনো নিজে ভুল করলে নিজেকেই দু'চার ঘা বসিয়ে দিতো। এটা একটি ব্যক্তির স্বভাব হতে পারে। ইসলামের সাধারণ নিয়মে তার কোনো স্থান নেই। তা হলে রাসূল সঃ নিজেই তা করে দেখিয়ে যেতেন। আল্লাহর শরীয়তের বিধান, মদ্যপান করলে আশি চাবুক এবং অবিবাহিত নারী পুরুষ ব্যভিচার করলে একশ চাবুক। কোনো অপরাধীকে ত্রিশ চল্লিশ ঘা মারার পর তার মৃত্যু হলে মৃতদেহ বা কবরের উপর বাকি চাবুক মারার কোনো নিয়ম ইসলামে নেই। উমর তাই করেছে বলে জানা যায়। তা কোনোক্রমেই ইসলাম সম্মত নয়। এক ব্যক্তির ভাব ও উচ্ছাসের প্রকাশ হতে পারে।

এভাবে উমরের যুগ কেটে যায়। মুয়াবিয়া, মুগীরা ও আমর ইবনুল আসদের চাবুক মেরে নিয়ন্ত্রণে রেখে নরম গরম সংমিশ্রণের এক অদ্ভুত শাসন চালিয়ে যায় উমর। এক ঘাতকের ছুরি আঘাত করে উমরকে। উমর বুঝতে পারে যে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। তাই উমর আবু বকরের ন্যায় পরবর্তী নির্বাচনের দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না নিয়ে ক্বোরেশদেরই ছ'ব্যক্তির এক প্যানেল তৈরী করে যায়। তাতে কোনো মদীনাবাসী আনসারও নেই, কোনো মুস্তাদআফও নেই। এ কেমন তরো শুরা? আল্লাহ বলছেন "মুমিনদের কার্য তাদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে স্থির হবে। وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (সূরা শূরা-৩৮) ঈমানদার বলতে কি উমররা শুধু ক্বোরেশীদেরই ধরে নিয়েছিলো? আনসার ও অন্যরা কি মুসলিম ছিলো না? তার মধ্যেও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার ছিলো যে উমরের নিয়োগকৃত ছ'জন ভাগ্য বিধাতার মধ্যে আলী একা ব্যতীত বনী হাশেমের আর কেউ ছিলো না। তাতে নিশ্চিত ছিলো যে আলী কোনো ক্রমেই পরবর্তী খলিফা হতে পারবেনা। ফলে আলী বিরোধীচক্র থেকেই পরবর্তী খলিফা হলো ওসমান। উক্বা, যাকে রাসূল সঃ বদরের যুদ্ধের পর পথিমধ্যে প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন, তার মেয়ে, ওসমানের সতালো বোনের স্বামী আব্দুর রহমান ইবন আউফের আরোপিত শর্তানুযায়ী ওসমান খলিফা হলো। ওসমান উমাইয়া বংশের। পরবর্তী উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্থপতি বলা চলে ওসমানকে। আলে আবু সুফ্য়ান ও আলে মারওয়ানকে উসমান এমন ভাবে ক্ষমতায় বসিয়ে যায় যে আলী আর ক্ষমতায় বসতেই পারেনি।

আলীর পক্ষে আব্দুর রহমান ইবন আউফের আরোপিত শর্ত কোনো অবস্থায়ই মেনে নেয়া সম্ভব ছিলোনা। কারণ তা সম্পূর্ণ ক্বোরআনের পরিপন্থী ছিলো। ক্বোরআনের নির্দেশ হলো, তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করবে। তার বাইরে নয়। তা হলে তোমাদের সারা জীবনের কামাই, আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩) ইব্ন আউফ সম্পূর্ণ ক্বোরআন বর্জিতভাবে পরবর্তী খলিফার জন্য শর্ত আরোপ করেছিলো যে, তাকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর আবু বকর ও উমরের সুন্নত মতো রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন! এ কি করে সম্ভব? তাই আলী তার জীবনে রাসূল সঃ এর এবং ক্বোরআনের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী বলে দিলো, أما كتاب الله وسنة رسول الله فنعم واما سنة أبوبكر و عمر فلا

আল্লাহর ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী খেলাফত পরিচালনার জন্য শপথ নিতে পারি। কিন্তু আবু বকর ও উমরের সুন্নাহ বলে কিছু নেই, তাই তা মানতে আমি রাজী নই। (দেখো, আল্ ইমামাহ্ ওয়াস্ সিয়াসাহ, পৃঃ ৩০, ৩১, ইব্ন কুতাইবাহ্)। এ পাতানো খেলায় আলী বাদ পড়ে গেলো। ওসমান আল্লাহ, রাসূল সঃ, আবু বকর ও উমরসহ সবার আদর্শ মানার কথা বলে ক্ষমতায় বসে তার নিজের সুন্নত ও বনু উমাইয়ার সুন্নাত ছাড়া কিছুই মানেনি। রাসূল সঃ এর বিতাড়িত, অভিশপ্ত ও হত্যার আদেশ দেয়া প্রত্যেক বনী উমাইয়ার পাষন্ড ও পাপীদের এনে মুসলিম উম্মার ঘাড়ে তলওয়ার হাতে বসিয়ে দেয়। ফলে এদের দৌরাত্মে মুসলিম বিশ্বের আনাচ কানাচে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হলে তাতে ওসমান নিহত হয়।

নিজের ভাগে তালগাছ রাখার নির্লজ্জ পাপে রাসূল সঃ এর আদর্শের বাঁধভেঙ্গে আল্লাহর গযবের মহাপ্লাবনে যখন সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়, তখন তাকে হালাল করার জন্য বনী ইসরাঈলের পাপের আরব প্রেতাত্মারা রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা হাদীস দাঁড় করায় যে, রাসূল সঃ বলেছেন যে, "উমর সকল ফিতনার বিরুদ্ধে বাঁধ স্বরূপ। উমরের পরে তোমরা দেখবে যে, সব দিকে ফিত্না আর ফিতনা" ইত্যাদি মিথ্যার ঝুড়ি! নিঃস্বার্থ সরলমনা মোটাবুদ্ধির উমর যেহেতু

চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে অবাধ্যতার স্বজাতিকে শক্ত হাতে দমন করে গিয়েছে, তাই উমরের প্রকৃতির সাথে মিল রেখে হাদ্দাসানা, হাদ্দাসানা বলে হাদীস দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মিথ্যুকদের স্মৃতিশক্তি থাকে না। তা না হলে ঐ মিথ্যুকরা ঐরূপ মিথ্যা হাদীস বানাতে লজ্জা পেতো। কারণ আল্লাহ্ তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মাদ সঃ তাঁর অনুসারীদের সাথে তাঁর রাসূলের নামে বিশেষ করে নাযিল করা সূরা মুহাম্মাদেই ওয়াদা করেছেন, তোমরা আল্লাাহকে সাহায্য করলে আল্লাাহ ও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের অবস্থানকে এতো দৃঢ় করবেন যে তোমাদের কেউ উৎখাত করতে সক্ষম হবেনা।" (সূরা মুহাম্মাদ-৭) বিদায় হজ্বে রাসূল সঃ লক্ষ লোকের সমাবেশে বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর ক্বোরআন ও আমার সুন্নাহকে ধারণ করে থাকলে কখনো তোমরা পথহারা হবেনা।" যদি উমরকে দিয়েই আল্লাহ সকল বিপদ-বালাইর বিরুদ্ধে বাঁধ দিবেন, উমর নামের সে বান্দাটি চলে গেলে আল্লাহর কালাম ও রাসূলের শিক্ষা কিছুই আর পতন ঠেকাতে পারবেনা, তাহলে সে আল্লাহ, রাসূল ও ক্বোরআনের কি প্রয়োজন থাকে? ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মিথ্যা বলা নয়, মিথ্যা শুনে তা বিশ্বাস করেই মানুষ কোথায় নামে? এদের পূর্বপুরুষ ইয়াহুদী খৃষ্টান মুফাস্‌সির মুহাদ্দিসদের আল্লাহ মিথ্যাবলা ও শোনায় ট্রানজিষ্টার ও হারামের পাকস্থলী বলে ক্বোরআন অভিহিত করেছেন। এদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও বর্জন করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃ ও মুমিনদের আদেশ করেছেন। আরো বলেছেন যে, এদের বাদ দিলে এরা কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। (সূরা মাঈদা-৪২) হযরত মূসা ও ঈসার পর তাঁদের ভক্তবেশী ভন্ডরা যেরূপ তাদের নবীর জীবনের ফসলকে নষ্ট করে, বিকৃত করে মানব জাতিকে বিপথগামী করেছে, আখেরী নবী সঃ এর পর কুফ্‌র ও নেফাক্বের ধাতুর আরব দাজ্জালরা তার চেয়ে মারাত্মক মিথ্যাচারের সাম্রাজ্য বিস্তার করে গিয়েছে। আমার আশ্চর্য লাগে ভেবে যে, তখনো আম্মার, বেলাল, ইবন মাসউদ, সালমান ও উসামাহরা দেখেছে, আর ভেবেছে যে, আল্লাহর রাসূল কি করে গেলেন, আর ক্বোরেশী ইমাম সাহেবরা কি করছে! তখনো উসামাহ ভরা যৌবনে উপস্থিত, যাকে আল্লাহর রাসূল সবার উপর ইমাম ও সেনাপ্রধান বানিয়ে গিয়েছেন, যেমনটি তার পিতা যায়দকে বানিয়ে ছিলেন। বর্তমানে আমার কেবলই মনে হয় যে বর্তমান তছ্‌নছ মুসলিম জাতির মাঝে একজন দুর্বোধ্য আরব উসামা বিন লাদিনকে শিয়া সুন্নী ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রিয় সে আদি উসামাহর নেতৃত্বের কথাই যেনো আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন! সে উসামাহকে তখন বহাল রাখলে যেমন উমর, উসমান ও আলীর যুগের ফিৎনা সৃষ্টি হতো না, তেমনি দুঃখজনক মৃত্যুও হতোনা। <u>এখনো আরবী-আজমী ও শিয়া-সুন্নীর রোগমুক্ত কোনো উসামাহকে ইমাম বানিয়ে ময়দানে নামলে আমরা তার মাঝেই বিশ্বমুক্তির ইমাম পেয়ে যাবো।</u> কারণ মুস্তাদআফ ইমামকেই আল্লাহ বিশ্বময় ক্ষমতায় অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। নমরুদ, ফেরআউন, ক্বারূন ও ক্বোরেশীদের অধ্যায় শেষ হয়েছে। ওদের আল্লাহ বিগত দিনের ইতিহাসে রূপান্তরিত করেছেন। ওরা চিরতরে নিপাত হয়েছে। (সূরা মুমিনুনের ৪৪ আয়াতের শেষাংশ) وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উমর আততায়ীর বিষাক্ত ছুরির আঘাতে বিদায় নিলো। উমর তার ছেলে বা বংশের কাউকেই ক্ষমতায় বসিয়ে যায়নি। ওসমান ক্ষমতায় বসেছে। তবে ওসমান ক্ষমতায় বসার পূর্বক্ষণেই তার ঈমানের পরীক্ষার ঘটনা ঘটে গেলো। ইসলামে আল্লাহ মহান, আল্লাহু আকবার। সৃষ্টি সব তুচ্ছ। এখন আছে তো এখন নেই। নবী রাসূল থেকে সাধারণ মানুষ, সবার একই দশা। কারো কোন স্থায়ীত্ব নেই। স্থায়ীত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর। তাঁর বিধানেরও স্থায়ীত্ব। তার কোন পরিবর্তন নেই। وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا- وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

তার বিধানে কখনো কোনো পরিবর্তন হতে পারেনা। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭৭, সূরা আল ফাতহ্-২৩)।

রাসূল সঃ বলেছেন, তাঁর মেয়ে ফাতেমাও চুরি করলে তিনি তার হাত কেটে দিতেন। আল্লাহর বিধান অমান্যকারী কারো রেহাই নেই। কৃত পাপের শাস্তি পেতেই হবে। উমর ঘাতকের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু বরণ করেছে। ঘাতক ধৃত হয়েছে বা হবে। আল্লাহর বিধানে ইমাম বা তার নিয়োগকরা রাষ্ট্রীয় কাজী তার বিচার করবে। অন্য কারো অধিকার নেই হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া। যদি কেউ তা করতে হাত বাড়ায়, সে যেনো আল্লাহর আইনের উপর হাত তুললো। পুরো বিধানকেই চ্যালেঞ্জ করলো। তার অপরাধ উমর হত্যাকারীর চেয়েও গুরুতর। ঘাতক উমরকে হত্যা করেছে। আর সে গোটা ইসলামকেই হত্যায় হাত তুলেছে। একথা বুঝতে হবে। তা না হলে ইসলাম ও রাসূল কিছুই বুঝা হলো না। এখানেই কুফর ও ইসলামের পার্থক্য। তাগুত ও মুস্তাদআফের মানদন্ড। আল্লাহর আইন সব মানুষের জন্য

সমান। শয়তানের আইন সকলের জন্য এক, দুর্বলের জন্য আরেক। আল্লাহর আইন ন্যায় বিচারের। ন্যায় নীতি ও ন্যায় বিচার আরবী ও ক্বোরআনের পরিভাষায় “আদ্‌ল্” ও “আদালত”। শয়তানের আইন, ন্যায়নীতির সীমালঙ্ঘন। এ সীমালঙ্ঘন তাগুতের পরিচায়ক। তাগুতরা মুস্তাকবির। বৈষম্যাচরণের নির্মূলের আদর্শের নাম ইসলাম। সাম্যের সৈনিকরা মুস্তাদআফ। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ রা মুস্তাদআফ। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বজাতীয় গোত্র ও বর্ণ বৈষম্যের মুস্তাকবিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নির্যাতন ভোগকরে মুস্তাদআফদের পক্ষে সত্যকে বিজয়ী করে মানবসাম্যতা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। নমরুদ, আদ, সামূদ, ও ফিরআউনরা মানব বৈষম্যের মানুষরূপী শয়তান। যুগে যুগে এ শয়তানদের ধর্মীয় বিকৃতির পতাকা উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ণবাদী ইয়াহুদী, মিথ্যাবাদী আল্লাহর বেটার পুজারী খৃষ্টান ও মুহাম্মাদ সঃ এর নামে মিথ্যা সৃষ্টিকারী ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া, আব্বাসী, মুঘল ও পাঠান সাম্রাজ্যাবাদ।
সকল বৈষম্যের আবর্জনা দূর করে মাদীনায় আল্লাহর শেষনবী তাক্‌ওয়া ভিত্তিক সাম্যের “মিযান” মানদন্ড বসিয়ে যান। তাকে যারা রক্ষা করবে, তারা “আদিল্” ন্যায়ের প্রতীক। যারা তাতে পরিবর্তন করবে, তারা নিকৃষ্টতম, ঘৃণ্য, অভিশপ্ত ও যালিম। আবু বকর, উমর , ওসমান ও আলী, যে কেউই তা করবে, তার রক্ষা বা অব্যাহতি নেই। এ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সঃ এর বিধান। এ বিধানের অনুসারী, প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারীরা আমাদের ইমাম। সে কৃষ্ণকায় বিলাল, সোনালী রঙ্গের সুহাইব, বাদামী রঙ্গের যায়দ, গোলাপী রঙ্গের সালমান বা মিশ্রিত বর্ণের উসামাহ হোক।
খলিফা উমরের ঘাতক আবু লুলু। উমরের পুত্র উবাইদুল্লাহ ক্ষিপ্ত হয়ে পিতার প্রতিশোধে আবু লুলুকে হত্যা করে। তার সাথে যোগ সাজস থাকতে পারে সন্দেহে উবাইদুল্লাহ, হরমুযান, তার স্ত্রী ও তার দু’শিশু সন্তানকে হত্যা করে। হরমুযান ইসলাম গ্রহণকারী এক ইরানী রাজপুত্র। সন্দেহ ও আরবী জাহেলী প্রতিশোধ স্পৃহায় উমরের পুত্র ছ’টি হত্যা করে। মাদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম জাহেলী হত্যাযজ্ঞ। উমরের মৃত্যুতে শোকাহত রাজধানীতে বজ্রপাত। আল্লাহর বিধান বহির্ভূত একটি হত্যাকান্ড গোটা মানবজাতিকে হত্যার শামিল। ইসলাম এরই নাম।
নতুন খলিফা হয়েছে ওস্‌মান। এতো দিন ওসমান খলিফা ছিলোনা। একজন সাধারণ মুসলিম নাগরিক ছিলো। তাই পূর্বে তার ত্রুটি তার ব্যক্তির। এখন তার কোনা ত্রুটি, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর। সাবধান! ইসলাম বড়ো না, ওসমান বড়ো, তার পরীক্ষা। ওসমান বড়ো হলে ইসলাম খতম। আর ইসলাম উর্ধ্বে উঠলে ওসমানও ধন্য। পূর্বে ওসমান ব্যর্থ হয়েছে পরীক্ষায়। ওয়ালিদ ইবন উক্‌বা ও আব্দুল্লাহ ইবন্ আবি সারাহ তার বৈমাতৃক ও দুধভাই। ঐ দুপাপীষ্ঠের অমার্জনীয় অপরাধে আল্লাহর রাসূল তাদের কাবাঘরে ঝুলন্ত পেলেও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূলের হুকুমকে যারা আল্লাহর হুকুম মনে করে কার্যকর করবে, তারা পরীক্ষিত ঈমানদার। যারা তা করবেনা, তারা যেই হোক, তারা খাঁটি মু’মিন নয়। মুনাফেক্ব, নয় কাফের। ওসমান তাদের মক্কা বিজয়ের সময় পূর্ব পরিকল্পনা করে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রেখে একের পর এক, তিনবার সুপারিশ করে তাদের রক্ষা করেছে। রাসূল সঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বার ওসমানের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে মুখ মুবারক ফিরিয়ে নেন। তৃতীয় বার এ নির্লজ্জ লোকটি ঐ মাহদুরুদ্দাম, অর্থাৎ রাসূলের ঘোষিত মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তপাতক দু’টিকে নিয়ে রাসূল সঃ এর সামনে উপস্থিত হয়ে পূনঃ সুপারিশ শুরু করে দেয়। প্রথমে রাসূল সঃ “কেউ তলোয়ার বের করে ওদের গর্দান উড়িয়ে দিক”, তার সুযোগ দেয়ার জন্য ওসমানের কথা না শুনে মুখ ফিরিয়ে নেন। আমার আফসোস হয় ঐ সমস্ত বানোয়াট গল্প পড়ে যে, রাসূলের সাহাবীরা নাকি এতো নিবেদিত প্রাণ ছিলো যে তাঁর ইশারা পাওয়া মাত্রই তারা প্রাণ দিতে ও নিতে প্রস্তুত থাকতো। গল্প গুজবে দেখা যায় যে, উমর নাকি রাসূলের কোনো অমান্যকারীকে দেখলেই তরবারী উচিয়ে বলতো, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, অনুমতি দিলেই ওর কল্লাটা ফেলে দেই”। তাই হওয়ার কথা।
রাসূল সঃ তিনবার প্রত্যাখ্যান করার পরও ওয়ালিদ এবং ইবন্ সারার মস্তক উড়াতে উমরদের রাসূল সঃ পেলেন না! পরে লজ্জার বিশ্ব প্রতীক রাসূল সঃ, ওসমানকে রাসূলের চেয়ে প্রিয় (?) তার দুই ভাইকে নিয়ে যেতে আদেশ করেন। কিন্তু খাতামুন নাবিয়্যীন পরক্ষণেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, “আমি তিনবার প্রত্যাখ্যান করি, তোমরা কেউই এমন হলে না যে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু দু’টির গর্দান উড়িয়ে দিতে!” উমর কোথা ছিলো তখন?
রাসূল সঃ এর ক্ষোভের উত্তরে নাকি “রাদিআল্লাহু আন্‌হুম” এর একমাত্র অধিকারীরা বলেছিলো, “আপনি একটু চোখের কানা দিয়ে ইশারা করলেই পারতেন?” তদুত্তরে হুজুর সঃ নির্বোধ, অথবা খলদের বলেছিলেন, “আমার ঘোষণা ও বারবার প্রত্যাখ্যান করা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিলোনা যে আমাকে তারপরও চোখের কোন দিয়ে

ইশারা করতে হবে? নবীর জন্য কি শোভন যে নবী সাধারণ লোকদের ন্যায় কানা চোখে ইংগিত করবেন?" إن النبى لا ينبغى أن يكون له جائنة أعين (দেখো ক্বোরআন, সূরা হুজুরাত-৬, আল মিলার ওয়ান নাহ্ল পৃষ্ঠা-৫২ আব্দুল করীম আল খতীব, আলী ইব্ন আবি তালিব, পৃষ্ঠা ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ১৯৬, ১৯৭-১৯৯ এবং ২০১, ২০২ পৃষ্ঠা)

ওসমান খলিফা হওয়ার পর আলীসহ সকল মাদীনাবাসী সর্বপ্রথম উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমরের ক্বেসাস বা হত্যার বদলে হত্যার ক্বোরআনী নির্দেশ কার্যকর করার পরামর্শ ও তাগিদ দেয়। ওসমান টালবাহানা করে তা করলোনা। সে বললো যে, লোকে কি বলবে যে কাল উমর মারা গেলো, আজ তার ছেলের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলো! এভাবে আল্লাহর ক্বোরআনের চেয়ে ওসমানের বিচার বড়ো হলো এবং বিবি ফাতিমার হাতের চেয়ে ছ'খুনের অপরাধী উবাইদুল্লাহ ইবন উমরের ঘাড়ের মূল্য বেশী হলো। শুরু হলো প্রকাশ্য ইসলামের পরাজয় এবং জাহিলিয়্যাতের নতুন জয়যাত্রা। আবু বকর ও উমর মায়ের সাথে জেনা করে সন্তান উৎপাদক মনযুর ইবন্ যিবরানকে রাসূলের নির্দেশ উপেক্ষা করে ক্ষমার মাধ্যমে যে দৃষ্টান্ত দাঁড় করে, ওসমানের আমলে তার স্বর্গরাজ্য শুরু। উবাইদুল্লাহর বিচার না করায় আলী এতোবেশী মর্মাহত হয় যে, আলী ঘোষণা করে যে, আল্লাহ কখনো তাকে কর্তৃত্ব দান করলে সে সর্বপ্রথম ঐ "ফাসিক্বটার" মৃত্যুদন্ড কার্যকর করবে। আলী খলিফা হলে উবাইদুল্লাহ, মুয়াবিয়ার সাথে যোগ দিয়ে মুয়াবিয়ার বিপথগামী বাহিনীর হয়ে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হয়।

উসমান সম্পর্কে পরবর্তীদের বানানো ইতিহাস ও খুতবায় শুনতে পাই।

(১) উসমান তৃতীয় খলিফা,

(২) রাসূল সঃ এর দু'মেয়েকে বিবাহের সুবাদে যিন্নুরাইন

(৩) এতো বিত্তশালী ধনী ছিলো যে তার নাম "উসমান গনী" হয়ে যায়,

(৪) জীবিতাবস্থায় সুসংবাদপ্রাপ্ত বেহেশ্তী দশ জনের একজন,

(৫) এতো লাজুক যে জিব্রাঈল ফেরেশ্তা ও রাসূল সঃ তাকে দেখে লজ্জা বোধ করতেন।

বাস্তবে আমরা কী প্রমাণ পাই, এবার তা দেখা যাক। আল্লাহ ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন যে,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ-

"আমি অবশ্যই নিশ্চিতরূপে আমার রাসুলদের ও তাঁদের অনুসারী মু'মিনদের পার্থিব জীবন ও ক্বিয়ামতের দিন সাহায্য করবই। তোমাদের আল্লাহ সাহায্য করলে কোনো শক্তি তোমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেনা। (সূরা মু'মিন-৫১ এবং আল ইমরান ১৬০)।

এখন প্রমাণ করে ছাড়বো যে আল্লাহ, তাঁর ক্বোরআন ও রাসূল মিথ্যুক, না আমরা! দীর্ঘ ১৪১২ বছর থেকে আমরা ক্বোরেশী, আরবী, ইরানী, হিন্দি ও বাঙ্গালী হয়ে শুধু লানত আর লানতই ভোগ করছি। আমরা মুখেমুখে মুসলমান দাবী করছি। পৃথিবীর যেখানেই মুসলিম নামধারী জাত রয়েছে, আকাশ ভেঙ্গে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত কেনো! বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম প্রধান দেশেও ইসলামের দাবীদার শাইখুল হাদীস ও মুফতিয়ে আযম গোলাম আযমরা গিয়ে এক বেপর্দা বিধবার আচলে আশ্রয় নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জিহাদ করছে! আমি সারা বিশ্বের সামনে ঘোষণা করছি যে আল্লাহর ও তার রাসুলগণ মিথ্যুক নন! ক্বোরআনও অসত্য নয়! মিথ্যুক আরবী, মিশরী, ইরাকী, ইরানী, আফগানী, পাকিস্তানী, হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালীরা, যারা মুসলিম না হয়েও ইসলামের নাম নিচ্ছে বলে। এ মিথ্যা দাবী শুরু হয়েছে আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ থেকে। আজ তার যবনিকা পাতের সময় উপস্থিত। তাই দুনয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে আল্লাহ কে সঙ্গে নিয়ে আযান দিচ্ছি।

ওসমান ইসলামের তৃতীয় খলিফা নয়। কারণ ইসলামে খেলাফত নেই। ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ ইমাম ছিলেন। সকল মানুষ আল্লাহর খলিফা। যারা আল্লাহকে মানে, তারা বাধ্য খলিফা। তাদের নেতা ইমাম। যারা আল্লাহ কে মানেনা, তারা বিদ্রোহী খলিফা। তাদের নেতা তাগুত। মুস্তাকবির।

ওসমান ক্বোরেশের বনী উমাইয়ার খলিফা। হাকাম,মারওয়ান, ওয়ালিদ ইবন উকবাও আব্দুল্লাহ ইব্ন সারাহ, এরা সবাই রাসূল সঃ এর অভিশপ্ত ও মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত অপরাধী। এদের সবাইকে ওসমান ক্ষমতায় বসে মুসলিম উম্মাহর দন্ডমুন্ডের মালিক করেছিলো। মারওয়ানকে নির্বাসন থেকে এনে তার সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়ে তাকে প্রধানমন্ত্রী

বানিয়েছিলো। তার পিতা হাকামকে নির্বাসন থেকে মাদীনায় এনে বনী ক্বোযাআর সদকার তহসীলদার বানিয়ে পরে তাকে তা দান হিসেবে প্রদান করেছিলো। উপরোল্লেখিত ইবন সারাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করার পর ইবন সারা আফ্রিকা বিজয় করলে তার এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব তাকে দান করে। ওয়ালিদ ইবন উকবাকে ইরাকের গর্ভনর নিযুক্ত করে সাআদ ইবন আবি ওয়াককাসকে পদচ্যুত করে। সাআদ ওসমানের মতো আশারায়ে মুবাশ্বারার একজন। ওয়ালিদ রাসূল সঃ কর্তৃক ঘোষিত জাহান্নামী। ওয়ালিদের পিতা উকবা মক্কায় রাসূলকে বকা দিয়ে, তার মুখে থুথু দিয়ে গন্ড মুবারকে চড় মেরেছিলো ঠান্ডা মাথায়। তাই বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহর হুকুমে বদর থেকে ফেরার পথে ঠান্ডামাথায় উকবার মুন্ডপাতের নিদের্শ দেন রাসূল। নির্দেশ শুনে উকবা বলেছিলো, "মুহাম্মদ আমি মারা গেলে আমার ছেলেরা কোথায় যাবে?" রাসূল সঃ উত্তরে বলেছিলেন, "জাহান্নামে যাবে" । তার পর থেকে উকবার সন্তানদের "সাবিইয়াতুন নার" বা জাহান্নামের সন্তান নামে ডাকা হতো। এ জাহান্নামী ওয়ালিদকে ওসমান সাআদের মতো বেহেশতীকে (?) পদচ্যুত করে তার স্থলে ইরাকের গর্ভনর নিযুক্ত করে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, এক হলে ওসমান বেহেশতী নয়, বা সাআদ বেহেশতী নয়। বা উভয়ই বেহেশতী নয়। গোটা দশ ব্যক্তির বেহেশতী হওয়ার হাদীসটিই বানোয়াট ও মিথ্যা। মূলে যা সত্যি তা না হলে কি এক বেহেশতী আর এক বেহেশতীকে পদচ্যুত করে অপর এক জাহান্নামীকে গর্ভনর বানায়? সে গর্ভনর হওয়ার পদাধিকার বলে ইরাকবাসী মুসলিমদের নামাজের ইমামতীও করবে! জাহান্নামী কি করে মুসলিমদের ইমাম হয়? এ জাহান্নামীই মদ্যপান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে ফজরের নামাজ তিন রাকাত পড়ায় দু'রাকাতের জায়গায়। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদের মতো ব্যক্তিকেও ওসমানের কান্ডে ঐ জাহান্নামীর পেছনে সালাতে দাড়াতে হয়। ইবন মাসউদ এর প্রতিবাদ জানালে তাকে তলব করে এনে মসজিদে নববীতে শারীরিক ভাবে মার-ধর করা হয়। যার ফলে ইবন মাসউদের মৃত্যু হয়। উসমানকে তার জানাযায় ডাকা হয়নি। আম্মার ইবন ইয়াসির তার জানাযা পড়ে। (দেখো ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবন কুতাইবাহ। আলী ইবন আবি তালিব, আব্দুল করীম আল খাতীব, পৃষ্ঠা- ৬৯, ৭০, এবং ৭১, ৭২)।

ওসমান বদরের যুদ্ধে শরীক হয়নি তার স্ত্রী অসুস্থ বলে। অথচ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঈমানের প্রথম পরীক্ষা ছিলো। বলা হয় যে ওসমান বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও রাসূল নাকি তাকে বদরের গনিমতের হিস্যা দিয়েছিলেন। এ তো হতে পারেনা! কারণ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরাই গনিমতের হিস্যা পাবে। রাসূল সঃ কি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ওসমানকে তার অংশ দিতে পারেন?

ওসমান উহুদের যুদ্ধে গিয়েছিলো। যুদ্ধে বিপর্যয় দেখা দিলে ওসমান ময়দান ছেড়ে পালিয়ে মাদীনায় চলে আসে। পরে যখন মুনাফিকরা প্রচার করে রাসূল সঃ শহীদ হয়ে গিয়েছেন, তা শুনে ওসমান ঘোষণা করেছিলো যে সে আদৌ যুদ্ধে যায়ইনি। যদি সে দিন সত্যি সত্যি রাসূল সঃ শহীদ হতেন, তা হলে কি ওসমানরা মুসলমান থাকতো? মক্কা ফেরৎ গিয়ে বাপদাদার ধর্মে গোবরখেয়ে শুদ্ধি হতোনা? খেলাফতে বসে যে ঐ সমস্ত কাজ করেছে, আবু যারকে সত্য বলার জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছে! রাসূল সঃ যাদের নির্বাসিত করেছিলেন তাদের এনে পুনর্বাসিত করেছে, তার দ্বারা কী না সম্ভব ছিলো? তার ও তার মতো আরো যে দু'জন উহুদ থেকে রাসূল সঃ কে ফেলে পালিয়েছিলো, তাদের শয়তান বিপথগামী করেছে বলে ক্বোরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। (আল ইমরান- ১৫৫।

হুদাইবিয়ার ঘটনার সময় "বাইআতুর রিদওয়ান" বা জানমাল দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ক্রয়ের যে বিশেষ শপথ অনুষ্ঠান হয়েছিলো, তাতেও ওসমান উপস্থিত ছিলো না। ইসলামের ইতিহাসে রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় এ তিনটি ঘটনায় উপস্থিত থাকাকে সৌভাগ্যের শিখর ঘটনা ধরা হয়। এর একটিতেও উসমান ছিলোনা। ঈমান ও ইসলামে তার মধ্য-অবস্থানের বিবেচনায়ই তাকে মক্কার কাফেরদের সাথে দূতিয়ালীর কাজে পাঠানো হয়েছিলো। উমরকে সে কাজে যেতে বললে উমর যেতে সাহস পায়নি। কারণ, ঈমানের ব্যাপারে মক্কাবাসীর নিকট উমরের অবস্থান স্পষ্ট ছিলো। দূতকে হত্যাকরা সর্বকালে একটি মহাঅন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়। দূত যে ধর্মেরই হোক। তবে, যাদের কাছে দূত পাঠানো হয়, তাদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করেই সাধানণতঃ দূত নির্বাচন করা হয়। ওসমানকে ক্বোরেশী কাফেরদের কাছে পাঠানোর পেছনে সে বিবেচনাই প্রধান্য পেয়েছিলো।

রাসূল সঃ এর চার মেয়ের মধ্যে একমাত্র ফাতিমাই তার পিতার রিসালাত জীবনে পিতার সঙ্গে থেকে পিতার প্রতি মক্কাবাসীর অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে ইসলামী শিক্ষা বেশী পেয়ে বাপের প্রিয়পাত্রী ছিলো। যায়নাব, রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলসুম পিতার সুদিনের সন্তান। তারা ফাতিমার মতো বাবার দুঃখ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেনি। তাদের

সবার বিয়েও রাসূল সঃ এর দুর্দিনের পূর্বে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তা ছাড়া, রাসূল সঃ এর নিকট রিসালাত এসেছে, অহী এসেছে এবং ক্বোরআন নাযিল হয়েছে, তাকেই নূর বলা হয়েছে। অন্যান্য নবী রাসূলদের নিকট যে হেদায়েত এসেছে, তাকেই নূর বলেছেন আল্লাহ । নবীরা সব মাটির তৈরী মানুষ। কেউ নূর নন। মাটির সৃষ্ট মানুষের মৃত্যু হয়। আল্লাহ নূর! তাঁর যেমন মৃত্যু নেই, নূরের তৈরী কারো মৃত্যু হয়না। যেমন ফেরেশতাদের মৃত্যু নেই বলা হয়। যার অংশের মৃত্যু হয়, তার পূর্ণেরও মৃত্যু অবধারিত। তাতে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহরও মৃত্যুর প্রশ্ন জাগবে।
মোদ্দাকথা, নবী রাসূলরা যখন নূর নন, তখন তাঁদের মেয়েদের নূর বা নূরের হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাতে কি করে ওসমান রাসূল সঃ এর দু'মেয়ের পানিগ্রহণ করে দু'নূরের অধিকারী যিন্নুরাইন হয়?! রাসূল সঃ এর মেয়েদের নাম নূর জাহান ও নূর বেগম হলেও হয়তো তাদের স্বামীকে যিন্নুর বা যিন্নুরাইন বলার অতিভক্তি দেখানো যেতো! তা তো নয়! তাদের নাম তো রোক্বাইয়া ও উম্মে কুলসুম। ওরা নূর হলে তো ফাতিমাও অবশ্য নূর। বরং ফাতিমা রাসূল সঃ এর বেশী প্রিয় ছিলো। আলী তাকে বিবাহ করেছে, ফলে অবশ্যই আলীকেও এক নূরের স্বামী বা যিন্নুর বলা ফরজ ছিলো? তা বলা হয় নি কেনো? আসলে এসব বানোয়াট ও মিথ্যা। ওসমানকে সামনে রেখে যারা মানব জাতির সর্বনাশ করেছে, সে সমস্ত শিয়া সুন্নী শিম্পাঞ্জীরা খেয়ে না খেয়ে এ সব মিথ্যা তৈরী করেছে, আর সরল মতি বিশ্বাসীদের চিন্তাশক্তির উপর তালা ঝুলিয়েছে। এখন তালা ভাঙ্গার পালা।

আল্লাহ নবী রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের জন্য সত্য দর্শনের স্বর্গীয় আলো পাঠিয়েছেন। قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

এর অর্থ তাই। অন্য কিছু নয়। তারপরও হঠকারীরা যদি নূর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায়, তা হলে তাদের পাগল চিকিৎসার জন্য আরো কিছু দুর্মুজ এখানে সংযোজন করছি। আল্লাহ জাল্লাজালালুহু নূর। তাঁর তাজাল্লী বা প্রকাশ, ধারণ ও গ্রহণ কোনো সৃষ্টির জন্য সম্ভব নয়। اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহর আদুরে হযরত মূসা কালিমুল্লাহর সখ হয়েছিলো আল্লাহকে স্বচোখে দেখতে। আল্লাহ বললেন, তুমি তা দেখতে পারবেনা। তবে তার এক ঝলকের আন্দাজ করার জন্য ঐ পাহাড়টির দিকে তাকাও। তারপর যদি তুমি ও পাহাড় স্বস্থানে টিকে থাকতে পারো, তা হলে আমাকে দেখার সম্ভাবনা হতে পারে। আল্লাহ তাঁর নূরের একটু প্রতিফলন পাহাড়ের প্রতি খুলে দিতেই পাহাড় পুড়ে সূর্মা, মূসা বেহুশ! হুশ ফেরত আসতেই মূসা বলে উঠেন, "তওবা, তওবা, আর না।" এ যদি হয় সাইয়েদুনা হযরত মূসা কালীমুল্লাহ আলাইহিস্ সালামের নূর দেখার পরিণতি, তা হলে উসমান ইবন্ আফ্ফানের দশা কি হওয়ার কথা?! উসমান কি হযরত মূসার চেয়েও উন্নত কোনো সৃষ্টি ছিলো নাকি যে দু' দু'নূরের সাথে সহবাস করার পরও তার কিছু হয়নি? আলীই বা সে মর্তবা থেকে বাদ যাবে কেনো? এরপরও যিন্নুরাইনের ক্বিস্সা তৈরীকারীদের জন্য আরো জুতার প্রয়োজন আছে?
বিশ্বের সরলমনা ঈমানদার ভাইরা, এতো দিনের মিথ্যার নেশা ঝেড়েফেলে তওবার গোসলে পাক হয়ে নতুন করে ক্বোরআন ও ক্বোরআন সমর্থিত রাসূল সঃ এর বাণী ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইয়াহুদী, নাসারা ও ক্বোরেশী, আব্বাসী ও উমাইয়া যুগের পয়সায় ভাড়া খাটা মুহাদ্দিস, মুফাসসিরদের বানানো, সিদ্দিক্বী, ফারুক্বী, যিন্নুরাইন ও শিয়া গাঁজাখোরী ধ্যান ধারণা ত্যাগ করে খালেস ও নির্ভেজাল তাওহীদে প্রবেশ করো। রাসূল সঃ যেখানে বলেছেন, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة
"তোমরা বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সফল হবে, যে বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতবাসী হবে" তাঁর রিসালাত ও নাম পর্যন্ত তার সাথে যোগ করেননি শির্ক হবে বলে, যেখানে চার খলিফা ও সাহাবী পূজার স্থান কোথায়? সাবধান! আমাদের সকলকে খুব সতর্ক হতে হবে যে, আমরা কখনো ভুলেও যেনো কোন নবী রাসূলকেও আল্লাহর সাথে শরীক করে না বসি। ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা উযাইর ও ঈসা আঃ কে আল্লাহর সাথে শির্ক করে অভিশপ্ত হয়েছে। সেখানে আবু বকর উমররা কে?
ওসমানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয় যে, সে এতো সম্পদশালী ও ধনী ব্যবসায়ী ছিলো যে তার ধন দিয়ে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামকে প্রায় কিনে নিয়েছিলো। আসলে কি তাই?! কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। ইসলাম ও ক্বোরআনে যারা বিশ্বাসী, তারা জানে যে, তারা ক্রীতদাসের চেয়েও আল্লাহর দাসানুদাস। তাদের জানমাল সব কিছু দান করেই তারা মুমিনের তালিকাভূক্ত হয়। (সূরা তওবা-১১১)। মু'মিনের সম্পদ তার নিকট আল্লাহর গচ্ছিত ধন। তার মালিক

সে নয়। ধনী একমাত্র আল্লাহ। ঈমানদাররা সবাই ফক্বীর। কখনো তারা নিজেদের ধনী মনে করবে না, অন্যরাও তাকে ধনী বলবেনা। কেউ বললে তা শক্তভাবে নিষেধ করতে হবে। তা না হলে তারা ইয়াহুদীদের তালিকা ভূক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ সূরা মুহাম্মাদের ৩৮ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, "সাবধান! তোমাদের বিশেষ করে বলে দেয়া হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের সকল সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। তোমাদের মধ্যে যারা তা করতে কার্পণ্য করবে, তারা নিজের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করবে। স্মরণ রাখবে, একমাত্র আল্লাহই ধনী। তোমরা সবাই ফক্বীর। তা না করলে তোমাদের অভিশপ্ত করে অন্য জাতিকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত করা হবে। তারা তোমাদের মতো কখনো হবে না।" (মুহাম্মদ-৩৮)। লক্ষ্যণীয় যে এখানে আল্লাহ বলেছেন, وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ একমাত্র আল্লাহ ধনী, তোমরা সকলেই ফক্বীর। এখানে "ওসমান ব্যতীত তোমরা সকলেই ফক্বীর" বলা হয়নি। একমাত্র ইয়াহুদীরা বলেছে যে, তারা ধনী, আল্লাহ ফক্বীর। (আল-ইমরান-১৮১) ইসলামে হালাল পন্থায় সম্পদ আহরণ বৈধ্য, কিন্তু জমা করা হারাম, নিষিদ্ধ। যারা করবে, তারা জাহান্নামী। (সূরা তাকাসুর ও হুমাযাহ্)।

যদি ওসমান ও আব্দুর রহমান ইবন্ আউফরা সত্যিকার অর্থে ঈমান এনে থাকে, তা হলে তারা ধনী বা সম্পদশালী ছিলোনা। ঈমানদাররা সকল সম্পদ ও ঘরবাড়ী ছেড়ে হিজরত করে মাদীনায় এসেছিলো। রাসূল সঃ এর দশ বছরের মাদানী জীবনে প্রায় পঞ্চাশটি যুদ্ধাভিযান হয়েছে। কাজেই যারা তাঁর সাথে অভিযানে শরীক হয়েছে, তাদের সওদাগরীর সময় ছিলোনা। বছরে প্রায় পাঁচটি করে গড়ে অভিযান হয়েছে। কোনো কোনোটি মাসাধিক কাল লেগেছে। যেমন খন্দক ও তাবুক। তাই মালপানি বানিয়ে ধনী-গনী হওয়ার সুযোগ ছিলোনা রাসূল সঃ এর মৃত্যু পর্যন্ত।

ক্বোরআন, রাসূল ও সহীহ বর্ণনায় আমরা জানি যে মাদানী জীবনে রাসূল সঃ বহুদিন কাটিয়েছেন যে, তাঁর ঘরে চুলা জ্বলেনি। ক্ষুধার জ্বালায় তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। তাঁর মৃত্যু কালেও তার বর্ম জনৈক ইয়াহুদীর নিকট ঋণের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো। এ অবস্থায় ওসমান রাসূলের দু'মেয়ের জামাতা ও ঈমানদার সাহাবী হয়ে থাকলে রাসূল ও তার শ্বশুর না খেয়ে থাকেন, আর ওসমান সম্পদ নিয়ে কিরূপে ধনী-গনী হয়ে দিন কাটায়? একথা এক হলে মিথ্যা, তা না হলে ওসমানরা ঈমানই এনেছিলোনা। হাদীসে যে মুহাদ্দিসরা বলেছে যে রাসূল সঃ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি রাতে খেয়ে ঘুমায় এবং জানে যে তার প্রতিবেশী অনাহারে আছে, তা হলে সে ঈমানদার নয়। খাতামুন নাবিয়্যীন না খেয়ে থাকবেন এবং তাঁর দু'মেয়ের জামাতা ও সাহাবারা ধনের ভান্ডার নিয়ে বাস করে, একি কখনো হতে পারে? অতএব দু'য়ে দু'য়ে চারের মতো অঙ্ক মিলে গেলো যে রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় এরা কেউ ধনী গনী ছিলোনা। এরা দুর্বল ঈমানের হলেও কেউ কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক্ব ছিলোনা। রাসূল সঃ এর সাথে এরাও ছিন্নমূল ফক্বীরপ্রায় ছিলো। পরে যারা ওসমানকে সামনে রেখে বিজিতরাজ্য থেকে আসা বাইতুল মালকে লুটেছে, ওরাই ঐ সমস্ত গল্প তৈরী করেছে নিজেদের কুৎসিত চেহারা লুকানোর জন্য। আমি শুধু ওদের মুখোশ খুলে দিলাম।

ওসমানসহ দশজন ক্বোরেশের একটি "দশো চক্র" দাঁড় করে প্রচার করা হয়েছে যে, রাসূল সঃ শুধুমাত্র ক্বোরেশ বংশ থেকে বেছে দশজনকে তাঁর জীবদ্দশায়ই আগাম বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। একথাও ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষা ও আচরণে টিকেনা। তার প্রথম কারণ হলো যে, রাসূল সঃ গায়েব জানতেন না। তারপর হলো, যে বেহেশত দোজখ বরাদ্দ দেয়া নবী রাসূলদের কাজ নয়। তারপর হলো যে, আনসার ও মুস্তাদআফ্ সব বাদ দিয়ে ক্বোরেশী মুস্তাকবির গোত্র থেকে বেছে দশজনকে শুধু বেহেশতের সুসংবাদ দিবেন, সে ব্যক্তি রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সঃ কখনো ছিলেন না। নিঃসন্দেহে এ পরবর্তীদের "দশো চত্রে ভগবান ভূত" বানানোর মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়। তা ছাড়া আমরা ওসমানের ক্রিয়া থেকেই প্রমাণ পাচ্ছি যে একথা ঠিক নয়। কারণ, ওসমান সে দশ জনের মধ্যে একজন হয়ে তারই মতো আরেকজন সুসংবাদপ্রাপ্ত সাআদ ইবন্ আবি ওয়াক্কাসকে বরখাস্ত করে এক জাহান্নামের দুঃসংবাদ প্রাপ্ত মাতাল মদ্যপকে কি করে মুসলিম জনতার শাসক ও ইমাম নিয়োগ করে? অতএব আশারা মুবাশ্বারার ব্যাপরটিই বানায়ট। তার আরো প্রমাণ আমরা পাই যে, রাসূলের সর্বসম্মত প্রিয় সঙ্গী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ যখন মাদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে, তখন যখন ওসমান তাকে "বমি করে খাওয়া কুকুর" বলে গাল মন্দ দেয় এবং ইবন মাসউদকে শারীরিক নির্যাতন করে, তা শুনে ও দেখে মা আয়শা ঘোষণা করেছিলো যে, "ওসমান কাফের হয়ে গিয়েছে, তাকে হত্যা করো।" তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদও বলেছে যে, ঐ

أقتلوا نعثلا إنه حل دم عثمان ওসমানের রক্ত হালাল হয়ে গিয়েছে। মা আয়শাও তার প্রসিদ্ধ ঘোষণায় বলেছিলো, كفر তোমরা বুড়া দাড়িয়াটাকে হত্যা করো, সে কাফের হয়ে গিয়েছে। (দেখো প্রথম খন্ড, ইমামাহ্, সিয়াসাহ্ ইবন্ কুতাইবাহ, পৃষ্ঠা ৪৪, ৪৫; ফিতনাতুল কোব্‌রা,ডঃ ত্বাহা হোসাইন)

যার বেহেশতবাসী হওয়া সত্য, তার বিপথগামী হয়ে হত্যাযোগ্য হওয়ার কথা মা আয়শা ও ইবন্ মাসউদ কি করে বলতে পারে? ইবন্ মাসউদ ও আম্মারকে সত্য বলার জন্য পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙ্গা, রাসূলের মতে ভূপৃষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী আবু যারকে নির্বাসনকারী এবং রাসূল সঃ কর্তৃক বিতাড়িত হাকাম ও তার ছেলে মারওয়ানকে মাদীনায় রাসূলের নিষেধ অমান্য ও আবু বকর ও উমরের নীতি বাদ দিয়ে এনে তাকে রাষ্ট্রীয় পদে বসানো, মারওয়ানের সাথে ওসমানের মেয়ে বিবাহ দিয়ে গোটা আফ্রিকার গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দান, যার পরিমাণ তখনকার দিনে দু'লক্ষ দিনার, এ সব কর্মের ব্যক্তি কি করে মুবাশ্বার বিল্ জান্নাহ হয়? (দেখো, আল মিলাল ওয়ান নাহল, শাহরাস্তানী, পৃষ্ঠা ২৪,২৫) এ সমস্ত করেই ওসমান ধনকুবের হয়েছিলো, যাকে সত্য প্রমাণের জন্য তার পূর্বের ধনী-গনী হওয়ার কাহিনী দাঁড় করানো হয়, যা ক্বোরআন ও রাসুল সঃ এর বাণী ও জীবন, মিথ্যা প্রমাণ করে। বিবেকবান মানুষদের এসব তথ্য থেকে সত্য বুঝে কর্মপন্থা নিতে হবে।

ওসমান সম্পর্কে পঞ্চম গুণ প্রচার করা হয়, "আস্‌দাকুহুম্ হায়াআন" অর্থাৎ শরম ও লজ্জা বোধে সবচেয়ে সাচ্চা ব্যক্তি বলে। আল্লাহ তাঁর রাসূলের এর মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়েছেন, الحياء شعبة الإيمان، إذا لم تستحي، فافعل ما شئت লজ্জা-শরম ঈমানের অঙ্গ। তোমার যদি লজ্জা না থাকে, তা হলে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো (বোখারী, আহম্‌দ)। লজ্জাবোধ মুমিনের ঈমানের গুরুত্ব পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল সঃ এর আদেশ-নিষেধ পালনে সূক্ষ্ম লজ্জাবোধ তাক্‌ওয়ার পরিচায়ক। মানুষের সাথে কথা রাখতে না পারলে মানুষ লজ্জায় মুখ দেখাতে কুণ্ঠিত হয়। সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের দ্বীনের ব্যাপারে হলে তা কতইনা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়! রাহমাতুল্‌লিল আলামীন খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ নব বধুর পাল্কিতে লজ্জা বোধের তুল্য ছিলেন। তাঁর নিকটতম অনুসারীদের লজ্জাবোধ নিশ্চয়ই অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তযোগ্য হওয়া কর্তব্য। আল্লাহর রাসূল সঃ আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে আল্লাহ ও রাসূলের অমার্জনীয় শত্রু ওয়ালিদ ইবন্ উক্‌বা ও ক্বোরআনে বর্ণিত ফাসেক্ব ও মুর্তাদ আব্দুল্লাহ ইবন্ সারাহ এর প্রাণদন্ড ঘোষণা করে হত্যার নির্দেশ দেন। তাদের ক্ষমা করতে আবেদন যে বা যারা করবে, তারা কি লজ্জাশীল না নির্লজ্জ? প্রত্যেক বিবেকবান ঈমানদার নির্বিশেষে এক বাক্যে তাকে বিশ্ববেহায়া বলবে। কারণ, রাসূল সঃ বিশ্বনবী ও বিশ্বরহমতের প্রতীক। তাঁর সত্য অনুসারী মাত্র বিশ্বলাজুক হবে সত্যের পক্ষে। যারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে নির্লজ্জ হবে, তারা নিঃসন্দেহে বিশ্ব বেহায়া ও বিশ্ব নির্লজ্জ। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের পিতা-মাতা ক্বোরবানের চেয়েও প্রিয় নবী সঃ কে কষ্ট প্রদানকারী আল্লাহ ও রাসূল সঃ এবং দ্বীন ও ঈমানের শত্রু, হাকাম, মারওয়ান, ওয়ালিদ ইবন্ উকবা ইবন্ আবু মুঈত ও ইবন্ সারাহকে ক্ষমা করতে তিনবার অস্বীকৃতি জানানোর পরও ওস্‌মান তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য রাসূল সঃ কে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। রাসূল সঃ ইন্তেকালের পর ক্ষমতায় বসেই এ পাপীষ্ঠ গুলোকে ওসমান ইসলামী রাষ্ট্রের দন্ডমুন্ডের বিধায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এরা মুসলিম রাষ্ট্রের ভিতকে মাদীনা, মিশর ও ইরাকে খুঁড়ে ফেলে। যাদের ষড়যন্ত্রে ইসলামী ইমামত ও খেলাফত "মুল্‌কুন্ আদূদ" বা হিংস্র পশুর কামড়ানো সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে এক সময় মারওয়ান ইসলামের ষষ্ঠ খলিফা হয়! তারপর শুরু হয় মুসলিম জাতির উপর মারওয়ানের বংশের রাজত্ব!

অপরদিকে আমরা দেখছি যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয়ভাজন, যাদের প্রতি রাসূল সঃ সামান্য অমনোযোগী হলে অহী নাযিল হয়ে রাসূল সঃ কে শক্ত ভাষায় তিরষ্কার করা হয়, সে সমস্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ ও আম্মার ইবন ইয়াসিরকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও আমানত আদায়ে সত্য কথা বলার জন্য ওসমানের হাতে নির্যাতিত হয়ে আহত হয়ে সংজ্ঞা হারা হয়ে সালাত কাজা হয়! তার ফলে কারো মৃত্যু হয়। আবু যারকে নির্বাসিত হয়ে নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এ জঘন্য পাপকে লঘু করার জন্য রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরীর মতো নির্লজ্জ মহাপাপ করা হয়। মূলতঃ এ ধরনের নির্লজ্জ, আল্লাহ্, ক্বোরআন ও রাসূলের আদেশ অমান্য করার ফলে ইসলামের বিশ্বরহমতের শাসনক্ষমতা ওসমানের বংশ উমাইয়াদের হস্তগত হয়ে বিশ্বনির্যাতনের দাজ্জালী কান্ডে মাদীনায় দশ হাজার সাহাবী ও তাবেঈ নিহত হয়। ইয়াযীদের সেনাদের দ্বারা মাদীনায় সপ্তাহকাল গণধর্ষণ চালিয়ে হাজার হাজার জারজ সন্তান জন্মদেয়া হয়। মসজিদে নববী উমাইয়াদের ঘোড়ার আস্তাবল হয়। রাসূলের কবর ঐ ঘোড়ার পা দিয়ে মাড়ানো হয়।

হুসেইনকে সপরিবারে হত্যা করে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার আনন্দ ঘোষণা করা হয়। এ সমস্ত ঘটনার স্থপতি সে ব্যক্তিটি কি করে সেরা লাজুক ব্যক্তি হয়? আমি তাকে বিশ্ব নবীর বিশ্বশান্তিকে উৎপাটনকারী বিশ্ববেহায়া মনে করে ঘোষণা করছি যে তাকে লাজুক বানানোর হাদীসটি তদরূপ বানানো মিথ্যা, যে রূপ রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর পরপর বারোজন ক্বোরেশী খলিফা হওয়ার কথা বানোয়াট, যার চতুর্থ খলিফা মুয়াবিয়া, পঞ্চম ইয়াযীদ ও ষষ্ঠ মারওয়ান।
স্বীয়কর্মের প্রতিফলে ওসমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুকেও আমি আল্লাহর রাসূলের অভিসম্পাতের ফল মনে করি, যাতে তিনি বলেছিলেন যে, যারা উসামাহর আনুগত্যে উসামাহর অভিযানে যাবেনা, তাদের উপর আল্লাহ ও রাসূলের লানত।
সে রক্তক্ষয়ী অভিশপ্ত সংঘাতের প্রলয় তুফানে আলী হাল ধরতে আসে। আলী রাসূল সঃ এর "রবীব" বা পালকপুত্রসম সাহচর্য পেয়ে রাসূল সঃ এর শিক্ষা-দীক্ষা পায় বটে-কিন্তু ক্বোরেশী ঠাকুরের মৌরুসী রক্তের ধারা থেকে আলীও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। সে কারণে রাসূল সঃ এর শিক্ষার কাছাকাছি পৌছা সত্ত্বেও আবু বকর, ওমরের ক্বোরেশী ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদ করেও প্রকৃত হক্বের উপর দৃঢ় হতে ব্যর্থ হয়েছে। আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ আদৌ রাসূল সঃ এর বাণী হলে তা সবার আগে আলী জানতো। আর তা জানলে আবু বকরের ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে বলতোনা "তোমরা যে দাবী তুলে মাদীনার আনসারদের বঞ্চিত করলে, তা সত্য হলে আমি তার প্রথম হক্বদার।" সে সময় পূর্বে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা উসামাহর ইমামতকে সমর্থন করে অন্যায়কে বাধা দিতে আলী ব্যর্থ হয়েছে। ওসমান নিহত হলে আলী খলীফা হতে গিয়ে সে ভুলটিই পুনঃ করেছে। তখনো সঠিক বুঝ বুঝে উসামাহকে ডেকে রাসূলের আদিষ্ট ইমামতকে, ক্বোরআন ও রাসূলের ব্যাখ্যায় ঘোষণা করলে গোত্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে মিশর, ইরাক ও ইয়ামেন থেকে আগত প্রতিবাদী মুস্তাদআফরা আলী ও মাদীনাবাসীদের সাথে মিলে আকাশে উঠে যাওয়া আল্লাহর রহমতকে পুনঃ ধরাতে প্রতিষ্ঠা করে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতো। আমার আলী ইব্ন আবি তালিবের জন্য বুকফাটা দুঃখ হয় যে, আলী, আবু বকর ও উমরের চেয়ে হক্বের অনেক কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে না পারায় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছটফট করে প্রাণ দিয়েছে। কাব্যে দুঃখ করে, اشكو إليك عجرى بجبرى، شفيت نفسى و قتلت معشرى বলে তারই প্রমাণ রেখে গিয়েছে আলী ইবন আবি তালিব। তার খেলাফতকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে উসামাহর বায়আত নিতে গিয়ে মসজিদে নববীতে উসামাহকে নির্যাতন করে যা ঘটিয়েছে, তা স্মরণ করে আমি দেখি যে রওযায় শোয়া রাসূল সঃ কে আল্লাহ যদি তার দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন, রাসূল সঃ তা দেখে কি অনুভব করেছেন? ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
শিয়া-সুন্নী দাবীদার মুসলমানদের মধ্যে "কাশফুল কুবুর" অর্থাৎ কবরবাসী লোকদের অবস্থা দেখার দাবীদার রয়েছে। কেউ কেউ, রাসূল সঃ কে হায়াতুন্নবী নামের এক ভুল শব্দ ও ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে, ও সে বিশ্বাস বিক্রিকরে ধর্মব্যবসা চালায়। তাদের কথানুযায়ী রাসূলুল্লাহ যদি জীবিত হয়ে সবকিছু দেখতে পান, তাহলে তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সঃ তার রওযা মুবারকে বসে নিশ্চয়ই দেখছেন যে তাঁর প্রিয় ইবন্ মাসউদ, আম্মার ও উসামাহ তাঁরই মসজিদে নির্দয় ভাবে প্রহারিত হচ্ছে। তখন তিনি তাও নিশ্চয় ভেবেছেন যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় মুস্তাদআফ্রা মক্কায় কা'বার চত্বরে মার খেয়েছে নামধারী মক্কার কাফের মুস্তাকবিরদের হাতে ঈমান আনার অপরাধে, এখন মার খাচ্ছে মসজিদে নববীর চত্বরে ঈমান রক্ষার অপরাধে মুসলিম মুস্তাকবিরদের হাতে। মুস্তাকবিররা মুসলিম হলেও মুস্তাকবির রোগ যায়না! মুস্তাদআফরা ঈমান আনার পর মার খেলেও ঈমান ত্যাগ করেনা! এ পার্থক্য কি বুঝার সময় আসেনি?
সত্য কাশ্ফুল কুবুর ওদেরই হয়, যাদের কাশ্ফুল হুজুর, অর্থাৎ বাস্তব, দৃশ্যমান ঘটনার রহস্যের কাশ্ফ হয়। আল্লাহ্ এ সত্যই ক্বোরআনে বলে দিয়েছেন ঃ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا
যারা পার্থিব জীবনে সত্যদর্শনে অন্ধ, তারা পরকালের ব্যাপারেও অন্ধ এবং অধিকতরো বিপথগামী হয়। (বনী ইসরাঈল-৭২) আল্লাহ যাদের পার্থিব জীবনে সত্য দর্শনের দৃষ্টিদান করেন, তারা কাল, পাত্র ও স্থান নির্বিশেষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনার ন্যায় অন্যায় দেখে। এটাকেই রাসূল সঃ মু'মিনের দূর দৃষ্টি বা "ফিরাসাতুল্ মু'মিন" বলেছেন। ইয়া আল্লাহ, হে মুস্তাদআফ্দের অভিভাবক, আপনি আমাদের সে কালজয়ী ইমাম দান করুন। সারা বিশ্বে আমরা তার অপেক্ষায় আছি, যার পরিচয়ে রোজ ক্বেয়ামতে আপনি ঈমানদারদের ডেকে তাদের

আমলনামা বা পরীক্ষার ফল ডান হাতে দিবেন। আমীন।

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীর ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে আমার একটি বিশেষ ফরিয়াদ আছে। তাহলো, ইয়া আল্লাহ, আপনার এ বান্দারা যদি তাদের সীমাবদ্ধতার জন্য এ ভুলগুলো করে থাকে, তা হলে আপনি মেহেরবানীকরে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত ভুল হতে বের হয়ে এসে সত্য দেখতে ও বিশ্বকে সত্য দেখাতে আমাদের তাউফিক্ব দান করুন। আর যদি বুঝে শুনে করে থাকে, তা হলে তাদের ব্যাপার আপনার হাতে ন্যস্ত করলাম। আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করেবেন। কিন্তু আমাদের তাদের ভুল থেকে তওবা ক্ববুল করে নবী রাসূলদের সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা নাজাতের পথ প্রদর্শক দান করুন। আমরা তাদের চার জনের খেলাফতের খাঁচা ভেঙ্গে দিলাম। যারা এ খাঁচা তৈরী করে ১৪১২ বছর যাবত মানুষকে অন্ধকারে রেখেছে এবং এখনো তা টিকিয়ে রাখতে চায়, তাদের উৎখাত করে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান ও শক্তি আমাদের দান করুন। আমীন।

সিরাতুল মুস্তাক্বীম পাওয়া যেমন সোজা, তেমন কঠিনও। সবকিছু দিয়ে আল্লাহর নিকট তা চাইলে তা মিলে। তালগাছ নিজ ভাগে রেখে চাইলে তা মিলা দুষ্কর। আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীর মধ্যে তুলনামূলক ভাবে আলী সাবীলুল্লাহ বা সিরাতুল মুস্তাক্বীমের এতো কাছে ছিলো যে এক কদম ডানে মারলেই মহাসড়কে উঠে যেতো। আলী খলীফা হয়ে আনসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলো। যা আবু বকর, উমর ও ওসমান করেনি। আলী রাসূল সঃ এর ঘরে সে কৃতজ্ঞতায় লালিত হয়েছে, যে কৃজ্ঞতায় ফাতিমা পালিত হয়েছে। ফাতিমার সংসারে বহু সন্তান থাকা সত্ত্বেও রাসূল সঃ তাকে একটি কাজের লোক দেননি। দূর থেকে পানি টেনে কাঁধে চলটা পড়ে গিয়েছিলো। হাতে গমভাঙ্গা চাকতি ঘোরাতে ঘোরাতে হাতে ঘা হয়ে গিয়েছিলো। এ তারবিয়াতের ফলে আলী রাসূল সঃ এর জীবনধারণ ও ধরনের অনেক কাছে ছিলো। ক্বোরেশী হাশেমী পরিচিতিটা মুছে ফেললেই মুস্তাদআফ্ যায়দ, আম্মার ও ইবন্ মাসউদদের সাথে একাকার হয়ে যেতো। তা সত্ত্বেও আম্মার ও ইব্ন মাসউদ ওসমানী ফিত্নার যুগে ও পরে আলীর পক্ষ সমর্থন করেছে এবং আলীও তাদের প্রতি একান্ত ছিলো। রাসূল সঃ এর প্রিয় নাতি হাসান ও হোসাইন তাদের পিতা-মাতার মতো ছোটোবেলায় কৃজ্ঞতায় লালিত পালিত হয়। ইসলামে পোষ্য ও সন্তানদের ব্যাপারে বিধান হলো, পিতামাতা ও অভিভাবককে তাদের আল্লাহর সৈনিকবান্দা রূপে গড়ে তুলতে হবে। তাতে ব্যর্থ হলে পিতা-মাতা ও অভিভাবককে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে। শৈশব থেকে কৈশোর পার হয়ে যৌবন পর্যন্ত এ দায়িত্ব অভিভাবককে পালন করতেই হবে। বালেগ হলে এ দায়িত্ব প্রত্যেক মুক্ত মানুষের নিজের হয়ে যায়।

<u>সন্তানদের বালেগ হওয়ার পূর্বেই তাদের আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজে ঐ সমস্ত কাজগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে সবসময় জিহাদ ফরজ। যেখানেই ঐ সমস্ত পালনে ত্রুটি দেখা যাবে, সেখানেই জিহাদ ফরজ। জিহাদী উম্মাহ আল্লাহর সৈনিক। তারা অবৈতনিক। নিজেদের জানমাল দিয়ে দ্বীনপ্রতিষ্ঠা ও তাকে অতন্দ্র পাহারা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে।</u>

মুসলিম উম্মাহর কোনো সদস্য ভোগবাদী, আরাম প্রিয় ও অলস হতে পারবেনা। সর্বদা তাদের প্রশিক্ষণ চলবে। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা চলবেই। যেমন মুসলিম উম্মাহর নেতা, ইমাম নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের আমরণ চলেছে। ছেলে কি মেয়ে, মুসলিম পরিবারে তারা পিতা-মাতার সাথে শারীরিক ইবাদতের সাথে রূহানী আন্তনিয়ন্ত্রনের প্রশিক্ষণও নিবে। তারা কায়িক পরিশ্রম করে গৃহকর্ম থেকে প্রত্যেক কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য করবে। বাড়ীতে কোনো অবস্থাতেই চাকর-চাকরানী থাকবেনা। সম্ভব হলে এতিম, আশ্রয়হীন ও মুস্তাদআফ্দের পরিবারের সদস্যরূপে গ্রহণ করে তাদের পরিবার ভূক্ত করবে। এ যোগ্যতা যাদের নেই, তারা পরিবারে দরিদ্র ও অভাব গ্রস্থ ছেলে-মেয়েদের বেতন প্রভৃতির ভিত্তিতে চাকর-চাকরানী রূপে রেখে পরিবারের সদস্যদের সেবাদাস বানাবেনা। তাতে মানুষে মানুষে বৈষম্য ও সন্তানদের অলস ও প্রভূত্বের মানসিকতায় বড়ো করা হয়। তাতেই আবু জেহেল, আবু সুফ্য়ান, হিন্দা ও বিলাল, আম্মার, সুমাইয়া ও ইবন মাসউদদের বৈষম্যজনিত দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম হয়। রাসূল সঃ বারাকাহ্ কর্তৃক লালিত হয়ে পরে যায়দ, উসামাহ ও শাক্‌রানদের যেভাবে একাকার করেছেন, সেভাবে সমাজের নির্যাতিতদের পরিবারভূক্ত করে সন্তানের মতো তাদের সেবা নেয়া যায় এবং বিনিময়ে তাদেরও সাম্যের ভিত্তিতে সেবা করতে হবে।

পরিবারের প্রাপ্তবয়স্করা পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে, শ্রম ও সাওমের দ্বারা নিজেদের দৈহিক যৌন পাশবতাকে নিয়ন্ত্রণে

রাখবে। তা না হলে পাশব যৌনতা পরিবারের সদস্যদের তাগুত বানিয়ে সমাজে ঘুনের জন্ম দেয়। মানবতার সর্বশেষ, সম্পূর্ণ আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসুলসুল্লাহ সঃ তাঁর ঘরে আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসেইন ও যায়দ এবং উসামাহদের সেভাবে মানুষ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাইতুল মালের বন্টনও তিনি মাথাভিত্তিক সাম্যে করে গিয়েছেন। স্ত্রীদের বেশী দেননি। স্ত্রীরা বেশী চাইলে তাদের তালাক দেয়ার নির্দেশ হয় আল্লাহর আরশ থেকে।
উমরের আমলে বৈষম্যমূলক বন্টন আরম্ভ হলে ঘরে ঘরে বৈষম্যের বীজ বপিত হয়ে তা অঙ্কুরিত হয়ে বিষবৃক্ষ রূপে বড়ো হয়ে ফল দিতে আরম্ভ করলে উমর ভুল বুঝে সে গাছ উপড়াতে মনস্থ করলে তাকেই উপড়ে বিদায় করা হয়। ওসমানের আমলে বৈষম্যের নারকীয় খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। তাতে কোনো ঘর বৈষম্যবাদী ধন বন্টনের বিষফল থেকে রক্ষা পায়নি। তাকে হালাল করার জন্য মিথ্যা হাদীস বানিয়ে প্রচার আরম্ভ হয়। ওসমান গনী হয়ে যায়, আব্দুর রহমান ইবন্ আউফ, ধনী হয়ে যায়। তালহা যুবাইর এতো ধনী হয় যে তাদের দৈনিক আয় শত শত দিনার ছাড়িয়ে যায়। তালহার মেয়ে সুন্দরী আয়শা সৌন্দর্য্য চর্চায় হিজাব খুলে ফেলার মতো ঘটনা ঘটায়। তার খালা, মা আয়শাও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। তাদের পিতারাও বিবাহকে নেশায় রূপান্তরিত করে। আব্দুর রহমান ইবন আউফ মোট ষাটটি বিবাহ করে। যারা খুব কম বিবাহ করেছে, তাদের বিয়ের সংখ্যাও ডজনের কম ছিলোনা। ফলে তাদের ছেলে মেয়েরাও যৌন উম্মাদনায় ইসলামী সংযমী জীবনকে অতীতের ইতিহাসে রূপান্তরিত করে। এ জোয়ারের ঢেউ আলীর ঘরেও লাগে। তাতে হাসান ভেসে যায়। হোসেইন তার নানা ও পিতার আদর্শে নিজেকে সীমিত রাখতে যত্নবান হয়। তখন হাসান, হোসেইন উভয়ই বড়ো হয়ে গিয়েছে। পিতার ফরজ নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর ছিলোনা। পচনধরা সমাজ রাসূল সঃ এর শিক্ষাকে বিসর্জন দিলেও তাঁর প্রতি বিকৃত ভক্তি দেখানোর জন্য রাসূলের নাতিদের বীজ গ্রহণের নামে হাসান ও হোসেইনের সাথে তাদের মেয়েদের বিবাহ দেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে যায়। আলী পিতা হিসেবে তাদের সতর্ক করে দেয়। হাসান তা মানেনি। হোসেইন নিজের বিবেকের সাথে পিতার উপদেশ যোগ দিয়ে সতর্ক হয়ে যায়। হাসান অসতর্ক হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে ইতিহাসে দেখা যায় যে, হাসান তার একচল্লিশ বছর জীবনে এক হাজারটি বিবাহ করে। যারা সবচেয়ে কম বলে, তাদের মতেও তার বিবাহ একশটি। পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ, ফরয ইবাদাতের সাথে নফল ইবাদত, বিশেষ করে তাহাজ্জুদ পড়া ও বেশী রোযার মাধ্যমে ঈমানদার নরনারীর জীবন দৈহিক ও রূহানী শক্তির দুর্গে নিরাপদ অবস্থানে বাস করে। তার ব্যতিক্রম হলেই মাথা ও বিবেকের উপর লিঙ্গের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়ে মানব দেহে যৌন ক্রিয়ার কুকুর-কুকুরী অবস্থান নেয়। বর্তমান বিশ্বে যা ঘটছে, তাতে এ প্রতিবেদনকে অস্বীকার করার সাধ্য আছে? আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা ত্যাগ করে ওসমানের উমাইয়ার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুখে যে আলী বাঁধসৃষ্টির প্রয়াসে খেলাফতে বসে সে আর খলীফা হতে পারেনি। মা আয়শা, তার দু'ভগ্নিপতি তালহা ও যুবাইর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে যায়। ইসলামের নিয়মে আলী খলীফা হলে মা আয়শা, তালহা ও যুবাইররা বিদ্রোহী মুর্তাদ, আর তারা সঠিক হলে আলী মুর্তাদ! উভয় সঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের তুলনায় মা আয়শা, আলী, তালহা ও যুবাইর কেনো, সারা বিশ্বের মানুষও তৃনখন্ড। ক্বোরআন ও রাসূল বাদে এদের কোনো মূল্য নেই। যারা এদের আলাদা মূল্য দিবে, তারা কাফের না হলেও মুশরিক।
গোত্রবাদী ক্বোরেশী নেতৃত্বের একপ্রান্তে আলী। আরেক প্রান্তে মুয়াবিয়া। ক্বোরেশী হলেও এ দু'য়ের মধ্যে কোনো তুলনা চলেনা। কিন্তু জাহেলিয়াত শুরু হলে মুহাম্মাদ সঃ ও যায়দদের কোনো ভবিষ্যত নেই। যেমন মুহাম্মাদ সঃ ও যায়দদের বিজয় আরম্ভ হওয়ার পর আবু জেহেল, আবু লাহ্ব ও আবু সুফ্য়ানের উৎপাটন ঘটেছিলো। আলীর মুয়াবিয়াকে দমনের পথে সব চেয়ে বড়ো বাধা হয়েছিলো আম্মাজান আয়শা। আল্লাহ ও আব্বাজান রাসূলের সকল শিক্ষাকে লন্ডভন্ড করে আম্মাজান দু খালুকে সঙ্গে নিয়ে ময়দানে নেমে উভয় পক্ষে সাত দিনের যুদ্ধে বিশ হাযার, পিতামাতার নিবেদিত প্রাণ সন্তানকে হত্যা করে তাদের লাশকে শকুন শিয়ালের খাদ্য বানিয়ে ঘরে ফিরে। সাথে সাথে দু'বোনকেও বিধবা বানিয়ে আসে।
এ চাপানো যুদ্ধে নিরুপায় আলী কিন্তু তার ভারসাম্যতা হারায়নি। রাসূল সঃ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষায় আলী দ্বীন, ঈমান ও ক্বোরআন রক্ষার্থে আত্মরক্ষার যুদ্ধ করেছে। মা আয়শা জিতলে কিন্তু আলীর গর্দান ঘাড়ে থাকতোনা। বরং বলা চলে যে হোসাইনের কর্তিত মাথার মতো আলীর মাথা মুয়াবিয়া ও মারওয়ানদের বিজয়ের পদক হতো, যেমনটা কারবালার পরে ইয়াযীদের দরবারে হয়েছিলো।

উষ্ট্রের মর্মান্তিক যুদ্ধে আলী বিজয়ী হয়ে তার অনুসারীদের শক্ত ভাবে তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলো। পরাজয় শুরু হতেই আলী ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, পলায়নপর কারো পিছু ধাওয়া করা চলবেনা। পরাজিতদের সম্পদ মালে গনীমত হবেনা। সকল আহতকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে এবং কারো থেকে কোনো প্রতিশোধ নেয়া চলবেনা। প্রচলিত যুদ্ধের নিয়মে আলীর এ ঘোষণা সম্পূর্ণ এক নুতন ব্যাপার। এ যাবত এ নিয়ম ছিলো যে, পরাজিতদের মাল, গনিমতের মাল এবং পরাজিতরা যুদ্ধবন্দী। তাদের বিজয়ীদের মাঝে বন্টন করতে হয়। আলী বললো যে, এ যুদ্ধ সে যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ ভুল বুঝাবুঝির ফল দু'মুসলিম ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কাফের ও মু'মিনদের মাঝের যুদ্ধ নয়। তাই এখানে গনীমত বন্টন করা হবেনা। ইসলামী ইমামত ত্যাগকারী জাতি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা সবাই নিজেরা ইমাম হয়ে যায়। উষ্ট্রের যুদ্ধের পরও তাই হলো। আলীর কথা তার সঙ্গীরা মেনে নিতে চাইলোনা। তারা পাল্টা যুক্তি দাঁড় করিয়ে গনীমত বন্টনের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করলো। এ সমস্ত পরিস্থিতিতে সঠিক ইমামতের যোগ্যতার পরীক্ষা হয়। আলী ফিতনার আবর্তে পড়ে গেলেও যেহেতু রাসূল সঃ এর শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলো, তাই মাত্র একটি কথা বলেই বিরোধী প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো। আলী বললো যে, তোমরা যেহেতু আমার কথা মানতে রাজী নও, **"তোমরা তোমাদের মতানুযায়ী কাজ করবে। তাহলে এসো, তোমাদের মতানুযায়ীই বন্টন হোক। আমি সর্বপ্রথম মা আয়শাকে বন্টন করতে চাই। তোমরা কে তাকে দাসী রূপে নিবে বলো?" একথা শুনতেই সবাই "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলে তওবা করতে লাগলো। এক কথায়ই সব বিরোধ খতম হয়ে গেলো।**

আলী অত্যান্ত সম্মানের সাথে মা আয়শাকে নারী প্রহরীদের পাহারায় মাদীনায় পাঠিয়ে দেয়। মা আয়শা ঘরে ফিরেছে। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ ঘরে ফিরেনি। উম্মাহ নারী নেতৃত্বের ফিতনায় ঘরছাড়া হয়ে আহত হয়ে মরুপ্রান্তরে মৃত্যুর প্রহর গুনতে লাগলো। মা আয়শা কাব্য-কবিতা বাদ দিয়ে ঘরে বসে আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক আদিষ্ট কাজ ক্বোরআন অনুসৃত জীবন যাপনের পরিবর্তে আরেক ফিতনা আরম্ভ করে দিলো। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাদীস-তাফ্সীর বর্ণনা আরম্ভ করে দিলো। ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষায় কোথাও মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগিরীর দায়িত্ব নারীদের দেয়া হয়নি। তা করতে গেলেই বেপর্দেগী হবে এবং নারীর বেপর্দেগী পুরুষের জন্য সবচেয়ে মারত্মক ফিতনা। নারী কণ্ঠ পুরুষকে শয়তানীর দাওয়াত দেয় বলেই আল্লাহ্ নবী সঃ এর স্ত্রীদেরও বলে দিয়েছেন, "তোমরা ঘরে থাকবে, ঘরে বসে ক্বোরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিক্র করবে। বাইরে জাহেলী কাজে কখনো বের হবেনা। কারো সাথে কোনো কথা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে বলবে। তাও কর্কশ স্বরে বলবে। নরম মিষ্টি ভাষায় বলবেনা। তাতে রুগ্ন মনে কামভাব জাগ্রত করবে। তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কার করে আল্লাহর রাসূলের ঘর পবিত্র করতে চান," ইত্যাদি। (দেখো-সূরা আহযাবের ৩২-৩৪ আয়াত পর্যন্ত)। মা আয়শা এ সবকিছু পদদলিত করে যুদ্ধে গিয়ে বিশ হাজার বাছা বাছা ঈমানদারদের প্রাণনাশের নেত্রী হয়ে বাড়ী ফিরে পুরানো ফিতনার আগুনে আরো বাতাস দিতে আরম্ভ করলো।

মুয়াবিয়া ও মারওয়ানরা মহাখুশী। আলী আর মরুবালুর সৃষ্ট কুফর ও নিফাকের ভেড়ার পালকে একত্র করতে পারলোনা। সে পালের ভিতরে এক লুকানো মরু-নেকড়ের আক্রমনে আলী বিদায় নিলো। তারপর বহু বিবাহের নায়ক তার ছেলে হাসান আর তার পিতার হাল ধরতে সক্ষম হলোনা। তার আরাম ও আরো বিবাহের ব্যবস্থা করনার্থে সে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি চুক্তি করে খোজেস্তানের রাজস্বের বিনিময়ে মুয়াবিয়ার হাতে বায়আত হয়ে তার নানার ইমামতের জানাযা পড়ে। মুয়াবিয়া তা লুফে নিয়ে তার আরবী সিজার হওয়ার অভিষেক উৎসবের প্রস্তুতি নেয়। হাসান তার ছোটো ভাইকে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করলে লোহারবেড়ী দিয়ে বন্দী করবে হুমকি দেয়। হাসান বিবাহ বিবাহ খেলে ঐ মায়ের সাথে ব্যাভিচারের ফসল, মনজুর ইবন যিব্বানের ডাবল হারামজাদী মেয়েকেও বিবাহ করে। যুক্তি, মেয়ের কী দোষ? দোষ তার পিতা-মাতার। মেয়ে নামকরা সুন্দরী। এভাবেই আরেক সুন্দরীকে দিয়ে মুয়াবিয়া হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে তার জারজ সন্তান ইয়াযীদের সিংহাসনারোহনের পথ পরিস্কার করে। তার পর রয়ে যায় মাত্র, একমাত্র কাঁটা হুসেইন। হুসেইন যেহেতু লিঙ্গের পরিবর্তে মাথা দিয়ে চিন্তা করার যোগ্য নানার ও পিতার গুণের অধিকারী ছিলো, তাই তার বুঝতে বাকী ছিলোনা যে আবু সুফ্য়ান ও হিন্দার কুকুরবৃত্তির ফসল, তাদের দেয়া নামের কুকুরের হাত থেকে তার আর রক্ষা নেই। তাই সে ওদের হাতে ধৃত হয়ে খরগোশের মতো জবাই না হয়ে সিংহের মতো ময়দানে লড়াই করে কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ করে নানা ও বাবার আমানত সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

মানুষ কি পশু, তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে তাকে সে অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক কাজ দিয়ে তার

নাফ্সকে ব্যস্ত না রাখলে তার বাড়তি শক্তি তাকে যৌন পাশবতার দিকে ঠেলে দিবেই। তাই গরু-ছাগল সদৃশ প্রাণীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রজননের অতিরিক্তগুলোকে বিচি ফেলে খাসী করে দেয়া হয়। তদরূপ আল্লাহর বান্দা মানুষকে হালাল রিযিক্বের জন্য শ্রম, আল্লাহর ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনার ফরজ রোজা ও নফল রোজা দিয়ে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্য রাসূল সঃ বেশী বেশী রোজা রাখতেন। হযরত দাউদ সারা বছর একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন। তিনি রাজা ও নবী এক সাথে ছিলেন। আল্লাহর সৈনিক মুমিনদেরও বেশী বেশী নফল রোজা রাখার তাগিদ ক্বোরআনে দেখা যায়। নরনারীদের "সা'ইহীন ও সা'ইহাত্" বলে তাই বুঝানো হয়েছে।

হাসান ও হুসেইন দু'ভাইর মধ্যে আমরা এর ফলে পার্থক্য দেখতে পাই। একজন সকালে একজোড়া ও বিকালে একজোড়া বা এক হালি বিয়ের জন্য রোজা রাখার ফুরসত পাচ্ছেনা। আর একজন কারবালার প্রান্তরে রোজা অবস্থায় জিহাদ করতে যায়। ফলে আমাদের সাধারণদের নিজেদের ও সন্তানদের ঈমানী জীবন গঠনের জন্য নফ্স্ দমন ও রূহানী সাধনার জন্য কতোটুকু তৎপর হওয়া প্রয়োজন? পশ্চিমা সমাজের প্রাচুর্য্য তাদের যৌনবিকৃতির কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে? আমাদের দরিদ্র দেশে, সারাদেশ লুটে প্রাচুর্য্যভোগী ও তাদের ছেলে মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, হোটেলে-রেস্তোরায় ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়তি মাংসের জ্বালায় কিরূপ মাংসের প্রদর্শনী করছে? এরা না বাড়িতে ঝি-চাকরানীদের পিটিয়ে মারে? যৌন নিপীড়নের পর গলা টিপে হত্যা করে? এটা যদি ঈমানদার মানব সমাজ হতো, মেয়েরা যদি সংসারের সবকাজ মা-মেয়ে মিলে সমাধা করতো, কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা থেকে সব শ্রম নিজেরা দিতো, ও ছেলেরা পড়ালেখার পরই পিতার সাথে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতো এবং পিতা পুত্রকে নিয়ে সালাতে দাড়াতো, তা হলে কি লিঙ্গ নিয়ে ঘাটাঘাটি করার ফুরসত পেতো? টেলিভিশন ও ইন্টারনেট দেখে কুকুর-কুকুরী হয়ে মা-মেয়ে ও পিতা-পুত্র পাপাচারে একাকার হতো? আল্লাহ ন্যায়নীতির নির্দেশ দেন এবং সকল অশ্লীলতা এবং গর্হিত কাজ নিষেধ করেন।

রাসুল হিজরত করে মক্কার শির্ক ও যৌন ব্যভিচারের সমাজ ত্যাগ করে মাদীনায় গিয়ে পবিত্র মানবতার সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করে যান। তাঁর অনুসরণের ফলে বর্বর মরু মানুষগুলোর চরিত্রে কী পরিবর্তন আসা আরম্ভ করে? তাঁর তোলা ঢেউয়ে তখনকার দুটি পরাশক্তি ভেসে যায়। তাঁর সে কৃজ্ঞতার জীবনাদর্শ আঁকড়ে থাকলে বিশ্বের অবস্থা কী হতো? এক ইঞ্চি যমিন পাপাচারের জন্য খালি থাকতো? রাসূল সঃ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলেছেন তাঁর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে পৃথিবীর বুকে কোনো তাঁবু ও পাকা ঘর এমন থাকবেনা, যেখানে এ দ্বীন প্রবেশ করবেনা। আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ বলে যে যাত্রাকে থামিয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে, তা সত্যিকার অর্থে পুনঃশুরু হতে যাচ্ছে। ইনশা আল্লাহ।

কারবালার পরিণতি মুস্তাদআফ ইমামত অমান্য করার ফল। কেবল আবার মুস্তাদআফ, গোত্র ও বর্ণবাদ মুক্ত ইমামত বুঝে আসলেই মুস্তাকবির উৎখাতের আসমানী সাহায্য পুনঃ পৃথিবীতে ঈসা রুহুল্লাহর আগমনের ন্যায় অবতীর্ণ হবে।

আলীর মৃত্যুর পর ইসলামকে সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করে ক্বোরেশী কুকুর ও কুকুরীর বেটা ও নাতির যে দাজ্জালী আরম্ভ হয়, তাকে বৈধ করার জন্য রাসূলের নামে যে হাদীস বানানো হয় যে তাঁর পর তিরিশ বছর খেলাফত থাকবে, তারপর রাজতন্ত্র আরম্ভ হবে। তাহলে বোখারী মুসলিমের হাদীস, "আমার পর, পরপর বারো জন খলিফা হবে, তারা হবে ক্বোরেশ থেকে", সে হাদীস কোথা যায়? তিরিশ বছরের মাথায় খেলাফত শেষ হয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তো আর খলিফা হতে পারেনা? খলিফা হলে আর রাজতন্ত্র হয়না। রাসূলের খেলাফত হলে তাতে মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ান খলিফা হতে পারেনা! ওদের রাজতন্ত্র যদি খেলাফত হয়, তা হলে আলীকে দীর্ঘ ষাট বছর জুমা, ঈদ ও হজ্বের খুতবায় গালী দেয়া ও লানত করা সম্ভব?

ঐ মিথ্যা হাদীসের পাশাপাশি রাসূল সঃ এর পর বারোজন ক্বোরেশী ইমাম হবার হাদীস তৈরী করে আলীর বংশ থেকে বারো ইমামের শিয়া ফিতনা আমাদের মুক্তির পথে বাধা, দুয়ারের দ্বিতীয় পাট। এ দুপাটকে একই ধাক্কায় ভেঙ্গে ঐ সমস্ত গাঁজাখোরীর হাদীস ধারণ ও প্রচারকারী সুন্নী ও শিয়া, শৃগাল ও শিম্পাঞ্জীদের খুঁজে ধরে খাঁচায় বন্দি করে চিড়িয়াখানায় পাঠাতে হবে। এরাই ক্বোরআনে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের শুকর বানরের পরিবর্তিত রূপ। ইরান আফগান বিরোধের সীমান্তে এদের মুখোমুখি সমাবেশ।

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র, মক্কা, মাদীনা, মিশর, সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া ও আলজেরিয়াসহ সকল আরব দেশ, তার প্রভাবে গোটা আফ্রিকা এবং এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও

ইন্দোনেশিয়ার প্রায় সকল মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সূরা তওবায় বর্ণিত ৩৪, ৩৫ নং আয়াতের ধর্ম ব্যবসায়ী, জনগণের পয়সা অবৈধ ভক্ষণকারীদের কব্জায়। এরা সবাই সূরা মাঈদার ৪২ নং আয়াতের বিশ্বহারামখোর মিথ্যুক। سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ এরা নিঃসন্দেহে প্রাক্তন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্মব্যবসায়ীদের নব্য সংস্করণ।

এদের মধ্যে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীন ও জামাতে ইসলামীর ভোগবাদের নষ্ট নেতৃত্ব বর্তমানে আন্তর্জাতিক নব্য ইয়াহুদীবাদের গলিত পচিত নর্দমার কুৎসিত কদাকার মহামারী ছড়ানো জীবানু। এদের নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর, পৃথিবীর সম্ভাবনাময় যুবক শ্রেণীকে ইসলামের ভ্রান্ত-ধারণা দিয়ে পিতামাতা ও অভিভাবকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিশ্বে এক দাজ্জালী জাল ছড়ানোয় ব্যস্ত। এ জাল দেখতে খুব মজবুত হলেও মূলে মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। তাওহীদ ও রিসালাতের ঝাড়ু মারা আরম্ভ করলে কোথাও এদের অস্তিত্ব থাকবেনা। এক নিমিষে উধাও হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

ইউরোপ আমেরিকা সহ সকল অমুসলিম বিশ্বের ধনী ও বিজ্ঞানে উন্নত দেশ সমূহে প্রাচুর্য্যের জোয়ারে ব্যভিচার ও মাদক আসক্ত ঘরভাঙ্গা মানুষগুলোর ইসলাম গ্রহণের পথে এ ইখওয়ানী ও জামাতী নব্য-ভোগবাদি চক্র সবচেয়ে ক্ষতিকারক বাধা। এদের নেতারা তাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য প্রবাসীদের ঢালাও ফাতোয়া দিয়েছে যে, "ইয়াহুদী নাসারা কা-মাল, সব হালাল"। যেমনে পারো ধর্মের নামে বা অন্যান্য প্রতারণায় টেক্স ফাঁকী দিয়ে মাল কামাই করো। তার বখরা আমাদের বাইতুল মালের ফান্ডে দিলে সব শূকর দুম্বা হয়ে হালাল হয়ে যাবে। এরা এক চরম কুৎসিত ধন লিপ্সু প্রতারক। সারা বিশ্বে ছড়ানো এদের নেটওয়ার্ক সঠিক ইসলামী দাওয়াতের পথে দূর্ণামের বাধা।

এদের এ আচরণের ফলে ঐ সমস্ত সমাজে ইসলাম, ইয়াহুদী নাসারা রাব্বাই ও পাদ্রীদের প্রতারণার মতো আরেকটি প্রতারণার রূপ নিয়েছে। এর ফলে জামাত ও ইখওয়ানীদের মাঝে জঘন্য অর্থলোভী এক শ্রেণীর হারামখোর চক্র লোকদেখানো নামাজী দাজ্জাল জন্ম দিয়ে এদের বংশ বিস্তার করছে। এদের অজান্তেই এদের প্রক্রিয়া ও হারামধনে এক হারামখোর প্রজন্ম মুসলিম সমাজে জন্ম নিচ্ছে। সাধারণ বেদ্বীন সমাজে কাফের, নাস্তিক ও ধর্মহীন জনগোষ্ঠি জন্মায়। তাদের চেয়ে এ শ্রেণীর হারাম ধর্মব্যবসায়ীরা জঘন্য। কারণ, এরা বিকৃত ধর্মের আবরণে জন্মানো। এরা সরল জনগণের ঈমান নষ্ট করে। এদের তওবার দরজা বন্ধ। কারণ এরা মনে করে যে এরাতো ধর্মে আছেই! তাই তওবা কিসের?

সাধারণ জাহেলিয়াতে জন্মানো মানুষদের জন্য তওবা করে দ্বীনের শৃঙ্খলায় আশা সম্ভব। কারণ তারা কাঁচামাল। ভালো প্রক্রিয়ায় পড়লেই এরা ফিনিশ্‌ড প্রডাক্ট বা পাকামাল হয়ে মানবতার কল্যাণে আসবে। আর ওরা পঁচা মাল। ওরা পাকা মাল ও কাঁচা মালে পচন ধরায়। তাই ওদের ডিডিটি ছিটিয়ে নাশ করতে হবে। তা না হলে সমাজের সাধারণ মানুষগুলো সব পঁচে যাবে। এ পচন ঠেকানো এখন সবচেয়ে বড়ো এবং মূখ্য কাজ। বিধর্মীরা এখন ইসলাম প্রচারের পথে বড়ো বাধা নয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকার পর এরা ঈমান কবুলের কাঁচামাল।

মূল ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর উমাইয়া ও আব্বাসী ভোগবাদী নব্য ইয়াহুদীবাদের সর্বশেষবিকৃতি এ ইখ্ওয়ানী জামাতী নেতারা। এদের মাখন-খোর আমীর ও নেতারা মধ্য প্রাচ্যের চরিত্রহীন রাজা-বাদশা ও শেখদের আমেরিকান-ইয়াহুদী তেল কোম্পানীর ভাগিদারী সুদী ব্যবসার সুদের উচ্ছিষ্টে ও সাধারণ ধর্মপ্রাণ আরব ব্যবসায়ী ধনীদের দান ও দলীয় প্রবাসীদের চাঁদায় ব্যাংক, বীমা, ঔষধ কোম্পানী ও হাসপাতাল ব্যবসা করে ক্বারুনের নব্য সংস্করণ হচ্ছে ইখওয়ানীরা। আরবী ভাষী বলে ওরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ কম বেশী ক্বোরআন হাদীস জানে। তাই পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী আধুনিক শিক্ষিত জামাতী নেতাদের মতো ওদের "মুফাস্সিরে ক্বোরআন" ও "মুহাদ্দিস" পুষতে হয়না। আরবরা নিজেরাই ঐকাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম। কিন্তু, বিশেষ করে বাংলাদেশী জামাতী নেতৃত্ব মূর্খ হওয়ায় তাদের মোল্লা পুষতে হচ্ছে। কিন্তু আলেমরা যাতে নেতৃত্বে আসতে না পারে, সে জন্য নেতা কিছু মারওয়ান তৈরী করে তাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে বসিয়ে মোল্লাদের সামনে কিছু অর্থ-স্বার্থের মূলা ঝুলিয়ে ওদের দিয়ে দেশ-বিদেশে ক্যান্‌ভাসে ব্যবহার করছে। মারওয়ানরা তাদের আলেম প্রচারকদের ব্যাপারে মনে মনে খুব ঈর্ষা পোষন করে, যা তারা কখনো কখনো প্রকাশও করে ফেলে। কিন্তু ওদের ছাড়া চলেনা বলে ওদের এরা পয়সা দিয়ে পুষে। ঠিক একাজটিই মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও আব্দুল মালিক ইব্‌ন্ মারওয়ানরা ইব্‌ন্ আব্বাস, ইবন ওমর ও যুহরীদের দ্বারা করিয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের এক সময়ের ইসলামী পূনর্জাগরণের আহবায়ক ইখওয়ান ও জামাতে ইসলাম দল দুটি বিশ্বের ইসলামী ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী যুবকদের একমাত্র সংগঠিত ফোরাম ছিলো। তাই বিশ্বময় সমাজের বাছা ছেলেরা সব সময়ে ওদের শিকার হয়েছে। তাবলীগ জামাত, মাদ্রাসা মসজিদের মোল্লা ও পীরেরা তাদের আধুনিক ধ্যাণ ধারণা না থাকায় ওদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলামী বিপ্লবের পিয়াসী যুবকরা দেশে বিদেশে বর্তমানে তাদের নেতাদের আপোষকামিতা, ধনলিপ্সা, অনৈসলামী ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং সবার উর্ধ্বে বেহায়া রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নিকৃষ্ট চরিত্র দেখে চরম হতাশায় ভুগছে। বিশেষ করে এদের চোখে ধরা পড়ে যায় যে এরা দিন দিন নিজ নিজ দেশে ইসলামী ও ঈমানী ক্ষেত্রে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণস্তরে পৌছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, এবং এদের নেতা, ও তার চারপাশের মারওয়ানদের বাড়ীগাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স ও তাদের ছেলেমেয়েদের দেশে বিদেশে দামী স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া হচ্ছে। অথচ কর্মীদের ঠিক মতো কর্মসংস্থানও হচ্ছে না। এদের এ কাজের সমালোচনা করলে হয় সমালোচনাকারীদের নেতাদের অর্থনৈতিক উৎকোচ দিয়ে থামিয়ে দেয়, নয়, আপোষহীন হলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দল থেকে বহিস্কার করে দেয়।

এ ধর্মীয় দাজ্জালদের নিজেদের মধ্যে লোক ধরে রাখার জন্য নিরর্থক নামাজ রোজা, সেমিনার ও মিলাদুন্নবী এবং তাফসীর মাহ্ফিলের জৌলুসপূর্ণ আয়োজন আছে। ব্যাংক-বীমা করে এরা আজ সত্যিকার অর্থেই বিত্তশালী ইসলামী ইয়াহুদী। স্কুল কলেজের মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের নামে নুতন রিক্রুটের ফি ম্যাসন পদ্ধতিও এদের রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল কবি সাহিত্যিক ও আঁতালাক্‌চ্যুয়ালদের ভাড়া ও কেনার ব্যবস্থাও এদের মধ্যে রয়েছে।

এখানে পাঠকদের একটি মৌলিক বিষয় বুঝতে ও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে ইসলাম মানব জাতিকে তাওহীদ ও ঈমানের প্রক্রিয়ায় এক ও অভিন্ন পরিবার ভুক্ত করে। ইবলিস শয়তান ও তার মানব দালালরা এক পরিবারের মানুষ, এমনকি ভাই বোন ও পিতা পুত্রকে বহু ভাগে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ইসলামে পিতা, পুত্র ও পৌত্র প্রপৌত্ররা এক সংগঠনের সদস্য হয়। ইবলিসের নিয়মে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক, কর্মকর্তা নেতা, মালিক নেতা ও ছাত্র নেতা হয়। এরা প্রত্যেকে স্বার্থের পৃথক পৃথক গোষ্ঠি। "তাহ্সাবু হুম জামিআঁও ওয়া কুলুবুহুম শাত্তা," অর্থাৎ দেখতে এক পরিবার ও এক জামাত হলেও মূলে যতোজন তাতো মুনি! (সূরা হাশর-১৪)

ইবলিসের নিয়মে দল করে নামায, রোজা, জুমা ও ঈদ প্রভৃতি করা সত্ত্বেও এদের দলীয় বংশ বৃদ্ধি হচ্ছেনা। কারণ, ইসলাম হলো নামায, রোজা, জুমা, ঈদ ও হজ্বের দ্বারা সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। সে পথে জান মাল ও সন্তান সন্ততিকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়া। এদের কাজ হলো ধর্ম ও আল্লাহ রাসূলকে নিলাম করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা। তাই এদের সালাত, সাওম ও জামাত জুমা এদের বংশ বৃদ্ধি করছেনা। নেক কাজের ফল দশ গুণ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি আনে। মন্দ ও পাপ কাজ একে এক, থেকেই নির্মূল হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেমন বিবাহ দ্বারা সন্তান জন্ম দিয়ে একব্যক্তির জীবনেই ছেলে মেয়ে ও নাতিপুতি দিয়ে সাতশ'গুনেরও বেশী হতে পারে। যেমন সৌদী বাদশা আব্দুল আজীজ জীবদ্দশায়ই নাকি ৩৯ ছেলে ও ৭০ মেয়ের ঘরের দু'হাযার প্রজন্ম দেখে গিয়েছে। বৈধ ভাবে হলে তাতে দোষ নেই। অবৈধ ভাবে একটি হলেও হারামজাদা।

আমি এক একটি মৌলিক কথা লিখে তার প্রমাণের জন্য ঘটনাবলী তুলে ধরি। এ ঘটনার বর্ণনাকে "কেইস্ ষ্টাডী" রূপে পড়তে ও বুঝতে হবে। যেমন ডাক্তারী পড়ার সময় ও পরে হাসপাতালে ডিউটি ও ইন্-সার্ভিস ইন্টার্নশীপ করে ডাক্তার হতে হয়, তদরূপ আমার লেখা পড়ে বাস্তব উদাহরণে গিয়ে সত্য বুঝতে ও ধারণ করতে হবে। আল ক্বোরআনের বাচন ও ভঙ্গিও তাই।

বিশ্বের তথাকথিত ইসলামী নেতাদের বিকৃত চরিত্রের ফলে দিন দিন এদের গুণগত সংখ্যা প্রত্যেক দেশে কমে প্রায় শেষ হওয়ার দিকে। একটি দেশেও ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই। অথচ ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মদ্রোহী প্রজন্মের হাতে একশ ভাগ মুসলিম রাষ্ট্র!? অর্থাৎ কুফরেরও বংশ বৃদ্ধি হয়, বিকৃতিতে নয়। এ বিকৃতিকে বুঝে এখনি তা ঠেকাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে সর্বনাশ! বিকৃত ইসলামের নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বর্তমান ইসলামী দল সমূহের নেতৃত্ব।

ভারত বর্ষ আদমের পত্তনস্থল রূপে আদি মানব নিবাস ও মানব সভ্যতার সূতিকা ঘর। মানবের ধর্ম সনাতন, দ্বীনুল্ কাইয়েমাহ্ বা ইসলাম। মনু সর্বপ্রথম মানব জাতির আইন দাতা। যাকে নূহ বলা হয়। ক্বোরআনে শরীয়তের পাঁচ ইমামের প্রথম ইমাম রূপে হযরত নূহের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্মারূপে এখানে হযরত ইব্রাহীমের ব্রহ্মাবাদ

দেখা যায়। শেষ নবী সঃ ভারত অভিযানকে সর্ববৃহৎ সফলতার অভিযান রূপে অভিহিত করেন। এখানে তাক্বওয়ার তাওহীদ আসেনি। "আলআইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর খাজুর তলার ব্রাহ্মণ্যবাদ এসেছিলো রাষ্ট্রীয় দস্যুবাদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে। আটশ' বছরের মক্কার মূর্তিবাদ বর্তমানে ভারতীয় মুর্তিবাদের হাতে পরাজিত। এখানে প্রয়োজন ছিলো যায়দ, বিলাল, সুহাইব, আম্মার, সালমান ও উসামাহর মুস্তাদআফ্ সাম্যবাদের আগমন। শাইখুল হিন্দ ও মাদানীরা ঐ বিতাড়িত মরুভুতকে পুনঃ আমদানীর প্রচেষ্টা করতে গিয়ে নিজেরাই বিদায় নিয়েছে।

ভারতের মুস্তাদআফ্ মুসলমানরা অনুন্যপায় হয়ে একটি মুক্তি আন্দোলনের পথ ও মত খুঁজছিলো। তাদের মনে মাদীনার স্বপ্ন ছিলো। বারাকাহর পালা মুহাম্মাদ সঃ এর দেশত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করা অভয়ারণ্য মাদানীতুত্তাইয়েবা, সকল বৈষম্য থেকে পবিত্র নগরী। সঠিক বুঝ ও অসর্তকতার ফাঁকে শয়তান সনাতন মুহাম্মাদ সঃ এর নামের সাথে আলীর নামও যোগ করা এক প্রতারক মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো। ভাবাবেগে জাতি আসল-নকল বুঝার অনুভতিও হারিয়ে ফেলে মুয়াবিয়া ও মারওয়ানদের পাল্লায় পড়ে ভারতকে খন্ডিত করে তাদের স্বপ্নের দ্বিতীয় মাদীনার প্রতিষ্ঠা করলো। শুরু থেকে জিন্নাহ-মুহাম্মাদের ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান, তাইয়েব হলোনা এক দিনের জন্যও। পাকিস্তান নামের নাপাকিস্তানে শুরু হলো ইসলামকে আরো বিকৃত করার নির্লজ্জ দাজ্জালী। জিন্নাহ আগাখানী শিয়া। মওদূদী সাইয়েদ ও সুন্নী। ইসলামে শিয়াও নেই, সাইয়েদও নেই, সুন্নীও নেই। আছে শুধু তাক্ওয়া। জিন্নাহ ও মওদূদীর মধ্যে ছিলো শিয়া, সুন্নী ও রক্তীয় বর্ণবাদ সাইয়েদ। তাক্বওয়া ছিলোনা কারো। এখানে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী মূলনীতির উল্লেখ করছি। ইসলামে মুসলিমদের সন্তান মুসলিম হয়না। প্রত্যেককে নিজে মুসলিম ও কাফের হতে হয়। কাফেরের সন্তানও জন্মসূত্রে কাফের হতে পারে না। তাকে কুফরী কারে কাফের হতে হয়। হাঁ, পিতৃ ধর্মের অনুসরণ করেই কেবলমাত্র পিতৃধর্মাবলম্বী হতে পারে। পালন না করলে নয়। মুসলিমের পুত্র ইসলাম না মানলে সে কাফের। কাফেরের সন্তান পিতার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলিম হয়ে যায়। যেমনটি হযরত ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ তাদের কাফের পিতা-মাতাদের কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছিলেন। নূহের ছেলে পিতার ঈমান প্রত্যাখ্যান করে যেমন কাফের হয়েছিলো।

ঠিক সেরূপ ইসলামে পিতা থেকে সন্তানের বংশের পরিচয় হবে, ধর্মের নয়। ধর্ম কর্ম থেকে। বংশের পরিচয় পিতৃবীজ ও বীর্য থেকে। অতএব কোনো ব্যক্তির তার মেয়ের জঠর থেকে তার বংশধর হওয়ার কোনো পথ নেই। কোনো মেয়েরও তার পিতার ভবিষ্যত বংশধর পেটে নেয়ার সম্ভাবনা নেই। ইসলামে তো নেইই, সভ্য সমাজেও নেই। একমাত্র বর্তমান ইন্টারনেটের নরক রাজ্য ইউরোপ আমেরিকায় হতে পারে, যে নরকে পিতা-পুত্রির যৌন ক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ সভ্যতা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। নাউজু বিল্লাহি মিন্ যালিক।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর রিসালাত যেমন সর্বশেষ, তারপর আর রাসূল ও রিসালাত নেই, তেমনি রাসূল সঃ এর কোনো ঔরসজাত পুত্রসন্তান না দিয়ে আল্লাহ তাঁর পরবর্তী বংশকে ওখানেই তাঁর নবুওতের মতো খতম ও সীল মেরে ঘোষণা করে দিয়েছেন, مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের জনক নন, তা থেকেই তার পরবর্তী বংশ শেষ, যেমন তা থেকে রিসালাত শেষ। সে শুধু আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" তাঁর বংশধারা শেষ করে আমি তাঁকে রিসালাতের অশেষ কল্যাণ দান করেছি। إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ আল্লাহর স্থীরনীতি হলো মানুষকে তার পিতৃ পরিচয়ে ডাকতে হবে। (সূরা আহযাব-৫) অন্য পরিচয়ে ডাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেক নারীর পেটে জন্মানো সন্তানের পরিচয় তার স্বামীর ঔরসের। কখনো পিতা বা ভাইয়ের ঔরসের হতে পারেনা ইসলামে।

অতএব এ যাবত সৈয়দ বলে যারা নবী বংশের হওয়ার দাবী করে আসছো, এখন থেকে তওবাতিল্লা করে ঈমান এনে মানুষ ও মুসলিম হয়ে পূর্বপুরুষের মিথ্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করো। বিবি ফাতিমার পেটে তার পিতার সন্তান হওয়া যেমন অকল্পনীয় মিথ্যা কথা, তোমাদের নবীবংশের হওয়াও তেমনি অমার্জনীয় মিথ্যা দাবী। নাউযুবিল্লাহি মিন্ যালিক। এধরনের কল্পনা থেকেও আমরা আল্লাহর পানাহ চাই। আমীন।

এরপরও যদি কোনো বেঈমান, বেহায়া ও বেজন্মা নবী বংশের সৈয়দ হতে চাও, তা'হলে নেদারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা চলে যাও। ওখানে পিতার ঔরসের কন্যার পেটে জন্মানো তোমাদের ভাই বোনরা থাকে। ইসলাম ও

মুসলিম সমাজ, এমন কি কোনো সভ্য সমাজে তোমাদের ঠাঁই নেই। দূর হও কুলাঙ্গার বেজন্মারা। তোদের উপর, আল্লাহ, রাসূল ও লা'নতকারীদের লা'নত। লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বাবা আদম প্রথম নবী ও আমাদের সকলের বাবা। তাঁর স্ত্রী হাওয়া আমাদের মা। সে সূত্রে সকল নবী রাসূলরা আমাদের ভাই। আমাদের এ বংশ পরিচয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নবীর সন্তান হলে যদি সৈয়দ হয়, তা হলে এর চেয়ে উত্তম পথ আর কি থাকতে পারে সৈয়দ হওয়ার?! তাক্বওয়া যেখানে সকল সম্মানের একমাত্র মানদন্ড, সেখানে আল্লাহ, ক্বোরআন ও ইসলাম বিরোধী, ফাতিমার পেটে পিতার পুত্র হতে যাবে কোন দুঃখে?। যা, কখনো আদৌ সত্য হলেও প্রমাণ করা তোদের পক্ষে সম্ভব নয়! এরপরও যদি তোরা সৈয়দ দাবি না ছাড়িস, তা হলে তোদের আদি পিতার নাম ইবলিস্, মায়ের নাম বেশ্যা! মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ তোমাদের আদর্শ।

ইয়া আল্লাহ! যারা না বুঝে, না ভেবে ও না চিন্তে শয়তানের প্রচলিত ভুলে এতো দিন সৈয়দ দাবীর মতো ভুল করে এসেছে এবং এখন ক্বোরআনের বিধানে ভুল বুঝে, তা স্বীকার করে তওবা করছে, আপনি তাদের ক্ষমা করুন। আপনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আর যারা এরপরও এ জঘন্য পাপের দাবিদার থাকবে, আপনি তাদের উপর লানত করুন। আপনি বলেছেন আপনার ক্বোরআনুম্ মাজীদে, যারা আপনার কিতাবে বর্ণিত সত্যকে মানুষ থেকে গোপন করে, তাদের উপর আপনার ও সকল লানতকারীদের লানত। (সূরা বাক্বারা-১৫৯)। আমি তা সর্ব সাধারণের জন্য প্রকাশ করে দিলাম। এরপরও যারা তা অমান্য করবে, তাদের আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। আপনি তাদের জন্য যথেষ্ট। আমীন।

বাবা আদম ও মা হাওয়ার সন্তানদের মধ্যে ইবলিসের গোত্র ও পরিবারবাদ কল্পনা করে তার প্রচলন ঘটায় ইয়াহুদীরা। তারা প্রথমে বলে যে, হযরত ইব্রাহীম ইয়াহুদী ছিলেন। তাদের পৈত্রিক রক্তবাদ খন্ডনের জন্য আল্লাহ পিতা ছাড়া হযরত ঈসা রূহুল্লাহকে পাঠান। ইয়াহুদীদের এক অংশ তাঁকে আল্লাহর বেটা তথা আল্লাহ বানিয়ে তাঁকেই পিতা বানিয়ে দিব্যি তাঁর সন্তান হয়ে যায়। তারপর তো আর তাদের হযরত ইব্রাহীমের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকার কথা নয়? কিন্তু ঘোড়া রোগের কি করা যে ঐ নব্য ইয়াহুদীরা পুরাতন ইয়াহুদীদের সাথে সূর মিলিয়ে বলে ফেললো যে ইব্রাহীম আঃ খৃষ্টান ছিলেন! আল্লাহ ঐ উভয় মিথ্যুকদের বলে দিলেন যে তাঁর খলীল ইব্রাহীম ইয়াহুদী খৃষ্টান কিছুই ছিলেন না। তিনি শুধু একমনা মুসলিম ছিলেন। একথা যে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এসে সারাজীবন বলে তিনি নিজের ব্যাপারেও স্পষ্ট করে বলে গেলেন যে তিনিও বাবা ইব্রাহীম আঃ এর অনুরূপ একমনা মুসলিম। আরব অনারবে, তাক্ওয়া ব্যতিত কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তাঁর মৃত্যুর পর কি ভাবে কোনো ঈমানদার মুসলিম বলতে পারে যে তিনি ক্বোরেশী, হাশেমী ও সাইয়েদ ছিলেন? তারপর সৈয়দ নামে আরেক নব্য ইয়াহুদী বংশবাদ মুসলিম নামধারীদের মধ্যে কিরূপে প্রচলিত হলো?

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে সে রোগে আক্রান্তদের তিন দাবীদার সাইয়েদ হোসেইন আহমাদ মাদানী, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ও সাইয়েদ আলী হাসান আলী নাদভী ভারত বর্ষে "সাইয়েদ ও সৈয়দ" রোগের জীবানুই বিস্তার করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। এদের প্রচারিত ইসলাম ভারত বর্ষের একশ কোটি মুস্তাদাফ্দের মাঝে কি করে প্রসার পেতে পারে? হোসেইন আহমদ মাদানীর পুত্র আসাদ মাদানীকে নিয়ে এদেশের কিছু মৌলবীরা "আওলাদে রাসূল" পূজা ও প্রচারের মন্ডপ তৈরী করছে! মাওদূদী তার মেয়েদের বিয়ের জন্য আঞ্জর আলী, খঞ্জর আলী খুঁজে বের করেছে। কিন্তু তার দলের অধ্যাপক খুরশিদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে পারেনি। ছেলেদের জন্যও ঐ ব্যাধি তালাশ করে পুত্রবধু এনেছে। এ'টি যে এক মারাত্মক রোগ, একথা বলার সময় কিছুদিন পূর্বে আমার পরিচিত এক ইসলামী মৌলবাদী ডাক্তার আমাকে বললো যে তার আন্দোলনী স্বতীর্থ সৈয়দ (?) ভাইকে তার বোনের সাথে তার ভাগ্নের বিয়ের প্রস্তাব দিতেই নাকি তার দ্বীনী ভাইটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে নাকি সে বলে "আপনি ভুলে গেছেন যে আমরা সৈয়দ?"

মানব দেহের প্রতিরোধ কোষ বিধ্বংসী এইচ,আই,ভির ন্যায় মানবজাতির ঐক্যের বাঁধন বিনষ্টকারী দুরারোগ্য জীবানু ইয়াহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, ক্বোরেশবাদ ও সৈয়দবাদ প্রভৃতি। আল্লাহর শেষ রাসূল ইয়াতীম হয়ে ঐ রোগাক্রান্ত শির্কে অপবিত্র পিতা মাতা আব্দুল্লাহ ও আমিনার জীবানুমুক্ত হন বারাকাহ কর্তৃক লালিত পালিত হয়ে। যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের দিয়ে তাঁর জামাত "হিয্বুল্লাহ" তৈরী করে তিনি তার রোগমুক্তির স্বাক্ষর রেখে যান। কিন্তু আবু বকর, উমর ও তাদের মেয়ে মা আয়শা ও হাফসারা ঐ রোগ থেকে মুক্ত

হতে পারেনি।

ঐ রোগের অচেতন রোগী হাসান আল বান্না, মাহদী সূদানী, হোসেইন আহ্‌মদ মাদানী, আবুল আলা মওদূদী ও আলী হাসান আলী নাদভীরা বিশ্বে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদী আল্লাহর রং সিব্‌গাতুল্লাহর ডাক দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তারা নিজেরাই তার যোগ্য ছিলোনা। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশাল ভারতে আজো ইসলাম স্বরূপে আসেনি। আসে যদি, তা হলে রাসূল সঃ এর "গায্‌ওাতুল হিন্দ" এ আসবে।

এ যাবৎ যা এসেছে, ফিতনা এসেছে। রাজা দাহিরকে নির্মূল করে তার মেয়েদের ইরানী রাজকুমারীদের ন্যায় বাজারজাত করার যে ক্বোরেশী উমাইয়া ফিতনা ভারতে এসেছিলো, তারই বিরান রাজপুরীর ভূতপেঁচার ডাক ছিলো ওদের "ওলামায়ে হিন্দ" ও "জামাতে ইসলামীর" ইসলামী আন্দোলন। ভারতে আসাদ মাদানী ও নাদভীদের পেঁচার ডাক যেমন মুঘল পাঠান শোষনের দুঃস্বপ্নের ভীতি সঞ্চার করে, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে কাজী হোসাইন আহমাদ ও কাজী গোলাম আযমদের রাজনীতিও ঐ একই দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এ ভাবে গোটা বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের পিয়াসীদের আন্দোলনের অগ্রভাগে ঐ ভোগবাদী নব্য ইয়াহুদীবাদী হুতুম পেঁচাদের পেঁচ-পেঁচানী। তার ফলে বিশ্বের সংগ্রামী ইসলামী যুবকরা আফগানিস্তানে এসে জোড়া হয়েছিলো। তারা তাদের মধ্যপ্রাচ্যের চাঁদাখোর, হারামখোর নেতাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ত্যাগ করে তাদের ফিরতি যাত্রায় কিস্তিতে আগুন দিয়ে আফগান যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশিয়াকে খান খান করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে এসেও তারা কাঙ্খিত ইসলামী নেতৃত্ব পায়নি। তারা সুন্নী ফিত্‌নার নেতৃত্বে রাশিয়াকে তাড়িয়ে শিয়া-সুন্নীর মুখোমুখী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের অভীষ্ট ইসলামের যেমন কোনো সম্ভাবনা তাদের নিজ নিজ দেশে নেই, তেমনি মোল্লা উমরদের আফগানিস্তানেও নেই। তাই তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের দিকে নিরুপায় হয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে মাদ্রাসা পড়ুয়া যুবকদের এক অংশ তাদের উস্তাদদের নিকর্মাপনায় নিরাশ হয়ে আফগান যুদ্ধের ধাঁচে বাংলাদেশে কিছু একটা করার কথা ভাবছে বলে পত্র পত্রিকার বিবরণে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত, কাশ্মীর, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে একটি অস্পষ্ট কল্পনায় এরা ভুগছে বলে ধারণা হচ্ছে। চেচনিয়া ও দাঘেস্তান নিয়ে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় আল্লাহর বিধানের পাঁচ নবী, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের বিশ্ব শান্তির আদর্শের নেতৃত্ব ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান, কোনো সম্প্রদায়ের কাছে না থাকায়, আজ এরা ত্রিশূল হয়ে একে অন্যের মৌলবাদের উত্থানের আতংকে আতঙ্কগ্রস্থ। অথচ এরা তিনটি সম্প্রদায়ই নবীদের অনুসারী ঐশী ধর্মের দাবীদার।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা একজোট হয়ে মুহাম্মাদ সঃকে শেষ নবী বলে অস্বীকার করে তারা একপক্ষ। মুসলমান নামধারী মোহামেডানরা ঐ পাঁচ নবীকে নবী রূপে মানলেও তারা তাদের নবীকে আলাদা করে এক পৃথক ধর্মের দাবিদার। অথচ আল্লাহর দ্বীন মাত্র একটি। যে এক দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে তার উপর পূর্ণ বিকশিত করতে শেষ নবীর আগমন হয়েছিলো ঃ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (সূরা তওবা-৩৩, ফাত্‌হ-২৮, সফফ্‌-৯)

তাই তিনি করে যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ বলে তাকে প্রথমে খন্ডিত করা হয় এবং মাসজিদুল আক্বসায় পৃথক জামাত করে ইসলামের পুনঃ বিভক্তিকরণকে চূড়ান্ত করা হয়।

আফগান-ইরান সীমান্তে যে বিভক্তিবাদের শেষ দৃশ্যপট মঞ্চায়ীত হচ্ছে, সেখানে প্রয়োজন সে কাঙ্খিত মাহ্‌দীর ইমামতের, যার নেতৃত্বে ইয়াহুদী, খৃষ্টবাদ ও শিয়া-সুন্নী সব ফিতনা বিদুরীত হয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর একক পতাকা তলে মানবজাতি এক হবে। কিন্তু হায়! সেখানে খোমেনী খামেনাঈদের শিয়া দাজ্জালীর আহলে বাইতের অজগর ফনা তুলে বিষাক্ত ছোবল মারছে এক দিকে, অপর দিকে ক্বোরেশী খেলাফতের মুয়াবিয়া, মারওয়ান, ইয়াযীদ ও আমর ইবনুল আসদের সুন্নী শিবিরে বসে সুন্নী উসামাহ বিন্ লাদেন বিশ্বে সন্ত্রাস প্রসারের কাজ করে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের দুর্ণাম দিচ্ছে।

এ অবস্থায় একমাত্র করণীয় হলো রাসূল সঃ এর আদর্শের যায়দ, সালমান ও উসামাহ ইবন্ যায়দের ইমামত প্রতিষ্ঠা করণার্থে শিয়া, সুন্নী ও ক্বোরেশী মাহ্‌দীর মিথ্যা বর্জন করে তাকওয়া মানদন্ডের ঘোষণা দেয়া ও তা বাস্তবায়নের জন্য কালক্ষেপ না করে ময়দানে নেমে পড়া। মিথ্যা উসামাহ দাঁড় করে আল্লাহ আমাদের সঠিক উসামাহ ইবন যায়দের মানদন্ডের প্রতি ইংগীত উদ্দেশ্য না হলে, ওখানে বিন লাদেনকে কেনো দাঁড় করাবেন? এমনতো ইসলামের ইতিহাসে

এ যাবৎ ঘটেনি! প্রিয় পাঠক বৃন্দ! এ ব্যাপারটি খুব ভেবে দেখবে।

এখন সময়ের দাবি হলো ইখ্ওয়ান ও জামাতে ইসলামীর ন্যায় যতো ইসলামী পুর্নজাগরণবাদী সংগঠন আছে, তার ত্যাগী কর্মী ও সদস্যরা তাদের ভোগবাদী নব্য ইয়াহুদী নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ রূপে উৎখাত ও ত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূলের মুস্তাদআফ্ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। ব্যাংক-বীমার সুদী কারবারী, মায়ের সাথে ব্যভিচারকারী এ নেতা ও তাদের ছেলে-মেয়েরা সবাই মুস্তাকবির। এদের ছেলে-মেয়েরা ইয়াহুদী-খৃষ্টান দেশে পড়া-লেখা করে ইউরোপ-আমেরিকাকেই তাদের আবাসভূমি বানিয়েছে। একমাত্র ধর্ম ব্যবসার আড়ালে অর্থ উপার্জন এবং তা দিয়ে পাঁচতলা-দশতলা নির্মাণের জন্যই এরা দেশে বাস করে। ইবলিস এদের বসিয়েছে দেশের সরলমনা ঈমানদার যুবকদের বিপথগামী করার জন্য। যাতে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মদ্রোহী দেশীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোনো সত্যিকারের ইসলামী, ত্যাগী সংগঠন দেশে গড়ে উঠতে না পারে। গনতন্ত্রের মতো সার্বজনীন কুফর এদের রাজনীতির বাহন। দাইয়ূসী নারী নেতৃত্বে এদের যোগদান এদের ঈমানহীন মুর্তাদ হওয়ার সনদ।

নারীবাদ ও পুরুষবাদ ইসলামে নেই। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয় মিলে আল্লাহর দাস-দাসী রূপে পুরুষ বাইরে এবং নারী ঘরে আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবে। এর বাইরে নরের নরবাদ এবং নারীর নারীবাদ সম্পূর্ণ জাহান্নামের ক্ষেতখামারী।

নারীবাদ ও নারী নেতৃত্ব মানব জাতির জন্য কতোটুকু সর্বনাশা এবং এর শুরু কোথা থেকে তার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পর্যাপ্ত বর্ণনার জন্য নিম্নে নবী রাসূলদের কয়েকজন নারীর সীমালঙ্ঘন ও তার ভয়াবহ পরিণাম তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ, মানব জাতির জন্য নবী রাসূলদের জীবন যেমন উত্তম আদর্শ, তদরূপ, তাঁদের পরিবার-পরিজন, বিশেষ করে তাদের স্ত্রীদের অবাধ্যতা নিকৃষ্টতম পাপের দৃষ্টান্ত। তাই প্রত্যেক মুক্তিকামী পুরুষদের, রাসূলদের একমাত্র আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেক মুক্তিকামী নারীকে নবী রাসূলদের অবাধ্য স্ত্রীদের চরিত্র থেকে আল্লাহর পানাহ্ চেয়ে তাঁদের উত্তম স্ত্রীদের অনুসারী হতে হবে। তার ব্যতিক্রম হলেই ধ্বংস অনিবার্য, নিশ্চিত এবং দুন্ইয়া ও আখেরাত বরবাদ। নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক।

বেদে দেখা যায় যে, মনু মানব জাতির সর্বপ্রথম আইন ও বিধান দাতা। ক্বোরআন বলে, হযরত নুহ আঃ মানবজাতির সর্বপ্রথম শারীআহ বা ধর্মীয় বিধানের ইমাম। তাই সম্ভাবনা রয়েছে উভয় এক ব্যক্তি হওয়ার। বেদকে আদি ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করা হয়। ভারতীয় বেদ্ বা বিদ্অ শব্দের অর্থ কোনো কিছুর শুরু বা সূচনা। তাই আমি এ অধ্যায়টি হযরত নূহ ও তাঁর অবাধ্য অভিশপ্ত স্ত্রীকে দিয়ে শুরু করবো। এবং আখেরী নবী সঃ এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত দিয়ে এর ইতি টানবো। ইন্শাআল্লাহ্।

পৃথিবী মাটি ও পানির ক্ষেত্র। এ ক্ষেত বা চাষাবাদের জমির চাষী হলো পুরুষ। জমি উর্বর ও পরগাছা মুক্ত হলে কৃষকের আর আনন্দের সীমা নেই। অনুর্বর ও পরগাছায় ভরা হলে দুঃখের আর শেষ নেই। পলিপড়া নতুন চরে এক কৃষক একা এক দিনে দশ বিঘা জমিতে বীজ ছিটাতে পারে। অনাবাদী জমি হলে দশ কৃষক দশদিনে এক বিঘা আবাদ করতে পারে। অনুর্বর পাষাণ জমি হলে সারা জীবন খেটেও কৃষক তাতে কিছু ফলাতে পারেনা।

নতুন চরের পলিতে পা দিতেই কৃষক বুঝে ফেলে তার করণীয়। মনের সুখে গান গেয়ে ধান ছিটিয়ে সামান্য পরিচর্যা করেই ঘরে ফসল তোলে। শক্তজমিতে কোদাল বা লাঙ্গল বসিয়ে যখন দেখে মাটি শক্ত, তখন মাটি কর্ষণ করে মই দিয়ে চাকা ভেঙ্গে জমি সমান করে বীজবপন করে। সার প্রয়োগ করে। নিড়ানী বাছনী করে। তারপর ফসল ঘরে আনে। আর যদি জমি পাথুরে শক্ত হয়, কোদাল মারলেই ঠুশ্ করে উঠলে কৃষক বুঝে ফেলে যে তার কপালে দুর্ভোগ আছে। আগত কষ্টে তার কপালে ঘাম এসে যায়।

তদ্রূপ পুরুষের জীবনে যদি নতুনচরের মতো কোমল মতি স্ত্রী হয়, তার সুখের সীমা নেই। দুন্ইয়াও বেহেশত, পরকালও বেহেশত। যদি স্ত্রী স্বার্থপর ও মত্লবী হয়, তা হলে নরমে-শক্তে ও ভালোমন্দ মিলিয়ে ব্যালেন্স শীট তৈরী করে সংগ্রাম করে যেতে হয়। আর যদি নারীবাদী, নারীপক্ষ হয়, তা হলে ইহকালও নরক ও পরকালও নরক। এক্ষেত্রে ঐ ক্ষেত্র ও জমি ত্যাগ করে অন্য জমি চাষের ব্যবস্থা নিতে হয়। সহ অবস্থান সম্ভব নয়। উচিতও নয়।

হযরত নূহকে দিয়ে আল্লাহ আমাদের অবাধ্য ও অনুর্বর, বরং বিষগর্ভা স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেখান। নূহ আঃ কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। কারণ, মানুষের অবাধ্যতার পাপে তাঁর বদ্দোয়ায় প্লাবনে তাঁর অনুগত স্বল্প সংখ্যক মানুষ ব্যতীত সকল

মানুষ পৃথিবী থেকে ধুয়ে মুছে যায়। তিনি ন'শ পঞ্চাশ বছর বেঁচে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকেন। তাঁর আত্মঘাতী স্ত্রী মানুষকে বলতো যে, তার স্বামী পাগল, মস্তিস্ক বিকৃত, ভন্ড ও বিপথগামী। চরিত্রহীন নারীভ্রষ্টতার অনুসারী জাতি নবীকে বাদ দিয়ে তাদের জাতীয় নেত্রীর কথা শুনলো। তিনি বহু বুঝালেন তাঁর ন'শ পঞ্চাশ বছর জীবনে। তারা ডাইনীর কথা শুনলো। ডাইনীর পেটে যে ছেলে হলো, সেও নবী বাপ বাদ দিয়ে ডাইনী মায়ের কথা শুনে। আল্লাহর আযাব আসলে নূহের ছেলে আব্বাজানকে ত্যাগ করে "আম্মাজান আম্মাজান, তুমি বড়ো মেহেরবান" গেয়ে গেয়ে মায়ের পায়ের নীচের বেহেশ্‌ত (?) অর্থাৎ জাহান্নামে যায়। পুত্রস্নেহে নূহ আঃ ছেলের জন্য একটু দোয়া করতে চাইলেও আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে শক্ত ভাষায় তিরস্কার করে তা থেকে বিরত করেন।

অবাধ্য না হয়ে নূহ আঃ এর স্ত্রী ঈমানদার বাধ্য হলে ন'শ পঞ্চাশ বছরে কতো লোক ঈমান এনে নাজাতের পথিক হতো? প্রথম আল্লাহর আইনদাতা ইমাম স্বামীর অবাধ্য হয়ে প্রথম নারীনেত্রী জাতিকে কি দিয়েছিলো? আল্লাহ ও উত্তম স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী হয়ে কি নূহের স্ত্রী বিজ্ঞের স্বাক্ষর রেখেছে, না নিজ ও জাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে এনেছে? পুরুষ সমাজের কাছে নারীর নারীত্ব ছাড়া আর কি আবেদন থাকে? চরিত্র বিকৃত জাতিই ঘরভাঙ্গা নারীর অনুসারী হয়ে জাতির সকল ঘর ভাঙ্গার রাজনীতি করে। ধর্মীয় কাজী গোলাম আযমরা সে ঘর ভাঙ্গার বিয়ে-তালাক রেজিষ্ট্রি করে এবং শায়খুল হাদীসরা সে মৃত জাতির জানাযা পড়ে ধর্মের খেদমত করে। বাংলাদেশ, তথা বিশ্বের মানুষের হরযত নূহ ও তাঁর স্ত্রীর জীবন থেকে শিক্ষণীয় কিছু আছে কি?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো হযরত লূতের স্ত্রী। জানামতে দেখা যায় যে, হযরত লূত আঃ ইব্রাহীম আঃ এর ভাতিজা ছিলেন। হযরত ইব্রাহীমের অগ্নিপরীক্ষার সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁর চাচা ইব্রাহীম খলীল আঃ এর উপর ঈমান আনেন। হযরত ইব্রাহীম গোটা মানবজাতির বিশ্বইমাম ছিলেন। তাঁর তাওহীদ প্রচারে প্রথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে হতো। দেখা যায়, তিনি তার একশ চল্লিশ বছরের জীবনে ইরাক থেকে হিজরত করে প্যালেস্টাইন, মিশর, আফ্রিকা, আরব বদ্বীপ, তুরস্ক, ভারত, বার্মা, ও ইন্দোনেশিয়া যাতায়াত করেছিলেন। তাঁর কাজের দায়িত্বে সহায়তার জন্য আল্লাহ তাঁর নায়েব রূপে আরো একাধিক নবী দান করেন। তাঁদের অন্যতম হযরত লূত আঃ। আল্লাহর মেহেরবানীতে হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রীরা আল্লাহ ও তাঁর বাধ্য নারী হওয়ায় হযরত ইব্রাহীমের কাজ সহজতরো হয়েছিলো, যা প্রত্যেক স্বামীদের সফলতায় বিরাট অবদান রাখে।

হযরত ইব্রাহীম হযরত লূত আঃ কে মিশর সংলগ্ন সূদান ও আফ্রিকার উর্বর এলাকা সমূহে নবুওতের দায়িত্ব পালনে নিয়োগ করেন। হযরত ইব্রাহীম আঃ এর দোয়া ও হযরত লূত আঃ এর পরিচালনার দক্ষতার ফলে আল্লাহ তাঁর জাতিকে তখনকার দিনে বিশ্বের সেরা কৃষিপণ্যে সমৃদ্ধি দান করেন। সমৃদ্ধির মুখ দেখে ঘরে হযরত লূতের স্ত্রীকে শয়তানে পেয়ে বসে। সে বিকৃতির দিকে পা বাড়িয়ে স্বামী নবীর বিরোধিতা করে জাতিকে বিপথগামী করে। স্বামী হযরত লূতকে পাগল ও বিকারগ্রস্থ বলে সে হতভাগী সমাজের বিকৃত লোকদের সাথে যোগ দেয়। সে নারীজাতির কলঙ্ক, সমাজে নারী পুরুষের সমকামিতা ও লেসবিয়ানের জন্ম ও প্রসারের কাজে লিপ্ত হয়, যে রোগ আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় মহামারীরুপে বিদ্যমান।

নারী পুরুষের মধ্যে যৌনবিকৃতি সাধারণতঃ বেপর্দা উলঙ্গপনা, অশ্লীল অঙ্গ প্রদর্শন এবং স্বামী-স্ত্রীর অমিল থেকে জন্ম নেয়। বৈধ যৌনমিলন স্বর্গীয় সুখের একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত। রাস্তা-ঘাটে ও হাটে-বাজারে নারী পুরুষের নগ্ন ও অশালীন বিচরণ না হলে স্বামীরা তাদের কর্মজীবনের শ্রম শেষ করেই শান্তি পেতে স্ত্রীদের কাছে ঘরে ফিরে। ঘরমুখী স্ত্রীরা গৃহকাজ গুছিয়ে স্বামীদের জন্য অপেক্ষা করে। আসামাত্র হাসি মুখে স্বামীকে স্বাগত জানায়। ঘর পার্থিব বেহেশতের একটি ছোট্ট নীড়ের রূপ ধারণ করে।

রাস্তাঘাটে নারীপুরুষের অশালীন চলাফেরার মেলা বসলে নারী পুরুষ ঘর ছেড়ে ঘরের বাইরে অজানা সুখের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর বাঁধন ঢিলা হয়। বাহির থেকে অপবিত্র দৃষ্টি ও কামের আবর্জনা নিয়ে উভয় ঘরে শুধু রাত কাটাতে ও ক্লান্তি দূর করতে আসে। কথায় কথায় ঝগড়া হয়। মারামারী পিটাপিটিও হয়। ফলে ঘরটি পার্থিব জাহান্নামের একটি হাজতখানা হয়। এ শ্রেণীর স্বামী স্ত্রীদের মিলন দুর্গন্ধময় খোলা শৌচাগারে মল মূত্রত্যাগের চাপে বাধ্য হয়ে নাকে মুখে কাপড় গুঁজে মলমূত্র ত্যাগের মতো। আবর্জনার মধ্যে যেমন কুৎসিৎ ও কদর্য কীট পতঙ্গ জন্মে, এদের মিলনে ঐ প্রজাতির ছেলে মেয়ে জন্মে। ঐ ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতাকে ওদের দুঃখ দুর্দশার জন্মদাতা রূপে মনে করে। যা বর্তমানে তথা কথিত উন্নত বিশ্বে ঘটছে। রোজ ক্বেয়ামতে পদতলে পিষ্ট করার জন্য এরা পিতা-

মাতাকে খুঁজবে।

রাসূল সঃ বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের মেরোনা। দিনে যাদের মারবে, রাত্রে তাদের সাথে মিলনে কিরূপ অনুভব করবে?" সে মিলন তো মলমূত্র ত্যাগের মতো ব্যতীত অন্য কিছু নয়! মানুষ কেনো স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলতে যাবে? কোনো কৃষক কি নরম উর্বর মাটিতে মুগুর মারে? তার প্রয়োজন কোথায়? মাটি তেড়া হলেইনা অগত্যা জীবনধারণে ফসল উৎপন্ন করতে ঠ্যাংগা মুগুর নিয়ে চাকা ভাংতে যায়! তাতে তো স্বামী কৃষকের কষ্টই বেশী! বিবেকবান আল্লাহর দাসীরা একটু ভেবে দেখো। স্বামীর অবাধ্যতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। দেখবে, ব্যর্থ স্বামীর জীবনে সফলতার দ্বার কিরূপে খোলে!

হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রীরা বাধ্য ও অনুগত হওয়ায় তাঁর জীবনের সফলতা দেখো। আর হযরত নূহ ও লূতের স্ত্রীদের অবাধ্যতার ফলে তাদের স্বামীদের জীবনের ঘটনাবলি কি? নূহের জাতিকে ডুবিয়ে মারা হয়। তার নেতৃত্ব দেয় তাঁর পাপীষ্ঠ স্ত্রী। সেও সন্তান সঙ্গে নিয়ে ডুবে মরে। তাকে আল্লাহ ক্বেয়ামতের বিচারের পূর্বেই বিচার করে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। আর স্বামীকে সর্বকালের জন্য সকল সৃষ্টির মুখে সালাম জানান, "সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামীন"। (সাফ্‌ফাত-৭৯)

হযরত লূতের স্ত্রী আল্লাহর নবী স্বামীর বিরুদ্ধে জাতির নারীনেত্রী হয়ে জাতিকে সমকামিতার অভিনব পাপে জড়িয়ে বর্তমান ঘাতক রোগ এইডস্ এর দাদীআম্মা হয়ে চির অভিশপ্ত হয়েছে। নারী ভালো হলে যেমন পুরুষের চেয়ে ভালো হয়, নষ্টা হলে নষ্ট পুরুষদের মাতানেত্রী হয়। হযরত লূতের স্ত্রী অধঃপতনের এমন পর্যায়ে যায় যে তার স্বামীবিরোধী পাপে যখন জাতি নিমজ্জিত হয়, তখন আল্লাহ সে জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যুবক ছেলেদের বেশে ফেরেশতা সৈনিক পাঠান। ফেরেশতারা আসেন রাতের বেলা। হযরত লুতের স্ত্রী ক্লাবে ক্লাবে সংবাদ পাঠায়, "এসো এসো, আমার মাথা খারাপ স্বামীর ঘরে সুন্দর সুন্দর যুবক বিদেশী অতিথি এসেছে। তোমরা এসে ফুর্তি করো। স্বামীর অতিথিকে অপমান করে তাকেও অপমান করো।" আল্লাহ সকল পাপী জাতিকে ধ্বংসের পূর্বে শেষপরীক্ষা করেন। ম্যাডাম নেত্রীত্বের সুডোম জাতিকে আল্লাহ গোটা দেশটাকে মাটিশুদ্ধ উল্টিয়ে পুঁতে ফেলেন। তাদের সঙ্গে তাদের ম্যাডাম লূতের স্ত্রীও।

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ কানাত মিনাল্ গাবেরীন। ক্বোরআনে সাত জায়গায় ঐ কুলাঙ্গার নারীকে ধংস প্রাপ্ত বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। আজো সে জায়গাটিকে "বাহ্‌রে লূত" বা "দাশ্‌তে লূত" বলা হয়। চার দিকে ঘেরা একটি সমূদ্র যেনো অভিশপ্ত এলাকাটি! আজো তার পানি কেউ মুখে দিতে পারেনা। অথচ তার আশে পাশে পানি মিষ্টি!

বিশ্বের সকল নারী পুরুষের ঈমানী পূর্ণতার রিসালাত দিয়ে আল্লাহ রাহমাতুল্লিল্ আলামীন শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ কে পাঠান। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সর্বকালের পূর্ণসফল ও পূর্ণব্যর্থ নর নারীর দৃষ্টান্ত আল্লাহ স্থাপন করেছেন। আল্লাহ মুস্তাদআফ্‌দের দ্বারা সফল ঈমানদার পুরুষের দৃষ্টান্ত যেমন স্থাপন করেছেন, তেমন কোরেশী মুস্তাকবিরদের দ্বারা অসম্পূর্ণ ঈমানের দৃষ্টান্ত দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর ঘরেও আম্মাজানদের মাঝে সফলতা ও ব্যর্থতার সবুজ ও লাল পতাকা উড়িয়েছেন। তিনি বিশ্বের পূর্ণ নবী। কোনো গোত্র, পিতামাতা, স্ত্রী কন্যা ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বা পরিবেষ্টিত সাময়িক সহচর সাহাবীদের নবী ছিলেন না। তাঁকে পুরুষদের মধ্যে যারা সর্বজাতির শেষ নবী রূপে তাঁর জীবনে ও পরে গ্রহণ করেছে এবং এখনও করবে, তারা পূর্ণ মু'মিন ও মুসলিম। নারীদের মধ্যে যারা রাসুল ও পূর্ণ আদর্শ পুরুষ রূপে তাঁকে গ্রহণ করে তাঁর স্ত্রী বা অনুসারী হয়েছে, তারা পূর্ণ মু'মিনা ও মুসলিমা। পূর্ণ মুমিন ও মুসলিমদের দৃষ্টান্ত যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সালমান, সুহাইব ও উসামাহরা। পূর্ণ মুমিনা ও মুসলিমার নবী স্ত্রী দৃষ্টান্ত হলো, বিবি খাদীজাহ্, উম্মে হাবীবাহ, উম্মে সালমাহ্ ও মারিয়াহ্ ক্বিবতিয়ারা।

যে সমস্ত নর-নারী তাঁকে গোত্রের নবী, গোত্রীয় নবী বা আরবী নবী রূপে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বায়আত হয়েছিলো, বা তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে তাঁর স্ত্রী হয়েছিলো, এবং তাঁকে ক্বোরেশী বিশ্বনেতৃত্ব বা ক্বোরেশী নব্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্থপতি রূপে "আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" কালেমা বা বাক্য প্রচার করে ক্ষমতা দখল করেছিলো, তারা অসম্পূর্ণ মুমিন ও মু'মিনা বা মুসলিম ও মুসলিমা অর্থাৎ আত্মসমর্পনকারী ও আত্মসমর্পনকারিনী ছিলো। তাদের ঈমান ও ইসলামের বর্ণনাই আল্লাহ্ সূরা হুজুরাতের ১৪নং আয়াতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের দৃষ্টান্তই হলো বাইরে আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, তালহা ও যুবাইর গংরা এবং ঘরে মা আয়শা ও হাফ্‌সারা।

আবু বকর ও উমরদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এবার রাসূল সঃ এর ঘরে মু'মিনাত্ ও মুসলিমাতের সংক্ষেপে বর্ণনা পেশ করছি। তাতে আমার ঈমানের সাক্ষ্য ও তার চৌহদ্দি প্রকাশ পাবে এবং পাঠকদেরও শ্রেণী

বিন্যাস হবে। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর কাছে যার হিসাব স্পষ্ট, স্পষ্ট ঈমানদারদের নিকটও তার হিসাব স্পষ্ট হবে। তাঁর কাছে যার হিসাব অস্পষ্ট, সৃষ্টির কাছেও তার হিসাব অস্পষ্ট ই থেকে যাবে। রাসূল সঃ আল্লাহর পাঠানো মাপকাঠি। তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যারা পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করেছে এবং তাঁর পর ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁকে যারা সে রূপ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সমর্পন করবে, তারা "সাবেকূন্ আল্ আউয়ালূন" বা প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারি। বরং পরবর্তীরা পূর্ববর্তিদের চেয়ে একটু বেশী বোনাস পাবে। কারণ তারা না দেখে পরীক্ষা দিয়েছে, আর ওরা দেখে পরীক্ষা দিয়েছে। তদ্রুপ যারা তাঁকে দেখে ও শুনেও পরীক্ষার খাতা পূর্ণ করতে পারেনি, তাদের চেয়ে যারা তাঁকে না দেখে পরীক্ষা দিয়ে অসম্পূর্ণ স্ক্রিপ্ট দাখিল করেছে ও করবে, তারা গ্রেস্মার্ক বেশী পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ পরীক্ষক আল্লাহ সর্বকালীন, সর্ববিদ্যমান। তিনি হাজিরদের চেয়ে গায়েব পরীক্ষার্থীদের ভালো পরীক্ষায় বেশী খুশী হন। "য়ু'মিনুনা বিল গাইব" তার কিতাবের পাঠ পদ্ধতি। তাঁর বোনাস মার্কের ঘোষণা হলো ঃ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তোমরা মহা আনন্দে পানাহার করো। কারণ, তোমরা না দেখে ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলে। (আল হাক্বকা-২৪)
সম্পূর্ণ সমর্পন ও গ্রহণের দৃষ্টান্তনারী হলো, মা খাদীজাতুল ক্বোবরা, উম্মে হাবীবা, উম্মে সালমা ও মারিয়া ক্বিব্তিয়া। অসম্পূর্ণ সমর্পন গ্রহণের দৃষ্টান্ত হলো মা আয়শা ও হাফসা। ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠে সত্যকে গ্রহণ করার নাম ঈমান। আবেগের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ বা বর্জনের নাম ইসলাম ও কুফর। সাবধান!

মা খাদীজা

হবু রাসূলের চরিত্র দেখেই দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সঃকে বিবি খাদীজা বিয়ে করে প্রমাণ করে যে, তার বুঝ ও গ্রহণ প্রতিভা অনন্য। তাই তার সকল ধন সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে মহাপ্রাপ্তির ধ্যানে স্ত্রী হয়েও একাকী হেরা গুহায় দীর্ঘ পনের বছর যাতায়াত ও অবস্থান করার সুযোগ করে দিয়েছিলো। মা আয়শা হলে কি তা কখনো খুশী মনে দিতো? কখনোই না। আমরা দেখি যে রাসূল সঃ রাতে শয্যা ত্যাগ করে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারতে গেলেও চুপে চুপে মা আয়শা পিছু নিতো এবং দেখতে যেতো যে, রাসূল সঃ কোথা যাচ্ছেন!
অহী প্রাপ্তির ঘটনায় আকস্মিকতা ও অলৌকিকতায় রাসূল সঃ স্বভাবতঃ কিছুটা চিন্তিত হলে তাঁকে প্রবোধ ও সাহস যোগাতে যে কথা স্ত্রী হয়ে স্বামীকে বলেছে, তা প্রমাণ করে যে আল্লাহ রাসূলকে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত পালনের জন্য যেমন বারাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তদ্রুপ তাঁর রিসালাতকে পালন করে বিশ্বময় তাঁকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান করাতে বিবি খাদিজাকে তৈরী করে দিয়েছিলেন। যার দৃষ্টান্ত একমাত্র স্বামীর প্রতি বিবি হাজেরার হযরত ইব্রাহীমের প্রতি বিশ্বাসেই মেলে। বিবি খাদীজা তাৎক্ষণিক স্বামীর রিসালাতে ঈমান এনে বলেন, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনো ব্যর্থ করবেন না। কারণ, আপনি অনাথের নাথ, আশ্রয়হীনের আশ্রয়, অপারগের সাহায্যকারী, রোজগারহীনের খাদ্য সরবরাহকারী এবং প্রত্যেক সত্যের কাজে অংশ গ্রহণকারী। আল্লাহ আপনাকে সফল করবেনই"। এখানেই বিবি খাদীজা থামেনি। পূর্ববর্তী তাওহীদী রিসালাত ও রাসূলদের সম্পর্কে জ্ঞানী তার চাচাতো ভাই ওয়ারাক্বা ইবন নওফেলের শরণাপন্ন হয়ে তার কাছে তথ্য শুনে তা সংগ্রহ করে স্বামী রাসূল সঃকে সাহস সরবরাহ করে। তারপর স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে ওয়ারাক্বা ইবন নওফেলের মুখে সে বাণী শুনিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে। এ অবস্থায় মা আয়শা হলে কি তা কল্পনা করা যায়? বরং সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাসূল সঃ এর উপর অবতীর্ণ অহীকে কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব ভেবে ভয় পেয়ে তা দূর করতে ওঝা বৈদ্যি জড়ো করে ফেলতো! সে পর্যায়ে তো রাসূলের প্রতি মা আয়শার ঈমান আনার কথা কল্পনাই করা যায় না! রাসূল সঃ এর রাসূল জীবনের শেষ দিনগুলোতে মা আয়শা যা করেছে, তাতে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।
অহী প্রাপ্তির পর তার প্রচারে মা খাদীজা তার সকল ধন স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে মক্কা বাসীর অবরোধ ও সমাজচ্যুতির দীর্ঘ তিন বছর পানাহারের কষ্টে গাছের পাতা খেয়েও স্বামীর সাথে জীবন কাটিয়েছেন। অপর দিকে আমরা দেখি যে মক্কা বিজয়ের পর মা আয়শারা তাদের খোরপোষের বরাদ্দ বাড়াতে একজোট হয়ে রাসূল সঃ এর উপর চাপ সৃষ্টি করে। পরে আল্লাহ তালাক্বের আদেশ দিলে মা আয়শারা আন্দোলন ত্যাগ করে "পূর্ব ভাতায়" থাকতে বাধ্য হয়!
এভাবে বিবি খাদীজা স্বামীর প্রতি শর্তহীন সম্পূর্ণ সমর্পণ দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। রাসূল সঃও কখনো বিবি

খাদীজার দান ভুলেননি। পরে মা আয়শা তাকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করলে রাসূল সঃ শক্ত ভাষায় নিন্দা করে মা আয়শার মুখ বন্ধ করেন। বিবি খাদীজার মৃত্যুতে রাসূল সঃ প্রচন্ড ভাবে শোকাহত হন। বিবি খাদীজার জীবদ্দশায় রাসূল সঃ দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। কারণ, বিবি খাদিজা একাই একশ ছিলো। ইব্রাহীম ব্যতীত আল্লাহ রাসূল সঃ এর সকল সন্তান মা খাদীজার জঠরেই দিয়েছেন। জাহিলিয়্যাতে রাসূল সঃ এর সাথে তার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও জাহিলিয়্যাত থেকে ইসলামে প্রবেশ করে এমন সেবা দান করে যায় যে, রাসূল সঃ এর সংসারে একত্রে ন'জন স্ত্রী হয়েও তারা সে এক স্ত্রীর অভাব ও শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। রাসূল সঃ পারিবারিক অশান্তিতে পড়লেই বিবি খাদীজার কথা স্মরণ করে তাঁর বিবিদের সামনে একা খাদীজার স্বামী সেবার তুলনা তুলে ধরতেন। অথচ মা আয়শা ও মা হাফসা পূর্ণ ইসলামে হিজরতেরও পরে রাসূল সঃ এর ঘরে স্ত্রী রূপে এসে রাসূল স্বামীর প্রতি সাধারণ দায়িত্বটুকু পালনেও বারবার ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে।

ভালো মন্দ, ভালো ও উত্তমকে নিজ নিজ স্থানে মূল্যায়ন করে সমাজে ভালোকে প্রতিষ্ঠা, উত্তমকে পুরস্কৃত এবং মন্দকে মন্দ বলে তাকে নির্মূল করার শিক্ষার নামই ন্যায় বিচার। এ ন্যায় বিচারকে ক্বোরআনে আদ্‌ল বলা হয়েছে। আল্লাহ ঈমানদারদের পৃথিবীতে আদ্‌ল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা রাসূল, রিসালাত, দ্বীন ও ঈমানের ইমামত প্রতিষ্ঠা করবে, তারা যদি রাসূলের সাথে বেআদবী ও দুর্ব্যবহারকারী এবং রাসূলের আনুগত্যে সব কিছু বিসর্জনকারীদের পার্থক্য না করে, বা করার যোগ্যতা রাখেনা, রাখলেও করার সৎ সাহাস রাখেনা, তারা কি আদর্শ মুসলিম? তারা কি বিশ্বে তাগুতকে উৎখাত করে রাসূলের বিশ্বরাহমাতকে প্রতিষ্ঠা করার যোগ্য হতে পারে!? আমার দ্ব্যর্থহীন মত, কখনো পারেনা। তাই ইসলামের পূনর্জাগরণের স্বপ্নদ্রষ্টাদের সর্বপ্রথম, তাওহীদ, ক্বোরআন, রাসূল ও রিসালাতকে বুঝে রাসূলের পরিবার ও কথিত সাহাবীদের মধ্যে উত্তম, ভালো ও মন্দদের পরখ করে উত্তম হয়ে ভালোদেরকে সঙ্গী করে মন্দকে উৎখাত ও নির্মূল করার সবক নিয়ে সুরা হুজুরাতের ১৮টি দফা মেনে ঈমামের পেছনে একৃতেদা করতে হবে। তাতেই সালাত ক্বায়েম হবে, সালাত ক্বায়েমের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হবে এবং সে ঐক্যের দ্বারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তা না করে যতো মস্‌জিদ বানানো হবে, সে গুলো হবে মসজিদে জেরার বা দেরার, সালাত হবে মুকাআঁও ওয়া তাসদিয়াহ্‌, বা আড্ডা ও তালি বাজানো, ধর্ম হবে, ফাসাদ্‌ ফিল্‌ আরদ্‌ বা ভূপৃষ্ঠে অরাজকতা সৃষ্টি, কায়েম হবে ইবলিসের খোদায়ী এবং রাষ্ট্র পরিচালক ও জনগণ সবাই হবে তাগুত, তাগুতরাই কাফের ও মুশরিক। এদের সবার স্থান ও ঠিকানা হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কাজেই সাধু সাবধান! সাধু সাবধান! নারী-পুরুষ, সবাই নিজ নিজ খাতা নিয়ে হিসাবে বসো। দম ফুরালে সবার ঠুশ। কেউ কারো কাজে আসবেনা।

মা উম্মে হাবীবা

মা উম্মে হাবীবা আখেরী নবী সঃ এর ঘরে প্রাচীন ফেরআউনের স্ত্রী সাদৃশ্য মক্কার তদানিন্তন ফেরআউন আবু সুফ্‌য়ানের কন্যা। উম্মে হাবীবার ভালো নাম রাম্‌লা বিন্‌ত্‌ আবু সুফ্‌য়ান। আবু সুফয়ানের কন্যা হলেও উম্মে হাবীবা হামযার কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দার পেটে জন্মায়নি। তার মা আবু সুফ্‌য়ানের আরেক স্ত্রী সফিয়্যাহ্‌ বিনত্‌ আবিল আসের জঠরের ফসল। ফেরআউন পিতার ডর ভয় উপেক্ষা করে উম্মে হাবিবা ইসলাম গ্রহণ করে পিতার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবন্‌ জাহ্‌শকে নিয়ে হাবশায় হিজরত করে। হিজরতরত আবিসিনিয়ায় থাকাকালীনই সেখানে খবর আসে যে রাসূল সঃ আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় যায়দ ইবন হারিসার সাথে তার বোন যায়নাবকে বিয়ে দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও বদ্দু রক্তের বিষ ক্বোরেশী আভিজাত্য উবাইদুল্লাহর অন্তর থেকে দূর হয়নি। অক্বোরেশী মুক্তদাস যায়দের সাথে তার ক্বোরেশী বোনের বিয়েতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায়। তাতে উম্মে হাবীবা স্বামীকে ত্যাগ করে ইসলামে দৃঢ় হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও রাসূলকে বিজয় দান করলে হাবশায় বসবাসরত মু'মিনরা মাদীনা ফেরত আসতে আরম্ভ করে। প্রায় সবাই চলে আসে। রাসূল সঃ জানতে পারেন যে, উম্মে হাবীবার কোনো সঙ্গী নেই। সে একা। তাই রাসূল সঃ সম্রাট নাজ্জাশীকে পত্র লিখে বললেন যে, সম্রাট নিজেই যেনো অভিভাবক হয়ে উম্মে হাবীবাকে রাসূল সঃ এর সাথে পুনঃ বিবাহের ব্যবস্থা নেয়। সম্রাট যেহেতু আখেরী নবী সঃ এর উপর ঈমান এনেছিলো, তাই সে রাসূল সঃ এর প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে উম্মে হাবিবাকে রাসূল সঃ এর সাথে বিয়ের আয়োজন করে। সম্রাট নিজের তরফ থেকে মূল্যবান রেশমী পোষাক ও চারশ দিনার মোহরানা দিয়ে বিয়ের পর্ব সমাধা করে। রাজ পরিবারের মেয়েদের নির্দেশ দেয়, তারা যেনো রাসূল সঃ এর স্ত্রীর জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করে। তারা সম্রাটের নির্দেশে আগরকাঠসহ বহু মূল্যবান আতর ও অন্যান্য উপঢৌকন

পাঠায়। নাজ্জাশী ধুমধাম করে বউভাতেরও আয়োজন করে। বহু লোককে আপ্যায়ন করে, তাতে মা উম্মে হাবীবা দরিদ্র থেকে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়। আবু সুফ্য়ানের মেয়ে হলেও বিদেশে হিজরত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? কিন্তু নাজ্জাশীর অভিভাবকত্যে রাসূল সঃ এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্যকে চিহ্নিত করতে রাজ প্রাসাদের দাসীদের উম্মে হাবীবা মোটা মোটা বখশিশ পেশ করে। দাসীরা তা এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে এ উপলক্ষে সম্রাট নিজেই তাদের প্রচুর বখ্শিশ দিয়ে নিষেধ করেছে তারা যেনো নবীর স্ত্রী থেকে কোনো দান গ্রহণ না করে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, উম্মে হাবীবাকে রাসূলের সাথে বিয়ে দেয়াকে নাজ্জাশী কতো গুরুত্ব দিয়েছিলো!

খাইবার বিজয়ের পর উম্মে হাবীবা মাদীনা ফেরত এসে রাসূল সঃ এর সাথে মিলিত হয়। তখন উম্মে হাবীবার বয়স চল্লিশ। রাসূল সঃ এর ঘরে এসে উম্মে হাবীবা তার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। আয়শা ও হাফসা কারো ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়নি। বরং সর্বক্ষেত্রে রাসূল সঃ এর প্রতি আদর্শ স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছে। রাসূল সঃ এর জীবনে খোরপোষের আন্দোলন, মধু খাওয়ানোর ঘটনা এবং মা মারিয়া ক্বিবতিয়ার সাথে রাসূল সঃ এর মিলন নিয়ে মা আয়শা ও হাফসার কোনো চক্রান্তে তারা উম্মে হাবীবাকে টানতে সক্ষম হয়নি। রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পরও মা উম্মে হাবীবা মা আয়শা, হাফসার কোনো কান্ডে যোগ দেয়নি। ক্বোরআন ও আল্লাহর রাসূলের শিক্ষাকে আঁকড়ে রয়েছে। তার সতালো ভাই মুয়াবিয়ার কোনো ধূর্তামীকে প্রশ্রয় দেয়া দূরে থাক, তাকে কাছেও ভিড়তে দেয়নি। বরং আলীর পক্ষ অবলম্বনকারী তার বাবা আবু সুফ্ইয়ানের জারজ সন্তান যিয়াদকে মুয়াবিয়া তার দলে ভিড়াতে তাকে ভাই রূপে স্বীকৃতি দিলে উম্মে হাবীবা যিয়াদের সাথে সাক্ষাত না করে তার সাথে পর্দা করে মুয়াবিয়ার চক্রান্তকে প্রত্যাখ্যান করে। এভাবেই সত্যের উপর অটল থেকে উম্মে হাবীবা ৪৪ হিজরীতে ঈমান ও আমলের সমন্বিত পাথেয় নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই আল্লাহ সূরা তাহরীমে উম্মে হাবীবাকে ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়ার দৃঢ় চরিত্রের দৃষ্টান্ত বলে ইংগিত করেছেন। ধন্য তার জীবন। ধন্য তার মরণ। অবশ্য সে ধন্য হবে হাশরের ময়দানেও। বর্তমানে ফেরআউনদের ঘরের মেয়েরা কি উম্মে হাবীবার অনুসরণে নতুন আসিয়া ও উম্মে হাবীবা হবে? আমি কিন্তু ভেবে দেখার দাওয়াত দিলাম। (এ ব্যাপারে আরো জানতে হলে, তাবারী, ইবন্ হিশাম, ডঃ আয়শা বিন্ত আশ্শাতীর নিসাউন্ নবী, ইব্ন সাআদ, ইব্ন হাজ্র ও সামাতুস সামীন দেখো)।
আবু সুফয়ানের মতো মুশরিক পিতাকে অপবিত্র বলে রাসূলস্বামীর বিছানায় বসতে না দেয়া কি চাট্টিখানি ঈমানের কথা? এ সমস্ত স্মরণ রেখে তুলনামূলক দৃষ্টিতে নিজেদের সৌভাগ্যের পরশ পাথর ক্রয় করতে হবে।

মা উম্মে সালমা

মা উম্মে সালমার আসল নাম, হিন্দ বিন্তে আবি উমাইয়া। তার স্বামী আবু সালমা, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল আসাদ। ইসলাম গ্রহণ করে ক্বোরেশের অত্যাচারে হাবশায় হিজরত করে চলে গিয়েছিলো। পরে রাসূল সঃ এর মাদীনায় হিজরতের পূর্বক্ষণে মক্কা ফেরত আসে। রাসূল সঃ এর হিজরতের পর হিজরত করে মাদীনায় চলে আসে। তার স্বামী বদরের ও উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। উহুদের যুদ্ধে আহত হয়। সে ক্ষতেই তার মৃত্যু হয়।
স্বামীর মৃত্যুর পর রাসূল সঃ এর সাথে তার বিয়ে হয়। উম্মে সালমা নামডাকের সুন্দরী ছিলো। আবার তার বাবা ক্বোরেশের নাম করা ব্যক্তি ছিলো। সবমিলে কোনো দিকেই মা আয়শার চেয়ে খাটো ছিলো না। মা আয়শা ও হাফসা তার সাথে সতীন সুলভ ঈর্ষা প্রকাশ করলেও উম্মে সালমা তাদের সাথে ঝগড়ায় যায়নি। রাসূল সঃ এর ঘরে রাসূলের বিরুদ্ধে মা আয়শা হাফসার পাকানো কোনো ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়নি। রাসূল সঃ এর স্ত্রীদের মধ্যে মা খাদীজার পর তাকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও বিপদ কালে রাসূল সঃ কে সঠিক পরামর্শদাত্রী বলে স্মরণ করা হয়।

হুদাইবিয়ার ঘটনা কালেও রাসূল সঃ এর সঙ্গী ছিলো উম্মে সালমা। আপাতঃ দৃষ্টিতে হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত সমূহ মুসলিমদের জন্য অপমানজনক মনে করে অবাধ্য বেদুঈন স্বভাবের তাঁর কথিত সাহাবীরা রাসূল সঃ এর সম্পাদিত চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। কেউ কেউ রাসূল সঃ এর সাথে প্রকাশ্য সওয়াল জওয়াবেরও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করে। উমর তাদের মধ্যে অন্যতম। কতো স্পর্ধা এদের যে এরা আল্লাহর পূর্ণনবী সঃ এর সাথে এ আচরণ করতে তাদের বাধেনি! তারা কোন ধরনের ঈমান এনেছিলো খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর উপর? ক্বোরআনকেই বা তারা কি হিসেবে গ্রহণ করেছিলো যে তারা ক্বোরআনের নির্দেশও মানতে দ্বিমত করে?

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ পর্যায়ে দাঁড়ায় যে রাসূল সঃ তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে সম্পূর্ণ একা হয়ে যান। যেমনটি তিনি হিজরতের সময় সওর গুহায় একা হয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু বকরও আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করে অস্থির হয়ে সাহায্যকারীর স্থলে দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিলো। তাই রাসূল সঃ কে আবু বকরকে আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে শান্ত করতে হয়েছে। অন্যথা যে কোনো অঘটন ঘটার আশঙ্কা ছিলো।

হুদাইবিয়ার ঘটনা আল্লাহর রাসূলের যেমন চূড়ান্ত বিজয়ের ঘটনা, তেমন আবু বকর, উমর ও আলীদের চূড়ান্ত ব্যর্থতার নির্দেশক। হুদাইবিয়ার ঘটনায় রাসূল সঃ শুধু ওমরা করতে এসেছিলেন। ক্বোরেশ ও মক্কাবাসীর সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য আসেননি। তাই তিনি সংঘর্ষ এড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তার অর্থ এ নয় যে, তিনি আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করবেন না। তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন। যখন তার দূত ওসমানকে হত্যার গুজব রটেছিলো, তখন ঠিকই তাঁর কর্তব্য নির্ধারণে তিনি সামান্যতম দুর্বলতাও দেখাননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গীদের প্রাণপণ অঙ্গীকারের বায়আত নিয়েছেন। যাকে "বায়আতুর রিদ্ওয়ান" বলা হয়। যার অর্থ প্রাণ উৎসর্গের অঙ্গীকার। হুদাইবিয়ার ঘটনা কালে রাসূল সঃ এর সঙ্গীদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দ 'শ' থেকে মতান্তরে আঠারো 'শ'। তাদের সাথে একটি করে তরবারী ও একটি করে বর্শা ছিলো! পূর্ণ সমরাস্ত্র ছিলোনা।

পরীখা বা আহযাবের পরের ঘটনা হুদাইবিয়ার সন্ধি। এর পূর্বে দুটি প্রধান সংঘর্ষে মু'মিন ও কাফেররা একটি করে যুদ্ধ জিতেছে। বদরে মু'মিনরা, উহুদে কাফের মুশরিকরা। আহযাবের শাসরুদ্ধকর অবরোধে আল্লাহ প্রচন্ড ঝড় ও তূফান বারিপাতের দ্বারা ক্বোরেশের নেতৃত্বে আসা সম্মিলিত কাফেরদের বিরাট রণপ্রস্তুতিকে লন্ড ভন্ড করে তাড়িয়ে দেন। তাতে ক্বোরেশরা পরবর্তী দিনে তাদের আগ্রাসন ক্ষমতা সম্পর্কে হীনবল ও হতাশ হয়ে ফিরে যায়। তার লক্ষণ টের পেয়ে রাসূল সঃ তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন যে, দেখবে এরপর ক্বোরেশরা আর তোমাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হতে আসবেনা।

তাই হুদাইবিয়ায় মিথ্যা মান রক্ষার জন্য মক্কাবাসীদের প্রকাশ্য হুমকি ধম্‌কি থাকলেও তারা ভিতরে সন্ধির পিয়াসী ছিলো। আল্লাহর রাসূলও তা বুঝতে পেরে শত্রুর বিরুদ্ধে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে আল্লাহ কর্তৃক আদেশকৃত সুদূর প্রসারী বিজয়ের লক্ষ্যে স্থূল দৃষ্টিতে অপমানকর শর্তে হুদাইবিয়ার চুক্তির খসড়া দাঁড় করান। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে পরবর্তীতে রাসূল সঃ এর স্থলাভিষিক্ত খলিফা হওয়ার প্রতিযোগী আবু বকর ও উমর রাসূল সঃ এর চুক্তির রহস্য অনুধাবন দূরে থাক, তা অনুমানও করতে পারেনি। তাদের জ্ঞান বুদ্ধির বেড়ে না আসলেও তো তাদের প্রতি আল্লাহর কঠোর নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলের কোনো সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের বিরোধিতা করতে পারবেনা। করলে তোমাদের ঈমান ও সকল আমল বেমালুম মুছে যাবে। এতো স্পষ্ট কঠোর সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও আবু বকর, উমর ও আলীরা রাসূল সঃ এর নির্দেশ অমান্য করার সাহস কোথা পেতো? তারা কি রাসূল সঃ অহী ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত নেননা বা কোনো কথা বলেন না, এ কথা বিশ্বাস করতো না, না জানতো না? না তারা রাসূল সঃ কে একজন সাধারণ দলপতি নেতা মনে করতো? তারা কেউতো নতুন ঈমান আনা বদ্দু ছিলোনা! তারা না পরে সিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আযম ও রাসূলের জ্ঞান নগরীর প্রধান ফটক প্রভৃতির দাবীদার হয়ে মুস্তাদআফ্ ও মাদীনাবাসীদের সম্পূর্ণ রূপে বাদ দিয়ে আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশের নতুন কালেমা প্রচার করে খলিফা ও আমীরুল মুমেনীন হয়েছে? হুদাইবিয়ার সময়তো যায়দ জীবিত। রাসূল সঃ এর সাথে তখন তো যায়দ ছাড়াও বিলাল, আম্মার, ইব্ন মাসউদ, সুহাইব, সালমান, ও উসামাহ্ গংরা ছিলো! তাদের একটি প্রাণীরও রাসূল সঃ এর সাথে বেয়াদবীর একটি দৃষ্টান্তও তো আমরা গোটা ইতিহাসে দেখতে পাইনা! তা কেনো? তারা কি দুর্বল ও নির্বোধ ছিলো? তা তো নয়! বদরের যুদ্ধে উমাইয়াকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে বিলাল, আবু জেহলের শিরোচ্ছেদ করেছে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও বাজপাখীর ন্যায় ঝাপটে শিকার করেছে আম্মার। সেখানে তো সিদ্দীক ও ফারুকদের উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব আমরা দেখিনা! মক্কা থাকাকালীন যখন দুরাচার ক্বোরেশী যালেম আবু জেহেলের অত্যাচার ও নিপীড়নে ঈমানী ও তাওহীদের জীবন ওষ্ঠাগত, তখন আমরা দেখতে পাই যে ওসমানের উপেক্ষার "ক্ষুদে কুকুর" ইবন মাসউদ কাবায় আরামরত আবু জেহলের মুখে চপেটাঘাত ও মাথায় পিঠে লাথি মেরে দৌড়ে পালিয়ে মাদীনায় এসে রাসূল সঃ এর সাথে মিলিত হয়। ওসমানদের মতো উহুদের যুদ্ধে রাসূল সঃ এর শাহাদাতের গুজব শুনে যায়দ, বেলাল ও আম্মারদের ময়দান ছেড়ে পালাতে দেখিনা! তারপরও তারা দূর্বল ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি কি রূপে হয়? বিশ্বে ইসলামের জাগরণের বা পুনরুত্থানের চূড়ান্ত জিহাদে নামার পূর্বে এ সমস্ত প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর চাই। তা হলেই বিশ্বের

জনসংখ্যার নির্যাতিত শতকরা আশি ভাগ মুস্তাদআফ্দের আমরা আমাদের সাথে পাবো। রসূল সঃ এর সঙ্গী মুস্তাদআফ্ ইমামদের উপর মোড়ানো যবনিকা দূর না করে আন্দোলনে নামলে পুনঃ বর্ণচোররা অনুপ্রবেশ করে পূর্বের ন্যায় আবার নতুন সাম্রাজ্যের গহ্বরে আমাদের ঠেলে দিবে। তাই দিগন্ত পরিষ্কার করেই পুণর্যাত্রায় পা বাড়াতে হবে। রাসূল সঃ এর কথা অনুযায়ী হুদাইবিয়ার প্রাণ বিসর্জনের শপথ নেয়ায় আল্লাহ রাসূল সঃ এর সঙ্গীদের উপর সে বিশেষ কাজটির জন্য সন্তুষ্ট বা রাজী হয়েছেন, إذ(؟)يبايعونك বলে, আল্লাহ সে বিশেষ কাজটিকে অনুমোদন দান করেছেন। আল্লাহ আনুগত্যে যেমন খুশী ও রাজী হন, তেমনি অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনে রাগান্বিত ও নারাজ হন। তাঁর সন্তুষ্টি যেমন অমূল্য প্রাপ্তি, তাঁর বিরাগ তেমন সর্বনাশা। সন্তুষ্টির কাজের পর অসন্তুষ্টির কাজ করলে পূর্বের সন্তুষ্টি মুছে গিয়ে পরের অসন্তুষ্টি ও গযব রয়ে যায়। খাঁটি তওবা বা তাওবাতুন নাসূহা করে পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্ফারা আদায় না করলে ফের সন্তুষ্টির পথে আসা যায়না। এ আল্লাহ্র শাশ্বত বিধান। সুন্নাতুল্লাহ। তাতে কোনো হেরফের নেই। আদি থেকে আল্লাহর দাসদের ব্যাপারে এ অমোঘ বিধান সমান ভাবে চলে আসছে, চলমান। তাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। যারাই, যে কালে, যে স্থানে তা অমান্য করবে, আল্লাহর আযাব ও গযব আসার পূর্বেই তওবা করে দায়মুক্ত হতে হবে। আযাব আসার লক্ষণ প্রকাশ পেলে তওবা করে কোনো ফায়দা হবে না। ধ্বংস অনিবার্য। فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ - (সূরা মু'মিন-৮৪,৮৫)

হুদাইবিয়ার প্রশংসিত বায়আতের চুক্তির খসড়া হচ্ছে, বা হবে। রাসূল সঃ এর সাথে দূতদের ও মককা ও তায়েফের নেতাদের সাথে আলাপ হচ্ছে। আল্লাহর পৃথিবীর পূর্ণতম মানুষটি কথা বলছেন আল্লাহর ঘর ও তার পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ নগরীর দু'নেতা সুহাইল ইবন্ আমর ও উরওয়া ইবন্ মাসউদের সাথে। শেষোক্ত ব্যক্তি উরওয়া ইবন মাসউদ মক্কা ও তায়েফের সে জাহেলী সমাজের দু'সম্মানীত দু'ব্যক্তির একজন, যাদের ব্যাপারে লোকেরা মনে করতো যে নবী হলে তাদের দু'জনের যে কোনো একজন হওয়ার যোগ্য। وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

"তারা বলেছিলো যে ক্বোরআন ঐ প্রধান জনবসতির দু'মহান ব্যক্তির কারো উপর কেনো নাযিল হলোনা?" (সূরা যুখরুফ-৩১) ক্বোরআনে দেখা যায় যে, রাসূল সঃ যখন কারো সাথে কথা বলতেন বা কেউ যদি রাসূল সঃ এর সাথে কথা বলতো, তখন আল্লাহ বিশেষ ভাবে তা দেখতেন। কি বলতে হবে রাসূল সঃ কে তা শিখাতেন। তা ছাড়াও আল্লাহ সর্বদা সবকিছু দেখেন বলে প্রত্যেক ঈমানদারের মৌলিক বিশ্বাস। আবু বকর উমরদেরকে তো সাধারণ ঈমানদার মনে করা হয়না, তাই তাদের তো রাসূল সঃ এর দরবারে কথা বলতে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী সতর্ক হওয়ার কথা!

উরওয়া ইবন্ মাস্উদ রাসূল সঃ এর সাথে কথা বলার মাঝে তার মুস্তাক্বিরী ধারণা মোতাবেক বলেছিলো যে, "হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার সাথে ভদ্রলোক দেখতে পাচ্ছিনা। দেখতে পাচ্ছি আজে-বাজে লোক তোমার চার পাশে জমা হয়েছে। বেশী দিন যাবেনা তুমি দেখবে যে, এরা তোমাকে একা ফেলে নিজ নিজ স্বার্থের পথ নিবে।" একথা শোনামাত্র আবু বকর রেগে গিয়ে উরওয়াকে বলেঃ امصص بظر اللات أنفر عنه و ندعه؟

"তুমি গিয়ে লাত দেবীর যোনি চুষো, আমরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো" ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজউন। (দেখো, আসাহ্হুসিয়ার, বোখারী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাব)।

আবু জেহেল যখন রাসূল সঃ কে অপদস্ত করার জন্য মক্কায় অগ্রসর হচ্ছিলো, তখন সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ الم يعلم بأن الله يري؟ "সে কি জানে না যে আল্লাহ তাকিয়ে আছেন?" (সূরা আল্ আলাক্ব-১৪) রাসূল সঃ এর সামনে আবু বকরের এ আচরণকে কী ভাবে নেয়া যায়? প্রথম খলিফা আবু বকর! খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূল সঃ তার মেয়ের জামাই। সেখানে ক্ষিপ্ত হয়ে এ অশ্লীল গালি? তাকে তো উরওয়ার কথাই সত্য প্রমাণ হয় যে, ওরা কেউ ভদ্রলোক নয়! কই উরওয়া তো তার উত্তরে সেরূপ আরেকটি গালি দিলোনা! এতো আমার অদূরে অবস্থিত গাবতলী গরুর হাটের দালাল ও টার্মিনালের কুলি কন্ডাক্টারদের ভাষা?!

ক্বোরআনে আল্লাহ বলেছেন ঈমানদারদের, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তোমরা মুশরিকদের গালি দিও না। তা হলে তারা তোমাদের শত্রুতায় মূর্খতা বশতঃ আল্লাহকে গালি দিয়ে ফেলবে।" (সূরা আনআম-১০৮) উরওয়া তায়েফবাসীর নেতা, বনু সাক্বীফেরও নেতা। লাত, বনু সাক্বীফের দেবী। হুদাইবিয়ার ঘটনাটি রাসূল সঃ এর কুটনৈতিক সুন্নাতের উজ্জ্বলতম ঘটনা। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির দু'বছর যেতে না যেতেই মক্কা বিজয় ও তায়েফ বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাঁর রিসালাতের চূড়ান্ত বিজয়, "ফাত্হুম্ মুবীন" দান করেছেন।

এ বিজয়ের চাবিই হলো রাসূল সঃ এর হুদাইবিয়ার সন্ধি। অথচ আবু বকর, উমর ও আলী, এর তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলো। সেখানে সম্পূর্ণ রূপে রাসূল সঃ একা তা সম্পাদন করেছেন। এবং তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে মা উম্মে সালমা অবিস্মরণীয় ঈমানী প্রতিভায় রাসূল সঃ কে সাহায্য করেছেন।

উরওয়া ইবন মাসউদ্কে রাসূল সঃ এর মুখের উপর অশ্লীলতম গালি দেয়ায় আবু বকরের ব্যাপারটি আমি আরেকটু বিশ্লেষণ করবো। যাতে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত রূপে আমরা ধরে নেই যে আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে তাঁর রাসূলের একজন খাঁটি অনুসারী ইমাম দান করলেন। সে ইমাম রাসূল সঃ এর ভবিষ্যত বাণীর ভারত অভিযানের প্রারম্ভে হুদাইবিয়ার সন্ধির ন্যায় এক কুটনৈতিক পদক্ষেপ স্বরূপ ভারতের আশি কোটি মুস্তাদআফদের সামনে আল্লাহর দ্বীনের আদর্শ তুলে ধরার জন্য ভারত সফর, তথা নয়া দিল্লী সফরের প্রস্তুতি স্বরূপ ভারতের সীমান্তে এক লাখ লোক নিয়ে উপস্থিত হলো। শুভেচ্ছা সফরে ভারতে প্রবেশের ভিসা বা অনুমতি চাওয়া হলো। মক্কার তুলনায় মাদীনা যেমন তখন ক্ষুদ্র বিকাশমান নগরী ছিলো, ঢাকা তথা বাংলাদেশ, ভারত তথা নতুন দিল্লীর তুলনায় তেমন ক্ষুদ্রদেশ ও ক্ষুদ্রশক্তি। সে পরিস্থিতিতে বর্তমান ভারতের মুশরিক মুস্তাকবির নেতা বাজপেঈ অথবা আদভানী ইমামের মুখোমুখি ব্যাপারটি সরাসরি জানতে আসলো। সে পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবৈষম্যের তাড়নায় আমাদের ইমামকে বাজপেঈ অথবা আদভানী বলে যে "তোমার সঙ্গীরা চন্ডাল শ্রেণীর। এরা ইমামের উচ্চ কল্কীর অবতার আদর্শের ধারক বাহক হওয়ার অযোগ্য। কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা ইমামের আদর্শ ত্যাগ করে পুনঃ যে চন্ডাল সে চন্ডালই হয়ে যাবে।" তার উত্তরে কি ইমামের প্রথম সারির কোনো শিষ্য বাজপেঈকে বলবে যে "তুমি গিয়ে দুর্গা বা কালির যৌনাঙ্গ চোষো, আমরা কখনো আমাদের নেতার আনুগত্য ত্যাগ করে তাকে বর্জন করবো না।" এমন কথা বললে কি প্রমাণ হবেনা যে, এক হলে আমাদের ইমামই ঠিক নয়, নয়তো ইমামের অনুসারীর দাবীদার আমরা সত্যি সত্যিই চন্ডাল প্রকৃতির, যে আমরাই ইমামকে এখনই মানিনা? পরে কি হবো তা বর্তমান আচরণেই বুঝায়, যেমনটি রাসূল সঃ চোখ বন্ধ করার পর আরব মরুর "আশাদ্দু কুফ্রাওঁ ও নিফাক্বার" লোকেরা করেছে!

হুদাইবিয়ার সন্ধি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। দশ বছরের জন্য "যুদ্ধ নয়, বন্ধুত্বের" চুক্তি হচ্ছে। উভয় এলাকার লোকেরা একে অপরের এলাকায় আবাধে যাতায়াত করবে। মক্কার কোনো লোক ধর্মান্তরীত হয়ে তাদের অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মাদীনা চলে গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। মাদীনা থেকে কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মক্কা চলে আসলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। আরব দ্বীপের যে কোনো গোত্র যে কোনো পক্ষের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে কোনো এক গোত্রের উপর অপর পক্ষের কেউ অস্ত্র ধরলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর হবে। এ ছিলো হুদাইবিয়ার চুক্তির মূল ধারাগুলো। ঈমানের গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এতে আদর্শবাদী কোনো আন্দোলনের কোনো হারানোর কিছু ছিলো না। যারা মাদীনা থেকে ইসলাম ও হিজরত ত্যাগ করে চলে আসবে, তেমন লোকদের কোনো প্রয়োজন মুসলিম সমাজে নেই। বরং তারা চলে আসলেই মঙ্গল। মক্কা থেকে খাঁটি ঈমান নিয়ে যারা মাদীনা যাবে, তাদের অভিভাবকরা বলপূর্বক তাদের ফেরত আনলে ফেরত এসে তারা তাদের ভঙ্গুর সমাজে আরো তাড়াতাড়ি ধ্বংস নামাবে।

রাসূল সঃ চুক্তি লেখানো আরম্ভ করলেন। রাসূল সঃ আল্লাহ্র সরাসরি তত্ত্বাবধানে বলছেন আর আলী ইবন্ আবি তালিব তা লিখছে। শুরুতেই বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচ্চারণ করতে মুশরিক পক্ষের সুহাইল্ ইবন্ আম্র আপত্তি তুলে বলছিলো, আমরা ঐভাবে আল্লাহর নাম নেই না, জানিও না। লিখা হোক, "বিস্‌মিকা আল্লাহুমা" আল্লাহ্ তোমার নামে শুরু করছি। রাসূল সঃ বললেন আলীকে তাই লেখো। তার পরের লাইন আসে, তাতে বলা হয় যে, এ চুক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও সুহাইল্ ইবন্ আমরের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে। তাতেও আমর আপত্তি তুলে বললো আমরা তোমাকে আল্লাহ্র রাসূল রূপে মানিনা বলেই তো বিরোধ! তোমাকে রাসূল রূপে মেনে নিলেতো আর বিরোধই থাকে না, তাই চলো আমরা আমাদের উভয়ের নাম ও পিতার নাম লিখি। রাসূল সঃ বললেন যে আমি আল্লাহ্র রাসূল

হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তা মানছোনা। ঠিক আছে, তোমাদের অমান্যের প্রমাণ স্বরূপ তাই লেখা হোক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ও সুহাইল ইবন আমর। আলী পূর্বেই রাসূলুল্লাহ লিখে ফেলেছিলো। রাসূল সঃ বললেন, ঐ অংশটুকু মুছে ফেলো। আলী তা মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানায়। কেনো? রাসূল সঃ এর চেয়েও কি আলী বেশী রিসালাতের রক্ষক ও মর্যাদা রক্ষাকারী?! এ কেমনতরো কথা যে, ক্বোরআন ও রাসূলের আদেশ মানতে অস্বীকৃতি? রাসূল সঃ এর যেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিলো না, তাই তিনি আলীকে বললেন যে বিশেষ স্থানটি দেখিয়ে দাও। আলী দেখিয়ে দিলে রাসূল সঃ স্বহস্তে তা মুছে ফেলেন। এভাবে চুক্তি সম্পাদিত হলো। চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হলো যে এ যাত্রা রাসূল সঃ মাদীনায় উমরা সম্পাদন ছাড়াই ফেরত যাবেন। পরবর্তি বছর এসে তিন দিন অবস্থান করে উমরা পালন করে যাবেন। তাই হারামের সীমায় নিজ নিজ ক্বোরবানীর পশু জবাই করে চুল কেটে বা মাথা মুড়ে হালাল হয়ে ইহরাম খুলবেন। রাসূল সঃ আদেশ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে কেউ তা করতে এগিয়ে আসেনি! এদের ঈমানের সীমাবদ্ধতা এখানেও পরিমাপিত হলো, এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কথা একশ ভাগ সঠিক হলো। وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

রাসূলের প্রতি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সীমাজ্ঞানে অযোগ্যতম!

<u>সংক্ষেপে কী খাঁটি চরিত্রের বিশ্লেষন? তাই সূরা তওবা রাসূল সঃ এর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মেধা মাপার কষ্টিপাথর। মুস্তাদআফ্‌রা ব্যতীত অন্যরা ঈমানের সত্তা বিলোপ না করে শুধু ইসলামে আত্নসমর্পণ করেছিলো। তার বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। মুস্তাদআফদের ঈমানের সনদ আল্লাহ পূর্বেই ক্বোরআনে রাসূল সঃ কে জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে আল্লাহ্ রাসূল সঃ কে বলেছেন তাদের তাঁর চোখের সামনে রাখতে। তাদের দরবার থেকে না তাড়াতে, মুস্তাকবিরদের তাদের উপর প্রধান্য না দিতে, তারা সকাল ও সন্ধা, সন্ধা থেকে সকাল, আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা স্মরণে কাটায়। আল্লাহ্ তাদের সকল হিসাব নিজ হাতে নিয়েছেন। মুস্তাকবির মুসলমানদের হাতে তাদের হিসাব দূরে থাক, স্বয়ং রাসূল সঃ এর হাতেও তাদের কোনো হিসাব রাখেননি। তারপরও যদি রাসূল সঃ কখনো তাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হন, তা হলে স্বয়ং রাসূল যালেম রূপে পরিগণিত হবেন?! (সূরা আনআম-৫২, সূরা কাহ্‌ফ-২৮)</u>

রাসূল সঃ এর নির্দেশ অমান্য করে উমর দেড় হাজার লোকের তাবুতে গিয়ে বলে, "একি হলো? রাসূল সঃ কি সত্য রাসূল নন? তারা কি মুসলিম নয়? তবে কেনো নিচে নেমে চুক্তি?" ইত্যাদি অনভিপ্রেত প্রশ্ন করে সবাইকে এক মহা পরীক্ষায় ফেলে দেয়। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে তারা রাসূল সঃ এর এমন এমন মোজেযা দেখেছে যে তার একটির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ভাবলেই তাদের ঈমানের মে'রাজ হয়ে যাওয়ার কথা! দেড় হাযার লোক স্বল্প সময়ের জন্য উমরা পালন করতে এসেছিলো। রসদ পানি কম ছিলো। প্রায় তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকায় খাদ্য ও পানি ফুরিয়ে যায়। শুকনো কুপে রাসূল সঃ তাঁর বর্শা ফেললে পানিতে তা ভরে যায়। পানির পাত্রে হাত মুবারক দিলে প্রত্যেক অঙ্গুলি থেকে টেপের পানির মতো পানির ধারা বয়ে পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়। এ সমস্ত আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যক্ষ অনুমোদনের দৃষ্টান্ত দেখেও আবু বকর, উমর ও আলীরা রাসূল সঃ এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থ হলো। তা'কি প্রশ্নের উদ্রেক করে না?

"শুনলাম ও মানলাম" سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا মুমিনদের সর্বকালীন ঈমানের পরিচায়ক। তা কেনো আমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না যারা পরবর্তীতে খলিফা হয়েছিলো? ক্বোরেশীদের জন্য কি আল্লাহ্‌র কোনো গোপন আয়াত নাযিল হয়েছিলো, যে তারা তালগাছ তাদের ভাগে না পড়লে প্রতিবারই তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতার প্রমাণ দিবে? ক্বোরআনে অন্যুন বারো জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবেই। অন্যথা ঈমান ও আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া আরো বহু স্থানে বাধ্যতামূলক ভাবে রাসূল সঃ এর আদেশ মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ ক্বোরআনে।

সাধারণ সেনাবাহিনীতে কমান্ডের আদেশ অমান্য করলে যেখানে কোর্ট মার্শাল হয়ে শাস্তিসহ চাকুরীচ্যুতি থেকে প্রাণদন্ড পর্যন্ত হয়, সেখানে রাসূলের উপস্থিতিতে হিযবুল্লাহর সদস্যরা অবাধ্য হওয়া তো আরো গুরুতরো অপরাধ! দীর্ঘ ১৪১২ বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যের ঘড়ি ও গাড়ী উল্টো চলার কারণ যদি ওদের ক্বোরেশী ঔদ্ধত্যবাদের শাসনকে বলা হয়, তা হলে কি অস্বীকার করা যাবে?

সন্ধি পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ তিনবার পশু ক্বোরবানী করে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেও আবু বকর, উমর ও আলীরা তা পালন না করায় অন্যরাও ওদের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রাসূল সঃ এর আদেশ অমান্য করে। কার্যতঃই রাসূল সঃ আরেকবার হিজরতের সময় সওর গুহায় একা হওয়ার মতো দ্বিতীয়বার একা হলেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাসূল সঃ মা উম্মে সালমার নিকট তাঁর মনের অবস্থা প্রকাশ করলেন, যেমনটি রাসূল সঃ প্রথম অহী প্রাপ্তির পর মা খাদীজার নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। আল্লাহ্ মা উম্মে সালমার মাধ্যমে যেনো দ্বিতীয় বার বিবি খাদিজার পরশ সৃষ্টি করেন। স্বামী রাসূলের মনোকষ্টে সহমর্মী হয়ে মা উম্মে সাল্‌মা দৃঢ়চিত্তে রাসূলের পাশে দাঁড়ালো। ঈমানদীপ্ত কণ্ঠে রাসূল সঃ কে পরামর্শ দিলো যে, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল আপনার চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ্ আপনার সাথে রয়েছেন। আপনি ক্বোরবানী করে আসুন। আমি আপনার মাথা কামিয়ে দেই। তারপর দেখি কারা মু'মিন, কারা মু'মিন না। যারা মু'মিন, তাদের অবশ্যই রাসূলের আনুগত্য করে ঈমানের প্রমাণ দিতে হবে।"

যেমন পরামর্শ তেমিন কাজ। রাসূল সঃ যায়দ, বিলাল, আম্মার ও ইবন্ মাসউদ্‌কে নিয়ে ক্বোরবানী করে এলে মা উম্মে সালমা তাঁর চুল কামিয়ে দেয়। তা দেখে সর্বপ্রথম মুস্তাদআফ্‌রা রাসূলের অনুসরণ করে। তারপর আর যায় কোথায়! সকল তেড়াঘাড়-ওয়ালাদেরও ঈমান বাঁচাতে তাড়াহুড়া করে ক্বোরবানী করে, মাথা মুড়িয়ে ইহরাম খুলে সোজা হতে হয়।

মা উম্মে সালমার ঈমানী বিচক্ষণতায় সত্যিকার অর্থে হুদাইবিয়ায় আল্লাহ্‌র রাসূলের একার বিজয় হয়। আর অন্যরা বাধ্য হয়ে তাকে অনুসরণ করে ঈমানের সীমায় নিজের অবস্থান কোন প্রকার রক্ষা করে। তা না করলে সব মুশরিক ও মুর্তাদ হয়ে যেতো। বিশেষ করে হুদায়বিয়ার ঘটনায় আবু বকর, উমর ও আলীদের যে দুঃখজনক ভূমিকা, তাতে তারা মা উম্মে সালমার ঈমানী দীপ্তির সামনে পরাজিত হয়ে শেষ-মেষ নিজেদের ঈমানের শেষরক্ষা করে বেঁচে যায়। তা না হলে পরে আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ বলার মুখও তাদের থাকতোনা। হুদাইবিয়ার অভিযানে রাসূল সঃ এর সাথে মা আয়শা ও হাফসা থাকলে নিশ্চিত আশঙ্কা ছিলো যে তারা নিজ নিজ পিতার পক্ষ অবলম্বন করে রাসূল সঃ কে আরো কষ্ট দিতো।

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ এর মহা বিজয়ের সূচনা করে দেন। রাসূল সঃ চুক্তি সম্পাদন করে যখন মাদীনার পথে ফেরত রওয়ানা হন, তখন পথিমধ্যে সূরা ফাত্‌হ বা বিজয়ের সূরা নাযিল হয়। রাসূল সঃ এর একার বিজয় ও আবু বকর ও উমরদের পরাজয়ের ব্যাপারে সকল দ্বিমত ও সন্দেহের সম্ভাবনা বিদূরণের জন্য আল্লাহ্ সূরা ফাত্‌হ শুরু করেন। فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا বলে। অর্থাৎ "আমি অবশ্যই তোমাকে" (?) সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি। "তোমাদের (?) বিজয় দিয়েছি" বলেন নি। তার পরের আয়াতে আল্লাহ্ প্রিয় নবীকে মৃদু তিরস্কার ও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, "তোমার পূর্বাপর ভুল ক্ষমা করে আমার বিশেষ দানকে পূর্ণ করে সঠিক পথে দৃঢ় করে তোমাকে ভারি বিজয় দানের লক্ষ্যে আমি এ সন্ধি সম্পাদন করিয়েছি। সকল বিরোধিতার মুখেও তোমাকে অটল রেখে আমি, যারা তোমার সাথে ঈমানদার ছিলো, তাদের নড়বড়ে ঈমানের সাথে আরো ঈমান যোগ করার ব্যবস্থা স্বরূপ আমি তোমার একার দৃঢ়তায় এ সন্ধি পূর্ণ করেছি। আসমান জমিনের সত্য প্রতিষ্ঠার সকল সৈনিক আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাত্‌হ-১-৪)

সে দিন সত্যিই ওদের পরাজয়, পরম শিক্ষণীয় পরাজয় হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কে অন্যায় ও অমূলক ধারণা করে রাসূল সঃ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলো, "একি আল্লাহ্‌র রাসূল, না আল্লাহ্‌র রাসূল নয়?"

হুদাইবিয়ার দশ বছর মেয়াদী যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেই রাসুল সঃ মাদীনা পৌছে কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে তখনকার ইয়াহুদী চক্রান্তের আড্ডা খায়বার দুর্গ দখল ও চক্রান্তকারীদের উৎখাতের অভিযানে বের হন। ইয়াহুদীদের খায়বার দুর্গ বর্তমান ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের চেয়ে কোনো অবস্থাতেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। দুর্গটি সর্ব বিচেনায় তখনকার দিনে প্রায় দুর্ভেদ্য ছিলো বলা চলে। রাসূল সঃ প্রথমে আবু বকরকে দুর্গ আক্রমনের নেতৃত্ব দেন। আবু বকর ব্যর্থ হয়ে ফিরে। তারপর উমরকে পাঠান। সেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে। দু'বীরের মৌখিক বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যায়। তারপর আলীকে রাসূল সঃ নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান। আলী তার মৌখিক বীরত্বকে দৈহিক বীরত্বের প্রকাশ প্রমাণ করে দুর্গ জয় করে ধন্য হয়। আল্লাহ্ তাকে এ সফলতার পুরস্কার দিন।

কিন্তু আবু বকর ও উমর বিরোধী শিয়ারা এ বিজয়ে আলীর স্বপক্ষে এমন এমন গাঁজাখোরী গপ্প দাঁড় করিয়েছে যা যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অভাবনীয়, যেমন সুন্নীরা আবু বকর ও উমরের পক্ষে কেরামত দাঁড়

করিয়েছে। বলা হয় যে খায়বারের যুদ্ধে আলীর প্রতিপক্ষ বীর মারহাবের আঘাতে আলীর ঢাল পড়ে গেলে আলী দুর্গের এক লৌহ কপাট উপড়ে ঢাল স্বরূপ তা ব্যবহার করে। যুদ্ধ শেষে আলীর বিজয়ের পর সত্তুর ব্যক্তি একত্র হয়েও নাকি তা নড়াতে পারেনি। আলীকে ভীমের গদাধর ও ভীম হুঙ্কারী কিংবদন্তীর নায়ক বা প্রতীক বানিয়ে শিয়ারা শিয়া ফের্ক্বার মূর্তি তৈরী করেছে, যেমন আবু বকর ও উমরদের নিয়ে সুন্নীরা আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর রাসূলের আদর্শকে আড়াল করে মানব জাতিকে সোজা সরল শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত ও বঞ্চিত করেছে। এ সমস্ত আড়াল দূর করে তাওহীদ ও ঈমানের রাসূলী দিগন্তকে স্বচ্ছ করে সত্যের সূর্যোদয়ের জন্য আমার এ কলমের জিহাদ। আবু বকর, উমর ও আলী, তথা আল্লাহ্ ও রাসূল বাদ দিয়ে সাহাবা পূজার যে সর্বনাশা শির্ক, বিদ্‌আত ও বাতিল দাঁড় করা হয়েছে, তাকে ফেলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র আযান ও তার পতাকা উত্তোলন করলেই ইয়াহুদীদের উযাইর পূজা, খৃষ্টানদের যীশু পূজা এবং মোহামেডানদের সাহাবী পূজা বিদূরিত হয়ে হক্কের সূর্যোদয় হবে। তবেই মানব ঐক্যের মাহ্‌দী ও মসীহের সমন্বিত নেতৃত্ব বা বিশ্বে ইমামত আবির্ভূত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সঃ আরব দ্বীপের অন্যান্য গোত্রকে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। তাতে সমস্ত গোত্রের লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ আরম্ভ করে। বহির্বিশ্বে রাসূল সঃ দূত পাঠিয়ে পারস্য সম্রাট, রোমান সম্রাট ও বাইজেন্টাইন সম্রাটদের সামনে তাওরাত ইঞ্জিলে ভবিষ্যৎবাণীকৃত দ্বীনের সুস্পষ্ট পত্র পাঠান। এভাবে মক্কার ক্বোরেশী মুশরিক ও কাফেররা প্রায় একঘরে হয়ে যায়, এবং এক ঘটনায় তারা হুদাইবিয়া চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কা বিজয়াভিযান তরান্বিত করে দেয়। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ক্বোরেশের ইয়াহুদীবর্ণবাদী জাহিলিয়্যাতের সমাপ্তি ঘটে। পরাজিত শক্তি, প্রকাশ্য শত্রুতা ত্যাগ করে পরাজয়ের প্রতিশোধ এবং পুনঃ হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য ধর্মের লেবাসে মক্কা ও মাদীনায় তাদের অবস্থান নেয়। আবু সুফ্‌য়ান, মুয়াবিয়া, হাকাম, মারওয়ান, মুগীরা, আমর ইবনুল আস, ওয়ালিদ ইবন উকবা ও আব্দুল্লাহ ইবন সারাহরা এ ঘাতক প্রতিবিপ্লবী দলের প্রথম সারি ছিলো। আল্লাহ্ তা জানতেন। তাই যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সালমান ও উসামাহ্‌দের ঐ মুস্তাকবির মানুষ-শয়তানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করে আবু বকর, উমর ও আলীদের মুস্তাদআফদের অনুগত হয়ে তাদের সহায়ক শক্তি হতে বার বার তাগিদ দিয়ে যান। তাঁর কথা না মানলে, অর্থাৎ মুস্তাদআফ্‌দের ইমামত না মানলে তারা অভিশপ্ত হবে এবং ফলে ক্ষমতা পূনঃ "কামড়ানো সাম্রাজ্যবাদী কুকুরদের" হাতে চলে যাবে, তারও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ বিদায় নেন। কিন্তু রাসুল সঃ এর দু'চোখ বুজতেই "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর কালেমা উচ্চারিত হয়ে লাত, মানাত, ও উয্‌যার পুনরাগমনের পথ হয়ে যায়। যার প্রতি উরওয়া ইবন্ মাসউদ ইংগিত করার ফলে তাকে আবু বকরের অশ্লীলতম গালি শুনতে হয়েছিলো। পরে ক্বোরেশী উমাইয়া ও আব্বাসীদের খেলাফত নামের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে আবু বকর, উমর, ও আলীর বংশধর ও অনুসারী সুন্নী ও শিয়াদের সে লাতের সে যৌনাঙ্গের পূজাই করতে হয়। বিশ্বময় জাতীয়তাবাদ, ভোগবাদ, ক্ষমতালিপ্সা ও যৌন বিকারের বর্তমান বিশ্বব্যাঙ্কের ভিক্ষা, এইড ও এইডস সকল রোগ ঐ মুস্তাদআফ রাসূল সঃ এর তায়েফের ঐতিহাসিক দোয়ার বিরুদ্ধাচারণের অভিশাপ। রাসূল ও যায়দের ঐ দোয়া যেমন মে'রাজের সাত আসমানের দুয়ার খুলেছিলো, তার বিরুদ্ধাচারণ তদ্রুপ উমর হত্যা, উসমানের দুঃশাসন ও হত্যা, মা আয়শার উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ, আলীর হত্যা, মুয়াবিয়ার ক্ষমতারোহণ, ইয়াযীদের কারবালা ও মাদীনায় গণধর্ষণ ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের নরকের দুয়ার খুলেছিলো।

নারী আল্লাহ্‌র দাসী হয়ে আল্লাহ্‌র দাস স্বামীদের ঘরে তারা স্বামীদের শান্তির সংসারের আদর্শ হলে নবী রাসূল থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের ঘরেও স্বর্গ নেমে আসে। যেমনটি হযরত ইব্রাহীমের ঘরে নেমে এসেছিলো। অবাধ্য স্ত্রী হলে ঘরে নরক নেমে আসে। যেমনটি নূহ ও লুত আঃ দের ঘরে নেমে এসেছিলো। আখেরী নবী সঃ এর ঘরে আমাদের চূড়ান্ত শিক্ষার জন্য স্বর্গ ও নরক উভয়ের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ স্থাপন করেছেন। বিবি খাদিজা ও উম্মে সালমার দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি। মা উম্মে সালমা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তার শ্রেণীর স্বাক্ষর রেখেই ক্ষান্ত হয়নি। আরেকটি অমর দৃষ্টান্তও উম্মে সালমা স্থাপন করে যায়। ওসমানের মারওয়ান, মুগীরা, ওয়ালিদ, মুয়াবিয়া, ও ইবন্ সারাহ্ প্রীতি যখন মাদীনায় ফিতনার অগ্নি সংযোগ করে, সে আগুন বাইরে ছড়াতে মা আয়শা তার দু'ভগ্নীপতি তাল্‌হা, যুবাইর ও তাদের দু'সন্তান আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবাইর ও মুহাম্মাদ ইবন তালহাকে নিয়ে, আল্লাহ্‌র হুকুম, ক্বোরআনের হুকুম, রাসুলের শিক্ষা ও ইসলামী পারিবারিক জীবনের দুর্গ হিজাব বা পর্দা সব কিছু পদদলিত করে যুদ্ধের ময়দানে পা বাড়ায়। সে সময় মা আয়শাকে সমুচিত উপদেশ দেয়, এমন কেউ ছিলো না। বেপরওয়া মা আয়শা যেখানে রাসূল সঃ এর কথাই

শুনতোনা, এখন কার কথা শুনবে? তবুও দ্বীপ্ত কণ্ঠে যে সত্য সে দিন মা উম্মে সালমা বলেছে, তা শুধু মা আয়শাকে আত্মঘাতি পথ থেকে সাবধান করার সোনালী দৃষ্টান্তই নয়, বর্তমান বিশ্বের পথ হারা মুসলিম নারীদেরও পূনঃ ধরায় স্বর্গ গড়ার মূলমন্ত্র।

মা আয়শা সূরা তাহরীমে তাকে আল্লাহ্ নূহ ও লূতের স্ত্রীর সাথে তুলনা করে যে সাবধান বানী ক্বোরআনে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা উপেক্ষা করে যখন যুদ্ধে যাওয়ার পায়তারা করছিলো, তখন মা উম্মে সালমা তাকে মৌখিক নিষেধ করে মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি লিখিত পত্রও রেখে যায়। তাতে সে মা আয়শাকে বলে কোনো অবস্থাতেই ঘরের বাইরে পা না বাড়াতে। ইব্ন কোতাইবা আল-ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ প্রথম খন্ডের ৫৫ পৃষ্টায় ঐতিহাসিক পত্রটি হুবহু তুলে ধরে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে উম্মে সালমা বয়সে প্রায় মা আয়শার মায়ের বয়সী ছিলো। ক্বোরেশ ও বনী হাশিমের সম্ভ্রান্ত পিতামাতার কন্যা ছিলো মা উম্মে সালমা। স্বচ্ছ রুচিপূর্ণ শিক্ষা ছিলো তার। এ পত্রের ভাষায় তার শিক্ষা ও বক্তব্য প্রকাশের মান নির্দেশনা ও আল্লাহ্‌কে সে কতোটুকু উপস্থিত মনে করতো, তা বুঝায়। রাসূল সঃ এর স্ত্রীর মর্যাদা ও মু'মিনদের মায়ের মর্যাদার পরিমাপ তাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পত্রটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে তার প্রত্যেকটি বাক্য বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

মা আয়শার প্রতি মা উম্মে সালমার পত্র

"আম্মা বাদ, তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ ও তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছো। তোমার হিজাব তাঁর মর্যাদা রক্ষার্থে অবশ্য কর্তব্য। ক্বোরআনুল করীম তোমার আচঁল বেঁধে দিয়েছে। তুমি তা খুলবেনা। তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত করেছে। তাকে তুমি চড়িওনা। আল্লাহ্ই উম্মতের জন্য যথেষ্ট। রাসূল সঃ তোমার অবস্থান জানতেন। কোনো দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য হলে তিনি তোমাকে তা দিয়ে যেতেন। তুমি ভালো করেই জানো যে দ্বীনের স্তম্ভ নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, চাইলেও। দ্বীনের কোথাও জং লেগে গেলেও তা মেয়েদের দ্বারা ঘষা মাজা হয়না। নারীর প্রশংসার উপাদানই হলো দৃষ্টি অবনত রাখা ও আর আঁচল সামলিয়ে চলা। তুমি রাসূল সঃ কে কি জবাব দিবে যখন তুমি ঘর ছেড়ে উপত্যকায় উটের বহরে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াবে? আল্লাহ্ সদা দৃষ্টিতে তো তোমাকে দেখছেন! তুমি রাসূল সঃ এর উপর কলঙ্ক লেপন করতে বের হচ্ছো। তোমার উপর তাঁর আদিষ্ট হিজাব তুমি ছুড়ে মারছো! তার প্রদত্ত অঙ্গীকার তুমি ভাংছো। তুমি যার পেছনে ছুটতে যাচ্ছো, তা যদি কেউ আমাকে সেধেও দিয়ে বলতো যে এটা গ্রহণ করো, তা হলে তোমাকে স্বর্গ দেয়া হবে। তাহলেও আমি লজ্জিত হয়ে বলতাম যে, "আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে আমার বেহেশ্ত যেতেও লজ্জা।" তাই তোমার উপর ফরজ করা পর্দাকে তোমার দুর্গ রূপে গ্রহন করো। তারপর তোমার কাঙ্খিত লক্ষ্য চাইলে হয়তো তা পাবে। তোমার দুর্গে অবস্থান নিলেই তুমি মর্যাদা পাবে। সে মর্যাদায় আসীন হতেই আমি তোমাকে এ নসিহত করছি। তোমার ব্যাপারে রাসূল সঃ এর বলা কথাটি যদি তোমাকে বলি, তা হলে ফণিনীর মতো ফণা তুলে আমাকে দংশন করতে আসবে। ওয়াস্ সালাম।"

তার উত্তরে মা আয়শা লিখে পাঠিয়েছিল "তোমার ওয়াজ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার নসিহতে কোনো শিক্ষণীয় নেই আমার। তুমি আমার যাত্রাকে যে জন্য ভাবছো সে জন্য নয়। আমি তো শঙ্কিত হয়েছি দেখে যে দু'দল দ্বন্দ্বে নেমেছে। দেখি যদি তাদের মানাতে পারি। যদি না পারি তা হলে তার বাইরে আমি কিছু করার কথা ভাবছি না। ওয়াস্ সালাম।"

মা উম্মে সালমার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উপদেশ পেয়েও তা না শুনে মা আয়শা বের হয়ে গৃহযুদ্ধের আগুন লাগিয়ে শুধুমাত্র উটের যুদ্ধেই বিশ হাযার সন্তানের সমাধি রচনা করছে। দু'ভগ্নিপতি ও এক ভাগ্নেকেও হারিয়ে দু' বোনকে বিধবা বানিয়ে ঘরে ফিরেছে। সে গৃহযুদ্ধ তার স্বামী রাসূল সঃ এর ঘরের মান ইজ্জতকে ধুলায় মিশিয়ে তার পিতার ক্বোরেশী খেলাফতকে উমাইয়া রাজতন্ত্রের হাতে নিলাম করে দেয়। আলীর বিরুদ্ধে মা আয়শা যুদ্ধে নামায় আলী আর তার খেলাফতকে সুসংহত করতে পারেনি। ফলে তা মুয়াবিয়ার হাতে চলে যায়। এ বিবেচনায়ই আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ ক্বোরআন মূলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুস্তাদআফদের ইমামাত প্রতিষ্ঠা করে যান। মা আয়শার বাবা প্রথম বিদ্আত্, ক্বোরেশীদের এক পরিবারের খেলাফত চালু করে যায় এবং মা আয়শা তার পিতার খেলাফত ধ্বংস করে উমাইয়া রাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে মুয়াবিয়াকে তাতে বসিয়ে অভিষিক্ত করে যায়। আততায়ীর হাতে নিহত হয়ে আলী

বিদায় নিলে মুয়াবিয়া রাজা হয়ে মা আয়শার জন্য মোটা অঙ্কের ভাতা প্রদান আরম্ভ করে। আর মা আয়শা হাদীস বর্ণনা করে ক্বোরেশী তথা উমাইয়া রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে যায়।

মা উম্মে সালমা হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে রাসূল সঃ কে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে আবু বকর ও উমরদের বিরোধিতা নস্যাত করে। মা আয়শার যুদ্ধযাত্রার প্রতিবাদ করে মা আয়শাকে ঐতিহাসিক পত্র লিখে মা উম্মে সালমা সত্যিকার উম্মুল মু'মিনীনের দায়িত্ব পালন করে। আলীকে গিয়ে মা উম্মে সালমা বলেছিলো যে, আলী, আমার প্রতি যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের আরোপিত হিজাব ফরজ না হতো, তা হলে আমি অবশ্যই আয়শার অন্যায় ও ভুলের বিরূদ্ধে তোমার সমর্থনে বের হতাম। কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালনার্থে আমি তা পারলামনা। উম্মে সালমার বলিষ্ঠ সত্যে আলী বিমোহিত হয়ে বলেছিলো, “আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন। আপনার ঘরে থাকায়ই আমার ও ইসলামী উম্মার কল্যাণ ” ।

মা উম্মে সাল্মা উসমানের আমলে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আম্মার নিগৃহীত হয়ে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হলে তাদের তুলে নিয়ে শুশ্রূষা করে তাদের প্রাণে বাঁচায়। এভাবেই মা উম্মে সালমা স্বীয় ঈমানী আদর্শ, আল্লাহ্‌র দ্বীন, রাসূল (সঃ) এর বিবির মর্যাদা ও মুস্তাদআফদের মায়ের দায়িত্ব রক্ষা করে হিজরীর ৫৯ সনে কারবালায় হোসেইনের শাহাদাতের সংবাদ মাদীনায় পৌছার পর তা শুনে তারপর ইন্তেকাল করে মাদীনায় ইয়াযীদ বাহিনীর গণধর্ষণ দেখার পূর্বেই সসম্মানে বিদায় নেয়। আল্লাহ্ তাকে তার প্রাপ্য পুরস্কার দান করুন।

মা মারিয়া ক্বিবতীয়া

হুদ্াইবিয়ার বিজয়ী সন্ধির পর আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ বিভিন্ন রাজ্যে রাজাদের তাঁর রিসালাত ও তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে পত্রসহ দূত পাঠান। মিশরের রাজা মহামান্য মুক্বাওক্বিসের নিকট রাসূল সঃ পত্র দিয়ে হাতিব ইবন্ আবি বাল্তাআকে পাঠানো হয়। রাজা পত্র পড়ে উত্তরে পত্র লিখে রাসূল সঃ কে জানায় যে, সে জানতো যে আরো একজন রাসূল আসা বাকী আছে। সে মনে করেছিলো যে শেষ রাসূল হয়তো সিরিয়া থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু সে জেনে খুশী হয়েছে যে, সে শেষ নবী মূল আরব ভূখন্ডে প্রেরিত হয়েছেন। সে রাসুল এর রিসালাতকে স্বীকার করলেও তার সিংহাসন রক্ষার্থে ইসলাম গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। সে রাসূল সঃ এর পত্র মূল্যবান আইভরী কাস্কেটে রেখে সংরক্ষিত করে রাসূল সঃ এর জন্য উপঢৌকন স্বরূপ তার গোত্রের এক সম্মানী পিতামাতার দু'কন্যাকে পাঠালো। তাদের উভয়ের সেবার জন্য একজন নির্বীজ করা সেবকও সঙ্গে দিলো। তাদের পিতা ক্বিব্তী হলেও তাদের মা ছিলো খৃষ্টান। তাই তারা দু'বোনই জানতো যে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। সে জন্য দু'বোন আনন্দচিত্তে খাতামুন নাবিয়্যীন এর সান্নিধ্যে আসতে সম্মত হয়।

মুক্বাওক্বিস এক হাজার তোলা স্বর্ণ, বিশ জোড়া করে দামী পোষাক, একটি উন্নত বাহন দুলদুল ও প্রচুর পরিমাণ আগরকাঠ, কস্তুরী, আতর ও মধু দিয়ে ঐ দু' কুমারী বোনকে রাসূল সঃ এর জন্য পাঠায়। এ দু'বোনের নাম মারিয়া ও সিরীন। ইসলামে যেহেতু একত্রে দু'বোনের এক পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ নয়, তাই রাসূল সঃ নিজের জন্য মারিয়াকে রেখে সিরীনকে হাস্সান ইব্ন সাবিতকে দান করলেন। সপ্তম হিজরীতে এ দু'বোন মাদীনা আসে।

মিশরীয় সুন্দরী সতীন রাসূল সঃ এর ঘরে আসায় স্বভাব সিদ্ধ মা আয়শা ঈর্ষান্বিত বোধ করলেও তার করার কিছু ছিলোনা। এ ভাবেই মিশরী খৃষ্টানধর্মী মারিয়া উম্মুল মু'মিনীন, বা মু'মিনদের মা রূপে মর্যাদা লাভ করে। শেষ নবীর সহধর্মিনী হওয়ার ভাগ্যে সে নিজেকে ধন্য মনে করে।

আল্লাহ্‌র নিকট সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ তাঁর দাস-দাসীর প্রিয়গুন রূপে বিবেচিত। বিদেশ থেকে এসে তাঁর প্রিয় রাসূল সঃ এর প্রতি আত্মসমর্পণ এ যেনো আরেক মারইয়ামের আত্মসর্মণের পুনরাবৃত্তি! যেমনটি বিবি মারইয়াম আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলো।

আল্লাহ্ তাঁর শেষনবীর সকল সন্তান মা বিবি খাদীজার পেটেই দান করেছেন। অন্য কারো ভাগ্যে রাসুল সঃ এর সন্তান ধারণের সৌভাগ্য হয়নি। একমাত্র মা মারিয়া ক্বিবতিয়া ব্যতীত। মা মারিয়ার গর্ভ সঞ্চার হলে রাসূল সঃ খুশী হয়ে মা ও পেটের সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য মাদীনার শহুরে কোলাহলের বাইরে গাছপালায় ঘেরা এক পানির কূপ সংলগ্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে মা মারিয়ার জন্য ঘর করে দেন।

রাসূল সঃ এর সন্তান হবে নতুন করে, এ সংবাদে মাদীনা মুখরিত হলেও রাসূল সঃ এর ঘরে তার বিবিদের সবার প্রতিক্রিয়া এক হওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে জানা চরিত্র মা আয়শার। ভিতরে ভিতরে যা হওয়ার তাই-ই হচ্ছিলো। সময় পূর্ণ হলে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। রাসূল সঃ তার আদর্শ পিতা ও মাতা হযরত ইব্রাহীম ও মা হাজেরার স্মৃতি নবায়নের জন্য নবজাতকের নাম রাখলেন ইব্রাহীম। রাসূল সঃ-এর আনন্দ অনুমেয়। তাঁর আনন্দে সকল মু'মিনদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। হয়েছিলোও তাই। তাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ্র রাসূল সঃ মাটির সৃষ্ট মানুষ হলেও রিসালাতের নূরের ধোলাইতে তাঁর অন্তর নূরের মতো স্বচ্ছ। তাতে কোনো ক্লেদের কল্পনাও করা যায় না। শিশুর অন্তরের চেয়েও তাঁর অন্তর সরল ছিলো। তার প্রমাণই আমরা পাই তাঁর প্রত্যেক কাজে। মা মারিয়ার কোলে আল্লাহ্ চাঁদের টুকরা দিয়েছেন। সে সন্তান যেমন রাসূল সঃ এর, তেমনি সকল উম্মাহাতুল্ মুমিনীনেরও। শিশু ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে আনন্দে পিতা রাসূল সঃ ইব্রাহীমের আরেক মা, মা আয়শার কোলে দেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাসূল সঃ ভেবেছিলেন যে নিঃসন্তান মা আয়শা ইব্রাহীমকে কোলে পেয়ে মাতৃগর্ভে আনন্দিত ও খুশি হবে। হোকনা সে তার সতীনের পেটের! তার স্বামী রাসূল সঃ এর সন্তানতো সে!

কিন্তু হায়, স্বভাব দোষ এতো খারাপ যে, তা কোনো কাল ও পাত্র বিবেচনা করতে দেয় না। তাই হলো মা আয়শার ব্যাপারে। রাসূল সঃ ইব্রাহীমকে মা আয়শার কোলে দিয়ে বললেন, দেখোতো, আমার সাথে কি কি মিল রয়েছে? মা আয়শা সকল বিবেক ও বিবেচনার মাথা খেয়ে রাসূল সঃ এর মুখের উপর বলে ফেললো যে, আপনার সাথে এ সন্তানের কোনো মিল নেই। এ বিদেশিনীর সন্তানের মিল রয়েছে তার সাথে আসা ঐ বিদেশী সেবক দাসের! "বিদেশী বিদেশিনীর পেটে বাচ্চা দিয়েছে।" (দেখো মুস্লিম, সাবিতুল বানানী আনাস থেকে, যুহাইর ইবনুল হারব থেকে "রাসূল সঃ এর পারিবারিক পবিত্রতা" অধ্যায়ে বর্ণনা করেছে। আরো দেখো, সাইয়েদাতু বাইতিন্ নবুওয়াহ্, ডঃ আয়শা বিনত্ আশশাতী, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

মাদীনার কোনো মুনাফিক হয়তো এ অপবাদ প্রচার করে থাকবে, যেমনটি এর পূর্বে মা আয়শা সম্পর্কে প্রচার করেছিলো। কারো প্রচারিত কোনো কথার উপর ভিত্তি করে এরূপ কথা কি মা আয়শার মুখে মানায়? রাসুল সঃ বলেন দেখো আয়শা পায়ে, গায়ে ও কপালে আমার মতো দেখায় না? দেখো, তাই? তাতে মা আয়শা আরো জ্বলে মন্তব্য করে "হ্যাঁ, ঐ দুধওয়ালীর স্তন বেশী পান করায় অমন দেখায়" ইত্যাদি। কিন্তু শেষ কথায় যখন মা আয়শা ইব্রাহীমের পিতৃত্বেই অপবাদ দিয়ে ফেললো, তখন শিশুর মতো সরল রাসূল সঃ তাতে চমকে উঠেন এবং আলীকে পাঠান ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখতে। খাদেমটির নাম মাবুর। মা মারিয়ার জন্য লাক্ড়ি সরবরাহ করতো, পানি এনে দিতো এবং ফুট ফরমাস পালন করতো সে।

ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য আলী চুপি চুপি যায় পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝার জন্য। আলী গিয়ে দেখে যে মাবুর কুপে নেমে অসতর্ক অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে গায়ে ঠান্ডা পানি দিচ্ছে। আলী তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় টেনে তুলে দেখে যে বেচারা, খাসী, অর্থাৎ নির্বীজ! আলী তার তদন্ত শেষ করে এসে রাসূল সঃ কে জানায় ما وجدته إلا مجبوبا অর্থাৎ অপবাদ মিথ্যা, বেচারা মাজ্বুব, খাসী। মিশরের রাজা অমুসলিম হয়ে আল্লাহ্র নবীর রিসালাতকে স্বীকার করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূলের জন্য খৃষ্টধর্মের এক নব্য মারইয়ামকে পাঠিয়েও স্বয়ং রাসূলের ঘরের মানুষের অপবাদ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেনি! মূল বিবি মারইয়ামকে যেমন ইয়াহুদীদের একশ্রেণী ব্যভিচারিণী বলে ঈসা রুহুল্লাহকে অবৈধ বলতে তাদের মুখে বাঁধেনি, শেষ নবীর ঘরেও আরেক বিবি মারইয়াম ও তার সন্তান ইব্রাহীম অপবাদ থেকে রক্ষা পায়নি। অথচ তারীখে ইয়াকুবীর দ্বিতীয় খন্ডে ৮৭পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে অষ্টম হিজরীর জিলহজ্ব মাসে ইব্রাহীমের জন্মের পর জিব্রাঈল আঃ অহী নিয়ে এসে রাসূল সঃ কে "আস সালামু আলাইকা ইয়া আবা ইব্রাহীম" বলে সম্বোধন করেন।

রাসুল সঃ তদন্তের কথা মা আয়শাকে বললে মা আয়শা বলে "আমার কোনো সন্তান হয়নি বলে বিদেশিনীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আমি তা বলেছিলাম"। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! কিছুদিন পূর্বে মা আয়শা অপবাদের শিকার হয়ে যে বিড়ম্বনা পোহায়েছে, তারপর তারই মুখে, তারই মতো রাসূলের আরেক স্ত্রীর উপর এ অপবাদ কি করে মুখে আনলো? ক্বোরআনে এ অপবাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত ধার্য করা হয়েছে মা আয়শার ঘটনা প্রসঙ্গেই! তাই মিথ্যা ভাগাবেগে আপ্লুত হয়ে কাকেও সাত আকাশে উঠানো যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনি কাকেও মাটিতে ফেলাও অপরাধ। ইসলাম বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বকালে ও সর্বস্থানে ন্যায় বিচারের মানদন্ড। এর সীমা যেই

লঙ্ঘন করবে, সে অপরাধী। সে যেই হোক। তাই আমাদের বুঝে শুনে ভেবে চিন্তে তওবা করে পুনঃ ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। বর্তমান শিয়া, সুন্নী ও আহ্লে হাদীস্, কেউ ইসলামে নেই। বিবি মারইয়াম নিছক ঈর্ষার শিকার হয়ে অপবাদগ্রস্থ হলে অপবাদকারীদের আল্লাহ্ স্বয়ং লা'নত করে বলেন,

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

মারইয়ামের ছেলে মসীহ্ একজন রাসূল। যেমন পূর্বে রাসূলগণ এসেছিলো। তার মাতা "সিদ্দীক্বাহ"। আল্লাহ্ ক্বোরআনে একমাত্র বিবি মারইয়ামকে সিদ্দীক্বা উপাধীতে ভূষিত করেছেন। আর কোনো নারীকে নয়। "আয়শা সিদ্দিকা" মানুষের বানানো "সিদ্দীকা"। বিবি মারইয়াম আল্লাহ্র বানানো সিদ্দিকা।

আখেরী নবী সঃ এর ঘরে বিবি আসিয়া সম আল্লাহ্ আবু সুফ্য়ান ফিরআউনের মেয়ে উম্মে হাবীবার মতো আরেক বিবি মারইয়াম মা মারিয়া ক্বিব্তিয়ার রূপে এক সিদ্দীকার ব্যবস্থাও করেছেন, আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খোলার জন্য। কারণ খাতামুন নাবিয়্যীন এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাই চূড়ান্ত সর্বশেষ আদর্শ তাঁর ঘর ও পরিবার থেকেই নিতে হবে। যারা আসিয়া ও মারইয়ামের দৃষ্টান্ত, তাদের সে ভাবে মূল্যায়ন করে তাদের গ্রহণ করতে হবে। যারা নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্তরূপে আল্লাহ্ কর্তৃক ক্বোরআনে ঘোষিত হয়েছে, তাদের হুবহু তাই মনে করে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ্র এ নির্দেশ পরিত্যাগ করার ফলে মুসলিম উম্মার ঘর ও সমাজ থেকে আসিয়া ও মারইয়ামদের আল্লাহ্ উঠিয়ে নিয়েছেন। তার পরিবর্তে প্রত্যেক ঘরে ঘরে নূহ ও লুতের স্ত্রীতে ভরে গিয়েছে। এখন আমাদের ঘর সমূহকে নূহ ও লুতের স্ত্রীদের থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে।

যোগ বিয়োগের অঙ্কের সূত্রের মতো এ মূহুর্ত থেকে বুঝতে হবে ও তা পালন করতে হবে যে প্রত্যেক মুমিন নর ও নারীর নিকট শ্রেষ্ঠতম নারী হলো ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও তারপর দ্বিতীয় স্থানে বিবি মারইয়াম! নিকৃষ্টতম হলো নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয়। কারণ, ফেরআউনের মতো পাপের সম্রাটের সকল বাধা, ভয়, ভীতি ও অত্যাচার উপেক্ষা করে মহারানীর পদ ও ভোগবিলাস সব ত্যাগ করে বিবি আসিয়া তার অদেখা প্রভূ আল্লাহ্কে দেখে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। সকল অত্যাচারে যখন তাকে ঈমান থেকে ফেরাতে ফেরআউন ব্যর্থ হয়েছে, তখন প্রাসাদের উপর থেকে বিরাট প্রস্তর নিক্ষেপ করে প্রসাদের দহলিজে জনতার সামনে তাকে গুড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। সে অবস্থায় আল্লাহ্ তাকে সরাসরি পার্থিব জীবন থেকে ক্বেয়ামতের পূর্বেই বেহেশতে স্থানান্তরিত করেছেন বলে ক্বোরআনের আয়াতের দৃষ্টে রাসূলের বাণীতে দেখা যায়। কারণ বিবি আসিয়া মন্দের প্রাসাদে উত্তমের দৃষ্টান্ত! তাই তার এ পুরস্কার। বিবি মারইয়াম ভালোর ঘরে ভালোর আলোক বর্তিকা। তাই বোধগম্য ভাবেই তার স্থান দ্বিতীয়। হযরত নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয় উত্তমের ঘরে নিকৃষ্টের অমানিশা। তারা তাদের দু'মহান স্বামীকে তাদের রিসালাতের কাজে বাধা দিয়ে সমাজকে নষ্ট করেছে এবং জাতির জন্য আল্লাহ্র গযব ডেকে এনেছে। তাই তারা ক্বেয়ামতের পূর্বেই সরাসরি পৃথিবী থেকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

এ দৃষ্টান্ত মেনে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের অভিশপ্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুন্নী ও শিয়ারা মুসলিম উম্মাহর ঘরে যে নরকাগ্নি জ্বালিয়েছে, তা এ মূহুর্তে নির্বাপনের পদক্ষেপ নিয়ে নতুন ও চুড়ান্ত বিশ্ব মানবমুক্তির আযান দিতে হবে। সুন্নীরা আল্লাহ্ ও ক্বোরআন অবিশ্বাস করে মা আয়শাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। শিয়ারাও আল্লাহ্ ও ক্বোরআনের ঘোষণা প্রত্যাখান করে বিবি ফাতিমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। উভয়ই বিভ্রান্ত বিপথগামী।

বিশ্বময় স্বেচ্ছাচারী নারী পুরুষের বিচরণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দন্ডায়মান মানব জাতিকে ফেরত যাত্রায় আহবান করতে আর একটি দিনও নষ্ট না করে আমাদের মা বোন ও স্ত্রী কন্যাকে ফেরআউনের স্ত্রী ও হযরত ঈসা আঃ এর মাতার আদর্শে, বিবি হাজেরা, বিবি খাদিজা, বিবি উম্মে হাবীবা, বিবি উম্মে সালমা ও বিবি মারিয়া ক্বিব্তিয়ার রূপ ধারণ করতে বলবো। তা হলেই পুনঃ ঘরে ঘরে ইব্রাহীমের মতো শিশু জন্মাবে। যেমনটি মা মারিয়ার পেটে জন্মেছিলো। আল্লাহ্ যে ইব্রাহীমকে কেনো জীবিত রাখেন নি, তা তার পিতা রাসূল সঃ ও তার মায়ের সাথে রাসূলের জীবদ্দশায় মা আয়শা ও মা হাফসার ব্যবহারেই বুঝতে পারি। এরপরও যারা বুঝবেনা, বা না বুঝার ভান করে, সে সমস্ত ব্যক্তিদের আমরা তাদের আদর্শ মা নূহ ও লূতের স্ত্রীদের কোলে পাঠানোর জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'হাত তুলে ও সিজদায় পড়ে দোয়া করছি। আমিন।

মা মারিয়া ক্বিবতিয়া তাঁর স্বামী রাসূল সঃকে ইব্রাহীমের মতো সন্তান দিয়ে প্রায় দু' বছর যাবত পুত্রসুখে তৃপ্তি দিয়ে তারপর তাকে পুনঃ আল্লাহ্র হাতে সপর্দ করে পরবর্তী ক্বোরেশী মুস্তাকবির খলিফা ও উমাইয়া সাম্রাজ্যের মুয়াবিয়া ও

ইয়াজিদের বর্বরতা থেকে রক্ষা করে যান। তা না হলে তার ভাগ্যে কি ঘটতে পারতো, তা আমরা মুস্তাদআফ্ আম্মার, ইব্ন্ মাসউদ ও উসামাহ্ এবং হোসেইনের সাথে কি ঘটেছে, তাতেই অনুমান করতে পারি। মা মারিয়া ক্বিবতিয়া তার ছেলের মৃত্যুর পরবর্তী বছরই অর্থাৎ দশম হিজরীতে স্বামীর বিদায় যাত্রা দেখে, তারপর মাত্র পাঁচ বছর বেঁচে থেকে পরবর্তী খলিফাদের কান্ড দেখে, সম্পর্ণ একাকী জীবন কাটায়। তার বোন সিরীন ব্যতীত কারো সাথে সাক্ষাত করতো না। ঘরের বাইরও হতোনা। শুধু মাত্র কখনো কখনো রাসূল সঃ এর কবর যিয়ারতে মসজিদে নববীতে আসতো, বা জান্নাতুল বাক্বীতে ছেলে ইব্রাহীমের কবর দেখতে যেতো। ষোলো হিজরীতে মা মারিয়া ইন্তেকাল করে। উমর ইবন্ আল খাত্তাব তার জানাযা পড়ে। তাকে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয়। রাসূল সঃ ওসিয়ত করে যান, "তোমরা ক্বিবতীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের সাথে আমার দায়িত্বপূর্ণ আত্মীয়তার বাঁধন হয়েছে।" (মুসলিম)

মা আয়শা

সকল কথার কথা হলো মা আয়শা আদৌ সঠিক অর্থে রাসূল সঃ এর স্ত্রী ছিলোনা। কি করে একটি ছ'সাত বছরের খুকী পঞ্চান্ন বছরের রাসূল সঃ এর স্ত্রী হয়? প্রকৃত অর্থে মা আয়শা রাসূল সঃ এর জীবনে একটি পুতুল স্বরূপ ছিলো। আবু বকরের বিবাহযোগ্যা কোনো মেয়ে ছিলোনা যাকে আবু বকর রাসূল সঃ এর সাথে বিয়ে দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কে রাসূল সঃ এর নৈকট্য অর্জন করে। অথচ আবু বকরের মনে প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্খা ছিলো রাসূলের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়বে। তখনকার দিনে, বিশেষ করে আরবদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কে ব্যক্তি ও গোত্রের সাথে সম্পর্ক গড়ার বহুল প্রচলন ছিলো। সেরূপ সম্পর্কে আবু বকর, তালহা ও যুবায়রকে জামাতা বানিয়ে পূর্বেই তার মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছে।

এর বাইরে রাসূল সঃ এর আয়শার সাথে বিয়ে সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা ও কাহিনী প্রচলিত ও প্রচারিত আছে, তা সবই স্বার্থপর শ্রেণীর বানানো কল্পিত কাহিনী ও কিসসা। তার পেছনে কোনো দ্বীন ও ঈমানের সম্পর্ক ছিলো না। বর্ণনাকারী লোকগুলোও কোনো দ্বীন ও ঈমানদার ছিলো না। তাদের ধর্মই ছিলো পিরিস্থিতি ঘোলাটে করে তাতে তাদের স্বার্থের মাছ শিকার করা। কারণ ইস্‌লামী চিন্তা চেতনার গভীরে ঢোকার তাদের কোনো যোগ্যতা ছিলো না। তাই কল্প কাহিনী রচনা করে তা স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে সে গুলোকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দাজ্জালীর ধুম্রজাল ছড়িয়েছে তারা মা আয়শা ও রাসূল সঃ কে নিয়ে। এ সমস্ত গাল্পিক ও কাল্পিকরাই পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসে মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ঐতিহাসিক বলে পরিচিত। মূলে আল্লাহ্ ও রাসূল সঃ ও তাঁদের দ্বীন এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খাঁটি ঈমান এনে ক্বোরআনে প্রবেশ করে তার দ্বারা আল্লাহ্ ও রাসূলদের চিনে দৃষ্টি দেয়া মাত্রই ঈমানদারের এক্সরে ও আলট্রা সাউন্ড দৃষ্টিতে পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ঘটনা ও ঘটিতব্য সব কিছুর সত্য মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। ক্বোরআন সে টেকনোলজীর বই। তাওহীদ তার চাবি। রাসূল সঃ এর প্রকৃত অনুসারীরা তাই বলেছে تعلمنا الايمان قبل أن تعلمنا القرآن "আমরা ক্বোরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমানের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।" তা ছাড়া আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের মুখে মানুষের শিক্ষার জন্য বলেছেন, "ক্বোরআনের দু'টি মাথা আছে। এক মাথা আমার হাতে রেখে দ্বিতীয় মাথা আমি পৃথিবীতে ঝুলিয়ে দিয়েছি। যারা তাকে ধারণ করবে, আমি তাদের আমার কাছে তুলে নিবো।" এ ধরণের বর্ণনাকেই হাদীসে কুদ্‌সী বলা হয়।

রাসূলরা আপাদমস্তক রাসূল। রাসূলদের স্ত্রী পরিজন ও ছেলে মেয়েরা তাঁদের রিসালাত ও নবুওতের সম্পূরক নয়। স্ত্রী পরিজনরা কোন্ জাত ও ধাতের, তা ধরা পড়ে নবীদের প্রতি তাদের আনুগত্যের দ্বারা। তারা অনুগত হলে যেমন রিসালাতের সত্যতা বাড়েনা, তেমনি তারা অবাধ্য হলেও রিসালাতের সত্যতা কমেনা। এ বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে মা আয়শা ও হাফসার ব্যাপারটি পড়লে চিন্তার ক্ষেত্রে সকল জট খুলে যাবে। ধারণা স্বচ্ছ না হলে আরো জট বাঁধবে। স্বচ্ছ চিন্তার যোগ্য মানুষদের চিন্তাকে আরো স্বচ্ছ করার জন্য এ প্রতিবেদন। অস্বচ্ছ মনের লোকদের হেদায়েতের দায়িত্ব যেখানে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের দেননি, সেখানে আমি কে তাদের মনের জঞ্জাল ঝাড়ু দেয়ার?

পুতুল যতো দামী হোক, যত প্রিয়ই হোক না কেনো, তা দিয়ে ঘর সংসার করা যায় না। তার বয়স বাড়লেও বড়ো হয়না। তার বাচ্চা হয় না। সে কাকেও সাহায্য করে না, করতে পারে না। সে শুধু অলস সময় কাটাতে সঙ্গ দেয়। তাকে ধুমধাম করে বর-কনে সাজিয়ে বিয়ে দেয়া যায়। বহু অর্থ ব্যয়ে বিয়ে ও বৌভাতের আয়োজন করা যায়। কিন্তু ফল, পন্ডশ্রম। তাই ইসলামে পুতুল প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে শিশুদের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা দেয়ার জন্য বুদ্ধিমান বড়োরা কখনো বাচ্চাদের পুতুল কিনে দেয়। কখনো বড়োরা পুতুল খেলায় বাচ্চাদের সঙ্গ দেয়। তার ফাঁকে কিন্তু তারা তাদের শিশুদের প্রতিভা প্রজ্ঞার পরীক্ষা নেয়!

আমরা দেখি মা আয়শা পুতুলের বয়সে পুতুল নিয়ে রাসূল সঃ এর ঘরে প্রবেশ করেছে। কখনো কখনো রাসূল সঃ স্বয়ং তাকে পুতুল খেলায় সহযোগিতা করেছেন বলে দেখা যায়। কিন্তু মা আয়শার পুতুল খেলার বয়স উত্তরণের প্রমাণ মিলেনা। বরং অবাক ও নির্বাক পুতুল খেলা তাকে সবাক ও নিরর্থক জেদী পুতুলে রূপান্তরিত করেছে বলেই পরবর্তীতে দেখা যায়।

এ ভাবে মা আয়শার জীবন ও চরিত্রকে নিলে ব্যাপারটি সহজ ও মা আয়শার কার্যাবলীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা যায়। সিরিয়াসলী নিলেই মা আয়শা ও ইসলামী উম্মাহ ধংসের মুখোমুখি হয়ে যায়। তাই আমি এ অধ্যায়টি পুতুল খেলার পর্যায়ে ফেলে দিতে চাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাসও তাই। কিন্তু আমি চাইলে কি ব্যাপারটি অতো সহজে সমাধান হয়ে যাবে? আমি যে পুতুল প্রতিমা ভাঙ্গা নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের উত্তরাধিকারী, “লাইলাহা ইল্লাল্লাহর কুড়ালধারী”! পুতুল প্রতিমার ব্যবসায়ী আযর, আবু লাহাব ও আবু সুফয়ানদের প্রজন্ম প্রেতাত্মারা তো তা মানবে না!

হে মানুষ ভাই,! এসোনা আমরা এক মুহূর্ত সত্য কথা বলি! বলো তো, যারা পুতুল প্রতিমার পূজারী বলে দাবী করে, তারা কি আসলে পুতুল প্রতিমাকে তাদের বিধাতা ও নিয়ামক মানে? যারা বিধাতাকে নিজ হাতে গড়ে ও ভাঙ্গে, আবার স্বার্থ ও অর্থ পেলে বিক্রি করে, তারা কি ওদের প্রভূ বলে মানে? মানলে কি করে প্রভুকে ভাঙ্গে ও বিক্রি করে? ওরা কি মিথ্যুক না? ওরাই তো ঐ পুতুল প্রতিমার স্রষ্টা, বিধাতা ও ভাগ্যের নিয়ন্তা? তা না হলে নিজ হাতে ওদের ভাঙ্গে গড়ে কি করে? ওরা কি মিথ্যুক, মিথ্যার পেশাদার ও মিথ্যার বেসাতী নয়?! লাত, মানাত, উয্যা ও হোবল প্রতিমার পেশাদার আবু সুফ্য়ান, মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের প্রজন্মপূজারীরা কখনো আবু বকর ও তার কন্যা মা আয়শার শুভাকাঙ্খি ছিলো না। তা হতে পারে না। তারা মা আয়শার মতো পুতুলখেলা, পুতুল স্বভাবী একটি মানুষকে পুঁজি করে পুতুল প্রতিমা ভাঙ্গা ইসলামের ঘরে পুনঃ ক্বোরেশী মূর্তির অনুপ্রবেশ ঘাটানোর নারকীয় চক্রান্তে নেমেছিলো মাত্র। বরং মা আয়শার স্বামী বিশ্বনবীর বিশ্ব বিজয়ের ঘোড়া চুরি করে ওরা তাতে চড়ে রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য, বাইজেন্টাইন ও ভারত জয় করে ঐ সমস্ত দেশের পুতুল প্রতিমা দিয়ে ইসলামের কাবাকে পূর্বের চেয়ে বেশী অসংখ্য অগণিত ও অদৃশ্য মূর্তি দিয়ে অপবিত্র করেছে। পূর্বে ওদের মূর্তিগুলো দেখা যেতো কাঠ পাথরের অবয়বে। পরে এগুলো স্থাপিত হয়েছে “আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ, বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস, বনু হাশেম, সুন্নী ও শিয়া” প্রভৃতি নামে। ওরা মা আয়শার দুনইয়া ও আখেরাতের শত্রু। তাদের স্বার্থে তারা মা আয়শার জেদী পুতুলের স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে তার সামনেই তার ভাইকে জীবন্ত গাধার পেটে হাত পা বেঁধে পুড়ে জ্বালিয়ে মেরেছে। যে মা আয়শা দরাজ মুখে উসমান ও আলীকে যা ইচ্ছা তাই বলতে পেরেছে, মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে টুশব্দটিও করতে পারিনি। কারণ সামনে ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন্ আবু বকরের পরিণাম দৃশ্যমান ছিলো। মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর মুর্তাদ হয়ে ঐ শাস্তি পায়নি। উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে সে বাধা দিয়েছিলো বলে তাই তার এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এরপরও কি আম্মাজান মুয়াবিয়া আরবী সিজার বা ক্বায়সারুর রুমের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে?

ছ'সাত বছরের পুতুল বিয়েতে মা আয়শা রাসূল সঃ এর ঘরে যায়। পিতা মুসলমান হলেও জন্মের সময় মা কাফের ও মুশরিকই ছিলো। দাদা শুধু কাফেরই ছিলো না, কট্টর রাসূল সঃ বিরোধী ছিলো। রাসূল সঃ কে অকথ্য ভাষায় গালি দিতো। ফলে মা আয়শা পিত্রালয়ে কোনো ইসলামী তারবিয়াত পায়নি। হিজরতের পর মাদীনা আসলে তার দু' বছর পর পুতুল খেলার বয়সে রাসূল সঃ এর সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর আরো তিনবছর পিত্রালয়ে সমবয়সী মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করে কাটায়। তার পর ন'দশ বছর বয়সে স্বামী রাসূল সঃ এর ঘরে চলে আসে। আর রাসূল সঃ এর ব্যস্ত জীবনে মা আয়শাকে বিশেষ তারবিয়াত দেয়ার সময়ও হয়নি। তাই অনায়াসে বলা যায় যে মা আয়শা পিত্রালয়েও স্বাভাবিক ভাবে ঘর সংসার করার মতো শিক্ষা পায়নি। কারণ, তার জন্য অন্তত পক্ষে তেরো চৌদ্দ বছর

সময় লাগে একটি মেয়েকে বৌ এর দায়িত্ব বুঝে গড়ে উঠতে। তদ্রুপ মা আয়শা স্বামীর বাড়ী গিয়েও দেখে সেখানে তাকে সংসারী ও স্বামীসেবী বৌরূপে গড়ে তোলার মতো কোনো শ্বাশুড়ি বা অন্য কেউ নেই। প্রথমে গিয়ে পেয়েছে মায়ের বয়সের চেয়েও বয়সী সতীন মা সাওদাকে। স্বামীকেও পেয়েছে পিতার বয়সের চেয়ে তিন বছরের বড়ো। তাই মা আয়শার কোনো সুস্থ গড়ন হয়ে উঠেছিলো না। সে জন্য মানসিক দিক দিয়ে তার কোনো ভারসাম্যতা আমরা দেখতে পাইনা। তার কাছে তা আশাও করা যায় না। তাই মা আয়শার আচার আচরণ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলো। রাসূল সঃ এর অতিস্নেহে তা আরো অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

আমরা দেখতে পাই যে, মা আয়শা গায্ওয়ায়ে বনী মুস্তালিকে যায় রাসূল সঃ এর সাথে। যুদ্ধে যাওয়া আর বনভোজনে বা বেড়াতে যাওয়া এক নয়। বেড়াতে গেলে মানুষ অলংঙ্কার পরে সেজে গুজে যায়। কেউ কেউ পাড়া প্রতিবেশী থেকে ধার করেও অলঙ্কার পরে যায়। মা আয়শা তা না বুঝে যুদ্ধ যাত্রায় প্রতিবেশীর অলঙ্কার ধার করে নিয়ে যায়। তার পর দায়িত্বহীন ভাবে তা হারিয়ে অঘটন ঘটায়। ফলে রাসূল সঃ এর শত্রুরা অপবাদ রটানোর সুযোগ পায়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের পক্ষে অহী নাযিল করে মা আয়শাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করেন।

রাসূল সঃ এর ঘর ফুলশয্যার ঘর নয়। ত্যাগ তিতিক্ষা ও কৃচ্ছতার ঘর। তাঁর ঘরে নারীজাতির দ্বীন শিক্ষার জন্য বিধবা ও হিজরতকারিণী বয়স্কা স্ত্রীদের আশ্রম তৈরী হয় বলা চলে। সেখানে মা আয়শা সতীনদের মাঝে সর্ব কনিষ্ঠা। এ অবস্থায় মা আয়শার মধ্যে সতীনী ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তার প্রধান কারণ হলো যে, সে একমাত্র রাসূলের কুমারী স্ত্রী। তার বশবর্তী হয়ে মা বিবি খাদীজা সম্পর্কে কটুক্তি করে রাসূল সঃ এর শক্ত ধমক ও তিরস্কারও শুনেছে।

রাসূল সঃ এর ঘরে কোনো আগন্তুক আসলেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু করা মা আয়শার স্বভাবের রূপ নেয়। রাসূল সঃ এর ঘরে যারা নবাগত, তারা তাঁর ঘরে ইসলামী সহঅবস্থানের শিক্ষা পাবে, পাবে রাসূল স্বামীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় তার আদর্শ দিক নির্দেশনা। মা আয়শা আরম্ভ করে সম্পূর্ণ তার উল্টা। যারা রাসূলের ঘরে এসেছে, তাদের অধিকাংশই কুফর ও শির্কের অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে এসেছে। কিন্তু রাসূল সঃ এর ঘরে মা আয়শার অবস্থান ছিলো সরিষার ভুতের মতো। এখানে তার একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। আসমা বিন্ত আন্ নো'মান রাসূল সঃ এর ঘরে নতুন স্ত্রী রূপে আসে। তার অভিভাবকরা আবু বকরের মতোই সখ করে মেয়ে বিয়ে দিয়ে রাসূল সঃ এর নৈকট্য চেয়েছিলো। রাসূল সঃ মা আয়শাকে বাসর ঘরের ইসলামী আদব সম্পর্কে নবাগতাকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব দেন। মা আয়শা সম্পূর্ণ রূপে উল্টো কাজটি করে। আসমাকে মা আয়শা বলে, রাসূল সঃ প্রথম স্পর্শ করলে বলবে "আউযু বিল্লাহি মিনকা" অর্থাৎ "আমি আপনা হতে আল্লাহ্র পানাহ চাই।" রাসূল সঃ আসলে বেচারী সত্যি সত্যি মা আয়শার শিখানো কথাই বললো। রাসূল সঃ দেখলেন যে, যে নারী আল্লাহ্র রাসূল থেকে পানাহ চায়, সে তো কোনো মতেই রাসূলের স্ত্রী হতে পারে না! তাই রাসূল তাকে তার পিত্রালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অভিভাবকরা কারণ জানতে চাইলে রাসূল সঃ যা ঘটনা, তাই বলেন। তারা আসমাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় যে, মা আয়শা তাকে তা বলতে শিক্ষা দিয়েছে। রাসূল সঃ মা আয়শার ঘটনা জেনে বলেন,"অবশ্যই এরা হযরত ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী জুলেখাদের শ্রেণী ভূক্ত। এদের চক্রান্ত জঘন্য"। إنهن صواحب يوسف، إن كيدهن عظيم (দেখো, সাইয়েদাতুন বাইতিন্ নবুওয়াহ্-২৭৮, ২৭৯ পৃষ্ঠা; উয়ূনুল আসর, ২য় খন্ড, ৩১০পৃষ্ঠা, তাবারী ২য় খন্ড ১৩২ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় অমার্জনীয় ঘটনাটি মা আয়শা ঘটায় মা মারিয়া ক্বিবতিয়াকে নিয়ে। মা হাফসা একদিন পিত্রালয়ে গেলে মা মারিয়া রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে আসলে রাসূল সঃ হাফসার ঘরে তার সাথে মিলিত হন। সে মুহূর্তে মা হাফসা এসে তা টের পেয়ে মা আয়শার কাছে তা বললে মা আয়শা হাফসার সাথে মিলে রাসূল সঃ এর গোপনীয়তা প্রকাশের ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়। রাসূল সঃ তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তা থেকে নিবৃত তারা হয়নি। তখনই রাসূল সঃ এর অভিভাবক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সূরা তাহ্রীম নাযিল করে তার সাথে তাদের পূর্বাপরের আচরণ তুলে ধরে তাদের দুজনকে নূহ ও লুতেরস্ত্রীদের শ্রেণী ভূক্ত ঘোষণা করেন। সে যাত্রা তওবা তিল্লা করে তারা তালাক্ব ঠেকায়। (দেখো সূরা তাহ্রীম)।

এরপরও কিন্তু মা আয়শা তার স্বভাব বদলায়নি। ইব্রাহিম জন্মানোর পর মা মারিয়ার উপর ব্যভিচারের জঘন্য অপবাদ দেয়া তার পরের ঘটনা। অথচ মা আয়শার বিরুদ্ধে অপবাদের বিষয়ই অপবাদকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের

বিধান নাযিল হয়। আখেরী নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের সাক্ষাৎ পেয়ে, তাঁর স্ত্রী হয়ে, তাঁর প্রতি অহী নাযিল হতে দেখেও যারা আল্লাহ্ কর্তক নূহ ও লূত আঃদের স্ত্রীদের পদবী পায়, তাদের চেয়ে হতভাগা, কপালপোড়া কে হতে পারে? পৃথিবীর সকল নারীর এ পরিণাম থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাওয়া কর্তব্য। বিশ্বে নারী জাতির উপর শয়তানের কর্তৃত্বের কারণ, নূহ ও লূতের স্ত্রীদের অধঃপতিত চারিত্রিক হঠকারিতা।

এভাবে জীবন কাটিয়ে আঠারো বছর বয়সে মা আয়শার উপর বৈধব্যের ছায়া নেমে আসে। রাসূল সঃ অসুস্থ হয়ে প্রচন্ড মাথা ব্যথা নিয়ে ঘরে ফিরেন। ঘরে ফিরে মা আয়শাকে বলেন, "আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে ব্যথায়। তুমি একটু মাথা টিপে দাও এবং মাথায় পানি ঢেলে দাও।" আঠারো বছরের আম্মাজানের উত্তর হলো, "আপনার মাথা ব্যাথা এখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, আর আমার মাথা ব্যথা সে সকাল থেকে।" "ওয়া রা'সাহ্"। হায় আমার মাথা ব্যথা! وار أساه

আম্মাজানের উত্তর শুনে রাসূল সঃ বললেন, তোমার মাথা ব্যথা আমার পূর্বে আরম্ভ হয়ে থাকলে তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যু বরণ করো, আর আমি নিজ হাতে তোমার দাফন কাফন করলে কি ভালো হয় না? এর উত্তর তো শুভবুদ্ধি সম্পন্না হলে বলতো যে "তা হলে তো আমার সৌভাগ্য, আল্লাহ্‌র রাসূলের জানাযা পেয়ে ধন্য হয়ে যাবো। আল্লাহ্ তাই নসীব করুন।" কিন্তু উত্তর আসলো, "আপনি তো তাই কামনা করেন, তা হলে আমি সকালে মরলে বিকালে আপনি আরেকটি বিয়ে করে আমার ঘরে নতুন বাসর সাজাতে পারেন।"

এমনতরো উত্তর কেনো আসবে? মা আয়শার মতো নারীর তখনো অভাব ছিলো না, এখনো নেই এবং ভবিষ্যতে কখনো হওয়ার কথা নয়। বরং বলা চলে যে প্রায় গোটা বিশ্বই এ শ্রেণীর উগ্রস্বভাবের মেয়েদের বিচরণে নরকপুরী। তাই বিশ্বে আজ ঘর ভাঙ্গা নারীর হাট। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর মতো তো দ্বিতীয় মানুষটি মানব বিশ্বে ছিলোনা এবং হবেও না! ঠাট্টা মশকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ পরিস্থিতিতে হতে পারে। কিন্তু সে রাসূলের সাথে কখনো হতে পারে না যার সম্পর্কে মা আয়শার বাবাদেরও আল্লাহ্ নিষেধ করে দিয়েছেন, তারা যেনো নিজেদের মধ্যে যে ভাবে বেপরওয়া কথা বলে, রাসূল সঃ এর সাথে তা যেনো কখনো না করে। তা হলে তাদের ঈমান ও আমল বিনা নোটিশে মুছে যাবে। (দেখো সূরা হুজুরাত, আয়াত-২)

আল্লাহ্ যেমন রাহমানুর রাহীম, তেমন শাদীদুল ইক্বাবও। বদ্‌তমীযীর জন্য কঠোর শাস্তিদাতাও। রাসূল সঃ পূর্বে চলে গেলেন। মা আয়শা পেছনে পড়ে রইলো। তার মৃত্যুর সময় মারওয়ান মাদীনার গভর্নর। অর্থাৎ মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব। এ মারওয়ান ও তার পিতা হাকাম রাসূল সঃ কর্তৃক চির বিতাড়িত অভিশপ্ত টিকটিকি। وزغنة لا يساكنا بعد، ملعون
(দেখো সকল ইতিহাস) সে মারওয়ান রাসূল সঃ এর মিম্বার দখল করেছে ওসমানের ক্রিয়ায়। সে মাদীনার ইমাম, আর আবু হোরায়রা তার মুয়াযযিন। মতান্তরে মারওয়ান অথবা তার মুয়াযযিন আবু হোরায়রা মা আয়শার জানাযা পড়ে। যেমন বর্তমানে ইমাম না থাকলে বা ইমাম গুরুত্ব না দিলে মুয়ায্‌যিন দিয়ে কাজ চালানো হয়।

রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তার বাবা ক্বোরেশী বংশীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করলে কন্যা মা আয়শা মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও মুফতী হয়ে যায়। ইসলামে রাসূল সঃ এর স্ত্রীরা যে যাই হোক, তারা সবাই নির্বিশেষে মুমেনদের মাতৃতুল্য। তবে সম্পূর্ন মা নয়। মাকে যেমন সন্তানরা বিয়ে করতে পারেনা, তদ্রুপ মু'মিনরা নবীর স্ত্রীদের বিয়ে করতে পারবেনা। তবে তাদের সাথে দেখা সক্ষাৎ হারাম। নবীর স্ত্রীরা মু'মিনদের সাথে দেখা দিতে পারেনা। তাদের সাথে খোলামেলা কথাও বলতে পারবেনা। নিতান্ত প্রয়াজন হলে পর্দার ভেতর থেকে কর্কশ ও নিরস ভাষায় কথা বলতে পারবে। তার বেশী নয়।

তাই হাজার হাজার হাদীস বর্ণনা করা, মাসলা মাসায়েল বর্ণনা করা এবং পুরুষদের মাদ্রাসা মজলিস করার কোনো অনুমতি ছিলোনা রাসূল সঃ এর স্ত্রীদের। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র কড়া হুকুম "ঘরে স্থির থেকে যিকির আয্‌কার ও তেলাওয়াত করবে। বাইরে ঘোরা ফেরা করতে পারবে না।" পরে মা আয়শা যে মুহাদ্দিসী করেছে, তা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ ও রাসূলের শিক্ষা ও নির্দেশের বিরুদ্ধে করেছে।

ক্বোরআন সম্পর্কে আবু বকর ও উমরের যেমন কোনো পারদর্শিতা ছিলো না, মা আয়শারও ক্বোরআন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ছিলো বলে কোনো প্রমাণ তার বর্ণিত হাদীসের বহরেও পাওয়া যায় না। তা যে সত্যি তার প্রমাণ মা আয়শা নিজেই। সত্যিকারে যদি ক্বোরআন সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতো, তা হলে কখনো ক্বোরআন অমান্য

করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে হাজার হাজার লোকের মধ্যে চিল্লাচিল্লী করতো না। সাত দিনের যুদ্ধে যেখানে বিশ হাজার মানুষ খুন হয়েছে, সেখানে যোদ্ধাদের প্রথম সারিতে অবস্থান নিয়ে মা আয়শা চুপ করে নীরবে তামাশা দেখেছে? ঐ যুদ্ধইতো ইসলামী উম্মাহর কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে!

পিতার মৃত্যুর সময় মা আয়শা শিয়রে। আবু বকরের জান যায় যায় অবস্থা। তখন মা আয়শা মাথার কাছে বসে পিতার মৃত্যু যন্ত্রনা দেখে কবিতা আবৃতি করছে। ক্বোরআন যার অন্তরের ফোয়ারা হওয়ার কথা, সেখানে সে পিতার শিয়রে বসে হাতেমের কবিতা পাঠ করেছে, তাতে ক্বোরআন তার জীবনে কোন্ অবস্থানে ছিলো, তা যে কোনো মানুষের বোধগম্য। পিতার জান বের হয়ে যাওয়ার পরও ইন্নালিল্লাহ পড়েছে বলে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (দেখো আবু বকর সিদ্দীক মূলঃ মুহাম্মাদ হোসেইন হায়কল-পৃষ্ঠা ৪২৯, আধুনিক প্রকাশনী)।

পিতার মৃত্যুর পর উমর ও উসমানের আমলে মা আয়শার জীবন স্বাচ্ছন্দেই কাটে। বেতন ভাতা ও মান সম্মান সবই ছিলো। কিন্তু ওসমানের আমলে রাসূল সঃ এর অভিশপ্ত বিতাড়িত মারওয়ান, তার পিতা হাকাম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্ আবি সারাহ্ ও ওয়ালীদ ইব্‌ন্ উক্বাদের ক্ষমতায় বসানোর সর্বনাশা কাজের মা আয়শা কোনো প্রতিবাদ করেছে, এমন কোনো প্রমাণ কোথাও নেই। এতো বাগ্মী, ইসলামী জ্ঞানের অর্ধেকের ভান্ডার ও রাসূল সঃ এর কথিত সবচেয়ে প্রিয়া স্ত্রী তার খাতামুন নাবিয়্যীন স্বামীর রিসালাতের শিক্ষা পদদলিত হচ্ছে দেখে কি করে চুপ করে তামাশা দেখেছে? কেউ বলবে যে, মা আয়শা দূর্বল নারী ছিলো। তার করণীয় কিইবা ছিলো? তা হলে আলীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে কি করে অবতীর্ণ হয়েছিলো? অন্যায়ের সময় চুপ এবং ন্যায়ের সময় স্বোচ্ছার, তাতো হয় না?! তার কারণও স্পষ্ট। ওসমান ইসলামের নামে রাজ্য জয়ের লুণ্ঠিত ধনে উপচে পড়া বাইতুল মাল যেমন মারওয়ান, মুয়াবিয়া ও অন্যান্য উমাইয়া দুর্বৃত্তদের জন্য খুলে দিয়েছিলো, তার হিস্যা তালহা ও যুবাইররা অঢেল পেয়েছে। তাই তালহা যুবায়রদের নিহত হওয়ার পরও ওদের স্ত্রীরা ও অসংখ্য ছেলে মেয়েরা পিতাদের পরিত্যাক্ত ধনের হিস্যা মিলিয়ন মিলিয়ন করে পেয়েছে।

আলী ক্বোরেশী বনু হাশিমের পারিবারিক ইমামতের দাবিদার মুস্তাকবির হলেও রাসূল সঃ এর সান্নিধ্য পেয়ে অন্যান্য ক্বোরেশীদের চেয়ে অনেক বেশী রাসূল সঃ এর আদর্শের কাছাকাছি ছিলো। মারওয়ান ও মুয়াবিয়াদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হস্তান্তর হতে যাচ্ছে দেখে আলী নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে বাইতূল মালের মোটা অংকের ভাতা খায় নি। আবু যারের নির্বাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছে আলী। তাই এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিলো যে আলী ক্ষমতায় বসলে সবার পেটের বেল্ট টাইট করবে। যে ক'দিন আলী ক্ষমতায় ছিলো নিজেকে শক্ত কৃচ্ছতার মাঝে রেখে ছিলো। আলীর বাইতুল মাল সম্পর্কে কট্টর রাসূল সঃ এর নীতির ফলেই আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস বসরার বাইতুল মাল চুরী করে নিয়ে গিয়ে মক্কা ও তায়েফে প্রাসাদ তৈরী করে মুয়াবিয়ার সাথে মিলে যায়। ঈমানের পরই মানুষের অর্থনৈতিক সততা মানবতার সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে আর ঈমান থাকেনা।

মা আয়শা চল্লিশ বছর উত্তীর্ণ বয়সে ঘর ছেড়ে ক্বোরআনী ও নবী জীবনের আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সংহারী ভুমিকায় অবর্তীর্ণ হয়। বয়স কম বলে পরিপক্কতার অভাবে এ সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়ে ছিলো, তা বলার সুযোগ এবার ছিলোনা। "রাসূল সঃ মারা গেলে আয়শাকে বিয়ে করবো" বলা ভগ্নীপতি তালহা ও অপর ভগ্নীপতি যুবায়রকে নিয়ে মা আয়শা হিজাবের দেয়াল ভাঙ্গে। ইসলামী শান্তির দুর্গ এ হিজাবের দেয়াল। এ দেয়াল ভাংলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কিছুই আর মানবীয় থাকেনা। সব পাশবিক হয়ে যায়। দেবর-ভাবী ও শালী-ভগ্নীপতির ব্যাপারে ইসলামে হিজাব আরো কড়া। একে রাসূল সঃ জাহান্নামের আগুনের সাথে তুলনা করেছেন। হামু, আল্ হামু, আন্নার। আল মউত। মৃত্যু। অর্থাৎ দেবর-ভাবী ও শালী-ভগ্নিপতির সম্পর্ক জাহান্নামের আগুনের মতো বিপদজনক।

নারী নেতৃত্ব ইসলামে নিষিদ্ধ। ক্বেয়ামতের পুর্বলক্ষণ। তালহা যুবায়রের মতো কথিত দু'আশারায়ে মুবাশ্‌শারার দিকপাল মা আয়শার সাথে হাজার হাজার সমর্থক যোদ্ধা নিয়ে ইরাকের দিকে ছুটেছে। উট, ঘোড়া ও সমর সরঞ্জাম নিয়ে যাত্রা পথে সালাতের সময় হয়েছে। কে ইমামতী করবে প্রশ্ন উঠে। সালাত ক্বায়েম করাই প্রকৃত ইসলাম। সখ থাকলেও মা আয়শা ইমাম হতে পারছেনা। যদিও ক্বোরআন ও রাসূলের শিক্ষা বর্জন করে যুদ্ধে নেতৃত্বে যাওয়া সালাতের ইমাম হওয়ার চেয়ে কোনো বিচারেই কম পাপ নয়। তবুও লোক লজ্জায় তা করা সম্ভব হয়নি। তালহা যুবায়রের পেছনে বা যুবায়র তালহার পেছনে সালাতে দাঁড়াতে নারাজ। কারণ যে ইমামতী করবে, সেই নেতা

ও খলিফা হবে। সালাত ছাড়া যায়, কিন্তু খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া যায়না! অথচ সালাতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মা আয়শা ফতোয়া দিলো, এক বেলা ইমামতী করবে যুবায়রের ছেলে আব্দুল্লাহ্, আরেক বেলা তালহার ছেলে মুহাম্মাদ। পিস্ ফরমূলা বটে! ইসলামের সাথে এর মিল কোথা?

হাজার হাজার লোক। অধিকাংশ সাহাবী। তাদের মধ্যে একজন "হাওয়ারিয়ে রাসূল"। এ ক্বাফেলা কি ইসলামের? ইসলামের হলে তো সর্বপ্রথম মা আয়শাকে বলতে হতো, "আম্মা আপনি ঘরে ফেরত যান। আপনার একাজ নয়। এ কাজ আমাদের পুরুষদের।" দ্বীনের প্রধান রোকন বা স্তম্ভের গুরুত্ব যদি এ ক্বাফেলার যাত্রীদের নিকট এক নম্বর হতো, তা হলে কোনো মতেই ওয়াক্তিয়া নামাজের ইমামত নিয়ে এ সমস্যা হওয়ার কথা ছিলোনা। নিছক ধর্মের নামে ঘৃণ্য ক্ষমতার লড়াইয়ে নামার ফলেই এ দু' জরবদস্ত পিতার নিজ নিজ ছেলেদের পেছনে সালাত নামের প্রহসন করতে হয়েছে। হাজার হাজার লোকের মধ্যে ঐ দু'পিতার লজ্জাও করেনি ছেলেদের পেছনে দাঁড়াতে? দু'ভগ্নীপতি ও দু'ভাগ্নের মধ্যে তিনজনকে হারিয়ে পরাজিত হয়ে মাদীনা ফিরে আসে মা আয়শা। পেছনে ফেলে আসে বিশ হাজার লাশ।

বলা হয় যে মা আয়শা এ যাত্রা তওবা তিল্লা করে ঘরে ফিরেছিলো। তারপর নাকি পেছনের ভুল বুঝতে পেরে কেঁদে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতো। তাই স্বাভাবিক ছিলো। এতো বড়ো ভুল বুঝে আসলে তওবাও বড়ো, বা দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কথা। কিন্তু তার পরও তো মা আয়শা আলীকে সমর্থন করেনি, বা আলীর হাতে খেলাফতের বায়আতও হয়নি! ইসলামে খলিফার বায়আত বাধ্যতা মূলক। না করলে ঈমানের বাঁধন গলা থেকে ছুটে যায়। এ পরিস্থিতিতে হয় আলী ঈমানহারা ছিলো, নয় মা আয়শা। উভয় ঈমানের উপর স্থাপিত থাকার সুযোগ ইসলামে নেই। শয়তানের রাজনীতিতেই তা আছে।

মা আয়শা মাদীনায় এসে উম্মে সালমা ও উম্মে হাবীবার মতো ঘরের দরজা বন্দ করে তওবা তিল্লায় বসেনি। নরনারী নির্বিশেষে হাদীসের মাদ্রাসা পুনঃ আরম্ভ করে। তার মধ্যে রাসূল সঃ এর ইন্তেকাল ও শেষ দিন গুলোর বর্ণনা পাওয়া যায় মা আয়শার মুখে। হাদীস নামের এ বর্ণনাটি পড়তেই লজ্জা ও ক্ষোভে আমার মাথা হেট হয়ে যায়। বলা হয় যে মৃত্যুর কালে ও পূর্বে রাসূল সঃ মা আয়শার ঘরে ছিলেন। তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তখন রাসূল সঃ মা আয়শার কোলে মাথা দিয়েছিলেন, আর দর্শনার্থী মানুষ আসা যাওয়া করছে, তা কি কখনো কল্পনা করা যায়? পর্দা বা হিজাবের আয়াত কি তখনো নাযিল হয়নি? তা ছাড়া যখন, আব্বাস, উসামাহ্ ও আলীসহ লোকেরা প্রতি মূহূর্তে রাসূল সঃ এর অবস্থা জানতে ও তাঁকে দেখতে আসা যাওয়া করছে, তখন রাসূল সঃ এর মতো লাজুক, যাঁর লজ্জাবোধ নববধুর চেয়েও অধিক বলে বলা হয়, তিনি তখন কি তাঁর যুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা দিয়ে থাকতে পারেন? বা বুকে হেলান দিয়ে থাকতে পারেন? (দেখো বোখারী-৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ১১-১৯) আমি আমার দাদা-বাবার মৃত্যু কালে উপস্থিত ছিলাম। তাদের মৃত্যুর পূর্বেও তাদের খবর জানার জন্য, ও এক নজর দেখার জন্য মানুষের ভীড় ছিলো। আর রাসূল সঃ! তাঁর মৃত্যুকালে কতো লোকের আনা গোনা ছিলো? সে অবস্থায় কি তিনি মা আয়শার উরুতে মাথা দিয়ে বা বুকে হেলান দিয়ে থাকতে পারেন! একি কোনো সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ বা জনগোষ্ঠি কল্পনা করতে পারে!?

আমার দাদা তার মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে আমার দাদীকে পর্দায় চলে যেতে নির্দেশ করে বিদায় নিয়েছিলো। আমার বাবার মৃত্যুর বহু পূর্বেই আমার মা জায়নামাযে বসে ক্বোরাআন তেলাওয়াত ও দোয়ায় বসে গিয়েছিলো। সেখানে রাসূল সঃ যিনি ভূপৃষ্ঠে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ক্বেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণতম আদর্শ মহামানব, তাঁকে কি বোখারীতে বর্ণিত মা আয়শার অবস্থায় কল্পনা করা যায়? রাসূলের (সঃ) এর মা আয়শার প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকলে তা প্রকাশ ও প্রমাণ করার অন্য সসম্মান ও রুচি সম্মত পন্থা ছিলো। কোনো দ্বীনদার পাঠক কি বলতে পারবে যে তাদের কারো পিতা ও দাদার মৃত্যু কালে তাদের মাথা তাদের মা ও দাদীর উরুর উপর বা বুকে হেলান দেয়া ছিলো? ইন্না লিল্লাহ! এ অশ্লীল চিন্তা কি করে খাতামুন নাবিয়্যীন সম্পর্কে কল্পনা করা যায়? বোখারীও এ ধরনের বর্ণনা তাদের সহীহ (?) কিতাবে কি রূপে লিখে? লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ও অলঙ্কার। এদের কারো কি লজ্জা শরম বোধও ছিলো না?

মা আয়শার হাদীস বর্ণনা এখানেই শেষ নয়। ইসলামে প্রত্যেক বৈধ সন্তানকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকতে হয়। কোনো মুসলিম নারী নিজ স্বামী ব্যতীত ভিন্ পুরুষের সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করতে পারেনা। তা নিষিদ্ধ, না জায়েয। আমরা জানি মা আয়শার পেটে রাসূল সঃ এর কোনো সন্তান হয়নি। কিন্তু বোখারীতে দেখা যায় যে, মা আয়শাকে উম্মে আব্দুল্লাহ, অর্থাৎ "আব্দুল্লাহর মা" বলে বোখারী হাদীস বর্ণনা করছে। যুবায়রের ছেলে আব্দুল্লাহর মা, রাসূলের

স্ত্রী মা আয়শা কি করে হতে পারে? যেখানে রাসূল সঃকে আল্লাহ্ যায়দের পিতার পরিচয় দিতে দেয় নি, সেখানে মা আয়শা এ কাজটি কি করে করতে পারে? রাসূল তো কোনো একজন সাধারণ ব্যক্তি নন? তিনি বিশ্বআদর্শ, আল্লাহ্র দ্বীনের মানদন্ড। তাই তাঁর ঘরের কেউ আল্লাহ্র শরীয়তের পরিপন্থী কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেনা। তাই রাসূলের ঘরে যারা সঠিক কাজ করে, তাদের দ্বিগুণ পূণ্য, আর যারা অন্যায় অশ্লীল কাজ করবে তাদের দ্বিগুণ শাস্তি। (দেখো-আহ্যাব-৩০) নির্লজ্জ মুহাদ্দিসরা রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা তৈরী করে বলছে যে মা আয়শার কোনো সন্তান হয়নি বলে নাকি রাসূল সঃ তাকে ইব্ন যুবায়রের মা "উম্মে আবদিল্লাহ্" বলে পরিচয় দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। রাসূল সঃ কি ক্বোরআনের বিধানের উল্টো কিছু করার অনুমতি দিতে পারেন? তা হলে তাঁর ঘাড়ের রগ কাটা যাবে না? বোখারী ও মুসলিমের এ সংক্রান্ত হাদীসটি তুলেধরে আমি পাঠকদের হাতে বোখারী ও মুসলিমের বিচারের দায়ীত্ব দিবো। عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضى الله عنها، قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد- رواه البخارى، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

"মুমিনদের মা, আব্দুল্লাহর মা, আয়শা থেকে বর্ণিত যে আয়শা রাঃ বলেছে যে রাসূল সঃ বলেছেন "আমার রিসালাতের বাইরে যে কোনো জিনিসই নতুনযোগ করবে, যা মূলে নাই, তা প্রত্যাখ্যাত।" বোখারী। মুসলিম বর্ণনা করেছে একই হাদীস, তাতে বলা হয়েছে, "যে কোনো কাজ করবে, যা আমার নির্দেশ অনুযায়ী নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

বিদআত্ বিরোধী এ হাদীসটিই একটি নির্লজ্জ ডাহা বিদআ্ত, তার বিচার কি হওয়া উচিত? মা আয়শাকে আব্দুল্লাহর মা বানানোর চেয়েও কোনো জঘন্য বিদ্আত্ হতে পারে? এ সমস্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মা আয়শা। নিজ নামের সাথে বিদআত্ যোগ করে "উম্মে আব্দুল্লাহ" হয়ে তারপর নিজেই বিদআত বিরোধী হাদীস বর্ণনা করা তো সে গর্হিত কাজ, যা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ। (সূরা সফ্ফ-৩) كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون

মা আয়শার মানসিক ভারসাম্যতায় তো এমনটি হওয়ার নয়!

মানুষ মানুষই। নবী রাসূল হোক বা সাধারণ মানুষ। নারীরাও তাই। তারা নবীদের স্ত্রী হোক বা সাধারণ গৃহবধু। মানুষ যেমন শয়তানও নয় তেমন ফেরেশতাও নয়। এ কথাটি বুঝাতেই আল্লাহ্ বলেছেন, মুহাম্মাদ তোমাদের মতো মানুষ। শুধু পার্থক্য হলো যে তার কাছে অহী আসে। রাসূল সঃকেও আল্লাহ্ আদেশ করেছেন বলতে, "বলো, আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। শুধু আমার নিকট অহী আসে, এই পার্থক্য।"

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ (কাহ্ফ-১১০, ফুস্সিলাত-৬)

মা আয়শাদের কাছে অহী আসতোনা। রাসূলের কাছে অবতীর্ণ অহী অনুযায়ী তাঁকে মানলে তারা ধন্য। না মানলে নূহ ও লূতের স্ত্রী। তৃতীয় কোনো অবস্থান তাদের নেই। তবে একটি কথা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে নিঃসন্তান নারী পুরুষ, বা আটকুড়ে নর বা বন্ধ্যা নারীদের মানসিক ভারসাম্যহীনতা থাকে। নিঃসন্তান হেতু তারা অন্যের সন্তান দেখতে পারে না বা অন্যের সন্তান দত্তক নেয়। বা পশু প্রাণী পেলে তাকে সন্তানের আদর দিয়ে নানা প্রকার মানসিক সিনড্রম বা মানসিকতায় ভোগে। আমার মক্কী জীবনে ডঃ আলী আশরাফ ও তার বৌকে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখে আমি তাদের অস্বাভাবিকতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম যে তার স্ত্রীর এ্যবোর্শন হয়ে যাওয়ার পর সে জটিলতায় বাচ্চাদানী কেটে ফেলে দিতে হয়। তারপর যাতে আলী আশরাফ সন্তানের জন্য আর দ্বিতীয় বিয়ে না করে, সে জন্য তার স্ত্রী বিভিন্ন পীর ফকীরের কাছে আলী আশরাফকে নিয়ে নিজেও মুশরিক হয়, স্বামীকেও মুশরিক বানিয়ে ফেলে। তারপর মানসিক শুন্যতা দূর করার জন্য শালীকে মেয়ের মতো পালে, যা হারাম। তার বিয়ে হয়ে গেলে অন্যের মেয়ে পালে, তাও হারাম। এবং শেষে ঘরে বিড়াল ও মোরগ মুরগী পালে। পরে সে মোরগ-মুরগী বুড়ো হয়ে মরে যায়। তাকে জবাই করে খেতে পারে না সন্তানের আদর জন্মায় বলে।

এটাই স্বাভাবিক। এজন্য মানব সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে হলে নেতা-নেত্রীদের সন্তান সন্ততির স্বাভাবিক পিতামাতা হতে হয়। তা না হলে ভারসাম্যহীনতার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মা আয়শার জীবনে তার কারণ উড়িয়ে দেয়া যায় না। তা না হলে আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবায়রের মাতৃত্ব জুড়ে কি করে উম্মে আব্দুল্লাহ হয়? তাতো ক্বোরআনে নিষিদ্ধ!

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মা আয়শার এ মানসিকতা প্রমাণ দেয়। আবু সুফয়ানের একটি ঘোষিত জারজ সন্তান ছিলো। তার নাম যিয়াদ। হারামজাদার পিতৃত্ব দাবী করলে ইসলামে দাবীকারীর জন্য পাথর ছুড়ে মৃত্যুর বিধান। হারামজাদাগুলো সাধারণভাবে যেমন চালাক ও ধুর্ত হয়, যিয়াদও তাই ছিলো। রাসূল সঃ বেঁচে থাকতে আবু সুফ্য়ান যিয়াদের পিতৃত্ব স্বীকার করেনি, শাস্তির ভয়ে।

যিয়াদ প্রথমে আলীর পক্ষে জোর সমর্থক ছিলো। কিন্তু মুয়াবিয়া তাকে টোপ দেয় যে সে আলীকে ত্যাগ করলে যিয়াদকে তার ভাই বলে স্বীকৃতি দিবে। এক পর্যায়ে সে মুয়াবিয়ার সাথে যোগ দিলে মুয়াবিয়া সাক্ষী সাবুদ দাঁড় করিয়ে তাকে তার ভাই বলে ঘোষণা দেয়। ব্যাপারটি তখনকার সমাজে সবার জানা ছিলো বলে মুসলিমরা তা গ্রহণ করেনি। বরং তাতে যিয়াদের আরো দুর্নাম বাড়ে। মা উম্মে হাবিবা দৃঢ়তার সাথে উক্ত জারজ যিয়াদ তার সাথে ভাই হতে সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে মা উম্মে হাবিবাহ পর্দা করে যিয়াদকে তাড়িয়ে দেয়। মুয়াবিয়া রাজা হলে সে যিয়াদকে কুফার শাসক নিযুক্ত করে। তাকে হালাল করার জন্য মুয়াবিয়া মা আয়শার সমর্থন চাইলে মা আয়শা যিয়াদকে "যিয়াদ ইবন আবি সুফ্য়ান" বলে সম্বোধন করে সে হারামজাদাকে জাতে তোলে। পরে এ যিয়াদের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবন্ যিয়াদকে দিয়েই ইয়াযীদ হোসাইনকে সপরিবারে কারবালায় নির্মূল করার নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, সে যদি হোসেইনকে শেষ না করে, তা হলে তার পিতার পিতৃপরিচয় প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। অবৈধ পিতৃপরিচয় রক্ষার্থে ইবন্ যিয়াদ কারবালার ঘটনার নায়ক হয়ে ইতিহাসে ঘৃণ্যতম প্রাণী হয়। মা আয়শার চিঠি পেয়ে যিয়াদ কুফার জামে মসজিদে জুমার দিন জন সমক্ষে তা পড়িয়ে "যিয়াদ ইবন আবিহ্" থেকে "যিয়াদ ইবন আবি সুফ্য়ান" হয়।

মা হাফসা

উমর ইবন্ আল খাত্তাবের কন্যা মা হাফসা সম্পর্কে লেখার বেশী কিছু নেই। পেছনে তার উম্মুল মুমিনীন হওয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আয়শাকে বিয়ে করে রাসূল সঃ যেরূপ আবু বকরকে কৃতার্থ করেছিলেন, সেরূপ হাফসাকে বিয়ে করে রাসূল সঃ উমরকে ধন্য করেছেন। তার বেশী কিছু নয়। এরা দু'জন রাসূল সঃ-এর ঘরে একজন অপরের ফটোষ্টেট কপি ছিলো। যেমন বাইরে আবু বকর ও উমর একে অপরের ফটোকপি ছিলো। তবে পার্থক্য এতটুকু ছিলো যে রাসূল সঃ এর ঘরে মা আয়শা ছিলো Extrovert বা বহির্মূখী প্রকৃতির এবং মা হাফসা ছিলো Introvert বা অন্তর্মূখী। মা আয়শা রাসূল সঃ এর ঘরে যা করতো, মা হাফসা তা অনুসরণ করতো। যেমনটি রাসূল সঃ এর ঘরের বাইরে আবু বকর ও উমর করতো। তবে এখানেও একটি লক্ষ্যনীয় পার্থক্য ছিলো। তা হলো যে রাসূল সঃ এর ঘরে মা আয়শা ছিলো বহির্মূখী প্রকৃতির, আর হাফসা ছিলো অন্তর্মূখী। বাইরে তার বিপরীত। উমর বহির্মূখী বিস্ফোরক, আবু বকর অন্তর্মূখী ধীরস্থির।

তবে একটি ব্যাপারে মা আয়শার চেয়ে মা হাফ্সার ভাগ্যে একটি বৈপরীত্ব আছে। তা হলো যে মা আয়শার সাথে মা হাফসাও উষ্ট্রেরযুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলো। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবন ওমর এসে পথিমধ্য থেকে মা হাফসাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে ঘরবন্দী করে দেয়। তার বোনকে বের হতে দেয়নি। তা না হলে মা হাফসা যুদ্ধের ময়দানে মা আয়শার ডিপুটি লিডার বা উপনেত্রী হতো। এটাকেই বলে ভাগ্য।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা না লিখলে মূল বক্তব্যে একটি শুন্যতা রয়ে যাবে। তাই তা উল্লেখ করছি। তা হলো যে ইসলামের সকল বৈষম্যবাদহীন মুস্তাদআফ্দের ইমামত রাসূল সঃ প্রতিষ্ঠা করে যাওয়ার পর আবু বকর কর্তৃক উচ্চারিত "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর সমর্থনে উমর ও আবু ওবায়দারা যে ক্বোরেশী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে, তারা বনি হাশিমের আলীকে ক্ষমতার বাইরে রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেও তারা ভাবেনি এবং চায়নি যে তাদের পদক্ষেপ দ্বারা উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক। কিন্তু তাদের না চাওয়া সত্ত্বেও তারাই পরবর্তীতে উমাইয়া আব্বাসী তথা অনাবরদের উপর আরবী সাম্রাজ্যবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা। কারণ "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বাক্যটি ঈমানদারদের জন্য আত্মঘাতি। যেমন পাপ বাপকেও ছাড়েনা। আবু বকর ও উমররা যে মুয়াবিয়া ও মারওয়ানদের মতো বেঈমান ও কাফের ছিলো না, তা মুয়াবিয়া ও মারওয়ানরা খুবই ভালোভাবে বুঝতো। পরবর্তীতে আবু বকর ও উমরদের সন্তানদের সাথে মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ, মারওয়ান ও তাদের ছেলেদের ব্যবহারে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়। তবে আবু বকর ও উমরের সন্তানদের চেয়েও ওদের বেশী আক্রোশ ও শত্রুতা আলী ও তার ছেলেদের প্রতি ছিলো এবং প্রকারান্তরে রাসূল সঃএর প্রতি ছিলো।

মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ তাদের ক্ষমতা প্রাপ্তির মূল উৎস যে আবু বকর ও উমরের খেলাফত, তা তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। যদিও তা অসতোদ্দেশ্যে। নিম্নের দুটি পত্র ও তার উত্তর তার অনস্বীকার্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। বিশ্বের তথ্যজ্ঞানহীন ইসলামী জনতা ও সঠিক তথ্য পিপাসু ইসলামী উত্থানের প্রত্যাশীদের জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক

পত্র দু'টি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

জামহারাতু রাসাইলিল্ আরব প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭৭, মরাওয়াজুয্ যাহব্ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬০, শারহে্ ইবন্ আবিল হাদীদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২৮৬ তে মুহাম্মাদ ইবন আবি বকরের মুয়াবিয়াকে এবং আব্দুল্লাহ ইবন্ উমরের ইয়াযীদকে লেখা দুটি পত্র ও তার জবাব দেখতে পাওয়া যায়। এ পত্রগুলো ও তার উত্তর এতো বাস্তব সম্মত ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, তা পড়া মাত্রই সকল বিবেচনা ও বিবেক, এর সত্যতার পক্ষে চিৎকার করে সাক্ষ্য দেয় এবং মুসলিম উম্মার বিচ্যুতির উৎস, বর্তমান বিশ্বময় লাঞ্ছনার কারণ ও ভবিষ্যতের মুক্তির পথনির্দেশ দান করে। মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরের পত্র দু'টি অতি দীর্ঘ বিধায় তাকে সংক্ষেপ করে প্রথমে তার মূল কথা গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বিপথগামী মুয়াবিয়ার প্রতি মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরের পত্র

আল্লাহ্র হিদায়েত অনুসারীর প্রতি সালাম, যারা আল্লাহ্র দরবারে আত্মসমর্পণ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান। তাঁর মহান কুদরতে তিনি সৃষ্টির বিকাশ করেছেন। তাঁর সৃষ্টি নিরর্থক খেলাচ্ছলে নয়। মহান উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্র কোনো ঠেকা নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সৃষ্টির কেউ সঠিক পথে চলে। কেউ ভুল পথে। তিনি সকলের অভাব মুক্ত।

মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের পাঠাতে আরম্ভ করেন নবী রাসূল করে। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি সর্বশেষ সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। তিনি তাঁর স্বীয় গোত্রকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করলে আলী সর্ব প্রথম তার প্রতি শৈশবে ঈমান আনে। তারপর তাঁর ঘরে, তাঁরই হাতে তারবিয়াত পেয়ে বড়ো হয়।

বড়ো হলে পর যুদ্ধের ময়দানে যেখানে অন্যেদের পা কেঁপে উঠে, সেখানে আলী দৃঢ়পদে অসম বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে....। আমার ভেবে আশ্চর্য লাগে তুমি সে আলীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে চাও। তুমি কি জানো না যে তুমি কে? তুমি সে আবু সুফয়ানের ছেলে যে রাসূল ও তাঁর রিসালাতের শুরু থেকে সে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত শত্রুতা করেছে? তোমার পিতা তার মৃত্যুকালে তোমাকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রেখে গিয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রুরা তোমার বাহুতলে আশ্রয় নিয়েছে।

মুহাজির ও আনসারদের মাঝে তুমি জানো যে আলীর মান ও মর্যাদা কী। তুমি জানো তোমার অবস্থান কোথায়। তারপরও তুমি আলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে সকল বাতিলকে বুদ্ধিমত্তা রূপে গ্রহণ করেছো?

তুমি জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তোমাকে মক্কাবিজয় কালে প্রাণে রক্ষা করেছেন। তাঁর অকৃতজ্ঞতার জন্য এখন তিনি তোমার কার্যবিধি পর্যবেক্ষণ করছেন। কল্যাণ চাও তো, আলীর বিরুদ্ধাচারণ ত্যাগ করে আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশা করো। আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্র অনুসারীর জন্য সালাম। (দেখো, জামহারাতু রাসাইলিল আরব ১ম খন্ড পৃঃ ৪৭৫, মরাওয়াজুয যাহব লিল মাসউদী ২য় খন্ড পৃঃ ৫৯, শরহে ইবন আবিল হাদীদ ১ম খন্ড পৃঃ ২৮৩)

মুয়াবিয়ার উত্তর

মুয়াবিয়া বিন্ সাখ্র্ এর পত্র, মুহাম্মাদ ইবন আবি বকরের প্রতি,

আল্লাহ্র অনুগতের উপর সালাম।

আম্মাবাদ ঃ তোমার পত্র পেয়েছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তাআলার মহাত্ম বর্ণনা করেছো এবং রাসূলের প্রশংসা করেছো। কিন্তু পত্রের বক্তব্যে তোমার মতামত ভ্রান্ত! কারণ, তাতে তোমার বাপের কুৎসা করে পরের গুণ গেয়েছো। পিতার বিরোধিতা করে পিতাকে বাদ দিয়ে পরের গুণ কীর্তণ করে তুমি পরের গুণে নিজেকে ধন্য করতে প্রয়াস পেয়েছো।

তোমার পত্রে তুমি আলীর গুণাবলী একে একে সব তুলে ধরেছো। তাতে তুমি আমাকে খাটো করে তোমাকেও খাটো করেছো। রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় তোমার বাবা ও আমি, আলীর মর্যাদা ও গুণাবলী জেনেছি ও দেখেছি। তারপর

রাসূল সঃ ইন্তেকাল করলে সর্বপ্রথম তোমার বাবা আবু বকর ও তার দোস্ত উমর আলীর বিরুদ্ধাচারণ করে তাকে, ছলে ও বলে বঞ্চিত করে ক্ষমতারোহন করে নিজেরা তা ভোগ করেছে। আলী প্রতিবাদ করতে দাঁড়ালে তাকে দৈহিক ভাবে আক্রমন করে বায়আতে বাধ্য করা হয়। প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও শেষে আলী সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছে। তোমার বাপ ও তার বন্ধু তারপর আলীকে কোনো দায়িত্বে স্থান দেয়নি। এভাবে তোমার বাবা ও তার বন্ধুর মৃত্যু হয়।

তারপর তাদের চালেই উসমান ক্ষমতায় বসে। সেও তার পূর্বতন তার গুরুদের অনুসরণে আলীকে দূরেই রাখে। তারপর চক্রান্তে উসমান বিদায় নিলে তোমার কর্তার (?) হাতে ক্ষমতা আসে এবং সে ক্ষমতার ভাগ পেয়ে তুমি আজ আমাকে গালমন্দ দিয়ে পত্র লিখছো। আবু বকরের বেটা! তুমি আন্দায করতে পারছো না ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে। তুমি আমাকে চেনো না। আমি বুদ্ধি দিয়ে পর্বত ওজন করি। আমার বর্শার উপর আমার হাত দৃঢ়। আমার ধৈর্য্যের পরিমাপ কেউ আন্দায করতে পারছেনা। তুমিও পারছোনা।

আমার অভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্খার পথ তোমার বাবা উম্মোচন করেছে। এখন যদি আমার পথকে তুমি রাজত্বের লিপ্সা মনে করো, তার পথ তোমার বাবা করে দিয়েছে। এখন এ পথ যদি সঠিক হয়, তা হলে তোমার বাবা আমার পীর। আর যদি আমার ক্রিয়া অন্যায় হয়, তা হলে, আমি শুধু তোমার বাবার পথ একটু এগিয়ে নিয়েছি। তোমার বাবার অনুসরণ করেছি।

তোমার বাবা আলীকে মেনে নিলে আমিও তাকে মেনে নিতাম। এখন আমাকে গালি দেয়ার পূর্বে তোমার বাপকে গালি দিয়ে নাও। এখন তোমার ইচ্ছা। তোমার বাবার প্রশংসা করতে চাইলে আমার প্রশংসা করো। তা না হলে চুপ হয়ে যাও। তাতেই তোমার কল্যাণ। আবু বকরের বেটা! নিজের শেষ রক্ষার চিন্তা করো। অচিরেই বাড়াবাড়ির মজা ভোগ করবে।

যে বিপথ ও ভ্রান্তি থেকে ফেরত আসে তার জন্য সালাম। (দেখো জামহারাতু রাসাইলিল্ আরব, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৭ মুরাওয়াজুয্ যাহ্ব, ২য় খন্ড পৃঃ ৬০, শারহ ইব্ন্ আবিল হাদীদ ১ম খন্ড পৃঃ২৮৬)

ইব্নু উমরের পত্র

কারবালায় হোসেইনের শাহাদাতের পর ইয়াযীদকে আব্দুল্লাহ ইব্ন্ উমর সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থবহ একটি পত্র লিখে। তা নিম্নরূপ, আম্মাবাদ ঃ "আমাদের উপর শোকের পর্বত ভেঙ্গে পড়েছে। দুঃখ দূর্দশার সীমাহীন পথ খুলেছে। ইসলামের উপর বিরাট বিপদ পতিত হয়েছে এবং হোসেইনের হত্যার ন্যায় দুর্ঘটনার দিনের মতো আর কোনো দিন আসবেনা।"

তার উত্তরে ইয়াযীদ লিখেছে। আম্মাবাদ ঃ

"হে নির্বোধ বেকুব!

আমরা তো সাজানো ঘরে আসন গ্রহণ করেছি, যে ঘরে পূর্ব থেকেই বিছানা বিছানো ছিলো, গদি সোফাসেট সব সাজানো ছিলো। আমরা মাত্র এসে বসেছি। হোসেইন এসেছিলো আমাদের সে সাজানো ঘর থেকে উৎখাত করতে। তাই যুদ্ধ হয়েছে।

এখন এটা যদি আমাদের অধিকার হয়, তাহলে আমরা আমাদের অধিকার রক্ষার্থে যুদ্ধ করে হোসেইনকে হত্যা করেছি। আর এতে যদি আলীর সন্তানদের হক্ব ছিলো, তাহলে তা সর্বপ্রথম তোমার বাবা তার বন্ধুকে নিয়ে হরণ করেছে।"

ঘৃণ্য স্বীয়স্বার্থে হলেও মুয়াবিয়া মুহাম্মাদকে এবং ইয়াযীদ আব্দুল্লাহকে যা লিখেছে, তা কি অস্বীকার করার জো আছে? মুহাম্মাদকে মুয়াবিয়া জীবন্ত গাধার পেটে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে এবং ইয়াযীদ হাজ্জাজ ইব্ন্ ইউসুফকে দিয়ে বিষাক্ত ক্ষত করে আব্দল্লাহ ইবন উমরকে পঁচিয়ে পঁচিয়ে মেরেছে।

এ মুহাম্মাদ ইব্ন্ আবি বকর আস্মা বিন্ত উমাইসের পেটের সন্তান। আসমা সে মহিলা, যাকে রাসূল সঃ মহিমাময়ী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এ আসমার প্রথম স্বামী জাফর ইব্ন্ আবি তালিব, আলীর বড়ো ভাই। যার দাওয়াত ও যুক্তিতে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। জাফর যায়দের অধীনে মওতার যুদ্ধে অমর শাহাদাত বরণ করলে পর আবু বকর তাকে বিয়ে করে। তার ঔরসে এ মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরের জন্ম হয়। আবু বকরের মৃত্যুর পর আলী তার বড়ো ভাইর স্ত্রী আসমাকে বিয়ে করে। সেখানেও আলীর ঔরসে তার ছেলে ইয়াহ্ইয়ার জন্ম হয়। তাই

মুহাম্মাদের মতো ঐতিহ্যের সন্তান খুব কমই জন্মায়। মায়ের ঐতিহ্যের পর সে আবু বকরের পিতৃত্ব লাভ করে। তারপর আলীর লালন পালন পায়। এ ভাবে গড়ে উঠা ব্যক্তির তো জানা কথা যে তার মায়ের প্রথম স্বামী যায়দের অধীনে যুদ্ধে গিয়ে অমর গাঁথায় মুক্তা হয়েছে, তার পিতা আবু বকর যায়দের ছেলে উসামার অধীনে সাধারণ সৈনিক রূপে আনুগত্যে আদিষ্ট ছিলো এবং তার মায়ের শেষ স্বামী আলীও উসামার অধীনে আনুগত্যে রাসূল কর্তৃক আদিষ্ট ছিলো। তারপরও কেনো এদের বোধোদয় হয়নি যে ব্যাপারটি তো ছিলো মুস্তাদআফ ইমামতের?! শুরু থেকেই তা অমান্য করার ফলেই ক্বোরেশী গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে। রাসূল সঃএরও বার বার ঘোষিত অভিশাপ রয়েছে তাঁর হুকুম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে।

বোখারীর ৬ষ্ঠ খন্ডের ১১ থেকে ১৯ পৃষ্টা পর্যন্ত রাসূল সঃ এর অসুস্থ হওয়া ও ইন্তেকাল সম্বলিত বর্ণনা পড়লে যে কোনো বিবেকবান সাধারণ পাঠক বুঝবে যে, রাসূল সঃ রোগাক্রান্ত হলে তাঁর মৃত্যু বরণ পর্যন্ত ও তাঁর মৃত্যুর পর কি ন্যাক্কারজনক কুৎসিত কথাবার্তা ও ঘটনা ঘটেছিলো। মা আয়শার নামে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা পড়ার সময় আমার মনে ইয়াহুদীদের বাইবেলে হযরত দাউদ আঃ এর মৃত্যুর কালের অশ্লীল কথা-বার্তার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়। খবীস ইয়াহুদীরা ডেভিডের বা দাউদের মৃত্যুকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে ওদের বিকৃতরুচির নগ্নচিত্র তুলে ধরেছে। দাউদ আঃ এর যখন মুমূর্ষ অবস্থা, তখন হয়তো শয়তানই মানুষের আকার ধারণ করে দাউদ আঃ এর শয্যা পার্শ্বের লোকদের পরামর্শ দিয়েছিলো, দাউদকে পুনঃ সজীব করে মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী সংগ্রহ করে আনতে। তারপর নাকি ওরা সত্যি সত্যিই এক যুবতীকে এনে সম্পূর্ণ নগ্ন করে হযরত দাউদের সামনে দাঁড় করে। তাকে দেখে যখন দাউদ আঃ এর কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, তখন নাকি দাউদ আঃ এর সাহাবীরা মেয়েটিকে বলেছিলো হযরত দাউদ আঃ এর সাথে শয্যাশায়ী হয়ে ঢলাঢলি ও মৈথুন করতে। তাতেও তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া না হলে নাকি তিনি ইন্তেকাল করেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক (দেখো, বাইবেল, দাউদের মৃত্যু)। নবীদের সঙ্গী বা তাদের পরবর্তী লোকেরা নষ্ট হলেই বোধ হয় ওরা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব হয়ে যায়। কোনো মিথ্যাই বলতে ওদের আর বাঁধেনা। হযরত দাউদ, যিনি একাধারে নবী ও বাদশা ছিলেন। তারপর তিনি রাজকোষেরটা না খেয়ে নিজ হাতের কামাই করে খেতেন এবং আজীবন একদিন পর একদিন সিয়াম পালন করেছেন।

বোখারীতে রাসূল সঃ এর মৃত্যু কালের বর্ণনা দিতে গিয়ে মা আয়শার মুখে সাত জায়গায় বলানো হচ্ছে যে রাসূল জাঁকান্দানীর সময় "আমার উরুর পর মাথা দিয়েছিলেন, আমার কোলে হেলান দিয়ে বুকে মাথা দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন।" এ গুলো দেখে লজ্জা ও ক্ষোভে আমার মাথা হেট হয়ে যায়, এবং কেবলই মনে হয় এ সমস্ত ঝুট ও মিথ্যা, বানোয়াট। পরবর্তী বিকৃত আরবরা ইয়াহুদীদের নিকট থেকে নবীদের নামে প্রচারিত মিথ্যার অনুকরণে এগুলো বানিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এগুলো বোখারীরা কি করে বর্ণনা করে? ওদের সনদ কি আল্লাহ্, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ থেকেও উর্ধ্বে।

আবু বকরকে দিয়ে ইমামত ও নামাজ সংক্রান্ত যতোগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর ভাষা ও বর্ণনা এতো পেচালো যে মনে হয়, কোনো মিথ্যুক বানিয়ে মিথ্যা বলছে যা সহজে তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছেনা। আমার মনে হয় যে ওরা মা আয়শার নামে এসব বানিয়ে বলছে। তাই বাচনভঙ্গি পেচালো ও অস্পষ্ট। অথচ বোখারীতে তার পরের পৃষ্ঠায় বর্ণিত উসামাহ্‌র নিয়োগ ও নেতৃত্ব সম্পর্কে রাসূল সঃ এর নির্দেশাবলী মুক্তার মতো ঝকঝকে এবং হিরার মতো ধারালো। এটাই আমার বিশ্বাস, সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের কষ্টি পাথর।

মা হাফসার প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে এ মূল্যবান তথ্যাদী সংযোজনের দ্বারা আমি বলতে চাই যে রাসূল সঃ এর ঘরে মা আয়শা ও হাফসা যেমন একজোড়া ছিলো, বাইরে আবু বকর ও উমর তেমনি একজোড়া ছিলো। এরা তাদের সীমাবদ্ধতায় রাসূল সঃ এর উসামার নিয়োগকে মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করেছে এবং ইসলামের যে ক্ষতি করেছে, তার ক্ষতিপূরণ তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। আলীও সে সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিলোনা। কিন্তু দ্বীনের তারবিয়াতে আলী, আবু বকর ও উমরের চেয়ে অনেক অগ্রসর ও অগ্রগামী ছিলো। আবু বকর ও উমররা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর শুধু উসামাহর ইমামতকেই অমান্য করে ক্ষান্ত হয়নি, আলী ও বনু হাশেমকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য বনী হাশেমের চির বিরোধী বনু উমাইয়ার আবু সুফয়ানের ছেলে ইয়াযীদ ইব্‌ন্ আবু সুফ্‌য়ান, মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফ্‌য়ান, আমর ইবনুল আস, খালিদ ইবন আল ওয়ালীদ এবং মুগীরা ইব্‌ন্ শুবাকে ক্ষমতার কীপয়েন্টে বসিয়ে গিয়ে নিজেরা আত্মহত্যা করে গিয়েছে এবং তাদের সন্তানদের জন্যও মৃত্যুর অন্ধকূপ তেরী করে গিয়েছে। তাই আবু

বকরের ছেলে আব্দুর রহমান মুয়াবিয়ার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বেড়িয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। মুহাম্মাদ জ্যান্ত গাধার পেটে ঢুকে পুড়ে মরেছে ও উমরের ছেলে ইয়াযীদের মুখে আহম্মক ও বেকুব গালি শুনে বিষাক্ত বর্শার আঘাতে পঁচে পঁচে মরেছে। পিতাদের ভুলে সন্তানরাও ভুলে নিমজ্জিত ছিলো। পিতারা ইসলাম গ্রহণ করেও মুস্তাকবিরী ছাড়তে পারেনি। কারণ, তারা "আস্‌লামনা" পর্যন্ত দ্বীনে প্রবেশ করেছিলো। "আমান্নার" দুয়ারে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। আমান্নার দুয়ারে প্রবেশ করলেই মানুষ মুস্তাকবির রোগমুক্ত হয়ে মুস্তাদআফ সুস্থ ঈমানদার হয়। যেমন রাসূল সঃ স্বয়ং, যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব, সাওবান, সালমান ও উসামাহ্‌রা প্রবেশ করেছিলো।

এ কথা ভাবা যায় যে মা আয়শা, হাফসা ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্‌ উমররা মুয়াবিয়ার হাতেও বায়আত হয়, কিন্তু আলীর হাতে বায়আত হয়নি??!! মা আয়শা আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, আর মুয়াবিয়ার হাতে বায়আত হয়ে তার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করে মুয়াবিয়ার রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে যায়! ইব্‌নু উমরকে পরে ইয়াযীদের হাতেও বায়আত হতে হয়! আলী কি মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের চেয়েও নিম্নমানের ঈমানদার ছিলো? এ যিল্লতী ও অপমানের কারণ কি? এর উত্তর খুঁজে পেতে, সূরা মুহাম্মাদের ৩২ আয়াতে ও সূরা আহযাবের ৫৭-৫৮ আয়াতে দেখো। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্‌ উবাইরা দুরে থেকে রাসূলকে কষ্ট দিয়ে রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায়ই মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে গিয়েছে। উবাইরা রাসূল সঃ এর ঘরের লোক ছিলোনা। ঘরের লোকেরা সব কিছু জেনেও রাসূলকে অমান্য করে তাঁকে ঘরে বাইরে কষ্ট দিয়েছে, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট দিয়েছে এবং মৃত্যু শয্যায়ও কষ্ট দিয়েছে। কাগজ কলম চেয়েছেন তাও দেয়নি এবং বার বার বলে নিজ হাতে ইমামতের পতাকা বেধে তা সবার সামনে উসামাহ্‌কে হস্তান্তর করে, তাকে যারা মানবে না তাদের লানত করে জীবনের সর্বশেষ কথা উসামাহ্‌র সাথে বলে হাত তুলে দোয়া করে বিদায় নেয়ার পরও খাতামুন নাবিয়্যীনের নিয়োগ অমান্য করে যারা আল্লাহ্‌ ও রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের ও তাদের সন্তানদের কপালে ঐ যিল্লতীই প্রাপ্য ছিলো। মুস্তাদআফ ইমাম মানেনি বলে মুস্তাকবির তোলাক্বা, ত্বারীদ ও জাহান্নামীর দুঃসংবাদ প্রাপ্ত খবীস মুয়াবিয়া, মারওয়ান, ওয়ালীদ ইব্‌ন্‌ উক্ববা ও ইয়াযীদের পেছনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে তাগুতকে সিজ্‌দা করতে হয়েছে তাদের। ওরা ইসলামের ইমাম ছিলোনা। ওদের পেছনে আল্লাহ্‌কে সিজদা করা যায়না। ওরা আইম্মাতুল্‌ কুফ্‌র বা কুফরীর ইমাম ছিলো। নিঃসন্দেহে ওদের পেছনে যারা রুকু সিজদা করেছে, ওরা আল্লাহ্‌কে সিজদা করেনি, সামনের তাগুতটাকেই সিজদা করেছে!

আলীও এ ভুলের উর্ধ্বে ছিলোনা। কারণ সেও উসামাহ্‌ প্রতীকী রাসূল সঃ এর ইমামতকে অমান্য করেছিলো। তাই তার ছেলে হাসান ও হোসেইন পিতার ভুলের অনুসারী হয়ে উসামাহ রূপী ইমামতের অমান্যকারী ছিলো । কিন্তু পিতার ভুল, আবু বকর ও উমরের চেয়ে লঘু হওয়ায় তারা তাগুতকে সিজদা না করার অপরাধে একজন তাগুতের বিষপানে মৃত্যু বরণ করেছে, অপরজন কারবালায় প্রাণ দিয়েছে। এ মৃত্যু আবু বকর ও উমরের সন্তানদের চেয়ে শ্রেয়। তারা ওদের মতো প্রত্যক্ষ তাগুতকে সিজদা করে যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এখানে একটি ছোট্ট হলেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখা দরকার। তা হলো যে শিয়ারা যেমন বলে যে আলীকে উসামাহ্‌র অধীনে পাঠানো হয়েছিলো না, সূন্নীদের বিভ্রান্তকারী ইব্‌ন্‌ তাইমিয়া বলে যে, তাদের ইমাম, আবু বকরকেও উসামাহ্‌র অধীন করা হয় নি। শয়তান কর্তৃক ইসলামকে সুন্নী-শিয়ায় দু'টুকরা করার পর থেকে আজ পর্যন্ত শয়তানই কোথাও সুন্নীদের ইমামের দায়িত্ব পালন করে আসছে, কোথাও শিয়াদের ইমামতি করে আসছে। কখনো যুহ্‌রী, আহমদ ইবন্‌ হাম্বল ও ইবন তাইমিয়ার বা কখনো মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহাবদের অসতর্ক মুহুর্তে তাদের মুখ দিয়ে সুন্নীর বিষ ছড়াচ্ছে। আবার কোথাও "আহলে বাইত" নামের শিয়া ইমামদের মুখে তার প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে। শেষ মেষ বর্তমানে শয়তান আরবদের সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় ভাবে মুর্তাদ বানিয়ে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের জুতার সুকতলা বানিয়ে সীল মেরে দিয়েছে। সম্প্রতি গত মে মাসের ২৩ (২০০০) তারিখে পাকিস্তানী সংবাদপত্রসমূহে পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বর্তমান বিশ্বের পরিচিত ইসলামী পুনর্জাগরণের নেতা ডাঃ ইস্‌রার আহমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। তাতে ডাঃ ইস্‌রার বলেছে যে বর্তমানে যে বিশ্বে গণনায় দেড়শ' কোটি মুসলমান রয়েছে, তন্মধ্যে আরব ভূখন্ডে বসবাসকারী বিশ কোটি আরব তাদের মাঝে, তাদের ভাষায় ক্বোরআন উপস্থিত থাকার পরও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী অপরাধী মুর্তাদ। এবং আত্মস্বীকৃত মুনাফিক জাতি হলো পাকিস্তানী জাতি। তারা বিশ্বে ইসলামী জাগরণের নেতৃত্ব দানের দাবিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গত অর্ধশতাব্দী ধরে অমার্জনীয় মুনাফেক্বীতে লিপ্ত। ডাঃ ইস্‌রার আহমদের এ উক্তি সঠিক ও সত্য।

পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ইরান ও আফগানিস্তান বর্তমানে ইবলিস শয়তান ও তার অনুসারী শিয়া-সুন্নী বিভক্তিবাদের ফিত্না বিশ্বে ইসলামী পূনর্জাগরণের পথে সর্বপ্রধান বাধা ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। ইব্ন্ তাইমিয়া, ইব্ন্ ক্বাইয়েম্ ও ইব্ন্ ওয়াহাব এর সুন্নীবাদের মোল্লা উমর ও বিন্ লাদেন এক ব্যুহ রচনা করে আছে। আরেক ব্যুহ রচনা করে আছে কথিত আলী ইব্ন্ আবি তালিবের শিয়াবাদী খোমেনী খামেনীরা। এদের সাদা কালো পাগড়ীর প্যাঁচে ক্বোরেশী বারো খলিফা ও বারো ইমামের সাপ কুন্ডলী বেধে ফনা তুলে আছে। এ দু'সাপের ফনা কাটার তরবারী রাসূল সঃ এর মুস্তাদআফ উসামাহ্র একক, অবিভক্ত ও ঐক্যের ইমামত ব্যতিত অন্য কিছু নেই। এক দুর্বোধ্য সন্দেহজনক আরব মুস্তাকবির উসামা বিন লাদেনকে দাঁড় করিয়ে আমার বিশ্বাস ইব্লিস খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর মনোনীত উস্ওয়ায়ে হাসানার উসামাহ্ ইব্ন্ যায়দের পথ রোধকরে আছে। যেমন ক্বেয়ামতের পূর্বে প্রকৃত মাহদী ও মাসীহের আবির্ভাবের পূর্বে মিথ্যা মাহদী ও মসীহুদ্দাজ্জালদের শয়তান সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য দাঁড় করাবে। অনারব বিশ্বের, বিশেষ করে উপ মহাদেশের মাটি থেকে শিয়া-সুন্নী ফের্ক্বা থেকে তওবাতুন্ নাসূহা করা খাঁটি কোনো আন্দোলন শুরু হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও য়াক্বীন যে সপ্তআকাশ, বায়ুমন্ডল ও ধরার মাটি আল্লাহ্র নির্দেশে আল্লাহ্র অদৃশ্য সৈনিক হয়ে সে ক্বাফেলাকে ঐ রূপ সাহায্য করবে, যেরূপ আল্লাহ্র অদৃশ্য সৈনিক তাঁর রাসূল সঃকে সওর গুহায়, হুদাইবিয়াতে ও হুনাইনে সাহায্য করেছিলো। এটাই আল্লাহ্র ওয়াদা ও অঙ্গীকার। আল্লাহ্ কখনো তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। যদি ওয়াদাকৃত সাহায্য না আসে তা হলে বুঝতে হবে যে, জামাত ও ক্বাফেলায় ত্রুটি আছে।
এবার সংক্ষেপে রাসূল সঃ এর কয়েকজন মুস্তাদআফ্ অনুসারীর পরিচয় তুলে ধরছি। যাতে পাঠকজন এদের ও ক্বোরেশী মুস্তাকবির চরিত্রের গুণগত পার্থক্য আঁচ ও অনুমান করতে পারে। বেলাল ও যায়দ সম্পর্কে যেহেতু এ বইতে মোটামুটি ইংগীত দেয়া আছে, তাই এখন আম্মার, ইব্ন্ মাস্উদ ও সালমান এবং শেষে উসামাহ্ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

আম্মার ইব্ন্ ইয়াসির

তার আসল নাম আবুল ইয়াক্বযান আম্মার ইব্ন্ ইয়াসির ইবন আমের। মূলে তারা ইয়ামেন থেকে আগত মক্কায় বসবাসকারী। মক্কায় বনু মাখ্যুমের সাথে তারা চুক্তির বাঁধনে মক্কার নাগরিক ছিলো। নামেই বুঝা যায় সম্ভ্রান্ত লোক ছিলো। কারো নামের সাথে উয্যার দাস, লাতের দাস বা মানাতের দাস নেই। যেমন ক্বোরেশীদের অধিকাংশের নামের সাথেই প্রত্যক্ষ শির্ক ছিলো। বনু মাখযুম আবু জেহলের গোত্র। মক্কায় কা'বার নগরীতে বিশেষ করে কা'বার চত্বরে ক্বোরেশীদের শির্কীপুজা ও দেব-দেবীর অর্চনাকে ইয়াসির পরিবার পছন্দ করেনি। তাই রাসূল সঃ এর আবির্ভাব হতেই ইবন্ ইয়াসিরের গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। পিতা ইয়াসির, মা সুমাইয়া বিন্ত খাইয়াত এবং তার ভাইও। তারপর শুরু হয় গোটা পরিবারের উপর নারকীয় অত্যাচার। আবু জেহল স্বয়ং তার দল বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইয়াসির পরিবারের উপর। যেহেতু ইয়াসির পরিবার বনু মাখযুম যা আবু জেহেলের গোত্র, তার সাথে আবদ্ধ ছিলো, তাই ইয়াসির পরিবারের ইসলাম গ্রহণ মককার কুফরের রাজা আবু জেহেলের জন্য অসহনীয় ছিলো।
আবু জেহেল সদলবলে পালা ক্রমে আম্মার, তার ভাই, তার পিতা ও মাতার উপর চাবুক মেরে জর্জরিত করে উত্তপ্ত মরু বালুতে ফেলে বলেছে "মুহাম্মাদ ও তার ধর্ম ত্যাগ করে বল যে লাত, মানাত ও হুবল উত্তম"। ইয়াসির পরিবার আবু জেহেলের পৈশাচিক অত্যাচারেও অটুট থাকায় আম্মারের ভাই, পিতা ও মাতাকে হত্যা করে। বর্ণিত আছে যে আম্মারের মাকে আবু জেহেল তার যৌনাঙ্গে বর্শা ঢুকিয়ে নাড়ি ভুড়ি বিদীর্ণ করে হত্যা করেছে। আম্মারের মা সুমাইয়া বিন্ত খাইয়াত ইসলামের প্রথম শহীদ। তারপর পর পর তার পিতা ও ভাই শহীদ। তাদের উলঙ্গ করে অত্যাচারের সংবাদ শুনে রাসূল সঃ বলেন, صبرا يا آل ياسر، إن موعدكم الجنة
"হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্য্য ধারণ করো, তোমাদের গোটা পরিবারের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।"
আম্মার পাশে তাকিয়ে দেখেছে একে একে তার ভাই, মা ও পিতার মৃত্যু। তারপর আবু জেহল তার পিতা-মাতা ও ভাইয়ের নিথর মৃতদেহ দেখিয়ে বলেছে, "দেখ তোর মা বাপ ও ভাইর দশা। এবার তোর পালা। বল লাত, মানাত ও হুবল উত্তম।" তাতেও আম্মার ঈমানের উপর দৃঢ় রয়ে যায়। তা দেখে রোষে আবু জেহল পুনঃ আম্মারের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। এক পর্যায়ে আম্মার হুশ হারিয়ে ফেলে। তখন আবু জেহল তার বুকে পা দিয়ে বলে এবার বল যে, লাত মানাত উত্তম। আম্মার সে অবস্থায় কি বলে তার হুশ নেই। আবু জেহল তাকে ফেলে গেলে পরে জ্ঞান

ফেরত আসলে মা বাবা ও ভাইর মৃত দেহ দেখে কোনো প্রকারে রাসূল সঃ এর কাছে পৌছায়। তার কোনো আশ্রয় ছিলোনা। কারণ, গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করায় আবু জেহল আম্মারদের বাড়ী ভিটায় অগ্নি সংযোগ করে তা ছাই করে দেয়। বেহুশ অবস্থায় কী বলেছে তা নিয়ে আম্মারের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হলে আম্মার রাসূল সঃকে তা বলে। সঙ্গে সঙ্গে অহী মারফত আল্লাহ্ জানিয়ে দেন যে, সে অবস্থায় কিছু বললে তা আল্লাহ্র দরবারে ধর্তব্য নয়। (সূরা-নাহল-১০৬)

গোটা পরিবার কোরবানী করে আম্মার পরিবার ইসলামের ভিত রচনা করে। প্রাণে বেঁচে সুস্থ হলে রাসূল সঃ এর নির্দেশে আম্মার হিজরত করে আবিসিনিয়া চলে যায়। পরে রাসূল সঃ মাদীনা হিজরত কালে আম্মার ক্বোবায় রাসূল সঃ এর সাথে মিলিত হয়। ক্বোবায় পাথর সংগ্রহ করে আম্মার রাসূল সঃ কে মক্কায় কাবা ত্যাগ করে যাওয়ার দুঃখ মোচনের জন্য মস্‌জিদ তৈরীর প্রস্তাব করে। রাসূল সঃ আম্মারের সাথে একমত হয়ে সেখানে মসজিদের ভিত রাখেন। এভাবে আম্মার শেষ নবী সঃ এর রিসালাতের সর্ব প্রথম মসজিদ নির্মাতা। (দেখো, সিরাতে ইবন্ হিশাম) মাদীনায় মসজিদে নববী নির্মিত হওয়ার পূর্বে মসজিদে ক্বোবা নির্মিত হয়। মসজিদে ক্বোবার নির্মাতা আম্মার।

ক্বোবা থেকে রাসূল সঃ মাদীনা পৌছুলে ক'দিন পর তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আরম্ভ করেন। তাতে আম্মার আলীর রচিত কবিতা পাঠ করে পাথর বহন করে আনছিলো। এক পর্যায়ে কোনো এক নাক উচু মুস্তাকবির আম্মারের বিরামহীন কবিতাপাঠে বিরক্তি প্রকাশ করে আম্মারকে চুপ করতে নির্দেশ দেয়। আম্মার তাতে কর্ণপাত না করলে সে নাক উচা আম্মারকে মন্দকথা বলে। তা শুনে রাসূল সঃ বলেন "তোমরা কে আম্মারকে মন্দ বলেছো? তোমরা কি জানো যে আম্মার কে? জেনে রাখো যে, আম্মার আল্লাহ্র রাসূলের দু'চোখের মধ্যস্থিত মাংস ও চর্ম।"

বহুদিন ধরে মাদীনায় মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছিলো। একদিন দেখা গেলো যে কামচোর লোকেরা আম্মারকে দিয়ে তার বহন ক্ষমতার অধিক পাথর টানাচ্ছে। তা দেখে রাসূল সঃ বলেন, একি, তুমি এতো বেশী পাথর বহন করছো? আম্মার বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সবাই আমার দ্বারা বেশী পাথর টানাচ্ছে। রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীন তা দেখে নিজ হাতে আম্মারের ঘাড় থেকে পাথর নামান, এবং নিজ বরকতময় হাত দিয়ে আম্মারের দেহের ধুলা মুছে দেন। কথা প্রসঙ্গে আম্মার বলে, ইয়া রাসূল! ওরা আমাকে দিয়ে অতিরিক্ত বোঝা টানিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে। রাসূল সঃ বলেন "এরা কেউ তোমাকে মারবেনা। তোমাকে মারবে বিদ্রোহী বিপথ গামীরা।" تقتلك الفئة الباغية রাসূল সঃ এর এ উক্তি ও ভবিষ্যদ্বাণীটি এতো প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, মাদীনার প্রত্যেক মুহাজির ও আনসারের মুখে মুখে এর বহুল প্রচার হয়। পরে আম্মার যখন মুয়াবিয়ার সৈন্যদের হাতে শাহাদাত বরণ করে, তখন মুয়াবিয়ার দলের লোকেরা তার সংবাদ পেয়ে চমকে যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, তারাই রাসূল সঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপথগামী বিদ্রোহী।

আম্মার ইবন ইয়াসির বদর সহ সকল যুদ্ধে রাসূল সঃ এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছে। যোদ্ধা হিসেবে আম্মার ইবন ইয়াসির নির্ভীক শানিত তরবারী ছিলো। ক্বোরেশী পরবর্তী খলিফাদের মতো আম্মারের ময়দান ছেড়ে পালানোর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় আম্মারের কোনো আচরণের বিরুদ্ধে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। যেমনটি প্রথম দু' খলিফার আচরণের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে। রাসূল সঃ এর কোনো নির্দেশ পালনে ক্রুটি করেছে এমন কোনো ঘটনাও ঘটেনি। বরং রাসূল সঃ কে ক্বোরেশী মুশ্‌রিক নেতাদের ইচ্ছানুযায়ী যে মুস্‌দ্রাদআফ্‌দের সাময়িক ভাবে দরবার থেকে উঠে যেতে বলার পর রাসূল সঃ কে তিরস্কার করা হয়েছে, আম্মার তাদের অন্যতম। দশজন ক্বোরেশীকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলার সত্যতা যেমন বিতর্কিত, তেমন গোটা আম্মার পরিবারের বেহেশতের সুসংবাদের সত্যতায় কোনো দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। রাসূল সঃ যাদের উপর সম্পূর্ণ তুষ্ট রূপে মৃত্যু বরণ করেন, আম্মার ইবন্ ইয়াসির সে সৌভাগ্যবানদের একজন।

রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর ইন্তেকালের পরক্ষণই আবু বকর আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ বলে যে বিতর্কের সৃষ্টি করে, তাতে অন্যান্য মুস্তাদআফদের ন্যায় আম্মারও জড়ায়নি। রাসূল সঃ কর্তৃক উসামাহ্র নিয়োগকে মেনে আম্মার, বেলাল ও ইবন্ মাসউদদের সাথে উসামাহর অভিযানে শরিক হয়। সেখান থেকে ফেরত আসার পর আবু বকরের আমলে ঈমানী দায়িত্ব পালনে মুর্তাদদের দমনের প্রত্যেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। মুসাইলামার যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন খালিদ ইবন্ ওয়ালিদ ও তার সৈন্যরা পলায়নপর হয়েছিলো, তখন আম্মার এক টিলার উপর পলায়নপরদের ডেকে বলেছে, "পালাচ্ছো কেনো শাহাদাত ও জান্নাত থেকে, দেখো আমরা এভাবে রাসূল সঃ এর সঙ্গি হয়ে লড়েছি।" তারপর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের উপর। তা দেখে বহু লোক ফেরত এসে ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মারের

সাথে যোগ দেয়। এ ঘটনা এক প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা বিরল ঘটনা রূপে জনমুখে বর্ণিত হতো।

আবু বকর ও উমরের আমলে বাইতুল মাল থেকে যে ভাতা দেয়া হতো, তাতে রাসূল সঃ এর প্রিয়জনদের তালিকায় আম্মারও অন্তর্ভূক্ত ছিলো। আবু বকরের আমলে যদিও আনসারদের মতো মুস্তাদআফ্‌দেরও কোনো সরকারী দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়নি, কিন্তু উমরের আমলে আম্মারকে কুফার শাসক নিযুক্ত করা হয়।

উমরের পর ওসমান খলিফা হলে তার ছত্রছায়ায় উমাইয়া দুষ্টচক্র মুসলিম উম্মার শাসন ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ করলে মুস্তাদআফ্‌দের উপর যে দুর্যোগ আরম্ভ হয়, আম্মার তার প্রথম শিকার। ইসলামে সজ্জন প্রীতি ফরজ, স্বজনপ্রীতি হারাম। আত্মীয়তা বৈধ, রক্তীয়তা নিষিদ্ধ। ওসমানের আমলে অন্যায় স্বজনপ্রীতি আরম্ভ হলে তার কুফলে তার শাসনের শেষ আমলে সর্বদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। আবু যার সঠিক প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওসমানের রোষের শিকার হয়ে নির্বাসিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

ওসমানের কুশাসনের ফলে যখন অবস্থা চরম নৈরাজ্যের রূপ নেয়, তখন মাদীনায় আলী, তালহা ও যুবাইর প্রভৃতি প্রথম সারির লোকেরা অবস্থা সংশোধনের জন্য ওসমানকে লিখিতভাবে উত্তম কিছু পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়। ওসমানের প্রধানমন্ত্রী মারওয়ানের চক্র ওসমানকে এমন অবিবেচক ও সংশোধনের অযোগ্য করে ফেলে যে লিখিত উপদেশ পত্র নিয়ে ওসমানকে হস্তান্তর করতে কেউ ভরসা পায়নি। তাদের মত ছিলো যে, এ সতোপদেশ উসমান শুনবেনা এবং তা কার্যকরও করবেনা। বরং তাতে ওসমানের সাথে তাদের শত্রুতা আরো বাড়বে বৈ কমবে না। তাই তারা কেউ তা নিয়ে ওসমানের কাছে যেতে রাজি হয়নি। কিন্তু আম্মার সকল বিপদের সম্ভাবনা উপেক্ষা করে তা নিয়ে ওসমানের হাতে দিয়েছিলো। তাতে মুয়াবিয়া, মারওয়ান, ওয়ালিদ ও ইবন সারাহদের পদচ্যুত করে তাদের স্থলে সজ্জনদের নিযুক্তির উপদেশ ছিলো। মিক্‌দাদের মতো লোকেরাও যেখানে ওসমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়েছিলো, সেখানে ইসলাম ও ওসমানের শুভাকাঙ্খী রূপে ভরসায় বুক বেঁধে আম্মার গিয়েছিলো।

উসমান পত্র পড়েই চটে গিয়ে আম্মারকে জিজ্ঞাসা করে, "এ পত্রলেখায় তোমার সাথে আর কে কে ছিলো?" আম্মার তাদের নাম বললো। ওসমান বললো, "তারা আসেনি কেনো?" উত্তরে আম্মার বললো, "তারা তোমার দ্বারা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের আশংকা বেশী করে, তাই আসেনি।" ওসমান আবার প্রশ্ন করে, "তুমি আসলে কেনো?" আম্মার শান্তভাবে বললো, "আমি তোমার শুভাকাঙ্খী বিধায় তোমার অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের আশা করে এসেছি।"

এখানে পাঠকের স্মরণ রাখতে হবে যে, আম্মার বয়সে উসমানের প্রায় দশ বছরের বড়ো। ইসলাম গ্রহণ, ত্যাগ ও জিহাদে ওসমানের অনেক উপরে ছিলো আম্মার। গুণগত ভাবে আম্মারের সাথে ওসমানের কোনো তুলনাই হয়না। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! ওসমান মুস্তাকবির দন্ডমুন্ডের মালিক এবং ইসলাম গ্রহণের পরও রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর আম্মার আজ ওসমানের দৃষ্টিতে এক তুচ্ছ মুস্তাদআফ।

ওসমানের সাথে কথোপকথনের মধ্যেই মারওয়ান বলে উঠে, "আমীরুল মু'মিনীন! এ কালো দাসের বেটা দাসের এতো সাহস যে অন্যান্যরা যেখানে সাহস পায়নি সেখানে সে এসেছে, আপনি তাকে কৃতল করে প্রাসাদের বাইরে ফেলে দিন, তা হলে ওর পেছনের লোকদের শিক্ষা হবে। তারা আর আপনার বিরোধিতা করতে সাহস পাবেনা।" উল্লেখ্য যে ওসমান তার আমলে মাদীনায় তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের জন্য যী-খাশাবে সাতটি প্রাসাদ তৈরী করেছিলো। (দেখো, আল্‌ ইমামাহ্‌ ওয়াস্‌ সিয়াসাহ্‌, প্রথম খন্ড, ওসমান অধ্যায়)।

মারওয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ওসমান আম্মারকে তরবারি দিয়ে দু'টুকরা করলোনা ঠিক, কিন্তু মেরে বেহুশ করে প্রাসাদের ফটকের বাইরে নিক্ষেপ করে। মা উম্মে সালমা সংবাদ পেয়ে নিজে এসে আম্মারকে তুলে তার ঘরে নিয়ে যায়। এ হলো আমাদের দেশে খুতবায় প্রত্যেক জুমায় নাম নেয়া লাজুক ওসমানের লজ্জার পরিমাপ। (দেখো, আল ইমামাহ্‌ ওয়াস্‌ সিয়াসাহ্‌, ইবন ক্বোতাইবা, প্রথম খন্ড ৩৫, ৩৬ পৃষ্ঠা)

কাফের মুশরিক আবু জেহেলদের পর ইসলামী আবু জেহেলদের(?) হাতে মুস্তাদআফ্‌দের উপর অত্যাচার আরো নির্লজ্জ ও নৃশংস ছিলো। কারণ, পূর্বের আবু জেহ্‌লরা কুফরের অবস্থানে থেকে ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা প্রকাশ করেছে। আর এ নব্য আবু জেহলরা ইসলামের নামাবলী পরে তাদের পূর্ব পুরুষদের কুফরকে ইসলামের নামে চালিয়ে সত্যিকারের ইসলামীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। মারওয়ানের কথায় ওসমান আম্মারের উপর হাত তুলে যে অত্যাচার করেছে, তা যদি সে রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় করতো, তা হলে কি ওসমানের ঘাড়ে মাথা থাকতো? কখনো না।

হাসান বস্‌রী বলেছে “যে বয়সে আমি সবে মাত্র বালেগ হয়েছি, তখন মাদীনায় এসে দেখি যে ওসমান সকাল সন্ধা নামাজের পর মানুষকে ডাকছে, এসো, বেশী বেশী ঘী খাও, মধু খাও।” কারণ, চারদিক সাম্রাজ্য বিস্তার করে হাভাতে আরবরা লুটপাট করে সম্পদ জড়ো করে তার ভোগে লিপ্ত হয়ে সকল বিবেকবুদ্ধি হারিয়েছিলো। পরে এদের দস্তরখানের থালাবাটি চাটাদের মুহাদ্দিস মুফাস্‌সির নাম দিয়ে বিদ্‌আতী পন্থায় কারো নামের সাথে সিদ্দীকে আকবর, কারো নামে ফারুক্বে আযম ও কারো নামে গণী ও যিন্নুরাইন লাগিয়ে পরবর্তী মানুষের মনে তাদের ব্যক্তি পূজার মূর্তি বানিয়েছে।

আবু যার, আম্মার ও ইবন মাসউদরা এদের ভোগ বিলাসে বাধা দেয়ায় সকল রোষ পড়েছে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রিয় মুস্তাদআফদের উপর। ওসমান যখন আবু যারকে নির্বাসনে পাঠায়, তখন তার প্রতিবাদ করায় ওসমান আম্মারকেও নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছিলো। আলী ও অন্যান্যরা হস্তক্ষেপ করে আম্মারকে ওসমানের নির্বাসন থেকে রক্ষা করে।

ওসমান তার কৃতকর্মে নিহত হলে আলী খলিফা হয়। কিন্তু আলীর খেলাফত সঠিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেমনটি পূর্বে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলী তার খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আম্মার ইবন ইয়াসির, মা আয়শা, মারওয়ান ও মুয়াবিয়া চক্রের বিরুদ্ধে আলীকে সমর্থন করে। আম্মার আলীর সঙ্গী হয়ে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। তখন আম্মারের বয়স ৯৩ বা তদোর্ধ। সে বয়সেও ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাতে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে আম্মার শাহাদাত বরণ করে তার শহীদ ভাই, পিতা ও মাতার সাথে মিলিত হয়। আম্মার মুয়াবিয়া সমর্থকদের হাতে শাহাদাত বরণ করে রাসূল সঃ এর সর্বজ্ঞাত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুয়াবিয়া ও তার দলকে বিপথগামী বিদ্রোহীর সীল মোহর লাগিয়ে জাহান্নামের সনদ নিশ্চিত করে।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ

তার পূর্ণ নাম আবু আবদুর রহমান আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্ মাসউদ ইবন্ গাফিল হাবীব আল হুযালী। তার পিতা মক্কায় বনু যাহ্‌রার মিত্র ছিলো। এ ছোটো খাটো মানুষটি ইসলামের একটি জীবন্ত মোজেযা। রাসূল সঃ যেমন ছোটোবেলায় মেষ পালক ছিলেন, ইব্‌ন্ মাসউদও তেমন মেষ চরাতো। একদিন রাসূল সঃ পিপাসার্ত হয়ে ইবন মাসউদের মেষের পালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো ইবন্ মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করেনি। সবেমাত্র রাসূল সঃ রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূল সঃ নাকি ইবন মাসউদকে বলেছিলেন একটি বকরী দোহন করে তাঁকে দুধ পান করাতে। তার উত্তরে ইবন মাসউদ বলেছিলো, আমি মেষ পালক মাত্র। মেষের মালিক নই। তাই অন্যের হক খেয়ানত করে সে দুধপান করাতে পারবে না। রাসূল সঃ ইব্‌ন্ মাসউদের আমানতদারীতে খুশী হয়েছিলেন। তারপর রাসূল সঃ বলেছিলেন যে যদি তিনি একটি বকনা, যা এখনো বাচ্চা দেয়নি তা দোহন করে তার দুধ পান করেন তার তাতে আপত্তি আছে কিনা। উত্তরে ইবন্ মাসউদ বলেছিলো যে তাতে তার কোনো আপত্তি নেই। তার ধারণা ছিলো যে, যে বকরী এখনো বাচ্চা দেয়নি, তার তো দুধ দেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা!

রাসূল সঃ তাকে একটি বকনা বকরী দেখিয়ে দিতে বললে ইবন্ মাসউদ ইংগীত করে তা দেখিয়ে দেয়। রাসূল সঃ তাঁর হাতে বকনাটির বান স্পর্শ করলে তা দুধে ভরে যায়। রাসূল সঃ তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং ইবন মাস্‌উদকে পান করান। এভাবে এক পুরাতন রাখালের সাথে আরেক রাখালের পরিচয় ঘটে। পুরাতন রাখাল পশু পালন করে বিশ্বের মানুষের রাখালীর রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর সাথে এ ক্ষুদে রাখালও যোগ দিতে যাচ্ছে মানুষের রাখালীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে।

ইব্‌নে মাসউদ একদিন রাসূল সঃ এর সংস্পর্শে গিয়ে ক্বোরআন তেলাওয়াত শুনে তার অর্থমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। ক্বোরআন শুনে যেহেতু তার ইসলাম গ্রহণ, তাই আল্লাহ্ তাকে ক্বোরআনের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। ইবন্ মাসউদের বর্ণনা মতে সে প্রথম সাত নং ঈমানআনা ব্যক্তি। তার পূর্বে কেউ ক্বোরআন প্রকাশ্যে পাঠ করে মক্কার ক্বোরেশদের শোনায়নি। ইব্‌ন মাসউদ সর্বপ্রথম কা'বায় প্রকাশ্যে ক্বোরআন তেলাওয়াতের সিদ্ধান্ত নিয়ে মাক্বামে ইব্রাহীমে দাঁড়ায়। বিস্‌মিল্লাহ বলে সূরা আর রাহমান পড়া আরম্ভ করে। পঠন সৌন্দর্য্য ও অর্থের সম্মোহনে ক্বোরেশরা ইবন্ মাসউদের চারপাশে ভীড় জমায়। পরে তারা ইবন মাসউদ্‌কে জিজ্ঞাসা করে যে, সে যা পাঠ করেছে, তা কী ও সে তা কোথা পেয়েছে। ইব্‌নে মাসউদ নির্ভয়ে জানায় যে এ হলো ক্বোরআন, যা মুহাম্মাদ সঃ এর উপর নাযিল হয়েছে। আর যায় কোথায়! হিংস্র ক্বোরেশীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ইবন মাসউদের উপর। রক্তাক্ত করে

দেয় তাকে মেরে। আবু জেহ্ল এ পাশবিক কাজে নেতৃত্ব দেয়। তারপর থেকে ইব্ন মাসউদ ক্বোরেশ, তথা মক্কার কাফের মুশরিকদের চেনাশত্রু এবং তারা ইব্নে মাসউদের আল্লাহ্, তাঁর রাসুল ও ইসলামের শত্রু। শুরু হয় ইব্নে মাসউদের উপর অত্যাচার। পথে ঘাটে পেলেই তাকে অত্যাচারের শিকার হতে হয়। রাসূল সঃ এর নির্দেশে ইব্নে মাসউদ হিজরত করে প্রথমে আবিসিনিয়া ও পরে মদীনা যায়।

তবে ইব্নে মাসউদের মাদীনা হিজরতের একটি দুঃসাহসিক মজার ঘটনা আছে। ইবন মাসউদ এতো ছোট খাটো মানুষ ছিলো যে, তাকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করতো। একদিন রাসূল সঃ তাকে নিমের ডাল ভাংতে নিম গাছে চড়তে বলেন। উমর ইব্নে মাসউদের শুকনো সরু পায়ের নালা লক্ষ্য করে বলে, নামো, আমি তোমার পায়ের নালা দিয়েই মিস্ওয়াক করবো। তা শুনে রাসূল সঃ উমরকে বললেন, "কি বললে? তুমি ইব্নে মাসউদের চিকন পা দেখে ঠাট্টা করছো? আল্লাহ্র কসম, ক্বেয়ামতের দিন এ ইব্নে মাসউদের এক একটি সরু পা পাল্লায় উহুদ পর্বতের ন্যায় ভারী হবে।" সুব্হানাল্লাহ্।

ইব্নে মাসউদ হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখছে যে, কোথাও সে আবু জেহলকে একা পায় কিনা। আবু জেহ্ল এক বিরাট বপু। এক মানুষ হাতি। ক্ষুদে ইব্নে মাসউদ তাকে পেলে কী করবে? তা তার মনেই লুকানো ছিলো। একদিন সে দেখতে পেলো যে, বিরাট বপু আবু জেহ্ল কা'বার চত্বরে শুয়ে আছে, এবং সে একা। মওকা পেয়ে চুপি চুপি পেছন দিয়ে ইব্নে মাসউদ আবু জেহ্লের গালে সর্বশক্তি দিয়ে এক চড় ও পাছায় দু'লাথি মেরে দে দৌড়। হতভম্ভ আবু জেহ্ল বুঝতে পেরে চিৎকার আরম্ভ করলো, তোরা কে কোথায় আছিস্। ধর ইবন্ মাসউদকে। সে আমাকে চড় ও লাথি মেরে ঐ পালাচ্ছে। ইবন্ মাসউদকে আর কে পায়! বাতাসের বেগে দৌড়ে ইবন্ মাসউদ পগার পার।

এভাবে এ ছোট্ট মানুষটি ক্বোরআন শুনে তাকে ও আল্লাহ্র দ্বীনকে অবমাননার প্রথম প্রতিশোধ নিয়ে মাদীনায় পৌছায়। তারপর বদরের যুদ্ধে আবু জেহ্ল আহত হলে তাকে ফেলে তার বুকে চড়ে তার মাথা কেটে রাসূল সঃ এর সামনে হাজির করে। বদর থেকে আরম্ভ করে সকল যুদ্ধে রাসূল সঃ এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে। সার্বক্ষণিক রাসূল সঃ এর সাথে ছায়ার মতো থাকতো। হুজুর সঃ এর জুতা সেন্ডেল বহন করতো এবং উযুর পানি ঢেলে উযু করাতো। অহী নাযিল হতেই যতটুকু ক্বোরআন নাযিল হতো সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে ফেলতো। ক্বোরআনের চলমান টেপরেকর্ডার ছিলো। তাই রাসূল সঃ বলেছেন, "তোমরা আমার পর ইবন মাসউদ্ থেকে ক্বোরআন গ্রহণ করবে।" এ গুণ ও মর্যাদা পরবর্তী কোনো খলিফা বা তথাকথিত ক্বোরেশী আশারায়ে মুবাশ্শারা, বা ক্বোরেশী বারো খলিফা ও ইমাম কারো কপালে জুটেনি।

আল্লাহ্র রাসূল সঃ এদের উপর এভাবে সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নেন। এবং তাঁর বংশ ও রক্তের দাবিদারদের আচার আচরণে উদ্বিগ্ন হয়ে দুঃশ্চিন্তা নিয়ে যান। রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর আবু বকর ও উমরের আমলে ইবন্ মাসউদ, আম্মার, বিলাল ও সালমানদের মতো নিরোপদ্রবে জীবন কাটায়। বরং উমর ইবন আল খাত্তাবের খেলাফত আমলে ইবন মাসউদ আম্মারের সাথে নবদীক্ষিত লোকদের ইসলামী শিক্ষাদানের দায়িত্বে ইরাকে নিযুক্তি পায়। আম্মার সেখানে গভর্ণর হয় এবং ইবন মাসউদ কোরআন ও দ্বীনের প্রধান শিক্ষক ও বাইতুল মালের হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। উমরের দশ বছর ইবন মাসউদ ইরাকে দ্বীনের শিক্ষক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সবার শ্রদ্ধারপাত্র হয়।

কিন্তু ওসমানের আমলে আম্মারের মতো ইবন্ মাসউদের উপরও সে মক্কার নব্য আবু জেহলদের অত্যাচার ও নিপীড়ণ নেমে আসে। প্রথমে ওসমান রাসূল সঃ এর অভিশপ্ত "সাবিইয়্যাতুন নার" অর্থাৎ জাহান্নামের সন্তান ওয়ালীদ ইবন্ উক্ববাকে ইরাকের আমীর করে পাঠালে সে খবীস সেখানে মদ্যপান ও নাচ গানের আড্ডায় যাতায়াত আরম্ভ করে। বাইতুল মাল থেকে ধার নিয়ে তাতে ব্যয় করে। তা আর কখনো পরিশোধ না করে আরো ধার নেয়। এ অবস্থায় সে আমীর বিধায় সালাতেরও ইমামতি করে। একবার মদ্যপান করে এসে ফজরের সালাত দু'রাকাতের জায়গায় তিন রাকাত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ায়। প্রতিবাদ করলে সে মাতাল বলে, "ক'রাকাত পড়তে চাও। এসো যতো রাকাত চাও পড়িয়ে দিবো!"

এ অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদকে খলিফার আনুগত্যে জীবন কাটাতে হয়। শেষ পর্যন্ত অসহনীয় হলে ওসমানের নিকট তার ভাইর অপসারণ দাবি করে ইরাকবাসীর সাথে। উত্তরে ওসমান, ইবন মাসউদকে লিখে জানায়, "তুমি শুধু বাইতুল মালের হিসাব রক্ষক। আমীরের ব্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।"

এ জাহেলী নির্দেশ পেয়ে আল্লাহ্র রাসূলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্বোরআনের অদ্বিতীয় শিক্ষক ও দ্বীনি শিক্ষার প্রথম ফক্বীহ্

www.facebook.com/ehsanal.maruf

ইবন মাসউদ ওসমানকে লিখে পাঠায়, “এতোদিন জানতাম যে আমি মুসলিম উম্মাহর বাইতুল মালের হেফাজতকারী, এখন জানলাম যে আমি তোমার ভাইর একজন হিসাব রক্ষক মাত্র। এ কাজের জন্য আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গী হইনি এবং রাসূল সঃও আমাকে সে শিক্ষা দিয়ে যাননি। তাই আমি তোমার ও তোমার ভাইর ব্যক্তিগত কর্মচারীর চাকুরী ত্যাগ করলাম”। এ পত্র লিখে আল্লাহ্‌র রাসূলের সার্বক্ষণিক ছায়াসম সঙ্গী ইবন্ মাসউদ বাইতুল মালের চাবি ওসমানের মাতাল মদ্যপ ভাইকে হস্তান্তর করে মানুষকে রাসূল সঃ এর শিক্ষা দানে ব্রতী হয়।

কিন্তু ওসমান তার ভাইর পরামর্শে ইবন মাসউদকে সে কাজ করতেও ইরাকে থাকতে দেয়নি। তাকে মাদীনায় ফেরত চলে আসতে ফরমান জারী করে। ইরাকবাসী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদকে ইরাক ত্যাগ করতে নিষেধ করে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, “আপনি যাবেন না। গেলে আমাদের আশঙ্কা যে, আপনার নিরাপত্তার বিপদ দেখা দিবে। আমাদের জানা মতে ওসমান বর্তমানে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ব্যক্তি। তাই আপনি আমাদের মাঝে থেকেই যান। আমরা আপনার নিরাপত্তা বিধান করবো।”

রাসূলের শিক্ষাপ্রাপ্ত ইব্‌ন মাসউদ তার জীবনের উপর ঝুঁকি দেখেও বললো যে, যেহেতু আমি খলিফার হাতে বায়আত হয়েছি, তাই তার প্রতি আমার আনুগত্য ফরজ। আমি আমার ফরজ পালনে যাচ্ছি। ওসমান অন্যায় করলে সে জন্য সে আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। এ বলে রাসুলের ছায়া মাদীনা এসে পৌছায়। তার মাদীনা পৌছার মুহূর্তে ওসমান মসজিদে নববীতে তার শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রতিবাদীদের সামনে কৈফিয়ত পেশ করছিলো। সে অবস্থায় ইবন মাসউদের আগমনে সমবেত জনতা ইবন মাসউদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ তারা ইবন মাসউদের ব্যাপারটিও জানতো। ওসমান তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেছে, يأتيكم دويبة السوء، يقئ ثم يأكل “ঐ এসেছে ছোট কুকুরটা, বমি করে তারপর খায়।” ইব্‌ন্ মাসউদ আকারে ছোটখাটো বলে সে ছোট কুকুর। কোনো এক যুদ্ধে শত্রুর তরবারির আঘাতে ইব্‌ন্ মাস্‌উদের মাড়ির একদিক কেটে যাওয়ায় খাওয়ার সময় মুখ থেকে খাদ্য পড়ে যেতো। তা সে পুনঃ তুলে খেতো বলে ওসমান গণীর (?) দৃষ্টিতে তা কুকুরের বমি করে খাওয়ার তুল্য!

ইব্‌ন মাসউদের মতো রাসূল সঃ এর প্রিয় সঙ্গীকে এ ভাষায় গালি দেয়ায় মা আয়শা পার্শ্ববর্তী হুজরা থেকে ওসমানকে শাসিয়ে বলেছিলো, “হে উসমান! তোমার কি হয়েছে যে, তুমি রাসূলের প্রিয়সঙ্গী সম্পর্কে এ কটুক্তি করছো। তোমার কি লজ্জাশরম সব গিয়েছে”।

মা আয়শার সঠিক কথায় উসমান উত্তেজিত হয়ে পাল্টা তীর নিক্ষেপ করে মা আয়শার প্রতি এবং বলে উঠে, “তুমি থামো”। এ বলে ওসমান সূরা তাহরীমের সে আয়াতটি সবার সামনে পড়ে শোনায় যাতে মা আয়শা ও হাফসাকে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এ অনভিপ্রেত উত্তরে মা আয়শাও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ফেলে, “নাসালাকে হত্যা করো সে কাফের হয়ে গিয়েছে।” এক বিশ্রী উত্তেজনার মধ্যে ওসমান নিজে হাত তোলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন্ মাসউদের উপর। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে তার অন্ডকোষে ওসমান লাথি মারে এবং পরে তার সন্ত্রাসীদের তার উপর লেলিয়ে দেয়। গণপিটুনীতে ইব্‌ন্ মাসউদ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে মসজিদে নববীর বাইরে মৃতবত ফেলা হয়। সেখান থেকে মা উম্মে সাল্‌মা ইব্‌ন্ মাসউদকে তার ঘরে তুলে নেয়। সে নিপীড়নে মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে রাসূল সঃ এর প্রিয়সঙ্গী এমন অসুস্থ হয় যে তা থেকে আর সুস্থ হয়নি। ওসমান বাইতুল মাল থেকে প্রাপ্য তার ও তার পরিবারের ভাতাও বন্ধ করে দেয়। সে দুঃখ কষ্টেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে যায় যে তার মৃত্যুর পর আম্মার ইবন ইয়াসির যেনো তার জানাযা পড়ে তার দাফন করে। তার মৃত্যু হলে তাই করা হয়। এ ভাবে সে বকরীপালা ক্ষুদ্র লোকটি তার বকরীপালা বিশ্বনবীর সঙ্গী হয়ে মক্কার আবু জেহেলের রাসূল সঃ ও ইসলামের শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়ে তাকে কা'বার চত্বরে চপেটাঘাত ও পরে বদরের যুদ্ধে তার বুকে চড়ে শিরোচ্ছেদ করেও উসমান ও মারওয়ানদের হাতে নিগৃহীত হয়ে প্রাণ দিয়ে আমাদের ঈমানের প্রশ্নপত্র রেখে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

www.facebook.com/eholo.islam

সালমান ফার্সী

সালমানের সাথে ফার্সী লিখতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তবুও তার ঘটনা সংক্ষেপে হলেও গভীর অর্থবহ করার জন্য তার পারস্যবাসী মূলের প্রতি ইংগিত করতে তা লিখলাম। সালমান কিন্তু কখনো তার নামের সাথে অন্য কোনো শব্দ যোগ করতো না। আরব বর্ণবাদীরা একবার তাকে তাদের রঙ্গে রঞ্জিত করতে জিজ্ঞাসা করেছিলো যে সালমান তোমার পূর্ণ নাম কি? উত্তরে সে কিংবদন্তীর আল্লাহ্‌র বান্দাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলো "আমি ইসলামের সন্তান সালমান! আমি ইসলামের সন্তান সালমান!! আমি ইসলামের সন্তান সালমান!!!" এর বাইরে বংশের, দেশের বা বর্ণের কোনো পরিচয় তার মুখ থেকে প্রশ্নকর্তা বের করতে সক্ষম হয়নি। সঠিক ঈমান অন্তরে প্রবেশ করলে কোনো মানুষ আর আরবী, আজমী, ইরানী বা হিন্দী হতে পারেনা। আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত হয়, যাকে আল্লাহ্ ক্বোরআনে সিবগাতুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র রং বলেছেন। এ রঙ্গেই নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ রা রঞ্জিত হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ সঃ নবী হওয়ার পর আর আরবী বা ক্বোরেশী ছিলেন না। শুধু আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহ্‌র দাস ও আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন ইব্রাহীম আঃ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না। আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীরা ইসলামে ঢুকেও গোত্ররোগ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি বলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র রং লাগেনি। কিন্তু যায়দ, বিলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহ্‌রা সে রোগমুক্ত হতে পেরেছিলো। সালমান তাদের জলন্ত প্রমাণ।

পারস্যের এক সমৃদ্ধ কৃষিজীবী পরিবারে সালমানের জন্ম। প্রচুর পাথেয় নিয়ে মহাসত্যের সন্ধানে সালমান গৃহত্যাগ করে। একাধিক ইয়াহুদী রাব্বাঈর আশ্রমে তাদের সংস্পর্শে বহুদিন একের পর এক কাটায়। ইয়াহুদীদের কাছে কাঙ্খিত সত্যের সন্ধান না পেয়ে পরে আবার একাধিক খৃষ্টান যাজকের পৌরোহিত্যের অধীনে বহু দেশে বিদেশে জীবন অতিবাহিত করে। শেষে এক যাজককে জিজ্ঞাসা করলে সে আল্লাহ্‌র বান্দা তার শিষ্য সালমানকে তার মৃত্যুর মুহুর্তে জানায় "চূড়ান্ত সত্যের শেষব্যক্তি আবির্ভূত হবেন আরবদেশের খেজুর বাগানে ঘেরা এক গাঁয়ে। তিনি মানুষের দানভিক্ষা খাবেন না। উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণ করবেন ও খাবেন। তিনি হবেন খাতামুন নাবিয়্যীন। যদি সম্ভব হয়, তা হলে তুমি তাঁর সন্ধানে বের হও।" দামেশকের আম্মুরিয়ায় সালমানের শেষ অবস্থান ছিলো। সেখানে সালমান কোনো সঠিক আরব ব্যবসায়ী ক্বাফেলার অপেক্ষা করছিলো। শেষ পর্যন্ত বনু কালবের এক আরব ব্যবসায়ী ক্বাফেলার সন্ধান পেলে সালমান তাদের বলে যে তারা যদি সালমানকে নিয়ে সে খেজুরবাগানে ঘেরা জনবসতিতে পৌঁছাতে পারে, তাহলে সে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার প্রদান করবে। আরবরা পয়সার লোভে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হলো বটে, কিন্তু তারা মধ্যপথে মরু স্বভারের বিশ্বাস ঘাতকতায় সালমানের সর্বস্ব লুটে নিয়ে যায় এক স্থানে। যার নাম ওয়াদিউল্ ক্বোরা। সেখানে জনৈক ইয়াহুদীর নিকট দাসরূপে সালমানকে বিক্রি করে দেয়। যেমনটি যায়দকে বিক্রি করেছিলো।

এবার সালমান সত্যের সন্ধানে এসে দাসদশায় পতিত হয়ে সে ইয়াহুদীর দাসত্ব আরম্ভ করে। তার কিছুদিন পর সে ইয়াহুদীর এক আত্মীয় বেড়াতে এসে তাকে ক্রয় করে ইয়াসরিবে নিয়ে আসে। এ ইয়াহুদী ব্যক্তি বনু ক্বোরায়যার লোক ছিলো। সে সালমানকে ইয়াসরিব নিয়ে আসলে সালমান সেখানে তার সর্বশেষ যাজকের বলা খেজুরের বাগান দেখতে পেয়ে দাসত্বের জীবনে সে এক অজানা তৃপ্তি অনুভব করে।

সালমানের ভাষায় ঃ

"তখন কিন্তু নবী সঃ এর আবির্ভাব ঘটেছে। তবে তা মাদীনায় নয়, মক্কায়। কিন্তু দাসত্বের বাঁধনে পড়া ছিলাম বলে আমি তাঁর সন্ধান করতে পারিনি। তার কিছুদিন পরই রাসুল সঃ হিজরত করে মাদীনায় পৌছান। একদিন আমি এক খেজুর গাছের মাথায় কর্মরত ছিলাম। তখন মনিব সে গাছের তলায় বসা ছিলো। ঠিক তখনই তার এক চাচা এসে বললো, "সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে! মাদীনার আউস্ ও খাযরাজরা ক্বোবায় মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চার পার্শ্বে ভীড় জমিয়েছে। সে নাকি বলেছে যে সে নবী!"

সালমান বলেছে যে সে তার মনিবের চাচার কথা শোনা মাত্রই যেনো তার সারা গায়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে জ্বরের তাপমাত্রা শেষ ডিগ্রীতে চড়েছে। তার মনে হচ্ছিলো যে সে তখনি গাছের চূড়া থেকে পড়ে যাবে। তাই তাড়াহুড়া করে গাছ থেকে নেমে এসে মনিবের চাচার পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, "আপনি একটু পূর্বে কী জানি বলছিলেন, তা কি আরেক বার আমাকে বলবেন।" একথা শোনা মাত্রই মনিব কষিয়ে আমাকে এক চড় মেরে বললো, "তোমার তা শুনে

কি কাজ, তুমি তোমার কাজ করো গিয়ে?" আমি থাপ্পড় খেয়ে পুনঃ আমার কাজে লাগলাম বটে, কিন্তু সর্বক্ষণ আমার মনে শোনা সংবাদ ঝড় তুলছিলো।

সন্ধ্যা হতেই আমার জমানো কিছু খেজুর নিয়ে ছুটলাম যেখানে রাসূল সঃ উঠেছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম যে আমি জানতে পেরেছি যে আপনি একজন সাধক। আমার কাছে কিছু খেজুর ছিলো, তা আমি আপনার জন্য সদ্ক্বা স্বরূপ নিয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে তো অনেক দরিদ্র ব্যক্তি রয়েছে। আপনি তা আপনার জন্য ও আপনার দরিদ্র সঙ্গীদের জন্য গ্রহণ করুন।

তিনি আমার কথা শুনে তা গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গীদের খেতে দিলেন। নিজে ছুলেন না। তা দেখে আমি মনে মনে বললাম, এ গেলো এক পরীক্ষা। তারপর আমি চলে আসলাম। এসে আমি পুনঃ খেজুর জমাতে আরম্ভ করলাম। ইতিমধ্যে রাসূল সঃ ক্বোবা ছেড়ে মাদীনা পৌঁছে গিয়েছেন। তারপর আমার জমা করা খেজুর নিয়ে আমি পুনঃ রাসূল সঃ এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বললাম যে, সে দিন আমি দেখেছি যে আপনি সদ্ক্বা-ভিক্ষা খান না। তাই আজ আমি আপনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি, আপনি গ্রহণ করুন। রাসূল সঃ তা গ্রহণ করে নিজেও তা থেকে খেলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও খেতে দিলেন।

তা লক্ষ্য করে বুঝলাম যে, দ্বিতীয় লক্ষণও পাওয়া গেলো। তারপর আমি তাঁকে আমার সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। তিনি তা শুনে খুব খুশী হলেন এবং আমার ঘটনা ও আমার বিবরণ তার সঙ্গীদেরও শোনালেন। সবাই আমার বৃত্তান্ত শুনে বিমোহিত হলো। তারপর রাসূল সঃ আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

এ হ'লো "সালমানু মিন্না আহ্লাল বাইত" এর ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস। রাসূল সঃ বলেছেন, "সালমান আমার আহলে বাইত, আমার পরিবার ভূক্ত ও আমার পরিবারের সদস্য।" সালমান আল্লাহ্র রং সিব্গাতুল্লাহর রংধনু। ইসলামে পূর্ণপ্রবেশ করলে মানুষ আদম হয়ে যায়। যে আদম আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ্র দাস ও আল্লাহ্র খালিফা ব্যতীত অন্য কোনো পরিচয় তার নেই। তাই খাঁটি আদম সন্তানের কোনো জাত থাকেনা, তাদের পিতা আদমের জাতের বাইরে। আদমের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাদের পিতা-মাতা বাবা আদম ও মা হওয়ার শত্রু ইবলিসকে সঙ্গে নিয়ে সন্তান জন্ম দেয়, তারাই আল্লাহ্র রং ত্যাগ করে রক্ত, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে এতো জাত ও জাতির জন্ম দিয়ে বর্তমান জাতি সংঘ, ইউনাইটেড নেশনের দুষ্ট চক্রের সদস্য বৃন্দ। ক্বোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন যে শয়তান তার অনুসারী মানব দম্পতির সাথে স্ত্রী সহবাসে শরিক হয়। وشاركهم في الأموال والأولاد (সূরা বনী ইসরাঈল-৬৪) জাতীয়তাবাদী, গোত্রবাদী ও বর্ণবাদীরা মানুষ ও ইবলিসের প্রজন্ম (সূরা কাহ্ফ্-৫০)।

সালমান রাসূল সঃ এর সাথে যায়দের মতো আরেক বিস্ময়কর সংযোজন। যায়দ রাসূল সঃ এর নবী জীবনের পূর্বে ও প্রারম্ভে এবং সালমান নবী সঃএর জীবনের পরিপক্ক কালে। যায়দ রাসুল সঃ এর নবী জীবনের কঠিনতম তায়েফ যাত্রা ও তার সে দুঃস্বপ্নময় কষ্টের সঙ্গী, যে কষ্ট রাসূল সঃ কখনো ভুলেননি। তাই তায়েফের কষ্টকে তিনি তাঁর জীবনে সবচেয়ে কষ্টের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। আর নবী জীবনের সকল সঙ্গীদের নিয়ে যে কঠিনতম পরীক্ষায় রাসূল সঃ কাটান, তা হলো মাদীনা অবরোধের ঘটনা। প্রায় মাদীনা এক মাসের বেশি সকল দিক থেকে অবরুদ্ধ ছিলো। মক্কা, তায়েফ, ইয়ামেন ও নজ্দসহ সকল আরব মুশরিকরা মাদীনায় রাসূল ও তাঁর সঙ্গী তিনহাজার জনসংখ্যাকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার জন্য ইয়াহুদীদের প্ররোচনা ও পরিকল্পনায় বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মাদীনা আক্রমনের প্রস্তুতি নেয়।

কাফেরদের সম্মিলিত শক্তির মরণকামড় এ অভিযানের সংবাদ পেয়ে রাসুল সঃ ও তাঁর সঙ্গীরা ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। মাদীনা রক্ষার প্রানান্তকর দুশ্চিন্তায় আল্লাহ্ সালমানকে রহমতের ফেরেশতা রূপে তাঁর রাসূলের সামনে তুল ধরেন। সালমান রাসুল সঃ কে পরামর্শ দেয় যে মাদীনার দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে পর্বতমালার বেষ্টনী। সেদিক সমূহে শত্রুদের ঠেকানো কঠিন হবেনা। সামান্য সংখ্যক লোক দিয়েই তা রক্ষা করা যাবে। কিন্তু সব বিপদ হয়েছে উত্তর দিক থেকে। উত্তর দিকেই মদীনায় প্রবেশের খোলা পথ। সালমান রাসুল সঃ কে পরামর্শ দিলো যে মাদীনাকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হলো গোটা উত্তর দিক জুড়ে গভীর খাল বা পরিখা খনন। মরুবাসী আরবরা যেহেতু কখনো সংঘবদ্ধ জাতি ছিলোনা, ছিলো শুধু কাফেলা লুটতরাজ করা মরুদস্যু ও গোত্রীয় মারামারির জাত, তাই তারা পরিখা খনন করে শত্রু প্রতিহত করার কোনো রণকৌশল জানতোনা।

সালমানের পরামর্শে রাসূল সঃ এর নেতৃত্বে তিন হাজার লোক দিন রাত ২৪ ঘন্টা পরিখা খননে লেগে গেলো।

একমাস ধরে অনাহার ও অর্ধাহার অবস্থায় এ পরিখা খনন সমাপ্ত করা হয়। এ সময়ই রাসূল সঃ ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে পরিখা খনন করেছেন। পরিখা খননের মাঝে, মধ্যে এমন এক পাথর পড়ে যে তাকে আর কোনো অবস্থায়ই কেউ ভাংতে সক্ষম হচ্ছেনা। আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ পেটে পাথর বেঁধে গর্তে নেমে স্বয়ং পাথর ভাঙ্গা হাতুড়ী হাতে নিলেন। রাতের বেলা ছিলো। আঘাত করতেই বিদ্যুতের মতো চমকে উঠে চারদিক। রাসূল সঃ ও সালমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সর্ব শক্তি দিয়ে আঘাত করছেন। প্রতি আঘাতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাতে রাসূল সঃ ও সালমান দেখতে পাচ্ছেন যে এককে চমকে পারস্য, ইয়ামেন ও রোমান সিংহাসনের পতন হচ্ছে। রাসূল সঃ হ্যামারের আঘাতে চটানপাথর চৌচির হয়ে তিন টুকরা হয়ে ভেঙ্গে যায়।

অভুক্ত পেটে পাথরবাঁধা নবী ও তাঁর অনাহার ক্লিষ্ট অনুসারীরা যেখানে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করছেন, সেখানে আল্লাহ্ তাদের তখনকার পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের বিদ্যুৎবার্তা ইন্টানেটে দেখাচ্ছেন। ঈমানের চোখ খুললে মানুষ যেমন পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ দেখে, তেমনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎও দেখে। আর ঈমানে অন্ধ হলে সকল অতীত ও ভবিষ্যত ভুলে মানুষ শুধুমাত্র বর্তমান নিয়ে সব আদর্শত্যাগী অধম পশু হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্বোরআনে সংক্ষেপে এ শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে বলেছেন, যারা পার্থিব জীবনে এরূপ অন্ধ হয়, পরকাল সম্পর্কে এরা আরো অন্ধ এবং চরম বিপথগামী হয়। وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

(বনী ইসরাঈল-৭২)

রাসূল সঃ যেরূপ তাঁর আদর্শপিতা ইব্রাহীম আঃ এর অনুরূপ সকল গোত্রবাদ ও বর্ণবাদের উর্ধ্বে উঠে নবূওত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সালমান, যায়দ, আম্মার ও বিলালরা ঠিক সে মান ও পরিমাপে রাসূলের অনুসারী হয়েছিলো। ফলে আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তিও খুলে দিয়েছিলেন। আজ ১৪০০ বছর পরও একটি ঈমানী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ১৪০০ বছর পেছনে গিয়ে রাসূল সঃ এর অসমাহিত লাশের পাশে দাঁড়ায়, আর ভাবে যে রাসূল সঃ মারা গেলেন। তিনি কি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে যে অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছেন, তার সেনাপতি সম্পর্কে বলেছেন, যে, "এর পিতা আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে আমীর হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলো, এবং আমার নিকট অবশ্যই সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম ছিলো। তারপর, এ, অর্থাৎ উসামাহ্ আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম"। তাও রাসূল সঃ তাঁর মৃত্যুশয্যায় কসম খেয়ে বলেছেন! এ সেনাপতি নির্বাচন, তাকে আমীর বলে উল্লেখ করা, তার অভিযানে না গেলে অভিশপ্ত হওয়া এবং তার অধীনে আবু বকর, উমর, পরবর্তী সকল খলীফায়ে রাশেদ কথিত ব্যক্তিবর্গ ও আশারায়ে মুবাশ্শারাকে বাধ্যতামূলক তার আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান কী কখনো শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন অভিযানের জন্য হতে পারে? রাসূল সঃ কি মৃত্যুর পর পুনঃ ফিরে আসবেন যে তারপর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে দিয়ে যাবেন? তারপর তিনি "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে ক্বোরেশ গোত্রের ঔরসের মধ্যে ইসলামী ইমামতকে চিরস্থায়ী ঢুকিয়ে যাবেন?

এ তো শুধুমাত্র সূরা মুহাম্মাদের ২৫ নং আয়াতে বর্ণিত মুর্তাদরাই ভাবতে, বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, "হেদায়েত ব্যক্ত করে দেয়ার পর যারা পিছনে জাহিলিয়্যাতের দিকে ফিরবে, তারা অবশ্যই শয়তানের শিষ্য। শয়তান তাদের বানান শিক্ষা দিয়ে, বাক্য গঠন করে, "ডিকটেট" করেছে।" ক্বোরআনের এ আয়াতটিতে "সাউয়ালা" ও আম্লা" দু'টি খুব অর্থপূর্ণ শব্দ বলা আছে। সাউয়ালা শব্দের বাংলা প্ররোচিত করা, রাজী করা। ইংরেজীতে To tempt, allure, entice দ্বিতীয় শব্দ আমলার অর্থ বানান ও অক্ষর বলে শিখানো বা লিখানো। ইংরেজীতে Spelling and dictation. ভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আয়াতটি পড়া মাত্রই বক্তব্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ এ রোগে আক্রান্তদের মুর্তাদ হওয়ার সংলাপও আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করেছেন। ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

কারণ হলো, ওরা আল্লাহ্‌র নাযিলকরা বিধান অপছন্দকারীদের গোপনে গোপনে বলে, "সময় মতো (?) কোনো কোনো ব্যাপারে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো"। আল্লাহ্ ওদের গোপন অভিসন্ধির খবর রাখেন। (সূরা মুহাম্মাদ-২৬) আল্লাহ্ গোপন জেনে সে গোপন তাঁর রাসূল সঃ কে জানিয়ে দেন। ফলে রাসূল সঃ তাঁর বিদায়ের সময় আসন্ন

বুঝে সূরা ক্বাসাসের ৫ ও ৬ নং আয়াতের মর্মানুযায়ী মুস্তাদআফ ইমামত প্রতিষ্ঠা করে যান। তাতে মুর্তাদ ব্যতীত কারো সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। সরলমনা ঈমানদারদের তারপরও কোনো দ্বিধা থাকলে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পূর্বে বলা বোখারীর দুটি হাদীস পড়লে তা'সম্পূর্ণ দুর হয়ে যায়। হাদীস দু'টি হলো:

(১) عن سالم عن أبيه استعمل النبى صلى الله عليه و سلم أسامة فقالوا فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم قد وإنه احب الناس إلى بلغنى أنكم فلتم في أسامة

(২)و عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث و أمر عليه أسامة بن بن زيد فطعن الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة ابيه من قبل ، وأيم الله إن مان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس بعده

(১) সালিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করছে যে রাসূল সঃ যখন উসামাহ্‌কে নিয়োগ করেন, তখন লোকেরা তার সমালোচনা করলে রাসূল সঃ বলেন, "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে তোমরা উসামাহ্‌র নিয়োগ সম্পর্কে আপত্তি করছো। জেনে রাখো, সে আমার নিকট সকল মানুষ থেকে প্রিয়তম"।

রাসূল সঃ সোমবার বেলা দশটার দিকে ইন্তিকাল করেন। শনিবার সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করে মসজিদে নববীর মেম্বারে উঠে এ ঘোষণা করে যান।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর বর্ণনা করেছে যে রাসূল সঃ এক সমরাভিযান প্রস্তুত করে উসামাহ্‌কে তার আমীর নিয়োগ করেন। সে নিয়োগের বিরুদ্ধে লোকেরা আক্রমনাত্মক সমালোচনা উত্থাপন করে। তার উত্তরে রাসূল সঃ বলেছেন, "ইন তাতআনু, অর্থাৎ আমার নিয়োগকে তোমরা যদি ছুরিকাঘাত করো (?)"। আরবীতে কাকেও পেছন থেকে ছুরিকাঘাত বা আক্রমন করাকে "তাআন্" বলা হয়। সোজা কথা দাঁড়ায়, "তোমরা যদি আমার উসামাহ্‌র নিয়োগকে ছুরিকাঘাত করতে চাও, তোমরা পূর্বে যেমন তার পিতার নিয়োগকেও করতে চেয়েছিলে, তা সফল হবে না। কারণ, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে, উসামাহ্‌র পিতা যেমন সন্দেহাতীত নেতৃত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলো, সে সঙ্গে সে আমার নিকট সকল মানুষের তুলনায় প্রিয়তমও ছিলো। এ উসামাহ্ তার পিতার পর আমার নিকট সকল মানুষ থেকে প্রিয়ভাজন" (বোখারী দেখো, ষষ্ঠ খন্ডের "রাসূলের অসুস্থতা ও মৃত্যু" অধ্যায়ের ১৯ পৃষ্ঠা)।

রাসূল সঃ এর আমীর নিযুক্তি ও উসামাহ্‌র অভিযানকে যে বা যারা ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলো, তারা কি মাদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কেউ বা আব্দুল্লাহ ইবন উবাইর দল ছিলো? তার পূর্বেই তো মাদীনা থেকে ইয়াহুদীরা সমূলে নির্বাসিত ও বিতাড়িত হয়েছিলো! তখনতো মাদীনার শতমাইলের মধ্যেও কোনো ইয়াহুদী ছিলোনা! তা হলে রাসূল সঃ এর বিদায়কালীন নিযুক্তিকে কারা ছুরিকাঘাত করতে সচেষ্ট হয়েছিলো??? তিনি কাগজ কলম চাইলে তা দিতেও তো কোনো ইয়াহুদী মুনাফিকরা বাধা দেয়নি! এরা যদি ঘনিষ্ঠরা না হয়ে দূরের লোকেরা হতো, তাদের বিরুদ্ধে সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযমদের তরবারী কই?! তার তো কোনো উল্লেখ আমরা পাই না? তা কেনো?!

এসবের পেছনে ঐ মিয়ারাই ছিলো, যারা পরবর্তী সকল অঘটন ঘটিয়ে উসামাহ্, ইবন মাসউদ, বিলাল ও সালমানদের পেছনে ঠেলে দিয়ে মুয়াবিয়া, খালেদ, আমর ইবনুল আস ও মুগীরাদের সামনের কাতারে এনে ইয়াযীদ ও মারওয়ানদের আমীরুল মু'মিনীন, খলিফা ও ইমামুল মুসলিমীন হওয়ার পথ করে দেয়। যার ফলে সালাত ভিত্তিক সমাজ আজ "ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন" দের পাপে অভিশপ্ত। রাসূল সঃ যে মে'রাজের সালাত শিক্ষা দিয়ে বলে গিয়েছেন صلواكما رأيتمونى أُصلى "সালাত আদায় করতে দেখেছো, সে ভাবে তোমরা সালাত আদায় করবে" সে সালাত আদায় করেও আমরা তাঁকে দাফন করতে ব্যর্থ হয়েছি। সে থেকে আমাদের প্রত্যেক কাজে ব্যর্থতা। ধাপে ধাপে অধঃপতন وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ "যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে, অবশ্যই আমি তাদের ধাপে ধাপে নির্মূল করবো। তারা তা টেরও পাবেনা।" (সূরা আরাফ-১৮২)

মুস্তাকবিরী থেকে তওবা করে মুস্তাদআফদের পথ না ধরলে এ ভাগ্য পরিবর্তন হওয়ার নয়। রাসূল সঃ সালমানের পরামর্শ অনুযায়ী পরিখা খনন করে আমাদের তার বরকত ও ফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন। আম্মারের আবদার ও জমানো পাথর দিয়ে ক্বোবায় মসজিদুত্তাক্বওয়া বানিয়ে আজো বিশ্ব থেকে আসা হজ্ব ও ওমরা পালনকারীদের জন্য আলোর দিশা ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহ্ সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে তাঁর বান্দাদের হাতে তা করিয়ে থাকেন। সালমানের পরামর্শে পরিখা খননের ফলে আল্লাহ্‌র রহমতে মাদীনায় আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ, তাঁর দ্বীন ও তিন

হাজার মু'মিন নিরাপদ হয়। তা না হলে কী হতে পারতো তাকি ভাবা যায়? তারপর বারো হাজার শত্রুর একমাস কাল অবরোধে রাসূল সঃ ও তাঁর সঙ্গীদের অন্তরাত্মা ভয়ে কণ্ঠনালীর কাছে পৌছে গিয়েছিলো বলে আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেন। সে বর্ণনা এখনো পড়ে সারা শরীর হীম হয়ে অবশ হয়ে যেতে চায়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"স্মরণ করো সে অবস্থার কথা, যখন তোমাদের শত্রুরা উপর ও নিচ থেকে এসে তোমাদের ঘিরে ফেলেছিলো, ভয়ে তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিলো। কলিজা মুখের কাছে চলে এসে গিয়েছিলো এবং আল্লাহ্র সম্পর্কেই তোমরা নানান কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছিলে। আদৌ আল্লাহ্ আছেন কি নেই! ইত্যাদি। এভাবে তখন চরম ঝাঁকুনী দিয়ে মু'মিনদের পরীক্ষা করা হয়েছিলো। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا তারপর আমি আমার সৈন্য ও ঝড় পাঠিয়ে তোমাদের রক্ষা করি ও শত্রুদের পরাস্ত করি।"

আহার নিদ্রাহীন দীর্ঘ একমাস অবরোধে ও তার পূর্বে দিবা রাত্রি একমাস ধরে পরিখা খননের ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠার পর আল্লাহ্ হঠাৎ করে এক রাত্রে এক ঝড় ও ঠান্ডা বৃষ্টি দেন যে তা শত্রুদের সকল তাবু উড়িয়ে নিয়ে যায়। পশু, উট-ঘোড়া বাঁধার খুঁটি উপড়ে তার পিটুনীতে ভয়ে পশুদের যত্রতত্র পলায়ন, পাকানো খাদ্যের ডেগ ও চুলার আগুন উড়ে হঠাৎ করে কাফের সেনাদের উপর পতন। সব মিলিয়ে ওদের উপর ছোটো খাটো ক্বেয়ামত ঘটে যায়। ফলে যে যেভাবে পেরেছে শত্রুরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। ঠিক পূর্বের দিন রাসূল সঃ ও তার সঙ্গীদের যে দুরাবস্থা ছিলো, তা সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর উপর এক রাতের ব্যবধানে ঘটে যায়। সকালের আলোতে আল্লাহ্র রাসুল সঃ ও তাঁর মুস্তাদআফরা দেখতে পায় যে, পরিখার অপর পাড়ে মুস্তাকবিরদের কোনো চিহ্নও নেই। আলহামদুলিল্লাহ! এখনো আমরা রাসূল সঃ এর সঠিক অনুসারী হলে কি আল্লাহ্ আমাদের পক্ষে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন না? নূহের শত্রুদের চল্লিশ দিনের বন্যায় নিশ্চিহ্ন করেছেন। শক্তিশালী সামুদদের একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ দিয়ে পঙ্গপালের মতো মেরে বিছিয়ে দিয়েছেন। আদ্দের সাত রাত ও আট দিনের ঘূর্ণীঝড়ে উৎপাটিত করেছেন। সে আল্লাহ্ মু'মিনদের সাহায্য করার অঙ্গীকারে এখনো তাঁর আরশে আসীন। এসো বিশ্বের নির্যাতিতরা, আমরা সালমানদের অনুসরণে পুনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হই।

তখনকার দিনে আরবদ্বীপের বাসিন্দারা বহির্বিশ্বের মানুষদের আজমী বলতো। ইরাক হয়ে ইরানের সাথে স্থল যোগাযোগ ছিলো বলে ইরানীরাই তাদের প্রতিবেশী আজমী ছিলো। রাসুল সঃ যখন সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াত পাঠ করে শোনান যে তাঁর সঙ্গী আরবরা যদি তাঁর শিখানো আদর্শ পরিত্যাগ করে, তা হলে আল্লাহ্ তাদের পরিবর্তন করে তার স্থলে অপর জাতিকে আল্লাহ্র দ্বীনের পূর্ণ বিজয়ের দায়িত্ব দিবেন। এ কথা শুনে, উপস্থিত সাহাবীরা সে সম্ভাব্য জাতি কারা হতে পারে, জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ্র রাসূল সঃ সালমানের কাঁধে হাত তুলে বলেন, "এ সালমান ও তার জাতি।" অর্থাৎ অনারব, আজমীরা। এর আরো ব্যাখ্যা করে রাসূল সঃ বলেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে আল্লাহ্র দ্বীন পরিত্যক্ত হয়ে আকাশে উঠে গেলেও সালমানের মতো লোকেরা সে দ্বীন পুনঃ ধরায় নামিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে। (মুসলিম, আবু হুরায়রা থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছে)

পরিখা খননের সময় পাথর ভাঙ্গার আঘাতে চমকানো আলোতে সালমান যে তখনকার পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন দেখতে পায়, পারস্য জয় হলে সালমানকে সে মাদায়েনের আমীর নিযুক্ত করা হয়। সেখানে শাহী প্রাসাদে সালমান এক রাতও কাটায়নি। রাষ্ট্র পরিচালনার দপ্তর হিসেবে প্রাসাদ ব্যবহৃত হলেও সালমান প্রাসাদের বাইরে একটি কুঁড়েঘর তৈরী করে তাতে বাস করে। রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে কোনো ভাতা সালমান গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় কাজের ফাঁকে বসে নিজ হাতে সে খেজুর-খাগড়ার ঝুড়ি ও মাদুর বানাতো, তা দিয়েই সালমান জীবিকা নির্বাহ করতো। অতীব দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে বলতে হয় যে, যায়দ, সালমান ও উসামাহ্দের বাদ দিয়ে যেহেতু ইসলামের ভিতই রচিত হয় না এবং ইসলামের নাম ব্যতীত পরবর্তী আরবী সাম্রাজ্যের বংশপরিচয় দেয়া যায় না, তাই সালমানদের নাম মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিররা নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী বংশধরদের কোনো হাদিসই বই কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার একক চেষ্টায় যদি বিশ্বে পুনঃ বারাকাহ, যায়দ, বিলাল, ইবন মাসউদ, আম্মার ও উসামাহ্দের কাফেলা ও

সৈন্য বাহিনী পুনঃ দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে আমি নিশ্চিত যে, বিশ্বে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের রিসালাত ও শারিয়াতের ইমামত গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার এ লিখনীকে বিশ্বেমানবের নাজাতের জন্য হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের কিস্তির মতো বাজারে ভাসিয়ে সে নূহ আঃ এর দোয়া দিয়েই হযরত সালমান ইবনুল ইসলাম, সালমান ইব্নুল ইসলাম ও সালমান ইবনুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করছি। "হে আমার প্রতিপালক, ধরাপৃষ্ঠে আপনি কাফেরদের একটি ঘরও রাখবেন না। আপনি যদি রাখেন, তারা শুধু আপনার বান্দাদের বিপথগামী করতেই থাকবে এবং তারা কাফের পাপীষ্ঠই জন্ম দিবে। হে আমার প্রতিপালক আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে মাগফিরাত দান করুন। যারা খাঁটি মু'মিন রূপে আমার ঘরে প্রবেশ করবে, তাদের ক্ষমা করুন ও অন্যান্য মু'মিন নরনারীদেরও। কিন্তু অত্যাচারীদের শুধু ধ্বংসের পর ধ্বংসই করতে থাকুন।" আমীন।

সালমানের পরিচয়ের সাথে হযরত নূহের প্রসঙ্গ টানার কারণ হলো যে, সালমান মতান্তরে দু'শ, আড়াইশ এবং তিনশ বছর নাকি আয়ূ পেয়েছিলো। হযরত নূহ ন'শ পঞ্চাশ বছর আয়ূ পেয়েছিলেন। সালমান তাঁর চেয়ে কম আয়ূ পেলেও তার সমসাময়িকদের চেয়ে বেশী আয়ূ পেয়েছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ কে পেতে তার যে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, তার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার জানা নেই।

উসামাহ্ ইবন্ যায়দ

উসামাহ্ সম্পর্কে এ বইতে বহু উল্লেখ থাকলেও তার জীবনী সম্পর্কে আলাদা কোনো প্রতিবেদন নেই। তাই এখানে সে অভাবটি সংক্ষেপে পূরণ করতে চাচ্ছি। রাসূল সঃ এর রিসালাত প্রাপ্তির সপ্তম বছর। ক্বোরেশদের অত্যাচার উৎপীড়নে রাসূল সঃ ও তার সঙ্গীরা "দ্বারে আরক্বামে" প্রায় গৃহবন্দী হয়ে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রদীপ জ্বালিয়ে যাচ্ছেন। বারাকাহ ও যায়দ রাসূল সঃ এর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পিতা-মাতা হারানোর পর শিশু মুহাম্মাদের ধরাপৃষ্ঠের স্বর্গ বারাকাহ। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে মা খাদীজার সাথে বিয়ের পূর্বপর্যন্ত রাসূল সঃ এর ঠিকানা ও ঘর বারাকাহ। সত্যিই আকাশ থেকে নাযিল করা বরকতই বারাকাহ। তারপর যায়দকে মিলিয়ে দিলে তা রাসূলের রিসালাত প্রাপ্তির সাধনায় অবশ্যই আল্লাহ্র একটি বাড়তি দান। তারপরও আল্লাহ্র অলৌকিক মিলনের ধারা থামেনি। বৃদ্ধা মাকে প্রেমাস্পদ পুত্রবত্ যায়দের সাথে বিবাহ দেন। যেমন অনেক সময় রসিকতা করে নাতি-দাদীর বিয়ের কথা বলে মস্করা করা হয়। মস্করাও যে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটাতে পারে, তারই একটি স্বর্গীয় ঘটনা যায়দ ও বারাকাহর বিয়ে। কিন্তু এ'যে আল্লাহ্র কুদরতের এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা যা ভবিষ্যতে আরো বিস্ময়ের জন্ম দিতে যাচ্ছে! পূর্বে বারাকাহকে যে রাসূল সঃ ভূপৃষ্ঠে বেহেশত্ বলেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ যায়দ ও বারাকার এক সন্তান দিলেন। তার নাম রাখলেন রাসূল উসামাহ্। ইসলামের ইতিহাসে যায়দ ও বারাকার মতো রাসুল সঃ ও এর এতো প্রিয় কোনো দম্পতি ছিলোনা। এ অদ্বিতীয় দম্পতির মিলনে আল্লাহ্ যে সন্তান দিলেন, তারও কোনো তুলনা নেই রাসূলের জীবনে, ইসলামের ইতিহাসে। রাসূল সঃ এর উসামাহ্ ও তার পিতা-মাতার প্রতি অতুলনীয় ভালোবাসার ফলে উসামাহ্কে সবাই হিব্ব ইবনুল হিব্ব বলতো। রাসূল সঃও তাই বলতেন। অর্থাৎ প্রিয়ের ছেলে প্রিয়। একবার ছোট বেলা উসামাহ্ পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে ফেললে রাসূল সঃ মা আয়শাকে তাকে তুলে নিয়ে ধুয়ে মুছে যত্ন করতে আদেশ দেন। নাক উঁচা মা আয়শা অবজ্ঞার ভাব দেখালে রাসূল সঃ স্বয়ং উসামাহ্কে কোলে তুলে নিজ ঠোঁট দিয়ে উসামাহ্র কেটে যাওয়া ঠোটের ক্ষত চুষে সেখানে নিজ ঠোঁটের লালা লাগিয়ে দেন। সুস্থ মানুষের থুথু যেখানে এ্যান্টি সেপ্টিক, সেখানে রাসূল সঃ মুখের লালাতো মহৌষধ!

উসামাহ্ বেড়ে উঠা আরম্ভ করলেই তার মাঝে অনন্য গুণাবলীর চিহ্ন প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। একবার মা খাদীজার ভাতিজা হাকীম রাসূল সঃ এর জন্য ইয়ামেন থেকে তখনকার দিনে পঞ্চাশ দীনার মূল্যের পোষাক কিনে রাসূল সঃ কে হাদিয়া পেশ করতে আসে। তখনো হাকীম ইসলাম গ্রহণ করেনি বলে রাসূল সঃ তা গ্রহণ করলেন না। দাম পরিশোধ করে রাসূল তা রাখলেন। রাসূল সঃ মাত্র এক জুমা পরে সে দামী পোষাকটি খুলে উসামাহ্কে পরিয়ে দেন। সম বয়সীদের মাঝে তা পরে উসামাহ্ চলাফেরা করতে দেখে রাসূল সঃ খুব তৃপ্তি প্রকাশ করতেন।

কৈশোর পার হয়ে যৌবনের কোঠায় পা দিতেই উসামাহ্র মাঝে অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে আরম্ভ

করে। যার ফলে তার প্রতি রাসূল সঃ এর বিশেষ আকর্ষণ নিবদ্ধ হয়। তীক্ষ্ম ধারালো বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীক সাহসিকতা, সূক্ষ্ম কাল পাত্রের অনুভূতি, সঠিক বিচার শক্তি, সকল নীচতার উর্ধ্বে চারিত্রিক পবিত্রতা, ভালো মানুষের প্রতি তার আকর্ষণ এবং সবের উর্ধ্বে উচু মানের তাক্বওয়া উসামাহকে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট চোখের পুতুল করে তোলে।
হবেই বা না কেনো? যার মা মানব জাতির সেরা পূর্ণ মানবাদর্শ খাতামুন নাবিয়্যীনকে পালনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলো। রাসূল সঃ যাকে নবী হয়েও আজীবন মা ডাকতেন, আসতে দেখলেই দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতেন, কপালে চুমো খেতেন এবং যার পিতাকে আল্লাহ্‌ স্বয়ং ক্বোরআনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের পুরস্কৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাদের পরিণত বয়সের সন্তানের মধ্যে ঐ রূপ চারিত্রিক মাধুর্য্য একত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের মিলন হলেই আল্লাহ্‌ তাকে নূরুন্‌ আলা নূর, অর্থাৎ নূরের উপর নূর বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহীমকে বলেছেন, "আমি তাকে খলীল বা বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি"। হযরত মূসা আঃ সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তোমাকে বাছাই করে আমার জন্য গড়ে নিয়েছি" (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে দিয়ে তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন। সে রাসূলের পর যাকে দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর রঙ্গে বিশ্বে মুস্তাদআফদের ইমামতের নমুনা দেখাবেন, তার মধ্যে ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক।
আল্লাহ্‌র বিধান হলো যে তিনি মানুষের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি ভালো ও মন্দের দিক নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে ছেড়ে দেন। মানুষ ভালোর দিকে গেলে তখন ফেরেশতার চেয়েও উত্তম, সম্মানী। মন্দের দিকে গেলে সকল সৃষ্টির ইতর, নিকৃষ্ট জীব। জাহান্নামের জ্বালানী। রাসূল সঃ এর বাণীতে উল্লেখ রয়েছে যে কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে যে, তাদের সফলতা দেখে সকল নবী রাসূলগণ ঈর্ষাবোধ করবেন। অথচ, তারা কেউ নবী বা রাসূল না হলেও সকল নবীদের আদর্শের সমষ্টি তাদের মধ্যে একত্রিত করে মানুষকে সেপথে পরিচালিত করেছে।
খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ কে দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর নবী রাসূলদের রিসালাত ও নবুওতকে আদর্শিক রূপে পূর্ণ করেছেন। সে আদর্শিক পূর্ণতাকে প্রাতিষ্ঠানিক পূর্ণতা দেয়ার জন্যই আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল সঃ কে দিয়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে উসামাহ্‌র রূপে দিক নির্দেশনা দেওয়ান। আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ বলে তাকে আবু বকর, উমর ও আলীরা বর্জন না করে তাকে গ্রহণ করলে সারা বিশ্বে সে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবু বকর উমররা তার সৈনিক হতো। তা না করায় তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের উচ্চারিত লানতে পতিত হয়ে আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র জমিনে সংস্কারের পরে কুসংস্কার আনয়নকারীর وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا কাজ করে বিদায় নিয়েছে। ফলে উসামাহ্‌দের পরিবর্তে মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানদের গযব মানব জাতির উপর পতিত হয়েছে। এখনো মানব জাতি তাতে জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছে। সে জাহান্নামের আগুন নিভানোর জন্য পুনঃ যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সালমান ও উসামাহ্‌দের সামনে আনার জন্য এ নির্ভীক কলমের অসি চালানো হচ্ছে।
উপরে বর্ণিত গুণাবলী নিয়ে যখন উসামাহ্‌ কৈশরের শেষ ধাপে উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য তার সমবয়সীদের সঙ্গে রাসূল সঃ এর খেদমতে উপস্থিত হয়, বয়স কম বলে রাসূল সঃ উসামাহ্‌কে গ্রহণ না করায় উসামাহ্‌ চোখের পানি ফেলে ফিরছিলো। তা দেখে রাসূল সঃ উসামাহর ফেরার পথে যতক্ষণ উসামাহ্‌কে দেখা যাচ্ছিলো, ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।
পরিখার যুদ্ধে এসে উসামাহ্‌ পুনঃ উপস্থিত। এবার বয়স সম্পূর্ণ না হয়ে কিছু কম থাকা সত্ত্বেও রাসূল সঃ উসামার কোমরে তলওয়ার ঝুলিয়ে দেন। তাতে উসামাহর সাথে রাসূল সঃও খুশী। এভাবে বেড়ে উঠা উসামাহ্‌ সত্যিই আল্লাহ্‌ ও তাঁর শেষ নবীর বিরল সিংহ রূপে গড়ে উঠে। এ গড়ে উঠাকে রাসূল সঃ প্রতি মুহূর্তে তাঁর স্বচক্ষে দেখেন। কারণ, রাসূল সঃ এর জীবনে বারাকাহ, যায়দ ও উসামাহ্‌ যেরূপ সার্বক্ষণিক প্রতি মুহূর্তে চোখের সামনে ছিলো, এমনকি অন্য কোনো পিতা-মাতা ও পুত্র ছিলো? আলী, ফাতিমা ও হাসান-হোসেইনও এতো ঘনিষ্ট ছিলো না। কারণ, আলী-ফাতিমার বিয়ের পর এরা পৃথক ঘর সংসার করেছে। তারা স্বতন্ত্র ছিলো। আর এরা ছিলো ছায়ার মতো সব সময় সঙ্গে সঙ্গে, চোখের সামনে। আবু বকর, উমর ও ওসমানরা তো, যুদ্ধ যাত্রা ছাড়া, হাটে-বাজারে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকতো। আযান হলে সালাতে এসে শরীক হতো, সালাত শেষ হলে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ও সংসারে চলে যেতো। এ জন্য অধিকাংশ সময়ে রাসূল সঃ এর দরবারে কি ঘটতো, কখন কি অহী নাযিল হতো, তাও তারা জানতো না। পরে এসে জনমুখে তা শুনে যতো টুকু জানতো, তাই তাদের জানা ছিলো। ফলে দেখা যায় যে,

ক্বোরআন সম্পর্কে আবু বকর ও উমরের উল্লেখ যোগ্য কোনো জ্ঞান ছিলোনা। খলিফা হওয়ার পর তারা যে সমস্ত ভাষণ ও বক্তব্য রাখতো, তাতেও ক্বোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি অনেক কম। অন্যান্য প্রচলিত সামাজিক যুক্তি তর্কই তাদের ভাষণে প্রাধান্য পেতো। এখনো তাদের ভাষণ বক্তৃতা পড়লে তাই প্রমাণ করে।

আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবীকে দ্বীনের আদর্শকে পূর্ণতার শেষ বিন্দুতে নিয়ে যাচ্ছেন। হুদাইবিয়া ও পরিখার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মক্কা বিজয়ে রাসূল সঃ যাচ্ছেন। সঙ্গে বারাকাহ, আইমান ও উসামাহ্। মক্কা জয় হলে রাসূল সঃ কা'বায় প্রবেশ করেন। সঙ্গে উসামাহ্। মক্কা বিজয় সমাপ্ত। এবার হুনাইন ও তায়েফ বিজয়াভিযান। বিরাট সংখ্যা এবার রাসূলের সাথে। সংখ্যালঘুতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যে বদরে বিজয় দান করেন। এ বিজয়ে রাসূল সঃ এর সঙ্গী খাঁটি মু'মিনদের মাথা ও ঘাড় আরো নত হয়। কিন্তু জাহিলিয়্যাতের বদরক্তের আধা মুসলিম আধা কাফেরদের মনে নিজেদের বাহুবলের প্রাধান্য পুনঃ অবস্থান নিয়ে নেয়। তাই উহুদের যুদ্ধে রাসূল সঃ এর পরামর্শ অমান্য করে তারা রাসূল সঃ এর আত্মরক্ষামূলক অবস্থান ত্যাগ করে আক্রমনাত্মক যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করে। তারপরও আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করেন তাঁর বিশেষ করুনায়। কিন্তু সেখানেও রাসূলের কড়া নির্দেশ অমান্য করে অবস্থান ত্যাগ করে লুটপাটে লেগে গেলে আল্লাহ্ বিজয়কে চরম পরাজয়ে রূপান্তরীত করেন। সে শিক্ষার পর আল্লাহ্ পরিখার যুদ্ধে আরো পরীক্ষা নেন। কিন্তু হুদাইবিয়ায় দেখা গেলো যে পুনঃ রাসূল সঃ এর অবাধ্যতার শয়তানী শিং আবার পাগড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ মা উম্মে সালমার ঈমানী শক্তি দিয়ে সে যাত্রা তাদের জব্দ করেন। তার ধাক্কায় মক্কা বিজয় পর্যন্ত অবাধ্যতার শিং ঢাকা থাকে। কিন্তু স্বভাব যায়না মইলে। সর্বত্যাগী ঈমানের আগুন দিয়ে নফ্সকে ছাই না করলে পুনঃ "নফসে আম্মারা" শিং বের করেই। মক্কা বিজয় ও তারপর বিরাট সংখ্যা দেখে আবু বকরই নাকি উক্তি করেছিলো "এবার আমাদের বিজয় ঠেকায় কে?" আবার আসলো আল্লাহর বেত্রাঘাত। শত্রুর অতর্কিত আক্রমনে সবাই রাসূল সঃ কে ফেলে পালালো যে শুধু তাদের পলায়নপর পাছাই দেখা গিয়েছিলো। কারো বুক দেখা যায়নি। সুম্মা ওয়াল্লাইতুম মুদবিরীন। অতঃপর তোমরা পাছা দেখিয়ে পালিয়েছো। (সূরা তওবা) আরবীতে পাছাকে "দুবুর" বলা হয়।

হ্যাঁ, রাসূল সঃ এর বক্ষ ছিলো হুনাইনের শত্রুদের বিরুদ্ধে। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রাণ ছায়ার মতো সঙ্গে ছিলো। শত্রুর আক্রমণের মুখে উমর ও আবু বকররা পালালেও এরা পালায়নি। সেদিন যারা পালায়নি, তাদের দ্বিমতহীন নাম হলো বারাকাহ, আইমান ও উসামাহ্। অন্যদের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। আইমান তাতে শাহাদাত বরণ করলে তার মৃত দেহ নিয়ে রাসূল সঃ বারাকাহর সামনে রাখতেই, বারাকাহ বলেন "আমার তিন ছেলের মধ্যে দু'ছেলে তো আছে। একজনকে আল্লাহ্ ক্বুবুল করেছেন। আমি খুশী।" বারাকাহ তার কিছুদিন পূর্বে মওতার যুদ্ধে স্বামী যায়দকে হারিয়েও আলহামদু লিল্লাহ বলেছিলেন। তার সকল সুখ তাতেই, যদি তার পালক ছেলে মুহাম্মাদ সঃ ঠিক থাকেন।

এমন মায়ের সন্তান রাসূল সঃ এর আপন হবে না তো কি হবে? রক্তের মায়ের পেটের সন্তানরা কি এমন হয়? আমি চৌদ্দ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর বত্রিশ বছর বয়সের বিধবা মা ও তিন ভাই ও এক বোনকেও তার দশটি সন্তানসহ একা পালন করেছি। কই, তারা তো কেউ আমার আদর্শিক জীবনে কোনো কাজে আসেনি! আমার জীবনে শয়তান আমাকে যেখানে কোনো ক্ষতি করতে ও কষ্ট দিতে পারেনি, সেখানে আমার মা ও ভাইরা আমার জীবনে ক্ষতি ও কষ্ট দেয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। তাই রাসূল সঃ এর সিরাত ও জীবনী পড়া ও লিখার সময় আমি ভাবি, আমার মা যদি আমিনার মতো আমার ছোট বেলায় মারা যেতো, তারপর যদি বারাকাহর মতো কোনো পালক মা আমাকে পালতো! আমার যদি কোনো ভাই বোন না থাকতো! আমার মায়ের যদি আমি ছাড়া আর কোনো সন্তান না থাকতো, তা হলে মা আমার সঙ্গেই থাকতো এবং মৃত্যুর সময় মুখে পানি না পেয়ে একা একা মরে থাকতো না। ঐ নিমকহারাম কুলাঙ্গার ছেলেদের পক্ষ অবলম্বন করে আমাকে ছেড়ে যেতোনা। অথচ বিধবা হওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ঐ তিন সন্তান রূপী শয়তানরা মাকে এক বেলা খাওয়া, মাথা গুজার ঠাঁই ও একখানা শাড়ী দেয়ারও যোগ্য ছিলোনা। দেড় বছর, সাড়ে তিন বছর ও সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে ছোটো ভাইরা বাপহারা হয়ে পরে নদীভাঙ্গায় ভিটাবাড়ি হারা হওয়ার পর থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে থেকে পড়ে বের হওয়া পর্যন্ড় কোনো নানা-নানী, চাচা, মামু ও খালু কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায়নি, এক বেলা আহারও পায়নি। তারপরও তারা আমার সংগ্রামী জীবনে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়েছে। আমার লেখনী এ যাবৎ পাঠকরা যতটুকু পড়েছে, তাতে নিশ্চয়ই তাদের আন্দাজ হয়েছে যে, আমার জীবনের কোনো স্তর, আদর্শ ও লক্ষ্যহীন কাটেনি। গভীর লেখাপড়া, স্থির লক্ষ্যের

দিকে অগ্রসর হওয়া এবং কোনো অবস্থাতেই আদর্শচ্যুত না হওয়া আমার পরিচয়। তাই নবীদের, বিশেষ করে খাতামুন নাবিয়্যীনের শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ড় তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আমার কাছে প্রিয় ও স্পষ্ট। পরে এ বইর শেষ অধ্যায় আমার ব্যক্তি জীবন ও আমার পোষ্য মা, ভাই, বোন ও সন্ড়ানদের সম্পর্কে উল্লেখ ও বিস্তারীত বর্ণনা থাকবে। ইনশা আল্লাহ্।

রাসূল সঃ এর জীবনে মুশরিক ও অপবিত্র পিতা-মাতা হারিয়ে বারাকাহর মতো মা, যায়দ ও উসামাহ্দের মতো স্বজন পাওয়ায় আমি ঈর্ষা বোধকরে আল্লাহ্র কাছে বলি, তিনি যদি আমার ভাগ্যে তা জুটাতেন! সে সৌভাগ্য না হওয়ায়ও তাতে আমার নাশুকুরী নেই। তিনি যে আমাকে এতীমদশা থেকে একা একা এপর্যন্ত এনে তাঁর রাসূল সঃ এর জীবনাদর্শের সাথে একাত্মতা দান করেছেন, তাতেই আমি মহাখুশী। আল্লাহ্র দানের ফক্বীরদের আরো প্রাপ্তির লোভ বেশী হয়। তাই আমি ফক্বীর আমার প্রভূর দুয়ারে আরো চাই, আরো চাই। মানুষের কাছে চাইলে মানুষ বিরক্ত হয়। তিনি বিরক্ত না হয়ে আরো খুশী হন। আমার জীবনে তাঁর ছাড়া আর কোনো দান নেই। তাই আমার যা আছে সব কিছু তাঁকে দেয়ার জন্য এ দলিল লিখ্ছি। আমীন।

বিশ্ব এতিমদের বিশ্বনেতা ও বিশ্ব মুস্তাদআফ্দের রাসূল-ইমাম, বারাকাহ্, আইমান ও উসামাহ্কে নিয়ে মক্কা ও তায়েফ জয় করে মাদীনায় ফেরত যান। দেড় বছর মাদীনায় অবস্থান করে তাঁর পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ভাবেন ও স্থির করেন। নিজের জীবন ও সঙ্গী সাথীদের হিসেব, যোগ বিয়োগ ও ভাগ পূরণে মগ্ন হন। মাটির প্রজা খাঁটি হলে আরশের মনিব তাঁর খাতা তার কাছে খুলে ধরেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে আর কেইবা খাঁটি প্রজা হতে পারে? তাই আল্লাহ্ সূরা তওবা নাযিল করে তাঁর রাসূল সঃ এর রিসালাত জীবনের সাল-তামামী করে হাল-খাতা খোলার নির্দেশ দেন। সূরা তওবা নাযিল হলে রাসূল সঃ সঙ্গে সঙ্গে তা ঘোষণার জন্য নিজে মক্কায় হজ্জে আসেননি। মক্কায় মুশরিকদেরই প্রাক্তন পরিচিত ব্যক্তি নবদীক্ষিত মুসলিম আবু বকরকে তা প্রচার করতে তিনশত সঙ্গী সহ হজ্জ মৌসুমে মক্কা পাঠান। তারপর পূনঃ আল্লাহ্র নির্দেশে আলীকে পাঠান। মক্কায় আগত মুশ্রিকরা যেহেতু তাদের সব দেবীদের সেবাইত ঠাকুর বনী হাশেমের আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালেবকেই ঠাকুর পরিবারের প্রতিনিধি রূপে জানতো, তাই সে পরিবারেরই শেষ ঠাকুর আবু তালিবের পুত্র আলীর মুখেই তাদের দেব-দেবীর পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য আলীকে পাঠান। আলীই আরাফা ও মিনায় তা পাঠ করে শোনায়। মূলতঃ মক্কাকে শির্কের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করার সূচনা রূপেই আবু বকর ও আলীকে পাঠানো হয়েছিলো। আবু বকর ও আলী কাকেও নেতা বা খলিফা বানানোর ইংগীত রূপে নয়, যেমন বিপথগামী সুন্নী ও শিয়ারা বলে থাকে। আবু বকর ও আলীরা যে সে যাত্রা হজ্জব্রত পালন করেছে, তারো কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। কারণ, ইসলামে মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে হজ্জ বা সালাত আদায় করা যায় না। প্রথমে স্থানকে শির্কমুক্ত করতে হয়। তারপর পবিত্র অঙ্গনে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে বিশ্বঐক্যের ভিত্ সালাতের জামাত, জুমার জামাত, ঈদের জামাত ও সব শেষে হজ্জের জামাত ও খোত্বা দেয়া যায়। যেমন রাসূল সঃ মক্কার মিশ্রিত সমাজে কোনো জামাত করেননি। মাদীনায় গিয়ে শির্কমুক্ত অঙ্গনে সালাত ও জুমার প্রচলন করেন।

আবু বকর ও আলীকে দিয়ে কাফের মুশরিকদের শির্কের অপবিত্রতা নিয়ে মস্জিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাসূল সঃ তারপরের বছর হজ্জে আসার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। রাসূল সঃ এর জীবনে একটিই মাত্র হজ্জ। তারপরই তাঁর বিদায়। এজন্যই তাঁর হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয়।

১০ম হিজরীতে রাসূল সঃ হজ্জের জন্য রওয়ানা হন। এ হজ্জকে ক্বোরআনে “হজ্জে আকবর” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওমরা ছোটো হজ্জ। ব্যক্তি পর্যায়ে ওমরা পালিত হয় বলে তা ছোটো হজ্জ। বিশ্বজনীন রূপে আসল হজ্জ পালিত হয় বলে তাকে হজ্জে আকবর বলা হয়েছে। শুক্রবারে হজ্জ হলে যে তাকে আকবরী হজ্জ বলা হয়, এ বলাটা বিদ্আত, ভুল।

রাসূল সঃ এ হজ্জ যাত্রায়ও উসামাহ্কে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁর বাহনে রাদীফ আরাফা ও মিনায় উসামাহ্ই প্রায় সময় ছিলো। রাদীফ্ অর্থাৎ ঘোড়া, গাধা, খচ্চর বা উটের উপর যে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূল আরোহির সঙ্গী হয়। এ যাত্রায় আরাফায় মূল খোত্বা দানের সময় উসামাহ্কে রাসূল সঃ তাঁর রাদীফ্ রূপে সঙ্গে রাখেন। মুজ্দালেফা ও মিনায়ও তাই করেন। বিদায় হজ্জে রাসূল সঃ চিরদিনের জন্য ক্বোরেশদের প্রাধান্যকে জাহিলিয়্যাত ও বাতিল বলে ঘোষণা করে তাকে পদতলে পিষ্ট বলে অভিহিত করেন। এরপর থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা জাতি তাক্বওয়া ব্যতীত কোনো প্রাধান্য ও সম্মানের দাবী করতে পারবে না। কোনো আরব অনারবের উপর এবং কোনো অনারব

আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারবে না তাক্বওয়া ছাড়া। করলে তা জাহিলিয়্যাত বলে গণ্য ও বাতিল হবে। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে কোনো কৃষ্ণকায় নাক কানে দাগওয়ালা ব্যক্তিও আমীর ইমাম হলে তাকে বিনা বাক্যে মানতে হবে। রং ও বর্ণের জন্য তাকে অমান্য করা চলবেনা। তা করলে ঈমান থাকবেনা। এর সাথে আরো মূল্যবান ভাষণ ও উপদেশ রাসূল সঃ তাঁর শেষ ও একমাত্র হজ্জে দান করেন। সে সমস্ত কথা তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষন বলে বহুল প্রচারিত ও সবার জানা বলে তা এখানে উল্লেখ করা হলোনা। তাঁর ভাষণ শেষে সবার কাছ থেকে রাসূল সঃ সাক্ষ্য নেন যে তিনি তাঁর রিসালাত পৌছিয়েছেন কিনা। সবাই সমস্বরে সাক্ষ্য দেয় যে তিনি যথাযথ তাঁর রিসালাত পৌছিয়েছেন। তারপর হাত তুলে বললেন "আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন"। তারপর প্রায় সবার কাছ থেকে তিনি বিদায় নেন এ' বলে যে, হয়তো তাঁর চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। হয়তো তিনি পরের বছর তাঁর শ্রোতা মন্ডলীর মাঝে আর বেঁচে থাকবেন না। সে যাত্রায়ই "আল্ ইয়াউমা আকমাল্তু" ও সূরা নাস্র নাযিল হয়। তাতে বলা হয় "আজ আমি দ্বীনকে পূর্ণ করে আমার নে'মাতস্বরূপ তোমাদের দ্বীন ইসলামকে তোমাদের জন্য অনুমোদন দান করলাম।" যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসে, তখন দেখবে যে জনগণ সুশৃংখল সেনাবাহিনীর মতো আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করবে। এ বিজয়কে টিকিয়ে রাখার জন্য তোমাদের করণীয় হবে আল্লাহ্র প্রশংসায় তস্বিহ পাঠরত থাকা এবং ইস্তিগ্ফার করা। তিনি ভুল ত্রুটি তওবা করলে ক্ষমাকারী। (সূরা নাস্র)

লক্ষাধিক লোক নিয়ে রাসূল সঃ হজ্জপালন করেন। হজ্জপালন শেষে মাদীনা ফেরার পথে খুমের জলাশয়ের নিকট যাত্রা বিরতি করে আলীর প্রতি রাসূল সঃ এর ভালোবাসা ও তাঁর সম্পর্ক বর্ণনা করে তার প্রতি যত্নবান হতে উপদেশ দেন। কারণ কুটিল ক্বোরেশী চক্রের বনী হাশিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রাসূল সঃ এর অজানা ছিলোনা। বিশেষ করে বনী উমাইয়ার শত্রুতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। বনী হাশিমে জন্মিয়ে রাসূল সঃ যে বনী হাশিমের প্রতিপত্তি মিটিয়ে দিয়েছেন, এর সুযোগে হিংস্র বনী উমাইয়া তাদের পেছনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে বলে রাসূল সঃ আশঙ্কা করতেন। তা হলে আলী ও তার পরিবার লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে বলে আলীর প্রতি যত্নবান হতে সবাইকে বলে যান। শিয়ারা যে গাদীরে খুমে রাসূল সঃ এর কথাকে আলীর পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্তি বলে চালাতে চায়, তা ঠিক নয়। তা হলে রাসূল স্পষ্ট করে বলে যেতেন। শিয়ারা যে নির্লজ্জ ভাবে বলে যে আবু বকর ও উমরের ভয়ে রাসূল সঃ তা বলতে সাহস পাননি, তা তাদের রাসূল সঃ কে রাসূল রূপে অমান্য ও অবিশ্বাস ঘোষণার শামিল। রাসূল সঃ আবু বকর ও উমরকে ভয় করবেন কেনো? ইসলাম ও রাসূলের মেহেরবানী না হলে আবু বকর ও উমরের কী গুণ বা মূল্য ছিলো বা আছে যে আমরা তাদের স্মরণ করবো? আবু বকর ও উমরদের রাসূল পরওয়া করলে তাদের উসামাহর অধীনে সাধারণ সৈনিক করে কি করে শাসিয়ে যেতে পারেন যে "তোমরা উসামাহ্র আনুগত্য না করলে অভিশপ্ত হবে?"

রাসূল সঃ ফেরত মাদীনা পৌঁছুলে তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ হয় তাঁর কথিত অনুসারীদের "টোটাল ওয়ার ফুটিং ও মবিলাইজেশনের" পরীক্ষা নিতে। তাই তিনি করলেন। অন্যান্য সব অভিযানে রাসূল সঃ শুধু প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিতেন। লক্ষ্য সম্পর্কে বলতেন না। তা সম্পূর্ণ নিজের কাছে "টপ সিক্রেট" রাখতেন। এবার সাধারণ পরীক্ষা। তাই যেনো প্রশ্নপত্র আউট করে দিলেন। গরম মৌসুমে, ফসল কাটার সময় ও বহুদূর অভিযানে সবাইকে যেতে হবে। কারো অব্যাহতি নেই। অচল, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু ব্যতীত। কোনো অজুহাত আপত্তি চলবেনা। সবাইকে যেতে হবেই। তাই সবাইকে যেতে হলো। আলসেমী করে তিন জন যায় নি। তাদের চরম শাস্তি পোহাতে হলো। মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর থেকে সালতামামী ও কালতামামীর হিসাবের সূরা তওবা আয়াতের পর আয়াত নাযিল হচ্ছে। হিজরতের সময় সওর গুহায় আবু বকরের ব্যর্থতা থেকে, ইব্ন্ উবাইর মুনাফেক্বী ও বদ্রী সাহাবীর আলসেমী কিছুই বাদ যাচ্ছেনা। মাদীনার একদল সাহাবী তাদের ঈমানী ও মানসিক দুর্বলতা হেতু একটি মহল্লায় (?) মস্জিদ বানিয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের নিয়মানুবর্তিতা থেকে পাশ কাটাতে চেয়েছিলো। তারা যে কাফের মুনাফিক ছিলো বলে ঢালাও বলা হয়, তা ঠিক নয়। তা সত্য হলে মস্জিদ বানিয়ে তা আবার রাসূল সঃ এর দ্বারা উদ্বোধন করাতে যাবে কেনো? তা হলে তো মস্জিদ বানানো তাদের জন্য বিপদের কথা! কারণ, মস্জিদ বানালেই তা সবার জন্য উন্মুক্ত হতে হবে! তাও রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায়! তাই মূলতঃ ইসলামী ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো মস্জিদের স্থান নেই ইসলামে। কেন্দ্রের অনুমতি ও নির্দেশে রাষ্ট্রীয় ইমামের শৃঙ্খলায় দেশব্যাপী মস্জিদ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অলিতে গলিতে মস্জিদ নামের ঘর তুলে তাতে অনৈক্যের সালাত ক্বায়েম করলে, ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন, সে

মুসল্লীদের সবার জন্য ধ্বংস ও নিপাতন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রহীন সালাত ও তার মুসলমান জাতি সে অভিসম্পাতে নিমজ্জিত। মাদীনার সে মস্জিদে দেরার বা উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির মস্জিদের প্রজন্ম বর্তমান দেড়শ কোটি মুসলমানদের মসজিদগুলো। এগুলো তাদের অনৈক্যের সনদ ও প্রমাণ। তাদের কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় মস্জিদ হলো নিউইয়র্কের জাতিসংঘ দফতর। সূরা তওবা তার দলিল।

রাসূল সঃ এর পর পূর্ববর্তী ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্মবেসাতী রাব্বাঈ, হিব্র্ ও যাজকদের ফটো কপি ইবন আব্বাস ও তার শাগরিদ যুহরী ও পরবর্তী ব্যবসায়ী মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও বেতনভুক ইমামদের ধোলাই রয়েছে সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ আয়াতে। ওদের পথ ধরেই বর্তমান বিশ্বের মস্জিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামী রাজনৈতিক দল সমূহের ব্যাংকবীমা ও আরব তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলোর অনুদান ও চাঁদাখোর এনজিও সমূহ। আমাদের দেশের পীর ও সুফী দরবেশরাও এর আওতায়। আরব রাষ্ট্রসমূহের দূতাবাস গুলোতে কর্মরত রাষ্ট্রদূত গুলো এদের মধ্যে বড়ো চোর। আমি মক্কায় থাকাকালীন বাংলাদেশের সৌদী দূত ছিলো ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল খতীব। তার আমলে সৌদী বাংলাদেশ মৈত্রি সমিতির সভাপতি আমাকে জানালো যে ফুয়াদ তার সমিতিকে তিনলক্ষ সৌদী রিয়াল দেয়ার কথা বলে রিসিট তিন লাখের নিয়ে দুলাখ দিয়েই বলে, খালাস, মাফী গাইরুহ্। বাস এইই পেলে, আর পাবেনা। ফুয়াদের ভগ্নিপতি জেদ্দায় বড়ো ব্যবসায়ী, মুহাম্মাদ আল রাওয়ী। লোকটি ইখওয়ানীদের সমর্থক খাঁটি ঈমানদার। আমার স্পষ্ট মতামতের জন্য প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর ফুয়াদের চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে আমার নিকট আরো তথ্য পৌছায়। তাই একদিন আমি তার ভগ্নিপতিকে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ঘটনাটা বলি। ভদ্রলোক আমার কথা শুনেই, আমার হাত ধরে টেনে এনে তার গাড়ীতে বসিয়ে এক নির্মীয়মান বিরাট বাড়ীর সামনে নিয়ে উপস্থিত করলো। বাড়ীটি দেখিয়ে রাগে তার ভাঙ্গা-ভঙ্গা ইংরেজীতে বল্তে লাগলো, "হি ইজ এ থীফ্, হি ইজ এন ইম্পোস্টার এ্যান্ড এ বোম্বাষ্টিক লায়ার। হি ইজ বিল্ডিং দিস প্যালেস বাই ষ্টোলেন মানি। হিজ সান ইজ ঠু এ ভেরী ব্যাড বয়। হি ওয়ান্টেড টু টেক মাই ডটার ফর হিজ সান। আই সেইড্ ফার্ষ্ট ইউ গিভ মী দ্যা একাউন্ট অফ ইউর মানী! ইউ হ্যাভ নো বিজনেস অর সোর্স অফ ইনকাম টু আর্ন সাচ হিউজ মানী টু বিল্ড সাচ্ এ ম্যাসিভ্ প্যালেস। দেন হি কেপ্ট কোয়ায়েট। ডিড্ নট আস্ক্ মি ফারদার মাই ডটার ফর হিজ সান।"

এ বিশেষ একটি ঘটনাকে এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো যে বিশ্বে ইসলামের নামে যে হারামখোরী চলছে, তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা। যেখানে রাসূল সঃ এর ঘরে একদিন চুলা জ্বললে পর পর তিন দিন জ্বলেনি, তিনি পেটে পাথর বেঁধে পরিখা খনন করেছেন ও তাঁর মৃত্যুর সময় তার বর্ম ঋণের দায়ে গচ্ছিত ছিলো, সেখানে তার মৃত্যুর পর কেউ ওসমান গণী, ইবন আউফ কোটিপতি, তালহা ও যুবায়র মৃত্যুর কালে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন রেখে যাওয়ার মতো ঘটনার মূলে পৌঁছা।

নিজের কষ্টার্জিত হালাল মাল ও জান বিলিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ইসলাম। আল্লাহ্, রাসূল ও ধর্মের নাম বিক্রি করে চাঁদা খয়রাত জমা করে ব্যাংক বীমা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করে দশ তালা বাড়ী করে তা রক্ষার্থে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী ক্যাডার পোষা ইয়াহুদীদের কাজ। যা আল্লাহ্ সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ আয়াতে বলেছেন। মুয়াবিয়া এ পয়সা দিয়েই ব্যক্তিগত সৈন্য তৈরী করে মাদীনায় হত্যাকান্ড, গণধর্ষণ ও বংশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ করে আজ আমাদের এখানে ঠেকিয়েছে যে এ দেশের ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য যুব শক্তিকে অধ্যাপক গোলাম আযমরা ধনলিপ্সু নব্য ইয়াহুদী শ্রেণীতে পরিণত করছে। সূরা তওবা এদের মুখোষ উম্মোচক।

রাসূল সঃ তার রিসালাত পূর্ণ করে, বিদায় হজ্জ পালন করে, তাবুকের যুদ্ধে তার কথিত অনুসারীদের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে ও অনৈক্যের মাসজিদ গুড়িয়ে তাঁর পরীক্ষার চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখানে একটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বুঝতে ও স্মরণ রাখতে হবে। তা হলো যে একটি বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ তার ছাত্রদের পাঠ্য পড়িয়ে, তাদের টেষ্ট বা বাছনী পরীক্ষা করে তাদের বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য সেন্টআপ করেই তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ছাত্ররা পরবর্তীতে যে যেমন পরীক্ষা দিবে, তেমন তার ফলাফল হবে। তাদের পাশ ফেলে অধ্যক্ষের কোনো দায় দায়িত্ব থাকেনা। তার কাজ হলো সিলেবাস পড়িয়ে ঠিক বাছনী করে করে ছেড়ে দেয়া। নবী রাসূলদের কাজ সম্পূর্ণ এ রূপ না হলেও এর কাছাকাছি। إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

তুমি কখনো যাকে পছন্দ করবে, তাকে পাশ করাতে পারবেনা। বরং যে আল্লাহ্‌র কাছে পাশ করার চেষ্টা করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাকে পাশ করাবেন।

তবে অবশ্যই কিছু ছাত্র সম্পর্কে অধ্যক্ষ নিশ্চিত হয় যে তারা পাশ করবেই। শুধু তারা গোটা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কে কোন স্থান অধিকার করবে, তা জানেনা ও বলতে পারেনা। তদরূপ নবী রাসূলগণ অবশ্যই জানেন যে তাদের অনুসারীদের মধ্যে কারা বিশ্বস্ত অনুগত এবং কাদের আনুগত্য নিশ্চিত নয়। যেমন রাসূল সঃ মুস্তাদআফদের আনুগত্য সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মুস্তাকবির থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তাদের আনুগত্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন আম্মার সম্পর্কে বলেছেন যে আম্মার আমার দু'চোখের মধ্যস্থিত চর্ম বিশেষ, যায়দ যেমন আমার নিকট সকল মানুষ থেকে প্রিয় ছিলো, তারপর উসামাহ্ আমার নিকট প্রিয়তম এবং নেতৃত্বের জন্য অবশ্যই যোগ্যতম। অপরপক্ষে উহুদে নিহতদের পক্ষে যখন সাক্ষ্য দিয়ে তাদের দাফন করছিলেন, তখন আবু বকর তার পক্ষে রাসূল সঃ এর সাক্ষ্য চাইলে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে তাদের পরবর্তী কি আচরণ হবে সে সম্পর্কে তিনি জানেন না। তা শুনে আবু বকর প্রশ্ন করেছিলো যে তারা কি রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর বিদ্আত করবে? উত্তরে রাসূল সঃ হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছিলেন। তা শুনে আবু বকর কেঁদে ছিলো। (দেখো, মুয়াত্তা মালেক, উহুদের শহীদদের দাফন সংক্রান্ত অধ্যায়) আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃকে কি পর্যন্ত দূরদৃষ্টি দান করে ছিলেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। আবু বকরদের ব্যাপারে তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেন, !ولكن لا أدرى ما تحدثون بعدى অর্থাৎ তুহ্দিসূনা যার অর্থ হলো, আমার পর তোমরা কি কি বিদ্আত দাঁড় করাবে, আমি, তা জানিনা। তাই দেখতে পাই যে রাসূল সঃ এর লাশ মুবারক সামনে রেখেই বলে ফেললো, "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ"। অর্থাৎ ইমামরা শুধু ক্বোরেশ বংশ থেকে হবে। এর চেয়ে ডাহা বিদ্আত আর কিছু হতে পারে??!! ক্বোরআনে বর্ণিত তাক্বওয়ার মানদন্ড, রাসূল সঃ এর সারা জীবনের আদর্শ ও বিদায় হজ্জের সব কিছু শুধু মাত্র একটি বাক্য দিয়ে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলেছে।

অথচ তার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে ইব্ন্ মাসউদ মার খেয়ে সংজ্ঞা হারাচ্ছে, আম্মার নির্যাতনে মৃতপ্রায় হচ্ছে, কোনো বিদ্আতের পক্ষও নিচ্ছেনা, বিদ্আত করবে দূরের কথা। ঠিক উসামাহও তাই আলীর সম্মুখে আলীর লোকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে চুপে নির্বাসনে চলে গিয়েছে, তবুও কোনো বিদ্আত বা নুতন উপদ্রবের আশ্রয় নেয় নি। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল, খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন নিঃসন্দেহে সঠিক নির্বাচন করেছিলেন উসামাহ্কে আবু বকর, উমর ও আলীসহ সকল কথিত সাহাবীদের উপর। সূরা ক্বাসাসে সে ইংগীতই আল্লাহ্ করেছেন তাঁর রাসূলকে।

"কথিত সাহাবী" এ বিশেষ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য জাহেল ও মূর্খ শাইখুল হাদীস ও সাহাবী পূজারী মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও মোল্লারা না বুঝিয়ে দিলে বুঝবে না বিধায় এখানে তা একটু খোলাসা করে বলা প্রয়োজন মনে করছি। সাহাবী "সাহেব" থেকে। সাহেবরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গী হয়। তারা কখনো সে ব্যক্তির গোলাম বা অনুসারী সেবক হয়না। সফর সঙ্গী হলেও সাহেবরা সাহেবই থাকে। এদের আনুগত্য সর্বদা সীমিত ও শর্ত সাপেক্ষ। স্বার্থের হিসাবে মিললে তারা সঙ্গী। না মিললে নেই। যেমন হুদাইবিয়ায় সাহাবী উমর "সাহেবরা" করেছিলো। এরা নিজেদের মূলব্যক্তির সমান না হলেও নিজেদের কাছাকাছি দ্বিতীয় সারির লোক মনে করে। প্রথম ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা সে অপসারিত হলে তারা তার স্থান দখলের প্রতিযোগিতায় লেগে যায়। এমন কি প্রথম ব্যক্তির পুনঃবিবাহযোগ্য স্ত্রী থাকলে তাকে বিয়ে করার প্রতিযোগিতাও লেগে যায়। যেমন তালহা মা আয়শাকে রাসূল সঃ মারা গেলে বিয়ে করবে বলে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলো। এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে ঐ সাহেব বা সাহাবাদের রাসূল সঃ এর প্রতি আনুগত্য কোন পর্যায়ের ছিলো।

রাসূলদের যে সাহাবী হয়না, হয় দাসানুদাস অনুগামী, তার ধারণা ঐ ক্বোরেশী সাহেবদের হয়েছিলো না। তারা যায়দ, আম্মার, ইব্ন মাসউদ ও সালমানদের মতো আনুগত্যের ধারে কাছেও ছিলো না। যায়দ, আম্মাররা রাসূল সঃ এর কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করার কথা কল্পনা করেছে, এমন কোনো কথা কি ভাবাও যায়!? কিন্তু ঐ সাহেবরা শুধু ভেবেই থামেনি। তা মুখে উচ্চারণও করেছিলো। তাই আল্লাহ্ ঐ পাঠাগুলোকে অহী নাযিল করে বলে দিলেন ঃ

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ "নবী সকল মুমিনদের চেয়ে উত্তম। তাদের সমান নয়। তাঁর স্ত্রীরা

সকল মু'মিনদের মাতা।" এ বার মাকে বিয়ে করো! এ ছিলো ওদের মানবীয় সীমাবদ্ধতার নিকৃষ্ট আরব মরুর ঔদ্ধত্যতা। তাকে শায়েস্তা করার জন্য পূর্ণ রাসূল সঃকে তাদের মাঝে আল্লাহ্ পাঠিয়েছিলেন। ওদের পূর্ণ শায়েস্তা করার জন্যই প্রয়োজন ছিলো ওদের দৃষ্টিতে যায়দ গোলাম, ও বারাকাহ দাসীর বেটা "গোলামের পো গোলাম" উসামাহ্‌কে ওদের আমীর ও ইমাম নিয়োগ করা। তাই রাসূল করেছিলেন। রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর থেকে ৫৪ হিজরী পর্যন্ত আবু বকর, উমর, আলী, উসমান, তালহা, যুবায়র, সাআদ ইব্‌ন্ আবি ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ও আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাদের সন্তানরা উসামাহর ইমামত ও আমারতের আনুগত্য করলে একটি আদর্শ অনুগত মুসলিম প্রজন্ম জন্মাতো।

কিন্তু অতি তিক্ত হলেও সত্য যে তারা সে আনুগত্যটি না করে নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে এবং উম্মাহকেই ধংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, যার ফল ১৪১২ বছর পরও আমরা ভুগছি। সত্য ভেবে আমার সারা অস্তিত্ব শিউরে উঠে যে আবু বকর সামান্য এক বিন্দু রাসূলের হুকুম পালনের ফলে কেমন সুদূরপ্রসারী কল্যাণ তাদের ভাগ্যে নেমে এসেছিলো! যে কোনো বিবেচনায়ই হোক, আবু বকর ক্ষমতা দখল করে তারপর উমরদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে উসামাহর অভিযান পাঠিয়েছিলো। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়োজিত উসামাহ্ ঠিক রাসূল সঃ এর আদেশ অনুযায়ী ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। এ সংবাদ পেয়ে রোম সম্রাট তার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ, উসামাহ্‌র পিতা যায়দের মাত্র তিন হাজার সৈন্যের কান্ড তাদের মনে ছিলো। এবার ত্রিশ হাজার অর্থাৎ দশগুণ বেশী সংখ্যা নিয়ে তার ছেলে আসছে। তারা কি ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে তাদের আন্দাজ পূর্বেই হয়েছিলো। তাই নতুন অভিজ্ঞতার ঝুঁকি না নিয়ে তারা সৈন্য প্রত্যাহার করে তাদের সাম্রাজ্যের বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা বিনা প্রতিরোধে উসামাহ্‌র হাতে সমর্পণ করেছিলো।

ফিলিস্তীনের এ এলাকাটিতে রোমান সাম্রাজ্যের "আল্ দারুস" দূর্গ অবস্থিত ছিলো। এ দুর্গ থেকেই তাখূমুল বাল্‌ক্বা ও তার চার পার্শ্বের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। এবং গোটা এলাকার লোকদের অন্তরে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো যে, তারা আর কোনো শক্তির তাদের উপরে বিজয়ের সম্ভাবনা স্বপ্নেও কল্পনা করতোনা। তাই রাসূল সঃ উসামাহ্‌কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, উসামাহ্ যেনো সে এলাকায় পৌছে দুর্গকে ধুলিস্যাত করে পুরা এলাকায় মরুর ধুলিঝড় তুলে দেয়। যাতে ওখানকার লোকদের অন্তর থেকে রোমান সাম্রাজ্যের ভীতি দূর হয়ে যায়। আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয়তম উসামাহ্ রাসূল সঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী তাই করলো। এ এলাকা দিয়েই সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকা যাতায়াতের পথ ছিলো। উসামাহ্‌র বিজয়ে সে সব পথ পরবর্তী আবু বকর ও উমরদের সিরিয়া, মিশর ও আফ্রিকা বিজয়াভিযানের পথ খুলে দেয়। উসামাহ্ বাহিনী চল্লিশ হাজার উট ও চৌদ্দ লাখ মেষ বকরির পশু সম্পদই সে অভিযানে হস্তগত করে। তাছাড়াতো অন্যান্য গনিমতের মাল রয়েছেই। বলা হয় যে উসামাহ্‌র এ অভিযানে যে গনীমত পেয়েছে ও যে প্রভাব বিস্তার করেছে, অথচ একজন সৈন্য ক্ষয় হয়নি এবং এক ফোটা রক্তও বহেনি, এর দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে, দ্বিতীয়টি নেই। রাসূলের প্রিয়, বারাকাহ ও যায়েদের বরকতময় ছেলে উসামাহ্‌র এ ক্বাফেলাকে চলতে দিলে পরবর্তীতে কিনা হতে পারতো!? (উসামাহ্ ও উসামাহ্‌র এ অভিযান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখো: (১) ইসাবাহ, মুস্তাফা মুহাম্মাদ সংস্করণ ১ম খন্ড ৪৬ পৃষ্ঠা (২) আল ইস্তিআব ১ম খন্ড ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা (৩) তাক্বরীবুত্তাহ্‌যীব ১ম খন্ড ৫৩ পৃষ্ঠা (৪) তারীখুয যাহবী ২য় খন্ড ২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা (৫) তাবাক্বাতুল ক্বোবরা ৪র্থ খন্ড, ৬১-৭২ পৃষ্ঠা (৬) আল ইবার ১ম খন্ড ৯৫, পৃষ্ঠা (৭) মিন আব্‌তালিনা আল্লাযীনা সানাউত্তারীখ, আবিল ফুতুহ্ আত্ তাওআনেসী, ৩৩-৩৯ পৃষ্ঠা (৮) ক্বাদাতু ফ্‌াত্‌হিশ্ শাম ওয়া মিসর ৩৩-৫১ পৃষ্ঠা(৯) আল্ আলাম ওয়া মুরাজাআ, (২৮১-২৮২)

সকল অভিশাপের মা-বিদ্‌আত

ইবন মাসউদ বর্ণনা করেছে যে রাসূল সঃ বলেছেন, "উত্তম হাদীস আল্লাহ্‌র কিতাব, উত্তম পথপ্রদর্শন মুহাম্মাদ সঃ এর পথ প্রদর্শন। নিকৃষ্ট কাজ হলো সর্বপ্রকারের বিদ্‌আত। প্রত্যেক বিদআতকারী বিপথগামী এবং প্রত্যেক বিপথগামী জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি"। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজা ও আহমাদ)।

বিদ্‌আত মানে মিথ্যা এবং মিথ্যা মানে বিদ্‌আত। ভিত্তিহীন মিথ্যাকেই ইসলামী পরিভাষায় ও আরবীতে বিদ্‌আত্ বলা হয়। বিশেষ করে ধর্মীয়,আরো বিশেষ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের রিসালাত ভিত্তিক দ্বীনের শিক্ষা ও আচার আচরণে যে কোনো নুতন সংযোজন বিদ্‌আত। রাসূল সঃ নবীদের শেষ নবী ও খাতামুন্ নাবিয়্যীন। রাসূল মুহাম্মাদ সঃ

বলেছেন, "আমার রিসালাত দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন। আমার পর আর কোনো নবী রাসূল আসবেনা, এবং আমার দ্বারা পূর্ণ করা দ্বীনের ব্যাপারে যে কোনো কথা ও কাজ নুতন সংযোজন করা হবে, তা প্রত্যাখ্যাত ও বর্জিত।" কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি যে রাসূল সঃ এর নামে ও তাঁর প্রচারিত দ্বীনে এতো সব মিথ্যা বা বিদআত্ সংযোজিত হয়েছে যে তার উপদ্রবে আসল দ্বীনই খুঁজে পাওয়া যায়না। ফলে মানব ঐক্য ও রহমতের ধর্ম ইসলামের দাবীদার জাতি বিশ্বে সবচেয়ে বিভক্ত,বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন। তাই এ অবস্থার জন্য দায়ী অল্পকিছু বিদআতকে নিম্নে চিহ্নত করতে চাই। যাতে, চাইলে এক শ্রেণীর মানুষ তওবা করে নতুন করে ইসলামে প্রবেশ করে বিশ্বের মানুষের আসন্ন মুক্ত আন্দোলনে শরিক হতে পারে। আর যারা তা মানবে না, তারা বিদআত নিয়ে জাহান্নামে যাবে।

আত্মঘাতি মিথ্যা সমূহ

(এক) রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলা। (বোখারী, মুসলিম)

(দুই) আল্লাহ্ ও রাসূলের পর কথিত সাহাবীদেরও মানতে হবে বলা। (বোখারী, মুসলিম)

(তিন) খেলাফতে রাশেদা বলে চারের চক্র দাঁড় করা, যাদের চারজনের তিনজনই অন্তর্দ্বন্দ্বের অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

(চার) একটি মাত্র বংশ থেকে বেছে বেছে দশজনকে আগাম বেহেশত্ প্রাপ্ত, বা আশারায়ে মুবাশ্শারা বলে চালু করা। (বোখারী, মুসলিম)

(পাঁচ) রাসূল সঃ এর পর বারো জন খলিফা পর পর সবাই ক্বোরেশ থেকে হবে বলা। (বোখারী, মুসলিম)

(ছয়) রাসূল সঃ এর পর বারো জন ইমাম পরপর সবাই ক্বোরেশ থেকে হওয়া। (বোখারী, মুসলিম)

(সাত) রাসূল সঃ এর চল্লিশজন পুরুষের যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া, এবং একরাত্রে বিরামহীন ভাবে পরপর এগারো জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। (বোখারী, মুসলিম) অস্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া নবুওত ও রিসালাতের জন্য শর্ত নয়। তা ছাড়া রাসূল সঃ বলেছেন, যারা স্বামী স্ত্রীর মিলনকালের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করে, তারা নিকৃষ্ট নির্লজ্জ। তারপরও কি রাসূল সঃ স্বয়ং নিজেই স্ত্রীদের সাথে মিলে তা অন্যদের বলেছেন?! তা ছাড়া রাসূল সঃ এর কখনো একত্রে ন'জনের বেশী এগার জন স্ত্রী ছিলোনা। থাকলেও দু'চার জনের মাসিক থাকতো! একরাতে এগারো জনের সাথে মিলনের কথা বা ঘটনা কি কখনো সত্য হতে পারে? এ সমস্ত গর্হিত কথা বলে বিকৃত রুচি ও চরিত্রের মুহাদ্দিস ও আরবরা ইসলাম ও রাসূল সঃ এর শত্রুদের বলার সুযোগ ও প্রমাণ সরবরাহ করেছে যে, মুসলমানদের নবী যৌন বিকৃত যৌনোম্মাদ ছিলো। নাউযুবিল্লাহ্।

(আট) "রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকরা চলবে না।" অথচ ঈমানের পথে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মার সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারাই ঈমানী জীবন আরম্ভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা দেখতে পাই যে, হযরত ইব্রাহীম আঃ তাঁর পিতার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে মিল্লাতে ইব্রাহীমের পত্তন করেছেন। আখেরী নবী সঃ বদরের যুদ্ধে রক্তীয়দের কচুকাটা করে ইসলামের বিজয় যাত্রা শুরু করেন। বদরের নিহত রক্তীয়দের রাসূল সঃ বদরের ডোবায় দাফন কাফন ছাড়া নিক্ষেপ করেছেন। আপন মুশরিক পিতা-মাতার জন্য দোয়া করাও ছেড়েছেন। ক্বোরআনে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, "ঈমানদারেরা, তোমাদের যে সমস্ত বাপ ভাই ঈমানের চেয়ে কুফরকে ভালোবাসে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। যারা তা না করবে তারা যালিম।" মুসলিম নয়। (তওবা-২৩) ক্বোরআন, মিল্লাতে ইব্রাহীম ও রিসালাতে মুহাম্মাদী বর্জনকারী উমাইয়া ও আব্বাসী দস্যুরা ইসলামের নামে স্বজন প্রীতি ও স্বজন তোষন পোষণের জন্য তাদের ভাড়াটে মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির দ্বারা এগুলো তৈরী করেছে। এ যুগের চোর বাটপাররাও তাদের বংশ বৃদ্ধির জন্য ঐ সমস্ত মিথ্যা বিদআত ধারণ করে আসছে। এখন যারা সত্যিকারে মুসলিম ও ঈমানদার হতে চায়, তাদের সর্বপ্রথম সূরা তওবার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত অনুযায়ী পিতা- মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নয়, তাদের ঘোষণা দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কাফেলায় যোগ দিতে হবে। তা না হলে তারা যালিম ও ফাসেক বলে নিজেদের প্রমাণ করবে, আর আল্লাহ্ ফাসেক্বদের মুক্তির পথ দেখান না। তাদের ধ্বংস সাধন আল্লাহ্র বিধান। (সূরা তওবা -২৪)

(নয়) "মায়ের পায়ের নিচে বেহেশ্ত" এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে বাবা আদম বেহেশত্ পাবেন না। কারণ তাঁর মা নেই। তাই তাঁর বেহেশত নেই। মা থাকলেও মা বেহেশতী বা জান্নাতী হলেই তাদের সন্তানদের তার পদতলে জান্নাতের কল্পনা করা যায়। মা জাহান্নামী হলে কি লক্ষকোটি মাইল দূরের জাহান্নাম থেকে মায়ের ঠ্যাং টেনে এনে

বেহেশতে সন্তানদের মাথার উপর ঝুলানো হবে? এ কেমনতরো গাঁজাখোরী বিদআতী মিথ্যাচার!

হযরত ইব্রাহীম ও আখেরী নবী সঃ উভয় দু'মুশরিক জাহান্নামী দম্পতির সন্তান। তাঁদের পিতা-মাতার জান্নাতবাসী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা আল্লাহ্‌র ঘোষিত অমোঘ বিধানের নরকী। তাদের পদতলে জান্নাত হলে বাবা ইব্রাহিম ও খাতামুন নাবিয়্যীন কোথা যাবেন? নাউযুবিল্লাহ্!

তা ছাড়া জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যেক মানুষের কর্মের ফল। আল্লাহ্ তার দাতা। জান্নাত পেতে হলে তরবারি উচিয়ে বেঈমান রক্তীয়দের বদরের মতো ধরাশায়ী করে সে তরবারির ছায়াতলে জান্নাত তালাশ করতে হবে। আল জান্নাতু তাহতা যিলালিস সুয়ূফ। জান্নাত তরবারী সমূহের ছায়া তলে।

এ ব্যাপারে বড়োজোর রূপক অর্থে বলা যায় যে, মায়েরা যদি পিতার বিবাহিতা নেককার স্ত্রী হয়, নেক স্বামীর অনুগত হয়ে যদি নিজের বেহেশতের পথ করে নেয়, তা হলেই সে মায়েদের পায়ে পায়ে অনুসরণ করে জান্নাতে পৌঁছানো সহজ হতে পারে। তবুও তা কখনো আল্লাহ্‌র বেহেশত মায়েদের পায়ের তলায় নয়। ঢালাও ভাবে গর্ভধারিণীদের ব্যাপারে এ উদ্ভট কথা প্রচারের ফলে নিবোর্ধ নারীরা মনে করতে পারে, যে তারা যেভাবেই পেটে সন্তান নিক্‌না কেনো, সন্তানের জান্নাত তাদের পায়ের তলেই নির্ধারিত রূপে অবস্থিত। তাই বাপছাড়া জন্মানো হারামজাদারা ও হারামজাদিরাও তাদের মায়েদের অনুসরণ করে বেহেশত বা জান্নাতবাসী হয়ে যাবে? মায়েরা নীড় ও ঘরের প্রতীক। তারা স্রষ্টার বিধানে তাদের পেটের সতীত্ব রক্ষা করে স্বামীর ঘরকে শান্তি ও শিক্ষার ভূস্বর্গ বানালে, সে ঘরটি একটি বেহেশতের নমুনা বটে। কিন্তু পাশব যৌনক্ষুধার তাড়নায় বাপের বাড়ী ছেড়ে ঐরূপ আরেকটা পুরুষের সাথে মোল্লা কাজীর পকেটে হাজার পাঁচ শ' টাকার নোট গুঁজিয়ে কাবিনের কাগজ বানিয়ে হারাম হালাল নির্বিশেষে খেয়ে বেপর্দা বেহায়া চলে, ভিসিআর, ভিডিও ও ইন্টার নেটের প্রজন্ম জন্মায়ে মায়েরা নিজেদের বেহেশত হারাম করে ও সন্তানদের বেহেশত হারাম করে যারা নিজেদের ঘরবাড়ীকে জাহান্নামের গুচ্ছ গ্রাম বানায়, যা বর্তমানে প্রায় সব ঘরই তাই, সেখানে বেহেশত নামের বস্তুটার নাম উচ্চারণের অবকাশ কোথায়?

এ প্রসঙ্গে তিক্ত হলেও একটি খাঁটি কথা বলতে চাই। তা হলো, পিতা-মাতা তিন প্রকারের (১) পিতা-মাতা, মাতা-পিতা (২) পিতা-পিতা,মাতা-মাতা (৩) পিতাও পিতা নয়, মাতাও মাতা নয়। প্রথম শ্রেণীর পিতার মাঝে, পিতা ও মাতার উভয়ের গুণের সমন্বয় থাকে। মায়ের অনুপস্থিতিতে সন্তানদের, পিতা উভয় দায়িত্বে দেখা-শুনা করে। মায়ের মাঝে পিতার শাসনেরও গুনাবলী থাকে। ফলে পিতার অনুপস্থিতিতে মা বাপের দায়িত্বও পালন করে। এ শ্রেণীর স্বামী স্ত্রী উভয় মাতা-পিতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর পিতা, শুধু পিতা। সে পিতৃত্বের পূর্ণদায়িত্ব পালনে সক্ষম। মাতৃত্বের কোনো পরশ দিতে অক্ষম। মাতা, শুধু মাতা, সন্তানদের মায়ের আদরে পালতে জানে। পিতার শাসনে অক্ষম। এ অবস্থায় স্ত্রী, অর্থাৎ সন্তানদের মায়ের উপর ফরজ যে সে সন্তানদের লালন করবে ঠিকই, কিন্তু সন্তানদের কোনো দোষ সন্তানদের পিতা, তার স্বামীর কাছে লুকাবেনা। বরং সন্তানদের বলে দিতে হবে, যে তোমরা অন্যায় করলে তোমাদের বাবাকে বলে দেয়া হবে তোমাদের শাসনের জন্য। স্ত্রী সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে স্বামীকে সহায়তা করবে এবং নিজেও স্বামীর কথা শুনবে। মনে রাখতে হবে যে অবাধ্য মায়েদের সন্তানরা পিতাকেও মানেনা। সে ক্ষেত্রে সংসার ধ্বংসের জন্য মা দায়ী। এরা স্বামীর অনুগত হলে তারা পিতার সম্পূরক এবং স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামীর আমানত খেয়ানতকারিণী। তৃতীয় শ্রেণীর দম্পতি, এরা স্বামীও স্বামী নয়। স্ত্রীও স্ত্রী নয়। এরা সন্তান পেটে দিতে জানে ও সন্তান পেটে নিতে জানে। অন্য কিছু জানেও না করেও না। এরা ইতর প্রাণীর চেয়েও অধম। এরাও এদের সন্তানরাই বর্তমান মানব প্রজন্মের সংখ্যা গুরু। ডেমোক্রেট।

"নিসাউকুম্ হারসুল্লাকুম।" তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্য ফসলের মাঠ"। (বাক্বারা-২২৩) মাতৃজাতি ফসলের মাটি। পুরুষ কৃষক। কৃষককে মাটি কর্ষণ করে সার বীজ প্রয়োগ করে বুনন নিড়ান করে ফসল পাকা মাত্র তা মাটি থেকে আলাদা করে ফেলতে হয়। পাকা ফসল বা ফল পাকার পর মাটির সংস্পর্শে রাখলে মাতৃমাটি তাকে পঁচিয়ে শেষ করে দেয়। তাই ফল বা ফসল পাকার পর মাটির সংস্পর্শে দিতে নেই। দিলে কৃষকের সর্বনাশ হয়ে যায়।

তদরূপ সন্তানদের ভালো মায়েদের পেটে জন্মায়ে লালন পালনের শৈশব পার হতেই ক্রমে যৌবনের কাছে আস্‌তেই পিতার সংস্পর্শে ততোটুকু বেশী নিতে হবে, শৈশবে মায়ের কাছে যতটুকু বেশী ছিলো। তাতে পিতার ঐতিহ্যে সন্তান গড়ে উঠে পিতার বংশ অটুট থাকবে। তা না করে সন্তান বড়ো হওয়ার পরও মায়ের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে রাখলে তাদের পৌরুষ গড়ে উঠেনা। ফলে ছেলেরা বিশেষ করে মায়ের কোল থেকে বৌ এর কোলে গিয়ে পিতাকে বাড়ীতে লজিং

থাকা মাষ্টার বা আশ্রিত একপুরুষ সদস্যের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী আত্মঘাতি ভুল। এজন্য যে কোনো মূল্যে যৌথ পারিবারিক নিয়ম শক্ত ভাবে চালু রেখে পরিবারের প্রধান পুরুষের কর্তৃত্বকে "মিনি রাজত্ব" রূপে সবাইকে মানতে হবে। তা না হলে পশ্চিমা ইবলিসীর পরিবার ও ঘর ভাঙ্গা মহামারী থেকে মানব সভ্যতা বা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে কোনো প্রকারেই রক্ষা বা উদ্ধার করা যাবেনা।

পশ্চিমা জারজসভ্যতা মা মা করে, মানব সমাজে পিতার ভূমিকাকে কুকুর, শূকর, শিয়াল, বিড়াল ও ভেড়া বকরির নরের পর্যায়ে নিয়ে মানুষকে পশুর চেয়েও নিচে নিয়ে গিয়েছে। তাই আর একদিনও নষ্ট না করে "আল্‌জান্নাতু তাহ্‌তা আক্বদামিল্ উম্মাহাতের" বিদআতকে ত্যাগ করে দাদা পিতার ইসলামী কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেই পশ্চিমা পরিবার ও ঘর ভাঙ্গা প্লাবনে ভাসা মানুষগুলো ইসলামের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়ে মানব সভ্যতার হারানো সূত্র "মিসিং লিঙ্ক" ফেরত পাবে। (পরে "মিসিং লিঙ্ক" বা হারানো সূত্রের অধ্যায় আসছে)

বেইজিং ও কায়রো সম্মেলনে বিশ্বের বেশ্যামেয়ে ও তাদের পুরুষ দালালরা যে বিশ্বে বেশ্যায়নের ইশ্‌তিহার বা চার্টার ঘোষণা করেছে, তা মানব সভ্যতার মৃত্যু-ঘন্টা। তা থেকে আদম সন্তান ও নবী রাসূলদের প্রজন্মকে রক্ষা করে বিশ্বে পুনঃ আল্লাহ্‌র খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও ইবলিসের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও যৌনাঙ্গের স্বাধীনতার প্রবক্তাদের স্তব্ধ করতে এখনি দিগ্বিজয়ী ধ্বনি তুলতে হবে, যে সতীত্ব রক্ষা করে, সহধর্মিনীর বিবাহের মাধ্যমে যারা বিশ্বস্ত স্বামীর ঘর করে সন্তান ধারণ করবে, তারাই মা, জায়া ও জননী। অন্যরা সব বেশ্যা ও তাদের সন্তানরা অবৈধ প্রজন্ম। এইডস রোগ দিয়ে আল্লাহ্ এ আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছেন। **এখন কর্তব্য হলো, এ বইতে লেখা "এ ছিলেন মুহাম্মাদ, এ হলো ইসলাম, বর্ণবাদ নয়, সকল বর্ণের সমাহার ও অন্যরা যা বলে তা নয়" এর মর্ম বুঝে যায়দ, বিলাল, ইবন মাসউদ, আম্মার ও সালমানদের মতো মুস্তাদআফ হয়ে উসামাহ্ আদর্শের নেতৃত্বের পতাকা তুলে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের নাম ঝুলিয়ে যে বিপদগামী বিভ্রান্তকারীরা ঘরভাঙ্গা নারীদের পেছনে পালা বদলের কাজী গিরি করে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে উৎখাত করে নির্মূল করা। এরাই বড়ো দাজ্জাল আসার পূর্বে ক্ষুদে দাজ্জাল। বড়ো দাজ্জাল আসার জন্য এরা ক্ষেত্র তৈরী করছে।**

ভালো করে বুঝতে হবে যে যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ্ বা মুস্তাদআফ বলতে সর্বহারাদের দল বুঝায়না। সর্বভোগীদের ন্যায় সর্বহারারাও সমাজের কলঙ্ক। সর্বত্যাগী মানব শ্রেণী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব প্রজন্ম। এদের সংখ্যা যতই কম হোক, তারা নবী রাসূলদের দল, হিযবুল্লাহ। তাদের সাথে আল্লাহ্ ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। সর্বত্যাগীরা সংঘবদ্ধ নয় বলে তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসছেনা। যা-ই দেয়া হয়, সবই হারায়, কিছুই রাখতে জানেনা, তারা সর্বহারা। তাদের শুধু সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনের বেশী তাদের হাতে দেয়া চলবেনা, দিলেই আবার নষ্ট হবে, আবার হারাবে। তাদের কোনো দায়িত্বও দেয়া হবেনা। তাহলে তাদের উপর যুলুম করা হবে। যে যার যোগ্য নয়, তার উপর সে বোঝা চাপিয়ে দেয়া ইসলামে নিষেধ। (সূরা নিসা-৫) যারা যা পায়, সব খায়, আরো আহরণ করে, আরো খায়, তারা সর্বভুক, সর্বভোগী। এরা তাগুত ও মুস্তাকবির। তারা বর্তমান সমাজ ও যুগের আবু জেহ্‌ল, আবু লাহ্‌ব, আবু সুফয়ান, মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াযীদ। রাসূল সঃ কর্তৃক এরা উৎখাত হলে পর, পুনঃ বিদআত চালু হলে এরা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবু বকর উমররা তাদের নব দীক্ষার সীমাবদ্ধতায় বিদআত করে ওদের পুনঃ আসার পথ করে দিয়ে নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তাদের সন্তানদেরও নির্মূল হওয়ার পথ করে যায়। তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহন করে আমরা সকল বিদ্‌আত ত্যাগ করে শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলদের আনুগত্যের "প্রাণপণ" বা "বায়আত্" করবো। তাহলে আল্লাহ্ আমাদের সে জাতিরূপে বেছে নেবেন, যাদের দিয়ে পুনঃ বিশ্বকে তিনি সাজাবেন বলে সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন। এখন আমাদের সকল পুরাতন বিদআত অন্তর থেকে মুছে ফেলে আমরা ভবিষ্যতে আর কোনো বিদআত করবোনা, তার শপথ নিতে হবে। আমি সে সব প্রস্তাব স্বয়ং পূর্ণ করেই সজ্জনদের সে পথে ডাকছি। আল্লাহ্ তুমি আমার ডাককে সবার কাছে পৌছে দাও। আমীন।

(দশ) কথিত রাসূল সঃ এর পরিবার, বনী হাশেম ও আব্বাসের বংশধররা যাকাত খাবেনা। তা তাদের জন্য হারাম। মুয়াত্তা, দারেমী, নাসায়ীও মাসনাদে আহমাদে যখন দেখি যে রাসূল সঃ তাঁর আহলে বাইতের জন্য যাকাত্ সদকা খাওয়া জায়েয নয়, তখন আমার নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে রাসূল সঃ ও তাঁর সত্যিকারের অনুসারিই তাঁর আহলে বাইত। ক্বোরআনে আল্লাহ্ সকল রাসূলদের আদেশ করেছেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

"হে রাসূল সম্প্রদায়, তোমরা সর্বদা হালাল খাবে, তারপর ভালো কাজ করবে।" ঈমান ও আমলের পূর্বশর্ত হালাল খাওয়া ও হালাল পরা। হারাম খেয়ে-পরে ঈমান-আমল হয়না। তাই নবী রাসূলদের প্রত্যেক অনুসারী দ্বীনের ধারক বাহককে হালাল খেতেই হবে। তবেই তারা নবী রাসূলদের আহলে বাইত হবে। তা না হলে নবীদের স্ত্রী ও ছেলে সন্তানরাও তাঁদের আহলে বাইত নয়। এ অবস্থায় সুদখোর আব্বাস ও বাইতুল মালের অর্থচোর, এবং সে লুণ্ঠিত ধনে তায়েফে প্রাসাদ তৈরী করে তাতে নিত্য নতুন নারীভোগী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসের বংশধরের যাকাত সদক্বা হারাম হওয়ার হাদীস ইসলামের সাথে নির্দয় উপহাস বই কিছু নয়। পূর্বে যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে আব্বাস আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেনি, সে তার অবৈধ প্রণয়ী হিন্দার স্বামী আবু সুফইয়ানের প্রাণরক্ষার জন্য চাচা হওয়ার সুবাদে রাসূল সঃ এর সাথে মিশে ছিলো মাত্র। আব্বাস আদৌ ঈমান আনলে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই আবু সুফইয়ানকে হত্যা করার ব্যবস্থা করতো। তা হলেই আব্বাসের অতীত পাপের কিছু কাফ্ফারা হতো। সে কাজটি না করে সে কুট-কৌশলে ইসলামের চির-শত্রু আবু সুফইয়ান, হিন্দা ও মুয়াবিয়াকে রক্ষা করেছিলো। পরে আব্বাস আবু সুফইয়ানের জয়েন্ট ভেনচারের দু'ভাই, ইবন আব্বাস ও মুয়াবিয়া মিলেই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পরবর্তীতে সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী উমাইয়া আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রস্তর রেখে যায়। তাই আব্বাসের বংশধরের জন্য যাকাত সদক্বা হারামের ফতোয়া শকুনের জন্য মরা গরু হারাম হওয়ার ফতোয়ার মতো কৌতুকের নামান্তর । আজ আমি যখন এ লাইনগুলো লিখছি, আজ শুক্রবার। পার্শ্বের মসজিদ থেকে বেতনভুক মোল্লার খোতবা পড়া শোনা যাচ্ছে। ঠিক এ মুহূর্তে নির্বোধ তোতাপাখি পড়ছে শুনছি , "আল্লাহুম্মাগ্ফির লি আব্বাস ওয়া ওলাদিহি ...।" আল্লাহ্ তুমি আব্বাস ও তার ছেলের জাহেরী-বাতেনী সকল গুনাহ মাফ করে দাও । আব্বাসী সাম্রাজ্যের আমলের দিনারের বিনিময়ে দ্বীন বিক্রিকারীদের বানানো খোতবার আদলে থানবীদের বানানো খোতবা পড়ে আজো তাদের পাপের বোঝা আমাদের উপর চাপাচ্ছে। এ সমস্ত বিদ্আতের পাপে গোটা মুসলিম জাতি "এখন মরে তো তখন মরে"। তবু ভুল বর্জন করে নতুন জীবন প্রাপ্তির জন্য আহ্বানকারী কেউ নেই । আমি সে ডাক দিচ্ছি ।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা

মহান আল্লাহ একমাত্র সত্য। তার বিধান একমাত্র সত্য বিধান। তাঁকে যারা বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে যারা নিজের সকল সত্তাকে সমর্পণ করে, একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবনের প্রতিটি কাজ করে এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটায়, তারাই সত্য, সত্যবাদী মানুষ, সত্যধর্মী ও কালজয়ী সত্যের প্রতীক। এদের জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু নেই। এরাই আদর্শ মুসলিম ও মু'মিন। রাদি আল্লাহু আনহুম ওয়া রাদুআন্হু। আল্লাহ্ এদের প্রতি তুষ্ট, তারাও তাঁর প্রতি তুষ্ট। এরা কখনো কোনো জাতি, বর্ণ ও গোত্রের হয়না। শয়তান এদের কখনো বিপথগামী করতে পারেনা। কখনো শয়তান এসে প্ররোচনার উদ্দেশ্যে এদের স্পর্শ করা মাত্র এরা আরো সজাগ ও সতর্ক হয়ে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ এদের কথাই আল ক্বোরআনে বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (সূরা আরাফ- ২০১)

আখেরী নবী সঃ এর সঙ্গীদের মধ্যে যায়দ, বিলাল, আম্মার ,ইবনে মাসউদ, সালমান ও উসামাহ্রা এ শ্রেণীভূক্ত ছিল। ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শয়তান এদের সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কারণ, তারা রাসূলের পূর্ণ অনুসারী ছিলো। তারপর মাদীনার আন্সাররা। অভিশপ্ত, ঘৃণিত শয়তান সকল অসত্য তথা মিথ্যার উৎস, খলনায়ক। বাবা আদমের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর সন্তান মানব জাতিকে বিপথগামী করার পথ প্রদর্শক খলনায়ক সে। সে-ই মানুষকে রক্ত, বর্ণ, গোত্র ,ভাষা ও বিভক্ত রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন করে। বর্তমান বিশ্ব শয়তানের সে বিচ্ছিন্নতাবাদের নরক। ইয়াহুদী, খৃষ্টান চক্রের-লীলাভূমি আমেরিকার ইউএন হেড কোয়ার্টার এদের মক্কা ও কাবা। এরা সদস্য রাষ্ট্রের সরকার ও তার সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা নির্বিশেষে শয়তানের অনুসারী মানুষ শয়তান। বা ন্যূনতম শয়তানের ভাই। আল্লাহ্ ক্বোরআনে এদের শয়তানের ভাই নাম করে বলেছেন,

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

"শয়তানের ভাই মানুষদের বিপথগামী করার জন্য শয়তান এসে স্পর্শ করা মাত্রই তারা শয়তানের সকল কাজ সমাধা করে দেয়। তাতে তারা সামান্যতম কসূর করেনা।" (সূরা আ'রাফ-২০২) এরা আল্লাহ্র উপর অসন্তুষ্ট, শয়তানের

উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ এদের প্রতি অসন্তুষ্ট। শয়তানও এদের দায়-দায়িত্বমুক্ত। আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ সবার জানা। এদের ব্যাপারে শয়তানের দায়-দায়িত্বমুক্ত হওয়ার কারণ হলো, এরা তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরে শয়তানের কথা শুনে তারাও জাহান্নামী হয়েছে এবং শয়তানেরও পাপ বৃদ্ধি করেছে। এরা ক্বেয়ামতের দিন শয়তানকে দোষারোপ করলে শয়তান বলবে, "আমার কোনো দোষ নেই, তোমরা আমার কথায় আল্লাহর অবাধ্য হলে কেনো? আমি কি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, না লালন-পালন করেছি? করেছেন তো আল্লাহ্! তোমরা প্রত্যেকে নিজেরা নিজেদের দোষারোপ ও অভিসম্পাত করো। আজ আমি তোমাদের উদ্ধার করতে পারবোনা। তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে পারবেনা। তোমরা যে মুহুর্তে শির্ক করেছো, ঠিক সে মুহুর্তেই আমি তোমাদের ত্যাগ করেছি। তোমাদের ন্যায় যালেমদের নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি হওয়া উচিৎ।" (সূরা ইব্রাহীম-২২)

শয়তানের এ অনুসারীরা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিভেদ, গোত্রভেদ, ভাষাভেদ, বর্ণভেদ ও রক্তভেদ নিয়ে মানুষকে বিভক্ত করে আসছে। ইয়াহুদী বর্ণবাদের পর ইসলামের শেষ নবী এসে এর নির্মূল ঘোষণা করার পর তাঁর মৃত্যুর পর যারা পুনঃ ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া, আব্বাসী, সাইয়েদ, সিদ্দিকী, ফারুকী ও উসমানী প্রভৃতির দাবি করে তার প্রচলন করেছে, ও বর্তমানে করছে, তারা নির্বিশেষে ঐ ইবলিস্ শয়তানের অনুসারী খলনায়ক।

রাসূলুল্লাহর বিদায়ের পর আবু বকর ও উমরের সীমাবদ্ধতার ভুলের ফাঁকে ঢুকে যারা সকল বৈষম্যবাদ দূরকারী দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে পুনঃ বৈষম্যবাদের আগুন জ্বালিয়েছে, তাও আবার ইসলামের নামে, তারা মানব ইতিহাসে নিকৃষ্টতম প্রজাতি। তারা তাদের জঘণ্যতম পাপের কুৎসিত চেহারাকে ঢাকার জন্য এক বানোয়াট কল্পিত খলনায়ক দাঁড় করিয়ে তাকেও তাদের ভাড়াটে প্রচারবিদদের দ্বারা প্রচার করে ভাড়াটে ঐতিহাসিকদের দ্বারা মিথ্যাকাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে। কিন্তু মিথ্যা মিথ্যাই। নিজেই নিজের অসত্যতা প্রমাণ করে।

আবু বকর ও উমরের সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইসলামীযুগ থেকে ওসমান যখন উপরে বর্ণিত পন্থায় বনু উমাইয়ার কাফেরদের হাতে ইস্‌লামী উম্মাহর ভাগ্য হস্তান্তর আরম্ভ করে, তখন তার বিষক্রিয়া আরম্ভ হলে মিশর, ইয়ামেন ও ইরাকসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মযলুম মুস্তাদআফরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে মাদীনা এসে রাসূল সঃ এর রওজা ঘিরে মসজিদে নববীতে অবস্থান নেয়। মাদীনায় পাঁচ ওয়াক্ত আযানের সাথে মসজিদে নববীতে সালাতের জামাত হচ্ছে। ওসমান খলিফা হিসাবে সালাতের ইমামতিও করে। তার কাছে তার নিয়োগকৃত উমাইয়া বংশের ঘাতকদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে মযলুমরা কোনো ন্যায় বিচার পাচ্ছেনা। বরং খলিফার চাচাতো ভাই, মেয়ের জামাই ও প্রধান মন্ত্রী মারওয়ানের লেলানো সন্ত্রাসীদের হাতে ফরিয়াদীরা নির্যাতিত হচ্ছে। তাও আবার রাসূল সঃ এর মাস্‌জিদ ও তার চত্বরে!

মাদীনায় উপস্থিত আলী, তালহা, যুবায়র, আব্দুর রহমান ইব্‌ন্ আউফ ও সাআদ ইবন আবি ওয়াক্‌কাসদের নিকট প্রতিবাদীরা তাদের অভিযোগ পেশ করলে এরা গিয়ে বার বার ওসমানকে ন্যায় বিচার করতে বললে ওসমান তাদের কথা শোনা দূরে থাক, তাদেরই তার মারওয়ান বাহিনী দিয়ে লাঞ্চিত ও অপমানিত করে। মা আয়শা প্রতিবাদ করে ওসমানের বকা শুনে। আবু যার গিফারী প্রতিবাদ করে নির্বাসিত হয়। এ অবস্থায় কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলী ও তালহারা নিরুপায় হয়ে বিভিন্নজন মাদীনা ছেড়ে মাদীনার বাইরে চলে যায়। নয়তো দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে যায়। মাসকে মাস এমনকি বছরের পর বছর এ অবস্থা চলছে। ওসমান তার বংশীয়রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ বিরামহীন চালিয়ে যাচ্ছে। বাহির থেকে আসা মযলুমদের পক্ষে ওসমানকে আল্লাহ্, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর আদিষ্ট সদোপদেশ দেয়ার অপরাধে আম্মার ইবন ইয়াসিরকে ইবন মাসউদের মতো মেরে আধা মরা করে প্রাসাদের বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে মাদীনায় খবর পৌছায় যে ওসমানের দক্ষিণ হস্ত, মুয়াবিয়া প্রাক্তন রোমান সাম্রাজ্যের সেনাদের ঔরসজাত ভাড়াটিয়া চারহাজার উমাইয়া সাম্রাজ্যবাদের অনুগত সশস্ত্র সৈন্য ওসমানের পক্ষে প্রতিবাদীদের নির্মূল করার জন্য পাঠিয়েছে। তারা মাদীনায় পৌছালেই হাযার হাযার ন্যায়বিচার প্রার্থী কচুকাটা হবে এবং মাদীনাবাসীও মরবে, যেমনটি মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের বাহিনী পরবর্তীতে মাদীনায় হত্যাযজ্ঞ ও গণধর্ষণের মাধ্যমে ঘটিয়েছিলো।

এ অবস্থার পরেই হয়তো প্রতিবাদী ন্যায়বিচার প্রার্থীরা একা ওসমানকে হত্যা করে সে যাত্রা মাদীনাকে মুয়াবিয়ার বাহিনীর ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করে। ওসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছালে পর আর মুয়াবিয়ার সৈন্যরা মাদীনায় আসেনি। মধ্যপথ থেকেই ফেরত চলে যায়। ওসমানকে এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়ে মারওয়ান ও মুয়াবিয়া তাদের যৌথ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করে থাকলেও ওসমানই তাদের সে পথ ও সুযোগ

করে দেয়।

ওসমানের এ দুঃখজনক ক্রিয়াকলাপ ও তার ফলশ্রুতিতে তার নিহত হওয়ার পর একের পর এক শোকাবহ ঘটনা ঘটে শেষপর্যন্ত বিশ্বরহমতের ইমামত বিশ্বলানতের উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিরবিদায় নেয়। ওসমানের অপকীর্তি, মুয়াবিয়া ও মারওয়ানের ষড়যন্ত্র এবং সবশেষে উমাইয়া ও আব্বাসী রাজতন্ত্রের কুৎসিত ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য করার অপচেষ্টায় ওদের উচ্ছিষ্টভোগীরা একটি খলনায়কের কল্পিত কাহিনী প্রচার করে যায়। সে খলনায়কটি হলো "আব্দুল্লাহ ইবন সাবা"। তাকে কোথাও কোথাও "ইবনুস সাওদা" বলেও চিহ্নিত করা হয়।

নির্লজ্জ মিথ্যুকরা গল্প তৈরী করে যে ইয়ামেনের একব্যক্তি, যার মা ইয়াহুদী ও পিতা খৃষ্টান, সে মিথ্যা মুসলমান হয়ে নাকি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর উদ্দেশ্যে আলীর পক্ষ অবলম্বন করে মিশর, ইয়ামেন ও ইরাক ভ্রমণ করে ওসমান, মুয়াবিয়া ও মারওয়ানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে চারদিকে, মহালাজুক, যিন্নুরাইন ও তৃতীয় রাশেদ খলিফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াযীদের উম্মত সুন্নীদের পুস্তকে এ আব্দুল্লাহ ইবন্ সাবার উল্লেখ পেলেও আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পড়া লেখায় কোনো নির্ভরযোগ্য বই কিতাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খলনায়কের বস্তুনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ পাইনি। আমার আল্লাহপ্রদত্ত বিবেকচালিত গবেষনায় বলা চলে, আমি হন্যে হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে খুঁজে বের করে তার সকল গোমর ফাঁস করার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাই। মক্কায় হিজরতে ন'বছর কাটানোর সময় মক্কায় আগত ও মক্কাবাসী বহু জ্ঞানী গুণীদের নিকট এ সাংঘাতিক দুষ্টলোকটির খোঁজ খবর নেই। হালকা মাঝারী ধরনের সুন্নী ও শিয়া শেখদের কাছে কিছু বর্ণনা পেলেও তার তথ্য সূত্র চাইলে বেচারারা কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে যেতো।

এভাবেই একবার এককালীন শেইখুল আয্হার, অর্থাৎ আল আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আব্দুল হালিম মাহমুদকে আমি হারাম শরীফের চত্বরে ইবনে সাবা সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করি। সুফী ধরনের ঠান্ডা লোকটি আমাকে বলে ফেললো যে এ নামের লোকের কোনো অস্তিত্ব তুমি কোথাও খুঁজে পাবেনা। কারণ যা নেই, কি করে তুমি তা খুঁজে বের করবে? এ'তো কল্প কাহিনী রচনাকারীদের মিথ্যা প্রচার! কথাটি শুনে আমার পছন্দ হলো ঠিকই। কিন্তু কোনো জিনিস শুনেই তার প্রমাণাদি না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মত বদলানোর মতো মন আল্লাহ্ আমাকে দেননি। যে ইবন সাবাকে নিয়ে এতো বড়ো একটি ফিত্না দাঁড় করানো হয়েছে, তাকে তো সহজে মুছে ফেলা যায়না! তাই আমি আরো গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাতেই থাকলাম।

এরপর মিশরের গবেষক ডঃ মুস্তাফা কামাল আল্ শাইবীর বই "আস্সিলাতু বাইনা আত্তাসাউফ ওয়াত্ তাশাইয়ু" বইটি আমার হাতে আসে। ডঃ মুস্তাফা অসংখ্য প্রমাণ দিয়ে খন্ডন করেছে এমন কোনো ব্যক্তি আদৌ ছিলো না বলে। তার গ্রন্থে একটি তাক্ লাগিয়ে দেয়া তথ্য তুলে ধরে আমাকে আরো অবাক করে দেয় যে রাসূল সঃ এর মুখে যে গোটা পরিবারকে জান্নাতবাসী বলে সুসংবাদ দিয়েছেন, যে পরিবারের তিনজনই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ, তাদের চতুর্থ প্রাণে বেচে যাওয়া ব্যক্তিকেই উমাইয়া ও আব্বাসীরা আব্দুল্লাহ ইব্ন্ সাবা বলে প্রচার করেছে। সে লোকটি হলো, 'আম্মার ইব্ন্ ইয়াসির'। যার মাতা-পিতা ও ভাই মক্কার আবু জেহেল ও তার ঘাতকদের হাতে নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেছিলো। একমাত্র আম্মারই বেঁচে যায়। তারপর যেহেতু রাসূল সঃ এর বহুল প্রচারিত এরশাদে সন্দেহাতীত প্রমাণিত যে আম্মারকে যারা হত্যা করবে তারাই বিপথগামী, এবং ওসমান, মারওয়ান ও মুয়াবিয়া চক্রই যেহেতু আম্মারের উপর রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর অত্যাচারকারী এবং শেষ পর্যন্ত তার হত্যাকারীও, সেহেতু ঐ নরপিচাশরা আম্মারকেই ইবন সাবার কল্পিত কাহিনীর নায়ক বানিয়েছে। কারণ আম্মারের পিতা যেহেতু ইয়ামেনী ছিলো এবং তার মাও কালো ছিলো, তাই তাকে কোথাও আব্দুল্লাহ ইব্ন্ সাবা এবং কোথাও ইবনুস সাওদা, অর্থাৎ "কালির বেটা" বলে উমাইয়াদের আমলে চিত্রিত করে। এ সময়েই উমাইয়া ও তাদের সুন্নীরা আলীকে দীর্ঘ ষাট বছর যাবত খুতবায় গাল-মন্দ চালু করে। ডঃ মুস্তাফার বই পড়ার পর আমি তথ্য পেলেও মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলাম না।

এ ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমি একদিন হঠাৎ করে মানসিক ও রুহানী প্রমাণও পেয়ে যাই যে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাবার পুরো ব্যাপারটিই মিথ্যে, কল্পিত ও খোদ শয়তানের প্রম্পট্ করা এক মিথ্যা উপাখ্যান। আল্লাহ্ আমার মনে দেন যে যদি ঐধরনের একটি খলনায়ক দাজ্জাল সত্যিই হয়ে থাকে, যার জন্মসূত্র ও পরিচয়ের বাস্তবতাই শোনা ও গৌণ, সে লোকটির অপপ্রচারে যদি সকল মুসলমান নামধারী লোকেরা কথিত রাসূল সঃ এর যিন্নুরাইন ও তৃতীয় খলিফা

ওসমানের বিরুদ্ধে চলে যায়, তা হলে তারা তো রাসূলের চেয়ে ইব্ন্ সাবাকেই বেশী বিশ্বাস করেছিল?! প্রকারান্তরে তারা ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষা ত্যাগ করে ঐ ড্যুবিয়াস লোকটির দীক্ষাই গ্রহণ করেছিল! ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর শিক্ষা হলো যে, কোনো ফাসিক্ব ব্যক্তি যদি কোনো একটি কথা প্রচার করে, তা হলে তা বিশ্বাস করার পূর্বে ভালো করে যাচাই বাছাই করতে হবে। (সূরা হুজুরাত-৬)। ওসমানের বিরুদ্ধে সে লোকটির কথায় যখন আলী, মা আয়শা, তালহা, যুবায়র, আবু যার, আম্মার, ইব্ন্ মাসউদ ও সাআদ ইব্ন্ আবি ওয়াক্কাস সহ সবার মাথা এমন খারাপ হলো যে তারা ঐ লোকটির কথা বিশ্বাস করলো, ক্বোরআন ও রাসূলের শিক্ষা মানলোনা, সে অবস্থায় ওসমান বিদ্রোহীদের হাতে ভেড়া বকরির মতো জবাই হলো প্রায় দু'মাস কাল গৃহে অবরুদ্ধ থেকে, তারপক্ষে এরা কেউই তলওয়ার ধরলোনা, নিহত হওয়ার পর তার দাফন কাফনের উদ্যোগও এরা নেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তার পচা লাশ জানাযা ছাড়াই ইয়াহুদীদের গোরস্থানে রাতের অন্ধকারে কোনো প্রকার মাটি চাপা দেয়া হয়, তখন এর কি কোনোই মূল্যায়ন হবেনা? এ তো কখনো কল্পনা করা যায়না যে মা আয়শা, তালহা, যুবায়র ও আলী গংরা আব্দুল্লাহ ইবন সাবা নামের একটি মাত্র লোকের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে ওসমানের বিরুদ্ধে চলে যায়, এবং ওসমান একাই হক্ব এবং ন্যায়ের উপর অনড় অটল রয়ে যায়?! এ-ই যদি ওদের ঈমানের মান ও শ্রেণী হয়, তা হলে তো এরা আল্লাহ্, ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর কোনো ধর্তব্য অনুসারীই ছিলো না! নাউযুবিল্লাহ। তা হলে তো ঝাড়ুমেরে এদের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা উচিত। এরা কোনো শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্রই ছিলোনা! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সন্দেহাতীত সত্যকথা হলো যে ওসমান, মারওয়ান, ওয়ালীদ ইবন উক্ববা, আব্দুল্লাহ ইবন্ আবি সারাহ্, হাকাম, মুয়াবিয়া ও সাঈদ ইবনুল আস সহ বনু উমাইয়ার কুচক্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এমন নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলো যে রাসূল সঃ এর শিক্ষার স্পর্শ পাওয়া মানুষ গুলো বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিলো। যার ফলে পরবর্তীতে এমন ঘটনাবলী ঘটা আরম্ভ হয় যে, কিংকর্তব্য বিমূঢ় মানুষগুলোকে আরো অবশ ও অথর্ব করার জন্য ইব্ন্ সাবা নামক এক খলনায়কের কল্পকাহিনীর প্রচার আরম্ভ করে দেয়। এ নামের কোনো লোক আদৌ ছিলোনা। এ লোকটির অস্তিত্ব কল্পনা করে তার প্রচার প্রোপাগান্ডাকে যদি মানা হয়, তাকে যারা মানবে ও মানে, তারা আল্লাহ্, রাসূল সঃ ও ক্বোরআন কিছুই মানেনা। বিশ্বাসরাজ্যে তাদের জন্ম আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমানের ভিত্তিতে নয়। সাহাবী নামক রাসূল পরবর্তী যুগের গোত্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারীরাই এদের ইলাহ, রাসূল ও নতুন ধর্মপ্রবর্তক। সে ধর্মের নাম আরবী ও সাহাবী ধর্ম। সে ধর্মের আদর্শ ইমাম ওসমান, মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ান প্রভৃতি। যাদের আল্লাহ্র রাসূল অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করে গিয়েছিলেন এবং ওসমান রাসূল সঃ কে অমান্য করে তাদের পুনর্বাসিত করে যায়। ওসমানের অপকর্মকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইবন সাবাকে জন্ম দেয়া হয়। তার কল্পিত কাহিনী প্রচার করা হয়।

আজ পর্যন্ত মিথ্যাচারের ইতিহাস থেকে সত্যিকারের ইসলামকে তুলে ধরার কোনো প্রচেষ্টা করতে গেলেই "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর জন্মদেয়া উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদের পোষ্যদের প্রেতাত্মারা আব্দুল্লাহ ইবন সাবার গীত গাইতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে উপ-মহাদেশের অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও পরভুক পরগাছা মোল্লাদের শেষ কলেমা হলো আব্দুল্লাহ ইবন সাবার রূপকথার আশ্রয় নেয়া।

বিশ্বের বর্তমান ইতর সভ্যতার অন্ধাকারতম যুগে ইসলাম ব্যতীত মানব জাতির উদ্ধারের অন্য কোনো পথ নেই। সে ইসলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের আদর্শ। তার পূর্ণ আদর্শ আখেরী নবী সঃ। তার নিচে সাহাবী, তাবেঈ, সুন্নী, শিয়া, আহলে হাদীস ও ওয়াহাবী সব ঝাড়ুমারা, ঝাড়ুযোগ্য আবর্জনা।

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর ক্বোরেশীরা পূর্ববর্তী অভিশপ্ত ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণে যে বিদ্আতের মহামারী চালু করে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের লানতে তৈমুর তাতারদের হাতে নির্মূল হয়ে যায়, সে প্রসংগ টেনে আমাকে মিথ্যা ও মিথ্যা আব্দুল্লাহ ইবন সাবার রূপকথার মুলোৎপাটন করতে গিয়ে দীর্ঘ সূত্র টানতে হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্বের বিবেচনায় আমি আশা করি আমার পাঠকদের এ বিষয়ের উপর একটু দীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণ অধৈর্য্য করবেনা।

বর্তমানের তাজা ঘটনাপ্রবাহ সামনে চলমান দেখে তার বিবরণ লেখা ও বর্ণনা করা সহজ কাজ। দূর অতীতকে খুঁজে তাতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তথ্য ও তত্ত্ব উদঘাটন করে তা পেশ করা যে কী কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, এ বইয়ের সজাগ পাঠক মাত্র তা সহজেই উপলব্ধি করবে।

সত্যান্বেষীদের সত্য পেতে হলে প্রথমে তাদের নিজ ধাতূ ও ধাত্কে সত্যের উপযোগী স্বচ্ছ পাত্রে রূপান্তরিত করতে হবে। অস্বচ্ছ পাত্রে স্বচ্ছ বস্তু রাখলে তা অস্বচ্ছ হয়ে যায়। তাই ইল্মে লাদুন্নী বা আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীনের জ্ঞানধারণ ও

বিতরণের লোকদের নবীদের আদর্শে স্বচ্ছ ও সাচ্চা হতে হবে। তবেই এ বই তাদের সমৃদ্ধ করবে। ইন্‌শাআল্লাহ্।

(এগারো) অসংখ্য বিদ্‌আতের মধ্য থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র এগারোটির প্রতি ইংগীত করেই আমি এ প্রসঙ্গ এখানেই ইতি টানতে যাচ্ছি। এ এগারো নং বিদ্‌আতটি আমার বিচারে মুসলিম উম্মাহ্ তথা গোটা মানবজাতির মুক্তির আন্দোলনের পথে হিমালয়ের মতো একটি কঠিন বাধা। এটাকে অপসারিত করেই আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

"আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর মতো মিথ্যা বা বিদ্‌আত সৃষ্টি করেই অশুভ চক্র তাদের চক্রান্তে ক্ষান্ত দেয়নি। আবু বকর ও উমররা ক্ষমতা দখলের জন্য তাদের সীমাবদ্ধতার ফলে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" এর আশ্রয় নিলেও তারা কাফের, মুশরিক, মুর্তাদ বা মুনাফিক্ব কখানো ছিলোনা। তারা হয়তো তাদের সীমাবদ্ধতায় ভেবেছিলো যে ক্বোরেশের মধ্যে নেতৃত্ব সীমাবদ্ধকরে তারা এমন একটি শাসন পদ্ধতি চালুকরে যাবে, যাতে তাদের ধারণায় রাসূল সঃ এর সংস্কারের ধারা অব্যাহত থাকবে। নগ্ন পুরাতন জাহিলিয়্যাত আর ফেরত আসবেনা। তারা যায়দ ও সালমানদের মতো ইসলাম ও ঈমানের গভীরে প্রবেশ না করার ফলে বুঝতে সক্ষম হয়নি যে বিশ্বজনীন রাবুবিয়্যাত কখনো গোত্রতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে টিকে থাকতে পারেনা। তারা রাসূল সঃ কে তাদের গোত্রের একজন সাধারণ নবী রূপে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো। যেমন তাদের পড়শি প্রতিবেশী ইয়াহুদীরা তাদের নবীদের সম্পর্কে ভাবতো এবং বুঝতো। আসলে তো আবু বকর ও উমর এবং তাদের ক্বোরেশী আরবরা গুণগত মান ও দিক দিয়ে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তুলনায় অনেক নিম্নমানের অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও বর্বর শ্রেণীভুক্ত ছিলো!!! আল্লাহ্ খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুীল্লাল আলামীন রাসূল সঃ কে মক্কায় প্রেরণ করে ক্বোরআন নাযিল না করলে আরবরা আফ্রিকার কোনো অর্ধজংলী জাতি ও তাদের ভাষা ঐ অসংখ্য জংলী জাতি সমূহের কোনো একটির স্থানীয় ভাষা রূপে হয়তো বা টিকে থাকতো। বা অন্যান্য বহু ভাষার মতো মিটে মুছে যেতো। রাসূল সঃ ও ক্বোরআনের বদৌলতে আরবরা জাতিরূপে এবং তাদের ভাষা, আরবী ভাষা আরবদের ভাষারূপে নয়,ক্বোরআনের ভাষা রূপে অমরত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ্ আমার অন্তরকে তাঁর বিশেষ রহমতে এতো পরিস্কার ও স্বচ্ছ করেছেন যে আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ ও ক্বোরআনের আওতার বাইরে কোনো আরব, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোনো মূল্য আমার অন্তরে নেই। বরং আমি বিশ্বাস করি এবং চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন, রাসূল সঃ ও ক্বোরআনুল করীমের ছড়ানো শিক্ষা ও সভ্যতার যে রসূনের বাকলার মতো হালকা আবরণটুকু এখনো আরবদের ছায়া দিয়ে রেখেছে, তা উঠিয়ে নেয়া মাত্রই বর্তমান আরব বিশ্বের মানুষগুলো বিশ্বের অসভ্যতম মানুষদের তালিকার শীর্ষে এক নম্বরে স্থান পাবে। তার কারণ ও অনস্বীকার্য প্রমাণ হলো যে তাদের মাঝে তাদের ভাষায় ক্বোরআন মওজুদ এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ দান তেলের অঢেল পয়সা থাকা সত্ত্বেও তারা বর্তমানে ক্বোরআন অমান্য করে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের নিজেদের সর্বস্ব দান করে ওদের দাসত্ব করছে। আল্লাহ্ ক্বোরআনে সূরা মুজাদালার ১৪ থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত যে নিকৃষ্টতম জাতির বর্ণনা দিয়েছেন, আমি শপথ করে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে বর্তমান আরবরা একশ' ভাগ সে জাতি। তবে প্রাচীনতম পাহাড়ের তলদেশে, যেখানে পাথরের ক্ষয় প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেখানে যেমন হিরার পকেট সৃষ্টি হয়, তেমনি পঁচা ও ক্ষয় প্রাপ্ত আরব স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের ধ্বংসলীলার মাঝে কিছু যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব ও সালমান চাপা পড়ে আছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর মুস্তাদআফ মুক্তির আযান শুনতে পেলেই এরা বের হয়ে এসে বর্তমান আবু জেহল, উতবা, শায়বা ও উমাইয়াদের শিরোচ্ছেদ করবে।

এখন শুধু প্রয়োজন, আব্বাস, আবু সুফ্‌ইয়ান, ইবন আব্বাস ও মুয়াবিয়াদের মুখোশ ও ছদ্মবেশ উম্মোচন করা। একাজটি সঠিক ভাবে করা মাত্রই রাসূল সঃ এর আদর্শের দ্বীন মেঘমুক্ত হবে এবং বিশ্বের আকাশে ইসলামের সূর্য উদিত হবে। ইন্‌শাআল্লাহ্।

ঐ যুগল শয়তানদের পারিবারিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর তারা ও তাদের দরবারী নবরত্নরা এমন মিথ্যার জাল তৈরী করে গিয়েছে যে তাদের সে জাল ভেদ, ছেদ ও বিদীর্ণ করে যাতে ভবিষ্যতেও কখনো তাদের বংশের বাইরে কোনো সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব সৃষ্টি না হয়। এটা আল্লাহ্‌র পরিবর্তনহীন বিধান বা সুন্নাহ এবং এ সংক্রান্ত রাসূল সঃ এর ইংগিতও রয়েছে যে মানব সমাজে সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো জাতি যদি দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত হয়, তখন অপর এক জাতিকে আল্লাহ্ সে দায়িত্ব অর্পন করেন। যেমন ইয়াহুদীরা ইসলামী বিশ্বজনীনতা পরিত্যাগ করে গোত্রবাদী হলে আল্লাহ তাদের বাদ দিয়ে আরবদের সে দায়িত্ব দেন। এবং রাসূল সঃ কর্তৃক সূরা মুহাম্মাদের শেষ আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন যে আরবরা দায়িত্ব পালনে বিচ্যুত হলে অনারবদের আল্লাহ্ সে দায়িত্ব অর্পণ করবেন এবং

পরবর্তী অনারবরা আরবদের মতো হবেনা। অর্থাৎ তারা আরবদের চেয়ে উত্তম হবে। এ পথের ধ্যান ধারণাকে রুদ্ধ করার জন্য অবশ্যই ইবলিসের পরামর্শে উমাইয়া ও আব্বাসী মুহাদ্দিসরা মিথ্যা হাদীসের জাল তৈরী করে যে ইমাম মাহদীরূপী বিশ্বে সত্যের চূড়ান্ত ইমামকে অবশ্যই ক্বোরেশ বংশোদ্ভুত হতে হবে। তার উত্তরে আলীর শিয়ারা বলে উঠে যে তাঁকে ক্বোরেশ থেকে অবশ্যই বনী হাশিম থেকে হতে হবে। যেহেতু বনী হাশিমের লোকই রাসূল হয়েছিলেন! এখানে একটি ল্যাঠা বেধে যায় যে রাসূল সঃ এর কোনো পুত্র সন্তান জীবিত ছিলোনা যে তার থেকে তাঁর বংশ হবে! তাই আরো অসম্ভব মিথ্যা যোগ করতে হলো যে রাসূল সঃ এর কন্যা ফাতিমার বংশ অর্থাৎ আলীর ঔরস থেকে হবে। পরে যেহেতু আলীর বংশেও বহু দাবীদার হবে ইমামতের, তাই আসল ব্যক্তিকে সনাক্ত বা চিহ্নিত করতে আরো জটিল শর্ত জড়ানো হলো যে সে ব্যক্তির নাম হবে মুহাম্মাদ ও পিতা মাতার নাম হবে আব্দুল্লাহ ও আমিনা। ঠিক যেমন রাসূল সঃ ছিলেন! ফলে ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে অন্ততঃ একটি দম্পতিকে কাফের মুশরিক বানাতে হয়! তা না হলে অংক মিলেনা! সেখানেও তৃতীয় ল্যাঠা লেগে যায় যে, জাফর সাদিক থেকে শিয়াদের সহী হাদীস(?) রয়েছে যে রাসূল সঃ নাকি বলেছেন যে, আহলে বাইতের লোকেরা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর থেকে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল সঃ এর সাথে হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সঠিক পথে থাকবে। তাই সে সিলসিলা ভেঙ্গে মধ্য থেকে একটি পরিবার বা দম্পতিকে কিরূপে মুশরিক বানানো সম্ভব?!

ওদিক দিয়ে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের সুন্নী "আহলে সুন্নাতুল জামাত" তারাও হাতগুটিয়ে বসে রয়নি। তারাও হাদীস বানিয়ে ফেললো যে ইমাম মাহ্দী যে-ই হোক, তাকে জয়যুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে যে খৃষ্টান মসীহ আসমান থেকে অবতরণ করবে, সে দামেশকে উমাইয়াদের মস্জিদের ছাদে নামবে! তাই উমাইয়ারা ইমাম মাহদীর গদি দখল করে নিবে, যেমন মুয়াবিয়া সিরিয়ার খৃষ্টান সাম্রাজ্যের সেনাদের সাহায্যে রাসূল সঃ এর গদী দখল করে নিয়েছিলো!

মোট কথা জটিল মোকাদ্দমায় মিথ্যাস্বাক্ষ্য দিতে গিয়ে যেরূপ মিথ্যুক পেচিয়ে যায়, তদরূপ শিয়া, সুন্নী শিয়াল, শূকররা ঝগড়া করতে গিয়ে পরস্পরের লেজে লেজে গিরু লেগে গিয়েছে। এখন আর কেউ ছুটতেও পারছেনা, পালাতেও পারছেনা। একজন অপরকে উল্টো দিকে টানছে। খোলা মাঠে শিয়াল, শূকর লেজবাঁধা অবস্থায় দৃশ্যমান। ওরা টানা টানি রত এখন ইরান, আফগান সীমান্তে অবস্থান করছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে মসীহ্ এসে খৃষ্টানদের ক্রূশ ভাংবেন এবং শূকর নিধন করবেন।

এখন শিয়াল শূকর হত্যা করে ময়দান পরিস্কার ও পবিত্র করার পালা। শিয়া পাক পাঞ্জেতন ও সুন্নী পাঞ্জেতন অন্তর থেকে মুছে মুত্তাক্বী মু'মিন হতে হবে। শিয়ারা রাসূল সঃ কে মধ্যে রেখে আলী, ফাতেমা ও হাসান হোসাইনকে দিয়ে পাঞ্জেতন দাঁড় করে প্রকৃতপক্ষে রাসূল সঃ ও তাঁর রিসালাতকে বর্জন করেছে। সুন্নীরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধ্যে বসিয়ে মূলতঃ আবু বকর, উমর, উসমান ও মুয়াবিয়াকে দিয়ে বেষ্টনী করে সুন্নী- পাঞ্জেতন সৃষ্টি করে তারাও কার্যতঃ রাসূল সঃ কে ত্যাগ করেছে। বিবেকবান মানুষ মুখে থুতু দিবে, সে লজ্জায় আহমদ ইব্ন্ হাম্বল মুখ বাঁচাতে আলীকে ধরে এনে মুয়াবিয়া ইয়াযীদকে আড়াল করেছে মাত্র। আসলে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদই সুন্নীদের মূল খুঁটি। তা না হলে ষাট বছর যাবত মসজিদে, মিম্বারে, জুমা, ঈদ ও হজ্জে আলীকে কি করে গালি দেয়?! যার প্রবর্তক মুয়াবিয়া!

এ মিথ্যা বা বিদআতের পাঞ্জেতনের মূর্তি নির্মূল করার দুর্মূজ হলো আল্লাহ্র বাছাই করা পাঁচ ইমামের পাঞ্জেতন ও তাঁদের শরীয়ত। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম। আল্লাহ্ ক্বোরআনে দু'খানে একত্র এ পাঁচ জনকে সাজিয়ে আমাদের সকল বিভেদ ও ফের্ক্বা নির্মূল করার বিস্তারিত নক্সা তৈরী করে দিয়েছেন। (দেখো, সূরা শুরা- ১৩, আহ্যাব- ৭)

বিশ্বমুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত ইমাম বাবা আদমের সন্তান হবেন। আদম থেকে মুহাম্মাদ সঃ পর্যন্ত সকল নবীদের সমান ভাবে মান্যকারী আল্লাহ্র বান্দা হবেন। তিনি নবীদের মাঝে কোনো পার্থক্য করবেন না। তাই তিনি সবার উত্তরাধিকারী হবেন। তার পতাকার ভাষা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আর বাকী সব কাহিনী মিথ্যা। বিদআ্ত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইহ্সানের সুফল ও বিদআতের কুফল

যারা ঈমানের দৃষ্টিতে আল্লাহ্কে উপস্থিত মনে করে আল্লাহ্র বন্দেগী করে, তারা মুহসিনূন। তাদের ইবাদতের নাম ইহসান। এদের সর্বদা, সর্ব কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং পথ প্রদর্শন করেন। এরা কখনো ভুলে পতিত হয় না। আর যারা সত্য আসার পর তাকে অবিশ্বাস করে, বা বিশ্বাস করে গ্রহণ করার পর সত্যের সাথে মিথ্যা বা বিদ্আত মিশ্রিত করে, তাদের আল্লাহ্ পথ দেখান না। পরিণতিতে ঈমান আনার পরও তারা নিশ্চত বিপথগামী ও মানুষকে বিপথে পরিচালনাকারী। আল্লাহ্ এদের ব্যাপারে প্রশ্ন করে বলেন, এরা জাহান্নামী। প্রথম শ্রেণী, অর্থাৎ ইহসান ও মুহসিনের ব্যাপারে আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো ঃ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

"আমার পথে আমার মতে যারা সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই ব্যতিক্রমহীন ভাবে তাদের পথ দেখাতে থাকবো। কারণ তারা মুহসিনূন। এবং আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বদা মুহসিনূনদের সাথে থাকেন।" (সূরা আনকাবুত-৬৯) "আল্লাহ্ মুত্তাক্বী ও মুহসিনূনদের নিশ্চিত সঙ্গী।" (সূরা নাহ্ল-১২৮)

যারা ঈমান আনার পর শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলকে মেনে চলে, বাঁচে ও মরে, তারা মুহসিনূন। তাদের যারা অণু পরমাণু সহ অনুসরণ করে, তারাও তাদের শামিল। যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সাহাবী, তাবেঈ ও তথাকথিত পীর ও অলীদেরও সমান ভাবে মানতে হবে বলে, তারা বিদ্আতী হয়ে আল্লাহ্র নিচে খোদায়ীর দাবিদার।' আরবাবাম্ মিন্দূনিল্লাহ্। এরা বিপথগামী, এদের অনুসারীরাও বিপথগামী। এরা সাধারণ মানুষকে বিপথে ঠেলে দেয় বলে, সদলবলে জাহান্নামী।

আমার হুশ হওয়ার পর থেকে আল্লাহ্কে উপস্থিত ও সঙ্গী মনে করে তাঁর পথে চলা আরম্ভ করি। চৌদ্দ বছর বয়সে মা, এক বোন ও তিন ভাই নিয়েও পিতৃহারা ভিটাবাড়ীহারা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ আজ পর্যন্ত আমাকে তাঁর কাছে ব্যতীত কোনো মানুষের দ্বারস্থ করেননি। বাহিরে হাসিখুশী বজায় রেখে আমি ভিতরে সর্বদা অন্তর্মুখী চিন্তায় মগ্ন জীবনে এ পর্যন্ত এসে নিজের ভ্রমন কাহিণী লিখছি। ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে আমার আমলনামা ও সাক্ষ্য হবে এ বই।

আমার পয়ষট্টি বছর জীবনের পথ যাত্রায় আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ সাহায্য ও দানের বৃত্তান্ত লেখা সম্ভব নয়। বর্তমানে এ বই লিখতে বসে আল্লাহ্র গায়েবী বা অদৃশ্য এবং দৃশ্যমান দু'চারটি ঘটনার উল্লেখ করবো, যাতে সব দিকে নৈরাশ্যজনক অবস্থায় নিমজ্জিত ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রত্যাশীরা শুধু আল্লাহ্র উপর ভরসা করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আমার পারিবারিক জন্ম থেকে আমার ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য এ বইর শেষে থাকবে। রাজনীতি ও সমাজ জীবন এবং ঈমানী শিক্ষা ও তার ব্যতিক্রমধর্মী দর্শনের ভিতমূলও উল্লেখ করার আশা রাখি। এখন শুধু এ বই লিখতে কলম ধরে যে আল্লাহ্র সাহায্য পেয়েছি তার যৎসামান্য ইংগীত দিবো। এর সাথে গভীরভাবে অল্লাহুল্ আলীম ও খাবীরের দরবারে ভিক্ষার হাত তোলা আছে। তাঁর প্রদত্ত ইলম বা জ্ঞান সন্দেহাতীত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। মানব কল্পিত ও রচিত শিক্ষা মানুষকে ইলাহ্ বানিয়ে আত্মপূজায় লিপ্ত করে। এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা সবাই ইলাহ্। এদের সবাইকে আমি শুধু শিক্ষিত মানুষ বলে অস্বীকার করিনা। এরা মানুষই নয়। কারণ, যে নিজেকে চিনেনা সে কি করে মানুষ হয়? মানুষ কি নিজেকে সৃষ্টি করেছে যে সে নিজেকে চিনবে? তাকে স্রষ্টা আল্লাহ্ সৃষ্টি করে তার আত্মপরিচয় জ্ঞান নিয়ে বসে আছেন। তাঁর উপর ঈমান এনে, সে মতো তাঁর আনুগত্য করে তাঁর কাছে হাত তুলে "রাব্বি যিদনী ইলমা" বলে চাইলে তিনি তাঁর জ্ঞান, বান্দাকে দান করেন। এ প্রাপ্তজ্ঞানই "ইলমুল্লাহ" বা "ইলমি লাদুন্নী"। তা প্রাপ্তির প্রথম শর্তই হলো, মানবপ্রাধান্য বা মানবস্বাতন্ত্র্যের জ্ঞানের ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হয়। এ বিশ্বাসে আমি আমার অজান্তে শৈশবে পিতৃহারা হয়ে মানব অভিভাবক ও তার সংকীর্ণ অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই। তারপর থেকে বুঝ হওয়া থেকেই আমি অনুভব করতে আরম্ভ করি যে, আমি আমার রবের প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠছি। أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

"তোমাকে এতিম পেয়ে কি তোমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিনি? পথের দিশাহীন পেয়ে কি পথের দিশা দেই নি? কপর্দকহীন দারিদ্র্য থেকে কি স্বাবলম্বী করিনি?" এ প্রথা নবী সঃ এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়। এ পথের পথিক প্রত্যেক জাতকের জন্যই আল্লাহর এ অমোঘ বিধান। জীবনের যে কোনো পর্যায়ে এসে যে কোনো ব্যক্তির এরূপ অনুভূতি আসামাত্র সে ব্যক্তি শির্ক ত্যাগ করে নিজেকে আল্লাহ্‌র হাতে সম্পূর্ণ তুলে দিলে আল্লাহ্ তাকে একটু ভালো করে ঝাঁকিয়ে দুমড়িয়ে দেখে নেন যে সম্প্রদান সঠিক কিনা। তাঁর কাছে সঠিক প্রমাণ হলেই লাইন চালু হয়ে যায়। আখেরী নবী সঃ এর আগমন ও বিদায়ের পর এ লাইন পাওয়া একেবারে সহজ এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাসূল সঃকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করলে, তা সম্পূর্ণ সহজ। নাযিল হওয়া তিরিশ পারা ক্বোরআন পুনঃ তার প্রয়োজনে নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। যেমন যায়দ, বিলাল, ইবন মাসউদ, আম্মার ও সালমানদের ব্যাপারে ঘটেছিলো। রাসূলের বিদায়ের পর ক্বোরেশী ফিত্‌না শুরু হলে তার কোনো একটিতেও এরা পা দেয়নি। আমৃত্যু সিরাতুল মুস্তাক্বিমে অটল ছিলো। যারা আংশিক সমর্পণ করবে ও রাসূল সঃ কে অসম্পূর্ণ গ্রহণ করবে, তাদের পক্ষে সে লাইন প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন ক্বোরেশী বারো খলিফা ও বারো ইমামের ব্যাপারে ঘটেছে। ওরা ন্যায়-অন্যায়ের সমূদ্রে হাবু-ডুবু খেয়েছে এবং এখনো ওদের অনুসারী সুন্নী ও শিয়ারা খাচ্ছে।

আল্লাহ্ আমাকে পূর্ণ তাওহীদে প্রতিষ্ঠিত করার পর আমার নিকট পাকিস্তানী, হিন্দুস্থানী, আরবী, ইউরোপী ও আমেরিকান প্রভৃতির দাবিদার মানুষগুলো সাব-হিউম্যান ও সাব-এনিমাল অর্থাৎ আধা মানুষ আধা পশুরূপে আজব প্রাণীরূপে দৃষ্ট হতে আরম্ভ হয়ে আজো হচ্ছে। এ দৃষ্টিতে মানুষকে তাদের হারানো সূত্র, "মিসিং লিঙ্ক", পুনঃ ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কাঁচা হাতে কলম ধরেছি। আমি ভাষার পন্ডিত নই। বিশেষ করে গ্রামার ও ব্যাকরণে আমার ভীষণ অনীহা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কথামালা দিয়ে ভাব প্রকাশ করা হয়, তাই ভাষা। যে কথামালা দিয়ে ভাব উত্তম রূপে প্রকাশ পায়, তাই উত্তম ভাষা। ব্যাকরণ ও গ্রামার অনুসারীরা ভাষার দাস। তাদের ভাষা, দাসের ভাষা। যারা ভাব প্রকাশের রাজা, ভাষা তাদের দাস। তাদের ভাষা, ভাষার রাজা। আল ক্বোরআন তার প্রমাণ। আরবী গ্রামারের কোনো দাসত্ব ক্বোরআনে নেই। তাই ভাষার দাস, ভাষাবিদরা ক্বোরআনের অনুরূপ একটি সূরাও বানাতে পারেনি। আজো সে চ্যালেঞ্জ অজেয় রয়েছে।

আমি ক্বোরআনের অনুকরণে বাংলা, আরবী, উর্দূ, ফার্সী এমন কি ইংরেজীও লিখি। দেখেছি যে মানুষ তা ঠিক ঠিকই বুঝে! তাই কেনো জানি জেনেসিসের সাথে আমার মত মিলে যাচ্ছে যে, আদিতে মানুষের ঈমান ও বিশ্বাস এক ছিলো বলে তাদের ভাষাও এক ও অভিন্ন ছিলো। পরে শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন মত পোষণ আরম্ভ হলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষকে বিভিন্ন ভাষায় বিক্ষিপ্ত করে দেন। পৃথিবীর বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদে বিভক্ত মানুষগুলো যখন তাদের ঐক্যের হারানো সূত্র "মিসিং লিঙ্ক" ফিরে পাবে, তখন পুনঃ তারা অভিন্ন বিশ্বাসে একজাত ও জাতি হবে, তাদের ভাষাও এক হবে। সে হারানো সূত্র হলো তাওহীদ, জাত হবে মুসলিম এবং জাতি হবে মুসলিম উম্মাহ। ইনশাআল্লাহ্। ভাষা কি হবে? ক্বোরআনের ভাষা হবে। আরবী ভাষা নয়। ক্বোরআনে ভাষা ও আরবদের ভাষা এক নয়। তাহলে আরবরা "আরব" না হয়ে মুসলিম হতো। তাদের নাম আরব হতো না।

ক্বোরআনের আদি সত্যের দিকে ডাকার জন্য লেখার তাগিদ অন্তরে উদিত হতেই কোরআন খোলা মাত্রই আমি দেখছি যে বিক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু যেনো চারদিক থেকে গুছিয়ে আসছে। ক্বোরআনের বাগ্‌ধারায় অনভ্যস্থ মানুষদের বুঝানোর জন্য রাসূল সঃ যে প্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন, যাকে হাদীস নাম দেয়া হয়েছে, তা বিষয়ভিত্তিক ভাবে স্বল্পায়াশে পেয়ে যাওয়া আল্লাহ্ পাকের রহমত বটে, কিন্তু এ জটিল বিষয়ে লিখতে বসে যখন অভাবিত ভাবে, দূর দূরান্ত থেকে দুষ্প্রাপ্য তথ্যসমৃদ্ধ বই কিতাবও হঠাৎ করে হস্তগত হয়, তখন সিজদায় পড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা।

বর্তমানে বিশ্বে মুসলিম জাতির মাঝে প্রধানতঃ দু'প্রকারের আত্মঘাতী সংঘাত চলছে। একটি সুন্নী-শিয়া সাম্প্রদায়িক, অপরটি চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ। শিয়া-সুন্নী সংঘাতের প্রধান দৃশ্যপট হলো ইরান-আফগান সীমান্তে। চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে গোটা মুসলিম বিশ্বে। সুন্নী-শিয়া রোগ উভয় ফুস্‌ফুস, উভয় কিডনী ও উভয় যকৃতের উভয় দিক পচন রোগের মতো মুসলিম উম্মাহকে খেয়ে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত করেছে, ঠিক সে সময় মুমূর্ষু রোগীর উপর সন্ত্রাসবাদ সাক্ষাৎ যমদূতের মতো উপস্থিত হয়েছে গোটা মুসলিম বিশ্বে। ইয়াহুদী বর্ণবাদ এবং খৃষ্টান উপনিবেশবাদের যাতাকলে পিষ্ট লোকেরা যুগে যুগে বিভিন্ন সময় ও স্থানে উপনিবেশবাদের প্রতিবাদে সশস্ত্র ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু অধুনা ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের কালচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে বর্ণবাদী ইয়াহুদী ও আরবরা মধ্যপ্রাচ্যে। মধ্যপ্রাচ্যে

ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টান আঁতাতের অবৈধ মিলনে ইসরাঈল নামে যে ইয়াহুদী রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া হয়, এ প্রক্রিয়াটি মানব ইতিহাসের জঘণ্যতম সন্ত্রাসবাদ। তার কোলেই জন্ম নেয় প্যালেষ্টাইনী ইয়াসির আরাফাতদের সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। যেমন ইয়াহুদীবাদের পাল্টা খৃষ্টবাদ। সুন্নীবাদের পাল্টা শিয়াবাদ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়। আল্লাহর দ্বীন ও বিধানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তা কল্পনা করাও হারাম। নিষিদ্ধ। ইসলাম হলো অন্যায়কে ন্যায় দিয়ে উৎখাত করা। অন্ধকারকে আলো দিয়ে দূর করা। ইসলাম নবী রাসূলদের আচরণ বিধি। যারা যে যুগে ও যে স্থানে নবী রাসূলদের অনুসরণে মানব, তথা সৃষ্টির কল্যাণে সংগ্রাম করবে, তারাই মুসলিম। যেমন সকল নবী-রাসূলরা মুসলিম ছিলেন। তাঁদের সংগ্রামই ক্বোরআনিক পরিভাষায় জিহাদ। নবী রাসূলদের অনুসরণ করলে কখনো ফির্ক্বা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়না। নবী রাসূলদের নিচে আহবার, রূহবান ও আসহাব বা সাহাবীদের অনুসরণ করা মাত্রই ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সুন্নী ও শিয়াবাদের জন্ম হয়। ইব্রাহীম আঃ যেরূপ শুধু মুসলিম ছিলেন, সেরূপ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা শুধু মুসলিম ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম যেরূপ কখনো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না, তদরূপ মূসা ও ঈসা আঃ কখনো ইয়াহুদী-খৃষ্টান ছিলেন না। তাঁদের শেষ ও তাঁদের রিসালাতের সমষ্টি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃও শুধু মুসলিম ছিলেন। তিনি ক্বোরেশ বংশে জন্মালেও ক্বোরেশবাদকে নির্মূল ও উৎখাত করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি কোনো অর্থেই, আরবী ক্বোরেশী বা হাশেমী ছিলেন না। তাঁর নামে পরবর্তীতে যারা ক্বোরেশী ইমামত, আহলে সুন্নাতুল জামাত ও শিয়া জামাতের সূচনা ও তা প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের কাজটিই করেছে। যা করতে রাসূল সঃ তাদের আমৃত্যু নিষেধ করে গিয়েছেন। তাঁর নিষেধ অমান্য করার পরিণামই মুসলমান নামধারী মিথ্যুক জাতি আজ ইয়াহুদী-খৃষ্টান পরাশক্তির জুতার সুকতলি।

একটি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান যেমন হযরত ইব্রাহীম আঃ এর অনুসারী নয়, তেমনি একটি সুন্নী বা শিয়াও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সঃ এর কেউ নয়। তারা কল্পিত ও রূপক খলনায়ক আবদুল্লাহ ইবন সাবা ও তার অনুসারী। একটি পাগড়ী, টুপি, জুব্বা, পাজামা ও জুতা পরিহিত মুসলিম, মুসল্লী ও মুজাহিদ যেমন একজন সুদর্শন, সুদৃশ্য সাচ্চা ম'মিন, তেমনি ঐ পোষাকটি আপাদমস্তক মধ্যখান থেকে দু'ভাগ করা ও পরা দুটি লোক অর্ধেক সুবেশী, অর্ধেক ন্যাংটা, কুদর্শন ও কুদৃশ্য, মিথ্যা এবং নির্লজ্জ প্রবঞ্চক। ঐ লোক দু'টির চেয়ে একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ব্যক্তি উত্তম। কারণ এ উলঙ্গ ব্যক্তিটিকে কালেমা পড়িয়ে "লিবাসুত্তাক্বওয়া" পরানো মাত্র সে একজন মূর্ত মুত্তাক্বী রূপে দৃশ্যমান হবে। কিন্তু ঐ অর্ধেক উলঙ্গ লোক দু'টির অর্ধেক পোষাক খুলে যাকেই পরাবো, সে কুদৃশ্য কুদর্শনই রয়ে যাবে। কখনো সুদৃশ্য ও সুদর্শন হবে না। সুন্নী-শিয়ার রূপক তাই।

এগুলো বুঝতে, বুঝাতে ও লিখতে আমার কোনো বেগ পেতে হয় না। ক্বোরআনে রাসূল সঃ এর সত্য বাণীর আলোকে এ সত্যকে আমি দৃশ্যমান চোখের সামনে বাস্তব দেখতে পাই। কিন্তু যাদের এ দৃষ্টি নেই, চর্ম চক্ষু থেকেও যারা অন্তর দৃষ্টিতে অন্ধ, তাদের চোখে কাটা ফুটিয়ে আমাকে তাদের সাময়িক অন্ধ করে তাদের অন্তর দৃষ্টি খোলার প্রয়াস পেতে হচ্ছে।

এর জন্য আমি কিছু সমসাময়িক ঘটনার তথ্যসমৃদ্ধ বই কিতাব খুঁজছিলাম। বর্তমান শিয়া সুন্নী আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব বিশ্বকে জুডো-খৃশ্চিয়ান দাজ্জালের মুখে মাখা গ্রাসের মতো তুলে দিচ্ছে। বিশ্ববাসীর মুক্তি ঐশী ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় ছাড়া বিকল্প নেই। ইসলাম ব্যতীত ঐশী কোনো ধর্ম নেই। কিন্তু শিয়া সুন্নী দ্বন্দ্ব ইসলামকে গ্রহণযোগ্যতা থেকে আড়াল করেছে। ইরানী বিপ্লবে সারা বিশ্বে অর্ধবুঝ সম্পন্ন মুসলিম যুবকদের প্রাণে এক অভাবিতপূর্ব আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ইরানী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সুন্নীবিশ্ব নগ্ন হয়ে নামলে কিছু আশাহত সুন্নী শিয়া হয়ে যায়। আবার ইরানীদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে তাদের ঘরের খবর জেনে কিছু শিয়া থেকে সুন্নী হয়ে যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীর সংখ্যাই বেশি। উন্নত শ্রেণীর সংখ্যা খুব কম। কারণ, সত্যিকারের প্রতিভাধর কোনো ঈমানদার তো সুন্নী বা শিয়া কিছুই হতে পারে না! সে তো শুধু মুসলিম হতে পারে!

বর্তমান বিশ্বে সুন্নীও নয়, শিয়াও নয় এমন ব্যক্তি আমি মুসলমানদের মাঝে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে খুঁজছি। পাইনি একজনও। সব সুন্নীও ঠিক, শিয়াও ঠিক শ্রেণীর ক্লীবলিঙ্গ মুসলমানদের জঞ্জালেই মুসলিম উম্মাহ নির্বীজ রাহুগ্রস্ত। অথচ আমি যখন বলিষ্ঠভাবে বলি যে, শিয়া-সুন্নী উভয়ের উর্ধ্বেই ঈমান ও ইসলাম, তখন দেখতে পেয়েছি যে, এ ক্লীবদের মধ্যে সজাগ ও সচেতন সংখ্যা গুরু কানখাড়া করে শুনে বলে , "ঠিক ঠিক, ইসলামেতো শিয়া-সুন্নী হতে পারে না! রাসূল সঃ তো সুন্নী ও শিয়া ছিলেন না!" কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এ সত্য বুঝা লোকেরা

তোলানো খাসীর পৌরুষের ন্যায়, পর মুহূর্তেই নিস্তেজ এবং পুনঃ ক্লীব হয়ে যায়।

আল্লাহ্র দ্বীনের স্বীকারোক্তি স্বরূপ আমাকে বলতে হয় যে, সত্য বুঝে সত্য বলার অদম্য ঈমানী পৌরুষ আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। এ ধরনের পুরুষ বান্দাদেরই ক্বোরআনে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সূরা নূর ও আহযাবে 'রিজাল' বলে বিশেষ শব্দে উল্লেখ করেছেন। ক্বোরআনে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের ঐ সত্য ধারণের পৌরুষ দান করেই বলেছেন, একাই সত্যের আযান বুলন্দ করতে। তা শুনে যারা আসবে, তারা ধন্য হবে। যারা আসবেনা, তারা তাদের নিজেদের বঞ্চিত করবে।

বিশ্বে ভরা ক্লীব ঈমানদারদের কিছু সকর্মক নিঃস্রাব বা এ্যাকটিভ ঈমানী হরমোন দেয়ার লক্ষ্যে আমি শিয়া-সুন্নী উভয়ের জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহের তাগিদ অনুভব করি। ঠিক এ অবস্থায় কয়েকবছর পূর্বে আফ্রিকা ফেরত এক অর্থনীতিবিদ আমাকে একখানা ইংরেজি বই দেয়। বইটির নাম Then I was guided ভদ্রলোক কিন্তু ইসলামিক দৃষ্টিতে তেমন কোনো চিন্তাবিদ নয়। বইটি প্রায় আমি একটানে পড়েই তার নামের নিচে মন্তব্য লিখি, Then I was Again Misguided বইটির লেখক একজন তিউনিশিয়ান, ডঃ তিজানী সামাভী। ভদ্রলোক সুন্নী থেকে শিয়া হয়েছেন। খুব গভীর পড়ালেখা করা লোক। শিয়া-সুন্নী এমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই, যার উল্লেখ তার বইতে নেই। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক মধ্যের সোজা পথ সিরাতুল মুস্তাকীমে অবস্থানে না গিয়ে আরেক চরম প্রান্তে প্রস্থান করেছে বলে আমি ঐ মন্তব্য করেছি। বইটিতে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের পার্শ্বে মন্তব্য লিখেছি। তারপর বইটি তার মালিককে ফেরত দেয়ার পূর্বে আমার কিছু বাছাই করা ব্যক্তিদের পড়তে দিয়েছিলাম। পাঠকরা বইটির তথ্যে না যতোটুকু বুঝলো, আমার মন্তব্যগুলো পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী বইটির বিষয় বস্তুর গভীরে প্রবেশ করলো। এ বইটি মাত্র দু'শ তিরিশ পৃষ্ঠার বই।

বইটিতে লেখকের আরো দু'খানা বইর উল্লেখ রয়েছে যার বিষয়বস্তু আমার নিকট এ বইটির চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তখন থেকেই ঐ দুখানা বই সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশর লেবাননী প্রকাশকের সাথে যোগযোগ করি। ঢাকায় ইরানী দূতাবাস ও তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে খোঁজ নিতে যাই। তারা ঐ বইর নাম আমার কাছ থেকেই সর্ব প্রথম জানতে পেরেছে বলে জানায়। আমি নিরুৎসাহী হয়ে ফিরি।

বইগুলো যেহেতু মূল আরবীতে লেখা, তাই তা পাক ভারতেই লোকদের নিকট তেমন গুরুত্ব পায়নি। এর মধ্যে আফগানিস্তানে তালেবানদের নাটকীয় উত্থান আমাকে নাড়া দেয়। আফগানযুদ্ধ একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ পর্যায়ে আসলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইসলামী মহল এদেশে তেমন একটা কিছু ঘটানোর স্বপ্ন দেখে সম্ভাব্য চিন্তাশীল লোকদের খোঁজে বের হয়। তাদের তালিকায় আমিও পড়ে যাই। তারা আমার কাছে আসলেও বেশ সতর্কতার সাথে আসে।

কারণ, শিয়া-সুন্নী একটিও যে ইসলাম নয়, আমার এ মত এদের মুরব্বীরা জানতো। তবুও তাদের মুরব্বীদের পড়া-শোনা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির দৈন্যতায় তারা তারপরও বহুবার বহুজনের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্যে আসার প্রচেষ্টা চালায়। আমি প্রতিবার প্রত্যেককে একই কথা জানিয়ে দেই। বলা চলে যে আমি তাদের প্রত্যাখান করি। কারণ, তারা সুন্নী ও সাহাবীদের সৈনিক, "সিপাহী সাহাবা" যা আমার দৃষ্টিতে অমার্জনীয় বিদ্আত ও শির্ক। তা সত্ত্বেও তাদের নিকট আমার একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের তাগিদ ছিলো। তা হলো আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর তালিবান উত্থানের মূল শক্তির উৎস কী, তা জানা। আমি যে গভীরের খবর চাই, তা তারা আমাকে সরবরাহ করবে দূরে থাক, তা তাদের নিজেদেরই সঠিক জানা নেই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ বর্তমান আরবদের ইসলামী উম্মাহর পুনরুত্থানের জাতিসত্তা থেকে বাদ দিয়েছেন। জাতি হিসেবে তারা অতীতের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ওদের ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়া কিছু যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহরা পালিয়ে হিজরত করে এসে যে দলে যোগ দিবে, তাদের মধ্য থেকেই বিশ্বের ত্রাণকর্তার ইমামত সৃষ্টি হবে। এবং তা আফগানিস্তান ও বার্মা মধ্যস্থিত এলাকা থেকে হবে। ইনশা আল্লাহ্।

তাই আফগানিস্তানের ভিতরে আসলে কোথায় কী ঘটছে, তা জানার জন্য আমার উৎসৌক্যে বিরাম নেই। কিন্তু মানবসূত্রে তা প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে আমি 'রাব্বিশ্ রাহলী সাদ্রী ও রাব্বী যিদ্নী ইলমার' অলটারনেট বা বিকল্পের দরবারে হাত তুলি। এর মধ্যে একদিন কোনো স্থিরলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই খোঁজ নিয়ে "জাগো মুজাহিদ" ওয়ালাদের দফতরে গিয়ে উপস্থিত হই। ওদের পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের র‍্যাকের উপর আমার সন্ধানী দৃষ্টি দিতেই এক কোনে তিন চার খানা মোটা কিতাবের উপরে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করা মাত্রই তাদের মধ্য থেকে একজন তা থেকে একখানা কিতাব এনে আমাকে বলে যে, আপনি ইচ্ছা করলে এর একখানা নিতে পারেন। কিতাবের নাম দেখে ভিতরে দৃষ্টি দিতেই আমি বুঝে ফেলি যে, আমি যা খুঁজছিলাম, তা আমার হস্তগত হয়েছে। সাড়ে পাঁচশ' ফুল স্কেপ সাইজের পৃষ্ঠায় সূরা তওবার ধারাবিবরণীতে আফগান যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ তাতে। নব্য আরব ফেরআউন ও নমরূদদের নির্যাতন থেকে পালিয়ে আসা আরব যায়দ ও বিলালদের সমকালীন প্রজন্ম, ইখওয়ানী প্রবীন ও অন্যান্য যুবক যোদ্ধাদের দীর্ঘ আফগান যুদ্ধের বর্ণনাসমৃদ্ধ সূরা তওবার তাফসীর কিতাব খানা। কিতাব খানা নিয়ে এসে দু'বার আমি আদ্যপান্ত পড়লাম। তার মাধ্যমে আমার আফগান যুদ্ধে সশরীরে যোগদানের চেয়েও সমৃদ্ধ ধারণা এসে গেলো। কারণ, গোটা মুসলিম বিশ্বই নয়, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকেও আগত মুসলিম মুজাহিদদের নেতা, প্রাবীনতম ইখওয়ানী ব্যক্তিত্ব ও বহু শিক্ষা শিবির পরিচালক এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণকারী শেখ আব্দুল্লাহ আয্যাম, যাকে তার অনুসারীরা ইমাম রূপে মানতো, তার আলেখ্য কিতাব খানা। দু'চার, দশ জন বা একশ জন রণাঙ্গনে শরীক হয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেও এতো তথ্যের অংশবিশেষও পাওয়া সম্ভব ছিলোনা। তাও আবার সূরা তাওবার আলোকে!

আমি মন্তব্য সহকারে পড়ে আমার ছেলে মুহাম্মাদকেও তা পাঠ্য রূপে আদ্যোপান্ত পড়ালাম। পরে এ কিতাবের নির্ঘন্ট লিখে পাঠকদের কৌতুহল মিটাবো। ইনশা আল্লাহ্।

আমার আফগান যুদ্ধে যাওয়া হয়ে গেলো। এবার সুন্নী থেকে শিয়া হওয়া ব্যক্তির উল্লেখিত বই দু'খানার প্রয়োজন আরো তীব্র ভাবে অনুভূত হলো। কারণ, আফগান যোদ্ধারা সুন্নী। এবার শিয়াদের ভিসেরা টেস্টের বিবরণের প্রয়োজন। তা না পেলে যে উভয়ের জন্য প্রয়োজন খাঁটি ইসলামী হরমোন-সমৃদ্ধ ব্যবস্থাপত্র তো লেখা যাচ্ছে না! মৌলিক উপাদান ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর সুন্নাহ তো আল্লাহ্ দিয়েছেনই। এখন তাকে নিঃস্রাবে রূপান্তরিত করতে ঐ সমস্ত তথ্যের রসায়ন প্রয়োজন।

পূর্বের মতো আরেকবার বের হলাম প্রায় দেড় বছর পর। বিসমিল্লাহ বলে সোজা গিয়ে উঠলাম ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লাইব্রেরীতে। এরা সবাই আমাকে, আমি যা নই, তার চেয়ে বেশী জানে। তাই আমি পৌছুতেই লাইব্রেরিয়ান সব ছেড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। ওরা আমার স্নেহাস্পদ। তাই আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমার বইয়ের কোনো সন্ধান পেয়েছে কিনা। সাফ উত্তর এলো, না। তাই সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্যান্য কথা বলে বিদায় হচ্ছিলাম। ঠিক সে মূহুর্তে একটি বিরাট পার্সেল এসে উপস্থিত হলো। আমি লাইব্রেরিয়ানকে বললাম যে, খোলো দেখি তাতে কি আছে? আমার কথা মতো খোলামাত্রই প্রথমে যে দু'খানা বই বের হলো,তা আমার সে বই দু'খানা, যার উদ্দেশ্যে বিস্মিল্লাহ বলে বের হয়েছিলাম। বই দু'খানা এ ভাবে আসা দেখে লাইব্রেরীয়ান অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে যে আল্লাহ্ আপনার জন্য তাঁর ডাক ব্যবস্থায় পাঠিয়েছেন। আমি ওর কথা শুনে বই দু'খানা হাতে নিয়ে বললাম, আমি চলি। লাইব্রেরীয়ান বললো, আমি কি করবো? এ যে তালিকা হয়ে এসেছে! আমি বললাম, তুমিতো দেখলে আল্লাহ্ আমার জন্য বই দু'খানা পাঠিয়েছেন। তুমি নিজেই তো তা বললে!

লাইব্রেরীয়ান সুন্নী। শিয়াদের চাকুরী করে। আমি তাকে বললাম, "তুমি তো সুন্নী। সুন্নীরা সত্যকে গোপন ও চাপাদেয়া জায়েয মনে করে। তাদের ভাষায় তারা তাকে, "তাওরিয়া" বলে। শিয়ারাও বিপদ কাটার জন্য মিথ্যা বলে। তাদের পরিভাষায় তাকে "তাক্বিয়া" বলে। শিয়া-সুন্নী উভয় মিলিয়ে তুমি ম্যানেজ করে নিও। আমি চললাম।" এ বলে আমি চলে আসলাম। পাঁচশ পাঁচশ করে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই দু'খানা। একখানার নাম "ফাস্আলু আহ্লায্ যিক্র" অর্থাৎ তোমরা ক্বোরআন জানা অভিজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করো। এ নামটি ক্বোরআনের একটি আয়াত। দ্বিতীয় বইটির নাম "আশ্ শিয়া, হুম আহলুস্ সুন্নাহ" অর্থাৎ শিয়ারাই আসল আহলে সুন্নাতুল জামাত।

মিথ্যা ও বিদআত ত্যাগ করে আল্লাহ্র সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকলে আল্লাহ্ যে সাহায্য করেন, তাঁর ও তাঁর রাসূল সঃ এর দ্বীনকে তুলে ধরার জন্য বিদ্আতী সুন্নী-শিয়াদের ভুলকে তাদেরই যুক্তি প্রমাণ দিয়ে খন্ডানোর জন্য আল্লাহ্ পর পর তিনখানা কিতাব আমাকে এভাবে সরবরাহ করার ফলে কি প্রমাণ হয় না, যে সূরা আনকাবূত ও সুরা নাহ্লে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন? সাদাক্বাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম।

বাংলাদেশে ইরানী দূতাবাসে চাকুরীতে থাকাকালীন জামাতে ইসলামের এক রোকন আবুল হোসেন সুন্নী থেকে শিয়া হয়েছে বলে জানি। কিন্তু সে পড়া লেখায় বা মানে মর্যাদায় কোনো উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব না হওয়ায় তার ব্যাপারটি একটি ব্যক্তির বর্ণ ত্যাগের বেশী কিছু নয়। কিন্তু ডঃ মুহাম্মাদ তিযানী সামাভীর সুন্নী থেকে শিয়া হওয়া এবং ডঃ মূসা

মূসুভীর শিয়া থেকে সুন্নী হওয়ার ব্যাপারটি জ্ঞান ও তথ্য পিপাসুদের জন্য কৌতুহল উদ্দীপক। কারণ ডঃ তিযানী যেমন সুন্নীদের মধ্যে পন্ডিতব্যক্তি, তদরূপ ডঃ মূসা মূসুভীর শিয়া থেকে সুন্নী হওয়ার ব্যাপারটি জ্ঞান ও তথ্য পিপাসুদের জন্য কৌতুহল উদ্দীপক। কেনোনা, ডঃ তিযানী যেমন সুন্নীদের মধ্যে পন্ডিত, তদরূপ ডঃ মূসা মূসুভী শুধু শিয়া পন্ডিতই নয়, সে শিয়াদের মার্জায়ে তাক্বলীদ আবুল হাসান মূসূভী ইস্পাহানীর পোতা। তারপর এরা উভয়ই তাদের স্ব স্ব ফের্ক্বা ত্যাগ করে নতুন ফের্ক্বা গ্রহণের পক্ষে মোটা মোটা বইও লিখেছে। তাই এদের লিখনীর বিষয়বস্তু ও তার লক্ষ্য জানার জন্য আমি উদ্গ্রীব ছিলাম। যদিও আল্লাহ্ প্রদত্ত আমার ধ্যান ধারণায় তাদের কারো প্রতিই আমার শ্রদ্ধার কোনো কারণ ছিলোনা। কারণ, তারা এক বিভ্রান্তি থেকে আরেক বিভ্রান্তিতে স্থান পরিবর্তন করেছে। ফলে উভয়ই বিপথগামী।

তবুও তাদের দিক পরিবর্তনের কারণ ও তার কিছু বিস্তারিত বিবরণ জানার লক্ষ্যে আমি বই দুই খানার পাতা উল্টাতে লাগলাম। পড়া শেষ করে আমি আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে কাঁদলাম। উভয় ব্যক্তি শিয়া-সুন্নী ফের্ক্বার স্বপক্ষ বিপক্ষের এতো তথ্য সূত্র দিয়েছে যে, অন্য কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তির এগুলো বের করতে হলে শত শত বইয়ের হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়তে হতো। দু'পক্ষের যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত গোলা বারুদের খোল ও বিস্ফোরকের নমুনা দেখে যেমন উভয়ের অস্ত্র ভান্ডারের আন্দাজ করা যায়, তেমনি এদের উভয়ের লিখনীতে উভয় পক্ষের জ্ঞানের ভান্ডার আবিস্কার করা সহজতর হলো।

সত্যের বিপরীত মিথ্যা এবং মিথ্যার বিপরীত সত্য। এ সহজ হিসাব সবারই জানা। কিন্তু মিথ্যা বা বাতিলের এপিঠ ওপিঠ উভয়ই মিথ্যা এবং বাতিল। উভয়কে যোগ করলে পূর্ণ বাতিল প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে তাঁর শেষ নবী প্রেরণ করে ইসলাম, ঈমান ও তাক্বওয়াকে যোগ করে আমাদের ইহসান দান করেছেন। তাক্বওয়া ইহসানের বহিরাবরণ। তাই মুমিনদের ইমামতের মানদন্ড করেছেন তাক্বওয়াকে। যাদের মধ্যে গোত্র ও বর্ণ বৈষম্য থাকে, তারা কখনো তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাক্বওয়া বিদ্আতের বিরুদ্ধে দুর্গ।

নবী রাসূলগণ তাক্বওয়ার মানদন্ড। আখেরী নবী সঃ তাক্বওয়ার মানদন্ডের সীলমোহর। তাই তিনি শির্ক ও বিদ্আতের সকল বৈষম্যবাদ ধুয়ে মুছে ইস্তিকবারের প্রত্যাবর্তন প্রতিরোধ কল্পে আল্লাহ্র নির্দেশে মুস্তাদআফ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বিদায় হজ্জ ও জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযান তাবুক থেকে ফেরত এসে, পথে পথে ও মদীনায় আমৃত্যু নাযিল হওয়া সূরা তওবার শেষ আয়াতের আলোকে রাসূল সঃ একা আল্লাহর নির্দেশে, একক সিদ্ধান্তে উসামাহকে তাঁর পর মুসলিম উম্মাহর ইমাম নিয়ুক্ত করে যান। তাঁর সিদ্ধান্ত না মানলে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সঃ কে বলতে বলেছেন, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"যদি তারা মুখ ফিরায় তুমি বলবে আমার জন্য আল্লাহ্ একাই যথেষ্ট। আমি তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। তিনি মহান আরশের একমাত্র মালিক।"

যারা ঈমানহীন, তাদের বলছিনা। যারা ঈমানদার বা ঈমানের দাবিদার, তাদের আমি নির্দেশ দিয়ে বলছি; তোমরা সূরা তওবাকে রাসূল সঃ এর রিসালাত জীবনের সমাপ্তির সূরা রূপে পড়ো, শেষ আয়াতটি পড়ে বোখারীতে বর্ণিত উসামাহ বিন যায়দের নিয়ুক্তির হাদীস দুটি পড়ো। তারপর চোখ দুটি বন্ধ করে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর দৃশ্যটি দেখতে চলে যাও। দেখবে রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর তাঁর গঠিত তিরিশ হাজার সৈন্যের উসামাহ চূড়ান্ত সেনাপতি ও মুসলিম উম্মাহর ঈমাম। আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীরা সবাই তার অধীনে সাধারণ সিপাহী। আল্লাহ্র আখেরী নবীর আখেরী যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর আখেরী নিয়োগই চূড়ান্ত নিয়োগ। এ অবস্থায় কখনো খন্ডকালীন নিয়োগ হয়না। উপরের লাইন কয়টি পড়ে আমার সাথে পড়ো,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(রাসূল বলো ঃ) "হে মু'মিনরা, তোমরা নিশ্চিত জেনে নাও যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে, তোমাদের রাসূল সঃ এসেছেন, তিনি তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে অতীব সজাগ ও যত্নবান। মু'মিনদের কল্যাণ বিধানে অতি

সংবেদনশীল ও মহাদয়ালু। তারপরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁর উপরই আমি সব ন্যস্ত করলাম। তিনি মহা আরশের মালিক।" (সূরা তাওবা- ১২৮, ১২৯)

এ রাসূল সঃ এর মৃত্যুর পর "আল্ আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে উসামাহকে বাদ দিয়ে গোত্রভিত্তিক তথাকথিত খেলাফত দাঁড় করানো হয়। কারণ, উসামাহ ক্বোরেশ বংশীয় নয়। তারপর থেকে ক্বোরেশী ক্ষমতা দখলের কলেমাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। তা করতে গিয়ে সমান্তরালে দু'টি নির্জলা মিথ্যা হাদীস তৈরী করে তা প্রচার করা হয়। উভয় হাদীসই রাসূল সঃ এর মুখ দিয়ে বলানো হয়। কারণ, তাঁর ভাষায় ও মুখে না বললে যে মানুষের মধ্যে তা চালানো যাবে না! প্রথমটি হলো, "আমার পর, পরপর বারোজন খলিফা হবে, তারা সবাই ক্বোরেশী বংশের হবে"। দ্বিতীয়টি হলো, "আমার পর, পরপর বারোজন ইমাম হবে তারা সবাই ক্বোরেশ বংশীয় হবে।" প্রথমটি আবু বকর, উমর, উসমান, মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদদের লাইন, দ্বিতীয়টি আলী, হাসান ও হোসাইনদের লাইন। ডঃ তিজানী প্রথমটি ত্যাগ করে তাকে মিথ্যা ও অসার প্রমাণ করে দ্বিতীয়টি সঠিক প্রমাণ করেছে। ডঃ মূসা মূসুভী দ্বিতীয়টি ত্যাগ করে তার অসারতা প্রমাণ করে প্রথমটিকে সত্য বলে প্রমাণাদি দাঁড় করে তাকে গ্রহণ করেছে। তিজানী সুন্নীডোবা থেকে লাফ মেরে মধ্যের সিরাতুল মুস্তাকীম অতিক্রম করে অপর পারের শিয়া ডোবায় পতিত হয়েছে। মূসুভী শিয়া ডোবা থেকে ডিগবাজী খেয়ে মধ্যস্থিত সিরাতুল মুস্তাকিম পার হয়ে সুন্নীডোবায় অবস্থান বদল করেছে। মাঝখানে রাসূল সঃ ও তাঁর বর্ণাঢ্য যায়দ, ইবন মাসউদ, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের বিশ্বরোড "রাহমাতুল্লিল আলামীন" ফাঁকা! এদের দু'পক্ষের লেখার দুর্লভ তথ্যাদি পড়ে আল্লাহ্ আমাকে পূর্বে তাঁর রাসূলের আচরিত দ্বীনের যে ঐশীপথ প্রদর্শন করেছিলেন, তার সত্যায়ন হয়েছে। তাই আমার বইতে আমি যা লিখেছি, তার যথার্থতা সম্পর্কে আরো দৃঢ় হয়েছি। সে জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা। আলহামদু লিল্লাহ।

এবার দ্বিতীয় মেরুর কিতাব, আফগান যুদ্ধের আরব যোদ্ধাদের ঈমাম, শহীদ আব্দুল্লাহ আযযামের প্রসঙ্গে আসছি। সৌদী মরহুম শেখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায, সংক্ষেপে বিন বাযের বিশ্বাসভাজন শেখ আব্দুল্লাহ আয্যাম আফগান যুদ্ধে ইখওয়ানী ও অ-ইখওয়ানী সকল আরব যোদ্ধাদের মধ্যমনি ছিলো বলে বলা চলে। উসামাহ্ বিন্ লাদেন ধনাঢ্য সৌদী ভিন্ন মতাবলম্বী রূপে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বললেও শেখ আযযামকে সেভাবে সন্ত্রাসী বলার জো নেই। সে একজন সাচ্চা ইসলামী, ইখওয়ানী ও সুন্নী মৌলবাদী, বিরল ব্যক্তিত্ব। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। সে শাহাদাত ও মৃত্যুর মধ্যে প্রতি মূহূর্তে পরকালের যাত্রীরূপে সূরা তাওবা পড়েছে। আর সঙ্গীদের সূরা তওবার দরস্ দিয়েছে। যুদ্ধে যোগ দেয়ার পর থেকে আমৃত্যু সে এপথে চলার ধারাবিবরণীতে তার সীমিত যোগ্যতানুযায়ী সাধারণভাবে ক্বোরআনে বিচরণ করে এবং বিশেষ ভাবে সূরা তওবায় নিজেকে আবদ্ধ করেছিলো। মৃত্যুপথের এ যাত্রায় সে ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্না, তার উত্তরসূরী, হাসানাল হুদাইবী, উমর তিলমিসানী, সাইয়েদ কুত্ব ও মুহাম্মদ কুতব প্রভৃতির জীবনীর চলমান প্রচারের সঙ্গে বর্তমান আরব বিশ্বেব শাসকদের দাজ্জালী ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছে। তাতে সন্দেহাতীত প্রমাণ হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে হযরত ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সঃ গণ আবির্ভূত হয়ে বিগত হলেও নমরুদ, ফিরআউন, আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফইয়ান, মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদরা এখনো দিব্যি বেঁচে আছে। রাজতন্ত্রের চেয়েও বর্বর অসভ্য ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচার মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশ সমূহে বিদ্যমান। যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কল্পনাও করা যায় না। তাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরোধীদের ধরে জেলে ঢুকিয়ে অত্যাচার করে হাত পাঁ বেঁধে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে তাদের পিতা-মাতার বাড়ির ছাদের উপর শূন্য থেকে ফেলা ও জীবন্ত দেহ এসিডে ডুবিয়ে কঙ্কাল করে পিতা-মাতা ও স্ত্রীর কাছে ফেরত দেয়া প্রভৃতি কি আবু বকরের ছেলেকে গাধার পেটে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারা ও হোসাইনকে কারবালায় হত্যা করা এবং আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়রকে হত্যা করে দিনের পর দিন কা'বার চত্বরে তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না? গোটা আরববিশ্বে রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদীদের সন্ত্রাসী স্বৈরাচার। তাই, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরা শুধু ইসলামী পুনর্জাগরণের সৈনিক। কেউ সামাজবাদী, জাতীয়তাবাদী ও অন্য আদর্শের নয়।

শেখ আব্দুল্লাহ আয্যাম ও তার সঙ্গীরা মধ্য প্রাচ্যের আরবদেশ সমূহের ইসলামী পুনর্জাগরণের মুক্তিযোদ্ধা। গোটা আরব দেশ সমূহের শাসকরা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পোষ্য সেবাদাস। ও,আই,সি, রাবেতা, উপসাগরীয় সহযোগিতা

কাউন্সিল বা জি. সি. সি. ও আরব লীগ মূলতঃ ইসলামী পুনর্জাগরণ ঠেকানো পশ্চিমা পরাশক্তির ঘাতক শিকারী কুকুর ও হায়নাদের দুষ্টচক্র বই কিছু নয়।

তাদের লোমহর্ষক অত্যাচার ও নিপীড়ন ইসলাম ও ঈমান পাগল লোকদের উপর হচ্ছে। তারা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিচে ক্বোরেশী খেলাফত ও সাহাবী পূজারী না হতো , তাহলে তাদের পক্ষে পূর্বের মতো আকাশ থেকে পাথর ও আগুন বর্ষিত হতো। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ, আল্লাহ্‌র নিকট বিদআত ও শির্ক কুফ্রীর চেয়ে মাহাপাপ। যার ক্ষমা নেই। কাফেরদের উপর আল্লাহ বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেন। শির্কের বিদআতের পাপে আল্লাহ্ পরস্পরকে হত্যা করার গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেন। "ফাক্তুলু আনফুসাকুম" বলে আল্লাহ্ বনী ইস্রাঈলদের গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়েছিলেন। এখন মুসলিম বিশ্বে যা চলছে তা সবই শির্ক ও বিদ্আতের ফলে আল্লাহর চাপানো গৃহযুদ্ধের অভিসম্পাত। "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে শির্ক ও বিদ্আত চালু করার ফলে যে উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিস্ফীনের যুদ্ধ হয়েছে, এগুলো তারই ধারাবাহিকতা।

আফগানিস্তানে জড়ো হওয়া ইখওয়ানী ও তাদের সঙ্গী যোদ্ধারা, সাদ্দাম, মুবারক, কায্যাফী ও হাফিজুল আসাদকে কাফের ও মুর্তাদ বলে। কিন্তু ফাহদ, হাসান, হোসেইন, শেখ যায়দ ও জাবের আল্ সাবাহ্, রাজা, বাদশাহ্ ও শেখদের ব্যাপারে কোনো উল্লেখই করে না! বরং প্রকারান্তে নাসের, আনওয়ার সাদাত ও হুসনী মুবারকদের কঠোর নিন্দা করে। মিশরের প্রাক্তন রাজা ফারুকের রাজতন্ত্রের ভূয়সী প্রসংশা করতে দেখা যাচ্ছে। আবু সুফইয়ান, মুয়াবিয়া ও মারওয়ানের নামের সাথে আগে পিছে ও ডানে বামে "রাদিয়াল্লাহু" বলতে তাদের কোনা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা লজ্জাশরমের লেশও দেখা যাচ্ছে না।

তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে নাসেরের অত্যাচারে সাইয়েদ কুত্ব ফাঁসিতে ঝুলে ঈমান নিয়ে চলে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার ভাই মুহাম্মদ কুত্ব জেল থেকে ফয়সলের হস্তক্ষেপে মুক্তি পেয়ে রাজতন্ত্রের পোষ্য হয়ে বেঁচে থেকেও ঈমানে মৃত্যুবরণ করেছে। তার সাথে অন্যান্য ইখওয়ানী নেতারাও জীবিত লাশ হয়ে রাজতন্ত্রের পক্ষে বিশ্বের ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাব্য সৈনিকদের ঈমান লুটেছে। এক এক জনের দেশে-বিদেশে বাড়ী, গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স ও ব্যবসা বাণিজ্যের শেয়ার বাড়ছে। মওদূদী মুয়াবিয়ার রাজতন্ত্রের সামান্যতম সমালোচনা করে পরে বাদশা ফয়সাল পুরস্কার গ্রহণ করে তার কাফফারা আদায় করে দুনইয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন তার উম্মত, জামাতী নেতা ও তাদের পোষ্যরা মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানদের সিলসিলার রাজা বাদশা ও শেখদের দানের উচ্ছিষ্টে দেশে-বিদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো ইসলামের নামে ব্যাংক-বীমা ও অগণিত সংস্থা দাঁড় করে ইসলামের শত্রুদের সে সেবা করছে যা শত্রুরা নিজ নামে করতে পারেনি, এখনো পারছে না। কিন্তু এ চর্ব্য, চৌষ্য ও মাখন ভোগী ইখওয়ানী নেতা ও তাদের মারওয়ানদের ভোগবাদ ও দুনইয়া পূজারীদের উপর নিরাশ হয়ে আরব যোদ্ধারা তাদের ত্যাগ করে আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও চেচনিয়ায় অস্ত্র ধারণ করে বিন লাদেনের খপ্পরে পড়ে তারা আজ ইসলামের নামে সন্ত্রাসী বৈ কিছু নয়। এরা রাসূল সঃ এর আদর্শ ও তাঁর মুস্তাদআফ যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের পথ থেকে যোজন দূরে বিচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে মুস্তাকবিরদের স্বার্থে ও ষড়যন্ত্রে বলির মেষ ও মহিষ রূপে জবাই হচ্ছে। এদের পরিণাম দেখে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, এরা যেনো পরিকল্পিত ভাবে বিশ্বতাগুত ও মুস্তাকবিরদের বর্ণচোরা দালালদের হাতে নিঃশেষ হচ্ছে। তাতে এক ঢিলে দু'পাখি শিকার হচ্ছে। সম্ভাব্য ইসলামী যুবশক্তির রক্তক্ষরণ হয়ে তারা নির্মূল হচ্ছে এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা অনিশ্চিত ও সুদূর পরাহত হচ্ছে। তাতেই শয়তান ও তার মানুষ সন্তানদের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে।

ইসলাম ও ঈমান পশুরমতো জন্মানো মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে। ঈমান অন্তরচোখে আল্লাহ্‌কে দেখে মানুষকে তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করতে শিক্ষা দেয়। এর নাম ইসলাম এবং আত্মসমর্পণকারী মুসলিম। এরূপ ইসলাম গ্রহণকারী তিন দিক দেখে। আদম থেকে তার রূহানী অতীত, বর্তমানে তার দৈহিক বর্তমান এবং পৃথিবী থেকে তার বিদায়ের পর পরবর্তী কাল আখেরাত। أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا এরাই সঠিক মু'মিন।

এ রূহানী ঈমান অর্জিত হলে ঈমানদার ব্যক্তিরা সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখে এবং সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচারের যোগ্যতা অর্জন করে। এ ন্যায় বিচার করার যোগ্য মানুষরা মুত্তাক্বী। ক্বোরআন এদের পথ প্রদর্শক। সালাত কায়েমের মাধ্যমে এরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। সালাতে দাঁড়িয়ে দৈনিক পাঁচ বার ক্বোরআন পড়ে সে ন্যায় বিচার ও ন্যায় নীতির প্রশিক্ষণরত জীবন যাপন করে। সে ভাবে নিজ পরিবারকে জাহান্নামের অগ্নিমুক্ত করে সমাজে সে

মানদন্ডের নেতৃত্ব সরবরাহ করে। যেখানে সালাত ও সমাজের নেতৃত্ব একহাতে, সে সমাজ ও জাতি মুসলিম। যেখানে সালাতের নেতৃত্ব এক শ্রেণীর হাতে এবং সমাজের নেতৃত্ব আরেক শ্রেণীর হাতে, সে সমাজ ও জাতি মুনাফিক ও মুশরিক। এরা ভূপৃষ্ঠে অভিশপ্ত পরমুখাপেক্ষী জাতি। পরকালে এরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

সালাত ভিত্তিক সমাজের নেতা ইমাম। প্রধান ইমামের হাতে বায়আতের আমরণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ব্যক্তিরা তার সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সমাজের আনাচে কানাচে নেতৃত্ব দিবে। এদের সকল কর্মকান্ড মস্‌জিদ কেন্দ্রিক। মসজিদ এদের একমাত্র মিলন কেন্দ্র ও কম্যুনিটি সেন্টার। মসজিদকে কেন্দ্র করে চারপাশে প্রশাসন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। সালাতের আযান হতেই শাসক-শাসিত কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সাম্য ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রদর্শন করবে। সালাতে জামাতের বিশেষ সময়টুকু ছাড়া অমুসলিমরাও মসজিদের পরিবেশে ইসলামের শিক্ষা ও তার আচরণ দেখার জন্য সর্বদা অবারিত যাতায়াত করবে। তাদের বিয়ে-শাদীও মসজিদে হতে বাধা নেই। সামাজিক বিচার আচারও সেখানে হবে। এটাই রাসূল সঃ এর আচরণ ও শিক্ষা। তা হলেই সমাজের সকল মানুষ মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। মক্কায় হজ্বের সময় ব্যতীত সারা বছর অমুসলিমরা যাতায়াত করবে। সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে হজ্বের সময় ছাড়া সারা বছর উমরার মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিমদের মক্কায় বিশ্ব ঐক্যের কর্মশালায় প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে। এরই নাম হজ্জ ও উমরা। এখন বিশ্ব জোড়া যে মসজিদ নামের ঘরসমূহে নামাজ ও মক্কায় হজ্জ ও উমরা হয়, তা আসল সালাত, হজ্জ ও উমরার প্রহসন। এর ইমাম ও হাজী সব প্রতারক ও জাহান্নামী। "ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন" অভিসম্পাতিত এ মুসল্লীরা। আল্লাহর দরবারে এছাড়া এদের অন্য কোনো নাম ও পরিচয় নেই।

এ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ নবী রাসূলদের যুগে যুগে পাঠিয়ে শেষে, শেষ নবীকে পাঠিয়ে তার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন। সকল গোত্র ও জাত বৈষম্য চিরতরে অবৈধ ঘোষণা করে তাক্বওয়াকে একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে শেষ কথা ঘোষণা করেছেন। এ হলো ন্যয়নীতি ও ন্যায় বিচারের একমাত্র বিধান।

বৈষম্যবাদীরা যেহেতু মানবসাম্য মানেনা, তাই তারা কখনো মানব জাতির নেতা হতে পারেনা। ইয়াহুদীরা বৈষম্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। মক্কায় কাবা ঘরের প্রতিবেশী ক্বোরেশীরা সে দোষে দুষ্ট ছিলো বলে তাদের পরাজিত ও উৎখাত করে আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে পবিত্র করেছেন। আরবরা ইয়াহুদীদের অনুসরণ ও অনুকরণে পুনঃ সে মক্কা মাদীনাকে অবরুদ্ধ ও অপবিত্র করায় বর্তমানে ক্যাম্প ডেভিডে পুরাতন অভিশপ্ত ইয়াহুদী ও নব্য অভিশপ্ত আরব ইয়াহুদীদের শেষ আঁতাতের বৈঠক হচ্ছে। এতে কোনো সমস্যার সমাধান না হয়ে বিশ্বসমস্যা মহা বিস্ফোরণের দিকে মোড় নিবে। ক্যাম্প ডেভিডে যেমন পৃথিবীর এক নম্বর তাগুত পরাশক্তির দাজ্জাল আমেরিকার দাবা খেলা চলছে, তদরূপ পৃথিবীর দরিদ্রতম আফগান সীমান্তে আল্লাহর কুদরতের খেলার মঞ্চ তৈরী হচ্ছে। তাওহীদ ও রিসালাত ত্যাগী আরবী, ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফত নামের সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষ আরবদের "প্রতীকী হনুমান" সন্ত্রাসী ইয়াসির আরাফাতকে আল্লাহ ক্যাম্প ডেভিডের চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দী করেছেন। বনী ঈসারাঈলদের বাঁদর ও আরব বাঁদরদের অভিশপ্ত ভূমি এখন মধ্যপ্রাচ্য। পূর্ব থেকে ভারত, বাংলাদেশ ও মধ্য এশিয়া থেকে ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃ দের অনুসারী আল্লাহর সৈনিকরা মক্কা, মাদীনা ও বাইতুল মাকদিস মুখে "কোটি সৈনিকের অভিযানে" পশ্চিমে মার্চ না করলে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সঃ দের রিসালাতের "উৎস ভূমি" মধ্যপ্রাচ্য মুক্ত ও পবিত্র হবে না।

ইরানের শিয়া মুস্তাকবির মোল্লা আয়াতুল্লাহদের "তাক্বিয়া" নামের মুনাফেক্বীর ফলে আল্লাহ তাদেরও ইরানের চৌহদ্দীর মধ্যে বন্দী করেছেন। আফগানিস্তানের সুন্নী মোল্লাদেরও গৃহ বিবাদে লিপ্ত করে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এ সুযোগে সকল বর্ণবাদ, গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদমুক্ত যায়দ ও উসামাহদের মুস্তাদআফ বাহিনী তৈরীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আফগান সীমান্ত থেকে পূর্বে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিশ্বমুক্তির মুস্তাদআফ সৈনিক তৈরীর পথে প্রধান বাধা তিনটি। তা, যথাক্রমে মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াযীদের সুন্নী তালেবান, মওদূদীবাদের গণতন্ত্রী তথা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ইসলাম ও ভারতীয় রামরাজ্যের শিবসেনা। গভীর অর্থে সত্যকথা বললে এ তিনটি একদল ও এরা পরস্পরের সহায়ক "হিয্‌বুশ শয়তান", সাম্প্রদায়িক শির্ক থেকে এদের জন্ম। সাম্প্রদায়িক তাওহীদী ঐক্যের পথে এরা সমভাবে বাধা।

এদের মধ্যে ইসলামের নাম নেয়া মওদূদী জামাত ও তালেবান জামাত "খেলাফত আলা মানহাজিন্ নবুওত" অর্থাৎ নবী সঃ এর আদর্শে খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাবিদার। এদের ব্যাপারটি " সোনার পিত্‌লা কলস"। নবুওতের আদর্শে

খেলাফত কি করে হয়??!! নবী তো কোনো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে যাননি? তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইমামত ভেঙ্গে যে খেলাফত নামের বর্ণবাদ দাঁড় করা হয়েছিলো, তার সাথে নবী সঃ ও তাঁর নবুওতের সম্পর্ক কোথায়? এ তো ঘোড়ার ডিম! নামে আছে, কামে নেই। এ ডিমে তা দিয়ে দীর্ঘ ১৪১২ বছর ধরে কোনো ঘোড়ার বাচ্চা হয়নি। ঘোড়ার বাচ্চার নামে হিংস্র নেকড়ে ও হায়নার পাল জন্ম দিয়ে এ যাবত মুসলিম উম্মাহকে তাদের খাদ্য রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর নয়।

উপমহাদেশে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর রহমতের ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লবী উত্থানের পথে যেমন মুঘল পাঠান বাদশাহ ও সুলতানদের বিকৃত ইসলাম ছিলো, তারই প্রেতাত্মা মওদূদী জামাত ও সুন্নী কট্টর মোল্লাদের তালেবান টাইপ সন্ত্রাসী ধ্যান ধারণা। তন্মধ্যে মওদূদী জামাত রাজনৈতিক ক্ষমতা লোভ ও অর্থনৈতিক ভোগবাদের এক বিকৃত সামাজিক ব্যাধি। সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকায় উপনিবেশবাদের আস্তাকুঁড়ে জন্মানো দেশীয় চোর বাটপারদের উপনিবেশীয় দুঃশাসনে নিরাশ ইসলামী যুবশক্তিকে বিকৃত মুখরোচক মওদূদীর হাকীকত সিরিজের চটিবই দিয়ে এদের শিকার আরম্ভ হয়। ইখওয়ান ও জামাতীরা ১৯২৪ সালে উৎখাত হওয়া তুর্কী সুলতানাত ও ভারতের মুঘল-পাঠান দস্যুলুটেরাদের শাসনকেও ইসলামী শাসন বলে মানে ও প্রচার করে।

মুস্তাদআফ চিন্তাধারাহীন এদের বই পুস্তক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, এদের মধ্যেই মুস্তাদআফ ও মুস্তাকবির সৃষ্টির একটি নির্লজ্জ জঘণ্য পৈশাচিক প্রক্রিয়া। এদের কেন্দ্রীয় নেতারা চরম প্রাচুর্যের জীবন যাপন করে তাদের ছেলে-মেয়েদের ব্যয়বহুল লেখা পড়া করায়। নেতাদের ছেলে ও মেয়েদের বিয়ে-শাদীতে তাগুত মুস্তাকবিরদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তাদের বিয়ের মজলিসে কাফের মুশরিকদের মতোই উলঙ্গ নরনারীর বেপর্দা মাংস প্রদর্শনী হয়। অথচ দলের মাসিক চাঁদা দেয়া নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মী ও সমর্থকদের একটি খেজুর ও একগ্লাস পানি দিয়ে বিবাহ মজলিসে আপ্যায়ন করা হয়। রাজনৈতিক পেশী প্রদর্শনে এদের নেতাদের সন্তানরা আসে না। ফলে তাদের লাশও পড়েনা। তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে দরিদ্রের লাশ পড়ার অপেক্ষায় থাকে। লাশপড়া মাত্র এদের কর্মতৎপরতা আরম্ভ হয়। জানাযা ও গায়েবী জানাযা শুরু হয়ে এক আধটি শোকসভা করে বক্তৃতারত নেতাদের ছবি তুলে নিজস্বব্যাঙ্ক-বীমার অঢেল ধনে স্মারক ও ক্রোড়পত্র ছেপে আবার নতুন লাশ পড়ার অপেক্ষায় থাকে। এদের জাহিলিয়্যাতের স্বার্থদ্বন্দ্বে যারা মরে ও মারে, উভয়ই সন্দেহাতীত জাহান্নামী, যেমন উষ্ট্র ও সিফফীনের যুদ্ধের সংঘটকরা ছিলো। এদের ষড়যন্ত্র না বুঝে যারা এদের দাজ্জালীর মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মারা যায়, এরাই ক্বেয়ামতের দিন এদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে নেতা-নেত্রীদের জাহান্নামে পাঠাবে। জামালযুদ্ধ ও সিফ্‌ফীনের আম্মারদের অনুসারী মুস্তাদআফদের কুচক্রী মুস্তাকবিরদের হাত থেকে রক্ষা করতে অনতিবিলম্বে কুচক্রী নেতাদের মুখোশ উন্মোচন "ফরজে আইন" হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য সূরা তওবার আলোকে এদের আড়াল করা চেহারা এ বইতে তুলে ধরা হচ্ছে।

মাওলানা মওদূদী একজন ইসলামী সাহিত্যিক ছিলো। একজন লেখকের কোনো বিষয়ে কিছু জানা শোনা ও সচল কলম থাকলেই সে সাহিত্যিক হয়ে যায় । তাদের লেখনীর সাথে আসল ও চরিত্রের কোনো সামঞ্জস্যের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে তিনটি জিনিস সর্বপ্রথম একত্র হয়ে একাকার হয়ে যেতে হয়। তা হলো ঈমান, আমল ও রূহানিয়াত। প্রথম দু'টি ঠিক কিনা, তার প্রমাণই হলো তৃতীয়টি। তৃতীয়টি অর্জিত হলে সে ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা কথা ও কাজে ডিগবাজী খাবেনা। যেমন রাসূল সঃ গণ ও তাদের মুস্তাদআফ অনুসারীরা খায়নি। অন্যরা অহরহ ডিগবাজী মেরেছে। নবী চরিত্রের মাধুর্য বুঝে তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে আল্ ক্বোরআনে ডুবে গেলেই সে অবস্থা ও অবস্থান সৃষ্টি হয়। তা না হলেই মিথ্যা হাদীসের আশ্রয় নিয়ে তরীকাত, মারিফাত ও হাক্বীক্বাত প্রভৃতির ভোজবাজীর দোকান ও প্রকাশনী খুলতে হয়। আসল হাক্বীকত যাদের কাছে খুলে যায়, তারা মওদূদীর হাক্বীক্বাত সিরিজের টোটকা বিজ্ঞাপন বাজারে ছাড়েনা। সরাসরি ঈমান, আমল ও রূহানিয়াতের ঘোষণা দিয়ে মানুষকে ক্বোরআন দিয়ে আল্লাহর দিকে ডাকে। যেমন নবীরা করেছেন।

নবীদের সরাসরি সে আদর্শ আমার পরিচয়। সে সোজা সরল পথেই আমি আমার পাঠকদের ডাকছি। আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী সঃ কে বলেছেন, "তোমাকে রূহ্ বা রূহানিয়াতের সম্পর্কে লোকেরা প্রশ্ন করবে। উত্তরে তুমি বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশাবলীর একটি। তোমাদের কিন্তু জ্ঞানের সামান্যতমই দান করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে যা সামান্য অহী মারফত তোমাকে জ্ঞান দান করেছি, তা'ও ফেরত নিয়ে যেতে পারি। তাতে কেউ আমার বিরুদ্ধে

তোমার পক্ষে ওকালতী করতে আসবেনা। এসবই তোমার প্রতি আমার রহমতের একতরফা দান। তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের মহাদান রয়েছে। সারা বিশ্বের জ্বিন-ইনসান পন্ডিতরা জড়ো হয়েও আমি তোমাকে যে ক্বোরআনের জ্ঞান দান করেছি, তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে সক্ষম হবেনা।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৫-৮৮)
আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে, এমন সকল রক্তীয় সম্পর্ক কর্তন করে এ ঈমানের সনদ ও রূহানিয়্যাত পেতে হয়। যারা নামের সাথে সাইয়েদ, ক্বোরেশী, বাঙ্গালী ও হিন্দী লাগায় বা দাবী করে, তারা কখনো এ স্তরে পৌঁছায় না। কারণ, তারা নীচ। أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ আল্লাহ্‌ ও রাসূলদের বর্ণবাদহীন এক রং সিবগাতুল্লার লোকেরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ঈমান ও রূহানিয়াতের মহাদান প্রাপ্ত হয়।
হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতব ও মওদূদীরা যেহেতু রিসালাত থেকে বিচ্যুত খেলাফতী রাজনীতির ধারক বাহক, তাই তারা ক্বোরআনের মূল শিক্ষা, মুস্তাকবির ও মুস্তাদআফ সূত্রই খুঁজে পায় নি। ফলে তাদের সকল শক্তি, প্রতিষ্ঠিত মুস্তাকবির উৎখাত করে নিজেরা মুস্তাকবির হওয়ার সংগ্রামেই নিঃশেষ হয়ে পরাজয়ের পর পরাজয় ভাগ্যের লিখন হচ্ছে। মিশর, আলজেরিয়া, সুদান, তুরস্ক, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যা হয়েছে ও হচ্ছে, তাতে কি আমার কথা সঠিক প্রমাণ হচ্ছেনা? আমি আর্শ্চয্য হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, এদের কারো লেখনী, চিন্তা ও চেতনা কোথাও বারাকাহ, যায়দ, বিলাল, ইবন মাসউদ, আম্মার, সালমান ও উসামাহ এবং তাদের মুস্তাদআফ ডায়মেনশন বা দিক দর্শন নেই!! أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
এরা কি ক্বোরআনকে ক্বোরআনের মতো অধ্যায়ন করেনা, না এদের অন্তর সমূহে তালা মারা রয়েছে? (সুরা মুহাম্মদ-২৪)
হাসানুল বান্না ও সাইয়্যেদ কুতবরা আরবী ভাষাভাষী হওয়ায় তাদের লেখনীতে ক্বোরআনের বাচনিক কিছু ধারা দেখতে পাওয়া যায়। মাওলানা মওদূদীর তাফহীমূল ক্বোরআন সাদা-মাটা সাহিত্যের মানে ভাসা ভাসা ক্বোরআনী জগতে পর্যটন। কোথাও স্থির অবস্থানের গভীর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশনা নেই। কারণ, পুরো ক্বোরআনই মুস্তাকবির ইবলিস্ ও তার জামাত নমরূদ, আদ, সামূদ, আইকা, ফিরআউন, আবু জেহেল, আবু সুফ্ইয়ান, আবু লাহাব ও বর্ণবাদী ইয়াহুদ এবং তাদের উত্তরসূরী মুস্তাকবিরদের বিরুদ্ধে মুস্তাদআফদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদার বর্ণনা। নবী রাসূলগণ সমকালীন মুস্তাকবিরদের বিব্লুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিজেরা মুস্তাদআফ হয়ে নির্যাতন ভোগ করে তারপর আল্লাহর সাহায্যে মুস্তাকবির আদ, সামূদ, নমরুদ ও ফিরআউনের এমন ভাবে নির্মূল করে গিয়েছেন যে তাদের স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর বিশ্বে তাদের কোনো চিহ্ন নেই। সে শ্রেণীর মুস্তাদআফ্ না হলে কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুস্তাকবির নিধনের সাহায্য আসেনা, আসবেনা।
মাওলানা মওদূদী সাহিত্যিক ইসলামের সিরিজের হাক্বীক্বত চর্ম, মাংস ও অন্তর স্পর্শ করে শিহরণ জাগায় না। তাই সে সিরিজের আবেদন ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জের মতো দেহে ক্রুটিপূর্ণ ঔষধ প্রবেশ করালেও তাতে অজ্ঞতা ও জাহিলিয়্যাতের রোগ নিরাময় হয়না। ঔষধ আংশিক কাজ করেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে রোগীকে আরো জটিল রোগের কোলে ঠেলে দেয়। একমাত্র ক্বোরআনের সরাসরি ঔষধই মু'মিনদের নিরামায়ক ও রহমত।
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (বনী ইসরাঈল-৮২)
ভাষা সাহিত্যের আবেদনে দ্বীনের ভাসা ভাসা জ্ঞান আসার পর রূহানী ভাবে ক্বোরআনে প্রবেশ না করলে বস্তুবাদী টেকনিক্যাল ধার্মিক হওয়া যায়। যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, উমাইয়া, আব্বাসী ও মুঘল ভোগবাদীরা হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কলঙ্কিত করেছে। এরা বদ এবং এদের ধর্ম বদ্‌দ্বীন। বদ্‌দ্বীন বেদ্বীনের চেয়ে খারাপ। রাসূল সঃ এ বদ্‌দ্বীন সম্পর্কেই তাঁর নওমুসলিম আবু বকর ও উমরদের বারবার সতর্ক ও সাবধান করে গিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে মুস্তাদআফরা পূর্ণান্তকরণে আল্লাহর দ্বীন ক্ববুল করেছিলো বলে রাসূল সাঃ তাদের প্রতি বেশী আস্থাশীল ছিলেন।
ক্বোরেশী গোত্রবাদী খেলাফতের প্রবক্তা বিধায় মাওলানা মওদূদী ইসলামের মূলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। ফলে তার অনুসারী জামাতী নেতা কর্মীদের ঈমানও মূলে গ্রথিত হয়নি। তাই তার বৃক্ষ আকাশে ডালা পালা ছড়িয়ে ফলবান হতে পারেনি। যা ক্বোরআনে বলা হয়েছে। ঈমানের ভিত ঠিক হলে তা আকাশে বিস্তৃত হয়ে সর্বদা ফলবান হয়।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (সূরা ইব্রাহীম ২৪-২৫)

তাইয়্যেবের উল্টোই খবীস। সঠিক দ্বীনের শিক্ষা কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ্। এর অনুসারীরা তাইয়েব ও তাইয়েবুন। অঠিক ধর্মীয় কথাবার্তা কালেমায়ে খবীসাহ। এর ধারক ও প্রচারকরা খবীস। এদের কোনো স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধি হয়না। বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত যে ধর্মাচার রয়েছে তা সবই অগভীর অর্থাৎ খবীস ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ধ্বজাধারিরা ধর্ম ব্যবসায়ী খবীস। তাই বিশ্বের মানুষের এ'দশা।

উপমহাদেশের ইসলামের দ্বিতীয় ধারা, মাদ্রাসা মসজিদভিত্তিক মোল্লাদের বিনা পূঁজি ও শ্রমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সঃ কে বেচা-কেনা করার ব্যবসা। যাকাত, সাদক্বা ও বাৎসরিক ক্বোরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে জীবিকা উপার্জন এদের দ্বীনের চতুর্সীমা। লোকেরা খুশীহয়ে যাকাত, সাদক্বা ও চামড়া দান করলেই বেচারারা মহাখুশী। ফাসেক্ব, কাফের, মুশরিক, ব্যভিচারী, ব্যাভিচারিণী, সিনেমা বেশ্যালয়ের প্রদর্শক, ঘুষখোর বা ছিন্তাইকারী যে কেউ পয়সা দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা তৈরী করে দিলে তারা তার ইমাম ও মুহতামিম। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এদের ধ্যান ধারণার কোথাও নেই। এদের ছাত্ররাই তাদের উস্তাদদের বিকৃত শিক্ষা পেয়ে কিছু তারুণ্য ও কিছু নৈরাশ্য নিয়ে সমাজের ধনীদের প্রতি হিংসা ও প্রতিশোধ মিশ্রিত কল্পনায় তালেবান ধরনের কিছু একটা করতে চাওয়াই এদের "হারকাতুল জিহাদ"। এর বেশী কিছু তাদের লক্ষ্যে নেই। কারণ, বারাকাহ্, যায়দ, বেলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহদের "মুস্তাদআফ্" ধারণা এদের দেওয়া হয়না।

এদের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন সত্যিকার অর্থে নেই বলে এদের পরগাছা ও পরভুকের বাইরে কিছু মনে করার নেই। কিন্তু মওদূদী জামায়াত রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও ইসলামী পোজপাজের একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি করে প্রকৃত ইসলামের পথে মারাত্মক বিভ্রান্তিকর বাধা হয়ে আছে। এদের তৃণমূলের নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী যুবকদের কাল বিলম্ব না করে, ওদের পচন ধরা, চরম নির্লজ্জ অর্থলোভী ও ক্ষমতা লোভী এবং নীচ প্রকৃতির নেতা উপনেতাদের চক্রান্ত থেকে পৃথক করে ফেলতে হবে। নেতাদের গোপন চরিত্রের মূল চেহারা সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতের নিরিখে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে দিতে হবে। যাতে নেতাদের ভিতরে ঈমানের সামান্যমত ভিত্ থাকলেও যেনো তারা তাওবাতুন নসূহা করে মানুষ হওয়ার শেষ সুযোগ পায়। আর যদি তাও না থাকে, তাহলে তাদের আসল রূপ জেনে সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা দাজ্জালী থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের ইসলামী কাফেলায় যোগ দিয়ে স্বার্থক মুক্তি সেনা হতে পারে। সমাজের সাধারণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার দোষত্রুটি গোপন রাখা সওয়াবের কাজ। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজপতিদের প্রতারণামূলক গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া "ফরজে আইন"। যেমন ফিরআউন, নমরূদ, ক্বারুন, বালআম ইবন বাউরা, ক্বোদার ইবন সাল্ফ, আবু লাহাব, ওয়ালিদ ইবন মুগীরা ও আস ইবন ওয়াইলদের ব্যক্তিজীবনের গোমরও আল্লাহ্ ক্বোরআনে ফাঁস করে দিয়েছেন। কারণ এদের চারিত্রিক ভ্রষ্টতায় সমাজ নষ্ট হয়েছিলো। তাই এদের ব্যক্তি চরিত্রের দোষাবলী অমার্জনীয় ছিলো।

মওদূদী মরহুম কতো সুন্দরভাবে দ্বীনের ডাকের সূত্রপাত করেছিলো। তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও উন্নততরো ব্যবহারিক ও রূহানী জীবনে নবীদের অনুসরণে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায়, নিজে জীবনের শেষ দিনগুলো চরম নৈরাশ্যে ভুগে আমেরিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার দলের পরবর্তী নেতারা দেশে বিদেশে অসংখ্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী করে আল্লাহ্ ও রাসূলকে বিক্রি করে তাদের পরিবারের সাম্রাজ্য ক্বায়েম করছে। তা দ্বারা তাদের ছেলে-মেয়েরা দেশে বিদেশে রাজার হালে ভোগ বিলাসে মত্ত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের পয়সায় ধনী ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পার্টনার আরবদের সুদ ও হারাম পয়সার দানখয়রাত এদের ক্যাপিটেল ফরমেশনের উৎস। সে মূলধন লগ্নী করে এরা ইসলামের নব্য ইয়াহুদী পুঁজিপতি শ্রেণী। ইখওয়ানীরাও এদের আরবী সংস্করণ।

মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী জামাতীদের বিদেশী "নেটওয়ার্ক" এর ভিত। ভারতের জামাতীদের মূলধন মওদূদী হলেও আলী হাসান আলী নাদভীর লোকেরা নাদভীকে মূলধন করে আরব তোষণ ও আরবী ইসলামের ভারতীয় এজেন্ট তার নাদওয়ার চেলারা। মওদূদী যেরূপ বাদশা ফয়সাল পুরস্কার প্রাপ্ত, সেরূপ সাইয়েদ আলী হাসান আলী নাদভীও ফয়সাল পুরস্কার প্রাপ্ত। মুয়াবিয়া ইয়াযীদদের সাম্রাজ্যবাদের সেবক। ওদের

অনুদানে মওদূদীর জামাতীরা যেমন পাকিস্তানের লাহোরে মনসূরায় উপশহর গড়েছে, ভারতের লক্ষ্ণৌতে আলী মিয়ার লোকেরা তাদের সাম্রাজ্য গড়েছে। বেচারী ইসলাম এদের সবার একনিষ্ঠ খাদেম।

বাংলাদেশে মওদূদীর সাহিত্যিক ফরযন্দ যেমন মাওলানা আব্দুর রহীম, গোলাম আযম তেমনি তার রাজনৈতিক পোষ্যপুত্র। ভারতের আলী মিয়া নিঃসন্তান। তার মৃত্যুর পর এখন তার চেলারাই একক উত্তরাধিকারী। এরা প্রায়ই আলী মিয়ার আরবী পান্ডিত্যের উত্তরাধিকারী আরবী শিক্ষিত। আরবী খেলাফতের ও আরব শেখদের একনিষ্ঠ খাদেম। মাওলানা মওদূদীর সম্ভবতঃ ছ'টি ছেলে দু'টি মেয়ে। কোনো ছেলেকেই মাদ্রাসা পড়ুয়া আলেম বানায়নি। মেয়েদেরও কোনো আলেমের সাথে বিয়ে দেয়নি। ছেলে-মেয়ে সকলেরই সাইয়েদ তালাশ করে বিয়ে–শাদী দিয়েছে। বর্ণবাদী রোগে সম্পূর্ণ আক্রান্ত তার বংশধররা। বাংলাদেশের মাওলানা আব্দুর রহীমের আটছেলে দু'মেয়ে। এক ছেলেকেও আলেম বানায়নি। এক মেয়েকেও আলেমের সাথে বিয়ে দেয়নি।

আধ্যাপক গোলাম আযমের পাঁচ ছেলে। তার দাদার বাবা পশ্চিম থেকে আসা এক ফকীর সূফী ছিলো। নাম ছিলো শেখ সুফী শাহাবুদ্দীন। যেমন শেখ মুজিবের পূর্ব পুরুষ বাংলার বাহির থেকে আগত শেখ ছিলো। অধ্যাপক আযমের দাদা বাবাকে শেখ শিহাবুদ্দিন দ্বীনি আলেম বানিয়ে যায়। তাই পরিবারের দ্বীনের বাহ্যিক রং ও চর্চা রয়ে যায়। দাদার পূর্বে তাদের পরিবারের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত একটিমাত্র পুত্র সন্তান রূপে বংশ চলে আসে। তাই হালাল রুযীর উপর চলার আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সহজ জীবন তাদের পরিবারে চলে আসছিলো। কিন্তু গোলাম আযমের দাদার আমল থেকে তাদের পরিবারের বিচ্যুতি আরম্ভ হয় যখন তার দাদা মৌলভী আব্দুস সোবহান বিয়ের কাজী হয়। তখন থেকে বেশী ছেলে মেয়ের সংসারে কাজীগিরির অনুত্তম খাদ্য তাদের পরিবারকে বিপথে নিতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিকৃত চিন্তাধারা পরিবারের ইসলামী ঐতিহ্যকে ক্ষয় করতে আরম্ভ করে। পরিবারে আর খাঁটি ইসলামী শিক্ষা থাকলোনা। জগাখিচুড়ীর পরিবেশ শুরু হলো। চিন্তা চেতনায় আর স্বচ্ছতা রইলোনা। মোল্লাদের পেশার মধ্যে কাজীগিরির পেশা একটি নিকৃষ্টতম কাজ। আমার বিচারে আলেমদের মধ্যে এরা সবচেয়ে ঘৃণিত পেশার লোক। আমার জানামতে এদের পরিবারে বিকৃত চরিত্রের মানুষের জন্ম হয়। আমার মতে এর কারণ হলো যে, এরা পয়সার লোভে মানব জন্মের সবচেয়ে স্পর্শকাতর পর্যায়ে অবৈধতার সম্প্রসারণ ঘটায়। একাজটি যদি অবৈতনিক সমাজ সেবামূলক হতো, তা হলে এতে প্রভূত কল্যাণ হতে পারতো।

সমাজবিজ্ঞানে এর ভালোমন্দ প্রভাবের প্রতি সাধারণ ইংগীত করে বুঝাতে বলছি যে অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি দ্বীনি পরিবারে এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিকৃতি দেখা দেয়। পরিবারটি আর ইসলামীও রইলোনা, পুরো ফিরিঙ্গীও হলো না। হারাম খাদ্যের প্রভাবে নির্লোভ পরিবারে পার্থিব অর্থ লোভ এসে যায়। পূর্বপুরুষের ফকীরী টানে এক দিকে, দুনইয়ার লোভ টানতে লাগলো বিপরীত দিকে। খাদ্যের বিকৃতি রুচির বিকৃতি আনে, রুচির বিকৃতি চারিত্রিক বিকৃতি আনে, চারিত্রিক বিকৃতি শিক্ষার বিকৃতি আনে এবং শিক্ষার বিকৃতি মস্তিষ্কের বিকৃতির জন্ম দেয়। মস্তিষ্কের বিকৃতির মানুষ পাগল এবং পাগলের নেতৃত্বে সমাজকে পাগলের জাতে রূপান্তরিত করে।

এজন্য ইসলামে হালালের প্রতি এতো গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যারা হালাল খাবে, তারা কখনো লোভী হতে পারেনা। নির্লোভ মানুষ সর্বদা আল্লাহর বান্দা ও গোলাম থাকতে চায়। পুরো হারাম খেলে মানুষ রাজা-মাহারাজা হতে চায়। আধাহালাল ও আধা হারাম খেলে দো-টানা হয়ে নামের অর্ধেক হয় গোলামের, আর অর্ধেক হয় রাজার। ফলে একই ব্যক্তির মধ্যে গোলাম ও শাহেনশাগিরির পাগলামী দ্বন্দ্ব আরম্ভ করে দেয়। লোকটি কখনো ভালো, কখনো পাগল হয়। পরকালের কল্যাণ যারা চায়, তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পার্থিব লোভকে পরিহার করে চলে। কোনো অবস্থাতেই পার্থিব স্বার্থ তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়না। কারণ ঈমান তাদের শিক্ষা দেয় যে পার্থিব সম্পদ পরকালের প্রাপ্তির তুলনায় তুচ্ছ।

কিন্তু বকধার্মিক উপরে ধার্মিকতা দেখায় এবং সম্পদ জমা করে। এভাবে সম্পদ আহরণ ও জমা করাই তাদের ঈমানহীনতার প্রমাণ। কোনো নামের মাধ্যমে তার পিতা-মাতা ও দাদা-দাদীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন একটি ব্যক্তির নাম আবদুল্লাহ হলে মনে করতে হবে যে তার পিতা-মাতা ও অভিভাবক আল্লাহ্র রাজত্ব ও বান্দার দাসত্বে বিশ্বাসী। ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ হলেও বুঝতে হবে যে, এদের অভিভাবক রিসালাতের অনুসারী ঈমানদার। কিন্তু যখন দেখা যাবে যে, কোনো পরিবারের লোকদের নাম, নমরুদ, ফিরআউন,

ক্বায়সার, খস্রু, মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ, মামুন, জাহাঙ্গীর ও সিরাজুদ্দৌলা প্রভৃতি, তখন পরিবারটি প্রচলিত মুসলমান হলেও এদের মজ্জায় আনুগত্যের চেয়েও কর্তৃত্বের নেশা প্রবল প্রমাণিত হবে।

যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার কাছে ধরা পড়েছে যে মওদূদী সাহেবের ছেলেদের সবার নামে ফারুক অবিচ্ছেদ্য। মাওলানা আব্দুর রহীমের ছেলেদের নামের সাথে সবার মুস্তাফা কমোন। অধ্যাপক গোলাম আযমের ছেলেদের নাম আমীন, মামুন, আমান ও নোমান আব্দুল্লাহর সাথে যৌগিক। আমাদের নামে নবী রাসূলদের নামের প্রাধান্য। এতে বুঝা যায় যে মওদূদী সাহেবের অন্তরে উমর ইবন আল খাত্তাবের ফারুক গুণের প্রাধান্য ছিলো, আব্দুর রহীম সাহেবের হৃদয়ে আল্লাহর বাছাইয়ের সিফাতের অনুভূতি প্রবল ছিলো এবং আমাদের অভিভাবকের মানসপটে রিসালাতের প্রাধান্য সক্রিয় ছিলো। রাসূল সঃ সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোনো ব্যক্তির নাম অশোভন হলে তা বদলিয়ে শোভনীয় নাম রেখে দিতেন। তাঁর কাছে প্রিয় নাম ছিলো, "উবেদা ও হুমেদা" নির্দেশক। অর্থাৎ যাতে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও প্রশংসা বুঝায়। যেমন আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ্‌, মুহাম্মাদ ও আহমাদ প্রভৃতি। "বিন্দু থেকে সিন্দুর" মতো ক্ষুদ্র নির্দেশক দিয়ে মূল আবিস্কার করার শিক্ষা কোরআনের। তাই মুমিনের বিচার ও বাছনী শক্তি আল্লাহর পর অদ্বিতীয়। সে গুণ গৌণ হওয়ায় আজ মুসলিম, ইসলাম ও ইসলামী নেতৃত্বের এতো নিম্নমান।

আল্লাহর এক নিরক্ষর মরু রাখালকে শুধু মাত্র ক্বোরআন শিক্ষা দিয়ে মানব ইতিহাসের সেরা শিক্ষিত ও সকল শিক্ষকের শিক্ষক বানিয়েছেন। আমাদের দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ক্বোরআন, শিক্ষার মূলে নেই বলে এদেশ দরিদ্রতম বর্বরজাতি। জাতির পিতাকেও মেরে ফেলেছে। স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতা অর্জনকারী যোদ্ধাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষিত সেনাবাহিনী মেরে ফেলেছে। তার পর নিহত পিতার মেয়ে ও নিহত স্বামীর বিধবা স্ত্রী দিয়ে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার ক্ষমতা দখল ও উচ্ছেদের খেলা ও লুট-পাট জাতির নিয়তি! এ ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাচ্যুতির "বিয়ে-তালাকের" কাজী সাহেব ইসলামী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম। তার আবিস্কৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার "ক্ষমতা তালাক ও ক্ষমতা পুনঃবিবাহের" কাজীগিরির অভিনব তামাশা। এর উর্ধ্বে উঠার সকল সম্ভাবনা তার দল ও আন্দোলনের নেই। পালাক্রমে দু'নেত্রীর আশ্রয়ে জীবন, আশ্রয়ে মরণ। তারপরও সে ইসলামী নেতা তার আন্দোলন ইসলাম?! আম্মার ও ইবন মাসউদরা যখন দেখলো যে ভোগবাদী ওসমানের ছত্রছায়ায় আবু সুফইয়ান ও হিন্দাদের যুগ ফিরে আসছে, তখন প্রাণ দিয়ে ঈমান নিয়ে বিদায় নিয়েছে। খবিসদের সাথে রয় নি।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখে পরে সে রাজতন্ত্রের পুরস্কার প্রাপ্ত ও রাজতন্ত্রের আরবদের অর্থানুকূল্যে দলীয় প্রতিষ্ঠার গুরু-শিষ্যের পথও একই হলো। সব কাজেই তারা অভিন্ন। গুরু ইসলাম বাদ দিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে ফাতেমা জিন্নাহর মতো এক অপ্রকৃতস্থ মহিলার নেতৃত্ব ক্বুবুল করার ফলে আল্লাহ্‌ তার শাগরিদদের কপালে দু'নেত্রীর "কবুল" লিখে দিয়েছেন। বাংলাদেশের কাজী গোলাম আযমের কপালে হাসিনা, খালেদা এবং পাকিস্তানের কাজী হোসাইন আহমদের কপালেও কুলসুম নওয়াজ শরীফ ও বেনজীর ভুট্টো "ক্বুবুল" লিখে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র আযাবের এ ফিতনা থেকে নাজাতের পথ বের করার জন্য আমাকে এতো সূক্ষ্মভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করতে হচ্ছে। মওদূদী সাহেব জিন্নাহর জাতীয়তাবাদী মূর্তিকে সিজদা করার ফলে জিন্নাহর বোনকেও তার নেত্রী মানতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে জন্ম নেয়া বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের সৈনিক গোলাম আযমকে ভাষার জন্ম জাতির পিতা ও জাতির সৈনিককে সিজদা করে তাদের পর তাদের কন্যা ও স্ত্রীকে নেত্রী ক্বুবুল করে অস্তিত্ব রক্ষার্থে "মাশরিক ও মাগরিবে" ক্বেবলা বদল করতে হচ্ছে।

এতো সূক্ষ্ম বিচার কার? যার চোখে বান্দার কোনো চালাকী এড়ায়না? সে বিচারক আল্লাহ্‌ لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ সকল চোখ মিলেও তাঁকে অবধারণ করতে সক্ষম হয়না, তিনি একাই সকল চোখের খবর রাখেন, তিনি সূক্ষ্মতম পরিজ্ঞাত। (সূরা আনআম-১০৩) ভাষা সৈনিক, আবার জাতীয়তাবাদী ও তারপরও ইসলামী নেতা। প্রফেসর! সাবধান! আল্লাহর ফাঁসের রশি সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তড়িৎ তওবা, তা না হলে সর্বনাশ।

একথা ভাবতে কেমন তাজ্জব লাগে যে মওদূদী, মাওলানা আব্দুর রহীম ও গোলাম আযমরা এতোগুলো সন্তান জন্মদিলো, কিন্তু আল্লাহর দ্বীন শিখে তার প্রতি সঠিক দাওয়াত দেয়ার জন্য ক্বোরআনের ভাষায় ক্বোরআন শিখার জন্য

তাদের কারো একটি ছেলেকেও আলেম বানায়নি। এদের কি মূলেই আল্লাহর কালামের উপর ঈমান ছিলোনা, যে কোরআনের ভাষায় ক্বোরআন বুঝে অন্যকে তা বুঝানো ফরজ? সে ঈমান যদি থাকতো, তা হলে তো প্রত্যেকেই সবার আগে তাদের সকল ছেলে-মেয়েদের আলেম-আলিমা বানিয়ে দ্বীনের শিক্ষক-শিক্ষিকা বানাতো? সে কাজটিতো একজনও করেনি? অথচ ক্বোরআনে আল্লাহ প্রত্যেক ঈমানদারদের বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেনো প্রথমে তাদের ও তাদের পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (সূরা তাহরীম-৬)

এদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেনো এরা ইসলামী পড়া লেখা করে মহাভুল করেছিলো। তাই বাপদাদার ইসলামী বিদ্যায় কিছু ইসলামী কথাবার্তা বলে এবং সে মতো কিছু সাহিত্য সৃষ্টিকরে তা প্রচারের মাধ্যমে লোক জড়ো করে কিছু অর্থ উপার্জন করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করে তওবা করেছে যে, তাদের বংশে আর কোনো মোল্লা বানাবেনা। যেমন গোলাম আযমের বাপদাদা কাজীগিরি করে পয়সার মুখ দেখে তাদের ছেলেদের একজনকেও আর মাদ্রাসায় পড়িয়ে আলেম বানায়নি। কারণ তারা দেখেছিলো যে মোল্লাদের বিয়ে পড়ালে নির্ধারিত ফীর উর্ধ্বে উপরি পাওয়া যায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে মূল ফী পেতেও কষ্ট হয়। তাই ছেলেদের প্রফেসর, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। তারপর ধর্মীয় জলসা ও তাফসীর মাহফিল করার জন্য পয়সার জোরে মাওলানা সাঈদী, কামালউদ্দিন জাফরী ও আবুল কালাম আযাদের মতো কিছু মোল্লা রিজার্ভ করে কাজ চালানোর বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

ঈমান ও ইসলাম কারো ভিতরে প্রবেশ করলে তো সারা দুনইয়ার চেয়ে বেশি গর্বের বস্তু হয় তার নিকট দ্বীনি ইলম! প্রত্যক্ষ ক্বোরআন শিক্ষার চেয়েও কি কোনো ইল্‌ম গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে? কখনো নয়। ইসলাম বনী আদমের সাম্যতা শিক্ষা দেয়। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে ইমামত দান করে। দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষার চেয়ে কেউ যদি অন্য শিক্ষাকে সম্মানজনক মনে করে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন বলে রাসূল সঃ বলেছেন। দ্বীনি ইলম বর্জিত শিক্ষিত লোকদের ক্যাডার তৈরি করে গদী দখলের রাজনীতির ফল একাত্তরের পরাজয় এবং বর্তমান শোচনীয় পরিণতির কারণও তা বললে কি তাকে ভুল মূল্যায়ন বলা যাবে? মূল ক্বোরআন ধরে রাসূল সঃ এর আদর্শ অনুসরণ না করলে ইসলামী আদ্‌ল বা ন্যায় নীতি মজ্জায় ঢুকেনা। যেমন ক্বোরেশীদের মধ্যে প্রবেশ করেনি। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দিয়েছিলেন, মুস্তাদআফদের পক্ষে তিনি স্বয়ং মুস্তাদআফ্ হওয়ার ফলে। তায়েফের সে দোয়াই রাসূল সাঃ এর মেরাজের দুয়ার খোলে। আবু বকর ও উমরদের সে দুয়ার খুলে ছিলোনা। তাই রাসূলের ফাতহুম মুবীনের পর তাদের দ্বারা পরাজয়ের গোত্রবাদী রাজনীতি আরম্ভ হয়। রাসূল সঃ এর তোলা ঢেউয়ে আবু বকর ও উমর পার পেয়ে যায়। আবু বকর ও উমরের ভুলের ফলে ওসমান ও আলীর যে হৃদয় বিদারক পরিণতি হয়, তাকে চাপা দেয়ার জন্য বাজারে শুধু আবু বকর ও উমরের যুগের স্তুতিপূর্ণ বই দেখা যায়। ওসমান ও আলীর উপর কোনো বস্তুনিষ্ঠ বই নেই বললে চলে। আল্লাহ আমার কাছে মিশরের তথ্যনির্ভর নন্দিত লেখক আব্দুল করীম আল খতীবের আলী সম্পর্কে রচিত একখানি কিতাব তুলে দিয়েছেন। কিতাব খানা এতো তথ্য বহুল ও সাজানো যে, তার তুল্য কোনো বই এ বিষয়ের উপর আমার নজরে পড়েনি। বইটি যদিও আলীকে তার যথাযথ মর্যাদায় বসানোর চমৎকার নিরপেক্ষ উপস্থাপন, তবুও তা মনোযোগ সহকারে আদ্যপান্ত পড়লে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর উসামার নেতৃত্বকে বহাল না রেখে সত্যি সত্যিই আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীরা আত্মহত্যা করেছে। পাঁচশ পৃষ্টার এ কিতাবখানা বাংলা ও উর্দূতে অনুবাদ হয়ে বাজারে আত্মপ্রকাশ করলে উপমহাদেশের জনসাধারণের মধ্যে যারা না জেনে সুন্নী ও শিয়া হয়ে আছে, তারা মুসলিম হয়ে সরল পথ পেতো।

সঠিক ইসলাম না বুঝলে ক্বোরআনে মুস্তাকবির ও মুস্তাদআফের ন্যায়-নীতির ধারণা জন্মে না। তা না জন্মালে বিশ্বজনীন ইসলামী ঐক্যের ধারণা স্পষ্ট হয় না। বিশ্বে শতকরা ৮০ ভাগ জনগণ মুস্তাদআফ। মাত্র বিশ ভাগ মুস্তাকবির। বিশ্বের প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলো সব মুস্তাকবিরদের পক্ষে ও মুস্তাদআফদের বিপক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে। একমাত্র আখেরী নবী সঃ এর দ্বারা পূর্ণরূপ দেয়া জীবন বিধান ইসলামের উপযোগীতা রয়েছে, বিশ্বের আশি ভাগ নির্যাতিত জনগণকে উদ্বেলিত করে গোটা বিশ্বে নূহের তুফান তোলার। ইসলামের উপর থেকে অন্যায় ভাবে লাগানো তিনটি ষ্টিকার তুলে ফেললেই বিশ্ব মুক্তির আসমানী ইশতিহার রাহুমুক্ত হয়ে যায়। প্রথমটি হলো "আল আইম্মাতু মিন

ক্বোরেশ” ভিত্তিক খেলাফতে রাশেদার ঘোড়ার ডিম, দ্বিতীয়টি হলো প্রথম মিথ্যাকে প্রলম্বিত করার জন্য পর পর বারোজন সুন্নী খলিফার মিথ্যা হাদীস এবং তৃতীয়টি হলো বারোজন খলিফার স্থলে বারোজন ইমাম হওয়ার শিয়া গাজার চুরুট। অর্থাৎ তিন মিথ্যার ত্রিশূলে বিদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্কে ত্রিশূল মুক্ত করতে হবে।
হাসানাল বান্না ও মাওলানা মওদূদীরা “খেলাফত আলা মানহাজিন্ নবুওয়াহর” প্রবক্তা ছিলোনা। তার অর্থ ক্বোরেশী এক পরিবারের বৈষম্যমূলক সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা ছিলো তারা! ফলে তাদের প্রচলিত ইসলামই তাদের নেতৃত্বের বিরোধী আদর্শ ছিলো। যেমন আবু বকর ও উমরের উচ্চারিত “আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ” তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আত্মস্বীকৃতি ছিলো। কারণ, আবু বকর ও উমর কখনো ক্বোরেশের নেতা ছিলোনা। এদের বাপ দাদারাও ছিলোনা। নেতা ছিলো মুয়াবিয়া, আবু সুফইয়ান ও তাদের বাপ দাদারা। তাই আবু বকর ও উমরের কথায়ই তাদের পর নেতৃত্ব আবু সুফইয়ান ও হিন্দার পুত্র ও পোতা মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের হাত হয়ে মূল উমাইয়াদের হাতে চলে গিয়েছে এবং আবু বকর ও উমরের পুত্ররা ওদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। ঠিক তদরূপ হাসানুল বান্না ও মওদূদীদের ভ্রান্ত মুসলিম জাগরণ সৃষ্টিতে মিশরে বাদশা ফারুক উৎখাত হয়ে এবং উপমহাদেশে পাকিস্তান হয়ে পুনঃ নব্য মুস্তাকবিরদের হাতে ক্ষমতা চলে যায় এবং হাসানুল বান্না ও মওদূদীরা জেল-যুলম ভুগে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পর তাদের সন্তান ও ভ্রান্ত আদর্শের নেতা, পাতিনেতারা মা মরা বাছুরের মতো দুধওয়ালী গাভীর পেছনে পেছনে দৌড়ে লাথি গুতা খাচ্ছে।
ইসলামী রাজনৈতিক সাহিত্যিক মাওলানা মওদূদীর মন মগজে যদি ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর মুস্তাদআফ ডায়মেনশন বা দিকদর্শন ঢুকতো, তা হলে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শতকরা নব্বইজনকেই তার আন্দোলনের সৈনিক রূপে পেতো। খালি ঈমানের উপর দৃঢ় হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক হিন্দুস্থান থেকে আগত মুঘলাই মুহাজির ও পাঞ্জাবী বৈষম্যবাদী শোষক ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্যের শিকার জনগণের পক্ষে সত্যকথা বললেই হতো। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদীর সাইয়েদী (?) মগজে বৈষম্য বিরোধী ইসলামী আদল বা ন্যায় বিচার ঢুকেনি। কিরূপে ঢুকবে, সে যে সাইয়েদ! তাই তার মনে ছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বৈষম্য দূরীকরণের দাবী ছিলো মূলতঃ ভারতের পাকিস্তান বিরোধী প্রপাগান্ডার ফল। কারণ, বাঙ্গালীরা হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার ফলে, তারা এখনো খাঁটি মুসলিম হয়ে যায়নি। তাই তাদের পূর্ব পুরুষ সীমান্তপাড়ের দাদাবাবুদের প্রভাব আজো তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
এখানে একটি ঘটনা বললেই ব্যাপারটি একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে। সম্মিলিত পাকিস্তানের শেষের দিকে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন কালে আমি সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রাদেশিক জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম। তখন আওয়ামী লীগের আব্দুস সালাম খান সভাপতি ছিলো। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিও আব্দুস সালাম খান ছিলো। তখন শেখ মুজিব ছিলো সাধারণ সম্পাদক। পরে ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে আব্দুস সালাম খান শেখ মুজিবের সাথে দ্বিমত হয়ে পৃথক হয়ে যায়। তারপরই আগরতলা ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে, ও শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়ে তার উপর দেশদ্রোহীতার মামলা শুরু হয়। আব্দুস সালাম খান নামকরা উকিল ছিলো। আমার সাথে তার খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো। আব্দুস সালাম খান শেখ মুজিবের পক্ষের প্রধান কৌশলী হয়। অটুট পাকিস্তানের সমর্থণ হওয়া সত্ত্বেও আব্দুস সালাম খান শেখ মুজিবের পক্ষ অবলম্বন করে। তার কারণও খান আমাকে বলেছে যে, শেখ মুজিব তার আত্মীয়, আজীবন রাজনৈতিক সঙ্গী ও মামলাটি রাষ্ট্রদ্রোহীতার, তাই সকল রাজনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও তাকে প্রধান ডিফেন্স লইয়ার হতে হয়েছে। মামলা চলাকালীন একদিন আমাকে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে আগরতলা মামলার সত্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত ইভিডেন্স বর্ণনা করলো। আমি শুনে যাচ্ছি তার কথা। আব্দুল সালাম খান রাতের বেলা চেম্বার ছেড়ে তার বাড়ীর দোতালায় এক গোপন রূমে দরজা জানালা বন্ধ করে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলার গোপন তথ্য বলছিলো। কারণ তখনো ঐ মামলার তথ্যাদি এতো টপ সিক্রেট ছিলো যে তা নিয়ে কেউ মুখ খুলতে ভয় পেতো। কারণ তা ফাঁসির যোগ্য রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা। আমি তার মূল বক্তব্য শুনতে চাইলাম, যেজন্য ড্রাইভার ছাড়া নিজে গাড়ী চালিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে আমাকে গুলশানে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলো। উত্তরে খান সাহেব বললো যে সব রাজনৈতিক পার্থক্য ত্যাগ করে দেশ প্রেমিকরা একত্র না হলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। সব শুনে আমি শান্ত ভাবে আব্দুস সালাম খানকে বললাম যে পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ভারতের সাথে মিলে গেলে তার অসুবিধা কোথায়? সে তো কোনো সাত্বিক মুসলিম নয়! বরং আধা হিন্দু! উত্তরে সে বললো যে সে আমার মানদন্ডে

মুসলমান না হলেও ভিতরে কট্টর মুসলিম। হিন্দুদের সাথে কোনো অবস্থাতেই সমঝোতা হতে পারে না। কারণ, স্বরূপ সে তার ব্যক্তিজীবনের একটি ঘটনা বললো যে সে ফরিদপুরের প্রথম মুসলিম ছাত্র, যে এ্যান্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়েছিলো। সে কৃতিত্বে তাকে ফরীদপুর শহরবাসী একটি র‍্যালে বাই সাইকেল পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলো। তখনকার দিনে সে পুরস্কারটি বর্তমানে একটি দামীগাড়ি পুরস্কারের তুল্য ছিলো।

সে সাইকেল চড়ে উঠতি যৌবনে ভালো জামা-কাপড় পরে শহরে যখন বের হতো, তখন নাকি শহরের মানুষরা তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। এরূপ প্রমোদ ভ্রমণে একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা বশতঃ একটি ব্রাহ্মণের মেয়ের সাথে তার সাইকেলের হ্যান্ডেল লেগে গেলে মেয়েটির পানির কলসি ভেঙ্গে যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাকি শহরে প্রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। আব্দুল সালাম খান তার অভিভাকবৃন্দ ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলে ক্ষমা চেয়েও নাকি সেবার ক্ষমা পায়নি। মেয়েটিকে গঙ্গাস্নানে পাঠিয়ে পবিত্র করে ওখানেই কোলকাতায় তাকে পাত্রস্থ করেছে। তাই হিন্দুদের সাথে কোনো প্রকারেই সহ অবস্থান অকল্পনীয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তাকে এমনভাবে বিচলিত করেছে যে সে যেনো তার ছোট্টবেলায় ঘটে যাওয়ার দৃশ্য তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। তাই সে ভাবছে যে তার সমমনা আওয়ামী লীগের সঙ্গীদের নিয়ে জামাতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে হলেও পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করতে হবে। কারণ, মুসিলম লীগের সে সাংগঠনিক শক্তি নেই যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে পুনঃ সুদৃঢ় করতে পারে। জামাতে ইসলামের আদর্শিক বন্ধন ও সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে গেলেই পাকিস্তানকে টিকানো যাবে।

তার কথা শুনে আমি বললাম যে পাকিস্তানের শাসন, সেনা বাহিনীর চাকুরী, সরকারী চাকুরী ও আন্তঃ প্রদেশীয় উন্নয়নে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলে ভারত পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য আগরতলা দিয়ে হাত বাড়িয়েছে। এ ন্যায্য পাওনা না দিলে ভারত, পাকিস্তান অটুট রাখতে সাহায্য করলেও অটুট থাকবেনা। মওদূদী ও তার জামাত ডিসপ্যারেটী হয়েছে এবং হচ্ছে এ সত্য স্বীকার করেনা। আর এ অভিমত সম্পর্কে আমার সরাসরি জানা ছিলো। আমি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে বিভিন্ন সভায় বৈষম্য দূর করার উপর দ্ব্যর্থহীন জোর দিয়ে বক্তব্য রাখার পর তখনকার জামাতে ইসলামীর পার্লামেন্টারী কমিটির দু'সদস্য সিদ্দিকুল হাসান গিলানী ও গোলাম জিলানী তাদের তৈরী করা তথ্যের বস্তা নিয়ে আমার সাথে তর্কে বসে। আমাদের লোকেরা উর্দুতে বাত্চিত করা লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা কালে প্রায় দেখা যায় হীনমন্যতায় ভোগে। ঐ দু'পাঞ্জাবী ভেবেছিলো আমিও তাদের মতো হবো। কিন্তু শক্ত করে পাল্টা ওদের ধরলে তারা চুপ মেরে যায়। কিন্তু আমার লাভ হলো যে আমি জামাতীদের পেটের রোগ টের পেয়ে গেলাম। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি আব্দুস সালাম খানকে আরো চিন্তা ভাবনা করতে বলে চলে আসলাম। তারপরও প্রবীন, ধীরস্থির ও বুদ্ধিদীপ্ত লোকটি আমার সাথে তার দলের আরেক ব্যক্তি জুলমত আলী খানকে নিয়ে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলাপ করেছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আব্দুস সালাম খানের মতো একজন সিকিউলার আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাও পাকিস্তানের সংহতি ও অখন্ডতা নিয়ে কতোটুকু উদ্বিগ্ন হলে জামাতে ইসলামীতে যোগ দেয়ার মতো কথা ভাবতে পারে? তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় জিন্নার সাথে মিলে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শেখ মুজিবরা কী পরিস্থিতি হলে ভারতের সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ বানাতে হাত বাড়ায় তা ভাববার বিষয় নিশ্চয়।

এরপর এমন হলো যে মাওলানা মওদূদীর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসার প্রোগ্রাম হলো। আব্দুস সালাম খান পুনঃ প্রসঙ্গ তুলে আমাকে বললো যে চলো মওদূদীর সাথে বিশেষভাবে সাক্ষাত করে মত বিনিময় করা যাক। আমি পরামর্শ দিলাম যে প্রথমে বিশেষ সাক্ষাতে না গিয়ে তাদের কাউসার হাউজে সাধারণ শ্রোতারূপে আপনি আপনার আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ একমনা ব্যক্তিকে নিয়ে কিছু কিছু বিশেষ প্রশ্ন রাখুন। দেখুন কী উত্তর দেয়। মওদূদী ঢাকা আসলে ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত কাউসার হাউজে বিশেষ সভা হতো। তাতে নিয়মিত কার্ড ছেপে দাওয়াত দেয়া হতো। আমি অধ্যাপক গোলাম আযমকে বলে পাঁচ ছ'টি কার্ড সংগ্রহ করে আব্দুস সালাম খান, জুলমত আলী ও আরো কয়েকজন আব্দুস সালাম খান সমর্থক আওয়ামী লীগ নেতাসহ মওদূদীর বিশেষ সমাবেশে কাউসার হাউজে গেলাম। এখানে উল্লেখিত জুলমত আলী বাংলাদেশ হওয়ার পর বিএনপিতে যোগ দিয়ে দলের যুগ্ম মহা সম্পাদক ও রাষ্ট্রদূত হয়েছিলো।

কাউসার হাউজে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত বিশেষ সমাবেশের আয়োজন দেখে আব্দুস সালাম খান আমকে বললো যে, দেখো এরা কতো সুন্দরভাবে ওদের অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন ও পরিচালনা করে। ওদের কর্মীবাহিনী নিয়ে ওরা যদি ব্যাপক ভিত্তিক ন্যাশনাল দলে উন্নীত হয়, তা হলে জাতিকে এরা সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। অন্যান্য দলের কর্মীরা এদের মতো ডেডিকেটেড ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। ইসলামের ব্যাপারে এরা এদের কট্টরতা একটু শিথিল করলে অবশ্যই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র রাখার নেতৃত্ব দিতে পারবে। উত্তরে আমি বলেছিলাম যে এগুলো সবই ঠিক, কিন্তু আন্তপ্রাদেশিক বৈষম্য ও তা দূরীকরণের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ন্যায়নীতি ও তার সুস্পষ্ট নীতিমালার ঘোষণা না থাকলে এ সমস্ত সাজানো গুছানো ছিমছাম অনুষ্ঠানের কোনো মূল্য নেই আমার নিকট। মওদূদীর বক্তৃতাপর্ব শেষ হলে যে এদের প্রশ্নোত্তর হয়, তাতে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করে তার উত্তর শুনুন, তারপর পরে বাকি আলোচনা করবো।

প্রশ্নগুলো পূর্বেই আমার কথানুযায়ী আব্দুস সালাম খানের ভাষায় লিখে রাখা হলো। পর্ব শুরু হতেই সংগঠকদের হাতে দিয়ে তা মঞ্চে দিলে তখনকার ঢাকা মহানগর জামাতের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার বাংলায় পড়ে শোনালে মহানগরী জামাতের উর্দুভাষী আমীর খুররম জাহ মুরাদ তা উর্দুতে অনুবাদ করে দিলে মাওলানা মওদূদী তার উত্তর দেয়।

পন্ডিত ব্যক্তি মাওলানা মওদূদী খুব গুছিয়ে বক্তব্য রাখতো। এবারও তার সাধারণ বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভাবগম্ভীর উপস্থাপনায় শ্রোতারা বিমোহিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে তার মাঝামাঝি আব্দুস সালাম খানদের প্রশ্নপাঠ ও তার উত্তরের সিরিয়াল আসে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাঝে চিন্তার পার্থক্য ও তার কারণ বলতে গিয়ে মওদূদী যখন পূর্ব পাকিস্তানীদের হিন্দু অরিজিনের প্রভাব বলা আরম্ভ করলো তখন তা শুনে খান উষ্কখুষ্ক আরম্ভ করে দিলো। তখন আমি মওদূদীর বক্তব্যের চেয়েও বেশি আব্দুস সালাম খানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। এরপর উভয় প্রদেশের উন্নয়নে তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন বেশি হওয়ার কারণ মওদূদী কেন্দ্রের অর্থ ও উন্নয়ন বন্টনের বৈষম্যকে প্রায় অস্বীকার করে বলে যে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় আসা ইউপি, সি পির শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও সম্পদশালী লোকেরা বেশী সংখ্যায় আবাদ হওয়ার ফলে সেখানে কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য স্বাভাবিক ভাবেই বেশী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা পড়া লেখায় ও হিন্দুদের তুলনায় ব্যবসা বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ ছিলো বলে পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় আয়, উন্নয়নের খাতে ও ব্যয়ের খাতের বৈমাত্রেয় বরাদ্দবন্টনের বৈষম্যকে স্বীকারও নয় আবার অস্বীকারও নয় ধরনের গোঁজামিল দিয়ে মওদূদী আসল সমস্যা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। এতে আব্দুস সালাম খান ও আমার মধ্যে অর্থপূর্ণ মুখ চাওয়া-চাওয়ী ঘটে। আমি খুব তৃপ্তির সাথে প্রতি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম। কারণ জামাত ও মওদূদী সম্পর্কে আমার কঠিন বাস্তব মূল্যায়নে আব্দুস সালাম খান সন্দেহ প্রকাশ করেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই মাওলানা মওদূদীর এক মন্তব্যে সবকিছুর ফায়সালা হয়ে গেলো। তা হলো মওদূদীর ধারণা যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাঝে চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ, পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক সরকারের আধিপত্যবাদ ও তাদের কল্পিত (?) বৈষম্যাচরণের চেয়েও পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালীদের পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের তথা ভারতের প্রপাগান্ডাকে পাকিস্তানের জাতীয় সম্প্রচারের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করা। তার পেছনে পূর্বপাকিস্তানী লোকদের হিন্দু অরিজিন ও আচার আচরণ এবং হিন্দু সংস্কৃতির সাথে নাড়ির সম্পর্ক আবিস্কার করে তা মওদূদীর মুখ থেকে প্রকাশ করা মাত্রই আব্দুস সালাম খান হঠাৎ করে চেয়ার থেকে উঠে আমার হাত ধরে সভাস্থল ত্যাগ করে বলতে থাকে "চরম বাঁচালে আমায়, তোমার কথাই ঠিক। ধুহ্ ধুহ্ সবই মিথ্যা। আশার আর কোনো পথ রইলোনা। চলো যাই", এ বলে আমরা যে যার পথে চলে এলাম।

আল্লাহ্র বিশেষ দান ও তার শুকুর হিসাবে আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি জীবনের কোনো ক্ষেত্রে ভাসাভাসা চিন্তায় গ্রহণ ও বর্জন করিনা। প্রত্যেক বিষয়ে সম্ভাব্য মূলে প্রবেশ করে তারপর একাগ্র মনোনিবেশে যোগবিয়োগ করে গ্রহণ বর্জন করি। তা'না হলে মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারে জন্মিয়ে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বাপ হারিয়ে নদীভাঙ্গায় ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় বিধবা মা , যাকে তার বাপ-মা, চাচা ও মামু একদিনের খাওয়া দূরে থাক, এক দিনের জন্য খোঁজ নিতেও আসেনি, তিনটি ছোট ভাই ও একটি বোন নিয়ে পাড়ি দিয়ে, সমূদ্রের সিন্দাবাদী যাত্রায় কূল পেতাম না। ফলে জীবনের কোথাও আমার ফাঁক ও ফাঁকি নেই। আল হামদুলিল্লাহ।

তাই সমসাময়িক যুগের হাসানাল বান্না, মওদূদী, আবুল হাসান আলী নদভী, খোমেনী, মাওলানা আব্দুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযমের ব্যাপারে আমার মুল্যায়ন কোনো সাময়িক প্রভাবে দুষ্ট নয়। ধর্ম নিরপেক্ষ শেখ মুজিব ও ধর্মদ্রোহী সমাজবাদী বা নাস্তিকদের ব্যাপারে মতামতও পক্ষপাত দুষ্ট নয়। এ সব কিছুর মূলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাজ করে যে পৃথিবীতে আমি আমার স্রষ্টা ও আমার সব কিছুর মনিব আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তাই সর্বদা আমার স্মরণ থাকে যে পৃথিবীতে, কি দেখলাম, কি শুনলাম, কি বললাম, কি করলাম, কি ত্যাগ করলাম, কি উপার্জন করলাম, কিসে ব্যয় করলাম, কি খেলাম ও কি নিয়ে পরকালের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তার সব কিছুর হিসেব দিতে হবে মনিবের কাছে। তাই কারো নিন্দাবাদ ও জিন্দাবাদে আমার ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু একটি ফ্যক্টরই সর্বদা ক্রিয়াশীল, "যদি মনীব আমার প্রতি খুশী হন, আমার প্রতি হাসেন ও আমাকে যদি কবুল করেন, তা হলেই আমি ধন্য।" আমার আর কিছুর প্রতি খেয়াল নেই। আমার সকল মূল্যায়নে আল্লাহর নবী রাসূলগণ আদর্শ। একমাত্র ক্বোরআন আমার কষ্টিপাথর বই। তা দিয়ে ঘষে কথিত হাদীস ও সাহাবী তাবেঈ দেখি। টিক্‌লে থলিতে পুরি, না টিকলে ছুড়ে মেরে পরবর্তী প্রাপ্তির সন্ধানে ছফর করি। এ ফকীরের পায়ে বিরতি নেই। যে পর্যন্ত না সেপারে গিয়ে মনীবের দেখা পাই। এ বই সে বিশ্বাসে পড়তে হবে। তা না হলে লাভবান হওয়া যাবেনা।

মওদূদীরা বই লিখেছে। তা দেশে বিদেশে বিক্রয় করে বহু টাকা হয়। তা নিয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মামলা মুকাদ্দমা হয়। সে গুলোর পয়সা দিয়ে এদের উত্তরাধিকারীরা আল্লাহ্‌র দ্বীন বিরোধী জীবন যাপন করছে। এরা কি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য এগুলো লিখেছে? এরা নিজেদের সন্তানদের ইসলামী বানালোনা কেনো? তারা তদের অবাধ্য হলে নূহ ও লূতের মতো তাদের ত্যাগ করেনি কেনো? তার উত্তর খুঁজে বের করতেই হবে। মওদূদী, সাইয়েদ কুত্‌ব, মুহাম্মদ কুত্‌ব ও মাওলানা আব্দুর রহীমরা ইসলামী বই লিখে এগুলোর স্বত্বাধিকার রক্ষা করে মারাত্মক অপরাধ করেছে। তা করে তারা ইসলাম ও ঈমানের প্রচারক না হয়ে অন্যান্য ব্যবসায়ী সাহিত্যিক রচয়িতাদের মতো নিজেদের নিছক ইসলামী সাহিত্যিক রূপে প্রমাণ করেছে। এদের ক্ষমা নেই। কারণ সাধারণ ব্যবসায়ী লিখক সাহিত্যিকরা জীবিকা ও ব্যবসার জন্য বই লিখে ও প্রকাশ করে। তাই এটা তাদের ব্যবসা, ধর্ম নয়। ধর্ম দিয়ে ব্যবসা হারাম, ধর্ম ব্যবসা করা আল্লাহ্‌র আয়াত বিক্রি করা। এ করে যারা খায়, তারা আগুন খায়। আগুন জাহান্নামীদের খাদ্য।

আল্লাহর বিধান ঃ

রাসূল সঃ এর রিসালাতের কাজ সম্পন্ন হলে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সূরা তওবা নাযিল করে আল্লাহ্‌ মানব জাতির জন্য তাঁর চূড়ান্ত বিধান ঘোষণা করে দিয়েছেন। ক্বেয়ামত পর্যন্ত এর কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন চলবেনা। যারা করবে, তারা কাফের ও মুর্তাদ হয়ে যাবে। তিনি বলে দিয়েছেন, যে যারা তাঁর দ্বীনের সেবা করবে, তারা অন্যায় ভাবে মানুষের ধন ভোগ করতে পারবেনা। তা হলে তারা ধর্মের প্রচারক হবেনা। তারা হবে আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারী। ফলে তারা জাহান্নামী হবে। পাঠকরা আমার সাথে এসো, আমরা একত্রে সূরা তওবার এ সংক্রান্ত আয়াত দুটি অধ্যয়ন করি ও বুঝি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

"হে ঈমানদাররা সাবধান! অধিকাংশ ধর্ম প্রচারকরা অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ খায়, ফলে তারা আলাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে যে সমস্ত ধর্মসেবীরা আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ না করে তা পুঞ্জিভুত করে, তাদেরকে উপহাসসূচক কঠোর শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করো সে দিনের, যে দিন তাদের জমাকরা সম্পদকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতু রূপে জাহান্নামের আগুনে গলানো হবে। তারপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পাজর ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে। তাতে তারা আর্ত চিৎকার করলে বলা হবে "হুজুর! এ গুলো সে সম্পদ যা আপনারা ধর্মবিক্রি করে জমা করেছিলেন, আজ সে পুঞ্জিভুত সম্পদের আস্বাদন ভোগ করুন।" (সুরা তওবা - ৩৪-৩৫)

এ আয়াত দুটিতে আল্লাহর বিদ্রুপ করে এ সমস্ত হুজুরদের শাস্তির সংবাদকে "সুসংবাদ" বলে ঠাট্টা করেছেন। তাই

বুঝতে হবে যে এ কাজটি কতো অমার্জনীয় অপরাধ! এ পাপটি পূর্বে সর্ব প্রথম ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম সেবকরা শুরু করে। এদের আল্লাহ্ কোরআনে "আক্কালুনা লিস সুহত্" অর্থাৎ সর্বদা হারামখোর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর দ্বারা দ্বীনকে চূড়ান্ত করার পর তাঁর অনুসারী ঈমানদারদের সর্বকাল, সর্ব স্থান ও সর্ব পরিস্থিতির জন্য ঘোষণা করে দেন, তারা যেনো এ কাজটি না করে। কিন্তু রাসূল সঃ এর ইন্তিকালের পর ক্বোরেশী গোত্রবাদী ধর্মব্যবসা ও ধর্মের নামে সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হলে বাইতুল মাল দিয়ে পুনঃ বেকার, শ্রমবিমুখ ও অলস ধর্ম প্রচারক পালন আরম্ভ করা হয়। যেমনটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাশেম, আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালিবরা করতো। রাসূল সঃ এর পর এ কাজটি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুরু করে আলীর আমলে বাইতুল মালের সম্পদ আত্মসাত করে ইব্ন্ আববাস মককায় পালিয়ে এসে। মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ইবন আব্বাসকে আরো সম্পদ দিয়ে সে প্রথা চালু করে, যা আজো মুসলিম উম্মাহ্কে ঘুণের মতো খাচ্ছে।

এ ঘুণে খাওয়ার পাপের অবসানের জন্য আমি এখানে নামসহ আমাদের সম-সাময়িক কালের কিছু ঘুণের নাম নিবো। তার মধ্যে সংক্ষেপ করার জন্য আামি মাওলানা মওদূদী, মুহাম্মদ কুতব, মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, হাফেজ্জীহুজুর ও মাওলানা আযীজুল হকদের কিছু বর্ণনা দিবো। যাতে এদের মধ্যে জীবিতরা তওবা করতে পারে, মৃতদের সন্তানরা তা ত্যাগ করে তাদের মৃত পিতাদের শাস্তি কমাতে পারে, নতুন ধর্মসেবীরা শ্রম করে হালাল খেতে পারে এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ এ মহামারী মুক্ত হয়ে রুগ্ন মানবজাতিকে ক্বোরআনের চিকিৎসায় নিরাময় পথ প্রদর্শনে সমর্থ হয়।

সাইয়েদ মওদূদীর মতো লেখক ও প্রচলিত ইসলামের প্রখ্যাত ব্যক্তি তার লিখনীতে কোথাও কোথাও যায়দ ও উসামার ব্যাপারে "জবরদস্ত সাহাবী থে" বলেই তাদের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করতে দেখা যায়। কোথাও ক্বোরআনে মুস্তাকবির ও মুস্তাদআফ এবং রাসূল সঃ যায়দ, উসামাহ ও বারাকাহ সম্পর্কে যে বিশেষ মূল্যায়নে তাদের তুলে ধরেছিলেন, সে অর্থে ও গুরুত্বে যথাযথ মূল্যায়ণ করেছে, তার প্রমাণ নেই। মনে হয় যেনো, এ 'থীম' তাদের মনেও কখনো উদয় হয়নি। সাইয়েদ রূপে ক্বোরেশী গোত্র ও তার খেলাফতী ধ্যান ধারণাই আল্লাহর এ বান্দার মনমগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তাই মূল রিসালাতী ইসলামের সাম্য চিন্তার দিগন্তে অন্তরদৃষ্টি খুলে ছিলোনা বলে প্রমাণিত হয়, এবং সে জন্যই পাঞ্জাবী ও ভারতীয় মুহাজিরদের আঁতাতে বঞ্চিত পূর্বপাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায় বিচারের সঠিক চিন্তা মনে উদিত হয়নি। যদি হতো, তা হলে জামাতে ইসলামীর ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নতরো হতো। তাতে শুধু সার্থক পাকিস্তানই প্রতিষ্ঠিত হতোনা, একাত্তুরের পাকিস্তান না ভেঙ্গে তার পূর্বেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতই টুকরা টুকরা হয়ে বিশ্বে রাসূলের ইসলামের চূড়ান্ত সূর্য ভারতবর্ষ থেকে উদিত হতো এবং আরবরা মূল ইসলামে ফেরত এসে প্যালেষ্টাইন সমস্যার ইসলামী সমাধান হয়ে মুসলিম উম্মাহর হাতে রাশিয়া ও আমেরিকার সে গতি হতো, যা পুঁজিবাদী আমেরিকার সামনে রাশিয়ার হয়েছে। যেরূপ পূর্বে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের রাসূল সঃ এর তোলা ঢেউয়ে পতন হয়েছিলো।

রূহানী দৃষ্টির অভাবে সত্যের ইসলাম দৃষ্টিগোচরিত না হয়ে সাহিত্যের ইসলামে জীবন কাটিয়ে মওদূদীকে পশ্চিমা ইবলিসী গণতন্ত্রের অসার রাজনীতিতে আত্মহুতি দিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে। প্রচুর সাহিত্যকর্ম করে দল ও সন্তানদের কপি রাইটের অলস ও অকর্মক জীবন আজ তার স্মৃতি। সাহিত্যের মাধ্যমে পিপাসার্ত পৃথিবীতে পরিচয় সৃষ্টি করে এক চরম সংকীর্ণ স্বার্থপর বিকৃত শ্রেণী রেখে গিয়েছে, যারা তাদের হীন স্বার্থে ইসলামকে বাজারজাত করে আখের গুছাচ্ছে। মওদূদীর যে কটি ছেলের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, প্রত্যেকটিকে আমি হিউম্যান মেটিরিয়াল হিসেবে চমৎকার পেয়েছি। মাওলানা সাইয়েদ ব্যাধিমুক্ত হয়ে এই ছেলেগুলোকে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সালমান ও উসামাহদের ডায়মেনশানে মানুষ করে গেলে, তাফহীমুল ক্বোরআনসহ সকল বই রচনার চেয়ে স্বার্থক কাজ হতো, এবং তার জীবনও সফল হতো।

এটা চিরাচরিত সত্য যে প্রত্যেক সত্যের আন্দোলন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারীতের পক্ষে হয়। আন্দোলন ও আন্দোলনকারী সত্য কি মিথ্যা, ভুয়া কি খাটি, তখনই প্রমাণিত হয়, যখন আন্দোলনের নেতা ও তার সহচরদের যালেমদের এলাকা ত্যাগ করে মযলুমদের এলাকায় হিজরত করতে হয়। কারণ, মযলুম নেতার কখনো যালেমদের পাশাপাশি সহঅবস্থান হতে পারে না। কোনো নবী রাসূল তা পারেনি। পাকিস্তানের যালেমদের স্বর্গ পাঞ্জাব। মাওলানা মওদূদী ও তার কেন্দ্র চিরদিন সে পাঞ্জাবেই ছিলো এবং এখনো আছে। তাই মক্কার ক্বোরেশদের সাম্রাজ্যবাদী

ইসলামের মতোই মওদূদীর জামাতে ইসলামী পাঞ্জাবী ইসলাম রূপেই দুর্নাম নিয়ে বেঁচে থাকবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে। কখনো আল্লাহ্ ও রাসূলদের মুস্তাদআফদের আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতার মুখ দেখবেনা। তার পরিচয়ের আন্দোলন বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর কোথাও সফল হবেনা। কপিরাইটের সাহিত্য বিক্রি ও ধর্মের নামে জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে আহরণ ও ভোগ করে তার অনুসারীদের সূরা তাওবায় বর্ণিত জাহান্নামের ছ্যাক খেতে হবে।

হাসানাল বান্নার অনুসারী সাইয়েদ কুত্‌ব মিশরীয় নব্য ফিরআউন ও ফিরআউনীর বিরুদ্ধে কলমের যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করে বিদায় নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছে। তার ভাই মুহাম্মদ কুত্‌ব প্রাণে বেঁচে জেল থেকে মুক্ত হয়ে সৌদী আরব পৌছুলে তার কিছু দিন পরই মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাত হয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। প্রত্যেক সাক্ষাতেই দেখতাম সে বর্তমান বিশ্বে মানুষকে বিপথগামী করায় শয়তানের যৌন বিকৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রাখছে। কিন্তু তখনো বিয়ে শাদী করেনি। বহুদিন জেলের নির্যাতন ভোগ করে বের হয়ে এসেছে। আমি তাকে বিয়ে করার জোর পরামর্শ দিয়ে পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানালাম। আল্লাহর রহমতে সহসায়ই এক সিরিয়ান ইখওয়ানী বোনের সাথে তার বিয়ে হলো। বিয়ের পর বৎসরপূর্তির পরই একটি পুত্র সন্তান হলো। নাম রাখা হলো উসাইমা। উসামাহর তাসগীর অর্থাৎ জুনয়িার উসামাহ।

আমার মনে তো আল্লাহ্ যায়দ, বারাকাহ্ ও উসামাহর থীম দিয়েই রেখেছেন। তাই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মক্কায় আগত বিশ্বের প্রচলিত ইসলামী নেতাদের অহরহ পর্যবেক্ষণ করেছে। সৌদি টাকায় কিছুদিন যেতেই এদের দেহ ও পেটের বেলুন ফুলছে দেখেই আমি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিতাম। মুহাম্মদ কুত্‌বেরও সে অবস্থা দেখে আমি আরো সতর্ক হয়ে গেলাম। এ অবস্থায় আমি দেখলাম যে, আমাদের গোলাম আযমসহ বহু ইসলামী নেতা পালে পালে রাবেতা সহ বিভিন্ন সংগঠনের নামে সম্মেলনে আসছে, আর সৌদি রাজত্বের ছিটানো ধানখেয়ে জালে আটকাচ্ছে।

আমি বহু জনকে সাবধান করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ধান ও ধনের লোভ কাটিয়ে বাঁচার লোক পেলাম না বললেই চলে। তাই আমি বেশী বেশী হেরা গুহা ও সওর গুহায় যাতায়াত করতে লাগলাম ও রাসূল সঃ বারাকাহ্, মা খাদীজা, যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইব্‌ন মাসউদ, সুহাইব, সালমান ও উসামাহর তুলনায় আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী ও অন্যান্য ক্বোরেশীদের ঈমানী রং ঢং পরখ করায় মনোনিবেশ করলাম। কা'বার পাশের কুতুবখানাগুলো আমার নিত্য দিনের চারণক্ষেত্র হয়ে উঠলো। বইর পর বই কিনছি। অনেক আধুনিক বই কিনেছি যার নামকরা লিখকদেরও মক্কায় সাক্ষাত পেয়েছি। বই পড়ে তার দৃশ্য অর্থ ও অদৃশ্য অর্থের সাথে লেখকদের মিলিয়ে দেখতাম এবং অমিল বা সাংঘর্ষিক বিরোধিতা দেখে আমি অন্য দিগন্তে সূর্য দেখা আরম্ভ করলাম। দেখলাম যে এরা প্রকারান্তরে উমাইয়া আব্বাসী ইসলামের সাহিত্য রচয়িতা। তার বেষ্ট সেলার্স চিন্তা, প্রকাশনা ও তার পয়সা ও কপিরাইট নিয়েই এদের ইহকাল পরকাল ও জান্নাত ও জাহান্নাম। আমার ভেবে মনে হয় যে সাইয়েদ ক্বোতব মরে অমর হয়েছে এবং তারই ভাই মুহাম্মদ বেঁচে মরে গিয়েছে বা মরছে। জিলালুল ক্বোরআনের প্রথম খন্ডেই তাদের কপিরাইটের সাক্ষ্য বহন করে। এভাবে তাদের মৃতজীবিত এবং জীবিতমৃত দু'ভাইর সকল প্রকাশনার অর্থই ইসলাম ও জান্নাত! পরকালে তাদের জন্য সূরা তওবার ঘোষণা বাদি হয়ে দাঁড়াবে। তাদের লেখা পড়ে দেশে-বিদেশে যুবকরা অর্ধসত্যের ইসলাম পড়ে কোথাও সন্ত্রাসী হয়ে মারছে ও মরছে, কোথাও নিরাশ মুর্তাদ হচ্ছে, আবার কোথাও ইউরোপ আমেরিকায় গুরুদের পদাঙ্ক অনুসারে নিজেরাই দোকান সাজিয়ে মানুষের দ্বীন দুনইয়া উভয়ই লুটছে। যা দেখে পশ্চিমা বিশ্বের হতাশ লোকেরাও আল্লাহর অঙ্গীকারের মুস্তাদআফ মুক্তির কাফেলা দেখতে না পেয়ে নেশা ও ইন্টারনেটের অশ্লীলতার বলি হচ্ছে।

বাংলাদেশে সাজানো গুছানো আধুনিক ইসলামী জীবন জিজ্ঞাসার বই বলতে মাওলানা মওদূদীর রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালী মওদূদী মাওলানা আব্দুর রহীমের রচনাবলী বুঝায়। আন্যান্যদের লেখা বাজারে প্রচলিত ইসলামী বই বলতে পীরপূজা, কবরপূজা, ঝাড় ফুঁক ও খাব নামার গাঁজাখোরী বুঝায়। বাদ বাকি দু'চারখানা বস্তুনিষ্ঠ বই তাও দিক নির্দেশনাহীন। কিন্তু মাওলানা আব্দুর রহীমকেও মওদূদী রোগে স্বতীর্থ করে প্রায় ফটো কপির মতো দুনইয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে প্রায় একই সংখ্যক ছেলে মেয়ে রেখে আল্লাহ্ কপিরাইট খাইয়ে রোজ ক্বেয়ামতে সূরা তাওবার ৩৪-৩৫ আয়াতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ আল্লাহর বান্দারও আক্ষরিক পান্ডিত্য ছিলো। রূহানী রিয়াযাতের ভান্ডারের দুয়ারে টোকা দেয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আট ছেলে দু'মেয়ে জন্ম দিয়ে পরের মাংসসর্বস্ব মেয়েদের স্বামী ও তদরূপ পরের ছেলেদের বৌ বানিয়ে ক্বেয়ামতের দিন বাবা, দাদা ও নানার বিরুদ্ধে সাক্ষী জন্মানোর খামার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে।

মওদূদীর বইর অনুবাদ করেছে, নিজের স্থুল চিন্তায় যতোটুকু ইসলাম বুঝে এসেছে, তার উপর কলম চালিয়েছে। সে কলমের ফল তার উত্তরাধিকারীদের উপজীব্য। হায় হায়! যদি আত্মার চিন্তায় একবারও মৃত্যুর পর এখন যেখানে আছে, সে অবস্থান দেখতো! একটি বইও না লিখে যদি আট ঘন্টা ঘুমিয়ে, আটঘন্টা কোনো গতরখাটা শ্রম করে জীবিকা উপার্জন করে তা নিজে খেয়ে ও সন্তানদের খাইয়ে বাকি আট ঘন্টা ছেলে-মেয়েগুলোকে হাতে গুনে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইবন মাসউদ, খাব্বাব, সালমান ও উসামাহ এবং বারাকাহ্ ও সুমাইয়ার শিক্ষা দিয়ে শুধু ক্বোরআন হাতে তুলে দিতে সামর্থ হলেই মাওলানা আব্দুর রহীম ইহকাল ও পরকালের অফুরন্ত ভান্ডার স্বয়ং পেতো এবং জাতিকে কল্যাণের পথ প্রদর্শক দিয়ে যেতে পারতো। আটটি ছেলেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। দেখতে অমায়িক ভদ্র ও বাআদব ছেলে। আট ঘন্টা আটটি ছেলে নিয়ে মাওলানা আব্দুর রহীম চারটি ঠেলা গাড়ি বা ভ্যান গাড়ি চালিয়ে গেলেও বর্তমান অবস্থা থেকে ভালো অবস্থানে থাকতো। এ সোনার ছেলেগুলোকে মানুষ করণার্থে রোজ আট ঘন্টা নয়, সকালে দু'ঘন্টা ও বিকালে দু'ঘন্টা মোট চারঘন্টা করে ক্বোরআন ইনজেক্ট করে গেলেই অন্তত এদের মধ্যে অর্ধেক পূর্ণ মানুষ অর্থাৎ চারটি যোগ্য সন্তান ও চারটি আধা যোগ্য হলেও তার জীবন সার্থক হতো। তা না করে অর্ধেক নিজের ও অর্ধেক মওদূদীর মতো চলতে গিয়ে দোটানায় কলম খোঁচাতে গিয়ে ছেলেগুলোকে "হংস মাঝে বক যথা" ও "বক মাঝে হংস যথা, না ঘরকা না ঘাটকা" বানিয়ে গিয়েছে। লিখতে গিয়ে বিতর্কিত নিষ্প্রয়োজনীয় বই লিখেছে। রূহানী দিক আনাবিষ্কৃত থাকায় পোষাকে-আষাকে যেমন ত্বাকওয়া ছিলোনা, ইবাদাতে আমলেও তার ছাপ ছিলোনা। সময় মতো সালাত আদায়ের প্রকৃত টান গড়ে উঠে ছিলোনা। ফলে মক্কায় গিয়ে হারাম শরীফের গা ঘেষা হোটেলে অবস্থান করে ফজরের জামাত পাওয়া দূরে থাক, ফজর নামাজই দু'দিন কাজা হয়েছে। আমি কাবায় সালাত আদায় করে মাওলানাকে কাবায় না পেয়ে হোটেলে গিয়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে কাজা নামাজ পড়তে দেখেছি। আমার ভাগ্য বহুত খারাপ। আমার জীবনে স্বনিয়ন্ত্রিত গুছানো জীবন যাপন করে নিজের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানোর কাজ করতে হয়েছে এবং এখনো তাই হচ্ছে। এ বই তার সাক্ষ্য। স্যার খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন আমার বয়সের দ্বিগুণের চেয়ে বর্ষীয়ান। বেক্সিমকো খ্যাত সুহেল ও সালমানের বাবা ফজুলর রহমানও আমার বয়সের দ্বিগুণের বেশী বয়সী ছিলো। বাংলাদশের বামবুদ্ধিজীবী বদরউদ্দীন উমরের বাবা আবুল হাশেমের বয়সও তাই ছিলো। কিন্তু নিয়তি আমাকে এদেরও খবরদারী করার পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছিলো। মাওলানা আব্দুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম আমার রক্তমাংসের অস্তিত্বে বড়ো। কিন্তু তাক্ওয়ার বয়সহীন তাগীদ কখনো কখনো আমাকে বাধ্য করেছে বিভিন্ন সময় এদের খবরদারী করতেও।

এদের কারো সাথে আমার পার্থিব স্বার্থের সম্পর্ক মুখ্য ছিলোনা। প্রথম দু'জনের সাথে গৌণ ছিলো। বাকিদের সাথে তাও ছিলোনা। শুধু দ্বীনি দায়িত্ব ছিলো। যার ইতিবৃত্ত এখন অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে লিখছি। মাওলানা আব্দুল রহীম পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামের আমীর ছিলো। অধ্যাপক আযম ছিলো সাধারণ সম্পাদক। পরে মাওলানা আঃ রহীম মওদূদীর ডিপুটি হলে গোলাম আযম জামাতের আমীর হয়। রাজনৈতিক স্রোতাধারায় এদের সাথে আমার সাক্ষাত হলেও আমি যেহেতু নীরব আদি দ্বীন, দ্বীনুল ক্বাইয়েমায় অটল বিশ্বাসী, তাই রাজনৈতিক সহযাত্রায়ও আমার অন্তরে এদের সবার ভিন্নতরো মূল্যায়ন চলতে থাকে। তার ইংগিতই এ লাইন গুলোতে লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

মাওলানা আব্দুর রহীম সাহিত্যকর্মে বাঙ্গালী মওদুদী হলেও রাজনৈতিক যোগ-বিয়োগে কোথাও মওদুদীর সাথে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছিলো। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হলে সে মতপার্থক্য উভয়কে আরো দূরে নিয়ে যায়। মওদুদী একদিকে নৈরাশ্যে ভোগে, মাওলানা আব্দুর রহীম আরেক মেরুতে নৈরাশ্যের শিকার হয়। এর চরম মুহূর্তে আমি এদের পরিবর্তন খুব গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। মক্কায় বসে মুসলিম বিশ্বের স্নায়ুবিন্দুতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি মূল্যায়নের সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশের অবস্থা আমার কাছে বোধগম্য কারনেই প্রাধান্য পায়। তন্মধ্যে বাংলাদেশের নাটকীয় পরিবর্তন আরো গুরুত্ব পায়।

মাওলানা মওদুদী ও মাওলানা আব্দুর রহীমের তুলনায় অধ্যাপক গোলাম আযম কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলোনা, এখনো নয়। অধ্যাপক আযম কলেজে পড়া, ছাত্র আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, তাবলিগী জামাত ও জামাতী পাকিস্তানী রাজনীতির স্ববিরোধী কতোগুলো দুর্বোধ্য জটের ব্যক্তি। ইসলামী গভীরতা তার কাছে আশা করাই কোনো ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার সনদ। আল্লাহ্র এ বান্দাটি সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি ব্যাপারে শতকরা একশ ভাগ

সজাগ ও বুঝমান। তা হলো, যে কোনো মূল্যেই হোক ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় তাকে টিকে থাকতে হবেই! তাতে তার অভিধানে কোনো প্রকার এথিক্স্ বা আচরণ বিধির সীমাবদ্ধতা নেই। তার মধ্যে একটিই মাত্র যোগচিহ্ন আছে, তা হলো তার দাদার বাবা ও তার উর্ধ্বে কোথাও ভালো মানুষের একটি সূতা আছে, যেটা তার দাদার আমল থেকে কাটা। সে জন্য তাদের পরিবারে মস্তিস্ক বিকৃতি থেকে সকল বিকৃতি। সে কাটা সূত্র আবিষ্কার করে পুনঃ জোড়া লাগিয়ে দেয়া সম্ভব হলে এ লোকটির নসিব ভালো হলে হয়তো সঠিকপথ পাবে এবং তার বিভ্রান্তি থেকে জাতি ও দেশ মুক্তি পাবে। তা না হলে এ লোকটি বাংলাদেশের ইসলামী মুক্তির পথে হযরত মূসার কাফেলায় সামেরী সদৃশ। সে অবস্থায় তার চক্রান্ত ও চক্র থেকে বাংলাদেশের ইসলামী যুবশক্তির নাজাতের পথ দেখাতে হবে। এ ব্যাপারে যথাস্থানে অধ্যাপক আযম সম্পর্কে আরো আলোকপাত করা হবে। ইনশাআল্লাহ্।

আমার একটি দোষ ও দুর্বলতা রয়েছে। তা হলো কোথাও ইসলামের পোষাক দেখলে তার মধ্য থেকে খাঁটি লোকটিকে বের করার চেষ্টা করি। কারণ, যে লোকদের পোষাক নেই, তাদের সঠিক বুঝ দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পোষাক পরিয়ে দিলে কিছু দূর গিয়ে সে পরানো পোষাক খুলে ফেলে নিজের পোষাক পরবেই পরবে। তাই ইউনিফর্মহীন সৈনিক যেমন সৈনিক নয়, পোষাকহীন মানুষ কোনো মানুষ হয় না। তাই আল্লাহ্ একমাত্র বনী আদমকে আশরাফুল মাখলুকাত রূপে পোষাকে সাজিয়েছেন। বনী আদমের পোষাকে পূর্ণ লজ্জানিবারণ, দেখতে শোভন ও স্বভাবে কর্মে তাক্বওয়ার নিদর্শন থাকতেই হবে। অন্যথা সে শয়তানের ক্রিড়নক হবেই হবে। (দেখো সূরা আরাফের আয়াত-২৬-২৭) ইসলামে ড্রেসকোড্ বা পোষাকের বহু গুরুত্ব।

অধ্যাপক আযমদের পরিবার হারানো সূতার সব হারিয়েও পোষাকের অবশিষ্টাংশ হারায়নি। তাই এ ব্যক্তিটি ও তার পরিবারের প্রতি আমার সে একটি মাত্র দুর্বলতা আছে। সেজন্য আমি তাদের কল্যাণ চাই। তাদের হারানো সূতার মাথা পেলে আমি এ পরিবারের নাম পুনঃ বিয়ের কাজী ও কুফ্রী গনতন্ত্রের অধ্যাপক বাদ দিয়ে শেখ লাগাবো। যারা সঠিক অতীতকে অস্বীকার বা ত্যাগ করে নুতন অথচ বিকৃত পরিচয় ধারণ করে, তারা আল্লাহ্র দানের অমর্যাদাকারী রূপে আল্লাহ্র বিরাগভাজন হয়ে অভিশপ্ত হয়ে লাঞ্ছিত হতে থাকে, যে পর্যন্ত না পূর্বের সত্যে ফেরত এসে তওবা করে। বর্তমান মুসলিম নামধারী জাতি চাল-চলন ও পোষাকে, ঈমান ও ইসলাম ত্যাগী আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতি। প্রমাণ হলো, দৈনিক ন্যূনপক্ষে সতেরো বার ফরজ নামাজে সূরা ফাতিহায় “গাইরিল মাগ্দূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দুয়াল্লীন” বলে যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রত্যাখ্যান করে, ক্যাম্প ডেভিডে গিয়ে তাদের নবীর পৃথিবী থেকে মেরাজে যাওয়ার পূর্বে সকল নবীদের জামাতের স্থল, মাসজিদুল আক্বসা ফেরত পেতে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পায়ে পড়েও তা ফেরত পাচ্ছে না! সময় মতো করণীয় একটি মাত্র সিজদা করতে ব্যর্থ হলে অসময়ে এক লক্ষ সিজদা করেও হারানো মর্যাদা ফেরত পাওয়া যায়না। আবু বকর, উমর, ওসমান, ও আলীরা রাসূল সঃ এর ইমামকে মেনে আল্লাহ্কে সিজদা করতে ব্যর্থ হলে, পরে ধুঁকে ধুঁকে তাদের মরতে হয়েছে। তাদের সন্তানদের আল্লাহ্, রাসূল ও তাদের শত্রুদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। যে আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর শেষ রক্ষার সুযোগে আলীর হাতে বায়আত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলো, ফলে আল্লাহ্ আলীকেও উঠিয়ে নিয়ে গেলে, সে আব্দুল্লাহ নিজে নিজের কান ধরে উপযাজক হয়ে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের পায়ে পড়েও প্রাণ বাঁচাতে পারেনি! মুহাম্মাদী রিসালাত পূর্তির আসমানী প্রতীক উসামাহ বিন যায়দের ইমামত অগ্রাহ্য করার শাস্তি আজো আমাদের উপর চলছে। ইবন্ উমর, ইবন যুবায়র ও ইবন্ আব্বাসদের জন্য উসামাহর পেছনে জিহাদ ও সালাত কি মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের পেছনে জিহাদ ও সালাতের চেয়ে লক্ষগুণ শ্রেয় ছিলনা, যে উসামাহর অধীনে তাদের বাবারা সাধারণ সৈনিক ছিলো? এ মহা সত্যটি বুঝানোর জন্যই আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চেপে রাখা নাজাতের পথটি উম্মোচিত করেছি ও করছি।

ইসলাম সালাত ক্বায়েমের সমাজবিধান। সালাত ক্বায়েম হয় ইমামের পেছনে। ইমাম তাই সমাজের নেতা। সমাজের নেতা সমাজের উত্তমতম চরিত্রের যোগ্যতম ব্যক্তি হতে হবে। এ যোগ্যতার তুলাদন্ড হলো তাক্বওয়া। আল্লাহ্ ভীতি। আল্লাহ্ আমাকে সর্বদা দেখছেন। আমি তাঁর দাস। তিনি সন্তুষ্ট হলে আমি ধন্য। তিনি অসন্তুষ্ট হলে আমার সর্বনাশ! তাই আমার পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী সন্তান, গোষ্ঠি-জ্ঞাতি, পাড়া প্রতিবেশী, দেশবাসী এমন কি বিশ্ববাসীও আমার উপর অসন্তুষ্ট হলে, বা আমার উপর চাপ প্রয়োগ করলেও, আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ করবো না। এ চরিত্রের নাম তাক্বওয়া। এ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মুত্তাক্বী। ক্বোরআন এদের জন্ম, শৈশব, শিক্ষা, যৌবন, কর্ম, জীবন, মৃত্যু, জানাযা, দাফন, উত্থান ও পরকালের পথ প্রদর্শক কিতাব। হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন। তাই মুত্তাক্বীরা কোনো রাজনৈতিক

দলের বর্ণ ও গোত্রের, ভাষা ও সংস্কৃতির এবং সম্প্রদায়ের হতে পারেনা। হলেই আর সে মুত্তাক্বী থাকবেনা। বিশ্বজনীনতা হারিয়ে ফেলবে। বিশ্ব প্রতিপালক "রাব্বুল আলামীন" এর বান্দা ও রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলের অনুসারীকে অবশ্যই বিশ্বজনীন হতে হবে। ক্বোরেশী, ইয়াহুদী, আরবী, ইরানী, হিন্দি ও বাঙ্গালী হলে কি আর কোনো ব্যক্তি বিশ্বজনীন থাকে? থাকেনা। তারা কূপের ব্যাঙ। সমুদ্রে তাদের স্থান নেই।

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও তার দলের লোকেরা ঐ ভাষা আন্দোলনের কথিত সৈনিক। ঐ ভাষার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে যারা মানুষ হত্যা করেছে, সে ভাষা যদি ক্বোরেশদের আরবী, বাইবেলের ভাষা আরামিট ও তাওরাতের ভাষা হিব্রুও হয়, তা হলেও তারা মুত্তাক্বী দূরে থাক, মানুষই নয়। কারণ, তারা বিশ্বমানবতা মানেনা। তাদের আদি পিতা আদম মানেনা। আদমের স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনকে মানেনা। খন্ডিত আল্লাহ্, খন্ডিত আদম ও খন্ডিত মানবতায় বিশ্বাসী মুশরিক, বিবর্তনবাদী ডারউন ও গোত্রবাদী পশু বিশেষ এরা। এরা মুস্লিম উম্মাহর নেতা দূরের কথা, এরা নিজেরাই মুস্লিম মু'মিন নয়। সকল নবী-রাসূলরা গোত্রের লোকদের এক আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে ডেকেছেন, যে আল্লাহ্ কোনো গোত্রের বা সম্প্রদায়ের নন। তাই আল্লাহ্তে বিশ্বাসীরা অভিন্ন, অবিভক্ত ও এক জাতি। গোটা মানব জাতি তাদের যৌথ পরিবার। সকল পারিবারিক বিরোধ মিটিয়ে পরিবারকে এক ও এক রাখার চেষ্টারতরা মুসলিম। তাদের নেতা বিশ্বমানবতার ইমাম। তাদের ইমামের কেন্দ্র মক্কা। পৃথিবীতে মানব বসতি স্থাপনের পর আল্লাহ্ এ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"সারা বিশ্বের মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য মককায় এ বরকতময় ঘর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। যেমন ইব্রাহীমের অবস্থান, যেমন এখানে যে ঈমান নিয়ে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং হজ্জ পালনে যোগ্য প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ্র ঘরে হজ্জের জন্য আসা অবশ্য কর্তব্য। এ আদেশ পালনে যারা হজ্জে আসবেনা, তারাই কাফের। জ্ঞাতব্য যে অবশ্যই আল্লাহ্ গোটা বিশ্বের কারো মুখাপেক্ষী নন।" (আল ইমরান-৯৬, ৯৭)

এ অর্থে মককা বিশ্ব মুসলিমের জন্য মুক্ত না হলে হজ্জ হয়না। কোনো বিশেষ গোত্র ও জাতীয় রাষ্ট্রের (ন্যাশন ষ্টেট) অধীন থাকলে মক্কা অবরুদ্ধ, মুক্ত নয়। সে অবস্থায় মুক্তহওয়া পর্যন্ত বৈধ হজ্জ হবেনা। যেমন রাসূল সঃ ক্বোরেশদের কর্তৃত্বে যতোদিন মককা অবরুদ্ধ ছিলো ততোদিন হজ্জ করেননি। মককা জয়ের পর আল্লাহ্ কর্তৃক সূরা তওবা নাযিলের মাধ্যমে মক্কা মুক্তির ঘোষণা প্রচারের পর রাসূল সঃ হজ্জ করে মককা থেকে মাদীনা গিয়ে উসামাহকে নিযুক্ত করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এখন বিশ্বমুসলিমের কর্তব্য হলো সকল জাতীয় বিভক্তি থেকে সূরা তওবার আলোকে তওবা করে খাঁটি মুস্লিম হয়ে বিশ্বইমাম নির্ধারণ করে মককা মুক্ত ও হজ্জ প্রতিষ্ঠা করা। তা হলেই তারা খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদ সঃ এর অনুসারী হবে।

ইখওয়ানীদের মতো আরবী ক্বোরেশী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা আব্দুর রহীমদের মতো ইসলামী সাহিত্য লিখে তার সর্বসত্ব দল ও সন্তানদের জন্য রক্ষিত করে আখের গুছানীর ইসলাম, ও অধ্যাপক আযমদের ভাষা সৈনিক, তাবলীগী চিল্লাকারী, ইয়াহইয়া খাঁর ইমামতীতে একাত্তুর সালের বদরের যোদ্ধা ও বিশ্ব ইয়াহুদীবাদের পোষ্যপুত্র বর্ণবাদী বর্তমান আরবদের উচ্ছিষ্টে স্থাপিত ভোগবাদের ব্যাংক-বীমার পয়সায়পালা সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী ইসলাম দিয়ে মক্কা মুক্ত ও পবিত্র হওয়া দূরের কথা, এরা যে যে দেশ ও স্থানে আছে, সে দেশ সমূহই এদের শির্কে অপবিত্র।

এদের মুখোশ উন্মোচন করে সর্বপ্রথম বিশ্বের ইসলামে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠিকে এদের খপ্পর থেকে মুক্ত করার জন্য আমাকে, অপ্রিয় হলেও এ সকল তথ্য পরিবেশন করতে হচ্ছে। আশাকরি, তার ফলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়াতে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবেনা। ইমামত ও নেতৃত্বের মহাসড়ক, সিরাতুল মুস্তাক্বীম, বন্ধ করে যারা বিকল্প রাস্তা তৈরী করে ধর্মের নামে মানুষের ধনসম্পদ লুটে তারপর তাদের বিপথগামী করছে, তাদের সূরা তওবার ৩৪-৩৫ আয়াত দিয়ে উৎখাতের দুরুহকাজে আমাকে বহু সতর্কতা অবলম্বন করে আল্লাহ্র দরবারে বিশেষ তাওফীক্ব ভিক্ষা করতে হচ্ছে। যাতে আমি শয়তান ও নাফ্সের কুমন্ত্রনায় না পড়ি, সেজন্য গত দুই মাস ধরে অবিরাম সাওম পালন করে লিখে যাচ্ছি। যে পর্যন্ত এ বই শেষ না হবে, সাওম চালিয়ে যাওয়ার নিয়াত করেছি। সত্যের উপর অনড় থেকে যাতে

সত্যের সাক্ষ্য সম্পন্ন করতে পারি, সে জন্য মনিবের দুয়ারে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যা দান-ভিক্ষা পাই, তাই কাগজে কালির রেখায় আঁকছি।

আমার যেহেতু আল্লাহ্‌র দুয়ারে কাতর ভিক্ষা যে রাসূল সঃ এর মুস্তাদআফ্‌ নেতৃত্ব বিশ্বের মুস্তাদআফ্‌তম দেশ, বাংলাদেশ, বাংলার মাটি থেকে ক্ববুলহোক, তাই এদেশের মাটিতে যে আবর্জনাসম অযোগ্য, অথর্ব, ক্ষমতালিপ্সু ও হারামভোগী ও ভুয়া ইসলামী শূকর, বানর ও কুকুর আছে, তাদের উচ্ছেদ সর্বপ্রথম কর্তব্য মনে করি। আল্লাহ্‌র পথে ধর্মের লেবাসে বাধা সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ্‌ ক্বোরআনে শূকর, বানর ও কুকুর বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আমি এদের, আমি নিজে গালি দিচ্ছিনা। শুধু আল্লাহ্‌র দেয়া গালি বাংলায় তেলাওয়াত করছি লিখনীর মাধ্যমে। তাতে আমি নিশ্চয়ই কোনো দোষ করছিনা!?

ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানদের মধ্যে হারামখোর যে সমস্ত হেব্‌র, পাদ্রী ও আলেম রয়েছে, তাদের মধ্যে যারা না বুঝে এ যাবৎ এ জঘণ্য পেশায় ডুবে আছে, তারা ও তাদের সন্তানরা যদি ভুল বুঝে তওবা করে সঠিক পথে চলে আসে, তা হলে আমার মতে তা খারাপ তো নয়ই - বরং উত্তম হবে বলে মনে করি। কারণ, তারা অতীতের ভুলের কাফ্‌ফারার জন্য বেশি বেশি সত্যের দাওয়াতী কাজ করবে এবং ঘরেরভেদী হিসেবে অন্যান্য পেশাদার ধর্মীদের দুর্বলদিক তুলে ধরে তাদেরও তওবার ডাক দিবে এবং জনগণকে সতর্ক করবে। তাতে বরং দু'কাজই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একাত্তর সালে পাকিস্তানী জাহিলিয়্যাত ও বাঙ্গালী জাহিলিয়্যাতের দ্বন্দ্বে যা হচ্ছিলো, তা দেখে যেমন ব্যথিত হচ্ছিলাম, বাংলাদেশ হওয়ার পর একবছর যাবৎ দেশের নৈরাজ্য দেখে আমি হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কা চলে যাই। আশা ছিলো যে সেখানে গেলে ঈমানী আদর্শ পিতা হযরত ইব্রাহীম ও খাতামুন্‌ নাবিয়্যীনের আদর্শের পরশ পেয়ে মনে কিছু সান্তনা ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা পাবো। হায়! মক্কায় গিয়ে সেখানে সারাবিশ্বের জাহিলিয়্যাতের মহা মিলন দেখে মনে হলো যেনো গরম তেল থেকে চুলায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম! শক্‌ ও শোক সামলিয়ে উঠে খুব ভেবেচিন্তে দেখলাম যে, আকাশ থেকে ফেরেশতা এনে তো আর পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না! তাই নামসর্বস্ব মুসলমানদের মধ্য থেকেই বেছে সঠিক ধারণা দিয়ে ক্বাফেলা তৈরীর চেষ্টা চালাতে হবে। তাতে আবার জন্মভুমির গুরুত্ব অগ্রধিকার পেলো। তাই অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তান থেকে হজ্জে আসলে তার সাথে মতবিনিময় করলাম। আমার ধারণা ছিলো যে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ ভবিষ্যতের লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ করে বর্তমান কর্মসূচী গ্রহণ করে। সে নিরীখে নিশ্চয়ই অধ্যাপক আযমদের পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে কিছু বোধোদয় হয়ে থাকবে। তাই তাকে বলেছিলাম যে আর পাকিস্তানী ইসলাম নয়, খাঁটি ইসলাম নিয়ে কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমার দ্ব্যর্থহীন কথা ছিলো যে আমরা বলবো যে পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হলেও পাকিস্তান এক দিনের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্র হয়নি। স্বয়ং জিন্নাই মুসলিম ছিলোনা। তাই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হয়েছে। সে অর্থে পাকিস্তানী দুঃশাসনই বাংলাদেশের স্রষ্টা। বিশেষ করে মদ্যপ চরিত্রহীন ইয়াহ্‌ইয়া খাঁন ও তার বাহিনীর ভ্রষ্টাচারে বাংলাদেশের অভ্যূদয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। এ সুযোগে ভারত তার ফায়দা লুটে নেয় মাত্র!

আমার বক্তব্য ও লেখনীতে দুর্বার অসিচালনার মতো পাকিস্তানীদের শোষক জাহিলিয়্যাত ও বাঙ্গালীদের শোষিতের জাহিলিয়্যাত বলতে লাগলাম। বাদশা ফায়সালকেও আমি সাক্ষাৎ করে লিখিত ভাবে তা'জানালাম। কোনো দিকে পক্ষপাতিত্ব না করে আল্লাহ্‌কে হাযির নাযির মনে করে সারা বিশ্বের জন্য ইসলামী পুনঃজাগরণের কাফেলা তৈরীর লক্ষ্যে প্রথমে আমি, গোলাম আযম ও ব্যারিষ্টার কোরবান আলী কাবাঘরের ছায়ায় মাক্বামে ইব্রাহীমে শপথ নিলাম। এর মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীমকে নেপাল থেকে মককা নেয়ার বন্দবস্ত করার জন্য অধ্যাপক আযমকে বললাম। মাওলানা আব্দুর রহীম শেষের দিকে মওদুদী ও জামাতে ইসলামের পাকিস্তানী নেতৃত্বের পূর্বপাকিস্তান সংক্রান্ত আচরণে অসন্তুষ্ট ছিলো। বাংলাদেশ হওয়ার পর তাই মাওলানা আব্দুর রহীম পাকিস্তান ত্যাগ করে নেপাল চলে যায়।

আমার তখনো বিশ্বাস ছিলো এবং এখন তা দৃঢ় ঈমান, যে বিপদ খাঁটি ঈমানদারকে আরো খাঁটি করে মেরাজের পথ দেখায়, যেমন রাসূল সঃ কে তায়েফবাসীর অত্যাচার মে'রাজের পথ দেখিয়েছিলো। আর দুর্বল ঈমানের লোকদের বিপদ নিরাশ করে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলানোর পথ দেখায়। যেমন উহুদের বিপদ দেখে ওসমান উহুদের ময়দান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে পালায়, এবং খালেদ মুতার যুদ্ধে মৃত্যু দেখে পালায়।

অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে, তার চাচা মরহুম শফীকুল ইসলামের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্কের সুবাদে প্রায় পারিবারিক জানাশুনার মতো পরিচয় হলেও মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসেবে যখন আমি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলীয় ঐক্য জোটেরও জয়েন্ট সেক্রেটারী হই, তখন অধ্যাপক গোলাম আযম জেনারেল সেক্রেটারী হয়। তখন আমরা পরস্পরকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনার সুযোগ পাই। আর উভয়ের পারিবারিক ইসলামী ঐতিহ্যের ফলে আমাদের উভয়ের সম্পর্কে প্রায় ভাই ভাইর মতো ঘণিভূত হয়। আমাদের উভয়ের মাঝে পড়ে আব্দুস সালাম খান ইসলামী চরিত্রের লোকদের প্রতি প্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু জামাতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতাদের মনোভাব জেনে আমি তাদের সঠিক পরিমাপ বুঝে ফেলি। পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে ওদের সাথে মিশে ওদের ব্যাপারে আমার ধারণা আরো পাকা হয়। তাই মওদুদী সহ পশ্চিম পাকিস্তানী জামাত নেতাদের আমি আউটকাষ্ট বলে ধরে নেই। কিন্তু একাত্তরে আমি অধ্যাপক গোলাম আযম ও তার নেতৃত্বে জামাতে ইসলামীর কর্মকান্ডে প্রায় বজ্রাহত হই। একাত্তরে অধ্যাপক গোলাম আযমের ভূমিকা সম্পর্কে আমি "আমার একাত্তুর পূর্ব ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনের" আলোচনায় কিছুটা বিস্তারিত আলাপ করবো আশা রাখি। তাতে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করবো, ইন্‌শা আল্লাহ্। এখন আমি আমার মক্কী জীবনের বর্ণনায় ফিরে যচ্ছি। আমি অধ্যাপক আযমের মৌলিক ইসলামী ভিত অনির্ভরযোগ্য জেনে মক্কা কেন্দ্রিক কাজে মাওলানা আব্দুর রহীমকে সঙ্গে পেতে চাই। শেষ পর্যন্ত মাওলানা আব্দুর রহীম নেপাল থেকে মক্কা আসলো। তাকে দেখে তার কথা-বার্তা, চলাফেরা ও আচরণ দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। মাওলানা স্যুট-টাই পরা, খালি মাথা! একের পর এক চুরুট ফুঁকছে। চেনা লোকেরা সালাম করে দু' হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করতে চাইলে মাওলানা এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেক করে বলে "আমি মিষ্টার আব্দুর রহীম, মাওলানা আব্দুর রহীম নই, ইত্যাদি!"

পরে বুঝলাম যে বাংলাদেশ হওয়ার পর মাওলানা পাকিস্তানী শাসকদের সাথে জামাতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও সমান ভাবে দায়ী করায় পাঞ্জাবী ও মুহাজির জামাতীরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করায় মাওলানা তাতে বেঁকে গিয়ে ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে। এটা নিশ্চয়ই এদের জামাতী চরিত্রে আল্লাহ্‌র সাথে বৈষয়িক লেনদেনের সম্পর্ক মুখ্য এবং আব্দ ও মাবুদের সম্পর্কহীনতার কারণে। এ রোগেই ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার দাস-মনিবের সম্পর্ক হতেই হবে। তবেই রূহানী তাঈদ বা সমৃদ্ধি নসীব হয়। আমি যতো জামাতী নেতা, পাতিনেতা ও যুবককর্মীকে দেখছি, এ দানে সবাই দেউলিয়া। তখনো, এখনো।

আমার সাথে অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আব্দুর রহীমকে না পেলেও ভেবেছিলাম যে যেহেতু মাওলানা আব্দুর রহীম আলেম মানুষ, ঘটনার আকস্মিতায় শোকাহত হয়েছে বটে, পরে হয়তো আরেক ধাককা খেয়ে শুধু প্রকৃতস্থই হবেনা, বরং রূহানী দিকে দর্শনের দিগন্ত ও উম্মোচিত হবে। মাওলানা ঐ অবস্থায় মক্কা থেকে পুনঃ কাঠমুন্ডু চলে এলো। তারপর বাংলাদেশে চলে এলো।

ও দিকে অধ্যাপক গোলাম আযম তার পাকিস্তানপ্রীতি ও পাকিস্তানীদের, বিশেষ করে পাকিস্তানী জামাতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও চাঁদা আদায়ের খয়রাতী নেটওয়ার্কের খাতিরে আমাকে খুব মাইল্ড ভাবে বুঝাতে দু'একবার এ্যাটেম্পট নিলো যে, পাকিস্তানের ভুল ও ইয়াহইয়া খান ও তার সৈন্য বাহিনীর লুচ্চামী লাম্পট্যের প্রসঙ্গটা বাদ দিলে হয়না? আমি দৃঢ় দীপ্ত ভাবে তাকে জানালাম যে, এ কথা না বললে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ্‌কে দায়ী করা ছাড়া উপায় নেই! কারণ, তাতে প্রমাণ হয় যে, জিন্নাহ থেকে ইয়াহইয়া খান পর্যন্ত সবাই ভালো ছিলো। আল্লাহ্ অন্যায় ভাবে না হলেও, অন্ততঃ খাম-খেয়ালী করে ইসলামী বা রিপাবলিক অফ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দিয়েছেন! আল্লাহ্‌র পর ধরাতে ইসলামী পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য বাঙ্গালীরা ও শেখ মুজিবুর রহমান দায়ী! পশ্চিম পাকিস্তানীরা কেউ দায়ী নয়!? আমাকে পূর্বেও অধ্যাপক আযম মোটামুটি চিনতো। এবার নখ দিয়ে চিমটি কেটে দেখলো যে আমার সত্য বলে সত্যের উপর অটল থাকা চামড়ার উপর তাদের মতো প্রসাধনের প্রলেপ নয়, হাড় মজ্জার টনটনে ফিত্‌রাত। তাই প্রফেসর আযম তার ভিক্ষার থলেটা নিয়ে কাবায় করা শপথ ভেঙ্গে "রিয়েল পথ ত্যাগকরে রিয়াল, দীনার, ডলার ও পাউন্ডের" আকাশে পাখা মেললো। এখন মনে হয় সে পাখা ভেঙ্গে সত্যের মাটিতে নামার সময় আসছে। তাই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে দিয়ে তা লেখাচ্ছেন। তাই এ লেখা কেরামান কাতিবীনের ডাইরীর পাতা।

আমি বাবা ইব্রাহীম, মা হাজেরা ও আখেরী রাসূল সঃ ও তাঁর প্রিয় যায়দদের পদচিহ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছি। দু' মাসের একটি বাচ্চাসহ স্ত্রীকে, মা ও ছোট ভাইদের লালন-পালনের জন্য দেশে রেখে বর্তমান থেকে "আলাস্তু বি রাব্বিকুম"

এর দূরঅতীতে যাত্রা আরম্ভকরে দেই। একা মককায় আছি। আগর কাঠ বিক্রি করি। মক্কায় ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদী মেহ্মানখানা চালাই। বাড়িতে দেশে পয়সা পাঠাই। লাইব্রেরী ও কিতাবের দোকানে ঘুরি। কিতাব কিনি। পড়ি। মিলিয়ে দেখার জন্য হেরাগুহা, তায়েফ, সওর গুহা ও মাদীনা যাতায়াত করি। মধ্য রাত্রের পর কা'বায় চলে যাই। তাওয়াফ করি আর দেখি যে "মাক্বামে মাহ্মুদ" পেতে কারা কা'বার চারদিকে ঘুর ঘুর করে মাক্বামে ইব্রাহীমে দাঁড়ায়। দেখি। কিন্তু মূল সন্ধানের লোক পাচ্ছিনা। কেউ ক্বোরেশ ও খেলাফত এবং আশারায়ে মুবাশ্শারার বেড়া ডিঙ্গায় না। বই পড়তে পড়তে এক দিন হঠাৎ করে বারাকাহ্র সন্ধান পেয়ে যাই। তার পেছনে চলে চলে আমার খোঁজের মুহাম্মাদ সঃ কে পেয়ে তাঁর সাথে যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইব্ন মাসউদ, সালমান ও উসামাহ্র সন্ধান মিলে যায়। তার সাথে পূর্বের জানা আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীদের পাশে দাঁড় করাই। দেখি মুস্তাদআফ্ ও মুস্তাকবির।

কা'বা যিয়ারতে ইরানের শাহ্ আসে, মরক্কোর হাসান আসে, ইরাকের হাসানাল বক্র আসে, ইয়ামানের ইব্রাহীম হামদী আসে, মিশরের আনওয়ার সা'দাত আসে। সবার জন্য সৌদী খাদিমুল্ হারামাইনের বিরাট আয়োজন। মাওলানা মওদুদীর জন্য ফায়সাল পুরস্কার! আলী হাসান আলী আন্ নাদাভী, রাজকীয় মেহমান! কা'বায় জুমা, ঈদ ও আরাফায় হজ্জের খোত্বাহ্ হচ্ছে। তাতে ক্বোরেশী খলীফা ও অ-খলীফা আব্বাস ও তার ছেলের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু ক্বোরআনের প্রশংসিত, নামসহ উল্লেখিত যায়দের বা মক্কা জয়ে কা'বা পবিত্র হওয়ার পর কা'বার চুড়ায় উঠে আযান দেয়া বেলাল ও রাসূল সঃ এর দু'ভালোবাসার ছেলে, সবার উপর আমারাতের যোগ্যতম উসামাহ্র নাম একবারও বছরে শোনা যায়নি। তাই হিসাবে মিলেনি বলে আরো খোঁজা হয়।

এর মধ্যে দশ লাখ ডলারের একটি চেক নিয়ে তাজুদ্দীন মক্কা যায়। ভারতের বিখ্যাত হুমায়ুন কবীরের ভাগ্নে রশীদুর রহীমের মাধ্যমে তাজুদ্দীন আমাকে খুঁজে বের করে সাক্ষাৎ করে। বলে, "ত্বাহা ভাই, মাত্র দশলাখ ডলারের একটি তুচ্ছ চেক নিয়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য হতে এসেছি। যেখানে আরবদের বিলিয়নের চেক হয়। আমার চেক এক মিলিয়নের চেক, কেমনে দেই?" সঙ্গে তাবারক হোসেইন ও অর্থনীতিবিদ আব্দুর রব। তাজুদ্দীন বলে, ত্বাহা ভাই, আমরা মুসলিম ভাই হিসেবে এদের অঢেল অর্থের হিস্যা পাইনা? উত্তরে বলেতে হয়, এরা "জয় সৌদী" আপনারা "জয় বাংলা" মুসলিম ভাই হলেন কিরূপে? তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ছিলো। হেসে বললো, "কথা তো তাই! আপনার ডিফিনিশনের মুসলিম কই পাবো, বা পাবেন? জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যি বলুন তো দেশের অবস্থা কী?" বললো, "দুঃখের কথা কি বলবো? বঙ্গভবনে রাষ্ট্রীয় ভোজ-সভা হয়। সেখানে আমাদের বউরা শাড়ী বাদ দিয়ে ঘাগড়া পরে অলঙ্কারে ডুবে মেমসাব হয়। বিদেশী ও বিদেশীনীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি বলব ভাই! দেশে চলে আসুন, আসুন দেশ গড়ি।"

পাকিস্তানীরা প্রচার করেছে তাজুদ্দীন হিন্দু ছিলো। পূর্বে নাম তেজা রাম ছিলো। আমাকে একবার ফরমান আলী জিজ্ঞাসা করার পর আমি বলেছিলোম যে, আমি জানি, সে কাপাশিয়ার এক হাফেজী মাদ্রাসায় ছোট বেলায় চৌদ্দপারা ক্বোরআন হিফজ্ করেছে বলে আমাকে শুদ্ধ ভাবে খানিকটা পড়েও শুনিয়েছিলো। আমার কথা শুনে জেনারেল ও সঙ্গীরা বললো, "তব ইয়ে সব ঝুট হায়?" আমি বলে ছিলাম "সফেদ ঝুট হায়।" মনে পড়লো আব্দুস্ সালাম খান সহ মাওলানা মওদুদী মরহুমের কাউসার হাউজের বাঙ্গালীদের হিন্দু অরিজিনের কথা।

এর মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম রাবেতার সদস্য হয়ে মক্কা আসলো। আবার নতুন করে মাওলনার দিকে তাকালাম। দেখলাম, এবার স্যুট-টাই নেই। জামা, পাজামা ও মাথায় টুপী। বললাম, "মিষ্টার আব্দুর রহীমের সিগারেট কই?" শিশুর মতো একটা সরল হাসি দিলো। কিন্তু দেখলাম যে, ইবাদতের রং ধরার চিহ্ন নেই। কাবার সাথে থেকেও জামাতে শরীক হওয়ার তাকিদ নেই। ফজর ও ক্বাজা হতে দেখলাম। রাবেতা ও সৌদী ইসলাম বুঝিয়ে বললাম, "কেনো আসেন?" বললো, বুঝলাম, সবই আল্লাহ্ ও মু'মিনদের সাথে প্রহসন। তা না হলে কি বিশ্বে মুসলমানদের এ অবস্থা! يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

আল্লাহ্ ও মু'মিনদের তারা প্রতারিত করতে চায়, তারা টের পাচ্ছেনা যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই প্রতারিত করছে। (সূরা বাক্বারা-৯)

আল্লাহ্র নিকট দু'টি পাপের কোনো ক্ষমা নেই। একটি হলো শির্ক, অপরটি হলো জনগণের সম্পদ অবৈধ ভাবে ভক্ষণ করা। এ রোগ যে ব্যক্তি ও জাতিকে ধরে, তাদের আর রক্ষা নেই। সর্বদা দারিদ্র্য, দুর্যোগ, নৈরাজ্য ও অশান্তি লেগেই থাকবে। এ দু' রোগে আক্রান্ত দেশের মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত হলো আমাদের বাংলাদেশ। যে দেশের প্রতিটি ইঞ্চি

মাটিতে সোনা ফলে। তাতেও এ জাতি পৃথিবীতে দরিদ্রতম! কারণ, এদেশের ধর্ম প্রচারকরা মুশরিক এবং এদের পেশা হলো অন্যায়ভাবে জনগণের ধন আহরণ ও ভোগ করা। সরকার হলো ধর্মহীন বর্গী। আমলাদের সাথে মিলে জাতির রক্তের শেষ বিন্দু শোষণ এদের জাতীয়তা। এরা মানব জাতিও না, এরা বাঙ্গালী জাতিও না। এরা বৃটিশ ও পাকিস্তানী শোষকদের পরিত্যক্ত আর্বজনায় জন্মানো ছত্রক ছত্রাক। এদেশের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিতরা এ জাতির অস্তিত্বনাশক উই পোকা ও ঘুণ। তাদের মধ্যে আলেম নামধারী পরভুক পরজীবিরা নিকৃষ্টতম। কারণ, তারা ওদের হারাম পয়সার অপমানজনক ভিক্ষার বিনিময়ে ওদের ধর্মীয় প্রতারণা অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করে, ধার্মিক বলে স্বীকৃতি দেয় এবং মরলে তাও পয়সার বিনিময়ে এদের মরদেহ সৎকার করে। কুলখানি ও চল্লিশা খায়।

খাঁটি মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের শির্ক ও হারাম জীবিকা থেকে মুক্ত হতেই হবে। তাদের পরিবার সকল দূর্নীতিমুক্ত হতেই হবে। সালমান ফার্সীর ইসলাম গ্রহণের বর্ণনায় আমরা দেখেছি যে, সত্যিকারের ঈমানদার হযরত মূসা ও ঈসা আঃ দের অনুসারী রাব্বাঈ ও পাদ্রীও বলেছে যে, শেষ নবী সঃ এর রিসালাতের চিহ্ন হবে যে, তিনি সাদ্‌ক্বা খয়রাত ও দান ভিক্ষা খাবেন না। তাই সালমান প্রথম দিন দান পেশ করলে রাসূল তা নিজে স্পর্শ করেন নি। মিস্‌কীনদের খেতে দিয়েছেন। পরের দিন যখন সসম্মানে উপঢৌকন স্বরূপ হাদিয়া পেশ করা হয়েছে, তখনই তা মুখে তুলেছেন ও তা থেকে অন্যদের খেতে দিয়েছেন। সকল নবীদের উত্তরাধিকারী ইসলামী সমাজ বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবশ্যই সপবিরারে যাকাত সাদক্বা ও ভিক্ষার মতো আবর্জনাভোগ মুক্ত হবে হবে। যেমন খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। চাঁদা-ভিক্ষাভোগীরা ক্ষমতাসীন হলে তারা অন্যায়ভাবে জনগণের ধনসম্পদ আত্মসাত করবে। কারণ, হারামভোগীরা নির্লজ্জ বেহায়া হয়। আর বেহায়া লোকেরা মুসলিম হয় না। তাই আল্লাহ সূরা ও তাওবায় মুমিনদের তাদের ব্যাপারে সাবধান করে বলেছেন যে, এরা জাহান্নামী। আর কোনো জাহান্নামী ব্যক্তিরা কি ইসলামের নেতা হতে পারে? কস্মিন কালেও না। তাই ইসলামের নামে পরিচিত ক্বোরআনের ভাষায় বর্ণিত মিথ্যাবাদী ও হারামখোরদের ত্যাগ করে সতর্ক হয়ে হালালভুক ইমামের নেতৃত্বে বিশ্বশান্তির মহাযাত্রার প্রস্তুতির জন্য এ অপ্রিয় তিক্তসত্য প্রকাশ। ইসলামে হালাল খাদ্যকে “তাইয়েব” বলা হয়। হালালভোগীদের “তাইয়েবূন” বলা হয় এবং সত্য কথাকে “কালেমায়ে তাইয়েবাহ্” বলা হয়। কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ্, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্”। বিশ্ব বিজয় একমাত্র হালালভোগী ইমামতের দ্বারাই হবে। হারাম খাদ্যকে ক্বোরআনের ভাষায় “খবীস” বলা হয়। হারামভোগীদের “খবীসুন” বলা হয়। এদের কথা-বার্তা ও ওয়াজ নসীহতকে “কালিমায়ে খবীসাহ্” বলা হয়। খবীসভোগী, খাবীস আলেম-উলামা, পীর মাশায়েখ, সুফী সম্রাট, শায়খুল হাদীস ও মুফাস্‌সেরে ক্বোরআনদের নেতৃত্বে কি কখনো ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদী দ্বীনের বিশ্ববিজয় সূচীত হবে বলে আশা করা যায়? এ যাবত সে আশা করেছিলাম বলে আল্লাহ্‌র গযবে আমাদের এ অবস্থা। আর এক মুহূর্তও এদের পেছনে নয়।

চরিত্রহীন মুর্তাদ ও মুনাফিক্ব আরবদের পয়সা হওয়ায় বিশ্বের হারামভোগী তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও আলেমদের মক্কায় বছরে একাধিকবার মেলা হয়। আমি এ মেলায় এদের উভয়ের রূপ ও স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করেছি। তাই আমার উপর ফরয হয়ে পড়েছে সরলমনা মুসলিমদের সামনে এদের মুখোশ উম্মোচন করা। অত্যন্ত দুঃখভরা হৃদয়ে আমি এ সব লিখছি।

অধুনা বিশ্বে আরব বিশ্বের হাসানুল বান্না ও তার জামাত, ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও উপমহাদেশে মাওলানা মওদূদী ও তার জামাতে ইসলামীর দিকে বড়ো আশা নিয়ে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমরা তাকিয়েছিলো। এরা যে ধোঁকা দিয়েছে ও দিচ্ছে, তা ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ। এদের ভুলসাহিত্য, তথ্য পড়ে যেমন বিশ্ব বিভ্রান্ত হচ্ছে, তদরূপ স্বত্বাধিকারী সাহিত্যের ধনে এদের সন্তানরা নব্য ইয়াহুদীরূপে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চরমভাবে হতাশ করছে। তাই ইব্রাহীম আঃ এর মূর্তিভাঙ্গা কুড়াল, মূসা আঃ এর যাদুনাশা লাঠি এবং মুহাম্মাদ সঃ এর মুস্তাদ্‌আফ ইমামত নিয়ে ময়দানে ডাক দেয়ার সময় এসে গিয়েছে। ইরানের খোমেনী ও তার লোকেরা মুস্তাকবির ও মুস্তাদআফদের ১৪১২ বছর ধরে চাপাদেয়া সত্যকে শ্লোগান রূপে ব্যবহার করে ক্ষমতা পেয়ে নিজেরাই নব্য প্রতারক মুস্তাকবির হয়ে তাদের বিজয়ের পর পরাজয়ের গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছে। তাই এ শূন্যতায় সত্য অনুধাবনকারীরা ময়দানে নেমে না আসলে প্রতারকদের উপর আসন্ন গযবে তারাও পিষ্ট হয়ে যাবে।

আরব বিশ্বের নিশ্চিত কুফর ও ইরতিদাদ দেখে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয় ভারতবর্ষের দিকে। ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মুনাফেক্বীর সর্বশেষ পরিণতি দেখে এখন আমার আশার কর্মস্থল ক্ষুদ্র বাংলাদেশ। এখান

থেকে শান্তিপূর্ণ যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, সালমান ও উসামাহ্‌র গণজাগরণের তুফানী প্লাবন উঠতে পারে। কিন্তু সে পথে নিস্তেজকারী তাবলীগের কোটি কোটি সওয়াবের নেশার স্বপ্ন এবং অধ্যাপক আযমদের সন্ত্রাসী ঘাতকরা দু'দিক থেকে সাঁড়াসী প্রতিক্রিয়ায় মূল ইসলামী ধারাকে খেয়ে ফেলছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক আযমের ব্যক্তি উচাভিলাষ দেশকে এমন এক গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে যে তাতে দেশের একমাত্র মুক্তির তাবিজ ইসলামেরই দূর্নাম হচ্ছে।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ নামে একবার চরমোনাইর পীর ফজলুল করীম ও মাওলানা সাঈদীকে নিয়ে মাওলানা আব্দুর রহীম প্রচলিত ধারায়ও একটু ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামী জাগরণে উদ্যোগী হয়েছিলো। এ সংগঠনটি নিউ ইস্কাটনে যে ব্যক্তিটির বাড়ীতে অফিস করেছিলো, সে লোক আমার পরিচিত ব্যক্তি মরহুম হাফেজ আব্দুর রউফ ছিলো। এ লোকটিকে আমি ভালোবাসতাম এজন্য যে সে লালবাগে হাফেজী পড়ার সময় দরিদ্রতার কারণে মরহুম মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী কর্তৃক চকবাজারের এক ব্যবসায়ীর নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়েও সাহায্য ছাড়া ফেরত চলে এসে রাতে রিক্সা চালিয়ে দিনে পড়ে হাফেজ হয়ে পরে কায়িক শ্রমকরে স্বাবলম্বী হয়েছিলো। বায়তুল মুকার্‌রাম মসজিদের উত্তর গেটের নূরানী আতরের দোকানটি তার। লোকটি মনেপ্রাণে ইসলামী সমাজবিপ্লব চাইতো। তাই ইত্তেহাদুল উম্মায় যোগ দিয়ে নিজ বাড়ীতে তার কেন্দ্রীয় দফতর করেছিলো। মূলে এ সংগঠনটি দেশের নিরপক্ষে পীর ও আলেমদের শিকার (?) করে জামাতে ইসলামের থলিতে পোরার জন্য গোলাম আযমদের একটি পকেট আর্গানাইজেশন ছিলো। তাতে চরমোনাইর পীরকেও ভিড়িয়ে ছিলো। জামাতের মাওলানা মীম ফজলুর রহমানকে তার সেক্রেটারী করে এ পকেটটি করা হয়েছিলো। এরা দেশের আনাচে কানাচে সফর করে মনে হয় বেশ সাড়া জাগিয়ে কমলাপুর রেল ষ্টেশনের আশে পাশে বিরাট সমাবেশও করেছিলো। তাতে নাকি তারা ঘোষণা দিয়েছিলো যে পরবর্তী মহাসম্মেলনে কর্মসূচী দিয়ে তারা ব্যাপক আন্দোলনে নেমে পড়বে। এতে মাওলানা আব্দুর রহীমও অন্যতম সংগঠকশক্তি ছিলো। ইত্তেহাদুল উম্মাহ্ অধ্যাপক গোলাম আযমের পকেট আন্দোলন থেকে মূল জামাতের পকেটকাটা স্বতন্ত্র গণআন্দোলন হতে যাচ্ছে দেখেই গোলাম আযম তার সন্ত্রাসীবাহিনী নিয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহ্‌র গলাটিপে ধরে। তাদের দলীয় ক্যানভাসের বক্তা বেচারা সাঈদীকে ছিন্তাই করে নিয়ে মক্কায় উমরার নামে দেশান্তরিত করে দেয়। যাতে কর্মসূচী ঘোষণার মহা সম্মেলনে সাঈদী উপস্থিত থাকতে না পারে। এ সন্ধিক্ষণে আযম বাহিনীর স্যাবোটাস ঠেকাতে হাফেজ আব্দুর রউফ পদক্ষেপ নিতে গেলেই নাকি জামাতীদের এক সরকারী কর্মচারী শাহ আব্দুল হান্নান তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তখনই মরহুম আব্দুর রউফ বিচলিত হয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে পুরো নাটকের বিবরণ জানায়। তা জেনে আমি হাফেজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আব্দুল হান্নান মিয়ার প্রতাপের উৎস কোথায় যে, সে তাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিতে সাহস পায়? উত্তরে হাফেজ সাহেব জানালো যে শাহ আব্দুল হান্নান চোরাকারবারী নিরোধ দফতরে সরকারী চাকুরীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। তাই তার স্পর্ধার উৎস। আমি এ ফেউ আব্দুল হান্নান মিয়াকে জীবনে মাত্র একবার সামনা-সামনি দেখেছি। তখন সম্ভবতঃ সরকারী চাকুরীতে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে এবং ইয়াং পাকিস্তান নামে একটি পাক্ষিক বা মাসিক ইংরেজী ম্যাগাজিনে নবীশের কাজ করছিলো। সম্ভবতঃ ১৯৬৪-৬৫ সন হবে। পত্রিকার মালিক আযীয আহম্‌দ বিল ইয়ামীনী একদিন শেরে বাংলার মেয়ে রাঈসী বেগমের স্বামী তখনকার এডিপিআই খলীলুর রহমানকে নিয়ে আমার বাসায় দেখা করতে এসেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো যে, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের ফলে আদমজী, ইস্পাহানী ও গ্লাক্সো কোম্পানীসহ বিভিন্ন শিল্পের মালিকদের সাথে আমার সম্মানজনক পরিচয় ছিলো বলে পত্রিকার জন্য কিছু বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে যেহেতু চাঁদা-খয়রাত থেকে আমি সর্বদা দূরে ছিলাম, এ সমস্ত শিল্পপতিরা খাজা সাহেবের সাথে ঘরোয়া সাক্ষাতে আসলে তাদের সাথে আমি ইসলাম ও পাকিস্তান সম্পর্কে কাটাকাটা স্পষ্ট মত বিনিময় করতাম। ফলে এরা আমাকে ভালো জানতো।

শেরে বাংলার জামাতা খলীলুর রহমান পশ্চিম বংগের নামকরা আলেম ইসহাক বর্ধমানীর ছেলে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও চিন্তা-চেতনায় খুব মানানসই ইসলামী ব্যক্তি ছিলো। তার সাথে বিলইয়ামীনীও শেরওয়ানী টুপী পরা কেতাদুরস্ত মনে হলো। আমার আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি স্বভাব ছিলো যে আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখেই প্রথম সাক্ষাতে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ ধারণা গ্রহণ করি না। ভালো করে জেনে তারপর মতামত গ্রহণ করি। মানুষের ভালোমন্দ যাচাইয়ের আমার প্রথম মাপই হলো, যে ব্যক্তির ছেলে-মেয়েরা নামাজী ও পর্দানশীন হবে এবং সবাই ফজরে উঠে সালাতের পর ক্বোরআন তেলাওয়াত করবে, তাদের আমি প্রথম শ্রেণীর ঈমানদার বলে মনে করি। আর যাদের ঘরে ফজরের

সালাতে লোকেরা উঠেনা, তাদের ধর্ম-কর্মকে আমি লোক দেখানো মেকী মনে করি।

আযীয আহমাদ বিল ইয়ামিনী কোন্ শ্রেণীর মুসলমান জানার জন্য একদিন তাকে না বলে আমার প্রতিবেশী খলীলূর রহমান সাহেবকে নিয়ে ফজরের পর তার বাসায় উপস্থিত হলাম। তখন বেলা উঠেছে। দেখতে পেলাম যে, বিল ইয়ামীনী কোনো প্রকার সিজদা করে ফজর সারছে। বড়ো ছেলেকে দেখলাম সালাত না পড়ে ঘুমাচ্ছে। এক ধমক দিয়ে ছেলেকে সালাত আদায় না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। চোখ ডল্তে ডল্তে সে বললো যে ফজরে উঠতে কষ্ট হয়। অন্যান্য ওয়াক্ত সময়মতো পড়ে। আমি বললাম যে ফজর দিনের হাজিরার সালাত। তা বাদগেলে সব গরহাজির। তারপর সে জানালো যে তার মা সাইয়েদ, তাই নামাজ-রোজা ছাড়া তাদের বেহেশত নিশ্চিত। আর যায় কোথা? বিল ইয়ামিনীসহ পুরা সাইয়েদদের ধোলাই হলো। সকালে চা নাস্তার ব্যবস্থা হলো, তাও আমি খেলাম না। তার পত্রিকা ও পাকিস্তানের ইসলামের কুষ্টিনামা আলোচিত হলো। তারপর কালো প্যান্ট, সাদা সার্ট ও কালো টাই পরা এক চিকন-চাকন ব্যক্তি প্রবেশ করলো। এ হলো শাহ আব্দুল হান্নান। পত্রিকার মালিকের ইসলাম যেহেতু পাতলা, তাই তার নবীশের ইসলামও প্রথম দর্শনে পাতলাই বলে আমার মনে অঙ্কিত হলো। তারপর আজ পর্যন্ত আমার সাথে আব্দুল হান্নানের সাক্ষাত হয়নি। তবে জামাতীদের মুখে অধ্যাপক গোলাম আযমের পরিবারের লোকদের মুখে তার নাম উচ্চারণ হতে শুনেছি। কারণ শাহ আব্দুল হান্নান প্রফেসর আযমের আত্মীয়।

বাংলাদেশ হওয়ার পরও সে সরকারী চাকুরে। ইসলামের প্রথম শর্তই হলো তাগুত ত্যাগ করে ইসলামের ক্ষেত্র তৈরী হয়। তাগুতের গোলামী করে মুসলিম বা ঈমানদার হওয়া অকল্পনীয়। জামায়াতে ইসলামের হয়ে এক ব্যক্তি তাগুতের বেতনভুক্ত চাকর, ক্বোরআন হাদীস সম্পর্কে মূর্খ, মাওলানা মওদূদীর সৈয়দী ইসলামের সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ পড়া জ্ঞানই যার ইসলামী আঁতালাকচুয়ালীর সবেধন নীলমনি, সে ব্যক্তি হাফেজ আব্দুর রউফের মতো একজন নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে হয়রান করবে, এ আমার কাছে অকল্পনীয় মনে হলো। তাও যাই হোক, একটি ইসলামী কাজে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে সন্ত্রাসী বাধা! আমি হাফেজ সাহেবকে বললাম, “আপনি যান, গিয়ে ওর মুখে থু দিয়ে বলে আসুন যে, ও যা পারে করে যেনো। তারপর দেখা যাবে।” আমি মূল ব্যাপারটা বিস্তারিত জানিনা বলে মনস্থ করলাম যে, পরের দিন সকালে বাদ ফজর মাওলানা আব্দুর রহীমের বাসায় গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা শুনবো। কারণ মাওলানা শাহ আব্দুল হান্নানের কুষ্টি জানে।

দ্বিতীয় দিন ফজরের পর আমি গিয়ে উঠি মাওলানা আব্দুর রহিমের নাখালপাড়ার বাসায়। তখন আমার বাসা ছিলো তেজগাঁও থানার পশ্চিমে মনিপুরী পাড়ায়। ফজর পড়েই নিজে গাড়ী চালিয়ে যাই বলে বিশ মিনিটের মধ্যেই মাওলানার বাসায় পৌঁছে যাই। আমার আশা ছিলো যে গিয়ে মাওলানাকে তেলাওয়াত বা তাসবিহ্ তাহ্লীলরত দেখতে পাবো। তা না হয় লেখার টেবিলে পাবো। কিন্তু আমাকেই মাওলানাকে ঘুম থেকে উঠাতে হলো অনেকক্ষণ দরজা পিটিয়ে। মাওলানা আমাকে দেখে বলে উঠলো “এমন সময়ও কেউ কারো বাসায় আসে”? উত্তরে আমি বললাম যে, আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দাদের কাছে যাওয়ার সর্বোত্তম সময়ই তো বাদ ফজর! কারণ ফজরের তেলাওয়াতের মজলিসেই না আল্লাহ্ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে হাজিরা নেন! যেমন বিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাসেই হাজিরা নেয়া হয়। ফজর তো ঈমানদারদের দিনের প্রথম ক্লাস। ইন্না কুরআনাল ফাজরি কানা মাশ্হুদা! সন্ধ্যার পর বরং সাক্ষাৎকারীরা আসেনা। কারণ সন্ধ্যায় রাত্রি শুরু হয়। রাত্র ঘুম ও ইবাদতের জন্য। প্রথম রাত ঘুম, শেষ রাত ইবাদতের জন্য।

মাওলানা তার সময়মতো ফজর আদায় করতে গেলো। আমি বসে চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেলাম ও ভাবতে লাগলাম। এরাই কি রাসূল সঃ এর উত্তরাধিকারী? একবার ভেবেছিলাম যে উঠে চলে আসি। পরে ভাবলাম যখন এসেছিই তাই নসিহতটা পূর্ণ করেই যাই। যদি আল্লাহ্ এর মধ্যেই কল্যাণ দেন! তাই মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম যে, বয়সের পার্থক্য মন থেকে দূর করে মাওলানাকে আজ এসপার ওসপার যা হয় সব কথা বলবো। কারণ মাওলানা এ দেশের পন্ডিততম ব্যক্তি।

মাওলানা সালাত সেরে আসলে আমি তাকে তাদের ইত্তেহাদুল উম্মাহ্‌র পূর্ণ বৃত্তান্ত বলতে বল্লাম। মাওলানা ঘটনার আদ্যপান্ত শোনালো। অধ্যাপক গোলাম আযমের কীর্তিকলাপ বলে মাওলানা এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে থামলো। আমি বললাম “বাঙ্গালী মওদূদী সাহেব” এর কারণ কি একবারও ভেবে দেখছেন? আপনিই না গোলাম আযমদের মাওলানা মওদূদীর তাফহীম থেকে আরম্ভ করে সব বই অনুবাদ করে জামাতী বানিয়েছেন! এদেশে আপনাকে বাদ দিয়ে জামাতে ইসলামী কী করে হয়? আপনি যদি জামাত বাদ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা হলে আপনি ওদের

কাছে কেনো যান? উত্তরে মাওলানা বললো যে ইত্তেহাদুল উম্মাহ্‌র সাধারণ সম্পাদক তারই ছোটো ভগ্নীপতি মাওলানা মীম ফজলুর রহমান। চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করীমও তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তারা সবাই মিলে দেশের ইসলামী শক্তিকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে ঐক্যবদ্ধ করে জাতিকে একটি দিক নির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যে একত্র হয়েছিলো। তাতে জামায়াতের বিশেষ স্বার্থে পালিত ওয়াজশিল্পী মাওলানা সাঈদীও যোগ দেয়। পরে যখন নির্দলীয় ঐক্যের ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে এবং দেখা যায় যে জামাতের ব্যবসায়ী ইসলামের স্বত্বাধিকারী গোলাম আযমের লালিত ব্যবসার মনোপলি বিপন্ন হতে যাচ্ছে, তখনই গোলাম আযম তার ত্রিশূল বাহিনী দিয়ে তার ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্যানভাসার সাঈদীকে তার ইচ্ছার বাইরে জোর করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তাতে শাহ্ আব্দুল হান্নান মিয়াকেও ব্যবহার করে।

আমি ব্যাপারটি শুনছিলাম এবং একাত্তর সালে গোলাম আযমের কীর্তিকলাপ এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর মক্কা সহ দেশ-বিদেশে তার কর্মকান্ডের মূল্যায়ণ করছিলাম। পরে মাওলানা আব্দুর রহীমকে বললাম যে, এ থেকে মাওলানা কোনো শিক্ষা নিয়ে বাকী জীবনে নিজের ও জাতির নাজাতের জন্য কিছু করার কথা ভাবছে কিনা। মওদূদীতো ব্যর্থতা নিয়েই দেশ ছেড়ে ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের লিলাভূমীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। তার মৃত্যুতে ভূট্টোর পত্রিকা মুসাওয়াতে হেডিং দিয়ে ছেপে ছিলো, "শেষ-মেষ মওদূদী তার প্রভুদের পদপ্রান্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিদায় নিলো।" এ শিরোনামটি দেখে আমার মতো শক্তপ্রাণ মানুষেরও চোখে পানি এসেছিলো। জীবনভর এতো লেখালেখি করে এ পরিণাম হলো কোনো? জাতিকে পথ দেখানো দূরে থাক, নিজের ও সন্তানদেরও একটি মুখ রক্ষাকর অবস্থানেও পৌঁছতেও ব্যর্থ হলো! আমি মাওলানা আব্দুর রহীমকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার মতো ব্যক্তি কি কারণে একজন অর্ধ শিক্ষিত পেশাদার পীর ও অর্ধ শিক্ষিত পেশাদার বক্তার পেছনে গিয়ে জুটেছিলো? উত্তরে মাওলানা বললো যে, বর্তমান চরমোনাইর পীরের বাবা মাওলানা ইসহাক সাহেবের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। সে সুবাদে তার ছেলে মাওলানা ফজলুল করীম তার স্নেহাস্পদ। মাওলানা ফজলুল করীমও তাকে শ্রদ্ধা করে বলে মাওলানা মনে করে। মাওলানা সাঈদী তার এলাকার ছেলে। তার বইপত্র পড়েই বক্তা হিসেবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। নির্বাচনে তার প্রচার প্রোপাগান্ডা করেছে। বর্তমানে মঞ্চে ও ময়দানে পীরের মুরীদ বাহিনী ও সূরেলা বক্তার শ্রোতা সংখ্যা অনেক। তাই তাদের মুখে মাওলানার চিন্তা চেতনা প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে রাজনৈতিক নোংরামীর উর্ধ্বে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করার নিঃস্বার্থ লক্ষ্য নিয়ে মাওলানা ইত্তেহাদুল উম্মায় গিয়েছিলো।

তারপর আমি মাওলানাকে সরাসরি প্রশ্ন করি যে, মওদূদী ও মাওলানা সূরা তাহ্‌রীমের ৬ নং আয়াত অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে কি না? তাদের উভয়ের সন্তানদের মধ্যে ক'জন দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার যোগ্য আলেম হয়েছে? উত্তরে মাওলানা বললো যে, মওদুদীর সন্তানদের উত্তর মাওলানা দিতে পারবে না। তার নিজের সন্তানদের ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো যে, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো পদ্ধতি সে চাপিয়ে দেয়নি। একটিকে মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছিলো। সে তা ঠিক মতো করেনি। তারপর বাংলাদেশ হওয়ার পর সন্তান ও পরিবারের সাথে তার সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হওয়ায় সন্তানদের তারবিয়াতের দায়িত্ব ঠিক মতো পালিত না হলেও ছেলেরা কেউ বিপথগামী হয়নি। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার জীবনের সাধনার দাওয়াত দেয়া এবং তার সংগৃহীত আলমিরার কিতাবাদির তথ্য উদঘাটনকারী যোগ্য একজনও হয়েছে কিনা? উত্তরে বললো, না। আমি বললাম যে, তা হলে আপনার পর এগুলো সেরদরে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করতে হবে। অন্যথা ঠেলাগাড়ী করে কোনো মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিতে হবে নিশ্চয়ই। উত্তরে মাওলানা চুপ মেরে গেলো। তারপরও আমি বললাম যে ববিতারা তার পূত্রবধু কি করে হলো? এ প্রশ্ন শুনে মাওলানা হা করে আমার দিকে তাকালো। যেনো প্রশ্ন করছে। আমি তা বুঝে বললাম যে, আপনার দ্বিতীয় পুত্র আনওয়ার চাকুরীর সন্ধানে সৌদী আরব গিয়ে আমার নিকট মক্কায় উঠেছিলো। সে ফজরের নামাজে উঠতো না। যার মানে সে নামাজে অভ্যস্ত ছিলোনা। আমার পরিবেশের চাপে তাকে নামাজ ধরতে হয়েছে। চাকুরী হওয়ার পর বউ নেয়ার পালা আসলে আপনার পুত্রবধূ সম্পূর্ণ বেপর্দা উৎকট সাজে শেরে বাংলার ছেলে ফয়জুল হক, নান্না মিয়ার ছেলে ও আব্দুল জাব্বার খাঁর ছেলে শহীদুল্লাহদের সাথে জিদ্দা বিমান বন্দরে লাউঞ্জে আসলে বাঙ্গালীরা চিৎকার করে মন্তব্য করে যে, ববিতা এসেছে। ঘটনাক্রমে আমি সেদিন বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম। মন্তব্য শুনে যেমন দুঃখ পেয়েছিলাম, পরে সেটি আপনার পুত্রবধূ জেনে বজ্রাহত হয়েছিলাম। মাওলানা চুপ করে ঝিম ধরে থাকলেও আমি বলে চললাম। বললাম যে, মওদূদীর ছেলেরাও বড়োটি

ছাড়া বাকীরা দাড়ী কামানো শার্ট প্যান্টওয়ালা ফিরিঙ্গি। মেয়ে-জামাই সৌদী আরবে চাকুরী করতে গিয়েছে। জামাই ক্লিন শেভ হলেও সাইয়েদ ঠিকই আছে। এগুলো আপনারা কি করে করলেন? এখন কেনো পাগড়ীওয়ালা পীর, জামা জুব্বা ও টুপীওয়ালা বক্তা ও কট্টর মাদ্রাসা পড়ুয়া মোল্লা হাফেজ্জীদের পেছনে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হচ্ছেন? এদের সবাইকে বস্তায়ভরে পাল্লায় দিলে, তারপর আরো ক'বস্তা দিলে আপনার সমান হবে? মাওলানা! লেবাসের কোনো মূল্য না থাকলে কেনো আল্লাহ্ ক্বোরআনে এর এতো গুরুত্ব দিয়েছেন?

এতোক্ষণ পরে আবার মুখ খুলে মাওলানা বললো যে ক্বোরআনে নির্দিষ্ট পোশাকের কী কোনো বিধান আছে? উত্তরে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, অবশ্যই আছে। লজ্জা নিবারণ ছাড়াও পোষাক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক এবং তাক্বওয়ার পরিচায়কও। যেমন ইউনিফর্ম সৈনিকের পরিচয় বহন করে। আর মুমিন মাত্রই আল্লাহ্‌র সৈনিক! আপনারা তো সেনাপতি! আপনাদের তো ইউনিফর্মের উপর বহু ডেকোরেশনও অনিবার্য! সুন্নাত ও বিদআত লিখতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কথার সাথে নিষ্প্রয়োজনীয় লেবাসের প্রসঙ্গ টেনে বরং ভুলই করেছেন। তাই লেবাসওয়ালাদের পিছনে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছেন। এখনো সময় আছে। বই লেখা বাদ দিয়ে ক্বোরআন ব্যতীত সব কিতাবের আলমারি এ রুম থেকে নির্বাসিত করুন। টেবিল-চেয়ার সরিয়ে ঢালা বিছানা করুন। যারা আসবে বিছানায় বসবে। নামাজের আযান হবে আপনার বাড়িতে। জামাত হবে আপনার পিছনে। ছেলে ও নাতিদের নিয়ে সকাল-বিকাল ক্বোরআন ভিত্তিক তারবিয়াত আজ থেকে চালু করুন। লেবাস, পোষাক, তাক্বওয়া, পরহেজগারী ও পর্দার ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, পীর ফজলুল করীম, বক্তা সাঈদী ও অন্যান্য ইসলাম পিয়াসীদের আল্লাহ্ তাঁর "আহলুয যিকর" ব্যক্তির নিকট ধাক্কিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। আমাদের পরিবারে দাদার পূর্বে থেকে ইলমে দ্বীন, শরঈ পর্দা এবং শক্ত লিবাসুত তাক্বওয়া ছিলো। তাতে আমাদের পরিবারে আল্লাহ্‌র খাস বরকত ছিলো। আমি ছোটো বেলায় এতিম হয়ে তারপর নদীভাঙ্গা হয়ে আশ্রয় ও অভিভাবকহীন হয়ে শুধু লিবাসুত তাক্বওয়া ছেড়ে দেখেছি যে, তাতে বরকত নেই। আল্লাহ্ আমাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিতেই আমি শক্ত করে তাক্বওয়ার ঈমান, আমল ও লেবাস ধরেছি। তাতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বরকত আমি অনুভব করছি। মা'রুফ ও মুনকার অর্থাৎ ন্যায় ও অন্যায় আমার কাছে আয়নার মতো স্বচ্ছ ধরা পড়ে। ঈমান ও আমলের সাথে লিবাসুত্তাক্বওয়া না হলে ঈমান আমল টিকেনা। যেমন ছিদ্র বেলুনে বাতাস থাকেনা। বেপর্দা মেয়ে মানুষের সালাত, সওম, যাকাত এবং হজ্জ যেমন সামঞ্জস্যহীন, তেমন পুরুষের তাক্বওয়ার লেবাসহীন চলাফেরা ফাসেক্বী। বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াত দানকারী দলের ইমাম ও তার কর্মীবাহিনীর জন্য ফরজের কাছাকাছি ড্রেস কোড।

মাওলানা আব্দুর রহীমকে মওদুদী ও তার পরিবার এবং তার নিজের ও পরিবারের মধ্যে তাক্বওয়া না থাকায় রূহানীয়াত বর্জিত অভিশাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলায় মাওলানা সেদিন একটু দমে গেলো। বিদায়ের পূর্বে আমার বাসার মতো ড্রয়িং রুমকে সালাতের জন্য সাজিয়ে তার পাশে কিতাব সাজানোর কথা বলায় মাওলানা সে দিনই বাহির থেকে ফেরার সময় আমার বাসায় যোহরের সালাত আদায় করে কিছু জরুরী কিতাব দেখার কথা বললে সে দিন আমি বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। বিদায়ের সময় পুনঃ বললাম, লম্বা জামা ও মাথায় পাগড়ী চড়লে আমি আপনার পেছনে এসে দঁড়াবো কিন্তু! শেষ কথা শুনে মাওলানা জোর করে হাসলো, আর বললো, "আচ্ছা, আচ্ছা, বাইশ হাত পাগড়ী মাথায় পেচাবো"।

ঠিক যোহরের সময় মাওলানা আমার বাসায় আসলো। উযু করে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে রুকুতে যেতেই এক অঘটন ঘটে গেলো। দেখা গেলো যে, মাওলানার পায়জামাটা পেছন থেকে এমন ছেড়া যে মাওলানার সতর সব দেখা যায়। তা দেখে আমি পাশ থেকে সরে সামনে চলে আসি। রক্ষা যে সে অবস্থায় আমি ও মাওলানা ছাড়া অন্য কেউ ছিলোনা। মাওলানা তৃতীয় রাকাত শেষে চতুর্থ রাকাতের সিজদায় গেলো আমি একখানা চাদর এনে সিজদারত অবস্থায় পেছন থেকে ঘাড় পর্যন্ত মাওলানাকে ঢেকে দেই। সালাম ফিরিয়েই মাওলানা বললো, কি হলো যে চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলেন? আমি বললাম যে, আপনার সালাত অবস্থায়ই আমার উপর অহী নাযিল হয়েছে যে নেসফে সাক্ব, অর্থাৎ হাটুর নীচ পর্যন্ত কোর্তা পড়া ফরজ। মাওলানা কিছুটা অবাক হয়ে বললো যে তা আবার কেমন কথা? উত্তরে আমি বললাম, পেছনে হাত দিয়ে দেখুন। হাত দিয়ে দেখে মাওলানা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। এ ফাঁকে আমি বললাম, জামাটা হাটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা হলে এ ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনা থাকেনা। তাই আপনার সুন্নাত ও বিদআত বই ঠিক নয়। পরে মাওলানাকে এক খানা লুঙ্গি দিলে তা দিয়ে পুনঃ উযু করে সালাত আদায় করে বাসায়

চলে যায়।

মাওলানা মূলে সরল প্রকৃতির পন্ডিতব্যক্তি ছিলো। ইত্তেহাদুল উম্মার ঘটনা সম্পর্কে আমার দীর্ঘ আলোচনা ও সালাতের সময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আমার ধারণা হয়েছিলো যে মাওলানার ভিতরে এরপর থেকে তার ও তার পরিবার, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তনের লক্ষণ শুরু হবে। এর কিছু দিন পর তার দ্বিতীয় ছেলে ও তার ববিতা বৌ সৌদী আরব থেকে এলে আমার বাসায় এসে মাওলানার ছোট মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দিয়ে যায়।

আমি বেপর্দা মেয়েদের উদাম মাংস প্রদর্শনীর জন্য সাধারণতঃ কোনো বিয়েতে যাইনা। কিন্তু মাওলানা আব্দুর রহীমকে এতো ওয়াজ করার ফল কী তা দেখার জন্য এ বিয়েতে গেলাম। শেরে বাংলা নগরে কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের মজলিসে ঢুকে আমি ভূত দেখার ন্যায় দেখলাম যে অসংখ্য ন্যাংটার চেয়ে খারাপ অর্ধোলঙ্গ মেয়েদের মধ্যে নান্না মিয়া সহ মাওলানা আব্দুর রহীম বসে দিব্যি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। বড়ো মেয়েটিকে মাওলানা হেফজভুলা এক নাম সর্বস্ব হাফেজের সাথে বিয়ে দিয়েছে। যাকে আলেম বলা যায়না। ছোট্ট মেয়েটিও এক দাড়িমুন্ডা ব্যবসায়ী জাহেল ছেলের সাথে বিয়ে দিচ্ছে এ অবস্থায়! তা দেখে আমার মনে ঘৃণাই সৃষ্টি হলো। আমি মাওলানার সাথে কোনো কথা দূরে থাক, দেখা না করেই চলে এলাম। মনে মনে বলতে গেলে এদের জানাযাই পড়ে ফেললাম।

এরপর বলা চলে আমি মাওলানা আব্দুর রহীম ও তার আই, ডি, এল, দল ও গোলাম আযমদের জামাতে ইসলামীর লোকদের পৃথকভাবে ভাবা বাদ দিয়েছি। বরং ধরে নিয়েছি যে মওদুদীর ইসলামী সাহিত্য মজলিসের পুরাতন ও নুতন, সবাই একই মুদ্রার এপিট ওপিঠ। মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা করে কাঠমোল্লারা যেমন মানুষের সদক্বা, যাকাত, ক্বোরবানীর চামড়া ও চাঁদা তুলে খায়, তেমন আধুনিক কায়দায় মুখরোচক কথাবার্তার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে বই পুস্তক লিখে ব্যবসায়িকভাবে তা প্রকাশ করে "সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত" পন্থায় প্রাক্তন ইয়াহুদী-নাসারাদের পেশা করে বাতিল ভাবে মানুষের মাল ভক্ষণ করাই এদের দুনইয়া ও আখেরাত। এর ফাঁকে আমি অসুস্থ হয়ে প্রায় ছ'মাস শয্যাশায়ী হয়ে যাই। এর মধ্যে হঠাৎ করে মাওলানা আব্দুর রহীম মারা যায়। এভাবে বলা চলে যে, বাংলা ভাষার মাওলানা মওদুদী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তার লেখা সাহিত্যের উপরই অধ্যাপক আযমদের মওদুদী জামায়াত আজো চলছে।

<u>বুক ফাটা ব্যথায় আর্তনাদ স্বরূপ আমি হাশরের দিনের সাক্ষ্য লিখছি। পৃথিবীতে এর ভিত্তিতে বিপ্লব না হলেও এর ভিত্তিতে পরকালে নাজাতের পথ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এর দ্বারা নূহের তুফানের মতো বিপ্লব হবেই। কারণ, কাফেরদের পাপে বিশ্ব যতোনা নুজ, ভন্ডধার্মিক ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের পাপে আজ গোটা বিশ্ব তার চেয়ে বেশী ডুবু ডুবু।</u>

আল্লাহ্‌ যেমন একমাত্র ইলাহ্‌, তাঁর দয়া যেমন সৃষ্টির অস্তিত্বের মূল, তাঁর অসন্তুষ্টি তেমনি সকল ধ্বংসের কারণ। তদরূপ তাঁর কিতাব সমূহ সৃষ্টির কল্যাণের সনদ। তাঁর কিতাবের কর্তৃত্ব যখন ঈমানদারদের হাতে ন্যস্ত হয়, তখন মানুষের ইহকাল পরকাল স্বর্গ হয়ে যায়। যখন ধর্মব্যবসায়ী প্রতারকদের হাতে পড়ে, তখন মানুষের ইহকাল ও পরকাল নরক হয়ে যায়।

ক্বোরআন যখন রাসূল সঃ এর হাতে ন্যস্ত হয়, তখন মুস্তাকবিরদের পতন হয় এবং মুস্তাদআফের বিজয় সূচীত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর যখন ক্বোরআন আংশিকভাবে আবু বকর ও উমরের আমলে কার্যকর হয়, তাতেও কল্যাণের ছোয়া মানুষের মাথার উপর ছিলো। কিন্তুএ ক্বোরআন যখন মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আসের হাতে সিফ্‌ফীনের মহাযজ্ঞের কালে হস্তান্তরিত হয়ে যায়, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ক্বোরআনের কল্যাণ মানুষ আর চোখে দেখেনি। বর্শার মাথায় ঝুলানো সে দিনের ক্বোরআন আজো মানব জাতির বুকে বর্শা হয়ে বিঁধছে। সে ব্যথায়ই আজো মানব জাতি কাতরাচ্ছে। মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস, ইয়াযীদ ও মারওয়ানদের হাত হয়ে সাহাবীপূজারী "সিপাহী সাহাবা" ও ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের হাতে পড়ে ক্বোরআনও আজ তার মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করছে। এ অবস্থার ফলেই রোজ ক্বেয়ামতে রাসূল সঃ বলবেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"হে প্রতিপালক, আমার নামের মিথ্যা দাবিদাররা এ ক্বোরআনকে পরিত্যাগ করেছিলো।" (সূরা ফুরক্বান-৩০) ক্বোরআনের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করেছে।

এ ক্বোরআন পেয়ে রাসূল সঃ এর হাতে সকল ধন-সম্পদ তুলে দিয়ে মক্কার তৎকালীন সবচেয়ে ধনাঢ্য মহিলা মা

খাদীজা ফকির হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূল সব বিলিয়ে দিয়ে পেটে পাথর বেঁধে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে বিদায় কালে নিজের বর্ম বন্ধক রেখে গিয়েছেন। এ কুরআনই যখন ঈমানহীন বর্শার মাথায় দু'ব্যভিচারিণীর পুত্র মুয়াবিয়া ও আমরের হাতে চলে যায়, তখন তা দিয়েই বিশ্ব লুট করে ধর্মের নামে অধর্ম চালু হয়। সে অধর্মেই আজো আমরা ধুঁকে ধুঁকে মরছি। অপরদিকে কাফের মুশরিকরা বিশ্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বিশ্বকে মুস্তাকবির ও মুস্তাদআফে বিভক্ত করে রেখেছে। অনুন্নত দরিদ্র দেশ ও জনগোষ্ঠী ক্বোরআনের ভাষায় "মুস্তাদআফ"। উন্নত ধনীদেশ ও জাতি ক্বোরআনে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র ভাষায় "মুস্তাকবির"। এ মুস্তাকবিররা তাদের উন্নত কারিগরী, উন্নত শিল্পদ্রব্য, লুণ্ঠিত ধন ও সুদী অর্থনীতি দ্বারা পুঞ্জিভূত বিশ্বের শতকরা পঁচাশি ভাগ ধনে আই, এম, এফ, বিশ্বব্যাংক ও অর্থলগ্নীর কনসোর্টিয়াম প্রভৃতি দ্বারা দরিদ্র বিশ্ব অর্থাৎ মুস্তাদআফদের লুটছে। মুস্তাদআফরা বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি ভাগ হলেও এদের মাঝে বিশ্বের আবিষ্কৃত সম্পদের মাত্র শতকরা পনের ভাগ সার্কুলেশনে আছে। মুস্তাকবির্‌রা বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা পনের ভাগ হলেও বিশ্বের আবিষ্কৃত সম্পদের শতকরা পঁচাশি ভাগের মালিক। এদের উৎপাদন, সম্পদ ও আহরণ ও ভোগের যোগানদার বিশ্বের শতকরা পঁচাশি ভাগ মুস্তাদআফ। এ মুস্তাকবির্‌রা তাদের সম্পদের জোরে বিশ্বের শতকরা পঁচাশি ভাগ দরিদ্রদের বিনা দাসখতে ক্রীতদাস রূপে খাটাচ্ছে এবং এদের সুন্দরী নারীদের হোটেল, পর্যটন ও প্রমোদ কেন্দ্রে বেশ্যারূপে ভোগ করছে। পূর্বে দাসখত দেয়া নারী ও কৃতদাসীদের সন্তানদের দায় দায়িত্ব নিতো এদের দেহ ভোগকারীরা। এখনকার নারীদের মাথায় তারা নারীবাদী স্বাধীনতার প্রতারণা ঢুকিয়ে তাদের বিশ্বময় বেশ্যা বানিয়ে ওদের বেশ্যাবৃত্তিকে সেক্স ইন্ডাষ্ট্রি বা যৌন শিল্প এবং বেশ্যাদের ফেমিনিষ্ট বা যৌনকর্মী নাম করণ করেছে। এখন আর ওদের পেটে জন্মানো সন্তানদের ওদের দেহভোগীরা দায়িত্ব নিচ্ছে না যেমন প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, ও অদূর অতীতে নিতো। সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও নিজেদের আশ্রয়ও যেহেতু এ নারীরা তাদের মাংসের খরিদ্দারদের কাছে পাচ্ছেনা, তাই তারা জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে সন্তানহীন অর্থাৎ উৎপাদনহীন যৌনাচারে লিপ্ত হয়েছে। ফলে বিকৃত যৌনাচারে এরা রুগ্ন হয়ে পড়েছে এবং তা থেকে এইডস রোগের মহামারী জন্ম নিয়ে গোটা মানব জাতিকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। এ মুস্তাদআফদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী মুস্তাকবিরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ধর্মের নাম ইসলাম।

মুস্তাদ্‌আফ্ বারাকাহ্‌কে দিয়ে পিতামাতাহীন ইয়াতীম মুহাম্মাদকে মুস্তাদআফরূপে পেলে তাকে মুস্তাদআফদের রাসূল রূপে রিসালাত প্রদান করে মুস্তাকবিরদের হাতে নির্যাতন করিয়ে যায়দ, বেলাল, আম্মার, সুহাইব, ইবন মাসউদ, সালমান ও সাওবানদের দ্বারা বিশেষ মুস্তাদআফ সেনাদের অগ্রণী জামাত দাঁড় করে রাসূল সঃ কে আল্লাহ্ কড়া, অলঙ্ঘনীয় আদেশ দিয়েছেন যেনো রাসূল কখনো তাদের থেকে বিছিন্ন না হন। সর্বদা যেনো তাদের মাঝে পরিবেষ্টিত থাকেন। কখনো মুস্তাকবিরদের ইচ্ছানুযায়ী মুস্তাদআফদের দরবার থেকে উঠিয়ে না দেন। দিলে রাসূল সঃ যালিমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন। এভাবেই আল্লাহ্ ঈমানদার ও বেঈমান বাছনীর ব্যবস্থা করেছেন। যখনই মুস্তাদআফদের সাথে উঠতে-বসতে ও সমান ভাবে মেলা-মেশা করতে কারো নাক উচু হবে এবং বলবে যে, "আমাদের সমাজ থেকে কি আল্লাহ্ এদেরই বিশেষ মর্যাদা দানের জন্য বেছে নিয়েছেন?" তখনই বুঝতে হবে এরা আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞ মুস্তাকবির। মুস্তাদআফ ঈমানদাররাই প্রকৃত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁর কৃতজ্ঞ মুস্তাদআফদের খুব ভালো করে চেনেন। এরা যখনই রাসূল সঃ এর দরবারে আসবে, আল্লাহ্ রাসূলকে তাদের সালাম করতে নির্দেশ করেছেন। রাসূল সঃ তাদের সালাম করবেন। রাসূল সঃ তাদের সালাম করে বলবেন, "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিশেষ রহমতের ঘোষণা করেছেন, তোমাদের মাফ করে দিবেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বিশেষ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এভাবে আল্লাহ্ মুস্তাদআফ কৃতজ্ঞ বান্দাদের এবং অকৃতজ্ঞ মুস্তাকবির অপরাধীদের অবস্থান স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন।" (সূরা আনআম-৫২-৫৫)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ - وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ- وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

এখানে ইসলামী আন্দোলন, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে যারা নিজেকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদ রূপে কাল ক্বিয়ামতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং "রাদি আল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূ আনহুর" তালিকাভুক্ত হতে চায়, তাদের সবার এ কথা জানতে ও স্মরণ রাখতে হবে যে, যাদের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জানের সাথে মাল রয়েছে, তাদের জান ও মালের সবটুকু আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রয় করে তারপর প্রবেশ করতে হবে। জান দিয়ে মাল হাতে রেখে বা মাল দিয়ে জান হাতে রেখে এ পথে তালিকা ভুক্ত হওয়া যায়না। যাদের জান আছে মাল নেই, তারা জানটা সম্পূর্ণ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। যারা জান-মাল উভয় দিবে, তারা জিহাদের কাজের ফাঁকে যে সময় পাবে, সে সময় তাদের মালের প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বানিজ্য করবে। প্রথমে জান-মাল প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই মালের খুমুস্‌ ইমামের হাতে হস্তান্তর করে ইমামের অনুমতিক্রমে বাকি চার ভাগ তার কাছে আমানত স্বরূপ গচ্ছিত থাকবে। তা দিয়ে সে হালাল পন্থায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি করবে। প্রয়োজনে ইমাম চাওয়া মাত্র সব সমর্পণ করতে প্রস্তুত থাকবে। আর যাদের মাল নেই, শুধু জান আছে, তারা বাইতুল মাল থেকে তাদের খাওয়া পরা এবং মাথা গোজার ঠাঁই বাসস্থান তৈরীর পরিমাণ ভাতা বা অনুদান পাবে। খরচ নির্বাহের বাইরে এ পয়সার অংশ বিশেষ এরা জমা করলে তা "কানয্‌" হবে। এ কানয্‌কারীরা জাহান্নামী হবে। وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (সূরা তওবা-৩৪)

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক নেতা, কর্মী, প্রশাসক ও কার্য নির্বাহীরা, যাদের নিজেদের মাল নেই, তারা সম্পদ জমা করতে পারবেনা। খরচের পর যা উদ্বৃত্ত হবে, তা বাইতুল মালে ফেরত দিতে হবে। তা না করলে খেয়ানত হবে এবং জমাকৃত অর্থ কানয্‌ হবে। এরা জাহান্নামে গরম করা মালে ছ্যাক এবং শক খাবে। এ অর্থে আমাদের মাঝে মুসলিম সামাজে যতো সব মূলধনহীন পীর, মসজিদ মাদ্রাসার ইমাম ও শিক্ষক এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মী রয়েছে, যারা জনগণের দান, খয়রাত, সদক্বা, যাকাত ও ক্বোরবানীর চামড়া প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল, তারা তাদের খাওয়া পরার বাইরে জনগণের দান দিয়ে যে বাড়ী ঘর ও বিষয় সম্পদ গড়েছে, সব খেয়ানত ও আত্মসাতের সম্পদ। তার মালিক তারা ও তাদের সন্তানরা নয়। ইসলামী বিধানে এগুলো চুরি করা সম্পদ। চোরামালের মালিক হয় না চোর। তাই চোরের উত্তরাধিকারীরা কেউ তার ওয়ারিশ হবে না। এরা সবাই আগুণ খাওয়ার মতো এ সম্পদ খাবে। যে পর্যন্ত এ সম্পদ ফেরৎ দিয়ে তওবা করে নুতন করে এ পীর, মাশায়েখ ও আলেমরা ঈমান না আনবে, তাদের মুখে ইসলামের কথা শুনা যাবেনা। এদের পেছনে সালাত হবেনা, এদের কাজীগিরীতে বিবাহ হবে না, এবং এদের পিছনে ঈমানদারদের জানাযাও হবে না। কারণ, এরা মুস্তাদআফদের হক্ব আত্মসাৎ করে সমাজে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে শোষকদের দুয়ারে বিক্রি করে আল্লাহ্‌র দ্বীনের শত্রু। যেমন ইয়াহুদী রাব্বাঈ ও খৃষ্টান যাজকরা। এ হারাম পন্থা সমাজে চালু থাকার ফলে এদের মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানক্বাহ থেকে সমাজে ধর্মের প্রতারক প্রজন্ম জন্ম নেয়। ফলে এ লাঞ্ছিত লোকদের আরচণের কারণে আল্লাহ্‌র দ্বীন মানুষের দৃষ্টিতে মর্যাদা হারিয়ে এমন পর্যায়ে নেমেছে যে সমাজের সম্মানী লোকেরা তাদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দিচ্ছে না। এমনকি এ ইমাম, আলেম ও পীরেরা স্বচ্ছলতার মুখ দেখলে আর নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসায় না পড়িয়ে স্কুল-কলেজে পড়ায়। অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযমের পরিবারকে 'ষ্টাডি কেইস্‌' রূপে তুলে ধরলেই তার অনস্বীকার্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

শামসুল হক ফরীদপুরী

মরহুম মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী আমাদের দেশের আলেমদের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় আলেম ছিলো। ভিক্ষা ভিত্তিক মাদ্রাসায় তার মতো সংগ্রামী মানুষ কিভাবে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে হয়েছে, আমি তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। সময়টি হয়তো ১৯৬২ কি ১৯৬৩ সাল হবে। তখন আইয়ুব খাঁ ক্বোরআন বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন ঘোষণা করেছে। স্যার খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে মাওলানা শামসুল হকের ভালো সম্পর্ক ছিলো। খাজা সাহেব তাকে শ্রদ্ধা করতো এবং মাওলানাও খাজা সাহেবকে মানতো। আইয়ূব খাঁর ক্বোরআন বিরোধী ঔদ্ধত্যে খাজা সাহেব বিচলিত হয়ে মাওলানা শামসুল হককে ডেকে আনলো তার নিউ ইস্কাটনের বাসায়। আমি উপস্থিত। খাজা সাহেব মাওলানাকে বললো, "মাওলানা, এখন রাজনীতি নয়, ঈমান পরীক্ষার সময় এসেছে। ইংরেজরা যেখানে ক্বোরআনে হাত দিতে সাহস পায়নি, সেখানে আইয়ুব খাঁ ক্বোরআনে হাত দিয়েছে। ঈমানের পরীক্ষা এখন, খানক্বাহ ও মাদ্রাসা ছেড়ে জেহাদে নামতে হবে। আমি বুড়া কালে আবার ময়দানে নেমেছি। আপনি কি নামবেন, না আইয়ুব খাঁকে ক্বোরআন অমান্য করার অধিকার দিয়ে মাদ্রাসা নিয়ে থাকবেন?"

খাজা সাহেবের কথা এতো দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট ছিলো যে তা শুনে মাওলানা শামসুল হক যেন উত্তেজিত হয়ে গেলো। মাওলানাকে তার ভক্তরা অনেকে "মুজাহিদে আযম" বলেও আখ্যায়িত করেছিলো। সে দিন মাওলানা জয্বায় প্রায় উত্তেজিত হয়ে বললো যে শুধু মাওলানা নিজেই নয়, অন্যান্য তার অনুসারী সকল আলেমদের নিয়ে ময়দানে নেমে পড়বে। প্রয়োজনে মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানক্বাহ ত্যাগের ডাক দিবে। কারণ, ক্বোরআন তার মর্যাদায় আসীন থাকলে মাদ্রাসা, মসজিদ ও পীরদের খানক্বাহ থাকবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচী নেয়ার জন্য পরবর্তী বৈঠকের জন্য দিন তারিখ ঠিক করে মাওলানা শামসুল হক বিদায় নিলো।

এর মধ্যে শর্ষিণার পীর সাহেবের সাথে যোগাযোগ করা হলে পীর সাহেব তার উপদেষ্টা কায়েদসাব খ্যাত মাওলানা আযীযুর রাহমানকে খাজা সাহেবের সাথে আলোচনার জন্য পাঠায়। শর্ষিনাওয়ালাদের ধর্ম হলো ক্ষমতাসীনদের পক্ষে থেকে দ্বীনের নামে দুনইয়া কামানো। তারা তখন আইয়ুব খাঁর পক্ষে অবস্থান নিয়ে ফেলেছিলো। স্পষ্ট ক্বোরআন বিরোধী আইন করার পরও পীর সাহেব আইয়ুব খাঁর পক্ষ নেয়ায় খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো ধীরস্থির এবং চরম ভদ্র মানুষটি সে দিন প্রায় মাওলানা আযীযুর রহমানকে অপমান করে তার বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সে দৃশ্যটি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসমান।

নির্দিষ্ট দিনে মাওলানা শামসুল হক আসছেনা দেখে খাজা সাহেব বিচলিত হয়ে আমাকে লালবাগ পাঠালো। আমি গাড়ি থেকে নেমে লালবাগ মাদ্রাসার সীমায় প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম যে মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ মাদ্রাসার উঠানে তর্জন গর্জন করে বলছে, "কিধার হায় মৌলভী শামসুল হক? আগার সিয়াসাত কারনি হায়, তো মাদ্রাসাসে নিকাল জানে কাহো। মাদ্রাসামে তালা লাগা দো" ইত্যাদি। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ আউয়ুব-মুন্য়েম খাঁর সমর্থক। তাই মাওলানা শামসুল হককে লালবাগ মাদ্রাসা থেকে বের করে মাদ্রাসায় তালা লাগানোর হুমকি ছড়াচ্ছে। মোল্লাদের স্বার্থের পক্ষে ক্বোরআন বিরোধী আইন করলে, তার বিরোধী প্রতিবাদ করলেও তা রাজনীতি হয়ে যায়। আর ক্বোরআন বিক্রি করা হয়ে যায় দ্বীনের খেদমত!

আমি অবস্থা দেখেই পরিস্থিতি আঁচ করে ওখানকার এক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলাম যে মাওলানা শামসুল হক কোথায়? উত্তরে সে শিক্ষক বেচারা আমাকে তাদের সদর সাহেব, মুজাহিদে আযম মাওলানা শামসুল হক সাহেবের ক্লাশে নিয়ে গেলো। আমি ঢুকে দেখি যে মাওলানা তার একদল ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে লম্বা মোনাজাতে কান্নাকাটি করছে। অবস্থা বুঝে আমার মাওলানার উপর ক্ষোভও হলো এবং তার দূরাবস্থা দেখে করুণাও হলো। আমি সালামও করলাম না। মোনাজাতে শরিক হওয়া দূরে থাক। মাওলানা মোনাজাত শেষ করে আমাকে পাশে বসিয়ে বললো, ভাতিজা কিছু বুঝতে পেরেছো? উত্তরে বললাম, কিছুটা আঁচ অনুমান করতে পেরেছি। এখন আপনার মুখে বলুন, খবর কি? মাওলানা তার মাদ্রাসা ও জেহাদের দ্বন্দ্বের কথা জানালো। আমি বললাম, তা হলে এ মাদ্রাসাই আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দানকারী মূর্তি। একে ভাঙ্গা ও ত্যাগ করা প্রথম জেহাদ। তা করতে পারলে আসুন। তা নাহলে মুনাজাত করুন। এ বলে আমি আর এক মুহুর্তও দেরী না করে চলে এসে খাজা সাহেবেকে বিস্তারিত ঘটনা জানালাম।

মাওলানা শামসুল হক আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের ইসলামী আইন রচনার জন্য মূলনীতির খসড়া তৈরীতে আমার পিতার সাথে মওলানা একত্রে কাজ করেছে। সে সুবাদে আমার পিতার সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো। আমার পিতা আপোষহীন তেজী ব্যক্তি রূপে খ্যাত ছিলো। আমাকে পেলেই মাওলানা আমার পিতার প্রসঙ্গ তুলে সে সমস্ত কথা শোনাতে, যা আমি শুনতে চাইতাম। কারণ, আমার চৌদ্দ বছর বয়সে ১৯৫২ সালে আমার পিতা মারা যায়। তাই পিতার স্মৃতিচারণ শুনতে আমি মাওলানার কাছে অন্যান্য সময় বেশি সময় কাটাতাম। এবার আমি তার সাথে মনের দুঃখে কোনো সৌজন্যও দেখাতে পারলামনা। তাই আমার মনে আফসোস ছিলো। কিন্তু ১৯৬৫ সালে হঠাৎ কারে খাজা নাজিমউদ্দিন ইন্তেকাল করলে খাজা সাহেবের অসিয়ত অনুযায়ী আমি গিয়ে মাওলানাকে এনে খাজা সাহেবের জানাযার ব্যবস্থা করি। খাজা সাহেবের উর্দু কিতাবাদী লালবাগ মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে দান করা হয়। ইংরেজী ও বাংলা সংগ্রহ মাদারীপুর নাজিমুদ্দীন কলেজে প্রদান করা হয়।

দান ভিক্ষার মাদ্রাসা যেখানে মাওলানা শামসুল হকের মতো মানুষকে এরূপ নিষ্ক্রীয় ও অকেজো করে, নবী রাসূলদের তাগুত বিরোধী বিশ্ব আন্দোলনের যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের জন্য এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এপথে পা দেয়ার চিন্তা করতে হবে। তাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে, নমরুদের চাঁদায় যেমন ইব্রাহীম হওয়া যায়না, ফিরআউনের দান নিয়ে যেমন মূসা হওয়া যায়না এবং আবু জেহেল ও আবু সুফয়ানের দয়ায় যেমন মুহাম্মাদ হওয়া যায়না, ঠিক তেমনি তাঁদের আদের্শর "দ্বীনুল ক্বাইয়েমাহ" তাগুতদের চাঁদা খয়রাত ভোগীদের দ্বারা কস্মিন কালেও ক্বায়েম হবেনা।

পিতাদের হালাল কায়িক শ্রমে উপার্জিত রিযিকের অভাবে এদের সন্তানরা পিতার ইম্‌প্রুভমেন্ট না হয়ে পিতাদের ডিজেনারেশন হয়। ফলে এরা অযোগ্য কুসন্তান হয়ে পিতাদের পরিচয়ে দ্বীনের নামে ঘৃণ্য ধান্দাবাজী করে খায়। মাওলানা শামসুল হকের দুটি ছেলে। উমর ও রূহুল আমীন। একটিও তার ধারে কাছেরও হয়নি। হাজার চেষ্টা করেও এদের উন্নত করা যায় না।

পিতাদের সাথে পরিচয়ের ফলে এদের দুর্দশা মনে সয়না। তাই এদের কারো কারো সন্তানদের এক আধবার অর্থনৈতিক সাহায্য করে স্বভাব বদলিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে তওবা করতে হয়েছে। মাওলানা আব্দুর রহীম বে-আমলী জীবনে বই লিখে সন্তানদের তার আয়ে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে যাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি যে আমার কিছুটা দুর্বলতা ছিলো, তা পূর্বের উল্লেখেই অনুমেয়। আমি মনে করেছিলাম যে মাওলানা আব্দুর রহীম তাদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না করলেও তার সন্তানদের দ্বীনের নামে তোলা চাঁদা খয়রাত খেয়ে জন্ম দেয়নি। তাদের স্বচ্ছলতা নেই। তাই তাদের অযোগ্যতা স্বভাবের নয়, অভাবের। তাই দু' একটি অভাব দূর করে মানুষ করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে। যেহেতু তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছেলে দুটি মককায় আমার কাছে যাতয়াত করতো, তাই এদের কাছে এদের বাবা যে এদের গোলাম আযমদের সন্তানদের মতো স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করে যায়নি, তা শুনতাম। দ্বিতীয়টি মোস্তফা আনওয়ার সৌদী আরবে কিছু পয়সা কামাই করে রিয়ালের জগত থেকে হিজরত করে ডলারের মুলুক আমেরিকায় সপরিবারে হারিয়ে গেছে। তৃতীয় পুত্র মোস্তাফা ওয়াহিদুজ্জামান কিছুটা মাদ্রাসায় পড়ুয়া। সে মধ্যে মধ্যে আমার কাছে আসা অব্যাহত রাখে। আসলেই বলতো যে তার বাবা তাদের মানুষ করে যায়নি, শাসন করেনি এবং তাদের প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করে যায়নি। তার ফলে আমার কিছুটা করুণার উদ্রেক হয় ওর প্রতি। একবার কথা প্রসঙ্গে বললো যে, মতিউর রহমান নিযামী ও ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউনুসরা তার বাবার কর্মীরূপে পায়ে হেটে তাদের বাসায় আসলে বাসার পাশের কোনো এক বুড়োর দোকান থেকে দুআনা দামের দুটো পরোটা ও দুআনা দামের একটি মিষ্টি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করতো। আজ তারা রাজার হালে এবং মাওলানা আব্দুর রহীমের আট ছেলে দু-আড়াই কাঠা জমির উপর খুপড়ি তুলেও মাথা গুঁজার ঠাই বানাতে পারছেনা। ব্যাপারটিতে তো মনে দাগ কাটার কথা! ওয়হিদ বিগত দশ বারো বছর ধরে আমার কাছে আসলেই তার ব্যবসায় কারো কাছ থেকে আট থেকে দশ লক্ষ টাকার পুঁজির ব্যবস্থার কথা বলে। তার ব্যবসা হলো এল্যুমিনিয়ামের হাড়িপাতিল তৈরীর কারখানা। বিনিময়ে সে লগ্নীকারীকে মাসিক ঘরে বসে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার লভ্যাংশ দিবে। এক দুবার জোর করে আমাকে তার কারখানাও দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার চাল-চলন, ছেলে-মেয়েদের তার সাধ্যাতীত ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো, নিজের রাজশাহী সিল্কের জামা-কাপড় পরা এবং ছেলেদের ইয়াংকী মার্কা বেশভুষা আমার কাছে প্রতারণা মূলক মনে হওয়ায় আমি তার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। এরপর এ প্রতারক ধার্মিকের ভাব প্রকাশ করে আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। এর মধ্যে ইসলামী

ব্যাংকের সাথে মিলে রংপুরে একটি ভালো এল্যুমিনিয়াম কারখানা ক্রয়ের সুসংবাদ জানিয়ে বলে যে, এবার তার দৈন্যতা কাটার সুবন্দোবস্ত হয়েছে। আমি বললাম, ভালো, করো। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। তারপর সে বছর দেড়েক এ কারখানা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এরপর হঠাৎ করে বছর দেড়েক পূর্বে এসে বলে যে দু'বছর আগের বন্যায় তার অসুবিধা হয়ে তার কারখানার উৎপাদন ব্যহত হওয়ায় রানিং ক্যাপিটালের অভাব পড়েছে। ইসলামী ব্যাংক একটি জামিনদার চাচ্ছে, তাহলেই ব্যাংক, তাকে মূলধন দিবে এবং এরপর আর তার কোনো ক্রাইসিস থাকবেনা। কারখানা ম্যানেজার ও কর্মচারীর হাতে দিয়ে সে মাসে দু'মাসে একবার কারখানার খোঁজ খবর নিলেই চলবে। তারপর সে তওবা তিল্লা করে তার বাবার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্নে আত্মনিয়োগ করবে। এর প্রস্তুতি স্বরূপ সে তার বাবার রূহানীকমৃতি দূর করার জন্য তাবলীগের চিল্লা দিয়ে তাও পূরণ করার সুসংবাদ সময় মতো দিয়ে গেলো।

ওদিকে ইসলামী বাংকের মতো প্রতিষ্ঠান যখন তাকে বিশ্বাস করে টাকা লগ্নী করেছে, তাই আমার কিছুটা আস্থা হলো ওর উপর। ওর সাময়িক অসুবিধা দূরের জন্য কিছু নগদ অর্থের যোগান দিয়ে বগুড়ার একটি কর্মঠ লোককে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। সেও ইসলামী চিন্তা চেতনার যুবক। সে তার বগুড়ার বাড়ী কোলেটারেল করে ওর সাথে পার্টনারশিপে যেতে প্রস্তুত হয়ে বাড়ী মর্টগেজের কাগজ পত্র তৈরী করতে লাগলো। ইতিমধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীমের ছেলে পরিচয়ে ওয়াহিদের প্রতি তার বিশ্বাস গাঢ় হলো। কিন্তু বগুড়ার লোকের মা ও ভাই-বোন ওয়াহিদের কোনো আচরণে তাকে মিথ্যুক ও প্রতারক মনে করে হঠাৎ করে বাড়ীর দলীল দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে। এ অবস্থায় মাওলানা আব্দুর রহীমের পুত্র ফাইল ও কাগজ পত্র নিয়ে ঢাকায় তার বগুড়ার হবু পার্টনার রেজাউল করীমের বাসায় ঝড় বৃষ্টি ও রোদ্রে গিয়ে ধর্ণার পর ধর্ণা দিয়ে তাকে এমন দুর্বল করে ফেলে যে, তাকে নিয়ে ওয়াহীদ আমার কাছে এসে, পারেনা তো পায়ে পড়ে যে আমার বাড়ির দলিল দিয়ে তাকে সাহায্য করি। আমি সারা জীবন যে ধরনের কাজের চতুর্সীমানায়ও যাইনা, আমি যেনো লজ্জায় পড়ে সে কাজ করে ওকে সাহায্য করতে গেলাম। অবশ্য এর মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীমের এক বোনের ছেলে লোক পাঠিয়ে আমাকে সতর্ক করে দেয় যে মাওলানা আব্দুর রহীমের ছেলেরা একটিও মানুষ নয়। তাই আমি যেনো ওর ব্যাপারে সাবধান হই।

কিন্তু ইতিমধ্যে কাজ এতদূর এগিয়ে যায় যে আমি বলতে গেলে মাওলানা আব্দুর রহীমের স্মৃতির লজ্জায় পড়ে জামানতের কাগজে দস্তখত করে দেই। পয়সা পেয়েই প্রতারক তার বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে গিয়ে কারখানায় উঠে। সেখান থেকে লক্ষাধিক টাকা নগদ সরিয়ে তার দ্বিতীয় মেয়েকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে। এল্যুমিনিয়াম ফ্যাক্টরীর আসল লাভ হলো গলানো মালের ছাই থেকে উৎপন্ন এল্যুমিনিয়াম বাট। ওয়াহিদ পূর্বেই ঢাকায় নাখালপাড়ায় তার বাসার কাছে ব্যাংকে তার নিজের নামে একাউন্ট খুলে কারখানা থেকে বাট ঢাকায় বিক্রির নামে পাচার করে তা বিক্রি করে তার ফ্লাট নির্মাণ আরম্ভ করেছিলো। পূর্বে সে প্রচার করতো যে তার বড়ো মেয়ে ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকতা করে ও কোচিং ক্লাশ করে তার আয়ে তার ছেলেদের পড়াচ্ছে এবং তার সংসারও চালাচ্ছে। সে কারখানা থেকে কোনো অর্থ নেয়না। কারখানা দাঁড়িয়ে গেলে লভ্যাংশ নিবে।

তার ব্যাপার স্যাপার লক্ষ্য করে আমার সন্দেহ হলে আমি সরাসরি একবার গিয়ে কারখানায় উপস্থিত হই। হিসাব পত্র ও খাতাপত্র হাতে নিয়ে দেখি ওর সব কিছু মিথ্যা। ওর টেবিলে মেয়ে সম্পর্কে ওরই লেখা বিবরণে জানা গেলো যে ওর বড়ো মেয়ের "এ" লেভেল পড়া মিথ্যা। মেয়ে বাসা থেকে বের হয়ে ঐ লেভেলের মেয়েরা যা করে, সে তাই করছে। পরে আরো খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে মাওলানা আব্দুর রহীমের এ নাতনীটি বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করেছিলো। সেখানে থেকে বিনা তালাকে ধরে এনে মাওলানার আমেরিকা বাসী ছেলের মাধ্যমে তাকে "এ" লেভেল পাশ বলে প্রবাসী এক ছেলের সাথে টেলিফোনে বিয়ে দিয়েছে। মেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা মিথ্যা হওয়ায় তার ভিসা হবে না বুঝতে পেরে মেয়ে আমেরিকান বিয়ে নাকচ করে দিয়ে এখানে এক ছেলে ম্যানেজ করে নেয়। এই মেয়ে ও তার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঐ কারখানার কোয়ার্টারে ওয়াহিদ মিয়া উঠে। ফলে বগুড়ার রেজাউল করীম ঐ অবস্থা দেখে ঢাকায় চলে আসে। এর ফাঁকে ওয়াহিদ নেহারাবাট ঢাকায় পাচার করে তা বিক্রি করে তার তিন রুমের মোজাইক করা ফ্লাট কমপ্লিট করে ফেলে। এভাবে মাওলানা আব্দুল রহীমের ছেলে মুস্তফা ওয়াহিদুজ্জামানের বিনা পুঁজির ব্যবসায় ফ্লাট নির্মাণ হয়, ও কারখানার মূলধন ক্ষয় হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ার জন্য কারখানায় সে তার ম্যানেজার,ফোরম্যান ও আরো লোক পার্শ্বচর রাখে, যাদের বখরা দিয়ে সে তার উদ্দেশ্য সফল করে। আমার ব্যবসায়ী

ছোটো ভাইরা খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে জানালো যে ওয়াহিদ মিয়ার বড়ো মেয়েটি লিভ টুগেদার করে। প্রথমে কথাটি শুনে একটু অবাক হলেও পরে আমি ভেবে দেখলাম, যে মেয়েটির এতো গুলো বিয়ে, তার কোনটি বিয়ে? তার সবগুলোই তো লিভ টুগেদার বিয়ে! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুম আব্বাস আলী খান আমাকে "দোস্ত" বলে সম্বোধন করতো। কাবা ঘরের সামনে বসে মাওলানা আব্দুর রহীম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে বলেছিলো, দোস্ত লোকটি অর্থের শকুন। কথাটি শুনে আব্বাস আলী খানের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তার ছেলে কি তার সত্যায়ন করলো! রাসূল সঃ বলেছেন الولد سر لأبيه ছেলে তার পিতার গোপন চরিত্রের প্রমাণ। রংপুর গিয়ে কারখানায় বসে তার ছেলের কান্ড, তার নাতি-নাতনীদের ক্রিয়া-কলাপ জানার জন্যই কি আমাকে দিয়ে আল্লাহ্ এ ভুলটা করালেন? পুরা মাস দেড়েক কারখানায় থেকে যখন জানলাম যে তার নাতিরা বিভিন্ন জনের পকেট থেকে পয়সা নিয়েছে। তা দিয়ে ফাইভ ফিফটি ফাইভ চুরুট ফুঁকেছে এবং ওয়াহিদুজ্জামানও তা করেছে, তখন তা মদীনায় ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে মাওলানার মুখের সিগারেটের ধুয়ার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ওয়াহিদের মূল রূপ উদঘাটিত হওয়ার পর সে আর আমার কাছে আসেনা। এরা যদি সপরিবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পায় এবং বাইতুল মাল এদের হাতে আসে, তা হলে কি হবে? তা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ্ তা ঘটালেন?

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি অত্যন্ত জরুরী কথা পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি। তা হলো যে প্রত্যেক ঈমানদার মানুষকে স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ্ পবিত্র এবং সকল পবিত্রতা তাঁর থেকে অনুসৃত। এটাকেই ক্বোরআনের ভাষায় "সুব্হান" এবং তা থেকে আমরা "সুবহানাল্লাহ" বলি। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তাআলার পবিত্রতার অনুভূত প্রকাশ হলো প্রত্যেক সুগন্ধী ও সুগন্ধ দ্বারা। এ "সু" ও সুগন্ধই হলো "তাইয়েব"। তাই আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বাক্যের নাম হলো "কালেমা তাইয়েবা" সে সূত্র ও অর্থে তাওহীদবাদি মানুষ নরনারী তাইয়েবূন ও তাইয়েবাত। তার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো "খবীসুন" ও "খবীসাত"। পৃথিবীর সকল মন্দ জিনিস ক্বোরআনের ভাষায় "খবীস"। মন্দ মানুষ "খবীস"। মন্দ কথা "কলেমা খবীসাহ্"। হালাল জিনিস "তাইয়েব"। হারাম জিনিস "খবীস" ও হারাম খাদ্য "খবীস" খাদ্য।

আরবী ও ক্বোরআনের ভাষায় আতরকে "তীব্" অর্থাৎ তাইয়েব বলা হয়। আল্লাহ্ যেহেতু পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতাকে গ্রহণ করেন। তাই শির্ক ও বিদ্আত্ অপবিত্র বলে তা খবীস রূপে আল্লাহ্র নিকট ঘৃণ্য ও অগ্রহণযোগ্য। নবী রাসূলগণ যেহেতু শির্ক ও বিদ্আত্ মুক্ত, তাঁদের অনুসারীরাও শির্ক ও বিদ্আত মুক্ত "তাইয়েবুন"। কাফের, মুশরিক ও বিদ্আতীরা অপবিত্র ও খবীস। "ইন্নামাল্ মুশ্রিকূনা নাজাসুন" মুশ্রিকরা অপবিত্র বই কিছু নয়। (সূরা তওবা-২৮) নাপাক খবীস মানুষদের মস্জিদের ধারে কাছে যেতেও আল্লাহ্ ক্বোরআনে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ তাঁর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে তার মাতৃগর্ভে হারাম রক্তও তার মুখ দিয়ে খাওয়াননি। তাই ঈমানদারদের জন্য হালাল খাওয়া তাদের ঈমানের পূর্ব শর্ত। হালাল খেয়ে হালাল মুখে হালাল কথাই "কালেমা তাইয়েবাহ"।

মু'মিন নরনারীদের আপাদমস্তক হালাল অস্তিত্ব নিয়ে উযু গোসল করে তাদের প্রতিপালকের সামনে সালাতে দাঁড়াতে হয়। উযুর পূর্বে মেস্ওয়াক ও দাঁতন করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে তাইয়েব হয়ে তারা সালাতের মে'রাজে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ায়। ফেরেশতারা তাদের সাথে সালাতে শরিক হয়। পোষাক ও মুখের দুর্গন্ধ যেমন আল্লাহ্র কাছে অপছন্দ, ফেরেশতাদের নিকটও কষ্ট-দায়ক অপছন্দ।

রাসূল সঃ কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদে যেতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। তার দুর্গন্ধে আল্লাহ্, রাসূল, ফেরেশতা ও খাঁটি সালাত আদায়কারীদের কষ্ট হয়।

পৃথিবীর উদ্ভিদের মধ্যে তামাককে আরবীতে "নাবাতুল খবীস্" বলা হয়। তামাক ও তামাক জাত দ্রব্য এমন বিষাক্ত যে, তাতে ও তার ধোঁয়ায় কীট পতঙ্গের মৃত্যু ঘটে। তার দুর্গন্ধে পোকামাকড় পালায়। ধর্মহীন বস্তুবাদী বিজ্ঞানে ধূমপানের বিষে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুহার সকল সংহারী রোগের চেয়ে বেশী বলে বিশস্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ও ধূমপান বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। তামাক পাতা খবীস উদ্ভিদ। তাই বিড়ি সিগারেট, জর্দা কিমাম ও গুল নস্যি খবীস দ্রব্য।

ইসলাম অপচয় ও ক্ষতিকারক পানাহারকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে। তাই ইসলামে বিশ্বাসী সাধারণ জনগোষ্ঠির কর্তব্য হলো তামাকের মতো নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকা। তা ধূমপানের মাধ্যমেই হোক বা পান, সাদা, গুল, জর্দা ও নস্যির আকারেই হোক। আল্লাহ্ ও রাসূলদের দ্বীন প্রচারক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিতদের জন্য ধূমপান ও তামাক সেবন হারামের চেয়েও হারাম। কারণ, তাদের দেখা-দেখি সাধারণ মানুষেরাও তাতে আসক্ত

ও নেশাগ্রস্থ হয়। তা থেকে সংক্রামক ভাবে গাঁজা, আফীম, কোকেন, মদ ও হিরোইন প্রভৃতিতে আসক্ত মানুষ তার মানবতার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইতর প্রাণীর চেয়ে ইতর হয়ে যায়।

ইসলামী আন্দোলন ও তা প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে জড়িত সকল ইমাম, নেতা ও কর্মীদের সপরিবার ধূমপান ও তামাক সেবন থেকে দূরে থাকতে হবে। তা না হলে তাদের অপবিত্র মুখ থেকে ইসলামের পবিত্রবাণী মানুষকে উত্তোরত্তর ধ্বংস ও রসাতলে নিয়ে যাবে। এ লঘুপাপে অভ্যস্তরা গোটা সমাজ ও জাতিকে গুরুপাপের পথ দেখায় বলে এরা নিঃসন্দেহে মহাপাপী। যারা ধূমপান করে, পান বিড়ি ও নিস্প্রয়োজনীয় চা কফি পানে অভ্যস্ত হয়, তারা খুব সহজে অজান্তে ঘুষ ও হারাম খেয়ে ফেলে। কারণ, এ সমস্ত অভ্যাস থাকার ফলে দুষ্ট ও অবৈধ স্বার্থ সিদ্ধিকারীরা আপ্যায়নের নামে, এদের চা, সিগারেট, পান ও বিড়ি অফার করে। এ অভ্যস্তরা তাকে হালকা মনে করে খেয়ে ফেলে। ফলে তারা চলমান ঘুষ গিলে ফেললো! এ ভাবে অফিস আদালতে আপ্যায়নের নামে জনগণের পয়সা অপচয় হয় ও দুর্নীতি চলে। এদের মধ্যে বিশেষ করে ধূমপায়ী লোকেরা তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে বেআদব হয়। বড়ো ছোট এবং স্থান কাল বিবেচনাহীন ভাবে মুখে আগুন দিয়ে বিভিন্ন প্রকারে মুখ থেকে ধুয়া ছোড়ে। তাদের ধোয়ার নিকোটিনে অধূমপায়ী ব্যক্তিরাও বিষপান করে। অনেক সময় এ থেকে অগ্নিকান্ড হয়ে বিরাট ক্ষতি হয়।

একটি লোক পয়সা অপচয় করে মুখে আগুন দিয়ে চার দিকে বিষ ছড়ায়! রাসূল সঃ বলেছেন, ধোঁয়া উঠে এমন গরম খাদ্য তোমরা খাবেনা, ধোঁয়া জাহান্নামের আগুনের আলামত। তাই খাদ্য ঠান্ডা হলে খাবে।

পানজর্দাখোর লোকেরা, বিশেষ করে এক শ্রেণীর পীর ও মোল্লারা এর এ্যাডিক্ট্ হয়। এরা এদের শিষ্য ও ভক্তদের কাছ থেকে পান, জর্দা ও কিমামসহ বিভিন্ন প্রকারের পান বিলাসের মসলা হাদিয়া স্বরূপ গ্রহণ করে। হালাল হারামের তমিয থাকেনা এদের। এরা পান খেয়ে এর পিক্ দিয়ে যত্রতত্র ময়লা করে এবং হাতের চুন দিয়ে দেয়াল ও খাম্বা নোংরা করে।

প্রকৃত ইসলাম মানুষকে উন্নততরো রুচিজ্ঞান দান করে। তাই যারা ধুমপান করে ও পান চিবায়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা আমার বিচারে নিম্নরুচির লোক হিসেবে মর্যাদা হারায়। বর্তমান ইরানের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা সাইয়েদ আলী খামেনীই যখন ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিলো, তখন প্রায় এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আমি তিন ঘন্টা তার সাথে কাটাই। তাতে এ লোকটি তিনবার অগ্নি সংযোগ করে একটিমাত্র সিগারেট ফুঁকে। খামেনীই প্রথমে সিগারেটটিতে অগ্নি সংযোগ করে তার তিনভাগের একভাগ পোড়ে। এভাবে নিভিয়ে নিভিয়ে সে তিনবারে একশলা সিগারেট শেষ করে। তা দেখে লোকটি আমার দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর মানুষ থেকে নিচে পড়ে যায়। অপচয়কারী, দুর্গন্ধ ছড়ানেওয়ালা ও স্বাস্থ্যের হানিকর খাদ্য গ্রহণকারীরা কখনো কোনো সমাজেরই প্রথম শ্রেণীর সম্মানীয় ব্যক্তি হতে পারেনা। ইসলামে তো নয়ই!

আমার বাপ, দাদা ও তাদের বাপ দাদারা কঠোর ধুমপানবিরোধী ছিলো। আমার বাপ, দাদাদের কাছে যারা দোয়া চাইতে আসতো, তাদের ধুমপান, দাড়িকাটা, লম্বা চুলরাখা, গানবাদ্য শোনা এবং মেয়েদের বেপর্দা থেকে তওবা করে তার উপর তিনমাস আমল করে এসে তওবা প্রমাণ করে দোয়া নিতে হতো। তারপর তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা হতো। অন্যথা তাদের কোনো দান গ্রহণ করা হতো না। আমি আমার জীবনে কখনো সিগারেট বিড়ি দূরে থাক, এক খিলি পানও মুখে দেইনি। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যেনো আমার পরবর্তী বংশধরদের এ বিষাক্ত জাহান্নামী ধুমপান থেকে হেফাজত করেন। আমীন!

দুঃখের কাহিনী এখানে শেষ নয়। আল্লাহ্ বলছেন, তিনি মন্দ কথা প্রকাশ পছন্দ করেন না। তবে হ্যাঁ যুল্ম হলে অবশ্যই তার প্রকাশকে তিনি পসন্দ করেন। لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (সূরা নিসা -১৪৮) মানুষের দুটি অপরাধ আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করেন না এবং করবেন না বলেছেন। অপরাধ দুটির একটি হলো আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, অপরটি হলো জনগণের সম্পদ অন্যায় ভাবে খাওয়া। এ কথাটাই আলী রাসূল সঃ এর কাছে থেকে শুনে বলেছে, الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم কুফরীর রাজ্য টিকে থাকতে পারে, কিন্তু যুল্মের রাজ্য টিকে থাকে না। কাফের আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে নিজেই খোদা হয়ে প্রজাদের উপর ন্যায়বিচার করলে পৃথিবীতে আল্লাহ্ সে রাজা ও তার প্রজাদের কল্যাণ দেন। পরকালে এরা কিছু পাবেনা। কিন্তু পৃথিবীতে যারা যুল্ম করে, আল্লাহ্ তাদের পৃথিবীতেও শাস্তি দেন না এবং পরকালেও শাস্তি দেবেন না। আমরা বর্তমান বিশ্বে ইউরোপ,

আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি কাফের সমাজে জনকল্যাণমূলক ন্যায়বিচারের ফলে ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট দেখতে পাই। কিন্তু মিথ্যা দাবীদার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে জনসম্পদের লুটপাটের ফলে সে সমাজকে পার্থিব জাহান্নাম রূপে দেখতে পাই। পূর্বোক্ত কাফের রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক শেষোক্ত রাষ্ট্রে কখনো বাস করতে আসবেনা। কিন্তু শেষোক্ত রাষ্ট্রের লোকেরা সুযোগ পেলে কেউ তাদের দেশে থাকবেনা। সবাই দেশ ত্যাগ করে কাফের দেশে চলে যাবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের লোকদের কানাডা বা আমেরিকায় একটি বাড়ী, একটি গাড়ি ও জীবিকা প্রদানের ঘোষণা দিলে এদেশ দুটিতে একটি লোকও থাকবে?

দুনইয়া ও আখেরাতের কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নাম ইসলাম। আখেরী নবী সঃ তার চূড়ান্ত আদর্শ। রাসুল সঃ এর বিদায়ের পর ক্বোরেশী গোত্রবাদের যুল্মের উপর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে কি রক্তপাতের দ্বারা সমাজ নরকের রূপ নেয়নি? কিন্তু উমর ইবন আব্দুল আযীয তার উর্দ্ধে উঠে রাসূল সঃ এর আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠার ফলেই সোয়া দু'বছরের মধ্যেই বিশাল সাম্রাজ্যে এমন সমৃদ্ধি ও শান্তি এসেছিলো যে দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত খুঁজেও দান গ্রহণের জন্য কোনো দরিদ্র পাওয়া যায়নি। এখনো তা অনুসরণ করলে সে শান্তি আসবে।

সাধুর হাতে ধর্ম পড়লে সে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, হয়েছে এবং হবে। চোরের হাতে ধর্ম পড়লে নরকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণচোর ধর্মচোরদের উৎখাত করে সে আল্লাহ্‌র রহমতের ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ বই লিখছি। মক্কায় বসে বিশ্বের ধর্মচোরদের দেখে সে মক্কা ত্যাগকরে দেশে এসে দীর্ঘ বিশ বছর আল্লাহ্‌র সাথে বুঝাপাড়া করে কলম ধরেছি। "সাধু বরণ ও অসাধু নিধন" এ যজ্ঞে কারো মুখ চাওয়া হবেনা। ইনশা আল্লাহ্। বাংলার মাটি থেকে যাতে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদী মসীহ ও মাহদীর কাফেলা তৈরীর আযান উত্থিত হয়, সে দোয়া ও দাওয়া নিয়ে এ মিথ্যার মূর্তি নিধন। আল্লাহুম্মা আমীন। দ্বিতীয় মদীনা রূপে ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি তেমনিই ব্যথা পেয়েছি, যেমন ব্যথা পাই "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বলে রাসূল সাঃ এর মাদীনাকে ভাঙ্গার ঘটনা স্মরণ করে। সাক্বীফা বনু সা'আদায় তাই করা হয়েছিলো। জিন্নার পাকিস্তান ভেঙ্গে মুজিবের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে আমার কানের মাছিও নড়েনি। বরং তাতে আমি খুশীই হয়েছি। এখন যদি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যায়, তা হলে আমি মহাখুশী হবো। কারণ এ দু'টি রাষ্ট্র আমাদের মুনাফেক্বীর প্রমাণ। তাই যতো শীঘ্র এ দুটো দুষ্টক্ষত আমাদের ঈমানের দেহ থেকে মুছে যায়, ততোই কল্যাণ। তাতে আমরা সুস্থ হবো। মহাবিজয়ের মহাসংগ্রামে একা হলেও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর পতাকা নিয়ে আমরা নামবো। ইন্শা আল্লাহ্। এবার সকলকে হাসানোর একটি কথা বলবো। তা হলো যে আমি মক্কা গিয়ে কাবার পরিবেশে মনে মনে বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণ প্রদক্ষিণ করে একদিন বর্তমান থেকে অতীতে চলে গিয়ে মনের বাসনায় বাবা আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সঃ হয়ে যাই। সে অবস্থায় কাবায় তাওয়াফ করে মুল্তাযেম ধরে কায়মনে দোয়া করি, "ইয়া রাব্বা হাযাল্বাইত, ইয়ারাব্বাল কা'বাহ্ ওয়া ইয়া রাব্বাল আলামীন! যারা আপনার দ্বীন পৃথিবীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে ভেঙ্গেছে, আপনি তাদের যে যেখানে আছে, তাদের নিপাত করুন। যেমন আপনি আপনার নবীর আদর্শ বিকৃত করার জন্য ক্বোরেশ, উমাইয়া ও আব্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আমীন"।

তারপর আমি দেখেছি যে, পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী সকল দেশী-বিদেশী নায়ক ও নায়িকা একের পর এক খতম হয়েছে। পরাশক্তি রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়াও ধ্বংস হয়েছে। আমি মনে মনে মহা খুশী। ভাবি যে আমার দোয়াই ক্ববুল হলো, না আল্লাহ্‌র সুন্নাত বা বিধানের সাথে আমার চাওয়া মিলে গিয়েছিলো! ফকীরের দোয়া ক্ববুল হলো, না ঝড়ে বক মরলো, আর ফকীর মনে করলো যে, তার ক্বেরামতি ফললো! যাই হোক, বক তো মরেছে? তাতেই তৃপ্তি। **এখন শেষ দোয়া ও চাওয়া হলো যে ইয়া আল্লাহ্! আপনি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান, যে কোনো এক দেশ থেকে আপনি আমাদের একজন ইমাম দিন, যার হাতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের যালেম রাষ্ট্রীয় সীমা মুছে গিয়ে একটি মাদীনা হয়ে এখান থেকে বিশ্বরহমতের মহা বিপ্লব সূচিত হয়। যেমন বেহেশত থেকে বাবা আদমের পতন ভারতে হয়ে এখান থেকে তাঁর সন্তানেরা গোটাবিশ্বে মানববসতি করেছে। এ দোয়াও ক্ববুল। কারণ, এটাই আল্লাহ্ করবেন। তাওরাত, বাইবলে ও ক্বোরআন এ কথাই নিশ্চিত প্রমাণ করে।**

বিধবা মা, প্রাণের চেয়েও বেশী যত্নকরে পালা ছোটো ভাই বোন ও স্ত্রী শিশু কন্যা দেশে ফেলে মক্কার মোয়াল্লেম চোর ও বিশ্ব থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মী নামের পকেটমারদের পর্যবেক্ষণে আমি এবার আমাদের দেশের অধ্যাপক গোলাম আযমের, যার আমি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, এমন কয়েকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

"আমরা কারো কাছ থেকে চান্দা ও অনুদান নেবো না" এ অঙ্গীকারে বিশ্বমুসলিম সমস্যার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থা জানানোর উদ্দেশ্যে আমি, অধ্যাপক গোলাম আযম ও ব্যারিষ্টার কোরবান আলী একজন প্রাক্তন সৌদী মন্ত্রী ও দৈনিক পত্রিকার মালিক শেখ আহমদ সালাহ্ জাম্‌জুমের সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাত করতে যাই। আমাদের পূর্ব শর্ত, কারো কাছ থেকে দানভিক্ষা নেবো না। তা ভঙ্গ করে অধ্যাপক আযম সর্বপ্রথম বাংলাদেশ হওয়ায় তার দলের যারা বিপদ গ্রস্থ হয়েছে, তাদের বর্ণনা সম্বলিত একটি সাহায্যের আবেদন পেশ করলে শেখ জামজুম তারপ্রতি দৃষ্টি দিয়েই বলে উঠলো, We are tired of hearing such stories. Every body comes to us with sole purpose of money and that's all. আমরা এ ধরনের গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত। প্রত্যেকেই এ সমস্ত বলে চাঁদা নিতে আসে। এ মন্তব্য শুনে আমি খুব অপমানিত বোধ করে দুঃখের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের দিকে তাকালাম। তারপর শেখ জামজুমের মুখ থেকে কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই বললাম "আমরা চাঁদার জন্য আসিনি। আমাদের দেশ এক সময় স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ ছিলো। তখন আরবমরু চরম দরিদ্র ছিলো। দু'শ বছরের উপনিবেশবাদের লুন্ঠনে আমাদের দেশ নিঃশেষিত হয়। তারপরও যা সর্বনাশ করে, তা হলো যে উপনিবেশবাদ এসে কিছু দেশীয়শোষক জন্ম দিয়ে তাদের ওদের শিক্ষা দিয়ে যায়। উপনিবেশীরা বিদায় কালে ঐ জাতির শত্রুদের হাতে দেশ হস্তান্তর করে যায়। ফলে পাকিস্তান একদিনের জন্যও জনগণের রাষ্ট্র হয়নি। পাকিস্তান হলে পর ওরাই দেশকে লুটেছে। তারপর পুনঃ ওদের স্বার্থেই পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ বানিয়েছে। এ বাংলাদেশও কোনো দিন জনগণের কল্যাণের রাষ্ট্র হবেনা। উপনিবেশবাদের আবর্জনায় জন্মানো পাশ্চাত্য শিক্ষার কুশিক্ষিতরাই জাতির হাড়ের মজ্জাটুকুও খেয়ে নিঃশেষ করবে। অশিক্ষিত জনগণ দেশ ও জাতির মাটি। এরাই তৃণমূলে জাতির উন্নয়ন ও উৎপাদনের মূলধন। উপনিবেশবাদের কুশিক্ষায় শিক্ষিতরা ওদের নিলামে বিক্রি করে খায়। তোমাদের আরবমরু পূর্বে সম্পদশালী ছিলো না। তাই উপনিবেশবাদীরা তোমাদের দেশ দখল করেনি। ফিলিস্তিন, লেবানন ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল উর্বর বলে তা উপনিবেশবাদীরা দখল করেছিলো। জায়ীরাতুল আরব, বিশেষ করে নজদ ও হিজায অনুৎপাদনশীল মরুভূমি হওয়ায় "লায়াবিলিটি স্টেট" হবে বলে তোমাদের দেশ তারা দখলকরে নেয়নি। এখন পেট্রোল আবিস্কৃত হওয়ায় কিন্তু তোমাদের দেশ তাদের চাইই। কিন্তু তারা তোমাদের দেশ পূর্বের মতো সামরিক অভিযানের মাধ্যমে নিবেনা। তোমাদের পয়সাই তোমাদের নতুন প্রজন্মকে ওদের শিক্ষা দিয়ে সাত সমূদ্রের ওপার থেকেই তোমাদের সন্তানদের মাধ্যমে নিকৃষ্টতম শাসন শোষন করবে। আমাদের দেশ অশিক্ষিত জনগণ ভাঙ্গেনি। তোমাদের দেশও অশিক্ষিতরা নিলাম করবেনা। করবে ওদের শিক্ষায় শিক্ষিত তোমাদের সন্তানরা। সে কথাটিই বলে সতর্ক করতে আমরা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তোমাদের কাছে আমাদের দুঃখের কথা বলে ভিক্ষা করতে আসিনি। এসো, আমাদের অভিজ্ঞতা ও তোমাদের আল্লাহ্‌প্রদত্ত অর্থে আমরা মুসলিম উম্মাহ হিসেবে পুনর্জাগরিত হতে পারি, এমন শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলি।"

আমার পর ক্বোরবান আলীও বললো। অধ্যাপক গোলাম আযমও পরে আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বললো বটে, কিন্তু তাতে কোনো প্রাণ ছিলোনা। আমাদের কথায় শেখ আহমদ সালাহ জামজুম প্রথমে যে ভাবে অপমানকর মনোভাব পোষণ করে কথা আরম্ভ করেছিলো, তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে পরস্পর শ্রদ্ধাবোধের পরিবেশে সাক্ষাৎ শেষ হলো। কিন্তু কপাল মন্দ। সাক্ষাৎ শেষ হতেই শেখ তার দেরাজ খুলে তার চেকবই বেরকরে একটি চেক লিখে তুলে ধরতেই আমাদের অধ্যাপক গোলাম আযম তা লুফে নিয়ে তার ব্যাগে পুরলো। অপমানবোধে আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তখন সৌদী এক রিয়ালের মূল্য ছিলো আড়াই টাকা মাত্র। এক হাজার রিয়ালের লোভে সেদিন যে অপমানবোধ নিয়ে ফিরেছিলাম, আজো ভুলিনি। কিন্তু ঐ নির্লজ্জ লোকটি যে আজো তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভে ইসলামের সর্বনাশ করছে, তার হয়তো কোনো অপরাধবোধই নেই। ইসলামী ইমামত নবীদের মিরাস বা উত্তরাধিকার। নবী রাসূলদের নিকট অহী আসতো। আখেরী নবী সঃ এর মে'রাজ হয়েছে। তাঁর দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত দ্বীনের বিশ্বনেতৃত্ব দেয়ার জন্য যেখানে শাহীনের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মহাকাশে উড্ডয়নক্ষম বিরল বাজপাখী হওয়া প্রয়োজন, সেখানে ডাষ্টবিন ঘাটা কাক দিয়ে কি সে নেতৃত্ব কল্পনা করা যায়? আমরা কতো হতভাগ্য যে এ ধরনের আবর্জনার চিল কাক ও শকুন প্রকৃতির মোল্লা মৌলভী বা অর্ধ-শিক্ষিত বংশানুক্রমে বিকৃত মস্তিস্ক তথাকথিত প্রফেসরের চক্রান্তে ঘুরপাক খাচ্ছি!

উপরোল্লেখিত ঘটনাটি ১৯৭৩ সালের সম্ভবতঃ জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর পূর্বের

কথা। তখন আমি জামজুমকে যা বলেছিলাম, তা আজ একশ' ভাগ সত্য প্রমাণিত। সম্পূর্ণ আরববিশ্ব আজ বিশ্ব ইয়াহুদী খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের হাতে ক্রীতদাস। বাংলাদেশ থেকে ইসলামী পূর্ণজাগরণের আন্দোলনের কথা ভাবা যায়। কিন্তু কোনো আরবদেশে কি তা কল্পনাও করা যায়? যে আফগান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত না হয়ে বিজয়ী হলে ভারত থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান সহ গোটা আরবদেশ রাশিয়ার সামারকান্দ ও বোখারা হতো, সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আরব যোদ্ধারা তাদের দেশে ফেরত যেতে পারছেনা। গেলেই খতম! ভিক্ষা, সাদক্বা, যাকাত, চাঁদা ও হারাম খেলে মানুষের রূহ মরে যায়। মানুষের স্মৃতি শক্তি থাকেনা। সে জন্যই হয়তো সাদক্বা যাকাত আল্লাহ্ মিসকিন দরিদ্রদের জন্য বৈধ করলেও নবী রাসূল এবং ইসলামী ইমামদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের রূঢ় উপহাস যে ইসলামের নেতৃত্বের দাবিদারদের আজ উচ্ছিষ্ট ব্যতীত কোনো জীবিকা নেই। ধিক্ শতো ধিক এদের উপর।

অধ্যাপকের দ্বিতীয় ঘটনায় আসা যাক। ভদ্রলোক লন্ডনে তার কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কারণ সে তো আর মক্কায় নাযিল হওয়া ক্বোরআনভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার লোক নয়! সে ইবলিস্ কর্তৃক ইউরোপ-আমেরিকার ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের উপর অহী করা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মানসপুত্র। তাই সে তার মক্কা ও ক্বেবলায় তার কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তবে পেট্রোডলারের চাঁদার জন্য আরব দেশে আসা যাওয়া করে। সে তো আর কোনো শ্রমকরে হালাল উপার্জনে বিশ্বাসী নয়! তাই ইসলামের নামে চাঁদাতোলাই তার পেশা ও জীবিকা ছিলো।

মক্কায় রাবেতা হজ্জ মৌসূমে ও রমজান মাসে বিশ্বের ইসলামী চাঁদাবাজ ও পেশাদারদের সম্মেলন করে থাকে। এটা সৌদী রাজতন্ত্রের প্রোপাগান্ডার একটি রুটিন কর্মকান্ড। তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশথেকে তাদের তালিকাভুক্ত লোকদের আসা যাওয়ার টিকেট ও হোটেলের খরচ বহন করে সৌদী সরকার। প্রচলিত ওমরা করা ও মাদীনা যেয়ারত ছাড়াও প্লেনে করে গিয়ে সৌদী বাদশার সাক্ষাৎ নসীব হয়। এ উপলক্ষে উদরসর্বস্ব ইসলামী চিন্তাবিদরা রাবেতা থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু অনুদানও পায় এবং নতুন নতুন পরিকল্পনা ও প্রকল্প পেশ করে রাবেতার অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারী অনুদানও পায়। অনেকে এ সুযোগে এসে কুয়েত, আমীরাত, সৌদী আরব সহ আরবদেশের ধনী শেখ ও ব্যবসায়ীদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে রমজান মাসে যাকাত উসুল করে থাকে। কারণ, আরবরা সাধারণতঃ রমজান মাসে যাকাত দেয়।

এমনি এক সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযম মক্কা আসে। এবার লন্ডনে একটি বড়োসড়ো ইসলামী প্রতিষ্ঠান দাঁড়করার কাগজ পত্র তৈরী করে নিয়ে এসেছে। তখন সালেহ্ কায্যায নামের এক ব্যক্তি রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল ছিলো। লোকটি ইংরেজী জানেনা। তার মাতৃভাষা আরবীই জানে। সম্মেলন শেষে অধ্যাপক বললো যে সে যেহেতু আরবী জানেনা এবং শেখ সালেহও ইংরেজী জানেনা, তাই আমি যেনো তার সাথে গিয়ে অনুবাদক রূপে তাকে সাহায্য করি। আমি গেলাম। সাক্ষাতের শুরুতে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর অধ্যাপক আযম লন্ডনে অনারবদের আরবী ভাষা শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য ইসলামী কর্মকান্ডের বিশ-তিরিশ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রকল্পের কাগজ পত্র দিতেই তা শুনে শেখ সালেহ্ কায্যায্ ক্ষেপে গিয়ে কাগজগুলো ছুড়ে মেরে অপমানজনক ভাবে বলতে লাগলো, "প্রফেসর, তুমি নিজে আরবী জানো না। তুমি অন্যদের আরবী শিক্ষা দিবে? আরব দেশের দূতাবাসসমূহের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাটে যে সে কাজ তোমার করতে হবে! যাও তুমি তোমার কাজ করো। এগুলো কিছুই হবেনা।"

আমার উপর পূর্বের চেয়েও বড় বাজ পড়লো। লজ্জা ও ক্ষোভে আমি থ'মেরে গেলাম। অধ্যাপক আযম শেখ সালেহের ছুড়ে মারা কাগজগুলো গুছাতে লাগলো। তারপরও আল্লাহ্র এ বান্দাটি আমাকে বলতে বললো যে শেখ তার লন্ডন-জিদ্দা ও লন্ডন টিকেটটি লন্ডন-জিদ্দা-কুয়েত-জিদ্দা-লন্ডন করে দিলে অধ্যাপক কৃতার্থ হবে। আমার এর তর্জমা করতে হলোনা। শেখ সালেহ তা বুঝে ফেলে বললো, "হাযা বাসিত্ তাইয়েব, রুহ ইলা তিজানী। ঠিক আছে, তা করে দিচ্ছি। তিজানীর কাছে যাও। আমি তাকে বলে দিচ্ছি।" এ বলে সে তার সহকারী তিজানীকে ইন্টারকমে বলে দিলো।

তখনই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম। দাস্ ফার, নো ফারদার। এখানেই শেষ। আর নয়। এ লোকের সাথে আর কোথাও যাবো না। রাবেতার শেখ সালেহের সাথে আমার পূর্বের পরিচয় ছিলো। কাবায় প্রায়ই দেখা হতো। তখন মক্কায় আমি বলতে গেলে একা। আমি পাকিস্তানীদের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলি। জিন্নাহ থেকে

ইয়াহ্ইয়া খানকে ভুট্টোসহ কবর দেই। জয় বাংলাওয়ালাদেরও সত্য বলতে ছাড়িনা। শেখ সালেহ সহ আরবদের সাথে বসলে আমি ওদের কোনো তোয়াক্কা না করে সত্যের তরবারী চালাই। তাই ওরা আমাকে পাকিস্তানী, ভারতীয় ও বাঙ্গালী জাহিলিয়্যাতের উর্ধ্বে ভাবতে আরম্ভ করে। আমি সর্বদা আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে ওদের সাথে চলি। রাবেতার সম্মেলন চলাকালে এদের সম্মেলনগুলোতে আগতদের জন্য বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করা হয়। আমি দেশ বিদেশ থেকে আসা তীর্থের কাকগুলোকে দেখার জন্য আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ে সহায়ক হবে মনে করে সম্মেলনে যোগ দিতাম। কিন্তু এদের ভোজসভায় একদিনও যোগ দেইনি। তখন আমার টাকা পয়সার দুর্দিন যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন, ততোটুকু খেয়ে জীবনধারণ করছি। রিচফুডের গন্ধ নাকে আসতো। কিন্তু তখনো তার জন্য জিভে পানি আসেনি। বরাবরই আল্লাহ্ আমাকে লোভের উপর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন। সেজন্য তাঁর শুকুর।

রাবেতায় শেখ সালেহ্ কায্যাযের কাছ থেকে ফেরত আসার সময় আমি অধ্যাপক আযমকে বললাম, “ভাই ভিক্ষা ছাড়ুন। ভিক্ষা করে আল্লাহ্র পথে “খবীস” পয়সা খরচ করলে তা তিনি ক্বুবুল করেন না। তিনি তাইয়েব, তাই শুধুমাত্র “তাইয়েব” মাল ক্বুবুল করেন। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

হে ঈমানদাররা, তোমাদের উপার্জিত “তাইয়েব” থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করো। (সূরা-বাকারা-২৬৭) ভিক্ষার অর্থ মালের আবর্জনা, ওয়াসাখুল মাল। সাধারণ অর্থনীতিতেও ভিক্ষার উপার্জিত অর্থ, অর্থই নয়। Beggars money is no money. দরকার হলে আমরা রাস্তা ঝাড়ূ দেই। ফেরী করি বা যে কোনো কায়িক পরিশ্রম করে তার উপার্জন থেকে আল্লাহ্র পথে তা খরচ করবো। তাতেই আল্লাহ্ বরকত দিবেন। আমি চাঁদা, ভিক্ষায় নেই। আমি পৃথিবীর সকল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলবো। জিন্নাহ থেকে ইয়াহ্ইয়া খাঁ পর্যন্ত সবাইকে প্রথমে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী করবো। তারপর বাঙ্গালীদের ও শেখ মুজিবকে। আমার এমন কথারই যেনো অধ্যাপক আযম অপেক্ষা করছিলো। তাই আমাকে বললো, “ভাই, জিন্নাহ, ইয়াহ্ইয়া ও ভুট্টোর বিরুদ্ধে বলা আমাদের নীতি নয়। আমরা বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য ইসলামী কাজ করবো। এ কাজে পাকিস্তানী, বিশেষ করে পাকিস্তানী জামাতের দেশে বিদেশে যে জামাতী নেটওয়ার্ক রয়েছে, তাদের সাহায্য আমার জন্য অপরিহার্য। আপনি যেভাবে পাকিস্তানী ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলেন, তাতে আমরা পাকিস্তানীদের সহযোগিতা পাবোনা। আপনাকে পাকিস্তানী সার্কেল ভারতের চর বলে। আবার কেউ পাকিস্তান আর্মির চর বলে। আমি তাদের বলছি, এ লোক ভারতের চর হওয়ারতো প্রশ্নই উঠেনা, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীরও চর হতে পারেনা। কারণ, চর হলে যাদের চর, তাদের অনুগত অধীনস্ত হতে হয়। এ লোক জেনারেলদের স্যার স্যার করা দূরে থাক, তাদের নাম ধরে ডাকতো। এ ধরনের লোক কারো এজেন্ট হতে পারেনা। তাই আপনি আপনার মতো কাজ করুন। আমি আমার মতো কাজ করি। আমার একটি দল আছে। তাদের মত নিয়ে আমার কাজ করতে হয়। আপনার কোনো দল নেই। আপনি একাই একদল”। আমি অধ্যাপক গোলাম আযমের কথায় খুশী হয়ে বললাম, আলহামদু লিল্লাহ। যে কোনো মূল্যে, যে কোনো পরিস্থিতি এবং যে কোনো ব্যক্তি ও শক্তির সামনে শুধুমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করে সত্য বলা আমার কাজ। সে পথেই আমি চলবো। ঠিক আছে। আপনি আপনার পথে চলুন।

এ মুহূর্তে অধ্যাপক গোলাম আযম আমার একটি এমন উপকার করলো যে তার জন্য আমি তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্র দরবারে তার জন্য শুকরিয়া আদায় করি। আমি আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টিগত ফিত্রাতে ভীষণ শক্ত শৃঙ্খলাবাদী। আমার বাবা ও দাদা, এমনকি তাদের বাপদাদারাও কঠোর শৃঙ্খলাবাদী মানুষ ছিলো। দাদার বাবা তার সাত ছেলের মধ্যে একছেলে দ্বীনীশিক্ষার বিনিময়ে মানুষের বাড়ী দাওয়াত জিয়াফতে যেতো বলে তাকে ত্যাজ্য করে গিয়েছে। তার ওয়ারিশানের মধ্যে তার নামও রাখেনি। তাকে খারিজ করে গিয়েছে। বড়ো ছেলে এলাকার মুসলমানদের সমাজপতি ছিলো। তাদের আদর্শ ছিলো যে, বেতনভুক লোকের পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না। তাই এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বেতনহীন ইমাম নিযুক্ত করে দিয়েছিলো। দু'জায়গায় খোতবা পড়ার মতো আলেম না পেয়ে সেখানে সূরা ক্বেরাত জানা লোকদের ইমাম নিয়োগ করে সে দু'মসজিদে নিজে খুতবা দিয়ে এসে তৃতীয় মসজিদ, অর্থাৎ বাড়ির জুমা মসজিদে এসে খুতবা দিয়ে তাতে নিজে ইমামতি করতো। আমার দাদা নতুন বাড়ী করে তাতে নিজের সন্দেহাতীত হালাল পয়সা দিয়ে মসজিদ তৈরী করে। মসজিদ নির্মাণে অন্য কাকেও শরীক করতে হয় বলে জানামতে

হালালভোগী এক কৃষক থেকে একটি সোনালুগাছের খাম্বা নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছিলো।

আমি ছোটকালে বাপ ও ভিটামাটিহারা হলেও পারিবারিক ঐতিহ্যের নিয়ামানুবর্তিতা ছাড়তে পারিনি। ছাত্র রাজনীতিকে আমি ছেলেধরার মতো মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ মনেকরি। কারণ, ছাত্র রাজনীতির পান্ডারা শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতা, অভিভাবক ও গুরু শিক্ষকের অবাধ্য বানিয়ে ফেলে। ফলে এরা পরিবারের কুলাঙ্গার হয়। আমার ইয়াতীম দশার অগ্নিপরীক্ষায় বহু কষ্টকরে ছোটো ভাইদের পড়া লেখা করাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে জামাতী ছাত্রসংঘ ওদের পড়া লেখার সাধনার সর্বনাশ করে দেয়। ফলে একাত্তর সালে আমার অবাধ্য হয়ে তারা পড়া-লেখা বাদ দিয়ে রাজাকার বাঁদরবাহিনীতে যোগ দেয়। ফলে বাংলাদেশ হলে বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে নিয়ে আমি সমস্যায় পড়ি। ছোটোটি ছাত্র সংঘ করলেও ফাঁকিবাজ স্বভাবের ছিলো বলে ওটা বাঁদর বাহিনীতে যায়নি।

দ্বিতীয়টিকে লন্ডনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম থেকে কিছু পয়সা ধার করে লন্ডনে আব্দুল আযীয নামের এক ছেলেকে ওর ভর্তি ও টিকেটের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। আব্দুল আযীয রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত থাকাকালীন নিজের পরিবারের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান রক্ষায় আল বদর করেছিলো। একাত্তরের পর আমি চট্টগ্রাম থাকা কালীন উক্ত আব্দুল আযীয সহ আরো ওর মতো ক'জন আমার বাসায় ছোটো ভাইদের সাথে আসা যাওয়া করতো এবং খাওয়া দাওয়াও করতো। সে সুবাদে ওরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমিও ওদের প্রতি স্নেহশীল ছিলাম। আমি মক্কায় চলে আসলে আব্দুল আযীযও কোনো প্রকারে লন্ডনে পৌঁছে ওখানে পড়ালেখা আরম্ভ করে। ওকে জিয়াউদ্দিনের লন্ডনে ভর্তির দায়িত্ব দিয়ে অধ্যাপক আযম থেকে ধারকরা চাঁদার পয়সা দেয়া হয়েছিলো। কথা ছিলো যে আমি পরে সে পয়সা ফেরত দিবো। অধ্যাপক আযম যখন দেখলো যে তার থলেতে পড়ার লোক যেহেতু আমি নই, তাই আমার ভাইরাও তাদের থলের বিড়াল হবেনা, সে জন্য সে আগে ভাগেই বুঝতে পেরে আব্দুল আযীয থেকে তার ধার দেয়া পয়সাটা ফেরত নিয়েছিলো। যাতে জিয়াউদ্দীন আর লন্ডনে গিয়ে পড়ালেখা করতে না পারে।

আল্লাহ্‌র রহমতে আমার পরিবার একটি কলঙ্ক থেকে রক্ষা পেলো। হতে পারতো যে জিয়াউদ্দীন বিলাত গিয়ে পড়া-লেখা করে অন্যান্য জামাতীদের মতো আন্তর্জাতিক ইসলামী পেশাদার প্রতারক হতো। ছাত্রসংঘ ও জামাত করা কোনো ছেলের লন্ডনে যাওয়ার পরও কোনো কেরিয়ার ডেভেলপ করেনি। ছাত্র রাজনীতির বিষফলে ওরা ওখানে গিয়েও পড়ালেখা করে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ না হয়ে তাদের নেতাদের মতো আরবদের দান-দক্ষিণায় ইসলাম বেচা-কেনার দোকানদার হয়েছে। অথচ এরা অধিকাংশই দেশে মেধাবীছাত্র ছিলো। ঐ দোষে আমার ছোটো ভাইদেরও দেশে সন্তোষজনক লেখা পড়া হয়নি। ছোটোটি বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইউসুফ ডাক্তার হলেও কোনো যোগ্য চিকিৎসক না হয়েই আমার সম্পূর্ণ নীতি ও আদর্শ বিরোধী পন্থায় অর্থোপার্জন করে দেশে ফিরে পোষাক শিল্পের মতো গর্হিত ব্যবসায় জড়িয়েছে। আমি মাত্র ১৪ বছরে পিতাহারা হয়ে বিধবা মা ও ভাইবোনদের জন্য জীবিকার সন্ধানে বের হলেও জ্ঞানার্জনের তপস্যা থেকে কখনো বিচ্যুত হইনি। নিজে নিয়মিত পড়া লেখার সুযোগ না পেলেও রাস্তায় পাওয়া লবনের ঠোঙ্গায় কি লেখা, তা পড়তেও কখনো ভুল করিনি। সৌদি আরব থাকাকালীন মক্কায় ডাষ্টবিনে ফেলা স্কুলের পাঠ্যবই কুড়িয়ে এনে বাসায় জড়ো করে তা পড়েছি। সৌদি আরবের ভূঁইফোড় ধনীদের ছেলে-মেয়েরা তাদের বিনা পয়সার পাঠ্যপুস্তক বর্ষশেষে পরীক্ষার পর গাট্টি বেঁধে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে। আমি সেগুলো তুলে এনে সংগ্রহ করে তা পড়ে বাছনী করে দেশে এনে আমার সন্তানদের তা পড়িয়েছি ও পড়াচ্ছি। সৌদিদের পয়সা হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের বিদগ্ধ ইসলামী স্কলাররা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পেয়ে সৌদীদের জন্য চমৎকার পাঠ্য বই রচনা করেছে।

আমার বিচারে সৌদী পাঠ্যপুস্তক মুসলিম প্রজন্মের জন্য মানের দিক দিয়ে সর্বোত্তম পাঠ্যক্রম। তার মধ্যে যেখানে যেখানে আরবী জাতীয়তাবাদের লাত-মানাতের চিহ্ন রয়েছে. আমি সেখানে লালদাগ দিয়ে পাশে টিকা নির্দেশনা দিয়ে সংশোধন করে নিয়েছি। তাই আল্লাহ্ তা'আলার পাঠ্যবই আল ক্বোরআনের সাথে মিল রেখে প্রকৃতিতে ছড়ানো জ্ঞান আমার শিক্ষা-দীক্ষার মূলধন। সে শিক্ষা দিয়েই আমি সন্তানদের শিক্ষিত করে আল্লাহর দরবারে দায়মুক্ত হচ্ছি। মানুষ নিজের উপর অপরকে কল্পনা করে থাকে। আমি আমার মাপাজীবনে পোষ্য ছোটো ভাইদের সে মানদন্ডে কল্পনা করেছি। সর্বকনিষ্ঠ ইউসুফকে ডাক্তারী পড়ালেও তাকে ব্যতিক্রমধর্মী রুগ্নের-সেবক চিকিৎসক রূপেই আমি দেখতে চেয়েছিলাম। মক্কায় থাকাকালীন কষ্টার্জিত অর্থে লন্ডনের হেফার্স থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেটেস্ট সংস্করণের বই তার জন্য সরবরাহ করেছিলাম। কিন্তু হতভাগা তা পড়ে ভালো ফলাফল করে যোগ্য ডাক্তার না হয়ে মধ্য দিয়ে ফেল

করে টেনেমেনে পাস করে ফাঁকিবাজ ডাক্তার হয়েছিলো। তাই গভীর জ্ঞানার্জনের স্বাদ পায়নি। আমার পাঠানো মূল্যবান বইগুলো দিয়ে কোনোপ্রকার পাশকরে সে বইগুলো অন্যদের বিলিয়ে দিয়েছে। অথচ এ সমস্ত বই সারাজীবনের সাথী হয়। এসবের কারণ, ছাত্রজীবনে ইবলিসী রাজনীতির বিষফল। তাই আমেরিকা গিয়েও সে সমাজের গুণ, পেশাদারী সম্পদ অর্জনকে পাশ কাটিয়ে শর্টকাট পথে অর্থ কামানোকেই লক্ষ্যস্থির করে চুরিকরে দেশে ফিরেছে। সে দৃষ্টিতে আমি মনে করি যে, জিয়াউদ্দিন ইংল্যান্ড গেলে ঐরূপ নষ্ট হয়ে দেশে ফিরতো বা আদৌ ফিরতো না। আমার ভেবে ক্ষোভ হয় যে অধ্যাপক গোলাম আযমদের চক্রেপড়া যুবকরা বিদেশে গিয়ে আদমপাচার থেকে আরম্ভ করে ধর্মের নামে যে ভোগভিত্তিক অর্থ লিপ্সায় ধ্বংস হয়েছে, তারচেয়ে দেশে থেকে মৃত্যুবরণও ওদের জন্য পরকালে নাজাতের কারণ হতো। এখন ওরা ধনলিপ্সু ধর্মবেসাতি নব্য ইয়াহুদী। তাই জিয়াউদ্দিনের বিলাত যাওয়া বন্ধ করে গোলাম আযম আমার মহা উপকার করেছে।

অধ্যাপক গোলাম আযম মক্কায় সালেহ কায্যাযের সে অপমানজনক ঘটনার পরও রমজান মাসের যাকাত ও দান খয়রাতে কুয়েতে চলে যায়। রমজান মাস ওখানে কাটিয়ে পুনঃ মক্কায় আসে। কাবা ঘরে অধ্যাপক আযম আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলো, "ভাই ভিক্ষার ব্যাপারে আপনার কথাই ঠিক। আমি কুয়েতে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গেলে তার মালিক দরজা খুলে দেখে আমাকে এক মুখভর্তি থুথু আমার মুখে ও কাপড়ে নিক্ষেপ করেছে।" আমি তার কথা শুনে খুব ব্যথিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আন্তরিক সমবেদনার সাথেই বলেছিলোম, ভাই এ পথ ছাড়ুন। এপথ ইসলামে নেই। নিষিদ্ধ।

তারপর গোলাম আযম পুনঃ লন্ডনে চলে গেলো। আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, এরপর লোকটির বিবেক তাকে সঠিক পথে চালাবে। কিন্তু হায়! ভিক্ষারপেশা এইডস রোগের ন্যায়। এর পরের বছরে হজ্জপালনে গোলাম আযম মক্কায় আসলো। আব্বাস আলী খান, মাওলানা এ,কে,এম, ইউসুফ, মাওলানা আব্দুস সোবহান ও নুরুজ্জামান সহ দশ বারোজন সমবেত হয়েছে হজ্জ উপলক্ষে। বলতে গেলে গোটা জামাতী ইসলামীই এরা। আরাফা ও মুজদালিফায় হজ্জের অকুফ ও ইফাদা সেরে মিনায় এসে ক্বোরবানী করার পর মিনার একপ্রান্তে আগুন লাগলো। আমাদের তাবু থেকে তা অনেক দূরে হলেও বাতাসের গতি দেখে আমার আশঙ্কা হলো যে আগুন আমাদের দিকে এসে যেতে পারে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার সঙ্গীদের নিয়ে যতোপারি তাবুর রশি কেটে তাবু বসিয়ে দেই মাটিতে। তাতে আল্লাহ্ চাহেন তো কিছু তাবু ও লোক রক্ষা পাবে। হজ্জ আমাদের এই সমস্ত পরিস্থিতিতেই ত্যাগের প্রশিক্ষণ দেয়। তাই ক্বোরবানীর ছুরি চাকু নিয়ে তাবু রক্ষার যুদ্ধে নামলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার নিজেরটা সবার শেষে কাটবো। পূর্বে অন্যদেরগুলো রক্ষার প্রচেষ্টা নিবো। সে ভাবেই যুদ্ধাবস্থার মতো কাজে নেমে গেলাম। আগুনের শিখার সাথে তুফানের মতো বাতাসও বেড়ে গেলো। তাই প্রায় দেখতে দেখতেই বলা চলে আগুন আমাদের এলাকায় এসে গেলো। বহু তাবু বাঁচালাম। কিন্তু আমার নিজেরটা রক্ষা পেলোনা। তাতে আমার আব্বার চিহ্ন একটি কম্বলও পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। এটি আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখতাম। সে দুর্ঘটনায় আমার আশা ছিলো যে অধ্যাপক গোলাম আযম ও তার সঙ্গী নেতারা হজ্জের ময়দানে অন্যের সেবার স্বাক্ষর রাখার মতো কিছু করবে। কারণ হজ্জ এ পরীক্ষার বিশ্বসম্মেলন। কিন্তু আমার সকল ধারণা অমূলক প্রমাণ করে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনেতারা সবাই নিজ নিজ বিছানাপত্র এমনকি প্লাষ্টিকের বদনাটি পর্যন্ত নিয়ে সবার আগে নিরাপদে পাহাড়ে চলে গেলো। কারো একটি সুতাও পুড়লোনা। পরে আগুন নিভানোর পর সন্ধ্যায় পুনঃ তাবু খাটানোর পর এরা সবাই পাহাড় থেকে নেমে তাবুতে জায়গা দখল করতে কে কার আগে পারে প্রতিযোগিতায় লেগে গেলো। তাবু রক্ষার কাজেও তারা কেউ ছিলোনা। পুনঃ খাটানোর কাজেও কেউ ছিলোনা। আমি সেকেলে আল্লাহ্‌র অধমবান্দা, কল্পনায় আরো পিছনে চলে গেলাম। ভাবলাম যে এ হজ্জতো হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও আখেরী নবী সঃদের ত্যাগের শিক্ষার হজ্জ! তাঁদের সময় এ ঘটনা ঘটলে কি তাঁরা নিজেদের স্বার্থ এভাবে দেখতেন? এখনকার নেতারা তো তাদেরই আদর্শ স্মরণ ও অনুসরণে এখানে আসে! এরা কারা এবং তাঁরাই কারা? এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতটুকু? কেনো এরা আসে? এদের আসল পরিচয় কি?

এভাবে হজ্জ শেষ হলো। সৌদী সরকার ঘোষণা করলো যে ক্ষতিগ্রস্থদের আটশ' রিয়াল করে সাহায্য দান করবে। আমার সাথে আমার সঙ্গী ছিলো তিরিশ জন। তারা আমার সাথে অন্যের তাবু রক্ষা করতে গিয়ে তাদের অনেকেরই সব ছাই হয়ে গিয়েছে। তাদের আমি বলেছিলাম যে, হজ্জ আল্লাহ্‌র পথে সর্বস্বত্যাগের পরীক্ষা। আমাদের সব কিছু

আল্লাহর জন্য কোরবান করার প্রস্তুতির নিদর্শন এ পবিত্র হজ্জের শিক্ষা। তাই তোমরা যদি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জে এসে থাকো, তা হলে আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ বলে খুশী হও যে আল্লাহ্‌ তোমাদের কিছু অন্ততঃ তিনি ক্ববুল করেছেন। আর যদি নফ্‌স্‌ ও সৌদী সরকারের জন্য হজ্জের প্রহসনে এসে থাকো, তা হলে তোমরা হজ্জ বিক্রি করে জনপ্রতি আটশ রিয়াল নিতে পারো। আমার হজ্জ সারা দুনিয়া দিলেও বিক্রির জন্য নয়। মুয়াল্লিম পান্ডা পেছনে লেগেছিলো এ'বলে যে আপনি ও আপনার সঙ্গীরা না নিলেও আপনাদের হজ্জের পরিচয়পত্র আমাকে দিন, আমি মিসকীন মানুষ, আমি উপকৃত হই। আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম, এ হারাম কাজ আমার ও আমার সঙ্গীদের দ্বারা হবেনা। তুমি অন্য চিন্তা করো। এ মুয়াল্লিম প্রতারকরা অন্যান্য হাজীদের সাথে মিলে তাদের পক্ষ থেকে সরকার থেকে ক্ষতিপুরণের নামে পয়সা আদায় করে হাজী প্রতি দু'তিনশ রিয়াল আত্মসাৎ করেছে। আমি তা দেখেছি আর আল্লাহ্‌র কাছে এদের থেকে মক্কা মাদীনাকে পবিত্র করার ফরিয়াদ করেছি।

শোক দুঃখের চরম আঘাত আসলো যখন জানলাম যে আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম তার সকল সঙ্গীনেতাদের নামের তালিকা সহ ক্ষতিপূরণের পয়সা উসূল করেছে। তারপর আরো মজার কথা যে, নেতা তার সঙ্গীদের বলেছে যে যেহেতু আমাদের কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, তাই এ অর্থটি আমাদের বাইতুল মালেই জমা হোক! ইন্নালিল্লাহ! এ হলো সূরা তওবার বর্ণিত হারামখোর, প্রতারক ও ঘৃন্যপেশাদার ইসলামী নব্য ইয়াহুদী আহ্‌বার ও রুহবানদের ক্রোনোলজি, বা সূক্ষ্ম মান নিরূপক তথ্যপঞ্জি।

এদের হাতে ইসলামের নামে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আসলে বাইতুল মাল বা জাতীয় অর্থভান্ডার এদের হাতে পড়লে কী অবস্থা হবে, তা কি ভাবা যায়? এভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ধারে কাছেও না পৌছে শুধু ধর্মের সাইনবোর্ড ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের নামে বাইতুলমাল দিয়ে সে পয়সায় সপরিবারে বিদেশে বাস করে, বাড়ি ক্রয় করে, ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা দিয়ে বিদেশে শিল্প কারখানা করে এবং দেশে আটতলা দশতলা বাড়ি করে তাতে যদি লেখা হয় “এ বাড়িটি ব্যাঙ্কে দায়বদ্ধ,” সে চক্রের হাতে কি ইসলামী খেলাফত ও ইমামত কল্পনা করা যায়?

এগুলো প্রফেসরী ইসলামীদের ব্যাপারে আমার জানা যৎসামান্য সাক্ষ্য। এবার আসা যাক যুগশ্রেষ্ঠ কথিত বুজুর্গ, আলেমে দ্বীন, ও আল্লাহর অলী ও তাদের কিছু বর্ণনায়। আমি হাফেজ্জী হুজুরের সাথে ইরান সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তাতে আমি এ শর্তে যেতে রাজী হয়েছিলাম যে, আমি আমার টিকেটে যাতায়াত করবো। ইরানীদের পয়সায় যাবো না। সে ভাবে হাফেজ্জীর সফরসঙ্গী হলাম। এ সফর ছিলো ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টায় ইরানী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ও তার উলামা পরিষদ এবং ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে সাক্ষাত করা। অত্যন্ত স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ সফর। হাফেজ্জী রক্তীয়তায় খালু হয়। তাই মূলতঃ তার ইচ্ছায় আমি সফর সঙ্গী হতে রাজী হই। আমি ইরান পর্যন্ত যাবো। ইরাক যাবো না। কারণ, আরবদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ আমাকে যা জানিয়েছেন, ওদের ব্যাপারে পার্থিব ক্বিয়ামত ছাড়া অন্য কিছুতে ওদের চিকিৎসা হবে না বলে আমি নিশ্চিত। ইরানীদের জানা দরকার। তাই এ সফরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি সজাগ ছিলাম যে মধ্যস্থতা বা সালিসী করতে কোনো পক্ষের অর্থানুকুল্যে গেলে তা কখনো ফলপ্রদ হয়না। তাই অন্যরা যাই করুক, আমি কারো ভাড়াটে হয়ে যাবোনা। অন্যরা যারা নিরুপায়, তাদের খুব সতর্ক হতে হবে, যাতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা খর্ব না হয়। হাফেজ্জী, মাওলানা আযীযুল হক, ফজ্‌লুল হক আমিনী, অধ্যাপক আখতার ফারুক ও হাফেজ্জীর ছেলে হামিদুল্লাহ এ মহা গুরুত্বপূর্ণ মিশনের সদস্য। ইরানীরা তাদের ঢাকা-তেহরান-জিদ্দা-ঢাকা টিকেট দিলো। আমরা তেহরান পৌছালাম। হাফেজ্জীকে বলাচলে রাষ্ট্রপতির ও রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে ইরানীরা ভূষিত করেছে। আমি দু'দেশের দু'শ্রেণীর মোল্লাদের মধ্যে পার্থক্য দেখেছি। আমাদের মোল্লারা সমাজের উচ্ছিষ্ট ভোগী মিসকীন। আর ইরানী শিয়া মোল্লারা মালের উৎকৃষ্ট অংশ খুমস্‌ভোগী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। আমি পদে পদে উভয়কে মাপছি। প্রথম দিন সন্ধ্যায় আমাদের খানা দিলো ফরাস বিছানো মেঝের উপর। আমাদের উঠানো হয়েছে শাহের যমজবোন বিতাড়িত আশরাফ পাহলভীর প্রাসাদে। আমাদের এ্যাটেনডেন্ট আয়াতুল্লাহ আহমদ জান্নাতি। প্রাসাদের পাশেই একটি দোতলা বাড়িতে তার বাস। আমাদের শোয়ার ব্যবস্থাও ফ্লোরে ফোমের বিছানার উপর। সন্ধায় আমাদের খাবারের পর ফল স্বরূপ পিয়ারস দিয়েছিলো। ফলগুলো একটু বেশী পাকা ছিলো বলে আমাদের হুজুররা অর্ধেক অর্ধেক খেয়ে দস্তরখানে রেখে দিলো। আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই ইরানের সর্বোচ্চ পরিষদের আলিমরা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলো এবং আমাদের পাশেই বসে পড়লো। আমাদের পরিত্যক্ত ফলগুলো পকেট থেকে চাকু বের করে কেটে খেয়ে ফেললো। আমি তা'খুব গুরুত্বের

সাথে লক্ষ্য করলাম। তখন সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে ইরানীরা লড়ছে এবং মোল্লারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবার চলাফেরা ও খাওয়া-দাওয়ায় চরম কৃচ্ছতা চলছে। আমাদের পরভুক হুজুররা বাথরুমে গিয়ে কাজ সেরে বাথরুমের বাতি জ্বালিয়ে রেখেই চলে আসে। আমার অভ্যাস বিনা প্রয়োজনে এক মূহুর্তও বাতি জ্বালানো নয়। ব্যবহারের পর বাতি বন্ধ করি। একদিন দেখি যে আমাদের জনৈক হুজুর বাতি জ্বালিয়ে রেখেই চলে এসেছে। এর পূর্বে আমি বহুবার শোয়া থেকে উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে এসেছি। সেদিন ঘুমের ঘোরে বাতি জ্বালিয়ে রাখা টের পেয়েও আমি একটু অলসতা করে বাতি নিভাতে দেরী করলাম এ মনে করে যে আমি একটু পরে বাথরুমে গিয়ে ফেরার সময় বাতি বন্ধ করে আসবো। কিন্তু দেখলাম যে কে এসে যেনো বাতিটি বন্ধ করে গেলো। তখন আমি তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম দেখতে যে কে এ কাজটি করলো ? এতো আমাদের মোল্লাদের কাজ নয়!

আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে বয়ঃবৃদ্ধ আয়াতুল্লাহ জান্নাতি বাতি জ্বালানো দেখে তার কোয়ার্টার থেকে এসে বাতিটি নিভিয়ে গেলো। আল্লাহ্ আমাকে এককালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রায় সকল উচ্চ পদস্থ রাজনীতিবিদদের কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ দিয়েছেন। বিদেশেও বাদশা ফায়সাল ও বাদশা খালেদকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তা ছাড়া কাবায় বসে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানদের মক্কায় আসা যাওয়া আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতাম।

ইরানের খোমেনী, খামেনী, রাফসানজানী ও মুন্তাজেরী থেকে শীর্ষ মোল্লাদের ও তাদের পার্শ্বচর আমলাদেরও আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখার জন্য চেষ্টা করেছি। খোমেনী ও তখনকার রাষ্ট্র প্রধান খামেনীর সাথে দীর্ঘ আলাপে আমিই ইন্টারপ্রেটরের দায়িত্ব পালন করেছি। কারন ইরানীদের দেয়া দোভাষীর অনুবাদ আমার নিকট সাব্স্ট্যান্ডার্ড মনে হয়েছে। আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে ইরানী মোল্লারা আমার বিচারে কাঙ্খিত উচ্চ মানের না হলেও আমাদের মৌলবীদের তুলনায় অনেক উন্নত। ওরা শিয়া না হয়ে মুসলিম হলে আরো অনেক উন্নত হতো। আমাদের গুলো মূল ইসলাম বর্জিত পঁচা সুন্নী হওয়ায় ওদের চেয়েও নিম্নমানের।

ইরানে দেখা সাক্ষাতের পর এবার সাদ্দামের সাথে সাক্ষাতের জন্য হাফেজ্জীর দলের ইরাক যাওয়ার পালা। তখন হজ্জের সময়। ইরাক-ইরানের যুদ্ধের ফলে দু'দেশের মধ্যে বিমান চলাচল নেই। তাই হাফেজ্জীরা মক্কা হয়ে ইরাক যাবে। ইরান ত্যাগ করে তাদের জিদ্দা রওয়ানার প্রাক্কালে এক বিব্রতকর ঘটনার সৃষ্টি হলো। আমাদের হুজুররা মক্কা যাবে, তাদের কাছে টাকা নেই। মক্কায় হজ্জের আনুসঙ্গিক খরচ তাদের বহন করতে হবে। তখন রাত বাজে দু'টো। চারটায় জিদ্দার ফ্লাইট। এখন এরা কোচর মোচর আরম্ভ করেছে। তাদের সকল ব্যয়ভার তাদের যারা হজ্জের জন্য ভাড়া করে, তারাই দেয়। তাই তারা হজ্জের যাতায়াতে বেশ লাভ করে। সেজন্য এদের হজ্জে যাওয়া পরের পয়সায় একটি লাভজনক ব্যবসা। ইরানীরা তো এদের হজ্জ করাতে নেয়নি! তারা নিয়েছে তাদের কুটনৈতিক প্রয়োজনে। তাই তাদের নৈতিক দায়িত্ব ছিলো, হাফেজ্জীদের ঢাকা-তেহরান-ঢাকা যাতায়াতের দায়িত্ব বহন করা। তার বেশী নয়। কিন্তু তারা ভদ্রতাকরে এদের ঢাকা-তেহরান-জিদ্দা-ঢাকা রাউন্ড টিকেট দিয়েছে। তাই বেশী। মক্কায় হজ্জের খরচ বহনের দায়িত্ব তো তাদের আদৌ নয়? কিন্তু এরা যে বসেছে ইরানীদের ঘাড়ে বিজনেস ট্রিপে! তাই তাদের মক্কার খরচপাতিও ইরানীদের কাছে চাই।

আমার মিশন ছিলো তেহরান পর্যন্তই। আমি মক্কা ও বাগদাদ যাবো না। কিন্তু হাফেজ্জীদের মক্কায় ফ্লাইটের মাত্র দু'ঘন্টা বাকী। টাকা নেই এখন কি হবে? তারা টাকা চাইতে পারছেনা। চাইলেও দিবে কিনা সন্দেহ। তাই আমাকে বললো যে, তুমি বলো যে, আমাদের মক্কার খরচপাতির টাকা দিতে, না হয় আমাদের ঢাকায় ফেরত পাঠাতে। আমি পড়লাম বিরাট ফাপড়ে। আমি যেহেতু ওদের টিকেটমানিও নেইনি, তাই আমি কি করে এদের হয়ে ইরানীদের কাছে পয়সা চাই? প্রতিমুহুর্ত যাচ্ছে আর হাফেজ্জীর উদ্বেগ বাড়ছে। যে ভিক্ষার হাত পাতে না, সেই বুঝে ভিক্ষা করা কতো কঠিন। আর যারা ওটাকে জীবিকা বানায়, তাদের জন্য তো ওটা ডাল ভাত! ছোটো কালে বাপ মরার পর মা, ভাই-বোনদের বোঝা বহন করেছি, নানা-নানী, মামু-খালু ও চাচা-ফুফা কারো কাছে হাত পাতিনি। তারপরও আল্লাহ্ মানুষের মুখাপেক্ষী থেকে বেনায়াজ রাখার পর একটি আন্তর্জাতিক মিশনে নেমে অন্যের জন্য, তাও আবার অন্যায়ভাবে, হাত পাতা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত হাফেজ্জী খালু ও বয়সে মুরব্বী বলে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে আমাকে আয়াতুল্লাহ জান্নাতীকে ব্যাপারটি খুলে বলতে হলো। বেচারা শুনে থ'খেয়ে গেলো। সে হয়তো নিজেদের অবস্থানের কথা ভেবে আমাদের মোল্লাদের দৈন্যতার পরিমাপ বুঝতে পারেনি।

পরে বেচারা অনন্যোপায় হয়ে তাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে এতোরাত্রে ভল্ট খুলে বিদেশী মুদ্রা বের করে এনে হাফেজ্জীকে দু'হাজার এবং অন্যান্যদের একহাজার ডলার করে দিয়ে আপদ পার করলো। বলে দিলো যে, মক্কায় তাদের "সাজেমানে আওক্বাফে ইরানকে" ইনফর্ম করে দিবে মক্কা, আরাফাহ, মিনা ও মাদীনায় এদের দেখাশুনা করতে। কিন্তু এরাতো গিয়েছে এদের সংকীর্ন মতলবে! তাই তারা মক্কা পৌছে ইরানীদের সাথে যোগাযোগ না করে তাদের বংশালের এক গরীব শাগরেদ ক্বারী মিযানুর রহমানের উপর সওয়ার হয়েছে। এ বেচারা হজ্জ মৌসুমে হাজীদের কাছে বাড়ী ভাড়া দিয়ে কোনো প্রকার চলে। হাফেজ্জী ও আযীযুল হক তার ওস্তাদ বলে তাদের ক্বারী মিযান জায়গা দিয়েছে তার ওখানে উঠতে। যখন হজ্জের দিন ঘনিয়ে আসছে, তখনো তার ওস্তাদরা ভাড়ার কথা কিছুই বলছেনা। পরে বাধ্য হয়ে বেচারা তাদের বলার পর হজ্জের একদিন কি দু'দিন পূর্বে তারা তাকে ভাড়া না দিয়ে পোটলা পুটলি নিয়ে হারাম শরীফ গিয়ে উঠে। ক্বারী মিযান দেশে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে তার ওস্তাদদের কান্ড শোনায়।

হাফেজ্জীরা মক্কায় লাইন করে ইরাকীদের সাথে যোগাযোগ করে ইরাকীদের কাছে থেকে পুনঃ জিদ্দা, বাগদাদ, ঢাকার টিকেট সংগ্রহ করে। বাগদাদ পৌছে সাদ্দাম হোসেনের সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশে তার দু'পালতু আব্দুল মান্নান ও মহিউদ্দিন খাঁর সাথে তাদের বচ্‌সা হলেও তারা ইরাকীদের আতিথেয়তায় "বাগদাদ মিশন" শেষ করে ঢাকা ফেরত আসে। ফেরত এসে তাদের কোনো নৈতিকতা থাকলে তাদের কর্তব্য ছিলো ইরানীদের জিদ্দা-ঢাকার প্যাসেজ টিকেটটুকু ইরানীদের ফেরত দেয়া। ইরানী রাষ্ট্রদূত সস্ত্রীক আমার বাসায় এসে জানালো যে, সে টিকেট তাদের ফেরত দেয়া দূরে থাক, তাদের কোনো অনুমতি না নিয়েই এ বুজুর্গরা ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে টিকেটের পয়সা তুলে নিয়ে হালাল করে ফেলেছে। এরা ইরানীদের সাথে জুমায় সালাত পড়ে ঘরে এসে সালাত দোহরায়ে নিয়েছে। অর্থাৎ ইরানীরা মুসলিম নয়। ঠিক আছে। তাই যদি হয়, তা হলে এদের পয়সা গিলা এদের জন্য কী রূপে হালাল হয়? তারপরও হজ্ব কনফারেন্স, আমীরে শরীয়ত সম্মেলন ও প্রেস প্রকাশনীর নামে বহু কোটি টাকা এনে এরা হজম করেছে। এ জঘণ্য কাজ এরা কিভাবে করে? উত্তর, এরা সূরা তওবায় আল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে হারামভোগী ইয়াহুদী-খৃষ্টান আহবার ও রুহবানদের মুসলিম সংস্করণ। ক্বেয়ামতের দিন এ অর্থ দিয়ে এদের স্যাঁকানো হবে। এরা যদি ইসলামের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের অর্থের ভান্ডারের নিয়ন্ত্রণ হাতে পায়, তার তলী থাকবে?

এরপর থেকে ঘৃণায় আমি এদের বাদ দেই এ মনে করে যে এরা সংশোধনের অযোগ্য। এদের আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বিধানে ধরবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে সময় কাছে এসেছে। আমার দেখা এদের সর্বশেষ একটি ঘটনা না বললে মনে হয় আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হবো, তাই ঘটনাটি অত্যন্ত ঘৃণার হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ না করে পারছিনা। পূর্বে এক প্রসঙ্গে মরহুম হাফেজ আব্দুর রউফ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। বাইতুল মুকাররাম মসজিদের উত্তর গেইটের পূর্ব পার্শ্বের নূরানী আতরের দোকানের মালিক ছিলো আব্দুর রউফ। লালবাগ মাদ্রাসার ছাত্র। সে সূত্রে মাওলানা আযীযূল হক তার ওস্তাদসম। লোকটি অনেক দিন ক্যানসারে ভুগে মারা গিয়েছে। আমার সাথে তার অন্তরের সম্পর্ক ছিলো বলে আমৃত্যু তাকে আমি দেখতে যেতাম। একবার কথায় কথায় বলছিলো যে তার মৃত্যু হলে আমি যেনো তার জানাযা পড়ি। আমি বলছিলাম যে তার বড়ো ছেলে যেহেতু যোগ্য এবং নেক, তাই তার দ্বারাই তার জানাযা হওয়া শ্রেয়। হাফেজ আব্দুর রউফের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমার ছেলে মুহাম্মাদকে নিয়ে তার জানাযায় শরিক হতে গিয়েছিলাম। মুহাম্মাদকে সে এতোই ভালোবাসতো যে আমি তার জানাযা ও দাফনে পর্যন্ত মুহাম্মাদকে সঙ্গে নেয়া কর্তব্য মনে করেছি। জানাযার পূর্বক্ষণে মাওলানা শেখুল হাদীস আযীযুল হক এসে উপস্থিত। আব্দুর রউফের ছেলেরা তাদের বাবার উস্তাদ এসেছে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই তাকে দিয়ে জানাযা পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্বে কথা হয়েছে যে ছেলেই জানাযা পড়াবে। আযীযুল হক আসবে জানলে আমি শুধু আব্দুর রউফের লাশ দেখেই চলে আসতাম, জানাযার জন্য অপেক্ষা করতাম না। মাওলানা এলে তাকে দিয়েই জানাযা হলো। জানাযার পর পাঁচশটি টাকা দেয়া হলে আযীযুল হক সে টাকা নিয়ে চলে এলো। এ ঘটনাটি আমি নিজে না দেখলে কেউ বললে আমার পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন হতো। এতো মুর্দার জানাযা, তারপর ছাত্রের জানাযা! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! এরা মানুষ? এরা আলেম! এরা শেখুল হাদীস?! ধিক এদের পিতা মাতার, যারা এদের ধরার পৃষ্ঠে এনেছে! ধিক এদের ধর্মের উপর! শত ধিক এদের ধর্মবেচার পেশার উপর। ঘটনাটি স্মরণ হতেই আমি চোখ বন্ধ করলে দেখি যে আযীযুল হক

<u>একটি মূর্দাখোর শকূন অথবা কুকুর হিসাবে যেনো আব্দুর রউফের মৃত দেহের এক খাব্লা পচা মাংস মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে! এরা মানুষ হলে ধরায় পশু কারা!</u>

ইসলামে শিক্ষা হলো, কেউ মারা গেলো জানাযা পড়ে তাকে দাফন করো। তিন দিন পর্যন্ত খানা পাকিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য পাঠাও। তা পালনে আমি এক দিন খানা পাকিয়ে পৌছিয়ে দিয়েছি। আর এ উস্তাদজী! মুর্দার গোস্ত খেলো?!

হাফেজ্জীর ছেলে জামাইরা ইরানীদের পয়সা মাতৃস্তনের মতো নিঃসংকোচে খেয়েছে। তার ছোটো ছেলে আতাউল্লাহ তার বাপের নামে মাদ্রাসাকে দেয়া নবাবপুরের একটি বাড়ি বাপের সই জাল করে তা এক কোটি টাকার উর্ধ্বে বিক্রি করে সবটাকা আত্মসাত করে কামরাঙ্গীর চরে ফ্লাড লেভেলের উর্ধে আট-দশ ফিট উচু পিরামিড তৈরী করে বাড়ি করেছে। পরে মাদ্রাসার বাড়ি বিক্রির জন্য ধরা হলে সে কামরাঙ্গীর চর ছেড়ে বারিধারা না গুলশানে পালিয়েছে। আরেক বুজুর্গ পীরজ্বী হুজুর। সব জ্বী আর হুজুর। তার স্ত্রীও আমার মায়ের চাচাতো বোন, যেমন হাফেজ্জীর স্ত্রী আমার মায়ের ফুফাতো বোন। পীরজ্বীর মুখে ইনস্যুরেন্সের চাকুরী শূয়োরের মতো হারাম শুনে আমার এক বন্ধু জেনারেল মুযাম্মিল ও ব্রিগেডিয়ার ইউনুস দেওয়ানের সম্বন্ধি সালাহুদ্দিন বিরাট বীমা কোম্পানীর চাকুরী ছেড়ে ঘরে বসে গিয়েছিলো। কিন্তু সালাহুদ্দীন সাহেবের বীমা কোম্পানীর লোকেরা মিষ্টি নিয়ে পীরজ্বীর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসাফাহা করে টাকা দিলে তা সে গ্রহণ করে। তাদের বিগ্ বস পীরজ্বীর কথায় শূয়রসম বীমার চাকুরী ছাড়লেও হুজুর বীমা কোম্পানীর লোকদের মিষ্টি ও টাকা কিরূপে গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করলে পীরজ্বী নাকি বলেছে যে, যাদের নসীব ভালো তারা তাদের কথা শুনে শূয়র খাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এবং পীরজ্বীরা শূয়র খেয়ে বাঁচবে। শূয়রভূকরা মরলে কোথা যাবে, এ কথাটি তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে কিনা, করলে কি উত্তর হতো তা জানা যায়নি। পীরজ্বীর মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার বরকতের নিয়াতে হুজুরের নামে হাউজিং এর একটি প্লটের দরখাস্ত করলে লটারীতে বেচারার ভাগ্যে প্লট উঠলে হুজুরের লোভ লেগে যায় প্লটের উপর। আর যায় কোথায়! হুজুর তা নিয়ে বিবির নামে হস্তান্তর করে দেয়। বিবি বড়োছেলেকে সে প্লটটি দান করলে তিন ছেলের মধ্যে ভাই-ভাই মামলা মুকাদ্দিমা ও কোর্ট কাচারী আরম্ভ করে দেয়। এক পর্যায়ে আমার কাছে এসে তারা সালিসী করে মিটমাটের কথা বলে। আমি সব শুনে বললাম যে তোমাদের সালিসী আমি করতে পারবোনা। কারণ, যাদের অবৈধ পয়সা খেয়ে তোমাদের জন্ম, তোমরা তাদের সন্তান। তারাই তোমাদের মিটমাট করতে পারবে। ইসলামে উপরে তাওহীদ এবং নীচে হালাল দিয়ে মু'মিনের অবস্থান তৈরি হয়। নবী রাসূলদের ব্যাপারেও সে এক কথা। তা না হলে, নামের সাথে যতো হুজুর, পীর, শেখ ও হযরতজ্বী লাগানো হোক, সব জাহান্নামের চর্বিদার মোটাশূকর।

মুয়াবিয়া, ইয়াযীদদের দামেশক ও স্পেনে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ, আব্বাস ও ইব্ন্ আব্বাসদের বাগদাদের দজলা, ফোরাত পাড়ের প্রমোদ বিহার ও মুঘল পাঠানদের দিল্লী আগ্রার সিংহাসন ও লাল কিল্লার মহাপাপের ধ্বংসস্তুপ আমাদের কোনো শিক্ষা দেয়নি বলে জন্ম নিয়েছে লালবাগ ও কাটরার কিল্লার ধ্বংসস্তুপের হুতুম পেঁচা, হুজুর ও হযরতজ্বীদের ছেলে-মেয়ে ও নাতি-পোতারা। এ পেঁচাদের তাড়িয়ে তাওহীদ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার আযান না দিলে পুরাদেশ হুতুম পেঁচায় ডাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। হালালভোগী পিতা যেমন হালালজাদা জন্ম দেয়, তেমনি হারামভোগী হারামদাজা জন্ম দেয়। ঠিক তদ্রুপ হালালভোগী শাসক, হালালভোগী সরকার জন্ম দেয়। মিথ্যা ও হারামখোর ধার্মিকরা সমাজে হারামখোর লুটেরা শাসকের লুটপাটের পক্ষে ফতোয়া প্রদানকারী মানুষরূপী শয়তান। হারামভোগী ধর্মবেসাতীদের উৎখাত করতেই ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, মূসা কালিমুল্লাহ, ঈসা রূহুল্লাহ ও শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এসেছেন। তাঁদের দ্বারা সে যুগে নমরুদ ফিরআউনদের যে ভাবে উৎখাত করেছেন আল্লাহ্, এ যুগের নব্য ফিরআউনদের নবীদের সে আদর্শেই উৎখাত করে মানবজাতির মুক্তি আনতে হবে। সে যুগের নমরুদ ফিরআউনদের হারামখোর দরবারী আলেম ও খতীবরা যে স্বার্থে সত্যের সৈনিকদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে, এখনকার খতীব ও মোল্লারা ঠিক একই স্বার্থে ফতোয়া বেচাকিনি করবে। তাই বিশ্বের নব্বইভাগ জনসংখ্যা মুস্তাদআফদের মুক্ত করার জন্য মুস্তাকবিরদের দান ও ভিক্ষাখোর ও মোট জনসংখ্যার শতকরা এক দেড়ভাগ আহ্বার ও রোহবানদের চিহ্নিত করে নির্মূল করে নবী রাসূলদের সাচ্চা অনুসারী আলেমদের ময়দানে নামতে হবে। তাই মুর্দাখোর ও আল্লাহ্‌র ভাষার হারামখোরদের চিহ্নিত করতেই হবে। এ চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় বর্তমানে না বুঝে অসতর্কতায় হারামখোরীতে লিপ্ত বহু সংখ্যক আলেম তওবা করে নায়েবে রাসূল ও নবীদের ওয়ারিশ বেরিয়ে পড়ার

সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঝাড়ূটা খুব শক্তভাবে দিতে হচ্ছে। যাতে ধুলাবালি, আবর্জনা ও মরা পাতা দূর হয়ে খাঁটি মাটি বের হয়ে আসে। এখন ১৪০০ বছর ধরে জড়ো হওয়া আবর্জনার জন্য খাঁটি মাটি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। ট্রাকটর, বুলডোজার, কম্বার ও টিলার দিয়ে বিশ্বের আবর্জনায় ঢাকা সারফেসকে ক্লিন করে তার পর রাহমাতুল্লিল আলামীনের চাষাবাদ শুরু করতে হবে। তাকে রেখে নয়। ইনশ্া আল্লাহ্।

আমার দীর্ঘ দিনের সুইপিং বা মহাঝাড়ূ বক্তব্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এক শ্রেণীর আলেম, যাদের মধ্যে যুবক ও মধ্য বয়সীর সংখ্যা বেশী, তারা মহাখুশী। তারাও পারিপার্শ্বিকতায় পড়ে বেশীখেয়ে ভুড়ি মোটা করে ফেলেছে। এখন সে ভুড়ির যোগান দিতে তারা বুঝা সত্ত্বেও মুর্দাখোরী ছেড়ে আসতে পারছেনা। ক্বোরআন ও নবীদের শিক্ষানুযায়ী তাদের কায়িক পরিশ্রম ও বেশী বেশী রোজা থাকতে হবে। তা না হলে তাদের পেটের টান ও লিঙ্গের উপদ্রব কমে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জিত হবে না।

আমার ঠিকানায় আসা যাওয়ার পথে ফুরফুরাওয়ালাদের "দারুস্সালাম" নামের ভোগবাদী ফাঁদের তাজমহলী "মসজিদে দেরার" দেখা যেতো। ইদানিং আশে পাশে দালান কোঠা নির্মানের ফলে তা আর দেখা যায় না। পূর্বে দেখা যেতো। পূর্বে যখন দেখা যাচ্ছিলো, তখন আমি একাধিকবার তা দেখতে ও পরিবেশ সার্ভে করার জন্য গিয়েছি। কখনো ফাঁকা সময়ে, কখনো মেলা চলাকালীন। একবার গিয়ে দেখি রাতভর চাঁদা তোলার পালা চলছে। মঞ্চের পার্শ্বে অদূরে আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী (?) আল-ক্বোরেশী (?) এক চৌকিতে শুয়ে আছে, আর জন কয়েক ভক্ত জনসমক্ষে লেপের নিচে হাত দিয়ে তার হাত-পা টিপছে।

ঠিক এরূপ দৃশ্য দেখেছিলাম ভারত থেকে আসা আবরার আহমদ নামের এক মৌলবী সাহেবের দেহ নিয়ে। মৌলবী সাহেব নাকি মৌলবী আশ্রাফ আলী থানবীর দর্জি না খলিফা। মৌলবী হেদায়েতুল্লাহ ও মৌলবী উবায়দুল হকরা তাকে ঘিরে এ কান্ড করেছিলো। তা দেখে আমার এতো রাগ করেছিলো যে কিছু লোক নিয়ে গিয়ে বেতিয়ে ওদের ওখান থেকে তাড়াই। আমার দাদা মৌলবী রশীদ আহমদ গাংগুহীর সে শাগ্রেদ, যার কাছ থেকে হালাল রিযিক চেয়ে গাংগুহী খেতো। আর বলতো, ভাই আব্দুল হামীদ, তোমার বাড়ী থেকে আসা খাদ্যের হিস্যা খেলে রাতে তাহাজ্জুদে আসমান-জমীন এক হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে গাংগুহী সাহেব তার এ শাগরেদের সাথে শেষকথা বলে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আমার দাদার কাছে আশরাফ আলী থানবীর বহুপত্র দেখেছি। আমার দাদা-বাবাকে কখনো দেখিনি ভীনলোক দিয়ে বদন দাবাতে। বরং এ বদ অভ্যাসওয়ালা কোনো মৌলবী মোল্লারা হলে তাদের সংস্পর্শেও যেতে আমার বাপদাদা নিষেধ করতো। এরা কোথা থেকে এতো বেহায়া হলো যে জনসমক্ষে দেহমর্দন করায়? এ থেকে সমকামিতা ও যৌন বিকৃতি ছড়ায়। এক পীর এ বদ অভ্যাসের শিকার হয়ে শালা বা শালী সকলের সাথে এ কাজ করে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার দশ এগারো বছরের ছেলে তার খালার সাথে অশোভন অবস্থায় পিতাকে দেখে ফেলে। ফলে পিতার প্রতি তার মাসুম ছেলে এমন বিগড়ায় যে সে পাগল উপাধি পায় এবং পিতার গদি থেকে বঞ্চিত হয়। ছেলেটি আমাকে ঘটনাটি বললে আমি তার এক মামুকে জানালে সে অকপটে স্বীকার করে বলে যে আমরা ভাইবোন সবাই মিলে দুলাভাইর সাথে বিয়ে বসেছি। তাই এগুলোই স্বাভাবিক। তার কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এজন্য নারী পুরুষ সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে দেহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। বেশী করে রোজা থাকতে হবে রূহকে সতেজ করে নফস্কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এ কাজ দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য ফরজের পর্যায়ে এবং সাধারণ মু'মিন মু'মিনাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাফ্ল। এটাকেই আল্লাহ্র রাসূল (وجاء)"বিজা" বা সাময়িক বন্ধ্যাকরণ বলেছেন।

শ্রমবিমূখ পরজীবী লোকেরা সর্বদা নতুন নতুন চারণক্ষেত্র খুঁজে বেড়ায় বা তৈরী করার ধান্দায় থাকে। বর্তমানে বাণিজ্য ক্ষেত্র ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমাসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী লগ্নিতে ধর্মের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রবণতা শুরু হয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে "শরীয়াবোর্ড" নামে কিছু ভুড়িমোটা মোল্লাদের ভুড়ি আরো মোটা করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি জানতে পারলাম যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে "বুজর্গহস্তী" গুলোকে প্রতি বৈঠকে দামানুপাতে এক থেকে দু'হাজার টাকা করে সম্মানী দেয়া হয়। তারা এ রোজগারকে আরো লাভজনক করার জন্য মাসে অন্ততঃ পাঁচটি করে বৈঠকের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। এ প্রথা চলতে থাকলে অসম্ভব নয় যে শরীয়া বোর্ডের সদস্যরা তাদের দাবি মানার জন্য রাস্তায় নেমে শ্লোগান দিয়ে প্রেস কন্ফারেন্স পর্যন্ত করবে। ঈমান চলে গেলে যখন একটি সাতপর্দার কুলবধুও নারীবাদী হয়ে বেশ্যাহয়ে রাস্তায় পয়সার জন্য সব কিছু করে, সেখানে অসম্ভব নয় যে ধনলিপ্সার

রাজনীতিকদের ন্যায় ওদের জানাযা পড়ার মোল্লা শরীয়াবোর্ডের এরা সুদভিত্তিক ব্যাংক বীমার পয়সা হালাল করবে তার উপর "ইসলামী" সাইন বোর্ড লাগিয়ে! যেখানে রাষ্ট্রই কুফুর ও শির্কের, সেখানে ইসলামী ব্যাঙ্ক ও বীমা সে সরকারের অধীনে কী করে হয়? শুকরের পেটে কি কখনো খাসির খলিজা হয়?! তা যদি সম্ভব হয়, তবেই অনৈসলামী রাষ্ট্রের অধীনে ইসলামী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী হতে পারে।

হারামখোর আলেম ও পীরেরা একটি মাদ্রাসা, মসজিদ বা খানক্বার ভিত দিয়ে তা অসম্পূর্ণ রেখে তা দেখিয়ে যুগ যুগ ধরে শুধু চাঁদা তুলে খায়, যেমন কিছু ভিক্ষুক দেহের কোথাও ঘা ও ক্ষত সৃষ্টি করে তা দেখিয়ে ভিক্ষা করে ব্যবসা করে। কখনো ক্ষত শুকাতে দেয় না। শুকাতে গেলেই পুনঃ খুটে ক্ষত তাজা করে ভিক্ষা চালিয়ে যায়।

আমি একবার কোনো উপলক্ষ্যে ইসলামী ফাউন্ডেশনে যাই। সেখানে তাদের অনুবাদের শাখায় গিয়ে দেখি মাওলানা ওবাইদুল হক, কাজী দীন মুহাম্মাদ ও আরো কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবী মোল্লারা একত্র হয়েছে। তারা কোনো একটি কিতাব বা কথিত হাদীসের অনুবাদ করবে। দৃশ্যটি দেখা ও বুঝার জন্য আমি কৌতুহলী হয়ে বসলাম। দেখলাম যে তারা ঘড়ি দেখে বসে কোনো প্রকার ঘন্টাখানেক বসে অস্থিরতার সাথে পুনঃ ঘড়ি দেখে হাজিরা খাতায় দস্তখত করে দু'তিনশ টাকা করে পকেটস্থ করে যেতে তাড়াহুড়া করছে। এর মধ্যে তাদের জন্য কেক, কলা ও নাস্তা আনলে প্রায় সবাই-ই তা পলিথিনে পুরে চম্পট দিলো। কারণ, তাদের অধিকাংশই বহুমুত্র, উর্ধ্ব রক্তচাপ বা অতি ভোজে ভুড়ি মোটা। তাই নাস্তা গুলো না খেয়ে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়ে বা নাতি-পোতাদের আপ্যায়িত করতে। এহলো এদের ইসলামী খেদমতের সূরত্ হাল!

সূরা তওবায় আল্লাহ্‌র বর্ণিত হারামখোর পীর দরবেশ ও মোল্লা অধ্যাপকদের বাদদিয়ে যে সত্যাশ্রয়ী খঁটি ঈমানদার হালালজীবী আলেম ওলামা রয়েছে, তাদের আর একদিনও কালক্ষেপ না করে ঐ লুটেরাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের মুস্তাদআফ্ জনগোষ্ঠির পক্ষে ময়দানে নামার সময় উপস্থিত। এক্ষুনি না নামলে ওদের পাপের শাস্তির মহামারীতে এরাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

তোমরা সে বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাও, যা তোমাদের মধ্যস্থ অত্যাচারীদের উপরেই আসবে না। তোমরা তাদের সাথে সহ-অবস্থান করছো বলে সে বিপর্যয় তোমাদেরও ধরবে এবং ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ্ অতীব কঠোর শাস্তি দাতা। (সূরা আনফাল-২৫)

এখানে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর আমি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবো। তা হলো যে, তেলের পয়সায় হঠাৎ ধনী আরবরা এক চরম যৌন উশৃঙ্খল জাত। পয়সার জোরে তারা দরিদ্র দেশের মেয়েদের গৃহপরিচরিকা রূপে নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-পুত্র পালাক্রমে তাদের ধর্ষণ করে। এতে তারা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে। আমাদের দেশের হাসিনা খালেদারাও তাদের কস্মেটিক রাজনৈতিক বিলাসিতার বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের জন্য এদের রপ্তানীপন্য রূপে লুচ্চা লম্পটদের হিংস্র থাবায় দিতে বাঁধেনা। কারণ, তাদের জীবনেও আল্লাহর দেয়া নারী সতীত্ব রক্ষার ঈমান ও দীক্ষা নেই। তা না হলে কি এহেন কাজ তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে হতে দিতে পারে? তা হলে এদের আর বেশ্যার সরদারনীদের সাথে পার্থক্য কি রইলো?! বরং নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে এরা সরদারনীদের সরদারনী। এ দেশে নারী নির্যাতনের আইন কেনো? না দেশের লোকদের পয়সা কম বলে তাদের ধর্ষণ অপরাধ, আর বিদেশীরা বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে করে বলে তা'সেক্স শিল্প!

বেশি ধনী ধর্মীয় লেবাসহীন আরব লম্পটরা তাদের পাশবতা চরিতার্থ করতে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অন্যান্য অমুসলিম দেশে যায়। সেখানে ওরা এ সমস্ত কাজে হোটেল ও পানশালাও চালায়। ধর্মীয় লেবাসধারী মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর আরবরা নামের সাথে "শেখ" লাগিয়ে আমাদের মতো অভাব ও স্বভাবের দরিদ্র তথাকথিত মুসলিম দেশগুলোতে পাড়ি জমায়। মাদ্রাসা, মসজিদ ও অনাথআশ্রমে সাহায্যের হাতবাড়িয়ে এরা এদেশের যুবতী মেয়েদের সর্বনাশ করে। পয়সার লোভে যেমন হাসিনা, খালেদারা এদের বিদেশে পাচার করে, ঐ সমস্ত মসজিদ মাদ্রাসার হুজুররা তেমনি তাদের প্রতিষ্ঠানের আনুকুল্যে ভিক্ষার স্বার্থের বিনিময়ে বিয়ের নামে ওদের মেয়ে সরবরাহ করে। এ কুকুরগুলো কিছু দিন পর পর নিত্য নতুন স্বাদের লিপ্সায় একের পর এক বিয়ে করে ও তালাক দেয়। ইসলামে এক জাতি অপর জাতির নারীদের এভাবে হেয় করা নিষেধ। উভয় জাতির মধ্যে মানবসাম্যতার ভিত্তিতে বিবাহ দেয়ানেয়ার মাধ্যমে হলেই তা অনুমোদনীয়। অন্যথায় তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (সূরা হুজুরাত-১১) আবু বকরের "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" দিয়ে পুনঃ জাতিভেদ সৃষ্টি করে আবু সুফইয়ান ও আব্বাসের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে আরব খবীসরা বিজিত

দেশ সমূহে তরবারীর বলে এ কাজটি করেছিলো। যা এখনকার আরবরা পয়সার জোরে করছে। তার ফলে ঐ সময়ে বাগদাদ ও স্পেনে ওদের পুরুষদের হত্যা করে ওদের মা-বোনদের যে ভাবে লাখে লাখে তাতার ও ইউরোপিয়ানরা নিয়ে ধর্ষণ করে ওদের প্রজন্ম উৎপাদন করেছে, এখনো আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে ওদের উপর পুনঃ সে শাস্তি অত্যাসন্ন, Over Due. ইয়াহুদীরা যে ভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিকৃত করে সংস্কারের পর ফাসাদ সৃষ্টি করেছে, বিশ্ব নবী রাসূল সঃ এর পর আরবরা তাঁর লাশ দাফনকাফন বাদ দিয়ে যা শুরু করেছে, আজো তাই করছে। তাই আল্লাহ্ আজ তাদের ইয়াহুদীদের সাথে বিচারের এক কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। আমরা রিসালাতের ক্বোরআনী ইসলাম ত্যাগ করে ১৪১২ বছর ধরে আল্লাহ্‌র মারা আরবী দ্বীনকে পুর্নজীবিত করার জেহাদে লিপ্ত ছিলাম। তাই যতো চেষ্টা করেছি, ততোই ডুবেছি। হাসানুল বান্না, শেখুল হিন্দ মাহ্‌মুদুল হাসান, আবুল কালাম আযাদ ও মওদূদীরা মূলতঃ আল্লাহ্‌র দাফন করা ক্বোরেশী সাম্রাজ্যবাদকেই পুনর্জীবিত করার আল্লাহ্ বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে নিরাশ ও নিস্ফল হয়ে বিদায় নিয়েছে। তাই আর আরবী ইসলাম নয়। রাব্বুল আলামীন ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের ইসলাম চাই।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে কিছু সংখ্যক আরবদের এনজিও রয়েছে, এখন এদের ধরা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এরা ইসলামী পোষাকে ও ইসলামের নামে আমাদের সরলমনা মানুষদের ওদের অভিশপ্ত বিকৃত ধ্যান ধারণা প্রচার করে বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করছে। হাই-আতুল্ ইগাসাহ্ বা আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা, আল হারামাইন সংস্থা ও রাবেতা প্রভৃতির নামে এরা বিদেশে এসে এদের নেটওয়ার্ক করে এ দেশের উঠতি বয়সের মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিপথগামী করছে। এদের সামান্য বেতন ও ভাতা দিয়ে ওরা নিজেরা মুয়াবিয়া ইয়াযীদের মতো রাজকীয় জীবন যাপন করছে। যারা যতো ইচ্ছে বিয়ে ও তালাক দিয়ে ওদের ইবলিসী খায়েশ মিটাচ্ছে। এ দেশের কর্মচারীদের সর্বোচ্চ দু'চার হাজার টাকা বেতন দিয়ে নিজেরা দেড় দু'লাখ টাকা করে বেতন নিচ্ছে। ওরা এদেশের শিক্ষার্থীদের পেটে-ভাতে খাটিয়ে মাসে চার পাঁচশ টাকা পকেটে খরচ দিয়ে এদের স্বভাব নষ্ট করে। এদের ওদের মতো লোভী এক শ্রেণীর নব্যমোল্লাতে রূপান্তরিত করছে। এদেরই পয়সার লোভ দেখিয়ে ওরা ওদেরই বোন, ভাতিজী, ভাগ্নী ও চাচাতো মামাতো বোনদের বিয়ে করে সমাজে আরেক শ্রেণীর ব্যাধি ছড়াচ্ছে।

সৌদী আরবের দারুল ইফতার মুবাল্লেগ বা প্রচারকসহ এদেশে যতো আরব এনজিও রয়েছে, এদের কথা হলো যে তারা ছাড়া অন্যরা সবাই শির্ক করছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের লোকদের এরা শির্কে ডোবা আধা মুসলিম ও আধা কাফের বা মুশরিক মনে করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের সমাজ শির্কসহ অসংখ্য বিদ্আতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এদের ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর খাঁটি তাওহীদে উন্নীত না করলে কস্মিনকালেও এদেশে ইসলামের পুনর্জাগরণ আসবে না। তাই খাঁটি তাওহীদী দ্বীনপ্রচার মৃতপ্রায় রোগীকে স্যালাইন ও রক্ত দেয়ার মতো অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এ অবস্থায় রোগীকে যদি মেয়াদোত্তীর্ণ পঁচা স্যালাইন এবং এইচ আই ভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত দেয়া হয়, তা হলে কেমন হয়!?

অবস্থাটি সম্পূর্ণ তাই। আরবরা ইয়ামেন থেকে সিরিয়া, এবং ইরাক থেকে মিশর পর্যন্ত সবাই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তাদের মিত্র, বন্ধু, অভিভাবক রূপে তাদের তৈল সমৃদ্ধ সকল অর্থনৈতিক কাঠামো হস্তান্তর করে কাফের, মুশরিক ও মুর্তাদ হয়ে আছে। ক্বোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ ঈমানদারদের ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের বন্ধু, মিত্র ও অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। তারপরও যখন আরব বিশ্বের সকল সরকারগুলো মককা, মদীনা ও বায়তুল মাক্দিস সহ সব কিছু ওদের হাতে সমর্পণ করেছে, ফলে তারা নিঃসন্দেহে নব্য ইয়াহুদী ও খৃষ্টান। এদের কাছে আমাদের ইসলাম শিক্ষার কী আছে?! সূরা মাঈদার ৫১ নং আয়াতে সুস্পষ্ট করে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, যারাই, যে অবস্থায় এবং যখনই ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মিত্র ও বন্ধু রূপে গ্রহন করবে, তখনই তারাও ইয়াহুদী ও খৃষ্টান হয়ে যাবে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে ঈমানদাররা, তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তোমাদের বন্ধু ও মিত্র রূপে গ্রহণ করবেনা। কারণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পরের মিত্র। তোমাদের যেই তাদের মিত্র রূপে গ্রহন করবে, অবশ্যই সে তাদের একজন। আল্লাহ্ এ ধরনের যালেম জাতিকে কখনো পথ দেখান না।" (সূরা মাঈদা-৫১)

এরপরও যদি কেউ বলতে চায় যে, আরব রাষ্ট্রগুলো তা করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান হয়েছে, কিন্তু এখানে যারা এনজিওর

কাজ করছে, তারা বেসরকারী জনগণ! উত্তর মিথ্যা, কারণ এরা সবাই সে সরকার সমূহের প্রজা রূপে তাদের অনুমতি নিয়ে তাদের হয়েই এ'কাজ করছে। ঐ দেশ সমূহের মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী সরকারের কোনো নাগরিক তাদের সরকারের আনুকুল্য ও আশীর্বাদ ব্যতীত এধরনের কাজ করতে পারেনা। কল্পনাও করা যায়না। কাজেই মুশরিক, মূর্তাদ ও নব্য ইয়াহুদী খৃষ্টানদের কাছে শির্ক ও বিদআতের সবক নেয়ার দিন বিগত হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ওদের সবক দিয়ে তাওহীদ শিক্ষা দিয়ে শির্ক ও বিদ্‌আত থেকে পবিত্র করবো। তারা যদি স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের এখানে মুহাজির হয়, তা হলে তাদের অবশ্যই রাসূল সঃ তাঁর মুস্তাদআফ অনুসারী যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন্ মাসউদ, খাব্বাব, সুহাইব, সাওবান, সালমান ও উসামাহ্‌দের মতো হতে হবে। আবু বকর, উমর, ওসমান, মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াযীদদের মতো মুহাজির গোত্রীয় সাম্রাজ্যবাদী ইসলামের এক মূহুর্তও প্রয়োজন নেই। যাদের আল্লাহ্ ধ্বংস করে সমাহিত করেছেন, ওদের পূজার আমাদের প্রয়োজন নেই। ওদের একশ্রেণী যেমন আফগানিস্তানে এসে যুদ্ধ করে আফগানিস্তানে আশ্রিত আছে, এখানে এরা আমাদের মতো মুস্তাদআফ হয়ে আমাদের মতো হয়ে আমাদের দ্বীনী ভাই রূপে আমাদের মাঝে থাকবে। তারা তাদের স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে এসে সমান মর্যাদায় তাক্বওয়ার ভিত্তিতে লেন-দেনের বিয়ে শাদী হবে। একই প্রকারের জীবন মান হতে হবে। তা না হলে এদের এদেশে এক দিনের জন্যও প্রয়োজন নেই। এরা আমার নিকট অবাঞ্ছিত।

ভাষা আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের উপর, জীবিত কি মৃত, আল্লাহর গযব ও লানত হোক। অবশ্য এর মধ্যে গোলাম আযমও একজন। শয়তানদের প্ররোচনায় জাতিকে মূর্খ ও বর্বর রাখার জন্য ভাষা আন্দোলন করে আমাদের হাযার বছর পিছিয়ে রেখেছে। জাতিকে আরবী শিখে ক্বোরআন বুঝে, ক্বোরআনী সাম্যবাদের সংগ্রাম করে মানুষ হওয়া থেকে এরা বঞ্চিত করে বাঙ্গালীদের আরবদের ড্রাইভার, ঝাড়ুদার, মেথর ও গৃহপরিচারিকা রূপে বেশ্যা হওয়ার পথ করে দিয়েছে। ক্বোরআনী শিক্ষার পর ইংরেজী শিখে আত্মপরিচয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করে ঘরভাঙ্গা, নেশাগ্রস্থ ও যৌন বিকৃত পশ্চিমা মানবরূপী মানবেতরদের মানুষ করার শিক্ষকতার পরিবর্তে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ আমাদের ছেলেমেয়েদের ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়ে ওদের রেস্তোঁরার বয়, ওদের থালা বাসন মাজক, বেশ্যালয় ক্লাবে ওদের বেশ্যা নরনারীর কোটগাউন ধারণ করে বখ্‌শিশ উপার্জন এবং সর্বোপরি ওদের এইডস্ ও এইচ, আই, ভির বাহক হওয়ার যোগ্য করেছে এ জাতিকে।

ভাষার দিক দিয়ে জাতিকে, বিশেষ করে ক্বোরআনের ভাষা থেকে যোজন দূরে ঠেলে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের পাষন্ডরা জাতির যে সর্বনাশ করেছে, সে পাপে ঐ পাপের নায়করা নিঃসন্দেহে গোটা জাতির পাপ নিয়ে জাহান্নামে জ্বলছে এবং জ্বলবে। গোলাম আযম মিথ্যা কথা বলেছে যে সে তার শিক্ষকরা আরবীতে ক্লাসে লেকচার দিতে পারেনি বলে সে আরবী ত্যাগ করে পুনঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ালেখা করে সময় নষ্টের ফলে অনার্স পড়তে পারেনি। আসলে সে বিয়েপাগল হয়ে মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে শিক্ষা বছরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। ফলে অনার্স ছাড়াই তাকে পাস কোর্সে গ্রাজুয়েট হতে হয়েছে। তার ছোটো ভাই মাহ্‌দী ১৯৬৩-৬৪ সালে বিয়েপাগল হলে পর তার চাচা শফীকুল ইসলাম আমাকে অধ্যাপক আযমদের চার ভাইয়ের মধ্যে ডাঃ গোলাম মোয়ায্‌যম ব্যতীত তিন ভাইয়ের পাগল হওয়ার ঘটনা সবিস্তারে বলেছে। ঐ সময়ে একদিন আমি সম্মিলিত বিরোধী দলের অফিসে বসা। এক অল্প বয়সী ব্যক্তি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে "শফীক মিয়া আছে, শফীক মিয়া"? আমি তার বয়স ও শফীকুল ইসলামের বয়স তুলনা করে একটু হতভম্ভ হয়ে গিয়ে ভিতরে গিয়ে তাজুদ্দীন সহ অন্যান্য নেতাদের সাথে বৈঠকরত শফীক সাহেবকে খবর দিলে শফীক সাহেব বের হয়ে এসে তার এক ভাতিজাকে বাসায় টেলিফোন করে আরেক ভাতিজা গোলাম মুকাররামকে ডেকে এনে মাহদীকে বাসায় পৌছিয়ে দেয়। তারপর শফীক সাহেব তার ভাতিজাদের পাগল হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করে।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মুসলমানরা তাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষাকে সমান্তরালে সমৃদ্ধ করায় আজ মালয়েশিয়া মুসলিমবিশ্বে কোথায় এবং বাংলাদেশ কোথায়? সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশী দু'মূর্খের ওআইসির সেক্রেটারী জেনারেল হওয়ার প্রস্তাব শুনে আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করেছি, "আল্লাহ্! এমনিতেই তোমার বাংলাদেশী বান্দারা বহু দুর্নামে ডোবা। তুমি আমীনুর রহমান শামসুদ্দোহা ও হুমায়ুন রশীদদের মতো বাংলাদেশীকে ওআইসির সেক্রেটারী জেনারেল বানিয়ে জাতিকে অতিরিক্ত অপমানিত করোনা। কারণ, আরব বদমাশগুলো তাদের বদমাশী পূর্ণ করে মরুক। তারা অন্ততঃ লাত মানাতের ভাষারূপে হলেও আরবী জানে। আমাদের সোনার বাংলার

পিতলা কলসগুলো তো তাও জানেনা। তুমি আমাদের মান রক্ষা করো।" আমি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এমন কি ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডের মুসলিম রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী ও ইসলামী নেতাদের দেখেছি যে তারা আরবীতে ফ্লুয়েন্ট। কিন্তু আমাদের "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ওয়ালা মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতের নাম মুহিবুল হাসান, জুলমত আলী ও হায়েজুর রহমান। এদের নামের অর্থ জানলে এরা ঘর থেকে বের হতে লজ্জাবোধ করতো। আমাকে একবার মোহাম্মাদ কোত্ব আমাদের দেশের নামের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলো যে তোমাদের দেশে যে আরবী নাম রাখে, তার অর্থ বোঝার মতো লোকও কি তোমাদের দেশে নেই? গোলাম আযম, সাজ্জাদ হোসেইন, গোলাম হোসেইন ও মুহিবুল হাসান এ সমস্ত নাম কি করে ডাকা যায়?

চিন্তা করে আমি খুবই লজ্জিত হই। সে সময় জিয়াউর রহমানের এক মন্ত্রী সৌদী আরব সফররত ছিলো। হতভাগার নাম ছিলো মুহিবুল হাসান। অর্থাৎ যে হাসানকে ভয় দেখায়। গোলাম আযম অর্থৎ মহা দাস, সাজ্জাদ হোসাইন অর্থাৎ সর্বদা যে হোসাইনকে সিজদা করে। সে সময় পাকিস্তানবাদী আওয়ামীলীগ নেতা জুলমত আলী লন্ডন থেকে মক্কা এসে আমার কাছে উঠে। তাকে মানুষের কাছে পরিচিত করতে গিয়েই বিপদে পড়ি। আলীকে আরবরা জ্ঞানের নগরী বলে জানে। আর আমাদের বাঙ্গালী জুলমত আলী, আলীর মুর্খতার অন্ধকার! অধ্যাপক গোলাম আযমও মক্কায় একবার দুঃখ করে আমাকে বলেছে যে আরবদের নিকট তার নাম বলতে তার লজ্জা বোধ হয়। আমার সামনেই তাকে তার গাড়ীর আরবী ড্রাইভার "ইয়া গোলাম" বলে ডেকেছে। মক্কায় তার ও টেলিফোন বিভাগে কার্যরত এক বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে তার অফিসে তুলকালাম কান্ড বাধে। উত্তরবঙ্গের এ লোকটির নাম ছিলো হায়েজুর রহমান। সাধারণ অর্থে "আল্লাহ্‌র মাসিক"। লোকটি আমার কাছে আসলে আমি আরবীতে তার নামটি "হাজত" অর্থাৎ "প্রয়োজন" ধাতু থেকে তৈরী বলে তাকে কোনো প্রকার মুখরক্ষার পথকরে দেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সাজ্জাদ হোসাইন তখন মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা গোলাম আযম তখন মক্কার ইখওয়ানী ও ইসলামী সার্কেলে একজন পরিচিত ব্যক্তি!

ভাষা আন্দোলনের মূর্খ চন্ডালেরা বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী জাতিকে এমন বিকলাঙ্গ করেছে যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বাংলা ভাষা প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতির হাতে মার খেয়ে এদেশের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম নিজঘরে ক্রেতা পায়না। ওপারে ভাষা ও কাব্য ধার করে লিখলেই এদের বইপুস্তক কিছুটা চলে। তা না হলে তা আজ লবনের পোটলা বানানোর জন্যও বিক্রি হচ্ছে না। কারণ পলিথিন এসে তার বাজার নিয়ে নিয়েছে। অথচ হিন্দি রাষ্ট্র ভাষার ভারতে কোলকাতার বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদেরও বুদ্ধিবৃত্তি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এতটুকু প্রতিষ্ঠা করেছে যে এখানকার সাহিত্যিকরা তাদের দুয়ারে সর্বস্তরে ভিক্ষুকই রয়ে গিয়েছে। ওদের সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও কাব্যে আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজী ভাষার শব্দমুক্তা দিন দিন বেড়ে ওদের বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতা এতদুর এগিয়ে নিয়েছে যে এপারের বাংলা একটি সীমাবদ্ধ গন্ডিতে দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। এদেশের প্রচার মাধ্যমের বাংলাভাষা ও সাহিত্যকর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যায় সে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ ছাড়া তাতে আর কোনো নতুন সংযোজন হচ্ছেনা। আর ওদের সংবাদ ও সাহিত্যে মার্কিং কলম নিয়ে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করলে দেখা যায় যে প্রতি পৃষ্ঠায় কোথাও অর্ধশত শব্দ বিশ্বভাষায় সমৃদ্ধ। ফলে এদেশের সাংস্কৃতি দেশবাসীর কাছেই পরিত্যাক্ত হয়ে মিলেনিয়াম, নববর্ষ ও বিভিন্ন পর্বে রাস্তাঘাটে, পার্কে উদ্যানে ও তথাকথিত কুশিক্ষার শিক্ষাঙ্গনে উলঙ্গ নরনারীর উম্মত্ত পাশবতার রূপ নিচ্ছে। দেশের সামর্থবান যুবকরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। মধ্যবিত্তরা অফিসে আদালতে ঘুষ খেয়ে প্রান্তিক দেশবাসীর রক্তের শেষ বিন্দু শোষণ করছে। নিম্নবিত্তরা ছিনতাই, চাঁদাবাজি, নেশাপাচার ও প্রসার এবং দুরারোগ্য এইডস রোগের ও ডেঙ্গুজরের এডিস্ মশার ভূমিকায় পাখা মেলছে।

আজ যদি সুস্থ চিন্তার সাথে পূর্ব বাংলায় বাংলার সাথে আরবী পাশাপাশি হাত ধরে সমান ভাবে গড়ে উঠতো, তা হলে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ ও তার সাহিত্য দেশ ও দেশবাসীকে সমৃদ্ধ করে পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বর্তমান হীনমন্যতার স্থলে এদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির অঙ্গনকে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিরূপে নিজেদের সমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতো। ভারতে যেখানে শত শত আরবী সাহিত্যের পন্ডিত পাওয়া যায়, যাদের পান্ডিত্বের স্বীকৃতি আরব বিশ্বেও দিন দিন প্রভাব বিস্তার করছে, সেখানে আমাদের ষোল কোটি বাঙ্গালী মুসলমানদের মাঝে নাম নেয়া যায়, এমন একজন আরবী জানা পন্ডিতও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ওআইসির সেক্রেটারী হয়ে আরবীতে সভার কার্য পরিচালনা করার মতো লোক যেখানে ভারতে, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায়

ভুরিভুরি বিদ্যমান, সেখানে বাংলাদেশে একজনও পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো আরবদেশে রাষ্ট্রদূত রূপে সমমর্যাদায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম, এমন কোনো ব্যক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ে কল্পনাও করা যায় না। এ দৈন্যতা ও দেউলিয়াপনার জন্য দায়ী তথাকথিত ভাষা আন্দোলন। কোনো অর্বাচিন দিন ও রাতকানা বুদ্ধিজীবী বা তাদের পেঁচার দল হয়তো বলবে যে, ভাষা আন্দোলন না হলে স্বাধীন বাংলাদেশই হতো না। তার একশ'ভাগ সত্য উত্তর হলো বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনের কোনো ফল নয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানী শাসনের ভুলের সন্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকারী বাঙ্গালী মুসলিমরা উর্দুর বিরুদ্ধে চিল্লাচিল্লি না করে দূরদৃষ্টি দিয়ে বাংলার সাথে দ্বিতীয়বাহু রূপে ক্বোরআনের ভাষাকে গ্রহণ করলে বাংলাদেশ নীরবে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তিরিশ কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠির নেতা হতো। ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা এদের সাথে যোগ দিতো। ভারতের বর্ণবাদী জাত প্রথায় পিষ্ট আশি কোটি মুস্তাদআফ তাদের মুক্তিরদিশা পেতো এদের যায়দ বেলালের আদর্শে। বাবর, শের শাহ, সুলতান মাহ্মুদ ও মুঘলদের লুটতরাজের মুয়াবিয়া ইয়াযীদী ইসলামের দুঃস্বপ্ন ভারতের একশ' কোটি মানুষকে আজো তাড়া করে বেড়াতো না। বর্তমানে আণবিক শক্তি সম্পন্ন পাকিস্তানী অসভ্যশাসক ও শোষকচক্র ও ভারতীয় রামরাজচক্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সামরিক ধ্বংসের ক্ষেত্র তৈরী করছে, এ অবস্থার আদৌ সৃষ্টি হতো না। বর্তমান বাংলাদেশ ভারতীয় পন্য ও সংস্কৃতির বাজার ও দুটি স্বামীহারা ও পিতামাতা স্বজনহারা নারীর আচঁলে বাঁধা। আল্লাহ্র বিধান হলো, তিনি শাসকদের ভাগ্যে শাসিতদের ইহকাল ও পরকাল নির্ধারণ করেন। বাংলাদেশের ব্যাপারে যদি তাই হয়, তা হলে কী হবে? কারো ঘরে স্বামী স্ত্রী ও সোহাগের সংসার থাকবে না। সব খালেদা- হাসিনার সংসার হবে। এটাই বোধ হয় পার্থিব দোজখের ভয়ঙ্করতম নমুনা।

এ পরিণাম এড়াতে হলে একটিমাত্র পথ রয়েছে। তা হলো স্রষ্টার বিধানে মানুষের পারিবারিক সংসারের সমাজ ও রাষ্ট্রগড়ার ব্যাপক সংগ্রামে নেমে পড়া। সারাবিশ্ব আজ এ নেয়ামত ও আশীর্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। এ কাজটি এ বাংলাদেশ থেকে শুরু হতে পারে। কারণ এদেশটি দু'টি ঘরভাঙ্গা নারীর ভাগ্যে অভিশপ্ত। এদের পেছনে যে পুরুষ নামের ক্লিব গুলো আছে, এগুলো এ জাতির উপর আল্লাহ্র রহমত বঞ্চিত বন্ধাত্বের আযাবের আসমানী সনদ। গোলাম আযম ও আযীযুল হকদের এদের সাথে যোগদান এদের গোর খোদাই ও শেষকৃত্যের বাড়তি আলামত।

এ অবস্থায় বিবেকবান জাত, জাতক ও মহাজাতক মানব সন্তানদের জারজ ও তাদের জারজ জীবন ও জারজ সভ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সাধারণ মানুষ, জাতমানুষ। মানবতার প্রতিজ্ঞায় জীবন যাপনকারী মানুষ জাতক শ্রেণী। এদের নেতৃত্ব যারা দেয় তারা মহাজাতক। মানব জাতির আদর্শ ভোলা, আদর্শ ত্যাগী ও আদর্শ বিরোধীরা জারজ। অর্থাৎ মানুষ হয়েও এরা মানব জাতির জন্ম, জীবিকা, জীবন ও মৃত্যুতে লক্ষ্যচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটায়। এ অর্থে এরা জাতধ্বংসী জারজ শ্রেণী। যেমন জারক সবখাদ্য হজম করে ফেলে, এরা সেরূপ মানবতার গুণাবলী শেষ করে দেয়।

মানব শ্রেণীর এ অর্জিত শ্রেণীবিভাগকে বুঝে, মেনে ও বিশ্বকে মানিয়ে স্বাধীন প্রতিযোগিতায় নিজেকে উন্নত ও উন্নীত করে মানব জন্মকে স্বার্থক করার বিরল সুযোগ এখন মানব জাতের সামনে উপস্থিত। যে বা যারা এ পথে অগ্রণী হবে, তারা হবে জাতক ও মহাজাতক। যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা হবে জাত। আর যারা এর বিরোধীতা করবে তারা হবে জারজ, যাকে ক্বোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে "যানীম্" এবং ইংরেজীতে বলা হয় Misbegotten, যাকে সরল বাংলায় অবৈধ সন্তাপ্রাপ্ত বলা যেতে পারে।

মানব জাতের উৎস, তার বিকাশ ও নাশ

মানবজাত আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আশরাফুল মাখলুকাত। সে স্বনাম ও স্বকর্মে সার্থক হলে স্রষ্টার পরই সে শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে আল্লাহ্কে সিজ্দা করে তার স্বীকৃতি দিতে হয়। এদের নিম্নশ্রেণী মানবজাত। মধ্যম শ্রেণী জাতকজাত। শ্রেষ্ঠ শ্রেণী মহাজাতক। এদের সবার শত্রু জারজরা। এরা আকারে মানুষ। মূলে শয়তান বা ইবলিসের মানস পুত্র। মানুষ জাতির জাতশত্রু ইব্লিস এদের মাতা-পিতার মিলনে অংশিদার হয়ে এদের গর্ভসঞ্চার থেকে, ভূমিষ্ঠ, খাদ্য, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনমরণে সঙ্গী। কিন্তু কৃবর ও হাশরের দিন একজন আরেক জনের শত্রু। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, মাতা পিতার, পিতা মাতার, সন্তান পিতামাতার, পিতামাতা সন্তানের ও শাসক শাসিতের এবং শাসিত শাসকের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করে দ্বিগুন শাস্তির জন্য আবেদন জানাবে। আল্লাহ্ বলবেন, "তোমাদের উভয়কেই দ্বিগুন শাস্তি দেয়া হলো"।

رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ (সূরা আরাফ-৩৮)

অপর দিকে জাত, জাতক ও মহাজাতক মানবরা পৃথিবীতে জাত জাতককে অনুসরণ করতে চাইবে, এবং এরা উভয়শ্রেণী মিলে উত্তম মহাজাতক শ্রেণীকে জানমাল সমর্পণকরে তাদের ইমামতে পার্থিব জীবন যাপন করবে। মৃত্যুর পর একে অপরের জানাযা পড়ে দাফন করে তাদের জন্য দোয়া করবে প্রত্যেক সালাত শেষে। রোজ কেয়ামতে এরা পরস্পরকে সালাম করবে تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ এবং একজন অপর জনের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে মর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া করবে। (সূরা ইব্রাহীম-২৩)। স্বয়ং আল্লাহ্ ক্বেয়ামতের দিন সালাম জানাবেন তাঁর এ জাত, জাতক ও মহাজাতক বান্দাদের। سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (সূরা ইয়াসীন-৫৮) এর বিপরীত মানব জাতের কুলাঙ্গার, জারজদের, আল্লাহ্ হাশরের মাঠেই জাত, জাতক ও মহাজাতক বান্দাদের থেকে পৃথক হতে হুকুম জারী করে বলবেন وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "তোরা জারজরা পৃথক হয়ে যা" (ইয়াসিন-৫৯) তারপর মানব জাতের এ জারজ শ্রেণীর অপকর্মের চার্জশীট দিবেন আল্লাহ্। (সূরা ইয়াসীন ৬০-৬৭)। তারপর এ জারজ শ্রেণী করজোড় করে কৈফিয়ত পেশ করে আল্লাহ্‌র সাথে একটু কথা বলে দয়া ভিক্ষা করতে চাইবে। قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ- رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (সূরা মু'মিনুন ১০৬-১০৭)

তদুত্তরে আল্লাহ্ তাদের বলবেন, "তোরা অভিশপ্ত হয়ে এ জাহান্নামেই থাক। আমার সাথে কোনো কথাই বলবিনা।" (সূরা মু'মিনুন-১০৮) তারপর পুনঃ তাঁর জাতক ও মহাজাতক বান্দাদের গুণাবলী তুলে ধরবেন জারজদের সামনে। সে দিন আল্লাহ তাদের বিজয় ঘোষণা করে তাদের পুরষ্কার দিবেন (সুরা মু'মিনূন ১০৯-১১১)।

মানব জাতের কুলাঙ্গার জারজদের পরিচয়

আমাদের মানব সমাজে তিনটি বিশেষ নিন্দাসূচক গালি রয়েছে। আসলে কিন্তু এগুলো গালি নয়। মানবজাতের পতন ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের সূচক নাম মাত্র। তা হলো ঃ

(১) হারামযাদা,

(২) হারামখোর,

(৩) নিমকহারাম

এ সূচকনাম থেকে যাদের জাত মুক্ত ও পবিত্র, সে মানুষেরা মানব সমাজের বৈধ ও কাঙ্খিত জনশক্তি। হারামযাদা, হারামখোর ও নিমকহারাম ব্যক্তিবর্গ মানব জাতের কুলাঙ্গার। যে জাতি এ তিন শ্রেণী থেকে তাদের জাতকে মুক্ত করতে পারে, স্রষ্টার কাছে একমাত্র সে জাতিই মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহভুক্ত। যে সমাজে এ তিন শ্রেণীর লোকেরা সমাজের স্বীকৃতজন, সে সমাজ আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংসের তালিকায় নিপতিত। পরকালে এ জাতির স্থান জাহান্নাম। এদের পার্থিব ধ্বংস শুধু সময়ের ব্যাপার।

যে সমাজে এ তিন শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব, সে সমাজে পৃথিবী ধ্বংস ও ক্বেয়ামত আসন্নের আলামত। ভূ-পৃষ্ঠে সে দেশ ও জাতি জাহান্নাম। সে দেশের ধ্বংসের জন্য সে দেশস্থিত জাতকমানুষ, পশুশ্রেণী, গাছ-পালা ও কীটপতঙ্গ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। যে কোনো সময় আকাশ ভাঙ্গার মতো তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসে। নমরুদ, আদ, সামূদ, ফিরআউন, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও ময়নামতির ধ্বংসাবশেষ তার নমুনা।

পূর্বে পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে হারামযাদা, হারামখোর ও নিমকহারামদের প্রাদুর্ভাব হতো, এবং সে বিশেষ দেশ ও জাতি গযবে নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্যান্যদের জন্য শিক্ষনীয় হতো। তাতে তা দেখে তওবা করে জাত ও জাতক জনগোষ্ঠি মানুষ হয়ে শান্তির জীবন যাপন করতো।

এখন গোটাবিশ্ব হারামযাদা, হারামখোর ও নিমকহারাম রোগের মহামারীতে জর্জরিত। এমন কোনো ঘর, পরিবার ও সমাজ নেই যেখানে এর বিষ ছড়ায়নি। দিন দিন অরণ্যে লাগা দাবানলের মতো মানবতার শেষ আশ্রয় স্থল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঈমানকে জারজতায় আক্রান্ত হারামযাদা, হারামখোর ও নিমকহারামরা পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে।

হযরত নূহের ঘরে এ জাতের একটি নারী ও একপুত্র মহাপ্লাবন ডেকে এনেছে। হযরত লূত আঃ এর ঘরে একটি নারী ঐ শ্রেণীর হয়ে আল্লাহ্‌র গযব ডেকে এনে সে জাতিকে মাটির নিচে পুতে সে জনবসতিকে ধ্বংসের সমূদ্রে রূপান্তরিত

করেছে।

এ তিনটি পাপের মধ্যে হারামযাদা, বা জন্মে জারজ হওয়া সবচাইতে লঘু দোষণীয়। কারণ, এতে জাত দায়ী নয়। জন্মদাতা ও দাত্রী দায়ী। এ জারজই বড়ো হয়ে জাতক অর্থাৎ সাধু হয়ে গেলে সে নিস্পাপ সাধু। হ্যাঁ, যদি জন্ম দোষের মতো তার স্বভাবচরিত্র হয়, তাহলে সে চিহ্নিত ঘৃণ্য হবে। এদের ক্বোরআনে "যানীম" বলা হয়েছে। ক্বোরেশী যোদ্ধা খালেদের পিতা ওয়ালিদকে আল্লাহ্ এ শব্দে উল্লেখ করেছেন। (সূরা ক্বালাম-১৩)।

হযরত মূসা আঃ এর সম্প্রদায়ভূক্ত এক ব্যক্তি ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে লোভলিপ্সায় পড়ে মূসা আঃ এর আদর্শ ত্যাগ করে ফিরআউনী পথ ধরলে, আল্লাহ্ তাকে তার সকল ধন, জন ও সম্পদ সহ মাটিতে ধ্বসিয়ে নিশ্চহ্ন করে দেন। সে জারজ লোকটির নাম ক্বারুন। তার নামের কোনো ব্যক্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া না গেলেও তার চরিত্রের লোকে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশও ভরা। পুঁজিবাদী সভ্যতার ভোগবাদী ধনিক শ্রেণী সে কারুনের প্রজন্ম। বর্তমান উন্নত দেশসমূহ ও তাদের বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ ও কন্সোর্টিয়াম কারুনদের চক্র।

আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবীর উপর পূর্ণ ক্বোরআন নাযিল করে আমাদের সে মানব জাতের জারজদের বর্ণনা দিয়ে প্রতিদিন পাঁচবার সালাতে দাঁড়িয়ে তা স্মরণ করে তা থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। সে ক্বোরআন ভিত্তিক রাসূল তাঁর সমাজের জারজদের ত্যাগ করে হিজরত করলে মাত্র দশ বছরেই আল্লাহ্ সে সমাজের জারজদের পতন ঘটিয়ে, জাত, জাতক ও মহাজাতকের সমাজবিপ্লবের আদর্শ স্থাপন করে দেন। তাঁর তোলা ঢেউয়ে তখনকার উভয় পরাশক্তির পতন হয়।

তারপর তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্তরা তাঁর শিক্ষা ত্যাগ করে জারজদের অনুসরণে জাতত্যাগী হলে আল্লাহ্ তাদের ওদের মতোই নির্মূল করে দেন। মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও ইয়াযীদরা তার দৃষ্টান্ত। মুয়াবিয়া, মারওয়ান, মুগীরা ও আমর ইবনুল আসদের জন্মে সে দোষ থাকলেও আল্লাহ্ রাসূল সাঃকে পাঠিয়ে তাদের তা থেকে বিধৌত হওয়ার মহা সুযোগ দিয়েছিলেন। তা পেয়েও তারা তা ত্যাগ করে তাদের অপবিত্র মূলে প্রত্যাবর্তন করে নিন্দনীয় হয়েছে। যায়দ, বিলাল, আম্মার, ইবন্ মাসউদ, সুহাইব ও সালমানরা নবী সঃ এর পরশে জাতের সন্ধান পেয়ে জাতক হয়ে জাতকের আদর্শ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে অমরত্ব অর্জন করেছে। মুস্তাদআফ হয়েই মানুষকে জাত হয়ে জাতকতা অর্জন করতে হয়। মুস্তাদআফ প্রকৃতি ত্যাগ করা মাত্রই মানুষ মুস্তাকবির হয়। অর্থাৎ জাত থেকে জারজ হয়। যেমন নমরুদ, ফেরআউন, ক্বারুন ও ওয়ালিদ হয়েছিলো। তাদের পরিণাম থেকে একজনও রেহাই পায়নি। মুস্তাকবির চরিত্র ত্যাগ করে মুস্তাদআফ হয়ে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মুহাম্মাদ সঃ রা যে মহাজাতক হয়েছিলেন, তার কি মৃত্যু আছে? ক্ষয় আছে? আমরা কাদের অনুসারী হবো? নূহ ও ইব্রাহীম আঃ দের লোকেরা তাঁদের জাত ত্যাগ করে আকার ও প্রকৃতিতে কুকুর, বানর ও শূকর হয়েছিলো। আখেরী নবী সঃ আসার পর ঐ হারামজন্ম, হারাম খাওয়া ও নিমকহারামী করলে আমাদের শুধু ঐ শূকর, কুকুর ও বানর বানিয়ে লঘুশাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিবেন না। আমাদের ইহকাল পরকাল উভয়ই জাহান্নাম বানিয়ে ছাড়বেন।

হারামযাদা হওয়ার প্রমাণিত পাপ থেকে আমাদের সমাজ সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও অনেকটা মুক্ত বলা চলে। সে জন্য এখনো আল্লাহ্র শুকুর। কিন্তু হারামখোরী ও নিমকহারামী থেকে ক'টি লোক মুক্ত? বা বাংলাদেশের জনসংখ্যার কতোজন মুক্ত?

ব্যাপারটি আরেকটু খুলে বলি। সরকার ও সমাজ শাসনের সাথে যারা জড়িত, তাদের মধ্যে তো হারাম খাওয়া ও জাতির সাথে নিমকহারামী থেকে একটি মানুষও সম্পূর্ণ মুক্ত নেই! আংশিক ভাবে বারো কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো বারোজন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাদ্রাসা, মসজিদ, মাযার, পীরের দরগা, পীরের খানক্বাহ ও কাযীর অফিসে একটি লোকও হারামখোরী ও নিমকহারামী থেকে মুক্ত নেই। এটি এমন সত্য, যেমন পূর্ব থেকে সূর্যোদয় ও পশ্চিমে সূর্যাস্ত হওয়া সত্য। কোনো মাদ্রাসার বেতনের বিল হয়না ঘুষ না দিলে। এরা সবাই সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত হারামখোর জাহান্নামী।

হারামখোর ব্যক্তিরা হারামযাদা বা জারজ হওয়ার চেয়েও পাপী। কারণ, হারামযাদা তো জন্মদাতা ও দাত্রীর দোষে অনাকাঙ্খিত। নিজের দোষে নয়। হারামখোর সে বুঝের হয়ে হারাম খায়, হারাম সন্তান জন্ম দেয় এবং হারাম জমা করে পরবর্তী বংশধরদের জন্য তা রেখে যায়। ফলে ক্বেয়ামত পর্যন্ত হারামযাদা জন্মাতে থাকবে। যে পর্যন্ত না তার কোনো অধস্তন সন্তান তার বাপ দাদার হারাম বাড়ি-ঘর ও সম্পদ ত্যাগ করে হিজরত না করবে, তারা ওর উপরই

থাকবে। এ অবস্থায় জাত ও জাতক হতে হলে মহামানব, মহাজাতক নবীদের অনুসরণে হিজরত ব্যতীত কোনো পথ নেই। না করলে নামাজ, রোজা, যাকাত, দান ও হজ্ব করা সত্ত্বেও তারা জাহান্নামী। কারণ, তারা হারাম খায় বলে তারা খবীস, এবং খবীসরা কালেমায়ে তাইয়েবার অযোগ্য। আল্লাহ্ স্বয়ং তাইয়েব। তিনি তাইয়েব ব্যতীত কোনো খবীস গ্রহণ করেন না। তাই খবীসদের লোক দেখানো সকল ধর্মকর্ম বরবাদ, বিফল ও পন্ডশ্রম। একটি লোক হালাল খেয়ে তাওহীদের উপর থাকলে কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার না করে শেষে জান্নাতে যেতে পারবে। কিন্তু হারামখোর ব্যক্তিরা হাযার ইবাদত করেও মুক্তি পাবে না। কারণ তার মধ্যে ঈমানের ভিত "তাইয়্যেব" বা হালাল রিযিক্ব নেই। তাই তার সব মিথ্যা।

এবার আমরা নিমকহারামদের সংজ্ঞায় যাচ্ছি। এ শ্রেণীর মানব সন্তানরা হারামযাদা ও হারামখোরের চেয়েও নিকৃষ্ট ঘৃণ্যজীব। আরবী ও ক্বোরআনের ভাষায় এদের "কাফের" বলা হয়। কাফের হলো "কাফেরুন্ নিয়াম" অর্থাৎ নেয়ামত ও দানের অস্বীকারকারী। সৃষ্টির সবটাই স্রষ্টার দান। সৃষ্টির সেরা মানব জাত। তার উপর আল্লাহ্র দান সবচেয়ে বেশী, অগণিত। তাই এ মানুষ যখন আল্লাহ্র দান অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হয়, তখনই সে কাফের। গরু, ছাগল, শৃগাল, কুকুর ও শূকর প্রভৃতি কখনো কাফের হতে পারে না। কারণ, তাদের প্রতি আল্লাহ্র দান সীমিত। তারা কেউ মানুষের মতো স্বাধীন সত্তা প্রদত্ত নয়। গবাদি ও গৃহ পালিত পশু তাদের মানুষ মনিবের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা করেই মাটিতে মিশে যায়। তাদের মানুষের মতো হিসাব নিকাশ ও বেহেশত দোযখ নেই। মানুষের প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস ও খুটি নাটি কর্মের জন্য তাকে পূর্ণ হিসেব দিতে হবে। ঈমানদার প্রত্যেক মানুষকে তার ঈমানদার পিতা-মাতা ও পালনকারী অভিভাবকের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র আনুগত্যের পরীক্ষা পাশকরে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। পিতা-মাতা ও অভিভাবক যদি কাফের ও বেঈমান হয়, তা হলে ঈমানদার পোষ্যের তাদের প্রতি আনুগত্য নেই। ঐ সমস্ত কাফের পিতামাতা ও পালক অভিভাবক আল্লাহ্র আনুগত্যে বাধা দানকারী হলে তাদের ত্যাগ, ও যুদ্ধে মুখোমুখী হলে হত্যা করা কর্তব্য। আর যদি তারা ঈমানে বাধা না দেয়, তাহলে তারা বৃদ্ধ ও সেবার মুখাপেক্ষী হলে, তাদের সেবা যত্ন করা উত্তম কাজ। কিন্তু ঈমানী দায়িত্বে বাধা দেয়া মাত্রই তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবেনা। যেমন হযরত ইব্রাহীম ও আখেরী নবী রাখেন নি।

প্রত্যেক নারীকে, অর্থাৎ ঈমানদার নারীকে তার পিতা-মাতার পর বিয়ের পর তার মু'মিন স্বামীর অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ পুরুষদের নারীদের উপর এক স্তর প্রাধান্য দিয়ে তাদের ভালো মন্দের দায়িত্ব দিয়েছেন। নারীদের সর্বদা পুরুষের আল্লাহ্ প্রদত্ত কর্তৃত্বের অধীনে থাকতে হবে। বিবাহের পূর্বে পিতা, পিতা না থাকলে ভাই, ভাই না থাকলে চাচা-মামা বা দাদা-নানা, এবং বিবাহ হলে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যু হলে যোগ্য ছেলের কর্তৃত্বাধীন ঈমানী আনুগত্যে থাকতে হবে। ইসলামে কর্তৃত্ব ও সর্বশেষ জবাবদিহিতা পুরুষের। الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (সূরা নিসা-৩৪, সূরা বাক্বারা-২২৮)

তবে মনে রাখতে হবে এটা সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান ও আদব-কায়দার মধ্যে হবে। বর্তমান তথাকথিত মুসলিম সমাজ আদৌ ইসলামী নয়। পিতা-মাতা ইসলামী নয়, তাদের বিয়ে ইসলামী নয়, নারী দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে পিত্রালয় ছেড়ে আরেকটি পুরুষের ঘরে আসে। পুরুষ তার দৈহিক চাহিদা পুরণের জন্য একটি নারী সংগ্রহ করে তার সাথে কাটায়। তারপর সন্তান হয়। হালাল হারাম নেই। আল্লাহ্র দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নেই। তাই নির্ভিক সত্য বললে এ সমাজ জারজ জন্ম, হারাম ভোগ বিলাস ও নিমকহারাম প্রজন্মের লালন পালনের মানবেতর খামার। তাই বিশ্বে মানুষ আজ সকল ইতর প্রাণীর চেয়ে বিপন্ন এবং মানব জীবন সকল পশুর জীবনের চেয়ে সমস্যাবহুল।

এ মানুষকে তাদের স্রষ্টার আজ্ঞাবাহী জাত, জাতক ও মহাজাতকের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ইসলাম ও ঈমানে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। মানব জাতিকে তাদের স্বভাবধর্মে ফেরত আনার পথে সর্বপ্রথম বাধা প্রথমে হারামভোগী রাব্বাঈ, পাদ্রী, ঠাকুর, মোল্লা, পীর ও পেশাদার ইসলামী রাজনৈতিক বাটপারশ্রেণী, তারপর বেঈমান নিমকহারাম সরকার ও তার আমলা ও সশস্ত্রবাহিনী।

বেতনভুক্ত কোনো শাসক, কোনো কর্মচারী ও সেনাবাহিনী সে জাতির আপনজন নয়। তারা তাদের পুরুষদের ঔরসে ও নারীদের জঠরে উৎপাদিত ও তাদের অর্থে পালিত চিরশত্রু, শোষক ও বিদেশী উপনিবেশবাদের দেশীয় জারজ। তাদের জাত, জাতক ও মহজাতক নয়। কারণ নির্দিষ্ট বেতন ও পারিশ্রমিকভুক হলে যেমন নবী রাসূল হওয়া যায় না,

ধর্মীয় ইমাম ও গুরু হওয়া যায়না এবং স্বামী স্ত্রী হওয়া যায় না, শুধু ধর্মীয় বেশ্যা ও বেশ্যা পিতা-মাতা হওয়া যায়, তদ্রুপ বেতন ভুক শাসক তার আমলা ও সেনাবাহিনী জাতির জাত ও জাতক না হয়ে জারজ নিমক হারাম হয়। এরা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির শত্রু। ক্বোরআনে সূরা মুমতাহানা শুরু ও শেষ করা হয়েছে এ বলে যে, "হে ঈমানদার মানুষেরা! তোমরা কখনো এদের তোমাদের স্বজন বানাবেনা। এরা ইহকাল পরকালে তোমাদের জন্য মৃত কবরবাসী ও কাফেরদের সদৃশ"। (দেখো সূরা মুম্‌তাহানা)।

আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দাদের এ নিমকহারাম শ্রেণী জাতির সম্পদের সিংহভাগ শোষণ করে জাতির শত্রু জারজ ও হারামখোর জন্ম দিয়ে তাদের উচ্ছিষ্ট জাতির জন্য রেখে দেয়। যাতে ওদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, ক্ষেতে খামারে গামছা পরে ফসল উৎপাদন করে ওদের রসনার যোগান দেয়। বন্দরে-নগরে এদের কারখানায় কাঁচা মাল সরবরাহ করে। শ্রমিক হিসেবে উৎপাদন করে ওদের রফতানী আয় বাড়ায়। ওদের আমদানীকৃত পণ্যের উপর আরোপিত পরোক্ষ ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদান এবং সর্বশেষ এদের রাজস্ব আয়ের ক্রীতদাস বৃত্তি করে। তারপর এ অর্ধাহারী অপুষ্ট ও রোগাক্লিষ্ট জনগণ ধর্মকর্মে বসে আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ পেয়ে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন হয়ে যাতে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে না তুলতে পারে, সেজন্য ওদের শ্রেণীর উলঙ্গ নারীদের নগ্নমাংস প্রদর্শনী ও বিকৃত রুচির গান বাজনা ও নাটক সিনেমা, টেলিভিশন ও বেতার সম্প্রচার দিয়ে দেশ গ্রাম ও পল্লীতে চরিত্র হরণের মহামারী ছড়ায়। (সূরা সাবা ৩১ আয়াত থেকে ৩৫ পর্যন্ত দেখো)

এ জারজদের একটি স্থুল প্রমাণ এখানে তুলে ধরা যায়। বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান রূপে পাকিস্তানের অংশ থাকাকালীন আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, দাউদ, সায়গল ও গান্ধারা প্রভৃতির মালিক বাইশ পারিবারকে শোষক রূপে চিত্রিত করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়া হয়েছিলো। আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট পাকিস্তানী জাতির মাঝে এরা জারজব্যাধি ছিলো নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে ওদের আদলে জন্মানো শত শত ধনীরাও নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী জাতের মাঝে সে সম্প্রদায়। সে পাকিস্তানের মতো শোষক সরকার, আম্‌লা ও সেনাবাহিনীর খুটার জোরে এদের নগর জীবনের বেবীলোনিয়া। বেবীলোনিয়া শব্দের অর্থ পাপ ও ব্যাভিচারের নগরী। পাকিস্তানী ও ইন্ডিয়ান মাড়ওয়ারীদের চেয়ে এরা জঘণ্য। কারণ ওরা পর ছিলো। ওদের বিরুদ্ধে ভীনদেশী বলে প্রতিবাদ ও প্রচারণার ভয় ছিলো। কিন্তু দেশীয় জারজদের সে ভয় নেই।

একটি সমীক্ষা চালিয়ে পরিসংখ্যান দাঁড় করালে ব্যাপারটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে। রাজধানী ঢাকার গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরা ও ধানমন্ডিতে প্রাসাদীয় বাড়ীর মালিক ও তার বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ক'জন এ দেশের জাত ও জাতক বাঙ্গালী এবং কজন জারজ বাঙ্গালী? এদের ছেলে মেয়েরা ক'জন বাংলাদেশে ও ক'জন ইউরোপ আমেরিকায়? এদেশের মোট গাড়ীর শতকরা ক'ভাগ জাতির বেতন ভুক আমলা, রাজনীতিবিদ, সেনাকর্তা, জাতির রাজস্বের ভর্তুকীতে শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ঘুষখোর পুলিশ ও আয়কর চোররা মালিক? ও কতো ভাগের মালিক দেশের তৃণ মূলে বসবাসকারী মাটির সন্তান জাত ও জাতক দেশবাসী? তা দেখলেই বুঝা যাবে যে, জাতির জাতদেহের নিমকহারাম মেলিগন্যান্ট কোষগুলো জাতীয় আয়, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির কতো ভাগ শোষণ করে, তাদের আনুপাতিক সংখ্যা কতো এবং প্রকৃত দেশবাসী কতো ভাগ ভোগ করে? এবং তাদের শতকরা হার কতো? তা হলে দেখা যাবে যে বৃটিশ উপনিবেশবাদের সাত সমূদ্র তেরো নদী ওপারের বর্গিরা জাতিকে কতোটা শোষণ করেছে, পাকিস্তানী পাঞ্জাবীরা কতোটুকু শোষণ করেছে এবং বাংলাদেশীয় জারজরা কতোটুকু শোষণ করছে।

ভালো হোক আর মন্দ হোক, প্রচলিত সমাজ ও আচারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে তা খুব স্পষ্ট করে না বললে তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠে। তাই বক্তাকে আগাম আটঘাট বেঁধে মাঠে নামতে হয়। তা না হলে হিতের চেয়ে বিপরীত বেশী হয়। লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়। আমার প্রতিবেদনে যে "জারজ" শব্দটি ব্যবহার করেছি, এতে তা সমাজের যাদের গায়ে লাগবে, আমি তাদেরকে, তাদের চেয়েও বেশী বুঝি ও চিনি। আল্লাহ্‌ আমাকে তা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে চিনিয়েছেন এবং প্রতি মুহূর্তে চিনাচ্ছেন। তাই ব্যাপারটি আরো খোলাসা করছি। প্রবাদ আছে যে, The pen is mightier than the sword , কলম তরবারীর চেয়েও শক্তিশালী। আমি বলবো যে, সাধারণ কলম তরবারীর চেয়েও শক্তিশালী। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জ্ঞানের কলম আনবিক বিস্ফোরকের চেয়েও কার্যকর শক্তিশালী। এ কলমের

কথাই আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবীর উপর নাযিল কৃত অহীতে উল্লেখ করেছেন। اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ -الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

"পড়ো, তোমার প্রতিপালক স্রষ্টার নামে। সৃষ্টি করেছেন মানবকে ঘনীভুত বীর্যের পিন্ড থেকে। পড়ো যে তোমার পতিপালক পরম দয়ালু। যিনি কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আলাক্ব)

খোদায়ী কলমের শিক্ষার পাঠ্যবই ক্বোরআন। সে ক্বোরআনের কথা লিখছি যে হাত ও কলম দিয়ে, তা তরবারি কেনো, বিশ্বের সকল শক্তির চেয়ে শক্তিধর। সে বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে এই বই লিখছি। তাই এতে কোনো বিতর্কের ছিদ্র না রাখার কথা প্রতিক্ষণ স্মরণ রেখে কলম চালাচ্ছি।

অসি ও সমরাস্ত্র দিয়ে বর্তমান শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। অতীত ও ভবিষ্যত শত্রুকে পরাভুত করা যায় না। কিন্তু সত্যের কলম দিয়ে অতীত ও অনুপস্থিত শত্রু নিধন করা যায়। বর্তমান শত্রুর মূলোৎপাটন করা যায়, এবং অনাগত শত্রুর জন্ম নিরোধ করে নিশ্চিত নিরোপদ্রব ভবিষ্যত গড়া যায়। এ লেখনীর কলম সে দিক ও কাল বিজয়ী।

সৃষ্টির স্বভাব ও জাত হলো তাওহীদ। স্রষ্টার সত্য এক অবিভাজ্য সত্য। এ বিশ্বাসই ঈমান। এর প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। আত্মসমর্পণকারী-মুসলিম। সে তার একমাত্র মুস্তাকবির স্রষ্টা, "আল্লাহু আকবারের সামনে" লুটিয়ে পড়া মুস্তাদআফ। তাঁর সামনে ব্যতীত কারো সামনে মুসলিম মাথা নত করে না। এ বিশ্বাস ও ঈমানের সে জাত, জাতক ও মহাজাতক। এ বিশ্বাসে তার কোনো শির্ক ও বিদআত যোগ হলেই সে আর যে জাতে রইলো না। সে জাতচ্যুত জারজ হয়ে গেলো। তাই যানীম, জাহান্নামী। নরকী।

মানব দেহে অসংখ্য জীব কোষ রয়েছে। এ জীব কোষের অনুগত সমবায়ে জীবের জীবন। এ সমবায়ে বিঘ্ন ও বিশৃংখলা দেখা দিলেই জীবের জীবন নাশ হয়। অসংখ্য জীবকোষের একটি কণিকা যদি কখনো জাতস্বভাব ত্যাগ করে অবাধ্য হয়ে যায়, তখন সে তার পার্শ্বস্থ কোষদেরও স্বভাব নষ্ট করে মূল জাতের বিদ্বেষী শত্রু হয়ে যায়। জাত বিদ্বেষী জারজ হয়ে যায়। এটাকেই ইংরেজীতে Malign, Malignant, Malignity বলা হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে এটাকেই ক্যান্সার বলা হয়। যার অপর নাম মৃত্যু। আরবীতে এ চরিত্রটিকে "খবীস্" বলা হয়। তা থেকেই ক্বোরআনে খবীস্ নারী-পুরুষদের নিন্দা ও নিন্দনীয় করা হয়েছে। এরা জাত নষ্টকারী জারজ-জারজী। এদের নির্মূল করলে সমাজ, জাত ও জাতক রক্ষা পায়। এদের চলতে দিলে গোটা জাতকে এরা জারজ করে ফেলে। গোটা মানব জাতি আজ এ জারজ মহামারীতে আক্রান্ত।

পল্লী ও সমাজচ্যুত, পিতা-মাতা ও জাত ত্যাগকারী এবং মানব জাত ও সভ্যতার তৃণমূলে অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম মানুষদের দ্বারাই প্রথমে নগর ও শহর নামের ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়। তারপর ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ যেমন গোটা দেহের জীবনী শক্তিকে চারদিক থেকে টেনে এনে কেন্দ্রীভুত করে ধ্বংসচক্র সৃষ্টিকরে, এবং তার ফলে দেহের প্রতিরোধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, তদ্রুপ গ্রামগঞ্জ ছেড়ে মানুষ শহরমূখী হয়ে বস্তির পর বস্তি গড়ে তুলে রাজধানীরোগে জাতির জাতসত্তার কবর রচনা করে। টোকিও থেকে টরেন্টো এবং পিকিং থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত এর মধ্যস্থ নগর ও নগরবাসীদের চরিত্রে কি কোনো পার্থক্য আছে? সাধ ও সাধ্য এবং প্রাচুর্য্য ও দরিদ্রতার পার্থক্য অবশ্য আছে! কিন্তু পাশব ইতরামিতে কি তেমন কোনো পার্থক্য আছে? ক্যানাডা, আমেরিকা তো বিরাট জনপল্লী ছিলো! যখন Continents, Contiguous অর্থাৎ মহাদেশগুলো প্রতিবেশীসূলভ সংলগ্ন ছিলো, তখন বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার সংলগ্ন ছিলো এবং উত্তর আমেরিকা বা ক্যানাডা বর্তমান সেন্ট্রাল এশিয়া ও ইউরোপের গা-ঘেষা ছিলো। অষ্ট্রেলিয়াও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার সাথে সংলগ্ন ছিলো। বাবা আদম সম্পর্কে আখেরী নবী সঃ ও তার পূর্বের অহীর কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা জানা যায়, তাতে বর্ণবাদী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা সীমাহীন বিকৃতি ঘটালেও যে কথা প্রায় নিশ্চত বলা যায়, তা হলো বাবা আদম ভারত বর্ষেই অবতীর্ণ হয়ে এখানেই প্রথম মানব নিবাস গড়ে তোলেন। তাঁর সন্তানেরা উত্তরে আফগানিস্তান, ইরাক, ও সেন্ট্রাল এশিয়া হয়ে উত্তর মেরু প্রদক্ষিণ করে বর্তমান উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে চাষাবাদে লেগে যায়। দক্ষিণ দিক দিয়ে একশাখা পশ্চিমমুখী হয়ে আরব বদ্বীপে গিয়ে ইয়ামেন ও হেজাযে বসতি স্থাপন করে। তারা ক্বাবায় প্রথম তাওহীদের ইবাদত আরম্ভ করে। তাই আমরা আজো দেখতে পাই যে, মাক্কা নগরী ও ক্বাবাকে ঘেরা পর্বত মালাকে "জাবালে হিন্দ" বলা হয়। এখনো ইয়ামেনে ছেলে-মেয়েদের প্রিয় নাম হিন্দ ও হিন্দা। তাদের উত্তম অসি ও খঞ্জরের নাম কাব্য কবিতায় "মুহান্নাদ" বা "ভারতীয়" বলে

উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে শয়তান তাদের জাত ও জাতক পরিচয় ভুলিয়ে শির্ক ও বিদআতের পাপে জারজ করে ফেললে তারা মুশরিক হয়ে কাবা ঘরকেই মূর্তির মন্দির বানিয়ে ফেলে। তাই আখেরী নবী সঃ এসে কা'বাকে পবিত্র করার সময় যে মূর্তির ভান্ডার পান, তাতে দেখা যায় যে, ৩৬০ দেব-দেবীর মধ্যে ভারতীয় মূর্তিই দু'শর বেশী। বাকীগুলো উত্তর পশ্চিম থেকে ও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা মূর্তি। তাই আরবদের, তথা মানবজাতির উত্থান ও প্রসার ভারতবর্ষ থেকে বলে প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। বেদ ও বেদান্তে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আইন বা শরিয়ত দাতা মনুর যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা ক্বোরআনে বর্ণিত সূরা শুরার তেরো নং আয়াতের সাথে মিলে যায়। ক্বোরআনে নিশ্চিত ভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ হযরত নূহকে সর্বপ্রথম মানব জাতের জন্য "শরীআ" বা আইন দান করেন। পরে সে একক শরীআই হযরত ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ রা অনুসরণ করে যান। তাতে সামান্যতম পার্থক্য করাও নিষিদ্ধ ছিলো। وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ মনু ও নূহ উচ্চারণে যে রূপ কাছাকাছি, বেদ ও ক্বোরআনের বর্ণনায় প্রথম বিধান দাতা রূপে যে ভাবে উল্লেখ, সে ভাবে হযরত নূহের আবাস স্থল সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, তিনি বর্তমান আরব বিশ্বের কোথাও বাস করেছেন। শুধু তার প্লাবনের নৌকার ধ্বংসাবশেষ জূদী পর্বতের শৃঙ্গে পাওয়া গিয়েছে অনুমান করা হয়। তাতে এ সম্ভবনাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি মহাপ্লাবনে ভারতের কোথাও থেকে মুক্তির নৌকায় উঠেন। পরে প্লাবন শেষহলে পর তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের নিয়ে পুনঃ মানব বসতি স্থাপন করেন। তাই তাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়।

তাঁর পরই সম্ভবতঃ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে তখনকার সংকীর্ণ লোহিত সাগর অতিক্রম করে প্রতিবেশী আফ্রিকা চলে যায়। তারপর বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকায় তারা বিস্তার ঘটায়। পরে আল্লাহ্র কুদরতে Continents Adrift অর্থাৎ মহাদেশ ভেসে বিচ্ছিন্ন হলে বাবা আদমের সন্তানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তারা যেহেতু মূল ইন্ডিয়া থেকে আবাদকার ও বসতকার, তাই তারা নামে ইন্ডিয়ান রয়ে গিয়েছে। আবহাওয়ার তারতম্যে চামড়া তামাটে হলে তাদের "রেড ইন্ডিয়ান" বলে আজো বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভেসে যাওয়া অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাও তাদের মূল ইন্ডিয়ান পরিচয়ে রেড ইন্ডিয়ান বলেই আজো পরিচিত। ইন্দোনেশিয়াও ইন্ডিয়ান এশিয়া। চীন, ক্যাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামও ইন্দো চায়না। অর্থাৎ ইন্ডিয়ান চীন।

নগর অসভ্যতার ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদের চোর ডাকাত ও অপরাধীদের দ্বারা আমেরিকা, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীরা যেরূপ বিলুপ্তির সাথে, আমাদের ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশের পল্লীর লোকেরা ও তাদের জাত ও জাতক সত্তা তাদেরই জারজ উপনেবিশবাদের শিক্ষায় শিক্ষিতদের হাতে হারাতে বসেছে। এদের গ্রামগঞ্জের প্রত্যেকটি নবজাত শিশু মাথায় করে দশ হাজার টাকার মতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আই এমএফ ও বিদেশী ঋণের দায় নিয়ে জন্মাচ্ছে। অথচ এর এক টাকাও তার ও তার পরিবারের জন্য ব্যয় হয়নি ও হচ্ছে না। বরং শিশুটির পিতা-মাতা বছরে জীবনোপকরণের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কাপড়-চোপড়, তেল-সাবান, চাল, ডাল, চিনি, পেয়াজ, রসুন, দুধ প্রভৃতির উপর আরোপিত পরোক্ষ কর স্বরূপ কয়েক হাজার টাকা সরকারকে দিচ্ছে। নবজাত শিশুটির মতো দেশের প্রতিটি পল্লীবাসির নামে আনা ঋণের সিংহ ভাগ রাজধানীর রাজপুত্র গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরা ও ধানমন্ডিসহ দেশীয় নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লন্ডন ও প্যারিসবাসীদের মুস্তাকবির জীবনধারার পেছনে ব্যয় হচ্ছে। বাদ বাকী পয়সাও পাচার হয়ে তাদের সন্তানদের মাধ্যমে সে বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম. এফদের দেশে গিয়ে পুঁজি জমা হচ্ছে। মুস্তাকবির, মুস্তাদআফ্ বা জাতক ও জারজদের এ পার্থক্য কখোনো দূর হবে না, যে পর্যন্ত মুস্তাদআফ্রা, বারাকাহ, যায়দ, বেলাল, আম্মার, সালমান, সুহাইব ও আবু যারদের আদর্শে রাসূল সঃ এর অনুসরণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনে ফেরত না আসবে। যার সৃষ্টি, তাঁর কাছে ফেরত না এসে কি সৃষ্টির কল্যাণ হতে পারে? কখনো হয়? أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ জেনে রাখো, যার সৃষ্টি, তাঁরই হুকুম মানতে হবে। তা না হলে রক্ষা নেই। (সূরা আরাফ-৫৪ এর শেষাংশ) ক্বেয়ামতের পূর্বে ক্বেয়ামতের দৃশ্য বুঝানোর জন্য আমি এ আহবান পত্র লিখছি।

যেদিন থেকে আল্লাহ্ তাঁর কা'বার পরিবেশে তাঁর এ নগণ্য দাসকে আখেরী নবী সঃ এর বিপ্লবী মুস্তাদআফ ও মুস্তাকবির, জাতক ও জারজ জীবনের পার্থক্য দিয়ে ক্বোরআন বুঝার স্বাদ প্রদান করেন, সে দিন থেকেই তাঁর রিসালাতের পাঁচ দিকপাল হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর পাঁচকোন বিশিষ্ট তারকা আমার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়। সুন্নী-শিয়া খেলাফত ও ক্বোরেশী বর্ণবাদী ইসলাম মরাপাতার মতো অন্তর থেকে ঝরে যায়। তারপর রাসূল জীবনে বারাকা, যায়দ, বেলাল, আম্মার ও সালমানের সংযোগ উজ্জল নক্ষত্রের মতো উদিত হতে আরম্ভ করে। মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্বে আমি যেনো রাসূল সঃ এর সঙ্গী হয়ে যাই। বর্তমান প্রচলিত হজ্ব আমার নিকট জাহিলিয়্যাতের বর্ণাঢ্য মেলা মনে হতে লাগে। সূরা তাওবা পড়ে আমি চমকে উঠি! রাসূল সঃ হিজরত কালে মানুষ রূপে তিনি একা হয়ে দু'জনের দ্বিতীয় হন। প্রথম জন তাঁর

আল্লাহ্। আবু বকর তাঁর "সাহেব"। দ্বিতীয় নয়। অস্থির, চিন্তিত তৃতীয় ব্যক্তি!? তাবূকের অভিযান। ফিরে এসে মসজিদ ভাঙ্গা। তারপর বিদায়ের প্রস্তুতি। তারপর আর তিনি ফিরে আসবেন না পৃথিবীতে। তাই উসামাহর নিয়োগ কোনো সাময়িক বিচ্ছিন্ন নিয়োগ নয়। চূড়ান্ত নিয়োগ। নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্‌র সরাসরি আদেশে। তা না হলে তিনি কী করে বলেন যে, যারা উসামাহর আনুগত্য করবেনা, তারা অভিশপ্ত হবে? উসামাহর নেতৃত্ব প্রত্যাখান করার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটে আসছে, সব সে অভিশাপের প্রমাণ। সে লানতে মৃত ও সমাহিত মুর্দাকে পুনর্জিবীত করার চেষ্টা করা হয়েছে দীর্ঘ এক হাযার বছর ধরে। তাই এবারের চেষ্টা উসামাহ ইমামতের পুনর্জীবিতকরণের। আল্লাহ্ এক ডামী উসামাহ্ বিন লাদেন দিয়ে যেনো আসল উসামাহর প্রতি ইঙ্গিত করে দিলেন। যেমন ইরানীদের মিথ্যা মুস্তাদআফ ও মুস্তাকবির প্রোপাগান্ডা দিয়ে ভুলেযাওয়া ক্বোরআনী মুস্তাদআফ মুস্তাকবিরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইরানী শিয়াদের ডামী ইসলামী বিপ্লব ও আফগানী সূন্নী ডামী বিন লাদেনকে দিয়ে বিশ্বের দানব মুস্তাকবির আমেরিকান জুডো-খৃষ্টান দাজ্জালের মাথা ব্যথা বানিয়ে আল্লাহ্ ওদের ব্যস্ত করে রাখছেন। এ সুযোগে খাঁটি মুস্তাদআফদের খাঁটি উসামাহ বেছে ময়দানে নামলে সফলতা নিশ্চিত। প্রমাণ সূরা ক্বাসাসের ৫ ও ৬ নং আয়াত।
খাঁটি নবী-আদর্শে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বা অর্থনীতি হয়না। এ কিতাবী বিশ্বাস আমার ছিলো। এর বাস্তবতা প্রমাণের জন্যই হয়তো আল্লাহ্ মাওলানা আব্দুর রহীমের প্রতারক ছেলে মুস্তাফা ওয়াহিদুজ্জামানকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি নিজে কখনো যখন এ ধরনের কাজের চতুর্সীমানায়ও যাইনা, সেখানে আমি ঐ মানুষ শয়তানটির ফাঁদে কেনো পড়লাম! এক ঢিলে আল্লাহ্ আমাকে দুটো বাস্তব শিক্ষা দিলেন। প্রথমটি হলো ধর্মব্যবসায় যাদের জন্ম, তারা কখনো খাঁটি ধর্মের যোগ্য অনুসারী হবেনা। যেমন ইয়াহুদী ইসলামী ও তাবলীগী লোককে টাকা ধার দিয়েছি, কারো কাছ থেকে সম্পর্ক নষ্ট ব্যতীত টাকা ফেরত পাইনি। তার মধ্যে জামাতের সাথে জড়িত লোকেরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মাওলানা আব্দুর রহীমের পুত্র সম্পর্কে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কুলাঙ্গার তার ছেলে মেয়েদের আমেরিকান বানানোর জন্য এপথ বেছে নিয়েছে। এপথেই সে নিজের বাড়ি করে নিয়েছে। সে নিজে কাগজ-কলমে কোনো দেনা নেই। তাকে যারা সাহায্য করেছে, সব দেনা তাদের ঘাড়ে। সে আমাকে ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যাংকের খাতায় ঋণী করে পলাতক। জামায়াতে ইসলামের এককালীন সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল খালেকের শালা অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ফারুকুল ইসলাম আজ থেকে বিশবছর পূর্বে এসে পঞ্চাশ হাযার টাকা ধার নিয়েছে। কয়েক শতবার মিথ্যা ওয়াদা করেছে। আজ পর্যন্ত টাকা ফেরত দেয়নি। আশ্‌রাফ হোসেন নামে এক আলবদরকে ধার দিয়ে ওর বকা শুনেছি। এরা নিকৃষ্ট মানব প্রজাতি।
অপর দিকে আওয়ামী লীগসহ কম্যুনিষ্ঠ পাটির লোকদের টাকা ধার দিয়ে শুধু টাকাই ফেরত পাইনি। সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। মধুর কৃতজ্ঞতাবোধ পেয়েছি। দেশের মাদ্রাসা, মসজিদ, মাযার, পীরের দরগা ও হুজুরদের সাথে লেনদেন করে যে ফলাফল পেয়েছি তার আলোকে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া, 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি ইসলামীদের (?) হাত থেকে আপনার দ্বীন ইসলামকে তুলে নিয়ে কোনো লেনদেনে স্বচ্ছ কাফেরদের ঈমান দিয়ে তাদের হাতে সর্ফ্দ করুন।" এ সত্যটি সুস্পষ্ট করার জন্যই সূরা তওবায় আল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত ধর্মবেসাতীদের চিত্র তুলে ধরেছি। বিশেষ করে অধ্যাপক গোলাম আযমের ব্যাপারটাকে বেশী করে হাইলাইট করার কারণ, লোকটি এ দেশে ইসলামের নামে মায়ের সাথে ব্যভিচারের সূদী ব্যাংক করে এ দেশের সম্ভাবনাময় শিক্ষিত যুবকদের বিপথগামী করে এদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারচ্ছন্ন করছে। তার সঙ্গী হয়ে মৌলবী আযীযুল হকও জাতিকে এক সংঘাতময় বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমার এ লেখা পড়ে আল্লাহ্ যদি এদের কপালে তওবা রাখেন, তা হলে এরা যেনো তওবা করে নাজাতের পথ পায়। আর কপালে তা না থাকলে তাদের পেছনে জড়ো হওয়া সরল বিশ্বাসী লোকেরা যেনো ওদের ত্যাগ করে নিজেদের ঈমান রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্‌র খলিফা, আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতি তাদের জাতসত্তা ও জাতক গুণাবলী তাদের রক্ত ও অর্থে লালিত জারজদের হাতে বিশ্বময় হারাতে বসেছে। প্রায় ধ্বংসের শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক পা আগালেই সব শেষ। তাই আমি পাগলপারা হয়ে মানব ভাইদের ডাকছি। আর এক পাও আগে বাড়বেনা। ফিরে দাঁড়াও। সম্পূর্ণ ফিরত যাত্রা করো। আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করবেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি সবার চেয়ে দয়ালু। রাহ্‌মানুর রাহীম। না ফিরলে কিন্তু তিনি সংহারীদের সংহারী। ক্বাহ্‌হার, জাব্বার ও আযীযুন্ যুন্ তিক্বাম! সাবধান! সারা বিশ্ব ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু তাঁর কাছে এতোই তুচ্ছ যে, আমাদের কাছে একটি ধুলী কণার যা মূল্য, তাঁর নিকট এ ব্রহ্মান্ডের সে মূল্যও নেই।

إن الدين ليارز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها

মক্কা থেকে ঢাকা

ঢাকা থেকে মক্কা

গোত্র ও ভাষার নামে দু'টি দেশ। সৌদী আরব ও বাংলাদেশ। এমন দেশ পৃথিবীতে কোথাও নেই। দুটি দেশই আল্লাহর গযবের দ্বারপ্রান্তে। সৌদী আরব পূর্ণ ইসলামের অবতীর্ণস্থল। ক্বোরআনের ভাষা সহ দ্বীন তাদের মধ্যে বিদ্যমান, কা'বা ও মাদীনা সেখানে। ধর্মীয় ও আর্থিক সম্পদ ষোলআনা আল্লাহ দিয়েছেন। যাতে তারা ষোলআনা দ্বীন ক্বায়েম করতে পারে। কিন্তু করেছে তার উল্টোটা। ষোল আনা মুর্তাদ সৌদী শাসকরা।

বাংলাদেশ বিশ্বে এক নম্বর দুর্ণীতি পরায়ণ দরিদ্রদেশ! ছোট্ট একটি দেশে ষোল কোটি মানুষ! না মানব সম্পদের খনি? শতকরা নব্বইজন মুসলমান! প্রতি ইঞ্চি মাটিতে সোনা ফলে। তাইনা সোনার বাংলা? ধর্মসম্পদ ও মানবসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতি ও দারিদ্র্যে পয়লা নম্বর কেনো? আল্লাহ আল্ ক্বোরআনে বলে দিয়েছেন (৫ঃ৮২) বিশ্বের ঈমানদারদের সর্বকালে, দু'নিকৃষ্ট শত্রু, ইয়াহুদী ও মুশরিক। সৌদীদের মনিব ইয়াহুদীরা ও বাংলাদেশীদের বিধাতা মুশরিক ভারত। সৌদী শাসকরা মুস্তাকবির, বাঙ্গালী শাসকরা মুস্তাকবির।

নবী আদর্শের যায়দ, বেলাল ও উসামাহ হয়ে মুসতাদআফ্দের "গায্ওয়াতুল হিন্দ" ঢাকা-মক্কা, সমান্তরাল সিরাতুল মুস্তাকীম। সে মুক্তিপথের মহাযুদ্ধের আযান, ইকামত, সালাত, সিয়াম ও হজ্জ এ বই। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তার ধ্বনী ও পতাকা।

তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বেলাভূমির বাংলা, গোত্রহীন ও বর্ণ বৈষম্যহীন মানব সাম্যবাদের উর্বর ক্ষেত্র। এদেশের মাটিকে হিন্দুকুশের উৎস থেকে সৃষ্ট স্রোতধারা বন্যার রূপ ধারণ করে ধুয়ে তার আবর্জনা বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করে। আবার সমুদ্রের জলোচ্ছাস এসে মাটি ও মানুষকে পবিত্র করে যায়।

হিন্দুকুশের উৎসের জনবসতির নাম খোরাসান বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আখেরী নবী সঃ খোরাসানের পশ্চাদভূমি থেকে বিশ্বমানবতার বিশ্বজয়ী আন্দোলনের ইঙ্গিত করেছেন বলে দেখা যায়। সালমান ফারসীর আবাস ভূমিও খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তার কাঁধে হাত রেখেই রাসূল সঃ বলেছেন "স্বরা থেকে ধরায় সালমানের আদর্শের সৈনিকরা আল্লাহর দ্বীনকে নামিয়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করবে।" (মুস্লিম) এখানে মনে রাখতে হবে যে, সালমান শিয়া বা সুন্নী ছিলোনা। পাঁচ নবীর পাঞ্জেতনী মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী নূহ সদৃশ দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ছিলো সালমান।

খোরাসানের উৎসে আজ ইব্রাহীম হানীফকে ইয়াহুদী খৃষ্টানে বিভক্তকারী দাজ্জাল আমেরিকা ও তার দোসরদের বিশ্ব ধ্বংসযজ্ঞের পায়তারা! অপর পক্ষ খাতামুন নাবিয়্যীনকে শিয়া সুন্নীতে বিভক্তকারী ইরানী আফগানিরা তার প্রেক্ষাপট তৈরী করে পরস্পরের নিধন প্রয়াসী। এক আল্লাহর এক দ্বীনের ঐক্য মূলের স্রোতে অনৈক্যের বিষ ছড়াতে কি ধনকুবের সৌদী উসামা বিন লাদেনের সংযোগ? সি, আই, এর কোনো পোষ্য, তাও আবার আরবী প্রতিহিংসা পরায়ণকে দিয়ে কি বিশ্ব শান্তির ইসলামী উত্থান নস্যাতের ইং-মার্কিন নীলনক্সা নয় ?! ইসলামের মূল নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী সন্ত্রাসী "আল্ কায়দা" কি গোটা ইসলামী বিশ্বকেই চরম বেকায়দায় ফালায় নি?!

ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই জানা যে, মুস্লিম জাতির মধ্যে গোত্র বিবাদী আরব ও উপজাতীয় বিবাদী আফগানীরা দু'টি নিকৃষ্ট ঐক্যভঙ্গকারী জাতি। বিশ্বনবী সঃ এর পূর্ণ রিসালাতকে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ কর্তৃক আল ক্বোরআনে নিন্দিত আরবরা যেমন ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া, আব্বাসী, শিয়া ও সুন্নীতে বিভক্ত করে ইসলামের উদীয়মান সূর্য্যকে ডুবিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষে ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়েদ আহমদের ইসলামী জাগরণের বিজয়কে আফ্গানী উপজাতীয়রা পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে বালাকোটে নিভিয়ে দেয়। এখন সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীনের চূড়ান্ত উত্থানের সন্ধিক্ষণে আরবী উসামা বিন্ লাদেন ও আফগানী অর্ধ-শিক্ষিত মোল্লা উমরের শ্বশুর জামাতার খেল কি চরম বিপদের অশনি সংকেত নয়?!

এ সন্ধিক্ষণে মনে রাখতে হবে যে বিন লাদেনরা ইয়ামেনের সে অর্থ পূজারী বেনিয়া সম্প্রদায়ের, যারা গর্বের সাথে বলে যে তারা আরব দ্বীপের ইয়াহুদী। মোল্লা উমররাও সুদ, আফীম, গাঁজা, চরস, হিরোইন ও অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ী কাবুলীওয়ালা বংশোদ্ভুত। সুন্নী আরবী সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসমুক্ত হলেই এরা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তা না হলে এরা ইরানী শিয়াদের সাথে মিলে ইসলামী বিশ্বের বুকে ত্রিশূল রূপেই রক্ত ঝরাবে।

আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে বিশ্বের ইসলামী উত্থানের পিয়াসীদের দশবার সতর্ক করে দিচ্ছি। নিউইয়র্কে যারা

সন্ত্রাসী আক্রমণ করে ইং-মার্কিন দস্যুদের আফগানিস্তান, তথা পাকিস্তান, ভারতীয় মুসলমান ও বাংলাদেশ গ্রাস করার পথ করে দিয়েছে, তারা কোনোমতেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মার পক্ষের কেউ নয়। শত্রুদের চর।

তালেবান ও বিন লাদেনরা যদি বিশ্ববানিজ্য কেন্দ্র আক্রমনের সাথে জড়িত না থাকে, তা হলে এখন তাদের শেষ সুযোগ, হয় তারা স্পষ্ট ভাষায় তার নিন্দা করে বিশ্বের মুসলিম ও নিরপেক্ষ অমুসলিম বিচারকদের ট্রাইবুনাল করে, বিন লাদেন ও তার আল কায়দাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে, নয় ঐ ঘৃণ্য পাপের দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে মজলুম নিরাপরাধ মুসলিম জাতিকে দায় মুক্ত করবে। এক মুখে তারা বলবে যে, "আমরা ঐ আক্রমন করিনি, যারা করেছে, তাদের সাধুবাদ জানাই, ঐ ধরনের আরো আক্রমন হবে" এবং তারপরও তারা বিশ্ব মুসলিমের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হবে, তা হবেনা। ইস্লামে চোরাগুপ্তা হত্যার কোনো ক্ষমা নেই। ঘোষিত সম্মুখ যুদ্ধ ইসলামী জিহাদ। আমরা তা না হলে সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করবো যে, তালেবান, বিন লাদেন ও ইরানী শিয়ারা তাদের জন্মদাতা আমেরিকা, রাশিয়া, ও ইয়াহুদী চক্রের ত্রিশূল বৈ কিছু নয়। মূলতঃ তারা ঐ দাজ্জালী ত্রয়েরই ত্রিশূল হয়ে মুসলিম জাতির বুকে বিঁধেছে।

এ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ ও তার ষোল কোটি মুস্তাদআফ্ জনগোষ্ঠি ব্যতীত বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের সূচনা করার যোগ্য আর কেউ রইলোনা। বাংলার সমতল মাঠ-ঘাটের মতো **গোত্রবাদের হানা-হানী মুক্ত জনগণকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস "বিস্মিল্লাহ" বলে নবী আদর্শের উসামাহ্ বিন যায়দের পতাকা উত্তোলন করে মূল ইব্রাহীমী আযান, ইসমাঈলী ইকামত ও মুহাম্মাদী ইমামত ঘোষণা করতে হবে।** তবে এ ক্ষেত্রে, এ মুহূর্তে চরম সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে যে, এ কাফেলার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাতারে যেনো কোনো অবস্থাতেই ১৯৭১ সালের বাছনী পরীক্ষা কালে যারা উভয় পক্ষে লুট, ধর্ষণ ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞে জড়িত ছিল তাদের একটি লোকও যেনো ঢুকে না পড়ে। এরা ঘোষিত অনুশোচনা করে এখন থেকে সদাচরণের শপথ করে অনুসারী হতে পারবে। ১৯৭১ সালে যারা ঐ বদকাজে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা রেজাকার আলবদরের হোক, বা মূর্তিবাহিনীর হোক, তাদের নেতৃত্বে কোনো স্থান হবেনা এ যাত্রায়। তারা বাকীজীবন তওবা-তিল্লা ও অনুশোচনা অনুতাপ করেই কাটাতে হবে। যদি আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন! তাই তাদের বড়ো পাওয়া! ১৯৭১ সাল প্রকৃত মুক্তিকামী মুক্তিবাহিনী, যারা পাকিস্তানী মুনাফেকী ও ভারতীয় কুফরের দ্বন্দে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছে, তাদের হিরার মতো খুঁজে বের করে সামনে সাজাতে হবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এটিএনের বক্তা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সম্পর্কে পত্রিকায় যেসমস্ত অভিযোগ ছাপা হয়েছে, সে গুলো যদি মিথ্যা হয়, তা মিথ্যা প্রমাণ করে এ কাফেলায় তাকে যোগ দিতে হবে। আর যদি এর কিছুও সত্য হয়, তা হলে তার নেতৃত্ব দূরে থাক, তার মুখে ইসলামের কোনো নীতিবাক্যও শোনা যাবেনা। অন্যায় স্বীকার করে তার অনুশোচনা বর্ণনা করে অপরাপর মানুষের শিক্ষার জন্য তার জবানবন্দি শোনা যেতে পারে। নীতিবাক্য নয়। তার জন্য জাহিলিয়্যাত ও ইসলামে সত্যের ধারক বাহক পবিত্র মুখ ও কণ্ঠ চাই। শিল্পীর বাক চাতুর্য নয়। রাসূল সঃ বলেছেন, "তোমাদের মাঝে জাহিলিয়্যাতে উত্তমরা ইসলামেও উত্তম। জাহিলিয়্যাতের অধমরা ইসলামেও অধম।"

خياركم في الجاهلية جياركم في الإسلام، وشراركم في الجاهلية شراركم في الإسلام

দরিদ্র মুস্তাদআফ্ বাংলাদেশ তার শাসক শ্রেণীর পাপে পৃথিবীর পয়লা নম্বর দুর্নীতিপরায়ণ। দুঃশাসনের ফলে প্রথম শ্রেণীর দরিদ্রও। সৌদী আরব কাবাঘর ও মসজিদে নববী দখল করে মাটির নিচে পৃথিবীর জানা সর্ববৃহৎ তেলের ভান্ডার ও খনিজ সম্পদ সহ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে আছে। বিশ্ব মুস্লিমের মিশনকেন্দ্র মস্জিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা মুর্তাদ আরবদের আতাঁতে আজ ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের করতল গত। ইয়া আল্লাহ! এ অবস্থায় তোমার মুস্তাদআফ্দের বিশ্বে আর কোনো ঠিকানা রইলোনা।

হে মুস্তাদআফ্দের অভিভাবক! আপনি আরব-অনারব ও পূর্ব-পশ্চিম কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। আপনি রাব্বুল মাশরিক্বাইন ও রাব্বুল মাগ্রিবাইন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও আসমান-যমীন সব কিছুর একমাত্র মালিক আপনি। আপনার তুচ্ছ দাস আমি পৃথিবীর সকল সীমাবদ্ধ শক্তি থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে আপনার সীমাহীন শক্তিতে আত্মসমর্পণ করলাম। আপনার খাতামুন্ নাবিয়্যীন রাসূলের অনুসরণে পৃথিবীর মুস্তদআফ্দের হয়ে আমি আপনার দরবারে রাসূল সঃ এর তায়েফের দোয়া হুবহু পূনরাবৃত্তি করে মাদীনার মতো মুস্তাদআফীনের একটি দেশ, দারুল হিজরত ও মাসাবা চাই।

হে মুস্তাদআফ্দের প্রতিপালক! আপনি আমার প্রভু। আমি আমার সীমাবদ্ধতা, আমার যোগ্যতার অভাব ও মানুষের

উপর আমার প্রভাবহীনতা স্বীকার করে আপনার কাছে আপনার পছন্দ যোগ্যতা যাচনা করছি। আমার অভাব আপনি দূর করে দিন। আমার ভুল ত্রুটি ও অপরাধের জন্য আপনি আমাকে আপনার ও আমার শত্রুর হাতে হস্তান্তর করবেন না। যা শাস্তি হয়, আপনিই দিবেন। পরকে দিয়ে তা দেয়াবেন না। আপনি রাজী থেকে যতোই শাস্তি দিবেন, তাতে আমার কোনোই দুঃখ থাকবেনা। কিন্তু পরকে দিয়ে আমাকে অপমান করবেন না। তার পূর্বে আমার মৃত্যুও শ্রেয় ও কাম্য। আমার শুরু যেমন আপনার হাতে, আমার শেষও যেনো আপনারই হাতে হয়।

হে সৃষ্টি জগতের মালিক! সারা বিশ্ব মুস্তাকবির দানবদের স্বেচ্ছাচারের নরকপুরী। আপনার পৃথিবীতে কোথাও আপনার ঈমানদার মুস্তাদআফ্‌দের অভয়ারণ্য নেই। আপনার 'বালাদুল আমীন' ও 'বাইতুল মাকদিস' তথা মাস্‌জিদুল হারাম ও মাস্‌জিদুল আকসাসহ গোটা আরব্য উপদ্বীপ বনী আদমের শত্রু ইবলিস ও তার মানব সন্তান আপনার নবী মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের ঐক্যবদ্ধ দ্বীনকে ত্রিধা বিভক্তকারী ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডান আরব সন্ত্রাসীদের পূর্ণ কব্‌জায়!

আপনার ক্বোরআনে ঘোষিত 'নিরুপদ্রব কেন্দ্র' কোথায়? কোথায় আপনার বানানো 'মাসাবা'? বিশ্বে নির্যাতিতের চূড়ান্ত বিজয় সংগঠনের মিলন কেন্দ্র 'মাদীনা' কোথায়? কোথায় আমরা হিজরত করবো? আমাদের কি কোনো ঠিকানা দিবেন না হিজরত করে সংগঠিত হতে?

গত শতাব্দীতে রাসূল সঃ এর 'গায্‌ওয়াতুল হিন্দের' সূচকের দাবীতে পাকিস্তান নামের একটি ভূ-খন্ড মাদীনার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার শপথে অর্জিত হয়েছিলো। কিন্তু ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্রের দেশী বিদেশী জারজরা এক দিনের জন্যও তা হতে দেয়নি। ১৯৭১ সালে তারা পাকিস্তানকে দু'টুকরা করেছে। আজ ২০০১ সালে তার পশ্চিমাংশকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান দাজ্জালের আফগানিস্তান আক্রমনের ঘাটি রূপে পারভেজ চৌকিদার তার প্রভুদের হাতে হস্তান্তর করেছে।

অপর টুকরাটি বাংলাদেশ নামে 'ঝুলন্ত' রয়েছে। এর কোনো স্বামী নেই। পারিবারিক বিবাদে বিভক্ত দু'নারী ও তাদের বেদে নৌকার দাঁড়ি-মাল্লা ও গুনটানাদের টানা-পোড়নের রশিতে আজ ষোল কোটি মুস্তাদআফ্‌ 'হারিসুল্‌ হাররাস' কৃষিজীবীর গলায় ফাঁস।

আপনার শেষ নবী সঃ বলেছেন, কৃষিজীবীর জাত 'হারিসুল হাররাস' দের মধ্যে থেকেই নাকি বিশ্বের মুক্তিদাতা বিশ্ব নেতার অভ্যুদয় হবে। বাংলাদেশের মতো ষোল কোটি মুস্তাদআফ্‌ কৃষি নির্ভর কৃষক জাতি কি বিশ্বে দ্বিতীয়টি আছে?

ইয়া রাব্বাল আলামীন! বাংলাদেশের মাটিতেই ১৯০৫ সালে এ্যঙ্গলো-এরাবিক গঠনে মুসলিম উম্মাহ অর্থে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিলো। এরই আন্দোলনের ঢেউয়ে এদেশের ৯৭% লোকের ভোটে মাদীনা আদর্শের প্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তান হয়েছিলো। কিন্তু ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্রের দেশী দালালদের চক্রান্তে দেশটি জনগণের ঈমানী ভিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে গণ অসন্তোষে পূর্ববৎ ৯৭% ভোটের জোরেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশটি পৃথক হয়ে সৎ নেতৃত্বের 'লা-ওয়ারিশী' অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ধর্মের মিথ্যা দাবিদাররা ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহীদের পদমূলে আত্মহুতি দিয়ে এ দেশটি থেকে খাঁটি ঈমানী তৃতীয় শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

হে রাহমানুর রাহীম! অনুর্বর মরুকাঠিন্যের সৌদী আরবে আপনার দানের প্রাচুর্য্য পেয়ে আরবরা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মিত্র হয়ে ইসলাম ত্যাগকারী মুর্তাদ। বিরাট ভূ-খন্ডে তারা প্রায় জনমানুষ শূন্য। আপনার খলীল বাবা ইব্রাহীমকে দিয়ে যেখানে বিশ্বের সকল দিক থেকে সমান অধিকারে বিশ্ব ঐক্যের কেন্দ্রে মানুষকে আসার আযান দিয়ে ছিলেন, সেখানে যেতে আজ ঈমানদারদের সবচেয়ে দুরূহ বাধা।

হে মুস্তাদআফ্‌দের চূড়ান্ত অভিভাবক, কাবার প্রভু! বাংলাদেশ থেকে আপনার বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত 'মনসুর' নেতৃত্বের অধীনে 'হারিসুল হাররাস্‌' কৃষিজীবীদের কোটি সৈন্যের কাফেলা তৈরী করে দিন। যারা গায্‌ওয়াতুল হিন্দের অপ্রতিরোধ্য অগ্রসেনা হয়ে ভারতীয় পৌত্তলিকতা, পাকিস্তানী মুনাফিকী, আফগানী সুন্নী লাদেনী ও ইরানী শিয়া ফিতনাকে নির্মূল করে খাইবার থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলিম ঐক্যের মহাসড়ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। যা দেখতে দেখতেই নূহের তুফানের মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধাবিত হয়ে বর্তমান আফগানিস্তানে প্রজ্জলিত ইং-মার্কিন যুদ্ধের দাবানলকে নিভিয়ে ওদের সলিল সমাধি রচনা করে দিবে। আপনার খাতামুন নাবিয়্যীন তারই ইঙ্গিত করেছেন বলে জানা যায়।

পূর্বের মুস্তাকবির নমরুদ, আদ্‌, সামুদ ও ফিরআউনী শক্তিদের আপনি ক্বোরআনে 'আহযাব' অর্থাৎ সম্মিলিত শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন। শেষনবী সঃ এর মাদীনা অবরোধকারী আবু সুফ্‌য়ান ও তার মিত্র বাহিনীকেও আপনি

আহ্‌যাব নামকরণ করে ক্বোরআনে একটি দীর্ঘ সূরা নাযিল করেছেন। এদের সবাইকে আপনার পূর্ব থেকে উঠা ঝড় তুফান দিয়েই নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করেছেন।

আফগান, ইরান, ইরাক ও সৌদী আরবে সমবেত আপনার ও আপনার মুস্তাদআফ্‌দের শত্রু মুস্তাকবিরদের বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে উঠা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাওহীদের প্লাবন দিয়ে নীল নদে সসৈন্য ফিরআউনের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিন। যেমনটি সূরা আল হাক্কায় উল্লেখ করেছেন।

হে জুনুদুল্লাহের সাহায্যকারী প্রভু! মধ্য এশিয়ার প্রবেশদ্বারে শিয়া-সুন্নী ও ওহাবী আরবী শয়তানী বিবাদ সৃষ্টিকারীরা ইসলামকে বিকৃত না করলে মধ্য এশিয়ার মুস্তাদআফ্ মুসলিমরা এ ধাক্কায় যায়দ, বারাকাহ, উসামাহ, আম্মার, সুহাইব ও সালমানদের আদর্শে বিশ্বশান্তি ও সৌভাতৃত্বের ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের নমুনা ও দৃষ্টান্ত হয়ে যেতো। ফলে তাদের আর্দশ দেখে চতুর্পার্শ্বের কোটি কোটি রাশিয়ান, চাইনিজ নাস্তিকরা মুসলিম হয়ে যেতো। সেখানে বর্তমানে খোমেনী, মোল্লা উমর ও বিন লাদেনদের সন্ত্রাস, সম্প্রদায়িকতা ও কূপ মান্ডুকতা ইসলামকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দুর্নাম ও কৌৎসিত্ব প্রদান করেছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি ইরানী, আফ্‌গানী ও বিন লাদেনদের হেদায়েত দান করে সঠিক পথে আনুন। তারা তার অযোগ্য হলে ওদের উৎখাত করে বুশ ব্লেয়ারদের সাথে একত্রে ওদেরও কবর করে দিন। যাতে চীন রাশিয়ার আদম সন্তানেরা তাদের আদি ধর্ম ইসলামে ফেরৎ এসে বিশ্বে ইসলামী শান্তি ও সহাবস্থানের মহা বিজয় ঘটায়। শয়তানের সৃষ্ট সকল জাতীয়তা মিটে সূর্যোদয়ের দেশ থেকে যেনো সূর্যাস্তের দেশ পর্যন্ত মানুষ এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এক জাত হয়।

হে ঈমানদারদের অভিভাবক! মুস্তাদআফ্‌দের প্রভু! আপনার গযবে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত ইয়াহুদী খৃষ্টানদের প্রজন্ম বর্তমান বুশ, ব্লেয়ার, এরিয়েল শ্যারন, ইয়াসির আরাফাত ও বিন লাদেনরা যে ধ্বংসযজ্ঞের আগুন মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানে জ্বালিয়েছে, আপনি আপনার ক্বোরআনে বর্ণিত পন্থায় ইয়াহুদী নাসারা ও তাদের আরব দোসরদের সে আগুন দিয়েই ভষ্মিভূত করে সে যুদ্ধের আগুনকে নিভাতে আমাদের তৌফিক দিন।

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ (মাঈদা-৬৪)

হে পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালক! স্বভাব ও প্রাচুর্যের পাপী সৌদীদের নির্মূল করে মক্কা মাদীনা ও বাইতুল মাক্‌দিসকে ইয়াহুদী খৃষ্টান ও আরবীদের দখল মুক্ত করে তাকে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃদের সাথে কৃত অঙ্গীকারে পবিত্র করতে আমাদের ইব্রাহীমী ইমাম দান করুন।

বর্তমানে বিশ্বে ইয়াহুদীরা যে মেসাইয়া, খৃষ্টানরা যে পুনরুত্থীত যীশু ও মোহামেডানরা যে এক চোখ কানা এক চোখা ইমাম মাহদীদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে, সে দাজ্জালদের হাত থেকে আমাদের বাঁচার জন্য উভয় চক্ষুর দূরদৃষ্টি দান করুন।

আপনার এ দীন দাস তার সকল দীনতা সত্ত্বেও গত এক যুগ ধরে প্রায় আধা ডজন মাহদীর দাবিদার, এক ঈসা মসীহ্, এক বিবি মারইয়াম, ও দেয়ালের অপরপার্শ্বে এক যীশু খৃষ্টানকে প্রতিহত করে আসছে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিশ্বময় এদের চক্রকে প্রতিহত করে একক ইব্রাহীমী ইমামতের কাফেলা তৈরীর যোগ্যতা দান করুন। যাতে আমরা বিশ্বে হযরত মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের একক অনুসারীরা এক আল্লাহ, এক বিশ্ব ও এক মানবতার বিশ্বায়ন ঘটাতে সফল হই।

সব শেষে, হে প্রভু! আপনি সূরা নিসার ১০০ নং আয়াতে বর্ণিত দারুল হিজরত রূপে বাংলাদেশকে ক্ববুল করে তার এক নম্বর দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের নির্মূল করে দিন। সে দায়িত্ব পালনে আমাকে প্রয়োজনীয় ঈমানী ও আর্থিক সহ সকল যোগ্যতা দান করুন। এ পথে আমি সব ত্যাগ করে নিজে হিজরত করে সবাইকে হিজরতের আযান দিলাম। বিশ্বের আনাচে কানাচে, ইয়া আল্লাহ, আমার ক্ষীণ আওয়াজ পৌছে দিন। আমীন।"

আমি সূরা তওবা পড়ে তার আদ্যোপান্ত মেনে তওবাকারীদের যোগাযোগের আহ্বান জানাচ্ছি। তার বাইরে কারো সাক্ষ্য, আলোচনা, যোগাযোগ ও পত্রালাপ অনাকাঙ্খিত। তাদের জন্য পত্রাকারে লেখা আমার বইই চূড়ান্ত। তা বুঝে যারা একাকার হতে আসবে, তাদের উদ্দেশ্যে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ্।" অন্যদের জন্য عليكم ما عليكم অর্থাৎ আপনাদের যা প্রাপ্য, তা' আল্লাহ আপনাদের দান করুন। আমার দীন, হীন ও জীর্ণ কুটিরে মুস্তাকবির "আপনাদের" পাবার কিছু নেই। মুস্তাদআফ্ "তোমাদের" জন্য আমার অস্তিত্বের সবটুকু দান।

যারা سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا "শুনলাম ও মানলাম" বলে, তারা মুস্তাদআফ্। আমি তাদের। তারাও আমার। যারা سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا "শুনলাম কিন্তু মানলাম না" বলে, তারা মুস্তাকবির। তাদের আমি কেউ নই। তারাও আমার কেউ নয়। আমি সর্বাবস্থায় তাদের থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই। তাদের থেকে পালাতেই আমি মক্কা মাদীনা থেকে হিজরত করেছি। এখন পাপের রাজধানী ঢাকা থেকেও আদি মক্কার ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ সঃদের পদচিহ্নে অজানার পথে পা বাড়াতে চাচ্ছি। পাথেয় সূরা নিসার ১০০ নং আয়াত। তাতেই আমার ১০০% পরিচয় পরিচিতি। وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

ইয়া আল্লাহ! মক্কা থেকে তায়েফ সোজা পূর্বে। বাংলাদেশও সে সমান্তরাল রেখায় পূর্বে অবস্থিত। বাংলাদেশ মুস্তাদআফের খনি। একে দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত মাদীনা রূপে ক্বুবুল করুন। যেমন খাতামুন নাবিয়্যীনের তায়েফের দোয়ায় মাদীনাকে ক্বুবুল করেছিলেন। শেষে আপনার দরবারে আরেকটি ছোট্ট দোয়া, আপনার হাবীবের তায়েফ হিজরতে যায়দ তাঁর একমাত্র সঙ্গি ছিলো। আমাকে যায়দের মতো ক্বুবুল করুন। আর আপনার কাছে গ্রহণীয় হলে আপনার দেয়া আমার ছেলে মুহাম্মাদকে উসামার স্থলে ক্বুবুল করুন। তবে অবশ্য উসামাহ বিন যায়দ রূপে, কখনো উসামা বিন লাদেন রূপে নয়।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

শেষ কথা, মূল কথা ও আত্ম স্বীকৃতি
সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমি বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত মোহামেডান মুসলমান নই, যাদের কলেমা একত্রে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। আমার কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা আলাদা, যা ক্বোরআন, রাসূল, আযান, ইক্বামাত ও তাশাহ্হুদ অনুযায়ী। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا "শুধু ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হলেই ঈমানদার হবে।"

মোহামেডানরা বলে "সুন্নী বা শিয়া হলেই ঈমানদার হবে।" তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল্‌জামাত ও শিয়া। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সুন্নী ও শিয়ারা কেউ মুস্‌লিম নয়। মুস্‌লিমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনা। ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ওরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানরা নিজ নিজ ইমাম মেসাইয়া, যীশু ও মাহদীর ভাব শিষ্য। আমি ঐ তিন কল্পিত ব্যক্তিকে এক চোখ বিশিষ্ট কানা দাজ্জাল মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাতে মানব জাতি ভবিষ্যতে কখনো তাওহীদের ভিত্তিতে একজাতি ও এক উম্মত হতে নাপারে, শয়তান তাই ঐ তিন কল্পিত দাজ্জালের কল্পিত প্রাচীর দাঁড় করেছে। আমার কাজ তা ভাঙ্গা।

ইসলাম এক ইমামের পেছনে ঐক্যবদ্ধ এক জাতির বিশ্ব সমাজ গঠন করে। মুসলিমদের কাজ হলো গোটা বিশ্বে ন্যায় বিচার ক্বায়েম করা। কোনো জাতির প্রতি বৈরীতা তাদের ন্যায় বিচারে বাঁধ সাধতে পারেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বর্তমানে যদি পৃথিবীতে শক্তিশালী ইমাম থাকতো, তা হলে বিন্ লাদেন ও তার সহযোগিরা বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্রের ধ্বংসে ও নিরাপরাধ মানুষ হত্যায় জড়িত থাকলে তাদের থেকে "ক্বিসাস" নিতেন। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে বুশ-ব্লেয়ারকে শাস্তি দিয়ে তিনি তাদের থেকে আফ্‌গানিস্তানের ক্ষতিপূরণ আদায় করতেন। প্রমাণ ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনরা, তোমরা সার্বক্ষণিক আল্লাহর ন্যায় বিচারের দন্ডায়মান সাক্ষ্য হবে। খবরদার! কখনো যেনো কোনো জাতির প্রতি তোমাদের বৈরীতা তোমাদেরকে ন্যায় বিচার বিচ্যুত অপরাধী করতে না পারে। খবরদার, তোমরা ন্যায় বিচার করবেই। ইহাই তাক্বওয়ার নিকটতম।" (মাঈদা-৮)

আল্লাহর একমাত্র দ্বীন, ইসলামের একক বিশ্ব নেতৃত্বের ইমামত আমার আদর্শ। যেমনটি ছিলেন আমাদের পিতা ইব্রাহীম। আমি তাঁর একক মিল্লাতের পতাকা পুনরোত্তলনকারী। কা'বার "মাক্বামে ইব্রাহীম"এ দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বমানবের জন্য যে সালাত ও হজ্জের যে আযান দিয়েছেন, আমি সে সালাত ও হজ্জের আযান দেয়া মুয়ায্যিন, জামাত ক্বায়েমের ইমাম ও হজ্জের ব্যবস্থাপক। যেমন হযরত মূসা, ঈসা ও খাতামুন নাবিয়্যীন ছিলেন।

আমি শুধু আমার কলেমা, সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের ইমাম। অন্য কারো ইমাম নই। তবে হ্যাঁ! যারা আমার মতো সব ছেড়ে আমার পিছু নিবে, তাদের আমি তাড়াবোনা। সূরা হুজুরাতের কঠোর নিয়মে তারা আমার সাথী হতে পারে। একটি আয়াতেরও সীমালংঘণকারীর আমার কাফেলায় ঠাঁই হবে না।

আল্লাহর রহমতে আমার বাপদাদার দেয়া আমার নামের অর্থের চার দেয়ালীর মাঝেই আমার দুর্গ। আমি তার চৌহদ্দি অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখিনা। আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।

ইয়া আল্লাহ!

আমরা সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্য নিয়ে গঠিত কোনো ইবলিসী সংগঠন, সভাসমিতি ও বক্তৃতামঞ্চ দাঁড় করাবো না। সালাতের জামাত আমাদের জনসভা এবং কোরান তেলাওয়াত ও তর্জমা আমাদের ভাষণ বক্তৃতা । ফজরের জামাত দিবসের প্রথম সভা হবে। অন্যান্য ওয়াক্তীয়া সালাত সাধারণ সভা। জুমার জামাত সাপ্তাহিক সভা। ঈদের জামাত বাৎসরিক মহাসম্মেলন। হজ্জ বিশ্ব সম্মেলন। ওমরা প্রশিক্ষণ কর্ম শিবির। জানাজার নামাজ শোকসভা। সূর্য ডোবার দু'ঘন্টার পর এশার জামাতের পর মজলিস মাহফিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে لا سمار بعد العشاء রাসুল সাঃ এর নির্দেশ। مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ রাত জাগা মুস্তাকবিরি, আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ। (আল মু'মিন- ৬৭) নিদ্রার জন্য রাতকে সম্পূর্ণ নীরব করা হবে। কোন প্রকার গোপন ও গোপনীয় কর্মকান্ড করা হবেনা। সকল কর্মকান্ড আযানের ন্যায় ঘোষণা পূর্বক করা হবে। ইসলামে গোপনীয় কর্মকান্ড নেই।

হে বিশ্ব, সাক্ষী থাকো "আমরা শুধু মুসলিম" اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (আল ইমরান- ৬৪)

বারাকাহ ফাউন্ডেশন (?)

উম্মুর রাসূল বারাকাহ?	ঃ	দাসী বারাকাহ?
উম্মু আইমান বারাকাহ?	ঃ	বুয়া বারাকাহ?
উম্মু উসামাহ বারাকাহ?	ঃ	আয়া বারাকাহ?

আমি এবার মানব জাতির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নিদের্শ করতে যাচ্ছি। মানবজাত নর ও নারী দ্বারা গঠিত। ঈমান ও ইসলাম মানবজাতকে পশুজাত থেকে পৃথক করেছে। ঈমান ও ইসলামহীন মানুষ যে কোনো পশু থেকে নিকৃষ্ট। স্বার্থক ঈমান ও ইসলামের অনুসারী নর-নারী ফেরেশতার চেয়েও সম্মানী, শ্রেষ্ঠ।

ঈমানের পর নর-নারীর জন্য ভূপৃষ্ঠে জীবনে বড়ো পাওনা ও পাওয়া হলো নরের জন্য ঈমানদার আদর্শ স্ত্রী এবং নারীর জন্য আদর্শ ঈমানদার স্বামী। ঈমানদার স্বামী স্ত্রী মানেই শিক্ষিত দম্পতি। প্রচলিত বাংলা, আরবী, ইংরেজী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষার অক্ষর জ্ঞান ছাড়াও বাবা ইব্রাহীম ও মা হাজেরা ও আখেরী নবী সঃ ও মা খাদিজাদের ঈমানের নিরক্ষর দম্পতিরাও শিক্ষিত। কিন্তু এ ঈমানী শিক্ষাহীন এম,এ পাশ, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারও মুর্খ। বরং জঘণ্য মুর্খ। দেশ, জাতি এবং পিতামাতার কুলাঙ্গার। ঘুষ ও সুদখোরী থেকে সকল দুর্নীতি এবং হারাম জীবিকার হারাম খোর। এদের হারাম খেয়ে জন্মদেয়া সন্তানরা হারামজাত হারাম জাদা। এরা জাত বহির্ভুত জাতির মাঝে অজাত। এদের দেশ, জাত ও মানব প্রেম নেই। হতে পারেনা।

ঈমানদার, ঈমানী শিক্ষায় সমৃদ্ধ দম্পতি মিলনের পূর্বেই আল্লাহর নিকট সৎ সন্তান কামনা করে মিশে। সন্তান হলে ভালো নাম রাখে। জন্মের তারিখ সর্বদা স্মরণ রাখে। কখনো জন্মের তারিখ বদলায় না। তা হলে যে সন্তানের জন্ম, তথা পিতৃপরিচয় মিথ্যা হয়ে যায়! জন্মের তারিখ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর বান্দা মানুষ তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত তার স্রষ্টার ইবাদতের পরীক্ষার হলে কাটায়। দু'কাঁধের দু'ফেরেশতা তার পরীক্ষার খাতায় অনুক্ষণ তার ক্রিয়াকলাপ লেখে। জন্মের তারিখ মিথ্যা বা ভুল হওয়া তার পরীক্ষা মিথ্যা ও ভুল হওয়ার নামান্তর। পরীক্ষা ভুল হলে কী হয়? ফেল!? মানুষের পার্থিব জীবন এক। তার পরীক্ষাও একটি। এ এক পরীক্ষায় পাশ করলে জীবন সার্থক ও ধন্য। ফেল হলে সর্বনাশ! মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে এসে কোনো পরীক্ষা দিয়ে পূর্বের ফেল পরিবর্তন করা যায় না।

তাই নর-নারীরা সাবধান! স্বামী স্ত্রীরা সাবধান! পিতা-মাতারা সাবধান! পার্থিব জীবনের পরীক্ষার হলে নকল ও ফেল অর্থ পরকালে জাহান্নাম। সেখানে স্বীয় আমল ব্যতীত কারো আমলে পার হতে পারবেনা। ঈমানদার নর-নারীর জন্য আমি এ মুক্তিপত্র লিখছি। যারা বেঈমান, সে সমস্ত নর-নারী সত্য থেকে মিথ্যায় পতিত, পতিত ও পতিতা। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীণী। তাদের সন্তান জাত ও জাতক নয়। জারজ ও জারজী। সাবধান! তাদের সাবধান হয়ে তওবা করে মানব মানবী হওয়ার চূড়ান্ত নোটিশ রূপে এ মহাজাতকের গ্রন্থ রচনা করছি। হস্তরেখা দেখে মিথ্যা শয়তানী ভাগ্য বলার মহাজতকের পঞ্জিকা লিখছিনা।

হে বাবা আদম ও মা হাওয়ায় সন্তান নর-নারী আমার ভাই বোনেরা! বই পড়ার এ স্থানে তোমরা একটু যাত্রা বিরতি করে অবশ্যই ভেবে নিও যে তোমার যাত্রা গন্তব্যের লক্ষ্যে কিনা! অতীতে ভুল হলে এক্ষুণি মোড় পরিবর্তন করে গন্তব্যের পথে যাত্রা আরম্ভ করো। বর্তমানে শুধু অমুস্লিম কাফেররা নয়, মুসলিম নামধারীরাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের পথ ত্যাগকারী মুর্তাদ ও কাফের। আল্লাহর নাযিল করা শরীয়া বা বিধান ত্যাগ করে মানব স্বেচ্ছাচারের রচিত আইনে চালিত জাতি, নির্বিশেষে যালিম, ফাসেক্ব ও কাফের। (দেখো সূরা মাঈদা-৪৪,৪৫ ও ৪৬) সে অর্থে বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ দারুল কুফ্‌র। তার জনগণ তাদের শাসকদের বদলিয়ে তওবা করে ঈমান এনে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের শরীআ চালু না করলে সবাই কাফের হয়ে জাতিসংঘের সদস্যদের সাথে জাহান্নামে যাবে। জাতি সংঘের অধীনে নরনারীর যে স্বেচ্ছাচারিতার বিধান রচিত হচ্ছে, তা বিশ্ব বেশ্যায়ন। তার বিরুদ্ধে সকল মুসলিম নরনারীকে আর একটি দিনও নষ্ট না করে প্রথমে নিজেরা রাসূল সঃ গণ ও তাঁদের অনুগত স্ত্রীদের আদর্শে সত্যের উপর দৃঢ়, অনড় ও অটল অবস্থান নিয়ে দেশী-বিদেশী বেশ্যা নরনারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও নির্মূল আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। ওদের পাপে সারা বিশ্বে বেশ্যাবৃত্তি, ঘরভাঙ্গা এবং এইডস রোগ সর্বগ্রাসী ধ্বংস যজ্ঞ রূপে ধেয়ে আসছে। এ থেকে মুক্তির প্রথম করণীয় হলো প্রচলিত কুশিক্ষা ও তার প্রচার মাধ্যম বর্জন করতে হবে। কুশিক্ষা হলো নরনারীর সহশিক্ষা ও নরনারীর পর্দাহীন বেহায়াপনা। প্রচার মাধ্যম হলো ছাপা

অক্ষরে সাহিত্য, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন এবং শ্রবন দর্শনের বেতার, দূরদর্শন, ভি,সি,আর, ভিডিও ইন্টার নেট প্রভৃতি। পাপাচারের নগর সভ্যতা নামের অসভ্যতা বর্জন করে সামাজিক বাঁধনের পল্লী-জীবনে ফিরে যাওয়া মাত্রই ঐ মুক্তির সূর্য উদিত হবে। শহর গুলো ক্যান্সারের ন্যায় পল্লী ও পল্লীর মানুষদের নিঃশেষ করে ফেলছে। অথচ পল্লীবাসিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য শহর মুখী না করে তাদের পল্লী জীবনকে স্বনির্ভর ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করা মাত্রই তাদের জীবন যাত্রার ব্যয় এক সপ্তমাংশে নেমে আসবে। নগরগুলো সংকোচিত হয়ে জনসংখ্যা কমে গিয়ে বর্তমান পাপাচারের রাজধানী থেকে আদর্শ গ্রামের তীর্থস্থানে পরিবর্তিত হবে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আল্লাহর বিধান মেনে প্রথম রাত্রিতে নিদ্রায় গিয়ে শেষ রাত্রিতে ইবাদত ও ভোরে উঠে কর্মজীবন আরম্ভ করলে বিদ্যুৎ খরচ সিংহভাগ কমে যাবে, অশ্লীল বিনোদন নামের পাশব তান্ডব প্রায় নাই হয়ে যাবে এবং হারামযাদা হারামযাদী পয়দার হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। আল্লাহর ওয়াদা তাই। বর্তমান নারকীয় বিশ্বে স্বর্গ নেমে আসবে। বর্তমান বিশ্ব ও তার নগর সভ্যতা ইবলিসের উপনিবেশবাদের বাজার ও মেলা। এ মেলায় বেচাকিনি ছাড়া কারো সাথে কোনো ঈমান ও সামাজিকতার বাঁধন নেই। যে যাকে পারে ঠকায়। প্রত্যহ, প্রতিমুহূর্ত ও সর্বক্ষণ চিন্তায় থাকে কে কাকে কিরূপে ঠকাবে। তাই যা অর্জন উপার্জন করে তা যতোটুকু ভোগ করে, তার চেয়ে বেশী অপচয় করে। সে অর্থে বর্তমান বিভক্ত জাতিসত্তায় উন্নতরা অপচয়ের জাতি, Nations of Waste, যাদের আল্লাহ কোরআনে পরস্পরকে "শয়তানের ভাই" বলে নাম করণ করেছেন ঃ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অবশ্যই অপচয় কারীরা শয়তানদের ভাই। (বনী ইস্রাঈল-২৭)

উন্নয়নশীল জাতিরা উন্নতদের যোগানদাতা দালাল, এবং অনুন্নতরা ওদের উচ্ছিষ্টভোগী দান ভিক্ষার ক্রীতদাস। আমাদের রাজধানীসহ বিভিন্ন নগরীর মুস্তাকবির ধনীরা উন্নত বিশ্বের দালাল, পরিত্যাক্ত উপনিবেশবাদের জারজ সন্তান এবং তাদের প্রভুদের দেশীয় প্রজন্ম তৈরীর প্রজনন যন্ত্র। সরকারগুলো ও আমলারা ওদের যৌথ খামার। দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের ছবি দেখলে কি মনে হয় যে এরা এদেশের ক্ষেতে খামারে কাজ করা মুসলিম জনগণের সন্তান বা বৈশিষ্টময় বাঙ্গালীদের ঔরষজাত সন্তান?! মনে হয় না যে এরা উপনিবেশবাদের ক্লাইভ ও কার্জনদের থুথু ও আবর্জনা থেকে জন্মানো ওদের আর্দালী, খানসামা, নাপিত, ধোপা ও মুচিদের প্রজন্ম! সবাই টাই স্যুটপরা গোঁপদাড়ী চাছা ক্লীব্লিঙ্গের বিকৃতজাত। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" কোথায়? একুশে ফেব্রুয়ারী ও পয়লা বৈশাখে ভন্ডামী ছাড়া কি এদের মধ্যে মুসলমানিত্ব দূরে থাক, কোনো বাঙ্গালীত্ব আছে? পার্শ্ববর্তী ভারতের নেতৃবৃন্দের পোষাক আশাক দেখেও কি এদের লজ্জা শরমের উদ্রেক হয় না? এ খবিসদের নামাজের ইমামত ও এদের মুর্দাদের জানাযা পড়ে যারা, তারা কি সূরা তওবায় বর্ণিত হারাম খোর ধর্ম ব্যবসায়ী নয়? পাঠক বৃন্দ! এর সঠিক উত্তর খুঁজে এ বই পড়লে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মুস্তাদআফ হয়ে মুস্তাকবিরদের উৎখাত করে বিশ্ব মুস্তদআফদের মুক্তির মাহদী, মসীহ ও মেসাইয়া হতে পারবে। তা না হলে তোমাদের ক্বিয়ামত উপস্থিত।

সুশিক্ষা মানুষকে ফেরেশতাদের চেয়েও মর্যাদাশীল করে। আদমকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁকে সকল জ্ঞান দান করে তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বলেন, "তোমরা যদি সত্যিকারের জ্ঞানের দাবিতে সত্য হও, তাহলে এর তাৎপর্য আমাকে বলো দেখি!" ফেরেশতারা তখন একবাক্যে বলে ছিলো, "মহাপবিত্র আপনি! আপনার প্রদত্ত ইল্ম ব্যতিত আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই! আপনিই যে সর্বজ্ঞ জ্ঞানের আধার!" অতঃপর আদমকে বলা হলো, "হে আদম! তুমি ফেরেশতাদের এর তাৎপর্য বলে দাও দেখি!" আদম যখন সেমতো বলে দিলো, তখন আল্লাহ বলেন, "আমি কি বলিনি যে আমি আস্মান যমীনের তোমাদের সকল অজানা জানি!? তোমরা যা গোপন বা প্রকাশ করো, সব জানি!" (দেখো, বাক্বারা-৩১,৩২,৩৩)

এ হলো মানব নরনারীর জন্য কল্যাণের শিক্ষা। এর বাইরের শিক্ষা ইব্লিসের শিক্ষা। মানবকে ইতর বানিয়ে পৃথিবীতে উদর পুর্তির কারিগরি শিক্ষা, প্রতারণার অর্থনৈতিক কলা কৌশল ও উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণ দিয়ে পরকালে জাহান্নামের জ্বালানী তৈরী করা। ইবলিসী বিদ্যার শহুরে বাটপাররা পল্লী গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের ভেড়া বকরি ও হাঁস মুরগীর দামে ব্যালট রূপে ভোটের বাক্সে পুরে পাঁচ বৎসর মেয়াদে এক এক দল ক্রয় করে গণতন্ত্রের হাটে নিলামে বেচাকেনা করে। এর নাম গণতন্ত্র! তাই এ গণতন্ত্র আত্মহত্যার মতো হারাম। আল্লাহর বিধানে আল্লাহর

বান্দাদের এরূপ গবাদি পশুসম দাসের হাট নিষিদ্ধ। তার শেষ ও চুড়ান্ত দৃষ্টান্তই তিনি স্থাপন করেছেন দাসের হাট থেকে কেনা বারাকাহ্‌কে দিয়ে তাঁর আখেরী নবী সঃ কে লালন করে। তাঁর দ্বারা দাসের হাট থেকে কেনা যায়দকে মুক্ত করে মুহাজির আনসারদের ইমাম বানিয়ে এবং সর্বশেষ মুজিযা বারাকাহ ও যায়দের মিলনের ফল উসামাহকে রাসূল সঃ কর্তৃক বিশ্বের মুস্তাদআফ্‌দের চুড়ান্ত ইমাম নিয়োগ করে।

জনগণের সম্মিলিত চেষ্টায় জনগণের কল্যাণ সাধনের গণতন্ত্র ইসলাম। শাসক ইমাম এবং ইমাম শাসক। নবী রাসূলগণ ইমাম ও শাসক ছিলেন। তাই তাঁরা পিতৃতুল্য ছিলেন এবং তাঁদের অনুগত আদর্শ স্ত্রীরা মাতৃতুল্য। যেমন মা হাজেরা ও খাদিজা। মন্দরা নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মাতৃতুল্য তো নয়ই, বরং মন্দ নারীদের চেয়েও ঘৃণ্য। যেমন হযরত নূহ্‌ ও লুত আঃ দের স্ত্রী।

ঈমানদার শাসকরা নবী রাসূলদের উত্তরাধিকারী। তাই তারা নামাজ সমাজের যেরূপ ইমাম, যুদ্ধেরও ইমাম। তারা নবীদের আদর্শ ও সুন্নায় জনগণের পিতৃতুল্য এবং জনগণ তাদের সন্তান তুল্য। গোটা সমাজ তাদের সংসার ও পরিবার। গোটা জাতি সম্পর্কে তারা হাশরের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (আরাফ- ৬)

এখন প্রশ্ন করি যে কোনো বৈধ পিতা-মাতা কি তাদের সন্তানদের ভোটাভোটির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পিতা-মাতা হয়?! তা হলে তো দম্পতিকে বিবাহের পূর্বে হারামযাদা-হারামযাদী জন্ম দিয়ে তারা প্রত্যেকে আঠারো বছর উত্তীর্ণ হলে তাদের ভোটেই পিতা-মাতা নির্বাচিত হতে হবে?!

পাঁচ দশটি সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার চেয়ে কোটি কোটি মানুষের পিতা হওয়া অনেক অনেক বড়ো কাজ। তাই তা' কখনো অবুঝ ও অর্ধবুঝ সাধারণ জনগণের খেয়াল খুশীর ভোটাভোটিতে হতে পারেনা। পরিপক্ক ঈমানী আনুগত্যের বাছনীতে ইসলামী জন কল্যাণের ইমাম ও শাসক নিযুক্ত হয়। দলাদলীর শ্লোগান, ভোট কেনা ও ভোট ডাকাতির দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের ইমাম নির্বাচন ও তাঁর বান্দাদের শাসক বাছাই হয় না। প্রচলিত গণতন্ত্র, বিশেষ করে মুস্‌লিম অধ্যুসিত দেশ সমূহে তাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক লুটেরাদের পরিত্যাক্ত "দেশী কালা আদ্‌মী" সাহেবদের গণতন্ত্র মধ্যযুগীয় দাস প্রথার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ মধ্যযুগের দাসদাসীদের মনিবরা তাদের অর্থ দিয়ে কিনে তাদের খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে সকল দায়িত্ব বহন করতো। কিন্তু গণতন্ত্রের মনিবরা ভোটার জনগণের রাজস্বে স্বর্গ সুখে বাস করে দেশবাসীকে গোলাম খাটায়।

ধরাপৃষ্ঠে নিকৃষ্ট মানুষ তারা, যারা মানুষ হয়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। তারা তাগুত, কাফের, ফাসিক ও যালিম। এরা শির্কের দ্বারা মানুষকে বিভক্ত করে দুর্বল করে তাদের উপর প্রভুত্ব করে। আল্লাহ ক্বোরআনে উল্লেখ করেছেন যে ফেরাআউন পৃথিবীতে প্রভুত্ব দাবি করে মানুষকে বিভক্ত করে এক শ্রেণীকে সবল এবং অপর শ্রেণীকে দূর্বল করে পরে সবলকে দুর্বলের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের দ্বারা মানুষের উপর প্রভুক্ত করেছে।

বর্তমানে গনতন্ত্রী ফেরআউনরা তাদের দলের মন্ত্রী, এম পি ও দলীয় সদস্যদের জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে শোষণ করে নব্য ফেরআউনী ও নমরুদী তাগুতী চালাচ্ছে।

এর সম্পূর্ণ উল্টোটা হলো আল্লাহর বিধান ইসলাম। তা হলো মানুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাওহীদ দিয়ে সকল মানুষ ও দেব দেবীর দাসত্ব থেকে মুক্তকরে এক স্রষ্টা, এক বিশ্ব ও এক জাতি করা। এটাই হলো ইসলামী বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন। এর বিপরীতটাই হলো ইব্‌লিস ও তার মানুষ জারজদের গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষ বাদের বিশ্বায়নের মাধ্যমে "বেশ্যায়ন"।

নবী রাসূলগণ মুক্তির বিশ্বায়নের আল্লাহ প্রেরীত আদর্শ ইমাম। তাঁদের মধ্যে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সঃদের কে পঞ্চরত্ন করে আখেরী নবীকে চূড়ান্ত মোহর দান করেছেন। সৃষ্টি সাম্যের এ মোহর মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে তিন দিন অসমাহিত রেখে যে বৈসম্য পুনঃ চালু করা হয়, তার আবর্তে আজ বিশ্বমানব জর্জরিত। ১৪০০ বছর পর সে রাসুল সঃ কে তাঁর রওযা থেকে উত্তোলন করেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। এ উত্তোলন রওযার মাটি খুঁড়ে নয়, তাঁর রিসালাতকে ক্বোরআন ও তাঁর বিশুদ্ধ সুন্নাহ অনুযায়ী পুনঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করতে হবে।

আমার এতো প্রচেষ্টা সে দাফন করা সত্যকে পুনরুত্থিত করতে। সে কাজে যারা আমার সঙ্গি হবে, তাদের পুরুষগণ হতে হবে যায়দ, বেলাল, আম্মার, ইবন মাসউদ, সুহাইব, সালমান, আবু যার ও উসামাহর দৃষ্ঠান্ত এবং নারীরা বারাকাহ, খাদীজা, উম্মে সালামাহ, উম্মে হাবীবাহ ও মারিয়া ক্বিবতিয়াহ্‌দের যিন্দা নমুনা।

বিশ্ব মানব আদর্শের পূর্ণ রবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ কে তাঁর আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগ কৃত পালিকা মাতা বারাকাহ যে ভাবে চিনে ছিলেন, আমার মতে, সে ভাবে তাঁকে আজ পর্যন্ত কেউ চিনে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়নি। হবে কিনা সন্দেহ।

বইর শুরুতে তা উল্লেখ করলেও বইর শেষ পর্যায়ে তার পুনরুল্লেখ করে পাঠকদের তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

রাসূল সঃ তাঁর কাজ সমাপ্ত করে বিদায় নিয়েছেন। কেউ গোত্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পাগলের ভান করেছে, কেউ কথায় কথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে "আল আইম্মাতু মিন্ ক্বোরেশ" জপেছে, আবার কেউ পারিবারিক ক্ষমতা রক্ষার জন্য ঘরের দরজা খিল্ দিয়েছে! কিন্তু সবাই গিয়ে যখন রাসূল ও রিসালতের পালিকা মাতার মুখে রাসূলের মৃত্যু সম্পর্কে মূল্যায়ন জানতে চাইলো তখন বারাকাহ্ উম্মে আইমান ও উম্মে উসামাহ বুকফাটা আর্তচিৎকার করে বলেন, "আহ্, লাক্বাদ্ ইনক্বাতা আল্ ওয়াহ্উ মিনাস্ সামা"। آه لقد إنقطع الوحي من السماء

হায়! আকাশ থেকে অহী আসার সংযোগ কেটে গেলো!

এ মূল্যায়ন কি অন্য কারো মুখ থেকে বের হয়েছে? এর চেয়ে কি খাতামুন্ নাবিয়্যীন সঃ এর রিসালাতের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব!! পাঁচ শব্দে সাত আসমান ও এক বিশ্বকে ঝিনুকে ঢুকিয়ে মুক্তামালা বানিয়েছেন বারাকাহ্।

এ বইর বারাকাহ অধ্যায় পড়ে ৩৫% ৬৫% ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের মিক্চার কিছু যুবক ডাক্তার ও তাদের স্বগোত্রীয়রা অনুপ্রাণীত হয়ে বারাকাহর নামে ফাউন্ডেশন দাঁড় করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাফিক হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা ধর্মের নামে আখের গুছানো কুশিক্ষিত ও বিকৃত জামাতে ইসলামীর এক শ্রেণীর নব্য সবজান্তা। কোনো জিনিস তারা পূর্ণ গ্রহণ করেনা বা করতে পারেনা। তদ্রুপ কোনো জিনিস পূর্ণ ত্যাগও করতে অপারগ। কারণ, পূর্ণ গ্রহণ ও বর্জনের জন্য পূর্ণ জানতে ও বুঝতে হয়। সে যোগ্যতা তাদের নেই।

তাই তারা বিভিন্ন তথ্য পঞ্জী ঘেটে তার এ্যাসর্টমেন্ট দিয়ে "সোনার পিতলা কলস" তৈরীর পথ বেছে নিয়েছে বলে মনে হয়। সততা ও সত্য গ্রহণে তারা অযোগ্য। কারণ, তাতে যেখান থেকে সত্যের সন্ধান পায়, তার স্বীকৃতি দিয়ে কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করতে হয়। সত্যের পথিক হতে হলে আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার গুণ মৌলিক পাথেয়। আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারটিকে সুস্পষ্ট করে বলেছেন من لم يشكر العبد لم يشكر الله **যে আল্লাহর বান্দার শুকুর করেনা, সে আল্লাহরও শুকুর করেনা।** শুকুর শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই কৃতজ্ঞতা। বোধ হয় অকৃতজ্ঞতা কুফরীর পরিণামে নিয়ে পৌছায় বলেই আল্লাহ ক্বোরআনে কাফেরদের অকৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞদের কাফের বলেছেন।

বারাকাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে শিক্ষিত আলেমরা তা বুঝে চুপ মেরে গিয়েছে। যদিও তা তাদের বাজারজাত করা ধর্মব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অনেকের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত নিঃস্বার্থ তৃণ মূলের কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় বিমুগ্ধহয়ে বলতে গেলে আমাকে বাধ্য করেছে বারাকাহর চেপে রাখা তথ্যের মর্মে এ পূর্ণাঙ্গ বই লিখতে। তাদের প্রথম সারির প্রতারক নেতা ও তাদের দ্বিতীয় সারির চামচাদের ধুর্তামী তারা হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে। তারা সন্দেহাতীত বিশ্বাস করে যে তাদের নেতা ও তার খলিফারা প্রতারক। ইসলাম ওদের ব্যবসা। ব্যাঙ্ক বীমাসহ চাঁদার পয়সায় গড়া ওদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্যই নেতা ও চার পার্শ্চর মীর জাফর ও মীর কাশেম আলীরা ধর্মের ভন্ডামী ধরে আছে। মূলতঃ এদের যেমন মূল ঈমান নেই, তাই মূল ইসলামী শিক্ষাও নেই। মাওলানা মওদুদীর চর্বিত চর্বন কিছু চটি বই পড়ে তার তালগোল পাকানো ভ্রান্ত ধারণার সাথে গণতন্ত্র, উমাইয়া, আব্বাসী ও মুঘলাই সাম্প্রদায়িকতার জগা খিচুড়ী এ জামাতে ইসলামীর প্রজাতির ধ্যান, ধর্ম ও উপজীব্য। এরা, বিশেষ করে এদের উপরের নেতা ও দ্বিতীয় কাতারের মজা ভোগীরা নব্য ইয়াজুজ মাজুজ, দাজ্জাল। সন্ত্রাসী ক্যাডার লালন পালন করে এরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং নিম্নের কর্মী শ্রেণীকে ভয় দেখায়। কেউ এদের অপকর্ম বুঝে এদের সংশোধনের কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলেই নেতা তার মারওয়ান বাহিনীকে দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে এবং দল ত্যাগ করলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা চরিত্র হনন ও সন্ত্রাসী প্রতিশোধের হুমকি ছোড়ে।

সত্য দিয়ে এদের নির্মূল করা এখন ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সানে বিশ্বাসীদের কর্তব্য। আখেরী রাসূল সঃ এর রিসালাতকে তাঁর মৃত্যুর পরক্ষণে বিকৃত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত চালু সকল বিদ্আত ও মিথ্যাকে নির্মূল করার লক্ষ্যে এ বই। বিশ্ব সত্য ও বিশ্ব শান্তি প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত বিশ্বনবী সঃ কে লালন ও প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহর নিয়োজিত বরকত, বারাকাহ্কে ঘিরে রচিত এ বই যেখানে গোত্রবাদী, বর্ণবাদী ও

মিথ্যাবাদীদের গোপন ও আড়াল করা যায়দ, বিলাল, আম্মার, সুহাইব, ইব্‌ন মাসউদ, সাওবান, সালমান ও উসামাহদের পরিস্কার দিগন্তে সূর্য উঠার মতো স্বচ্ছ করে, সেখানে মৃত সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস স্তুপের পেঁচা শ্রেণীর কতিপয় ছেলে ছোক্‌রা আমার উপস্থাপিত বারাকাহ পড়ে তাদের কুচক্রি নেতা ও পাতি নেতাদের পরামর্শে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বারাকাহ্‌কে কাজের বুয়া, আয়া ও দাসী রূপে বিকৃত রূপে চিত্রিত করে "হযরত বারাকাহ (রাঃ)" নামে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বই রচনা করেছে। এ বিকৃত পুস্তিকা লিখে তা প্রকাশ করে তা আবার তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, "দি বারাকাহ্‌ ফাউন্ডেশন" নামে বাজারজাত করেছে। ওদের সিনিষ্টার ডিজাইন ও কুৎসিত চেহারাকে ঢাকার জন্য ওরা যে পুস্তিকার শেষে গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ করেছে, তার চেহারাও ওরা বা ওদের সুড়ু নেতারাও দেখেনি। দু' একখানা দেখলেও তা পড়ে তার পাঠোদ্ধার করার যোগ্যতাও ওদের নেই। গ্রন্থপঞ্জি ও বইর তালিকা দেখে মূল বারাকাহ্‌ ও তার জীবনের আবেদনকে খাটো ও বিকৃত করার জন্য তথ্যচোর চক্ররা এ ঘৃণ্য কাজটি করেছে। এদের নির্লজ্জ স্পর্ধা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম যে তারপরও তারা তাদের ব্যবসায়িক প্যাটেন্ট হিসেবে "বারাকাহ্‌ ফাউন্ডেশন" ও "বারাকাহ্‌ কিডনী হাস্‌পাতাল" নামে দু'টি দোকান খুলে হালে একটি স্কুলও চালু করেছে। ওদের তো মানায় বারাকাহ নামে এজেন্সী খুলে মধ্যপ্রাচ্যে বুয়া রপ্তানী করে নুতনকরে দাসীর ব্যবসা আরম্ভ করা!

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ ওদের গুরুদের কুষ্টিনামায় যেহেতু নাই, তাই তাদের বদ্‌তমীয শাগরেদদের কিরূপে থাকবে! এদের জন্য আল্লাহর দরবারে আমার বিশেষ দোয়া, হয় এরা ভুল বুঝে তা স্বীকার করে তওবা করে মানুষ হোক, না হয় আল্লাহ এদের এমন শাস্তি দিন যে তা দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের এ চরিত্র ছিলো। এরা ওদেরই সুন্নাতের শেষ অনুসারী। আল্লাহ এদের নির্মূল করে আল্লাহর রহমত ও বরকতের প্রতীক খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন সঃ ও তাঁর সত্যিকারের "আহ্‌লে বাইত" বারাকাহ, যায়দ, আম্মার, বিলাল, সুহাইব, সালমান ও উসামাহদের জামাত রূপে বিশ্বে সত্যান্বেষীদের বিশ্বায়নের ইমাম ও সৈনিক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বারাকাহ দাসী, যায়দ গোলাম, আম্মার বিলাল ও ইবন্‌ মাসউদরা তুচ্ছ নিম্নশ্রেণীর, আর ক্বোরেশী, হাশেমী, উমাইয়া ও আব্বাসীরা সাহাবী, আশারায়ে মুবাশ্বিরা, খোলাফায়ে রাশেদ, ইমাম ও খলিফা! এতো পুরাতন পরাজিত জাহিলিয়্যাতের বর্ণচোরা প্রত্যাবর্তন! এটাকেই আল্লাহর আখেরী নবী তাঁর বিদায় ও বিজয় হজ্জে পায়ের তলায় পিষ্ট করে গিয়ে ছিলেন! আমরা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অনুসারী। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সঃ এর প্রিয় হিব্ব ও হাবীবরাই আমাদের কাছে প্রিয়দের তালিকায় শীর্ষে। তারপর গোত্রবাদীরা তাদের ব্যক্তিগত তওবা ও আমলের পরিমাপে আমাদের অন্তরে, কাছে ও দূরে। ক্বোরআন ব্যতীত, ক্বোরআন বিরোধী কোনো তথাকথিত হাদীস আমাদের এ বিশ্বাসের ভীতে নাড়া দিতে পারবেনা। ক্বোরআনের সাথে মিললে সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হাদীসও (?) আমাদের নিকট সবল। তাই-ই সহীহ্‌। না মিললে তা কথিত সহীহ হলেও মিথ্যা। তা সিহাহ্‌ সিত্তায় হলেও।

রাসূল সঃ যাকে বলেছেন ঃ

(১) "আমার মায়ের পর ইনিই আমার মা, আমার স্বজনদের অবশিষ্ট।"

(২) ধরার পৃষ্ঠে চলমান জান্নাত।

(৩) রাসূল সঃ যাকে সালাম করে বলেছেন, "আম্মা তুমি কেমন আছো?" উত্তরে বলেছেন, "হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমি ভালো, যতক্ষণ ইসলাম ঠিক থাকে।"

(৪) বারাকাহ এসে তার রাসূল ছেলেকে বলেন, "মুহাম্মাদ পানি পান করাও"। উত্তরে নির্বোধ মা আয়শা বলে, "তোমার এতো স্পর্ধা যে রাসূলকে পানি দিতে বলছো!" উত্তরে ধীর কণ্ঠে বারাকাহ নির্বোধ পুত্রবধুকে তীক্ষ মেধায় তিরস্কার করে বলেন, "বউ, মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করো?" রাসূল মা আয়শা কে বলেন, "তুমি কাকে কি বলছো? এ যে আমার মা। এ যে জন্ম দাত্রীর পর আমার আসল মা!" রাসূল নিজ হাতে পানি এনে মাকে পান করান।

(৫) আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসিত যায়দের সাথে বিয়ে হলে যাদের মিলনে আল্লাহ মুস্‌লিম উম্মার ইমাম ও প্রধান সেনাপতি উসামাহ্‌ ইবন যায়দের জন্ম হয়।

(৬) আবু বকর ও উমর গোত্রবাদী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ শিষ্ঠাচারে রাসুল সঃ এর কপালে চুমো খাওয়া ও মুখে ডাকা আম্মার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে কান্নায় ভেঙ্গে বলেন। آه لقد إنقطع الوحي من السماء

"হায়, আসমান থেকে অহী আসার সংযোগ কেটে গিয়েছে।"

এ সমস্ত হীরা ঝরা অমর গাঁথার মহিয়সী মহিলা, বুয়া, কাজের ঝি, আয়া!? আর যারা রাসূল সঃ এর জীবদ্দশায় ঘরে

বাইরে ফিতনা সৃষ্টি করে বেড়িয়েছে, যাদের ব্যাপারে বহু খন্ডিত অহী নাযিল ছাড়াও পূর্ণ দৈর্ঘ সূরা নাযিল হয়েছে, যারা মুহাজির আনসার, ক্বোরেশী অ-কোরেশীর ধুয়া তুলে ইসলামী ঐক্যকে খান খান করেছে, রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর নারী পুরুষ নির্বিশেষে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে হাযার হাযার নয়, লক্ষ লক্ষ ঈমানদারদের লাশকে শকূন ও শিয়াল কুকুরের খাদ্যে রূপান্তরিত করে আজো শতধা বিভক্তির কারণ হয়ে আছে, তারা "রাদিআল্লাহ আন্‌হু?!" রাসূল সঃ এর শ্বশুর, জামাতা ও শালা সম্বন্ধি হলেই তারা সবাই পূজনীয়?

এমন আম্মাজান, নানাজান, মামুজান ও দুলা ভাই জানদের ১৪১২ বছর পর সশ্রদ্ধ সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে আমি সম্পূর্ণ দায় মুক্ত হয়ে, আল্লাহ, রাসূল সঃ ও ক্বোরআনকে বুকে ধারণ করে ১৪০১ থেকে ১৪১২ বছরের পূর্বের অবস্থা ও অবস্থানে আমি নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের ইসলাম, ঈমান ও ইহ্‌সানের তাক্‌ওয়ার পতাকাবাহীদের "লা ইলাহা ইলাল্লাহ" এর কালেমায়ে তাইয়েবার দিকে ডাকার আযান দিচ্ছি।

দি বারাকাহ ফাউন্ডেশনের তথ্যচোর অকৃতজ্ঞ চক্রের উদ্যোক্তাদের আমি মনে করেছিলাম যে এরা জামাত চক্রের কিছু তত্ত্বাকারী লোক হবে। তাই এরা যখন আমার লেখা বারাকাহর প্রতিবেদন পড়ে আমার কাছে এসে যোগাযোগ করে, তখন আমার সন্দেহ হয়েছিলো যে, এদের হয়তো সৎ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু পরে এরা পাল্টা বিকৃত বারাকাহ প্রকাশ করে প্রমাণ করলো যে এরা গোলাম আযম চক্রেরই বি টিম ও সি টিমের হুতুম পেঁচা। এরাই পার্থিব তুচ্ছ স্বার্থে মা বোন বিক্রি করতে পারে, বা করে। তারই প্রমাণ সরবরাহ করেছে মা বারাকাহর জান্নাতী জীবনী বিকৃত করে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এদের জন্ম হলে এরা অবশ্যই আবু জেহল, আবু লাহাব, আবু সুফ্‌য়ান, মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানদের দলের রোকন ও মুত্তাফিক এবং মুনাফিকদের অন্তর্ভূক্ত হতো। আল্লাহ এদের ষড়যন্ত্র থেকে সরলমনা মু'মিনদের এবং কোমল মতি সত্যান্বেষী যুবকদের রক্ষা করুন।

এদের কথা বার্তা ও লেখায় সাধারণ মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে এদের ইসলামী বলে ভাবতে আরম্ভ করে। তাই এদের সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যই বারাকাহকে নিয়ে ওদের কুকীর্তি প্রকাশ করে সাবধান হওয়া ও করার দৃষ্টান্ত ওরা নিজেরাই সরবরাহ করলো। সাধারণ ঈমানদাররা হয় দাড়ি কামায়, অথবা মাপমতো দাড়ি রেখে মাথায় টুপী পরে। এরা কামার, চামার ও ধোপা সুইপাররা যেমন সময়াভাবে দাড়িগোঁপ কামাতে না পেরে, পরে সপ্তাহ দশ দিন অন্তর শেভ হয়, তেমন দাড়িগোঁপ রাখে। শার্ট প্যান্টের সাথে এদের এ গোঁপদাড়ি দেখলেই এদের চেনা যায়। দাড়িগোঁপে যেমন এরা খাটো, ঈমান আমলেও এরা খাটো। এদের হুলিয়া দেখেই এদের থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এদের হুলিয়া তুলে ধরা হলো।

সারা বিশ্বে এদের চেহারার নমুনা প্রায় এক। এ ইয়াহুদী খৃষ্টান ষ্টাইলের ক্রস্ ব্রীডরা "দ্বীনুল ক্বাইয়েমা" ইসলামের পথে মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ। এরা সেমিনার, পাঠচক্র ও মুখরোচক খন্ডসভা করে তার উপর পুস্তিকা ও সামায়িকী প্রকাশ করে দিশাহারা যুবকদের আকৃষ্ট করে বিভ্রান্ত করে। তাওহীদ, রিসালাত ও ক্বোরআন ভিত্তিক ইসলামের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এরা কখনো উমাইয়া আব্বাসী বর্ণবাদী খেলাফত, কখনো মুঘল পাঠান সাম্রাজ্যবাদ ও কখনো পশ্চিমা কুফরী গণতন্ত্রের প্রবক্তা। এরা দাজ্জালী ফিত্‌নার এ্যডভান্স পার্টি। এদের থেকে সতর্ক হতে হবে।

যাদের কাছে বারাকাহ উম্মুর রাসূল, যাকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর খাতামুন্ নাবিয়্যীন সঃ-কে লালন পালনের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন, যার পেটে আল্লাহ আইমান ও উসামাহকে জন্মিয়েছেন এবং যায়দের মতো প্রশংসিতের সাথে জোড়া বেঁধে ছিলেন, এ বই তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের। তাদের কাছে বারাকাহ উম্মুর রাসূল, যেমন বিবি আসিয়া উম্মু মূসা ও মারয়াম্ উম্মু ঈসা। এদের সবার উপর সালাম।

যাদের কাছে বারাকাহ গুরুত্বহীনা দাসী, কাজের বুয়া ও আয়া, তাদের জন্য এ বই ও তার আদর্শ নয়। তারা মা আমিনা ও বিবি হালিমার নামে মিলাদ পড়ুয়া ধর্ম বেসাতী মোল্লাদের মতো আরেক নব্য বিকৃত ব্যবসায়ী। এ উভয়ের ফিত্‌না থেকে আল্লাহ ঈমানদারদের রক্ষা করুন। আমীন॥

বিশেষ ঘোষণা

মানব ঐক্যের পথে প্রধান বাঁধা

বিশ্বের তিনটি অভিশপ্ত জাতি

(১) ইয়াহুদী মুসলমান (২) খৃষ্টান মুসলমান (৩) মোহামেডান মুসলমান

ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহ আছেন, তবে ওযাইর আল্লাহর ছেলে।

খৃষ্টানরা বলে, আল্লাহ আছেন তবে ঈসা আল্লাহর ছেলে।

মোহামেডানরা বলে, আল্লাহ আছেন, তবে "আহাদ" আর "আহ্মাদ" এর মধ্যে মাত্র একটি "মিম" অক্ষরের তফাত। মিম মুছে ফেললেই "আহ্মাদ" আহাদ" অর্থাৎ আল্লাহ হয়ে যায়।

আল্লাহর নূরে মুহাম্মাদ তৈরী, আর নূরে মুহাম্মাদী দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি। মুহাম্মাদ না হলে বিশ্বে সৃষ্টি হতো না।

এদের কলেমা, কালেমা তাওহীদের সাথে মুহাম্মাদ সঃ কে একাকার করে বলা, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।" আরবী ব্যাকরণ মতে যার অর্থ দাঁড়ায় ঃ

"নাই কোনো উপাস্য আল্লাহ ব্যতিত, তিনিই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

অতএব, দেখা যায় যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা অর্ধেক মুশ্রিক, আর মোহামেডানরা ষোলো আনা মুশ্রিক।

তাই বিশ্বময় আল্লাহ মোহামেডান মুসলমানদের ইয়াহুদী খৃষ্টানদের গোলাম দশায় অভিশপ্ত করে রেখেছেন।

তাহলে বাঁচার উপায় কি?

উপায় হলো, আল্লাহ ও তাঁর আখেরী নবী সঃ যেভাবে কলেমা পড়তে ও বলতে বলেছেন।

তা হলো, আমরা যেভাবে আযান, ইক্বামত ও তাশাহ্হুদে (আত্তাহিয়্যাতে) কলেমা উচ্চারণ করি ঃ

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

আশ্হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده و رسوله এসো হে আদম সন্তান মানব জাতি, আমরা সঠিকভাবে কলেমা পড়ে মুস্লিম ও মু'মিন হই।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ বলেছেন, জেনে নাও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (সূরা মুহাম্মাদ-১৯)

শেষ নবী মুহাম্মদ সঃ বলেছেন ঃ

قولوا لا إله إلا الله تفلحواو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة যে-ই বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" জান্নাতে যাবে।

শেষ নবী সঃ কোথাও, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একত্রে বলেন নি। যে কেউ জেনে তা বলবে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় ওযাইর ও ঈসা আঃ কে আল্লাহর শরীক বানানোর পাপে মুশ্রিক ও কাফের হয়ে যাবে। (তওবা-৩০) وَقَالَتِ

الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (তাওবা-৩০)

এতো দিন যারা না জেনে ভুলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একত্রে বলেছে ও লিখেছে, তারা তওবা করে এখন থেকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমা তাইয়েবা ও তাওহীদ পড়ে ঈমান নবায়ন করবে।

ঘরে, মসজিদে, অফিসে, স্থাপনায় ও যেখানে যেখানে "লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একত্রে লেখা আছে, তা মুছে ও সরিয়ে ফেলবে। এখন থেকে পৃথক পৃথক কলেমা তাইয়েবা ও কালেমা রিসালাত পড়বে, লিখবে ও শিখাবে। যেমন সালাতের আযান, ইক্বামত ও তাশাহ্হুদে আছে। তবেই তাওহীদ ভিত্তিক মুস্লিম উম্মাহ সৃষ্টি হয়ে বর্তমান অচল অবস্থা দূর হয়ে বিশ্বে আল্লাহ, রাসূল ও আল্ কোর্আন ভিত্তিক উম্মাহর জয় হবে। রহমতের বিশ্বায়ন হবে মানব জাতি এক জাতি হবে।

তাওহীদ ও কলেমা তাওহীদের উত্থানই ইমাম মাহ্দী ও হযরত ঈসা আঃদের বিপ্লবের সূচনা করবে। বর্তমান প্রচলিত শির্কী কলেমা সে উত্থানের পথে বাধা।

আজ থেকে সবাই তাওহীদের পতাকা ধারণ করো ও বলো ঃ

لا إله إلا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আযান ও এক্বামতের শেষে তাই আছে। আল ক্বোরআনে আল্লাহ তাই বলতে নির্দেশ করেছেন।

জরুরী জ্ঞাতব্য

হযরত মূসা আঃ তাঁর রিসালাত পূর্তির কালে তূর পর্বতে তাওরাত আনতে আল্লাহর সান্নিধ্যে গেলে তাঁর প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হতেই তাঁর সাহাবীরা গো বাচ্চা তৈরি করে তার পূজা আরম্ভ করে দেয়। তাঁর মৃত্যুর পরই তারা বর্ণবাদী হয়ে তাঁর রিসালাত ত্যাগ করে ইয়াহুদী হয়ে যায়।

হযরত ঈসা আঃ কে তাঁর নিকটতম সাহাবী মাত্র ত্রিশটি মূদ্রার বিনিময়ে শত্রুর হাতে তুলে দিতে গেলে আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নেন। হযরত ঈসা আঃ এর হাওয়ারী নামের নিকট সাহাবীরা তাঁকে রক্ষা করতে আসেনি। তাঁকে তুলে নেয়ার পর তাঁর নামে ক্রুশ গলায় পরে ঈসায়ী হয়ে যায়।

আখেরী নবী সঃ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সাহাবীদের হযরত মূসা ও ঈসা আঃ দের সাহাবীদের পদাঙ্কে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে যান।

তার মৃত্যুর পরই তাঁর লাশ মুবারক বিনা দাফনে রেখে ক্ষমতা দখলের চক্রাতে লেগে যায়। রাসূল সঃ এর দাফনের পূর্বেই তাঁর রিসালতকে দাফন করে তারপর তাঁকে প্রতিষ্ঠিত জানাযা ছাড়াই দাফন করে।

মক্কার লোকেরা রাসূল সঃ এর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে এমন আনন্দে ফেটে পড়ে যে, তাঁর নিয়োজিত গভর্নরকে মক্কা ছেড়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়।

মক্কাবাসী পরে তাদের মক্কার কোরেশী ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হয়েছে জানার পর মাদীনার সাথে মিলে কোরেশী সাম্রাজ্যবাদের পত্তন করে। বিশ্বকে ধোকা দেয়ার জন্য তারা রাসূল সঃ এর প্রতিষ্ঠান নির্মূল করে অনুষ্ঠান চালু রাখে।

হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ এর দাফন করা প্রতিষ্ঠানকে অতীতের কবর খুঁড়ে উদ্ধার করে বর্তমান ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও মোহামেডানদের ভন্ড অনুষ্ঠানকে কবরস্থ করে পূনঃ রিসালাতকে প্রতিষ্ঠা করার জিহাদ আমার এ লেখনী।

এই জিহাদে আমার জন্য "একা" আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমি তাঁর "দোকা" সানীয়াস্নাইন। বিশ্বের যারা আমার সাথে যোগ দিবে, তাদের লাভ। আমার কোনো লাভ নেই।

আমার পথে বাধ সাধায় মা, আশৈশব পালিত ভাইদের, নূহ ও লুতের স্ত্রীদের দৃষ্টান্তের স্ত্রী ও মায়ের অনুসারী বড়ো মেয়েকে ত্যাগ ও ত্যাজ্য করে মাঠে নেমেছি। আমার নির্বোধ নিমকহারাম ছোটো ভাইটি বলে যে, আল্লাহ নাকি আমার ঘাড় ধরে তাদের সবাইকে লালন করিয়েছেন। বাঁদরটির এই কথাটি ঠিক।

আল্লাহ আমাকে প্রথমে ওদের উঠানোর জন্য ঘাড়ে ধরেছিলেন। এবার ওদের ও ওদের মতো নিমকহারাম ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও মোহামেডানদের নামাতে ঘাড়ে ধরেছেন।

বর্তমান রাব্বাই, পাদ্রী ও মোল্লাদের মাঝে যে ধর্মাচার রয়েছে তা ব্যবসার জন্য। যেমন কুলাঙ্গার ছেলে মেয়েরা তাদের ধর্ম প্রচারক পিতা ও পূর্ব পুরুষদের রচিত বই বিক্রীর জন্য তাদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা মাওলানা মওদুদী ও মাওলানা আব্দুর রহীমের ছেলে মেয়েদের ভাবতে পারি।

আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের ঘাড়ে তার কর্ম পর্যবেক্ষক যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছেন। রোজ ক্বেয়ামতে তা থেকে আমলনামা বের করে প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে। (বনি ইস্রাঈল-১৩)

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

আমার একআল্লাহ তাঁর "দোকা" কে দিয়ে অতীতের সমাধি খুঁড়ে যে তথ্যাদী দিয়েছেন তার একশ' পৃষ্ঠার মতো এ বইতে অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যারা তওবা করে এক আল্লাহর "দোকা" হতে চায়, তারা যেনো ভাবতে পারে।

পরে পরিস্থিতি দেখে তা প্রকাশ করা হবে। অন্যান্যদের ব্যাপারে যেখানে চার আনা ও আট আনা লেখা হয়েছে, সেখানে আমার ব্যক্তি, পরিবার, ভাই ও রক্তীয়দের ব্যাপারে ষোল আনা লেখা থাকবে। আমার ঘাড়ে আল্লাহর শক্ত হাত। ভুল করলে আমার ঘাড় মটকে দিবেন।

সময় এসেছে এক আল্লাহর "দোকা" দের। "ধোকা" দের দিন শেষ।

الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إ لا الله আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!!!

প্রমাণসূত্র

১। কোরআন
২। তাওরাত
৩। বাইবেল
৪। মুয়াত্তা মালিক
৫। বোখারী
৬। মুস্‌লিম
৭। আবু দাউদ
৮। তির্‌মিযী
৯। নাসায়ী
১০। দারেমী
১১। মুস্‌নাদি আহমদ
১২। রুহুল্‌ মা'আনী
১৩। কুরতবী, তাফসীর
১৪। তাবারী, তাফসীর
১৫। ফত্‌হুল ক্বদীর, তাফ্‌সীর
১৬। ইব্‌ন কাসীর, তাফ্‌সীর
১৮। দাইরাতুল্‌ মা'আরিফ আল-ক্বারনুল্‌ ইশ্‌রীন
১৯। দাইরাতুল মা'আরিফ আল- ইস্‌লামিয়্যাহ্‌
২০। বেদায়াহ্‌ নেহায়াহ্‌
২১। উস্‌দুল্‌ গাবাহ্‌
২২। তাবারী, তারীখ
২৩। তারীখ ইব্‌ন কাসীর
১৪। তারীখ ইব্‌ন হিশাম
২৫। তারীখ ইব্‌ন খালদুন
২৬। তাবাক্বাতুল কোবরা
২৭। তারীখুল্‌ উমাম ওয়াল্‌মুলূক
২৮। তারীখু ইয়াকুবী
২৯। তারীখু বাগদাদী
৩০। তারীখুল আরব
৩১। ইমামাহ্‌ ওয়াস্‌ সিয়াসাহ্‌ লি ইবন্‌ ক্বোতাইবাহ্‌
৩২। আল ইসাবাহ্‌
৩৩। আল্‌ কামিল ফিত্‌তারীখ
৩৪। আর্‌রাসূল, সাঈদ হাওয়া
৩৫। হাদিরুল আলম আল্‌ ইসলামী আমীর শাকীব আরসালান
৩৬। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌- মুহাম্মাদরেদা
৩৭। জুনদুল্লাহ্‌, সাঈদ হাওয়া
৩৮। তারীখুল বোখারী
৩৯। আন্‌সাবুল্‌ আশ্‌রাফ, লিল্‌ বালাযরী
৪০। রাবিউল্‌ আব্‌রার, যামাখ্‌শারী
৪১। তারীখে দিমাশ্‌ক্‌, ইব্‌ন্‌ আসাকির
৪২। ফিল্‌ মিলাল্‌ ওয়াল্‌ আহ্‌ওয়া, ইব্‌ন্‌ হাকাম্‌
৪৩। ওয়ালাতু মিস্‌র্‌ লিল্‌ কিন্দি
৪৪। আন্‌নিযা ওয়াত্তাখাসুম্‌, লিল্‌ মুক্বরিনী
৪৫। মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ, ইবন্‌ তাইমিয়্যাহ্‌
৪৬। আল্‌ ইসলামু ওয়া উসুলুল্‌ হুক্‌ম্‌
৪৭। আল্‌ মিলাল্‌ ওয়ান্‌নাহাল, শাহ্‌রাস্তানী
৪৮। আবু বকর, মাহমুদ আক্কাদ
৪৯। আল ফারুক, উমর, মুহাম্মাদ রিদা
৫০। খোলাফাউর রাসূল, খালেদ মুহাম্মদ খুল্‌দ
৫১। সাইয়্যেদাতু বাইতিন্‌ নবুওয়াহ্‌,ডঃ বিন্‌তুশশাতি
৫২। বেদ
৫৩। গীতা
৫৪। মহাভারত